কালি ও কলম

সাহিত্য পত্রিকা

চট্টজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎ-বিচিত্রা, শ্রীকান্ত ৩য়, ৪র্থ (খণ্ড) / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আরোগ্য নিকেতন / তারাশঙ্কর বন্দ্যো...
জাগরী, সতীনাথ-বিচিত্রা, দিগ্‌ভ্রান্ত / সতীনাথ ভাদুড়ী
কথা-চরিত মানস / বিমল মিত্র
ন্যায়দণ্ড, লৌহকপাট (৩য় খণ্ড) / জরাসন্ধ
মন্দাক্রান্তা / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বলাকার মন, আবার আমি আসব //
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বরযাত্রী, রূপ হ'ল অভিশাপ / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
পুতুল নাচের ইতিকথা / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জেনানা ফাটক / রাণী চন্দ
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে / সুরেশচন্দ্র সাহা
কালজাক // যজ্ঞেশ্বর রায়
মানব কল্যাণে রসায়ন / দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
নাগচম্পা // নারায়ণ সান্যাল
রুদ্ধ যাযাবর / গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সমুদ্রের চূড়া / গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রাশিয়ার ডায়েরী / প্রবোধকুমার সান্যাল
হাসের আকাশ / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দিগন্তের রং / গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রকাশ ভবন
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—এম. কে. গান্ধী

IATA

নিয়মাবলী

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বারো টাকা ও
ছ'মাসের জন্য ছ'টাকা অগ্রিম দেয়
রেজেষ্ট্রি ডাকে পেতে হলে পৃথক খরচ দেয়
সাধারণ ডাকে পত্রিকা নিরুদ্দিষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া চলে
গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক
রচনার নকল রেখেই লেখা পাঠাবেন
কোন গোলযোগে রচনা নষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
সঙ্গে ডাকটিকিট থাকলে
অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়
কিন্তু অমনোনীত কবিতা
কখনোই নয়
রচনা সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করা
সম্ভব নয়
পত্রোত্তরে এজেন্সীর নিয়মাবলী
জানানো হয়
পত্রিকার সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা
সবরকম যোগাযোগ ও টাকাকড়ি পাঠানোর ঠিকানা
কালি ও কলম ॥ ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ দিয়ে স্নানে আনন্দ—স্নিগ্ধশীতল ফেনায় গা জুড়োবে —ত্বক হয়ে উঠবে কমনীয় কান্তিময়। আর স্নান সেরে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যালক গায়ে ছড়িয়ে দিলে দেহ-মন সতেজ হয়ে উঠবে। এই চন্দন সুরভিত সাবান ও পাউডার দুয়ে মিলে আপনাকে দিনভর ঝরঝরে রাখবে—প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তও ঘিরে থাকবে চন্দন-সৌরভে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

MLT 5671A

কয়েকজনের খেয়ালখুশির উপর
লক্ষ লোকের ভাগ্যকে
ছেড়ে দেবেন কেন?
কোন ট্রেন দেরীতে পৌঁছনোর জন্য ঠিকসময়ে হাজিরা দিতে না পারায় শ্রমিকের একদিনের রুজি চলে যায়, পরীক্ষায় ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারায় কোন ছাত্রের সারা বছরটাই মাটি হয়ে যেতে পারে, কোন বিয়ের কনে লগ্ন বয়ে যাবার আগে হয়ত পৌঁছতেই পারলনা, আর কোন রুগী হয়ত সময়মতো চিকিৎসার অভাবে বাঁচলই না।
যে কোন দিন যে কোন সময়েই এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, যদি খেয়ালখুশি মতো ট্রেনের বিপদ-শৃঙ্খল ব্যবহার করা হয়। বিপদ বা কোন দুর্ঘটনাকে রোধ করার জন্যই বিপদ-শৃঙ্খলের ব্যবস্থা। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন অযথা এই বিপদ-শৃঙ্খলের অপব্যবহার করে ট্রেনের অসংখ্য যাত্রীর নিদারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। কয়েকজন লোকের অযৌক্তিক খেয়ালখুশির উপর লক্ষ লোকের ভাগ্য নির্ভর করবে কেন?
ট্রেন বিপদ-শৃঙ্খলের অপব্যবহার বন্ধ করুন। অপরাধীদের ধরিয়ে দিন। আপনাদের আরও ভাল ভাবে সেবা করার জন্য রেলওয়েকে সাহায্য করুন।
পূর্ব রেলওয়ে

কালি ও কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ ॥ নবম সংখ্যা ॥ বৈশাখ, ১৩৮০

সূচীপত্র

আমাদের কথা ॥ ১২৪৫

প্রবন্ধ

অপরাধী রামমোহন ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১২৪৭

যুগপথিক রামমোহন* ॥ গোপাল হালদার ॥ ১২৫৩

সাহিত্য পত্রিকা : রামমোহন ও বিদ্যাসাগর চর্চা ॥ নির্মলেন্দু ভৌমিক ॥ ১২৬১

দুই মনীষী এবং আমাদের উত্তরাধিকার ॥ বার্ণিক রায় ॥ ১২৭৩

রামমোহন ও যুক্তিবাদ ॥ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১২৮৫

রামমোহনের বংশপরিচয় ॥ ডঃ দিলীপকুমার বিশ্বাস ॥ ১২৮৯

রামমোহন-চর্চার নানা দিক ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১৩০১

বাংলা গদ্যরীতির বৈচিত্র্য ও বিদ্যাসাগর ॥ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ॥ ১৩০৭

ভবভূতির উত্তরচরিত এবং বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস ॥ আশিস মজুমদার ॥ ১৩১৯

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা ॥ ১৩২৭

ভারতদূত রামমোহন ॥ অরুণকুমার সেনগুপ্ত ॥ ১৩৩৫

কার 'সম্ভাষণ' ? ॥ বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ॥ ১৩৪৩

বাঙলা গদ্যের পরিমার্জনা : শকুন্তলা ও সীতার বনবাস ॥ ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার ॥ ১৩৪৯

"সতী" ও বৈধব্য সমস্যার সমাধানে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রেরণা ও রণনীতি ॥ অজয়েন্দ্রনাথ সরকার ॥ ১৩৫৭

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত পথিক রামমোহন ॥ ডঃ সুধীরকুমার নন্দী ॥ ১৩৬৫

রামমোহনের ধর্মচেতনা ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৩৭৫

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তা ॥ শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ ১৩৮৫

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে রামমোহন ও ডাফ্ ॥ ভূপেন্দ্রনাথ শীল ॥ ১৩৯৭

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ॥ ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ॥ ১৪০৩

রাজা রামমোহন ও বিশ্বমানস ॥ বিষ্ণুপ্রসাদ চক্রবর্তী ॥ ১৪০৮

রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ॥ সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী ॥ ১৪১৯

সাহিত্যের খবর ॥ সুচরিতা সান্যাল ॥ ১৪৬৭

প্রচ্ছদপট—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক : শুভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

॥ ষষ্ঠ বর্ষ ॥
॥ নবম সংখ্যা ॥
॥ বৈশাখ ॥ ১৩৮০ ॥

॥ আমাদের কথা ॥

…নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনেক পূর্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মত বড়ো মন তাঁর ছিল। বর্তমান কালে অন্তত বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ-বেদান্তে উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি পারসিতেও ছিল সমান অধিকার, শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেই সঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ। এদেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই। সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবনযাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।…আজ যদি তাঁকে আমরা ভালো করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্বলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালি চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

—রবীন্দ্রনাথ

...বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে জোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিও ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁর যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভুরি ভুরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্ম-সম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্র পরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্তবলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অপরাধী রামমোহন

বড়োকে ছোটো করা, আর ছোটোকে বড়ো করা এটা বোধহয় সাধারণ-বুদ্ধি লোকদের স্বভাব। তা না হ'লে গৌতমবুদ্ধকে তাঁর আত্মীয় দেবদত্ত পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে নিধনের চেষ্টা করবেন কেন? কেনই বা সোক্রেতিসের বিরুদ্ধে তাঁর উপদেশ শ্রোতারা সাক্ষ্য দিয়ে এলো এবং বিচারকের দল দিলো মৃত্যুদণ্ড? আর যিশুখৃষ্টকেই বা ইহুদী পুরোহিত পাণ্ডার দল মিথ্যাপরাধে দণ্ডিত করে কেন ক্রুশে বিদ্ধ করলো! হজরত মহম্মদকে তাঁর কোরেশীয় আত্মীয়রা মক্কায় কেনই বা বিপন্ন ক'রে তুলেছিলো? এ সবই ছোটো মানুষের স্বভাবধর্ম।

সুতরাং মহাপুরুষরা চিরদিনই কাপুরুষদের দ্বারা নিন্দিত, ভর্ৎসিত, নির্যাতিত হ'য়ে আসছেন। রামমোহনকেও তাঁর জীবনকালে লোকনিন্দার ভাগী হতে হয়। দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন মুহূর্তেও রামমোহনকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে—বাঙ্‌লাদেশেই বেশি করে এবং বাঙালীর দ্বারা দেশে দেশে সেই প্রচারকার্য চলছে।

রামমোহনের অপরাধ অনেক। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কারও ধর্মকেই অন্যায়-আচরণ, অসম্ভব-বিশ্বাসাদির মধ্যে থাকতে দিতে চাননি। ধর্মের মূঢ়তায় সদ্যবিধবা নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো ধর্মকর্মকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। আজ শুনে আশ্চর্যান্বিত হই যে, রামমোহন নাকি সতীদাহ বন্ধ করতে চেষ্টা করেন নি!

পাণ্ডিত্য দুই ধরণের। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যার ধারক ও বাহকগণ মনুষ্যনিধন যজ্ঞের জন্য যন্ত্রাদি উদ্‌ভাবন করে—এঁরা অসৎ পণ্ডিত, আর সৎ পণ্ডিত মানুষের নানাবিধ ব্যাধি নিরাকৃত করবার জন্য চেষ্টা করেন। তেমনি জ্ঞানরাজ্যে সত্যকে স্বচ্ছভাবে দেখানোকে বলবো সৎ পাণ্ডিত্য, আর যাঁরা সত্যকে আতস কাচের মধ্য দিয়ে দেখে বিকৃত করে জনসমাজকে দেখাতে চান, তাঁরা অসৎ পণ্ডিত। এঁরাই mountain of a mole-hill করেন—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে জাতীয় জাগরণ বলে ব্যাখ্যা করেন।

সৎ ও অসৎ পণ্ডিত ছাড়া আছেন গুরুর প্রতিধ্বনিকারী ভক্তের দল। দেশের সবকিছুই বিদেশ থেকে পেয়েছি বলে তাঁরা হীনমন্যতার ভাব প্রকাশ করেন, আবার কালে প্রতিক্রিয়াশীলরা বলতে স্থরু করেন—সবই ছিল দেশে, বিদেশ থেকে কিছুই পাইনি। রেলযান, এরোপ্লেন, শতঘ্নী প্রভৃতি ছিল। এঁরা পাণ্ডিত্যের জাহির করেন, আর আমরা সাধারণ লোকেরা শুনে অবাক্ হ'য়ে বলি—আমরা এসব তো কিছুই জানতাম না। ভাগ্যিস্ পণ্ডিতরা এসব তথ্য আমাদের জানালেন! শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার পথিকৃত রামমোহন কেন হবেন? এ বিতর্কও উঠেছে। বলছেন—ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা বই লেখেননি বাংলায়? তত্ত্বকথা তো বাংলা গদ্যে কেউ লেখেননি —এই উক্তিটির জবাবে তাঁরা বলবেন, কেন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার! হ্যাঁ, মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' সত্যিই ভালো বই, কিন্তু রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ রচনার বহু বৎসর পরে তা মুদ্রিত হয়—একথাটি তাঁরা মনে রাখেন না। রামমোহনকে শ্রেষ্ঠতার আসন দেওয়া যেতে পারে না—বড়োকে যে ছোটো করতেই হবে!

রামমোহনের অপরাধ কতো! তিনি মাতৃভাষা বাংলায় শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করলেন—সেই পাপেই তো মুর্শিদাবাদের কাছে ভাগীরথী গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত হয় ও সেই অঞ্চলে মহামারী হয়। এবং যশোরে কলেরা রোগে বহু লোক মারা পড়ে। এ সবই নাকি শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করার প্রত্যক্ষ ফল! গ্রাম্যদেবতার পূজো হ'তো, দুর্গোৎসব হ'তো, কালীপূজো হ'তো, শিবের গাজন হ'তো—এইতো ধর্ম! রামমোহন কিনা বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা বাংলায় তর্জমা করলেন—সাধারণ লোকের বোধগম্য ভাষায় লিখলেন! এর থেকে অশাস্ত্রীয় কাজ আর কী হ'তে পারে! সাধারণ লোক বুঝতে পারবেনা বলেই তো দেবভাষা লেখা ছিলো এতোকাল।

রামমোহনের অপরাধের কি সীমা আছে! তিনি বাইজী নিক্কির নৃত্যসভায় থাকতেন, বিষয়সম্পত্তি করেছিলেন টাকা লগ্নী করে, বক্সু শেখকে নিজের ছেলের মতো পালন করে রাজারাম নাম দিয়ে বিলেত নিয়ে যান। তাঁর নাকি উচিত ছিলো শরৎচন্দ্রের বীর বাঙালী প্রেমিক যেমন ক'রে বর্মী মেয়েকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখিয়ে চম্পট দেন, তেমনি করা। তবেই তো হিন্দুত্ব বজায় থাকতো। স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন—আমি রাজা রামমোহনকে তিনটি কারণে শ্রদ্ধা করি। প্রথম—তাঁর বেদান্ত-প্রীতি, দ্বিতীয়—হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা, তৃতীয়—তাঁর

অকৃত্রিম দেশপ্রেম। বিবেকানন্দের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। কারণ রামমোহন যেমন বেদান্ত হিন্দুদের জন্য ব্যাখ্যা করেন, তেমনি খৃষ্টানদের জন্য Precepts of Jesus সংকলন ক'রে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠদানের কথাও ব্যক্ত করেন। আর তাঁর জীবনে ধর্মজিজ্ঞাসার প্রথম গ্রন্থ ইসলাম সম্বন্ধীয়। কারণ, মধ্যযুগে ভারতে আরবী-পার্সি কিতাব ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর এবং রামমোহন যৌবনকাল পর্যন্ত আরবী-পার্সির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। 'তুহ্ফাৎউল-মুয়াহহিদীন' গ্রন্থে সেই কথাই বলেছেন।

ইসলামের আদর্শ মুতাজলিদের বাণীতে যথার্থ রূপ পেয়েছিলো। কিন্তু যারা ধর্মের উৎস থেকে বহুদূরে এসে গেছে, নানা যুগের নানা কালের উপধর্ম যে নদীধারাকে ম্লান ক'রে দিয়েছে, তাতেই অবগাহন ক'রে তারা তৃপ্ত—তারা উৎসমুখে গিয়ে স্বচ্ছ উদক পান করতে চায় না। তাইতো রামমোহন হিন্দুর কাছে হলেন পাষণ্ড, খৃষ্টানদের কাছে হীদন, আর মুসলমানদের কাছে থেকে গেলেন অনামাজী। সমসাময়িক, অন্ধ্রদেশীয় পণ্ডিত সূর্যনারায়ণের ভাষাই ঠিক—রামমোহনের ধর্ম ধর্মই নয়—"Is no religion and his laws are no laws···He is neither a Christian, a Mahammedan nor a Hindu, but a free-thinking man, abandoned by all religions". কথাটা সত্য। সকলেই তাঁকে বর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে 'free thinking' বলতে যা বোঝায় তা তাঁর ছিলো না। তিনি মানুষের ধর্ম মানতেন, তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে ছিলো একটি বাণী—এক ধর্মসূত্রে ছিন্নভিন্ন ভারত বেঁধে দিব আমি। সেই ধর্মসূত্রের নাম মানুষের ধর্ম।

শঙ্করাচার্য প্রস্থানত্রয়ের দার্শনিক ভিত্তির উপরে 'ব্রহ্মণ্য' ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের অপরাধ তিনি আধুনিক বঙ্গে শঙ্করের পথনির্দেশমতে প্রস্থানত্রয়কে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেন। এই দেবভাষার দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশে ব্রাহ্মণের ছিলো অধিকার। গায়ত্রীমন্ত্র ছিলো ব্রাহ্মণের মন্ত্র—শূদ্র শুনতে পেতো না, পাঠ করা তো দূরের কথা। রামমোহন কিনা সেই মন্ত্রকে বাংলা অক্ষরে ছাপিয়ে, বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা লিখে প্রচার করলেন! সকল জাতের লোক গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ জানলো!

প্রমেথ্যুস দেবলোক থেকে আগুন চুরি ক'রে এনে মানুষকে দান ক'রেছিলেন বলে প্রমেথ্যুসকে পাহাড়ে বেঁধে রেখে দেবতারা শাস্তি দিলেন। কলিযুগের কলিকাতার ব্রাহ্মণরা পারলে রামমোহন-সম্বন্ধে ওই ধরণের কোনো

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেন। তাঁরাই সতীদের সহমরণ বা অনুমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রমুখদের প্রচেষ্টাকে বান্চাল করবার জন্য বিলেতে পর্যন্ত লোক পাঠিয়েছিলেন।

দেশকে তিনি ভালোবাসতেন! বটেই তো! তাই না তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, ভারতে য়ুরোপীয়দের উপনিবেশ হ'লে ভালো হবে, নীলচাষে দেশের উন্নতি হয়েছে ইত্যাদি…। এমন কথা যে বলতে পারে, তাঁকে কিনা শ্রদ্ধা করতে হবে—অসম্ভব। সত্যই ভাববার মতো কথা। কিন্তু কি দেখছি আজ—চা-বাগিচা, পাটকল, কয়লাখনি প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র বিদেশীর সহায়তায় গড়ে উঠেছিলো। আজ শিল্প এলাকায় যারা বাস করছে তারা কি অনগ্রসর গ্রামবাসীদের তুলনায় স্বাচ্ছন্দ্যভোগী নয়? তা যদি না হবে তবে কেন গ্রাম থেকে শিল্পাঞ্চলে এতো জনপ্রবাহ। আমরা য়ুরোপীয়তাকে কি নানাভাবে স্বীকার ক'রে নিইনি? শিল্পায়ন তারই একটা দিক মাত্র। রামমোহন চেয়েছিলেন ভারতকে modern করতে—আমরা কি আজ সেই পথেরই পথিক নই? আজ এসব কথা তুলেও রামমোহনকে ডকে (dock) তুলতে চাইছি!

চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মের প্রতি রামমোহনের মন্তব্য-তে লোকে অসন্তুষ্ট। হবারই কথা। কিন্তু যে কাল-পরিবেশে রামমোহন মন্তব্য ক'রেছিলেন, বিচারের সময় তাতো সচেতন ভাবে বুঝবার চেষ্টা হচ্ছে না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের যে নমুনা রামমোহন পেয়েছিলেন, তা কি খুবই উচ্চ মানের? উৎসবানন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে রামমোহনের যে-মসীযুদ্ধ হয় তার ফলে উৎসবানন্দ রামমোহন পক্ষে ব্রহ্মবাদী হন—অবশ্য এটি ঘটে অনেক পরে।

রামমোহনের নিরাকার ব্রহ্মউপাসনাও তো ফাঁকি! তাঁর মৃত্যুর বারো বৎসর পরে অভিভাবকহীন অরাজকতা-পুষ্ট ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে জনৈক পণ্ডিত—শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্ব প্রমাণ করে ভাষণ দেন। বাঙালী পণ্ডিত তাঁর ইংরেজি গ্রন্থে খোঁটা দিয়ে লিখলেন—এ ব্যাপারটার প্রতি রামমোহনের দৃষ্টি যায়নি কেন? বেচারা রামমোহন! প্রেতযোনি লাভ ক'রে তাঁর উচিত ছিলো ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ঢুকে সেই পণ্ডিতের গলা টেপা। তা করেন নি! এটাও রামমোহনের অপরাধ নিশ্চয়ই।

রামমোহনকে একবার কোনো রাজনৈতিক কাজের জন্য স্বাধীন ভোটানের পক্ষের কর্মচারিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়—বৃটিশ শাসকদের প্রয়োজনে।

সেই দৌত্যকার্যে রামমোহন যে মুখ্য তা হতেই পারে না—এই নিয়ে জনৈক পণ্ডিত অনেক মুন্সিয়ানা করেছেন।

মোটকথা রামমোহনকে হেনস্ত করা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের যেন ধর্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বড়োকে ছোটো করতে পারলে ও ছোটোকে বড়ো করতে পারলেই পণ্ডিতম্মন্যতার পরাকাষ্ঠা হয়।

"অয়ি ইতিবৃত্ত-কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।
... ...
মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।"

বিনয় ঘোষের

বাংলার বিদ্বৎসমাজ

উনিশ শতকে আধুনিক যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর বিকাশকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তাঁদের বিবিধ সমস্যা, সামাজিক চরিত্র ও ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিদ্যা বিদ্বান বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থীবিদ্রোহ পর্যন্ত এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত।

দাম : ৭·৫০

শিবনারায়ণ রায়ের

কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা

মনস্বী লেখকের নতুন বই। 'লেখক ও পাঠক', 'কবির নির্বাসন', 'ক্লাসিক ও রোমান্টিক', 'রনেসাঁস সম্পর্কে প্রস্তাবনা', 'উইলিয়ম ব্লেকের ছবির জগৎ', 'আধুনিক কবিতায় ব্যঞ্জনা', 'রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটে' 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন', 'বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু ও আধুনিকতা' 'সত্য, শ্লীলতা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য' ও 'সমকালীন বাংলা উপন্যাসে মননবিমুখতা—প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা।

দাম : ৭·৫০

দেবল দেববর্মার

নতুন উপন্যাস

বাড়ী

মানুষের মনের মাটিতে নতুন নতুন বাড়ির ভিত তৈরী হচ্ছে। রঙচঙে কি সুন্দর সব বাড়ি! অথচ একটির সঙ্গে অন্যটির কি অদ্ভুত অমিল! বাড়ি সেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ, প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্নার এক অম্লমধুর কাহিনী।

দাম : ৮·০০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২

গোপাল হালদার
যুগপথিক রামমোহন*

"আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তাঁরই কথা যিনি আমাদের আধুনিক ইতিহাসের উজ্জ্বলতম প্রকাশ— রবীন্দ্রনাথ। রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি একালের; কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভূমি চিরন্তন ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথের মতে সেই ভারতপথিকরা যে মিলনের বাণী বলেছিলেন, সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনার।···সেই পথের পথিক আধুনিককালে রামমোহন রায়।"

"তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বত্র প্রসারিত হৃদয়ের মূল বিশেষত্ব, রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "তিনি (রামমোহন) সকলকেই বলেছেন 'ভাব সেই একে।"···নিরাকার একেশ্বরবাদিতার প্রচার রামমোহনের কর্মজীবনেরও উৎস, সর্বমান্য। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম দিয়েই তাঁর পরিচয় এবং রামমোহন সেই কারণেই আধুনিককালের 'ভারতপথিক', এ কথা একটা বিশেষ অর্থেই সত্য— রামমোহন রায় ভুঁইফোঁড় ছিলেন না। আমাদের নব-জাগরণের প্রারম্ভ রামমোহনের উপনিষদ অনুবাদ ও বেদান্ত গ্রন্থাদির প্রকাশ থেকে, এদেশেরই সত্যকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়,—এ কথাটা মনে রাখবার মত। অর্থাৎ বাঙলার নবজাগরণ ষোল আনা, 'nascence' নয়, Renascence ও কিন্তু তারপরেও একটা কথা বিবেচ্য। ইতিহাসে ভারতপথিকের আবির্ভাব আরও হয়েছে। নিরাকার পরমেশ্বরের অনুভূতি ভারতীয়দের মধ্যে কোনোকালেই দুর্লভ ছিল না, এখনো নেই। সগুণ নির্গুণ যাই হোক ব্রহ্মের প্রকৃতি, কিম্বা সাকার-নিরাকার যাইহোক ব্রহ্মের উপাসনা পদ্ধতি। কিন্তু একথাও সত্য—'সমস্ত মনুষ্যত্বের অঙ্গীকার এই, তারমধ্যে, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিকেও জ্ঞান কর্মসাধনায় অঙ্গীকার, পূর্ববর্তী 'ভারতপথিক'দের মধ্যে তো অকুণ্ঠ ছিল না। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জাগ্রত চেতনা, সক্রিয় জীবন-ধর্মিতা, বাস্তব মনুষ্যত্ববোধ—আধুনিক যুগের পূর্বে ভারতে অকুণ্ঠিত নয়। বরং এই মনুষ্যত্বের অঙ্গীকার এই বিশেষ যুগের মর্মবাণীর বিশেষ Rights of Man-এর চেতনায়ই বিশ্ববোধ ও বিশ্ব-স্বীকৃতিও

*১৯৭১এর ডিসেম্বরে লেখকের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার (বাঙলার জাগরণ-প্রথমার্ধ) একটি অংশ।

অথবা, বিপিনচন্দ্র পালের বহুব্যাখ্যাত নীতিতে বলতে পারি—একই সমন্বয়। এ যুগের আগে জন্মালে ভারতপথিক রামমোহনকে আমরা যুগপথিক রামমোহন রূপে পেতাম কিনা সন্দেহ। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ-এ না জন্মে রামমোহন যদি ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মাতেন তা হলে তিনি কী হতেন?—হয়তো আর একজন কবীর নানকের মত সর্বযুগের বরেণ্য সাধক, কিন্তু 'যুগপথিক' নন। এই যুগপথিক' রামমোহনের তাৎপর্যই আজ বেশি স্বীকার্য। Rights of Man বলতে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে যে 'বস্তুসম্পদ" ও 'চিৎসম্পদ' বোঝাত, রামমোহন ভারতবর্ষে তার অগ্রগামী বাহক—যুক্তি মুক্তি (Rationalism), ব্যক্তি মুক্তি (Individualism), জাতির মুক্তি (Nationalism) প্রভৃতির রামমোহন সক্রিয় সাধক। এবং তা ছাড়িয়েও আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও ঐক্য (Universalism) পর্যন্তও তাঁর সেই মানবিক সাধনা (Humanism) বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। (বুর্জোয়া) আধুনিক নেতা হবার জন্য নাস্তিক হবার প্রয়োজন নেই, তবে ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন না হওয়া প্রয়োজন। এই দৃষ্টি দিয়েই রামমোহনের ভূমিকা উপলব্ধি করা সঙ্গত।

মাত্র ১৮।১৯ বৎসরের তাঁর কর্মজীবনকে আমরা জানি। সে কর্মজীবনের ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ এই দেশে উদযাপিত, বাকী দু' বৎসর তাঁর বিলাতি-বাসে কাটে—সে সময়ে তাঁর প্রধান আলোচ্য ছিল তাঁর স্বদেশের বাস্তব জীবন ও তার সমস্যা। ১৮১৪-এর পূর্বে রামমোহনের যে আত্মসংগঠনের আয়োজন—তাতে বুঝি রামমোহন শুধু ধর্মজিজ্ঞাসু নন, জ্ঞান আহরণে অতন্দ্র নন,—চৌকষ বৈষয়িক মানুষও কি ডিগ্‌বির দেওয়ান হিসাবে সেদিনের পদ্ধতিতেই তাঁর সম্পদ অর্জিত হয়ে থাকবে। (কিশোরী চাঁদ মিত্র যাকে 'ঘুষ' বলেছেন 'উপরি', 'দস্তুরী' 'নজরাণা' 'গ্রহীতা ও অনুগৃহীত' দুইই সম্ভবত তা মনে করত—তা নিয়মসঙ্গত। রামমোহন জানতেন যে, বৈষয়িক বনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে তিনি কলকাতার অভিজাত সমাজে নিজের মত দিয়ে উন্নত মস্তকে দাঁড়াতে পারবেন না, স্বমত প্রকাশ ও প্রচার করতেও পারবেন না। তিনি প্রবল ব্যক্তিত্ববান পুরুষ (Individual), অসামান্য কর্মতৎপর (dynamic)। দেহমনে বলিষ্ঠ, আহারে-আচরণে Anglo-Mughal অভিজাত। জগৎ ও জীবনের সত্যকার আনন্দ আপনার প্রাণৈশ্বর্য দিয়ে উপভোগ করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। দুর্জয় জ্ঞানী, দুর্জয় কর্মী, দুর্জয় প্রতিজ্ঞ সর্বসংস্কারক, আধুনিক নেতা। ১৮১৫ খ্রীঃ থেকে কলকাতায়

প্রায় এমন একটিও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে নি, যাতে রামমোহন নেতৃস্থানীয় নন,—হয় পক্ষীয় হিসাবে, নয় বিপক্ষীয় হিসাবে। তৎকালীন হিন্দুসমাজের রাজা রাধাকান্তদেব থেকে রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণরা যেমন তাঁরই প্রতিকূল আচরণে ব্যস্ত, তেমনি সে সমাজের এমন একটা অনুকূল গোষ্ঠীও তৈয়ারী হচ্ছে—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, পরে 'চক্রবর্তী ফ্র্যাকশান' যাঁরা দেওয়ানজী'কে পুরোভাগে পেয়ে নিজেদেরও ব্যক্তিত্ব আবিষ্কারে ও সমাজ সংস্কারে উদ্যোগী হন।

রামমোহনের এই সর্বতোমুখী প্রয়াসের বিবরণ না দিলে এ যুগের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর জীবনী ও তাঁর রচনাবলী থেকে মাত্র যে ধারণাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রধানতঃ নবজাগরণের দিক থেকে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

১। রামমোহনের ধর্ম সংস্কারে রামমোহন প্রথমতঃ ফার্সিতে 'তুহ্‌ফাৎউল মুয়াহহিদীন' নামক গ্রন্থে মুসলমান ধর্মেরও যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করেছিলেন, তাতে মুসলমান সমাজে কেউ-কেউ নাকি বিরক্ত হন। মোটের উপর তিনি বুঝেছিলেন, মুসলমান সমাজ তখন তাঁর যুক্তি আন্দোলনে সাড়া দেওয়ার মত অবস্থায় নেই। মত প্রচার করতে হলে হিন্দুদের মধ্যে করাই সম্ভব,—এবং নিরাপদ। তখনকার দিনে খ্রীষ্টান মিশনারিদেরও দেখি মুসলমান সমাজকে ঘাটাতে বিশেষ উদ্‌গ্রীব নন। ইসলামের দ্বারা আকৃষ্ট হলেও, রামমোহনও হিন্দুসমাজকেই মনে করতেন নিজ সমাজ ও নিজের প্রচারের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর আলোচনা চালান অবশ্য যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের পথে। শাস্ত্র বিচারের প্রচলিত পদ্ধতিতেই। 'সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার,' 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' প্রভৃতি পুস্তিকাতে জ্ঞানের যুক্তি বা শাস্ত্রীয় যুক্তি অবজ্ঞাত হয় নি।

এদিকে রামমোহন খ্রীষ্টধর্মেরও যুক্তিনিষ্ঠ বিচারেও অগ্রসর হন। সেখানে উইলিয়াম এ্যাডাম তাঁর শিষ্য ও সহযোগী ও প্রতিপক্ষ শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। এসব ইংরেজিতে তর্ক বিতর্ক। রামমোহনের কোনো কোনো লেখা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিন প্রধান ধর্মই তাঁর আলোচনার উৎসাহ থেকে বলা যায়—রামমোহন আধুনিক Comparative Religionএর আলোচনার পথিকৃৎ।

(২) লক্ষণীয় এই তুলনামূলক ধর্মালোচনায় রামমোহন, (ক) কোনো

ধর্মকেই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত মনে করেন না। অনুভব করেন, সকল প্রধান ধর্মেই কিছু সত্য ও কিছু কিছু মিথ্যা আছে, প্রত্যেক ধর্মের সেই সত্যকে তিনি স্বীকার করতে উৎসাহী, এবং কোনো ধর্মকে অন্যায় আক্রমণ করতে প্রস্তুত নন। এই উদার ও সভ্য মনোভাব সব চেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়েছে তাঁর ব্রহ্মসভার 'ট্রাষ্টডীড-এ'। তাতে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকেই সমশ্রদ্ধায় আহ্বান করা হয়েছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ তাঁর আলোচনা পদ্ধতি মধ্যযুগীয় Schoomanএর পদ্ধতি হলেও আলোচনায় দেখা যায় শান্ত যুক্তিনিষ্ঠা, প্রতিপক্ষের গালি-গালাজেও তিনি অবিচলিত, সংযতভাষী। এও একটা আধুনিক মেজাজ।

(২) ধর্মালোচনা ও রামমোহনের ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও এ কথা স্পষ্ট, রামমোহন ধর্মপ্রবর্তক নন, কিম্বা শাস্ত্র সংহিতা প্রণয়ন করতে চান নি। কোনো নতুন ধর্মমণ্ডলী গড়া, চার্চ গড়া ছিল তাঁর কল্পনার অগোচর। রামমোহনকে 'জড়রূপে চিত্রিত করলে সুবিচার করা হয় না। নিশ্চয়ই রামমোহন ভগবদ-বিশ্বাসী ছিলেন। 'অদ্বৈতবাদী হলেও উপাসনা করেন, Unitarian কিন্তু তিনি ভক্ত নন, সাধক নন, দেবেন্দ্রনাথ কি, কেশবচন্দ্র নন, গুরু নন, প্রোফেট্ নন, এমন কি, সত্যদ্রষ্টা (ঋষি) বলেতো দাবী করেনই নি। ধর্মসংস্কার তিনি কেন চান সে বিষয়ে তাঁর কোনো কোনো পত্র ও লেখায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে—যেমন, ১৮।১।১৮১৮ তে ব্যাকিংহামকে লেখা তাঁর চিঠিতে বলছেন—প্রচলিত হিন্দুধর্মে জাতিভেদ প্রভৃতি ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে রাজনৈতিক জীবনে পঙ্গু করে রাখে। হিন্দু আচার-আড়ম্বর হিন্দুর স্বাধীন কর্মোদ্যোক্তা সম্পূর্ণ অপহরণ করে। "It is necessary that at least some change should take place in their religion at least for the sake of political advantage and social comfort.

এরূপ আরও বক্তব্য ছড়িয়ে আছে সেগুলি তুচ্ছ নয়। আধুনিক যুগধর্মের উপযোগী বাস্তব ধর্ম সংস্কারে বিশেষ আগ্রহ। Unitarianism অপেক্ষা সেদিনের Utilitarianism রামমোহনের ধর্মান্দোলনে কম শক্তি জোগায় নি। Calcutta Reviewতে (Vol iv no P 388) কিশোরী চাঁদ মিত্রের কথাটা স্মরণীয়—"Rammohan was a religions Benthamite and estimated the different creeds in the world, not according to the notion of their truth or falsehood, but by his notion of their utility ; according to their tendency,

in his view. to promote the maximization of human happiness, and the minimization of human misery." রামমোহন ছিলেন religions Benthamite."

(২) সমাজ সংস্কারে রামমোহনের প্রধান কাজ (ক) সতীদাহ নিবারণে উদ্যোগ। অন্যেরা এমত আগেই স্থাপন করেছিলেন, তবে রামমোহনই হিন্দু সমাজের অগ্রবর্তীদের নিয়ে একটা সক্রিয় আন্দোলন গড়েন। সরকারী হুকুমে সতীদাহ বন্ধ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু বেন্টিঙ্ক-এর নির্দেশে সতীদাহ নিষিদ্ধ হলে 'ধর্মসভার' নেতারা ক্ষিপ্ত হন, রামমোহন উল্টোদিকে বেন্টিঙ্কের সমর্থনে ডাকেন সভা, বিলাতে পাঠান আবেদন। (খ) তা ছাড়া সতীদাহ নিবারণের চেষ্টাই তো রামমোহনের একমাত্র কাজ নয়, স্ত্রীজাতির অধিকার স্বীকারে ও উন্নয়নে তিনি যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, তা আজও বিস্ময়কর। সতীদাহের প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদের বিচার পড়লে তাঁর ভাষার আন্তরিকতায়, যুক্তির শুভ্রতায় ও মানসিক উৎকর্ষ দেখে মনে হয় তিনি বাঙালী সমাজে এক নূতন আবির্ভাব। কোথা হতে রামমোহন পেলেন নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধা—তন্ত্র থেকে মনে হয় না। —কে কত উদার, এমন কি কত সমাজ সচেতন, তা ধরা পড়ে স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই খানে রামমোহন যুগধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষদেরই একজন—এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগরে পাই, এবং অন্যদিকে মধুসূদনের (কাব্য রচনায় হলেও) মধ্যেও অনুভব করি।

৩। রামমোহন বাঙলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রথমদিককার এক জর্ন্যালিষ্ট। (ক) তাঁর তিনখানা পত্র তিনি প্রকাশে নামেন। এবং (খ) ১৮২৪-এ মুদ্রাযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের সরকারী নির্দেশ বেরোয়, প্রতিবাদে তিনি পত্রিকা বন্ধ করেন। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর সেই প্রতিবাদ প্রথমতঃ বন্ধুদের একত্র করে নিবেদন, পরে সুপ্রিম কোর্টের কাছে স্মারক-পত্র ; শেষে বিলাতে সপরিষদরাজার কাছে আবেদন। সবই অবশ্য অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর এসব লেখা যে কোনো দেশে যে কোনো মানুষের পক্ষেই গৌরবের হ'ত। পরাধীন দেশে তো নতুন ও বিস্ময়করই। (গ) তাঁরই প্রবর্তণায় অবশ্য চলেছে প্রসন্নকুমারের ঠাকুরের Bengal Herald, ও বাঙ্গলা 'বঙ্গদূত'—সংস্কার-বাদীদের এই দুই মুখপত্র।

৪। শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে সেদিনকার Orientalist vs. Occidentalist

বিতর্কে রামমোহন যুক্তিবাদীর মত দাবী করেছেন—আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানই হবে শিক্ষণীয়। তবে মেকলে যেমন ১৮৩৫-এ ইংরাজকে বাহন হিসাবে একচ্ছত্র অধিকার দেবার যুক্তি পরামর্শ (minute) দিলেন, দেশীয় ভাষার বদলে ইংরেজির এই একচ্ছত্র রাজত্ব রামমোহন সমর্থন করতেন কিনা বলা যায় না। (মেকলের প্রস্তাব মিনিটের আগেই রামমোহন গত হয়েছেন)।

৫। রামমোহনের লেখা বাংলা খুব সরল নয়, তখনো গদ্য গড়ে ওঠে নি। সে সময়ে যুক্তিপ্রধান বাঙলা রচনার তিনি একটা সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। আর তাঁর গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণও তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচায়ক। বাঙলায় তা প্রথম ব্যাকরণ।

৬। কিন্তু আসল কথা—স্বাধীনতাপ্রিয়তা—রামমোহনের প্রধানতম মানসিক প্রবণতা বলা চলে জাতীয় স্বাধীনতাপ্রিয়তা। নেপলস্-এর স্বাধীনতার অপঘাতে তিনি ডিনার বন্ধ করে দেন। (১৮২১) দক্ষিণ আমেরিকার কলোনির স্বাধীনতা লাভে তিনি উৎসব করেন। ফরাসী বিপ্লবের (১৮৩০) ফলে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ফ্রান্সে হয় তাতে তিনি উৎফুল্ল। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণ পতাকা দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে ওঠেন ; ফ্রান্স ধন্য, ধন্য, ধন্য। ১৮৩২এ সেখানকার ভোটাধিকার ব্যাপকতর করার (ক্যাথোলিকদের সে অধিকার) প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত না হলে তিনি বিলাত ত্যাগ করবেন, এমনও স্থির করেন ;—সেদিনের পরাধীন দেশে এমন মানুষ জন্মেছিলেন, ভাবতে গৌরব বোধ করি। সেই সঙ্গেই জানি—এ দেশের স্বাধীনতা তখনো তিনি সুদূর জানতেন। শাসনেও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রয়োজন তাও মনে করতেন না—অভিজাতরাই তো আছে। আবার নীল চাষ ও এদেশে ব্রিটিশের বসবাসও (Colonisation) তাঁর সঙ্গী দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব ছিল। রামমোহন অসামান্য বুদ্ধিমান হলেও অভ্রান্ত নন, সর্বজ্ঞ নন;—এই দুনিয়ার মানুষ। ভুল তাঁরও ঘটেছে। আশ্চর্য তবু তাঁর আশা, তাঁর স্বপ্ন মানুষের সম্পর্কে। ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে (১৮৩২ ?) তিনি স্পষ্ট করে বলেন—সকল দেশের মানুষের সকল দেশে যাতায়াতের অধিকার থাকা উচিত, তোমাদের দেশে আমার যেতে আপত্তি করো কেন ? তোমরা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দেশের মানুষ, একই মানব-পরিবারের সন্তান, জাতি-উপজাতি সে পরিবারের বিভিন্ন শাখামাত্র ইত্যাদি। এইখানে রামমোহন সম্ভবতঃ সমকালীন ইউরোপীয় মনস্বীদের চেতনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন—সমগ্র মানব জাতিকে

একজাতি করে দেখার আশা বা কল্পনা তাঁর ছিল। তিনি সত্যই এখানে Great Humanist of the Age. রামমোহনকে নানা আলোচনায় ১৮৩৩-এর চার্টর এ্যাকট পরিবর্তনকালীন অনেকেই দেখেছেন। রামমোহনের মতামত ফরাসী মনস্বী মঁতেস্ক্যু, ব্রিটিশ ব্লাকষ্টোন ও রামমোহনের সমবয়সী বন্ধু বেন্থামের চিন্তার প্রভাব। সে প্রভাব না থাকলেই আশ্চর্য হতে হ'ত। কারণ যাঁদের উদ্যোগে ভাবনায় নানা প্র-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রম প্রসারিত হয়েছে, তাঁরা যে সে যুগে পাশ্চাত্ত্য দেশেরই মানুষ—কিন্তু মানুষ তাঁরা মধ্যযুগের নয়, মানুষ আধুনিক যুগের—ইতিহাসের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পথিক ও পথকৃৎ, যে আধুনিক যুগের উত্তরাধিকার সকল দেশের মানুষের, রামমোহন ভারতের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতের হয়ে সেই ইতিহাসকেই জানান স্বাগতঃ—আর সমস্ত জীবন দিয়ে তাকে করতে হয় ভারতীয় মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তাই তাঁকে এদেশে শুধু যুগের পথিক নয়; আধুনিকতার অগ্রদূতও বলা সঙ্গত।

নির্মলেন্দু ভৌমিক

সাহিত্য পত্রিকা : রামমোহন ও বিদ্যাসাগর চর্চা

১। বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মশাই ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে "সাহিত্য" পত্রিকার পত্তন করেন। তখন তাঁর বয়স ২০ বছর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজপতি মশাই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৭ই পৌষ, ১৩২৭ সালে ৫১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই "সাহিত্যে"র সম্পাদক হন। ১৩৩০ সালের বৈশাখ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটি বের করেন। ওই বছরেই ২৯শে কার্তিক পাঁচকড়ির মৃত্যু হয়।

কম-বেশি ৩৩ বছর "সাহিত্য" পত্রিকা স্থায়ী হয়েছিল। সময়ের দিক দিয়ে ৩৩ বছর কিছু কম নয়, শতকের এক-তৃতীয়াংশ, বাঙলার অনেক প্রখ্যাত পত্রিকাই এই আয়ুষ্কাল অর্জনে সমর্থ হয় নি। এই সময়ের মধ্যে "সাহিত্য" প্রশংসা ও ততোধিক 'নিন্দা' নিয়ে বাংলা সাময়িক ও স্থায়ী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর ও উজ্জ্বল হয়ে আছে। "সাহিত্য" মোটামুটি রক্ষণশীল পত্রিকা ছিল, হিন্দুয়ানীর প্রতি মোহও ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুরেশচন্দ্রের অদ্ভুত মেজাজ ও দৃষ্টিকোণের জন্যে মাঝে মাঝে এ পত্রিকাকেও আশ্চর্যজনকভাবে উদার হতেও দেখা গেছে। রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও রবীন্দ্র বিদূষণ এ পত্রিকার নিন্দা-প্রশংসার মূল কারণ, তথাপি রবীন্দ্রনাথের দু-একটি রচনা সমাদৃতও হয়েছে। সমাজপতি যেন তাঁর কঠোর সমালোচনা এবং পরিহাসদীপ্ত মন্তব্যে এক অদ্বিতীয় সম্পাদকে পরিণত হয়েছিলেন।

এমন একটি পত্রিকায় স্বভাবতই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জীবন-কর্ম-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সুরেশচন্দ্র আত্মীয়তাসূত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জড়িত,—অথচ বিধবা-বিবাহের আন্দোলনকারী, আস্তিক-কি-নাস্তিক আজও বোঝা দুরূহ এমন একটি চরিত্র সুরেশচন্দ্রকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, বলা মুশকিল। অনাত্মীয় বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশচন্দ্রকে যতখানি প্রভাবিত করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ততখানি করেছিলেন কি না সন্দেহ। মতাদর্শের ক্ষেত্রে আত্মীয় অনাত্মীয়ের প্রশ্ন তোলাটাই অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয়, তবু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমের মতের একতা ছিল না, স্থানে স্থানে তা অস্বস্তি-

জনকত্তার কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছিল; সুরেশচন্দ্র সেই দুই মনীষীর প্রত্যক্ষ প্রতিস্পর্ধার মধ্যে নিশ্বাস নিয়ে কী করে শ্যাম ও কুল রক্ষা করেছিলেন, আজ তাও এক কৌতুক ও কৌতুহলের বিষয়।

ঠিক একই বিতর্ক রামমোহনকে নিয়ে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, স্বভাবতই হিন্দুধর্মের প্রতি মমতা-প্রবণ সুরেশচন্দ্র ও পাঁচকড়ি রামমোহনকে সুনজরে দেখবেন না। কিন্তু সর্বত্রই এ কথা সত্য নয়।

আসলে সুরেশচন্দ্র খাঁটি সম্পাদক ছিলেন। নিজের মতাদর্শকে অনেক স্থলেই লুকিয়ে রাখবার মতো কৌশল এবং উদারতা দুই-ই তাঁর আয়ত্তে ছিল। সেই কারণে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে অবলম্বন করে কিছু রচনা পাই, যা আজও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে ধরা দেয়॥

২। "সাহিত্য" পত্রিকায় রামমোহন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন যথাক্রমে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল। রামমোহনের জীবনের একটি ঘটনার সত্যতা নিয়ে বিদ্যানিধি ও বটব্যাল মতানৈক্য ঘটে এবং পরিশেষে এই মতপার্থক্যের পরিসীমা "সাহিত্য" পত্রকে ছাপিয়ে তদানীন্তন একাধিক সাময়িক পত্রিকায় পরিব্যাপ্ত হয়।

"রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কয়েকটি অজ্ঞাত বৃত্তান্ত" (ফাল্গুন ১২৯৮) এবং "রাজা রামমোহন রায়" (কার্তিক ১৩০৬) এই প্রবন্ধ দুটি মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির। মহেন্দ্রনাথ রামমোহনের জ্ঞাতি, কাজেই রামমোহন সম্পর্কে তিনি যে সব তথ্য প্রকাশ করেছেন সেগুলোর একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। বস্তুতঃ মহেন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই সব তথ্য রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের "দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে"(৭ মাঘ, ব্রাহ্মাব্দ ৬০) লিখেছেন: "রামমোহনের জ্ঞাতি,...শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।" তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনেও (৮ মাঘ ১৩০৩, ব্রাহ্মাব্দ ৬৭) তিনি মহেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যানিধির প্রথম প্রবন্ধটি যথার্থই "বৃত্তান্ত", রামমোহন সম্পর্কে প্রচলিত গল্পাবলী: রামমোহনের 'উদারতা' কোন্ সময়ে কোন্ অবস্থায় প্রথম প্রকাশিত হয়; তাঁর জ্যেঠতুতো ভাই, নবকিশোর রায় কোন্ ঘটনা অবলম্বনে রামমোহনকে প্রথম 'খ্রীষ্টান' অপবাদ কোন; রামমোহনের মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত; একেশ্বরবাদ সম্পর্কে প্রথম ধারণার উদ্ভব—ইত্যাদি বিষয়ে পারিবারিক ও ঘরোয়া জীবনের বিবরণ। "গৃহদেবতার একত্ব" নাম দিয়ে "সাহিত্য" পত্রিকা

থেকে এই অংশ নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করেছেন,—কিন্তু "সাহিত্য" পত্রিকার নাম, মাস, বৎসর উল্লিখিত হয় নি। পঞ্চম সংস্করণ (১৯২৮) অবলম্বনে অধুনা পুনর্মুদ্রিত (১৩৭৯) গ্রন্থেও সে উল্লেখ নেই।

"সাহিত্য" পত্রিকায় পত্রস্থ মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকৃতই 'প্রবন্ধ'। এটি "উক্ত চট্টোপাধ্যায় [নগেন্দ্রনাথ] মহাশয়ের ভাবী চতুর্থ সংস্করণের উপকরণ স্বরূপ" রচিত। যে তথ্যগুলো তিনি প্রদান করেন, তা এই: (১) 'রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন ও স্মরণার্থ সভা' (২) রামমোহন রায়ের কার্যের গুরুত্ব (রাজা রামমোহন রায় ও দিল্লীরাজ দ্বিতীয় আকবর)' (৩) 'বিলাতের পরিচ্ছদ' (৪) 'বিলাতে সতীদাহের আন্দোলন' (৫) 'তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের একটি নিদর্শন' (৬) 'রামমোহন রায়ের বিপরীত সংবাদ' (৭) 'বিলাতী বিবী সাহেবের অপবাদ' (৮) 'তাঁহার প্রতি এ দেশীয়দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।' পরিশেষে মন্তব্য ছিল: "আবার যদি কখন কিছু পাওয়া যায়, "সাহিত্য" পাঠকদিগকে উপহার দিব।"

উমেশচন্দ্র বটব্যালের "রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল" (অগ্রহায়ণ ১৩০১) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বাঙলা সাময়িক পত্রে একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের জীবন চরিতে (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৩৯) লিখেছিলেন যে, কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রামনগর গ্রামের এক অধিবাসী—রামজয় বটব্যাল, দলপতি হয়ে ওঠেন; এবং রামমোহন পৌত্তলিকতা পরিহার করেছেন বলে রামজয়ের অনুবর্তীরা প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় রামমোহনের বাড়ীর কাছে এসে "কুক্কুট ধ্বনি" করত; সন্ধ্যেবেলায় তাঁর বাড়ীর ভেতর 'গোহাড়' প্রভৃতি নিক্ষেপ করত।

উমেশচন্দ্রের মন্তব্য: রামজয় বটব্যালের প্রতি নগেন্দ্রনাথ অকারণে কলঙ্ক লেপন করেছেন। "...রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।" উমেশচন্দ্রের মতে, রায় পরিবার ও বটব্যাল পরিবারের মধ্যে একটি ঈর্ষার ভাব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; এবং তার কারণ বৈষয়িক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক কোনো কারণ নিয়ে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় নি। হুগলি কোর্টের একটি নথি উদ্ধার করে উমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, বাদী রামজয়ের ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্র লুঠ করায় প্রতিবাদী রামমোহনকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। বাদী পক্ষে দাবী ছিল ২০৯২ টাকা। এই মামলায় রামজয় ডিক্রী পান।

উমেশচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নানা মহল থেকে স্বাভাবিক

কারণেই প্রতিবাদ হল। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখলেন; "রাজা রামমোহন রায়ের ডাকাইতি" (ভারতী, পৌষ ১৩০১, পৃঃ ৫৪২—৫৪৪)। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদ করলেন 'দাসী' ও 'জ্যোতিঃ' পত্রিকাতে। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখলেন, "রাজা রামমোহন রায়" (নব্যভারত, আষাঢ় ১৩০৩, পৃঃ ১৩০—১৩৮)। মহেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ কেন 'নব্যভারতে' হল, তা একটি ভেবে দেখবার বিষয়। মহেন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিবাদের উত্তরও, 'সাহিত্যে' মুদ্রিত হয় নি। বস্তুতঃ 'সাহিত্য' অতঃপর এ বিষয়টি সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। যে কোনো কারণেই হোক, বিষয়টি নিয়ে সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বেশি ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করেন নি।

'নব্যভারতে' কেন এই প্রতিবাদ বের হল, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "যে কারণে এই প্রবন্ধ, "সাহিত্যে" মুদ্রিত হইল না, এ স্থলে তাহার নির্দেশ আবশ্যক। চৈত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ প্রবন্ধ নিঃশেষ করা আবশ্যক, এই কারণে "সাহিত্য" পত্রে ইহা মুদ্রিত না হইবার প্রধান হেতু। দ্বিতীয় হেতু, প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা, উহা ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেই প্রকাশোপযুক্ত হয়। তৃতীয় হেতু, বিলম্বে প্রবন্ধটি লিখিত।..."

এই তিনটি কারণই অ-দৃঢ়। ইচ্ছে করলেই বাধাগুলো অপসারণ করা যেত। মনে হয়, মহেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশের প্রকৃত বাধা অন্যত্র, অন্ততঃ এখানে নয়। সুরেশচন্দ্রের এই নীরবতার কারণ আজও অজানা। অবশ্য, এটাও লক্ষ্য করি, মহেন্দ্রনাথই এর পরেও রামমোহন সম্পর্কে "সাহিত্যে" প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে কি মহেন্দ্রনাথের প্রতিবাদের যৌক্তিকতা "সাহিত্য" পত্রিকা মেনে নিয়েছিলেন!

'নব্যভারতে' মহেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের শুরু করেন এই ভাবে: "'সাহিত্যে' ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তাহা করিয়াই তিনি [উমেশচন্দ্র] ক্ষান্ত হন নাই। কাশীপুরের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বাবুর প্রযত্নে ঐ বৃত্তান্ত মুদ্রিত হয়। তৎপরে ইণ্ডিয়ান মিরারের সংবাদস্থলেও উহা পরিগৃহীত হইয়াছিল।..."

মহেন্দ্রনাথের অভিযোগ,—মামলাবাজ ও দলবাজ এবং অত্যাচারীরূপে রামমোহনের অপবাদের মূলে উমেশচন্দ্রের প্রবন্ধটিই। "ঐ প্রবন্ধ প্রচার জন্যই

এই বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে। তৎপূর্বে এ কথার কোন জল্পনাকল্পনাই ছিল না।"

মহেন্দ্রনাথের প্রতিবাদের প্রথম যুক্তি হল : হুগলি কোর্টের যে নথিটি উমেশচন্দ্র প্রকাশ করেছেন, তাতে রামজয়ের উপাধি "বটব্যাল" লেখা আছে। তাই তিনি বলেন : "...রামজয়ের উপাধি 'বড়াল' ছিল—'বটব্যাল' নয়। সুতরাং আরজিতে আমাদের সন্দেহ হয়। কেননা আরজিতে রামজয় "বটব্যাল" দেখিতেছি, রামজয় "বড়াল" দেখিলে কোন সংশয় হইত না। আমরা স্বচক্ষে বংশের অনেক প্রাচীন দলিল দেখিয়াছি, তৎসমুদায়ে "বড়াল" লেখা আছে।..."

রামজয়কে মহেন্দ্রনাথ "বড়াল" ধরে নিয়ে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সমাজের কে কে বর্ধমান রাজ-এষ্টেটের কর্মচারী ছিলেন, তার তালিকা সঙ্কলন করেছিলেন এর আগেই ('পুরোহিত' পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩০১, পৃঃ ২৫-৩১)। এই বংশ তালিকা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ ওই বংশের আদিপুরুষের নাম 'কুমুদানন্দ বা রামমোহন বড়ালে'র পাশে বন্ধনীতে "বটব্যাল" শব্দেরই উল্লেখ করেছেন! কাজেই কুমুদানন্দে'র বিকল্পে 'রামমোহন' নাম যেমন প্রশ্ন জাগায়, তেমনি, 'বড়ালে'র পাশে সমার্থক শব্দরূপে 'বটব্যাল' শব্দের ব্যবহারও মনে সংশয় আনে।

মনে হয়, 'বড়াল' ও বটব্যাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়ে মহেন্দ্রনাথ কিছু ভুলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। 'বড়াল' এই উপাধির দুটি অর্থ; প্রথম, এটি স্বর্ণবণিকদের উপাধি (যেমন, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল); দ্বিতীয়, রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ, বটব্যাল নামীয় গ্রামের অধিবাসী যাঁরা এবং 'বটব্যাল' শব্দ থেকে ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে 'বড়াল' শব্দের উদ্ভব। রামজয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, অতএব তাঁর উপাধি হিসেবে কোর্টের নথিতে 'বড়াল' শব্দের শুদ্ধ ও তৎসম রূপ 'বটব্যাল'ই লিখিত হয়ে থাকতে পারে। বলা হয়েছে উমেশচন্দ্র বটব্যাল উক্ত রামজয়ের জ্ঞাতি; তা যদি হয়, তা হলে তো 'বড়াল' শব্দ যে 'বটব্যাল' শব্দের তদ্ভব রূপ এবং সেই কারণেই সমার্থক,—সেটা স্বীকার করে নিতেই হবে। মনে হয়, 'বড়াল' শব্দের ব্যবহার এই বংশে খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, 'বটবাল' শব্দের ব্যবহারই অধিক হত। মহেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন নি, তিনি নিজেও প্রতিবার "রামজয় বটব্যাল" বলেই উল্লেখ করেছেন, "বড়াল" বলে নয়! রামজয় যে একজন বদান্য ও ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ ছিলেন, একথা মহেন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন ('পুরোহিত' পত্রিকা. বৈশাখ, ১৩০১ ; বৈশাখ ১৩০২)।

সুতরাং হুগলি কোর্টের নথিতে উল্লিখিত রামজয় বটব্যাল নামীয় ব্যক্তিকে রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করে দেখাবার যে চেষ্টা মহেন্দ্রনাথ করেছেন, তা ধোপে টেঁকে না।

রামমোহনকে সমর্থনের জন্যে মহেন্দ্রনাথের অপর যুক্তিগুলো এই রকম: রামমোহনের পিতা রামকান্তের সঙ্গে বর্ধমানের রাজপরিবারের প্রীতির বদলে অপ্রীতিই ছিল; এবং যেহেতু রামজয় বর্ধমান রাজগোষ্ঠীর কর্মচারী ও রায়গোষ্ঠীর প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, সেই হেতু অত্যাচার করা রামজয়ের পক্ষেই সম্ভব। রামমোহনকে জমিদারী থেকেও অপসৃত করা হয় নি, কারণ, "অদ্য পর্যন্ত ঐ জমিদারী রামমোহনের পৌত্রদ্বয়ের অধিকারে রহিয়াছে।" মহেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ স্বীকার করেছেন, রামমোহনের নায়েব জগন্নাথ মজুমদার মশাই অত্যাচারী ছিলেন, কাজেই নায়েবের অত্যাচার প্রভুর ওপর বর্তাতে পারে; অন্যে দূরে থাক, স্বয়ং রামমোহনই জগন্নাথকে ভয় পেতেন! ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে রামমোহন মামলায় লিপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দোষ ছিল না। তারপর "সাহিত্যে" উমেশচন্দ্র বাদী পক্ষের আরজি নথিটি প্রকাশ করেছেন মাত্র, ডিক্রীর নকল প্রকাশ করেন নি। দেওয়ানী মামলাতে ফৌজদারী ব্যাপারের কেবল উল্লেখন যথেষ্ট নয়, ফৌজদারীতে পৃথক নালিশও করতে হয়। আর, রামজয় যদি ডিক্রী পেয়েও থাকেন, তবে তাঁর অভিযোগ কি সবটাই সত্য হবে? অনেক সময় তো দেখা যায়—মিথ্যে ব্যাপারেও আদালতে জেতা যায়।

কাজেই রামজয়ের সঙ্গে মামলা আদৌ হয়েছিল কিনা, অথবা হয়ে থাকলে রামমোহনের দোষ ছিল না। তবে এটুকু মহেন্দ্রনাথের কাছে সত্য যে, রামজয়ের অনুবর্তীরা রামমোহনের বাড়ীতে সকালে 'কুক্কুট ধ্বনি' এবং সন্ধ্যায় 'গো-হাড় নিক্ষেপ করত।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের একটি মন্তব্য উমেশচন্দ্রের আলোচনার বিষয় ছিল। নগেন্দ্রনাথ উপরে আলোচিত প্রতিবাদের পটভূমিকাতে তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ৬৭ ব্রাহ্মাব্দ) "পরিশিষ্ট" অংশে একটি অমূলক অপবাদ খণ্ডন" (পৃ ৫৫৯—৫৫৫) নামে এই বিয়ের উল্লেখ করেন। তিনি রামমোহনের অপবাদ খণ্ডনের জন্য নতুন কোনো যুক্তি দেন নি, মহেন্দ্রনাথের যুক্তিরই সার সংকলন করেছেন মাত্র। তবে নগেন্দ্রনাথ একটি নতুন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে রামমোহনের ও রামজয়ের দ্বন্দ্বের

মূল কারণ বৈষয়িক ব্যাপার নয়, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার ; কিন্তু উমেশচন্দ্রের মতে বৈষয়িক ব্যাপার। অর্থাৎ রামমোহন যদিবা কলহে লিপ্ত হয়েও থাকেন তবে তিনি তুচ্ছ বৈষয়িকতার স্তরে নেমে আসেননি, একথাই নগেন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন : "আমরা অনুসন্ধান দ্বারা ইহাই অবগত হইয়াছি যে, রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল। · · · বাস্তবিক কথা এই যে, রামমোহন রায়কে ইজারা হইতে অপসৃত করেন নাই ; এবং তজ্জন্য রায়বংশের ক্রোধ জন্মে নাই।"—পৃ ৫৫৩, তৃতীয় সংস্করণ।

এবং গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (এই সংস্করণের তারিখ পাচ্ছি না) এসে নগেন্দ্রনাথ এসব প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে এই ধরণের অলোচনার সম্ভাবনাই লুপ্ত করে দিতে চেয়েছেন। "চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখেছেন : "পূর্ব পূর্ব সংস্করণে রাজার কোন কোন অমূলক অপবার খণ্ডনের চেষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু এবারে কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে, সে অংশ পরিত্যক্ত হইল। সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ ভাবী বংশীয়দিগের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কখনই উচিত বলিয়া বোধ হয় না।"

অবশ্য রামজয়ের অনুবর্তীরা সকাল-সন্ধ্যায় যে উৎপাত করত, যা নিয়ে উমেশচন্দ্রের মূল প্রতিবাদ, তা পরিত্যক্ত হয় নি। পঞ্চম সংস্করণেও (১৯২৮) তা মুদ্রিত হয়েছিল, সাম্প্রতিক (১৩৭৯) পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থেও (গ্রামে উৎপাত", পৃ ১৮) তা আছে।

৩। বৈশাখ, ১৩০০ সালে "সাহিত্য" পত্রিকায় "সহযোগী সাহিত্য" নামে একটি নতুন ফিচার খোলা হয়। দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সমাজ, অর্থনীতি ছিল বিভাগটির মূল আলোচ্য বিষয়। "সাহিত্য" পত্রিকার মনীষার দিক ছিল এই বিভাগটি। শ্রেষ্ঠ লেখকগণ এর লেখক ছিলেন। এই বিভাগে বেশ কিছু কাল পরে আবার রামমোহন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যায়। আলোচক ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নামহীন অপর একজন।

"ইষ্ট্ এণ্ড ওয়েষ্ট্" পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৯০৩) লেখা একটি প্রবন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দ আকবরকে সমাজ-সংস্কারক রূপে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু, বৈশাখ ১৩১১ সালের "সাহিত্য" পত্রিকার "সহযোগী সাহিত্য" বিভাগের লেখকের এ উদার ব্যাখ্যা অসহ্য বলে মনে হওয়ায়, তিনি গোঁড়া হিন্দুর রক্ষণশীলতা নিয়ে লিখেছিলেন : "তিনি [রমাপ্রসাদ চন্দ] আকবরকে রাজা রামমোহন রায়ের ইসলামী Enlarged Edition-এ পরিণত করিয়া, আকবর-চরিতের

আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এইভাবে আকবরের কথা কহিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায়ের সহিত সমাজ-সংস্কার কার্যে আকবরের তুলনায় সমালোচনা করিলে, বাঙ্গালী জাতির অপমান করা হয়—বিদ্যাসাগরের অমর্যাদা করা হয়, রামমোহন রায়কে কলঙ্কিত করিতে হয়।"

"আর্থার এভেলন" এই নামে কলকাতা হাইকোর্টের কোনো বিদেশী বিচারপতি মহানির্বাণ-তন্ত্রের ইংরিজি অনুবাদ ও তার ভাষ্য প্রকাশ করেছিলেন। এই অনুবাদ ও ভাষ্যের পরিচায়ন প্রসঙ্গে, শ্রাবণ ১৩২০ সালে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বাঙলা দেশে তন্ত্র-চর্চার পথ রেখাটির অনুসরণ ও অন্বেষণ করেছেন। পাঁচকড়ি লিখেছেন, বাঙলাদেশে একদা আনন্দমোহন বেদান্ত-বাগীশের সম্পাদনায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা থেকে মহানির্বাণ তন্ত্র প্রকাশিত হয়েছিল। রাজা রামমোমাহন রায়, নিজে শৈব ছিলেন, এই তন্ত্রটিকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। অনেক ব্রাহ্ম মহানির্বাণ-তন্ত্রের স্তোত্র আবৃত্তি করে থাকেন। ইংরিজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের নিন্দে হতে থাকে, এমন কি, হিন্দুরাও প্রকাশ্যে তন্ত্রকে মানতে চাইতেন না। "মহানির্বাণ-তন্ত্রের প্রভাব পূর্বে এ দেশে তেমন ছিল না। এখন ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বাঙালীর মন ও বুদ্ধি যে আকারে আকারিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, মহানির্বাণতন্ত্র এখনকার উপযোগী তন্ত্র। রাজা রামমোহন রায় এইটুকু বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহানির্বাণের আদর বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

পাঁচকড়ি এবং "সাহিত্য" পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি এই মন্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ॥

৪। এইবার "সাহিত্য" পত্রিকায় বিদ্যাসাগর-চর্চার কথা বলি।

"সাহিত্য" পত্রিকার শ্রাবণ, ১২৯৮ সালের সংখ্যার প্রথমেই "সম্পাদকের নিবেদন" হিসেবে সুরেশচন্দ্র লিখেছিলেন :

"বিগত ১৩ই শ্রাবণ [১২৯৮] মঙ্গলবার, ২।১২ মিনিটের সময়, পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দাদা মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

"আমার এখন কিছু বলিবার শক্তি নাই। দেশের সকল কাগজপত্রে তাঁহার কথা আলোচিত হইতেছে, আমাদের আত্মীয় ও বান্ধবগণ, "সাহিত্যে"ও দাদা মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া, আপাততঃ আমায় ক্ষমা করিবেন।…"

"এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের নিজের রচনা বলতে দুটি :" বিদ্যাসাগরের

"আত্মজীবনচরিতের" কয়েক পৃষ্ঠা (কার্তিক ১২৯৮) এবং "প্রভাবতী সম্ভাষণ" (বৈশাখ ১২৯৯)। "আত্মজীবনচরিত" অতি সামান্য মাত্রায় বের হয়েছিল। কিন্তু এই সামান্য অংশটুকুতেই বিদ্যাসাগর নিজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। "প্রভাবতী সম্ভাষণ"ই গুরুত্বপূর্ণ রচনা। রচনাটির পরিচয় সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র পাদটীকায় মন্তব্য করেছিলেন :

"পূজ্যপাদ, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতামহ মহাশয়, শিশুদের প্রতি অতিশয় স্নেহময় ছিলেন। বর্তমান ক্ষুদ্র রচনায় তাঁহার সেই স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়।"

"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত, মাতামহদেবের বিশেষ সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রভাবতী এই রচনার বিষয়। ১৭৮২ শাকের ২৩শে মাঘ প্রভাবতীর জন্ম হয় ; ১৭৮৫ শকের ৪ঠা ফাল্গুন, তিন বৎসর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। মাতামহদেব, প্রভাবতীকে অপত্য নির্বিশেষে ভাল বাসিতেন। এই সময়ে, নানাবিধ কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মনের এই অবস্থায়, স্নেহভাজনের বিয়োগে, তাঁহার স্নেহময় করুণ-হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়াছিল। প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য, তিনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্বেও আমি তাঁহাকে একান্তে "প্রভাবতী-সম্ভাষণ" পড়িতে দেখিয়াছি। প্রভাবতীর স্মৃতি তিনি চিরদিন হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন।"

"প্রভাবতীর ক্ষুদ্র কথায়, একটি ছোট মেয়ের খেলাধূলার বেশ একটি মনোজ্ঞ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। স্নেহ ও প্রেমের মধুর ভাবে, এবং সরল শোকের ছায়ায়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যেন আরও মনোহর হইয়াছে। ইহা কখনও পাঠকসমাজে প্রকাশিত হয় নাই। পূজ্যপাদ মাতামহদেবের এই অপ্রকাশিত রচনা, পাঠকগণের প্রীতিপদ হইবে মনে করিয়া "সাহিত্যে" মুদ্রিত হইল।"

"এই প্রবন্ধ, ১৭৮৬ শকাব্দার ১লা বৈশাখ লক্ষিত হয়। এক্ষণে, ১৮১৪ শকাব্দা চলিতেছে। অতএব প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর হইল, এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। —সাহিত্য-সম্পাদক।"

প্রভাবতীকে উদ্দেশ করে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "বৎসে ! কিছুদিন হইল, আমি নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে।...ইদানীং একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম।..."

এ যেন বিদ্যাসাগরের ডায়েরি। এ যেন একটি বজ্রগর্ভ পুরুষের মা হয়ে যাওয়া। এ যেন একটি অবোধ শিশুকে শোনাবার ছলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক শক্তিমান্ পুরুষের নীরব-নিভৃত আত্মগত সমালোচনা ও আত্মসমর্পণ। সংসারের সমুদ্র থেকে সংশয়-বিদ্বেষ-সমালোচনার যে নীল বিষ উঠে তাঁর কণ্ঠে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, তিনি যেন তার দুর্বহ ভারে জর্জরিত হয়ে এটি লিখেছেন।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এই সংশয় বিক্ষুব্ধ মনোভাব-জাত নৈরাশ্যের পটভূমিকায় সরোজ কুমারী দেবীর লেখা "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" (শ্রাবণ ১২৯৮) কবিতাটি পড়লে তার অর্থটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। যেন মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর স্বর্গে গিয়েছেন, স্বর্গে মানুষের নীচতা, স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ নেই, তাই স্বর্গবাসীরা বিদ্যাসাগরকে "আবাহন" জানাচ্ছে,

এস এই পথে, মানব হৃদয়
রেখে এস এই কুলে।
নয়নের জল— পরাণের তৃষা,
কেন মোহে চাও ভুলে ?

এখানে তোমার সংসারের ঢেউ
তীব্রশত কোহাহল
আসিতে পারে না, বহে না হেথায়
উত্তপ্ত সে হলাহল।...

মানুষের প্রতি দরদের জন্যই যে বিদ্যাসাগরকে মাইকেল "করুণাসাগর" আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর যখন স্বর্গে তাঁর আবাহন ঘটল, তখন নয়নের জল, পরাণের তৃষ্ণা পরিত্যাগ করে তাঁকে স্বর্গ অর্জন করতে হয়েছে! সরোজকুমারীর এই কবিতাটি বিদ্যাসাগরের জীবনের এক করুণ দিকের প্রতি এক ঝলক আলোকপাত।

অবশ্য, উল্টোদিকও আছে। "বিদ্যাসাগর" (আষাঢ় ১৩১৬) নামে দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি গানে দেশবাসীর তরফ থেকে মৃত মহাত্মার ক্ষুব্ধ মনে কিছু শান্তির প্রলেপ দেবার চেষ্টা (গান দুটির প্রথম পংক্তি: "তারকা নিবিয়া যায়..." এবং "বিদ্যাসাগর করুণাসাগর শৌর্য-সাগর তুমি")। রচনা হিসেবে দুটিই মামুলি ধরণের॥

৫। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে গুটি তিনেক প্রবন্ধ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। সেগুলো হল : রজনীকান্ত গুপ্তের "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" (শ্রাবণ, ১৩০০); রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" (ভাদ্র, ১৩০৩); এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" (ফাল্গুন, ১৩১৪)। এঁরা প্রত্যেকেই বিদ্যাসাগরকে স্বচক্ষে দেখেছেন,—বিদ্যাগরের সমকালীন, এবং তিনজনেই নিজ-নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য। কাজেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এঁদের মূল্যায়নের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিদ্যাসাগরকে Assess করবার সময় এই সমকালীন সমালোচকরা বিদ্যাসাগরের কোন্ দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেইটাই ইতিহাসের দিক থেকে সবচেয়ে লক্ষনীয় বিষয়। বিদ্যাসাগর-চর্চার ইতিহাস একটি পূর্ণতার মর্যাদা পাবে তখনই, যখন সে যুগের Assessment এবং এ যুগের Assessment-এর মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলো আমরা কারণসহ তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখব।

রজনীকান্ত গুপ্তের মতে বিদ্যাসাগরের মহত্বের মূল হল "মস্তিষ্কের অসাধারণ ক্ষমতার সহিত হৃদয়ের অতুল্যশক্তির সামঞ্জস্য" সাধনের মধ্যে। তাঁর এই মূল্যায়ন যথার্থ, এখন পর্যন্ত আমরা বিদ্যাসাগরকে এভাবেই Assess করে থাকি। প্রবন্ধটির সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল : "গত ১৩ই শ্রাবণ [১৩০০] স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ, "বিদ্যাসাগর পুস্তকালয় ও ঝামাপুকুর পাঠাগারের সভ্যগণের যত্নে, বিজ্ঞান-সভাগৃহে যে সভা হয়, এই প্রবন্ধ তথায় পঠিত হইয়াছিল।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধটিও "...১৩ই শ্রাবণ [১৩০৩] বিদ্যাসাগর-স্মরণ-সভায় পঠিত হইয়াছিল।" উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানীর যুক্তিবোধ ও দৃষ্টি নিয়েই একটি অনুচ্ছ্বাসিত কিন্তু শ্রদ্ধা-সন্নত চিত্তে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনার ধারাটি মোটামুটি এই রকম : বাক্‌সর্বস্ব বাঙালীর ঘরে জন্ম নিলেও বিদ্যাসাগরকে "বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়।" কেবল এই প্রবন্ধেই নয়, তখনকার একাধিক প্রবন্ধেই লক্ষ্য করেছি, বিদ্যাসাগরকে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে,—এই প্রবণতা এখনও আছে। মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রেম ও অন্যান্য কয়েকটি গুণ-ধর্মের জন্যে অনেকেই আবার তাঁকে 'ইউরোপীয়' বলেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, তিনি বাঙালীও নন,— তিনি ভারতীয়, জীবনাদর্শ ই তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল।

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অবলম্বনে বিদ্যাসাগর যে 'সীতার বনবাস

রচনা করেছিলেন, তাতে বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে পত্নী-প্রেমে কাতর ও ক্রন্দন পরায়ণ রূপে লক্ষ্য করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরদুঃখ-কাতরতাকে স্মরণ করে চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন : "সীতার বনবাসের নায়কের সহিত বিদ্যাসাগরের কোন আত্মীয়সম্বন্ধ ছিল কিনা বলিতে পারি না।" আত্মীয়সম্বন্ধ ছিল বলেই এই মন্তব্য।

ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে এখন পর্যন্ত অস্পষ্টতা ঘোচে নি। এ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, "...দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি, সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্তব্য পথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও বিদ্যাসাগরের গুণাবলীর মধ্যে অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয় মনোভাব লক্ষ্য করেছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল—'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের অবমূল্যায়ণ প্রসঙ্গের উত্থাপন।

"১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রে কোনও লেখক পরিহাসচ্ছলে লিখেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল, ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দু-আনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন।...অন্যের রূপা একটু বাঙলা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক ছাঁটিয়া উপরে "শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত" ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণ পরিচয় দু-আনি ; ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোনও গ্রন্থ সিকি, কোনও গ্রন্থ আধুলি, ও কোন গ্রন্থ টাকা।...বিদ্যাসাগর টঙ্কযন্ত্র মাত্র।"

'বঙ্গদর্শনে'র এই অভিযোগ হেমেন্দ্রপ্রসাদ এই যুক্তিতে খণ্ডন করেছেন : বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-সেবা নয়, জনমন গঠন করা। উদ্দেশ্য অনুযায়ীই তিনি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন। মৌলিক রচনাতেও যে তাঁর প্রতিভা ছিল, তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, এতে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব ও সার্থকতাই প্রকাশিত হয়েছে। "যশোলাভের অপেক্ষা স্বার্থত্যাগের গৌরব অনেক অধিক দধীচির গৌরব তপস্যায় নহে,—স্বার্থত্যাগে—আত্মত্যাগে।"

প্রসঙ্গতঃ, 'বঙ্গদর্শনে'র এই সমালোচনায় প্রাপ্ত দুটি শব্দের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি : বিদ্যাসাগরের রচনা ও যুগ নির্দেশ করতে দুটি বিশেষণ শব্দ—'সাগরী' ও 'সাগরিক'। শব্দ দুটি বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে একদা বেশ ব্যবহৃত হত, বিশেষতঃ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচনায়॥

বার্ণিক রায়

দুই মনীষী এবং আমাদের উত্তরাধিকার

রামমোহন আমাদের ধাক্কা দিয়ে অগাধ জলে ফেলেছিলেন, জল খেয়ে গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলুম, বিদ্যাসাগর আমাদের টেনে তুললেন, জলসিক্ত দেহের লাবণ্যে প্রকৃতির রৌদ্রকরোজ্জ্বল অলংকার দিয়ে সাজিয়ে দিলেন।

যে কোনো সভ্য জাতির আদর্শ বিদ্যাসাগর। মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে অথবা মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বীজ বপন করে তাকে পল্লবিত করে তুলেছেন। ভাষা কখনো সরল একমুখীনতায় বিকশিত হতে পারে না, ভাষাকে বিকাশ করতে গেলে, তার শক্তিকে প্রসারিত করলে, আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় কমপ্লেক্স বা জটিল রূপ দিতে চলে সব সময় একটা টেন্‌সন জাগ্রত রাখা দরকার। ফলে ভাষা যিনি চর্চা করবেন, তাঁকে শুধু ঈশ্বর গুপ্তের মতো মাতৃভাষা প্রেমিক হলে চলবে না, সেই সঙ্গে বহুভাষার ও জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। যদি ভাষাকে তিনি নূতন রূপ ও ভাষার চৈতন্যে নূতন শক্তি যোগ করতে চান, তাহলে তাকে বহুভাষায় বিশেষজ্ঞ হতেই হবে। নতুবা ভাষা কোনো শক্তি পায় না, এগোয় না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বুদবুদ কাটে, অথবা অশ্লীলতার ছিবলেমি করে, কিংবা বার্তিকের স্টান্ট দেয়। এই কারণেই গ্যেটে মাতৃভাষার জন্যে বিদেশী ভাষাশিক্ষার অনিবার্যতা স্বীকার করেছিলেন। ভাষার মূল শক্তিকে জেনে, তার চৈতন্যকে উদ্‌ভাসিত করাই ভাষাশিল্পীর প্রধানতম কর্তব্য। এদিক দিয়ে হুতোম এবং প্রমথ চৌধুরী ভাষার অন্তমূলে প্রবেশ না করে বাইরের চাকচিক্য এবং ভাঁড়ামিতে মনোনিবেশ করেছেন বলে মনে হয়, এবং এঁদের যারা গুরু বলে মানে লেখায় এ যুগে, তাদের রচনায়ও এই মুখোশ বড়ো চমকে ওঠে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির, বাঙালি জাতীয় সভ্যতার প্রথম একমাত্র প্রতীক। সংস্কৃত বর্জন করে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করার আগ্রহে রামমোহন যে গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিলেন তারা ইয়ংবেঙ্গল বলে পরিচিত। তাদের বাপ ঠাকুর্দার টাকা পয়সা ছিল, তাই হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল সহজে, এবং এই পয়সার কৌলীন্যে এবং শিক্ষার দাপটে দেশীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্য পরিহারে পারদর্শিতা দেখিয়েছে, এদের যে মানসিকতা এবং স্বাধীন বুদ্ধি, তা দিয়ে কোনো জাতি

উপকৃত হতে পারে না। কারণ এরা নিরালম্ব। যৌবনের উচ্ছৃংখলতা, অহংকার, স্বদেশ বুদ্ধি, স্বাধীনতা স্পৃহা, বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য সবই উঠে যায় যদি ইংরেজ সরকারের অধীনে ভালো চাকরি পায়, না পেলেই স্বদেশপ্রেম গজিয়ে ওঠে, বক্তৃতা বেরয় এবং এর শেষ পরিণতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় সংস্কৃতি বাদ দিয়ে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পেয়ে, ব্রিটিশ শক্তির প্রতি চাটু-কারিতায় এরা সবই দেখেছিল ইংলণ্ডের ধাঁচে, কিন্তু বাঙালি জীবনে কি সত্য তা তারা বোঝে নি। বাংলাদেশটা ছিল তাদের কাছে ইংলণ্ডেরই একটি অংশ বিশেষ। এবং এই জাতীয় মানসিকতা বর্তমান বাংলাদেশের রূপ থেকে লুপ্ত হয় নি। তাই যাদের পয়সা আছে, আজও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠায় মিশনারি স্কুলে, বাংলা না পড়লেও চলে, এবং কলেজে এসে বাংলা পড়তে চায় না, বাংলার বদলে নেয় বিকল্প ইংরেজি। সুতরাং কোনোদিনই এরা বাংলা ভাষা চর্চা করলো না, কিন্তু বাঙালি বলে পরিচিত। হয়তো পরে শিক্ষা বিভাগে কর্ণধারও হয়ে ওঠে, যখন কর্ণধার হয়ে ওঠে, তখন জাতীয় শিক্ষা, মাতৃভাষা, ভারতীয় ঐতিহ্য, দেশের সমস্যা, দেশবাসী সকলের সম্পর্কেই একটা বিজাতীয় মনোভাব প্রকাশ করে এবং দেশের বুকে বিজাতীয় নীতি নৈতিক আদর্শ এবং উন্মার্গগামিতা প্রকাশ করতে চায়। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এই নিয়ম আছে কিনা জানি না যেখানে মাতৃভাষা ব্যতিরেকেই কোনো সন্তান শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে। এবং মাতৃভাষা ছাড়া আদৌ শিক্ষা হয় কি না। কারণ বস্তুজ্ঞান তো কখনোই বিদেশী শব্দে হতে পারে না। পাউণ্ডের একটি কবিতায় আছে 'from spat to colour stiffness grows,' এখন 'spat' যে বস্তু তা আমাদের দেশে নেই, অথচ ওদের দেশে বহুল প্রচলিত, যারা ইংরেজি চর্চা করে, তারা বস্তু ছাড়াই ওর ব্যবহার করে থাকে, বস্তুজ্ঞান নেই বলেই আমি ওকে অনুবাদ করতে পারছি না। মার্কিন ও ইংরেজদের দেখাদেখি 'spat' যদি ব্যবহার করতো পোশাকে, তাহলে কোনো অসুবিধে ছিলো না। এবং এই গোষ্ঠীর লোকের মানসিকতা আমাদের দেশে এখনো এতো প্রবল যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিনা দ্বিধায় বাঙালি ছেলেকে বিকল্প ইংরেজি পড়তে অনুমতি দেয়, এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় মাতৃভাষায় শিক্ষার বাহনের উপযোগী পুস্তক রচনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে না বলেই মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। কারণ এদের মতে বাংলায় সব প্রকাশ করা যায় না, এবং বোঝানো যায় না ও বোঝা যায় না। তাই সত্যেন বসু শুধু মুখের কথা বলে বেড়ান মাতৃভাষায়

বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে, কিন্তু নিজে একখানা বই রচনা করে দেখালেন না, ব্যবহারিক বিদ্যায় কোনো কিছু প্রকাশ করলেন না। একদিকে পরাধীনতা, অন্যদিকে অসাধুতা এই দুই মিলে জাতীয় চরিত্রকে খর্ব করে দিয়েছে। এবং এই ধারা চলেছে রামমোহনের সেই চিঠি ১৮২৩ থেকেই, কিন্তু এই উত্তরাধিকার আমরা এখনো বয়ে নিয়ে চলেছি। এটিকে বলা যেতে পারে প্রথম উত্তরাধিকার।

ইয়ংবেঙ্গলদের উন্মার্গগামিতায়, উচ্ছৃংখলতায় যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীসভা এবং পত্রিকা বার করে তাকে রোধ করলেন। জাতীয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর। ইয়ংবেঙ্গল হয়েও প্যারীচাঁদ মিত্র জাতীয় শিক্ষার জন্যে অনবরত সংগ্রাম করেছেন।

এই সংগ্রামের মধ্যেই আমাদের জাতীয় চেতনা নতুন স্ফূর্তি পেয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কৃতির প্রাণকথাও এই সংগ্রামে নিহিত। বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মচরিতে সংগ্রামের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন :

'মাইলস্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা একবাক্য হইল, 'তবে ইহাকে রীতিমত ইংরেজি পড়ান উচিত' এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পূর্বদিকে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাতে ছাত্ররা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে ; এ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও, যদি ভালো শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইবেক, হিন্দু কলেজে পড়িলে ইংরেজির চূড়ান্ত হইবেক। আর, যদি তা না হইয়া ওঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ মোটামুটি ইংরেজি জানিলে হাতের লেখা ভাল হইলে ও যেমনতেমন জমা-খরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যাবসায়ী। পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ ইচ্ছানুরূপে সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই ; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না।'

এই ইংরেজি ও সংস্কৃতের টানাপোড়েন থেকেই বিদ্যাসাগরের জন্ম এবং

বিদ্যাসাগরের বাংলাভাষার জন্ম, শুধু বিদ্যাসাগরের নয় সমগ্র বাঙালি জাতির বাংলাভাষার জন্ম। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত যেমন অনুবাদ করেছেন 'সীতার বনবাসে,' 'শকুন্তলা'য় তেমনি মার্শম্যানের ইংরেজি ও শেক্সপিয়রকে অনুবাদ করেছেন। এবং দুই ভাষার শক্তি নিয়ে বাংলাগদ্যের ছন্দস্পন্দ ও ধ্বনিকে কল্লোলিত ও রণিত করেছেন। সংস্কৃতের ধ্বনিময় শব্দের সংগীতের মাধুর্যের সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণের ছেদ উপচ্ছেদজাত মাত্রাকে তিনি নবগঠিত বাংলা ভাষায় লাবণ্যের মতো ব্যবহার করেছেন। 'লাবণ্যের ছায়া' দুই ভাষা থেকেই গ্রহণ করেছেন। এবং একে আরো প্রসারিত করেছেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র হিন্দি শব্দের ধ্বনিসাযুজ্যে। এমনিভাবে বিদ্যাসাগর তিনটি ভাষাকে বাংলাভাষার সৃষ্টিতে কাজে লাগিয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, তিনি অনুবাদ করেছেন, কিন্তু নকল করেন নি, ফলে অনুকরণের গ্লানি নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথ্যসাধুরীতিকে ভাষার মধ্যে যতোদূর সম্ভব আনবার চেষ্টা করেছেন। এবং এই কথ্যভাষাকেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে মধুসূদন ব্যবহার করেছেন কাব্যে। এদিক থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে মধুসূদনের ঋণ অপরিসীম। বিদ্যাসাগরের ছেদচিহ্নজাত ধ্বনির তরঙ্গ, শব্দের ধ্বনি গাম্ভীর্য, সমারোহ, সংগীত, কল্লোল, চিত্রময় বর্ণনা একই রূপের মধ্যে বিভিন্ন সুরের সমাবেশ সবই বিদ্যাসাগরের কাছে পাওয়া যায়।[১] বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতসারে বাংলা কবিতার গদ্য ছন্দের স্পন্দনময় হিল্লোল প্রথমে তাঁর রচনায়ই ধরা পড়ে, এ ব্যাপারে তিনিই বাংলা ভাষায় গদ্য ছন্দের প্রথম কবি। আর বিদ্যাসাগরই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার বাংলাভাষাকে গড়েছিলেন, অক্ষয় দত্ত তাঁরই পালিত সন্তান, কারণ তিনি তাঁর লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে বিদ্যাসাগরের গদ্য রীতি সাধুশব্দের মন্থর ধ্বনি গাম্ভীর্যে ছন্দায়িত, অর্থাৎ বেদনার ও অনুভূতির একটি দিকই প্রকাশ করা যায়, সেটি হচ্ছে মোহময় সুদূর অতীতের রোমান্স। একথা যথার্থ নয়, বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষা বিভিন্ন প্রকার, বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা অতি সহজে পরিবর্তিত হয়েছে একই গ্রন্থে। এমনকি 'ভ্রান্তিবিলাস', 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'ও কথা সংলাপের ভাষা মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে।

'তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ ঠোঙ্গা ছিল।'

১। মধুসূদন আলালী ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলেন: **It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit.** বিদ্যাসাগরের সমর্থন ই এখানে দেখি রীতির আলোচনায়।

'গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! লজ্জিত হইও না, আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি; তাহা হইলে মহারাজ তোমায় চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া তিনি শকুন্তলার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন।'

প্রথম বাক্যে 'সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে 'ঠোঙা' অদ্ভুত মানিয়ে গেছে। সংলাপের ভাষায় ঘোমটা, কিন্তু বর্ণনায় 'ঘোমটা' 'অবগুণ্ঠন' হয়েছে। এই শব্দ সচেতনতাই বিদ্যাসাগরের ভাষার প্রাণ। এর একটু আগেই আছে:

'শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গৌতমীকে কহিলেন, পিসি! আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন?'

এই মুখের কথা কি এ যুগেরও নয়! কোথায় সংস্কৃতের বাগাড়ম্বর এখানে। বেতালে অব্যবহৃত কিছু সংস্কৃত শব্দ থাকলেও পরে ব্যবহার করেননি।

অনুবাদের কথা ছেড়ে দিলে তাঁর মৌলিক রচনার বৈশিষ্ট্য আমাদের আরো বেশি চকিত করে, তাঁর বেদনা, প্রত্যক্ষতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, প্রতীক, হাস্যপরিহাস রসিকতা, জীবনদর্শনজাত গভীরতর গাম্ভীর্য একসঙ্গে দুলে ওঠে, অথচ বাহুল্য কোথাও নেই:

'পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, 'একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।' এই সময়ে আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিনী ছিল; তাহারও, আজকাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পিতামহদেবের কথা শুনিয়া; পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, 'ওদিকে নয়, এদিকে এসো, আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।' এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।'

বস্তু ও ঘটনা কতো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, ঘটনার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন ভাবে কাজ করছে, তা থেকে নানাবিধ ভাব উঠছে, সেই ভাব থেকে একটি কাহিনী গড়ে উঠছে। রামমোহন বাংলা গদ্য চেনাবার জন্যে বলেছিলেন যে বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ দেখে বুঝতে হবে বাক্য শেষ হয়েছে। কিন্তু এখানে ক্রিয়াপদ কতো নিপুণভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকি ক্রিয়াপদ নেইও, 'তাহারও, আজকাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা।' সবচেয়ে আশ্চর্য বাক্যের

শেষে শব্দ ও ধ্বনি ক্রিয়াপদ বা অন্য পদের সাহায্যে এমন ভাবে বসিয়েছেন, ধ্বনির সমতায় একঘেয়েমিত্ব কখনোই আসেনি, ফলে ক্লান্তি লাগে না। আর কতো দেশী শব্দ যে তিনি ব্যবহার করেছেন তার নমুনা সর্বত্র এই রচনায় ছড়িয়ে। এখানে কোনো মন্থরতা নেই, পথ চলার গতিবেগই ভাষাকে টেনে নিয়ে গেছে।

'আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবে না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব।'

'তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফল কথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রইলনা। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে, আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকি রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভালো তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব, এই বলিয়া তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন, এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড়ো মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্যন্ত রহিল না। ফলত, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব অতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না,' এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।'

অনেকে বলতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র[২] ও রবীন্দ্রনাথ প্রভাব ফেলেছেন এই রচনায়, কারণ এই রচনা ১৮৯১ সালের। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনারীতির মধ্যে ভাষার ক্ষেত্রে এই জীবন উপলব্ধি প্রথম থেকেই ছিল, এই ভাষা বিবর্তনের, প্রভাবে নয়। বেতাল ও ভ্রান্তিবিলাস পড়লে বোঝা যায়।

২। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে সব বিরোধকে ভুলে নিয়ে বিদ্যাসাগরের ভাষার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে বলেছিলেন-: বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।' তাঁর ঋণ এখানে স্বীকৃত।

'প্রভাবতী সম্ভাষণে' ভাষা বেগবান. এখানে তথ্য ঘটনা কাহিনী কিছু নেই, আছে হৃদয়ের বিরহবিচ্ছেদ বেদনাজাত ব্যথার উৎসার, তাকে ঘিরে ধরেছে খণ্ড মুহূর্তের কতকগুলি স্মৃতি, এই স্মৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে বিদ্যাসাগরের জীবনের অপার দুঃখ. এবং দুঃখ থেকে জীবনের গূঢ় অভিজ্ঞতা ও দর্শন। এই ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে। আমার সন্দেহ হয়, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের ভাষাসংস্কার শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেও প্রথম জীবনের গদ্য ভাষায় প্রভাবিত করেছে। এখানে তিনি কথ্য সংলাপে চলিত ক্রিয়ারূপ পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন, 'কাল এসেছিল', কি কি দিয়ে গেল।'

'বৎসে। কিছুদিন হইল, আমি, নানা কারণে অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনো বিষয়েই, কোনোও অংশে কিঞ্চিৎমাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে।'

প্রথম বাক্যের অনুপ্রাসজনিত গোপন ধ্বনির সংগীত লক্ষণীয়।

এই সঙ্গেই দেখতে হয় সরল, সংক্ষিপ্ত, তথ্য বহুল, নিরাভরণ ব্যবহার-উপযোগী গদ্য :

'বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিতে থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নহে ; এ নিমিত্ত, হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে।' বোধোদয়

ভাষার বিদ্যুৎগতি, নানা শব্দের সংমিশ্রণ, কৌতুক ব্যঙ্গ রসিকতা, মানবচরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও সিঁড়ি ভাঙা পদ্ধতি, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে মানবিকতা সমস্ত কিছু একত্র মিলে যে রচনার সৃষ্টি তা তাঁর বাক্‌বিতণ্ডাজাতীয় লেখায় অপূর্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

'সত্য সত্যই খুড়র দফা রফা হয়েছে। আর তিনি ঘাড় তুলিবেন, তার পথ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিদ্যার দৌড় কত তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। বলিতে কি, খুড় আবার বড় নির্বোধ ; অকারণে আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, খুড় আর যেন সংস্কৃত লিখিয়া, বিদ্যা খরচ না করেন। খুড়র লজ্জা সরম কম বটে। কিন্তু, লোকের কাছে, আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়! তোমার পায়ে

পড়ি; এমন করে আর চলিও না; এবং শতং বদ, মা লিখ, এই অমূল্য উপদেশ বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, আর কখনো চলিও না। ইত্যস্তু কিং বিস্তরেণ, অর্থাৎ এবার এ পর্যন্ত।'

আমরা এগুলিকে না দেখে শুধু উদাহরণ দিই :

'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরি শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর পটল সংযোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত,' 'উত্তর চরিতের' অনুবাদ এর থেকে ভালো হতে পারে না, ভাষার মধ্যে যে ধ্বনি বিস্তার গাম্ভীর্য আমাদের সুদূরে টেনে নিয়ে যায়, তা রোমান্টিক সুদূরতারই একটি লক্ষণ, এ ছাড়া ওই অলসমন্থর স্নিগ্ধ ভাব অন্য কোনো ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। অথচ লেখক শেক্সপিয়রের ভাষার অনুবাদ কত সংহত, সংক্ষিপ্ত ও সরল বাক্যে করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যসম্পর্কিত রচনায়ও এই প্রাঞ্জলতা ও যুক্তির স্বচ্ছতা লক্ষ্য করবার মতো। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন, তাঁর বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও আমরা একই কথা বলতে পারি :

'সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে।'

এই বৈচিত্র্য ও সমতা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের গুণ, সেই চারিত্রশক্তি তাঁর গদ্যভাষায় ব্যক্ত, এবং যাকে উপলক্ষ করে এই ভাষা, সেই বস্তুর মধ্যেও আছে তৎকালীন জীবনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব থেকে সমন্বয়ের চেষ্টা। এই সমন্বয়ের মধ্যেই তাঁর মানবতাবোধ, সৌন্দর্যপ্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা, জীবন উপলব্ধি, মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রখর হয়ে উঠেছে। এবং এই বোধ থেকে তাঁর সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও ব্যক্তিগত জীবনবোধ গড়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে। মূলত বিদ্যাসাগরের এই পথই আমরা বেছে নিয়েছি, তাই বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি বিদ্বজ্জনের কাছে আজও অপরিহার্য। এদিক থেকে তিনি প্রতীক, যার পূর্ণরূপ রবীন্দ্রনাথে দেখি। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সেই কারণেই বিদ্যাসাগরকে নিন্দা করেছেন।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যদি জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হয়, তাহলে তা মাতৃভাষায় দিতে হবে, সংস্কৃত অতি প্রাচীন, সুতরাং তাকে পুনরুজ্জীবিত করা মৃত্যুর সামিল, এবং ইংরেজি বিদ্যালাভ উচ্চ মধ্যবিত্ত বা ধনীদের আয়ত্তে, আজকের যুগে মিশনারী স্কুলের মতো; সুতরাং সাধারণ মানুষকে বিদ্যা দিতে হলে মাতৃভাষার সাহায্যে অবশ্য কর্তব্য। অথচ দুই

ভাষার মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে যে সর্বজনীন সত্য এবং আধুনিক জীবনের উপকরণ আছে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য আমরা। রামমোহন দেশীয় ঐতিহ্যকে একেবারে বর্জন করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর সাংখ্য ও বেদান্তের জ্ঞান উপযোগী নয় জেনেও ঐতিহ্যের পরিচয়ের জন্যে এই দুই শাস্ত্র অধ্যয়নের নির্দেশ দেন। রামমোহন শুধু শিক্ষাপদ্ধতিকে পাল্টাতে চান নি, শিক্ষার মাধ্যম ভাষাকে পর্যন্ত ইংরেজি করতে চেয়েছেন, তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিঠির একটি বাক্য এই ব্যাপারে আমাদের দিগদর্শন করে :

But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and and providing a college furnished with the necessary books, instrument and other apparatus.

যে শিক্ষিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদের নিয়োগের কথা উল্লিখিত হয়েছে, এরা য়ুরোপে বিদ্যার্জন করে, এবং তৎকালে যারা য়ুরোপে বিদ্যালাভ করতো তারা বাঙালি নয়, ইংরেজ; এবং সেইদিনের ইংরেজ নিশ্চয় ইংরেজি ভাষার বদলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতো না। সুতরাং শুধু শিক্ষাপদ্ধতি নয়, শিক্ষার মাধ্যমকেই পাল্টে দিয়েছেন রামমোহন। ইয়ংবেঙ্গলদের উচ্ছৃংখলতায় নব্য সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দেই দেখি সরকারী রিপোর্টে কলেজের পাঠশালায় জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করতে নির্দেশ দিচ্ছে।

এবং এই ধারাই পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও বিদ্যাসাগরের কর্মে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে বলেছেন যে বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে, এর জন্যে প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন দরকার, দায়িত্বশীল একদল শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে। এই শিক্ষকরা মাতৃভাষায় অধিকারী হবে, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্যে জ্ঞান থাকবে এদের। কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দৃঢ় মনোবল থাকবে। এবং ইংরেজি ভাষাও জানবে এরা।

কিন্তু এগুলি তিনি প্রবর্তন করেছিলেন মডেল স্কুলের জন্যে, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিছুটা পরিমাণ পাঠশালায়ও এই শিক্ষা প্রবর্তন করেন, কিন্তু কলেজ ও স্কুলে কি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে, তার কোনো কথা নেই। এবং এখানে যে ইংরেজিই প্রচলিত ছিল, তা সন্দেহাতীত। ১৮৫৫ সালে পাঁচ শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; কলেজ, মধ্য ইংরেজি স্কুল, নর্মাল স্কুল, মডেল স্কুল ও পাঠশালা। মডেল স্কুলে হ্যালিডের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় মাতৃভাষায় শিক্ষারীতি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মডেল স্কুলের ছেলেরা মধ্য ইংরেজি স্কুলে এলে তাদের অবস্থার শোচনীয়তা লক্ষণীয়। দেখা যাচ্ছে সে যুগেও যাদের পয়সা ছিল না, তারা উচ্চশিক্ষা পেত না, কারণ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার কঠিন ছিল, অধিকার পেলেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ এই সমস্যাকে তীব্র করে তুলতো, পাঠশালায় বা মডেল স্কুলে যারা পড়তো তাদের অবজ্ঞাই ছিল জীবনের মূলধন। বিদ্যাসাগর নিজেই এর নিদর্শন রেখে গেছেন: 'নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যেন তাহার নিকটে কোনো ইংরেজি কলেজ বা স্কুল না থাকে। ইংরেজি কলেজ ও স্কুলের আশেপাশে বাংলা শিক্ষা ঠিকভাবে আদৃত হয় না।' এবং এই বিরোধ আজও শেষ হয় নি। মিশনারী স্কুলের ছেলেরা-মেয়েরা, সরকারী বা সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, এবং যেহেতু কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ছাড়া সব শিক্ষাই ইংরেজিতে হয়ে থাকে, সেই হেতু মিশনারী স্কুলের ছেলেমেয়েরা ইংরেজির দাপটেই আজও আধিপত্য পায়। কারণ ইংরেজি জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। স্বাধীনতার পরে মধ্য ইংরাজি স্কুলে অর্থাৎ সাধারণ স্কুলে বাংলা ভাষার মধ্যে যে পুরোপুরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সরকারীভাবে চালু হয়েছে, বিদ্যাসাগরের কাল থেকে এই সম্বন্ধে কেবল স্পৃহা জেগেছে এই মাত্র, কিন্তু কার্যকরী হয় নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু বেগ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে, কার্যত কিছু হয় নি। অসহযোগ আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার বাংলাভাষাকে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে কিছু মর্যাদা দিয়েছে মাত্র, এর বেশি নয়। সুতরাং শিক্ষাজগতের এই বিরোধ, নীচ থেকে ওপরে পর্যন্ত আজও অক্ষুণ্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারাকেই আজও আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। কোনো একটি নবমূল্যের মানদণ্ড আজও তৈরি হয় নি।

তবু রামমোহনের থেকে বিদ্যাসাগর যে কোনো দেশের জাতীয় শিক্ষা

ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয়। বিদ্যাসাগরের চিন্তার মধ্যে বিরোধ খুবই কম; যে বিরোধ রামমোহনের মধ্যে প্রচণ্ড। বেদান্তের শিক্ষা তিনি ছাত্রদের দিতে চান না, অথচ বৈষ্ণবদর্শনকে অস্বীকার করে শাংকর ভাষ্য প্রতিপাদনই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের শিক্ষার মধ্যেই বিরোধ ছিল। তবে বিভিন্ন ভাষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে বাংলাভাষার যুক্তিকে তিনি শাণিত করেছেন, এইটুকুই তাঁর কাছ থেকে আমাদের লাভ। তিনি পুরোপুরি উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্যে তাদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে মানবিকতার জন্যেও সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, দেশের অপামর জনসাধারণের জন্যে তাঁর চিন্তা সুদূরপ্রসারী হয় নি। বিদ্যাসাগর দরিদ্র পরিবারের সন্তান, দারিদ্র্য থেকেই বুঝেছিলেন সমস্যা কোথায়, সেই হেতু তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সমাজের নীচুতলায়, নীচুতলায় সমাজের মানুষের জন্যে যা করেছেন তার তুলনা নেই। বিদ্যাসাগরের আদর্শই যে আমাদের জ্ঞানগত বুদ্ধির নজির তার প্রমাণ আমাদের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে অভিব্যক্ত। হয়তো কার্যত আমরা এখনো রূপায়িত করতে পারি নি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সেই দিকেই। এবং এই আদর্শই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলে গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের বাস্তব বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকবার জন্যেই টোল উঠিয়ে দিয়ে মডেল স্কুলের প্রবর্তন করেন, কারণ টোলের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয় যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাহ্য। এবং শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই ভাষা ও জ্ঞানের উদ্ভব, উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব। বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনা এই উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত, ফলে ইতিহাস প্রকৃতিজ্ঞান ভূগোল গণিত দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাভাষা নূতন উপাদান পেয়েছে, এমনিভাবেই বলতে পারি। আজ যদি বিজ্ঞান শিক্ষা বাংলায় দেওয়া হয় তাহলে অনুরূপ উপায়েই আইন-স্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব, দর্শনে রাসেলের গাণিতিক দর্শন, ইতিহাসে টয়েনবির ইতিহাসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে ছাত্রদের কোনো অসুবিধে হবে না। প্রথমদিকের বাধা সহজেই অপসারিত হয়ে যাবে। এবং তাকে ভিত্তি করেই বিজ্ঞানচিন্তার নূতন ও মৌলিক পথ খুলে যাবে। বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের অবশ্যভাবী ফল হয়েছে এই, আমরা কতকগুলি দর্শনের ইতিহাসের বিজ্ঞানের প্রাথমিক মাস্টার তৈরি করেছি এবং করছি, কিন্তু কোনো দার্শনিক, ঐতিহাসিক বিজ্ঞানী জন্মে নি। এই কারণেই, ভাষার ক্ষেত্রে কিছু সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, তা না হলে পি. লালের ওয়ার্কশপের মতো কতকগুলি নোটমেকার কবি তৈরি করতো দেশ।

আবার বলি, শিক্ষার মাধ্যমে যে চেতনা তিনি চারিয়ে দিতে চেয়েছেন সমাজের নিম্নস্তরে, সেই মুক্ত চেতনাকেই স্ত্রী শিক্ষায়, জাতীয় সংস্কৃতিতে, সমাজ দেহে বিভিন্নভাবে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন, সুতরাং তাঁর কাছেই আমাদের উত্তরাধিকার এবং তাঁর আদর্শের মাতৃগর্ভেই জন্ম নিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। সেই সর্বজনীন আদর্শের ধারাই চলছে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন ও যুক্তিবাদ

বাল্যকাল থেকেই রামমোহন সেমিটিক শাস্ত্রসংহিতা ও একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'তুহ্ফাতুল মুওয়াহিদ্দিন' রচনার আগেই ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটল্ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে অধিগত করেছিলেন। পরে তিনি যে বিশুদ্ধ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এবং সত্যকে অলৌকিক বিশ্বাসের কুহেলিকা থেকে উদ্ধারে চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রধান কারণ—একদিকে গণিতের প্রমাণের মতো ঋজুপথাশ্রয়ী যুক্তিধারা এবং অপর দিকে নৈয়ায়িক হেতুবাদ তাঁর কিশোরচিত্তকে কার্যকারণ শৃংখলায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর একদিকে ইসলামি একেশ্বরবাদের বস্তুনিষ্ঠ চেতনা এবং যুক্তিপ্রধান আবেদন। যৌবনের প্রথম দিকে ইউক্লিড, অ্যারিস্টটল্ এবং ইসলামি 'মোতাজেলা' (যুক্তিবাদী) এবং 'মুত্তহিদ্দিন' (একেশ্বরবাদী) তত্ত্বের বুদ্ধি ও প্রতীতিগম্য ধর্মচেতনা—যৌবনের উপান্তে এসে বেদান্ত, উপনিষদ ও তন্ত্রের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়েছে। রামমোহনের চরিত্রের একদিকে ইসলাম, অপরদিকে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও খ্রীষ্টীয় ঐক্যতত্ত্ব (Unitarianism)—এই তত্ত্বগুলির মূল কথা হচ্ছে জগৎ-বৈচিত্র্যের মূলীভূত ঐক্যতত্ত্ব—যা একান্তভাবে লৌকিক ওযুক্তিমার্গীয়। রামমোহন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। তার প্রধান কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নিরঙ্কুশ ভাবব্যাকুলতা, যা তাঁর কঠোর যুক্তিবাদী মন সহ্য করতে পারেনি। এ হল রামমোহনের অন্তর্জীবনের একাংশ। অপরদিকে উনিশ শতকের বিশ্ব-ইতিহাসের কোন কোন ঘটনা তাঁর মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লব এবং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের মধ্যে তিনি অনাগত জীবনের জয়ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮২১ খ্রী: অব্দে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই ঐতিহাসিক ব্যাপার স্মরণীয় করে রাখবার জন্য টাউনহলে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। গ্রীস যাতে তুরস্কের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা

করতে পারে, এ-জন্য তিনি সর্বদা শুভকামনা করতেন। নেপল্‌স্‌-বাসীদের স্বাধীনতাসংগ্রাম ব্যর্থ হলে ক্ষুব্ধ রামমোহন যেদিন সর্বপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ রেখেছিলেন। ১৮৩০ খ্রী: অব্দে যে ফরাসী-সংঘর্ষ হয়েছিল তিনি তার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি বোধ করতেন এবং ইংলণ্ডে নির্যাতিত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় মানুষের অধিকার (Catholic Imancipation Act of 1892) লাভ করলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। রিফর্ম বিল (১৮৩২) পাস হলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ক্ষমতার যৎকিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করল। ঐসময়ে রামমোহন ইংলণ্ডে ছিলেন, ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। অপরদিকে তিনি জীবনযাপন, চিন্তা ও মনীষায় অভিজাত হলেও জনসাধারণের সঙ্গে মমতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

নব্যভারতের নবজাগৃতি রামমোহনের চিন্তা ও চেতনাকে কীভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, তার কারণ খুঁজতে হলে তাঁর চিত্তভূমির পারিপার্শ্বিকতা ও তার স্বরূপ নির্ণয় প্রয়োজন। তাঁর মনটি পূর্ব থেকেই বিস্ফোরকে পূর্ণ ছিল, তার নানা কিংবদন্তী তাঁর বাল্য-ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে। কিশোর-জীবনে ইসলাম ও গ্রীকদর্শনে (অ্যারিস্টটল) দীক্ষালাভ করে চিন্তার যুক্তিনিষ্ঠ প্রাণালীটিকে প্রথম জীবনেই অবধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিধারা প্রধানতঃ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল নৈয়ায়িক বাঙালীর চিরাচরিত তার্কিকতার পটভূমিকায়। তবে এ বিষয়ে তাঁর অবলম্বনস্বরূপ হেতুবাদ এবং নব্যন্যায়ের ভক্ত তার্কিক বাঙালীর হেতুবাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বাঙালীর তর্কবোধ ততটা মীমাংসাবাদী নয়। বিশ্লেষণী বুদ্ধির শাণিত আত্ম-প্রকাশ-ই তার মানসিক পরিতৃপ্তির কারণ। তর্কেই তর্কের চরম পরিণতি; বুদ্ধিকেন্দ্রিক সত্তাকে বুদ্ধির সাহায্যে অণু পরমাণুতে পরিণত করে নেতিবাচক নৈসর্গের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার মধ্যে দেহের যে আত্মপ্রসার লক্ষিত হয়, চৈতন্যদেবের পূর্বে ও পরে বাঙালী যে মণীষার গৌরব করেছে, অবাঙালীরাও বাঙালীর এই কূট তার্কিক সত্তাকে শ্রদ্ধা করেছে—রামমোহন সেই কৌলিক অধিকার নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তার্কিক মন বৃথা-পাণ্ডিত্যের দ্বারা পরিচালিত হয় নি। য়ুরোপীয়রা জ্ঞানবাদ ও ইসলামী 'মোতাজেল' সম্প্রদায়ের বস্তুচেতন মীমাংসা ও নৈসর্গিক বস্তুবোধে অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে এদেশে সর্বপ্রথম তিনি অবহিত হন। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে, রামমোহনের কাছে তার্কিকতা কেবলমাত্র একটা অস্ত্র বলে বিবেচিত হয়নি। এই অস্ত্রের সাহায্যে তিনি

সমস্ত বস্তুবিশ্বের স্বরূপ বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। এই বস্তুচেতনা ও ইন্দ্রিয়জ বিশ্ববোধ তাঁর বেদান্তাশ্রিত ব্রহ্মতত্ত্বকেও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তাই তিনি বেদান্তের ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করলেও মায়াবাদ বর্জন করতে কুণ্ঠিত হন নি। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। সাধারণতঃ দেখা যাচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে তিনি মায়াবাদের বিরোধী ছিলেন। সরকারের প্রস্তাবিত মহাবিদ্যালয়ে হিন্দুর বেদান্তাদি পাঠনার গুরুত্ব আরোপিত হওয়ার পরিকল্পনা হলে তিনি তার প্রতিবাদে লর্ড আমহার্স্ট'কে লিখেছিলেন :

> Neither can much improvement arise from such speculation as the following which are the themes suggested by the Vedanta ; in what manner is the soul absorbed in the Deity ? What relation does it bear to the Divine Essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother etc., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."—*The English Works of Raja Rammohan Roy*, Vol, 1. P. 472.

বেদান্তের ব্রহ্মবাদে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে তিনি যে মায়াবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না তা এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যাবে। এই ভৌমবোধ ও ঐহিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ তিনি সমসাময়িক য়ুরোপীয় মুক্তজ্ঞানী দর্শন, বাস্তব সমাজবিজ্ঞান ও বিশ্ববিবর্তনের নব নব নিরীক্ষা থেকেই পেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই য়ুরোপের জ্ঞানতত্ত্ব অলৌকিকতার কুহেলিকা ছেড়ে দিয়ে বুদ্ধিমার্গীয় হেতুবাদের সাহায্যে জগৎ জীবনকে কার্যকারণাত্মক শৃঙ্খলার মধ্যে উপস্থাপনা করেছিল। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্ক্রিয়া ও তার ব্যবহারিক নৈপুণ্যের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই য়ুরোপে মানবমুক্তির লৌকিক পন্থা গ্রহণ করেছিল। নিউটন, হিউম, লক ও বেন্থাম সেই মানবমুক্তির অগ্রদূত। গণিততত্ত্ব, মানব-হিতবাদ (Positionism)

এবং সংশয়বাদ—এসমস্তই বাস্তবচেতনাকে বুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা পরিশুদ্ধ করে গ্রহণ করে। রামমোহন উত্তরকালে য়ুরোপীয় জ্ঞানাশ্রয়ী বস্তুসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে যেমন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর দীক্ষায় তিনি তন্ত্রের বুদ্ধি-আশ্রয়ী ঐক্যতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি বেদান্তভাষ্যের মধ্যেও অতিলৌকিক-কুহেলিকামুক্ত যুক্তিরই জয় উপলব্ধি করেছিলেন। যুক্তির আনুগত্যে অভ্রান্ত বিশ্বাসই রামমোহনকে আধুনিক জগতের দ্বারপ্রান্তে হাজির করেছে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

রামমোহনের বংশপরিচয়

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় রামমোহনের জন্মের পর দু-শতাব্দী অতীত হলেও আজ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কত ক্ষুদ্র। রামমোহন-গবেষণার ক্ষেত্রে তিন প্রজন্ম উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অথচ কতকগুলি টুকরো টুকরো পরস্পরবিচ্ছিন্ন সংবাদ ব্যতীত তাঁর জীবনের বিশেষ কিছুই আমরা জানতে পারলাম না—এই পরিস্থিতি যে কোনো অনুসন্ধিৎসুকে অতৃপ্ত করে তোলে। রামমোহনের প্রথম চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস সম্পর্কে এ কথা তো বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। তাঁর যথার্থ জন্মবৎসরের প্রশ্নটির সুনিশ্চিত মীমাংসা এখনো হয় নি; তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর অনুপুঙ্খগুলি যেমন আজও অনাবিষ্কৃত, তেমনি অসম্পূর্ণ তাঁর বিদ্যার্থী-জীবনের রূপরেখা; চাকরী ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও মোকদ্দমার সাক্ষীদের জবানবন্দী বা অস্পষ্ট কিছু সরকারী চিঠিপত্র ছাড়া অন্য উপকরণ আমাদের হাতে নেই। সবদিক বিবেচনা করলে এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে তাঁর রচনাবলী পত্রগুচ্ছ ও সমসাময়িক ইয়োরোপীয় বন্ধু ও পরিচিতবর্গের বিবরণ যদি আমাদের সামনে না থাকত তা হলে রামমোহনের চিন্তা ও কল্যাণকর্মের যেটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছি তার থেকেও আমরা বঞ্চিত হতাম ও সম্পূর্ণ কিংবদন্তীর বিষয়বস্তুরূপে তিনি আজ আমাদের কল্পনারাজ্যে বিরাজ করতেন। রামমোহন-জীবনীসংক্রান্ত তথ্যাবলীর যেখানে এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা সেখানে তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে তাঁর নিজ-পরিবারে রক্ষিত ঐতিহ্যের মধ্যেই যে পরস্পর বিরোধী একাধিক ধারা লক্ষিত হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

রায়পরিবারের সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে আমরা যে-টুকু জানি তার ভিত্তিতে বলা যায় রামমোহন শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান এবং সুরাই 'মেল'এর (অর্থাৎ রাঢ়ীয় কুলীনগণের বিভাগ-বিশেষের) অন্তর্ভুক্ত কুলীন; তাঁদের কৌলিক উপাধি ছিল 'বাঁড়ুয্যা' বা 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। কিন্তু তাঁর বংশলতিকা বা বিশিষ্ট পূর্বপুরুষগণ সম্পর্কিত যে তিনটি বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলির সর্বত্র পারস্পরিক মিল বা সামঞ্জস্য নেই। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র নন্দমোহন

চট্টোপাধ্যায় যে ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তদনুসারে রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত 'শাঁকাসা'র অধিবাসী ছিলেন। এই বংশে তিনিই প্রথম যজন-যাজন অধ্যাপনা ইত্যাদি চিরাচরিত ব্রাহ্মণবৃত্তি ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে চাকরী গ্রহণ করেছিলেন। চাকরী ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও সুনাম অর্জন করায় নবাব সরকারের পক্ষ থেকে তিনি 'রায় রায়ান' উপাধিতে ভূষিত হন ও সেই থেকে এই বংশে কৌলিক উপাধি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর পরিবর্তে সরকারী খেতাব 'রায়' প্রচলিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম পরিবারের আদিনিবাস শাঁকাসা পরিত্যাগ করে হুগলী (তৎকালে বর্ধমান) চাকলার অন্তর্ভুক্ত রাধানগর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তদবধি রায়-পরিবার রাধানগরবাসী। এইখানেই রামমোহনের জন্ম (দ্রষ্টব্য, নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প,' দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১২৯৮ বঙ্গাব্দ পৃঃ ১)। শ্রীযুক্তা সোফিয়া ডবসন কলেট তাঁর ইংরেজী রামমোহন-জীবনীতে এই কাহিনীকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। নন্দমোহন প্রদত্ত বিবরণ হতে কতকাংশে পৃথক ও অধিকতর বিস্তারিত এক ঐতিহ্যের সংবাদ দিয়েছেন রায়বংশের আর এক শাখার সন্তান মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীকাররূপে বাংলাসাহিত্যে ইনি সুপরিচিত। মহেন্দ্রনাথ রামমোহনের কাকা (রামকান্ত রায়ের সহোদর ভাই) রামকিশোর রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। ইনি দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধে রামমোহনের জন্মসাল ও বংশপরিচয় নিয়ে আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য 'জন্মভূমি', পঞ্চম ভাগ, অষ্টম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৭১ ৮১ ; ও 'নব্য ভারত', চতুর্দশ খণ্ড, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, পৃঃ ২৮০-৮৬)। এর মধ্যে 'নব্য ভারত'এ প্রকাশিত প্রবন্ধে রামমোহনের কাল পর্যন্ত রায়-পরিবারের এক সুদীর্ঘ বংশ-লতিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই তালিকা অনুসারে বংশের আদি-পুরুষ হলেন কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ ভট্ট নারায়ণ। বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রসমূহে রক্ষিত কাহিনীতে ভট্ট নারায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব পূরণ করবার জন্য রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে যে পাঁচজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে এই রাজ্যে আনয়ন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে—ভট্ট নারায়ণ নাকি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এঁর থেকে বংশ-তালিকা শুরু এবং রামমোহন এঁর সাক্ষাৎ অধস্তন সপ্তবিংশ (২৭) তম পুরুষ। মূল তালিকাটি নানা শাখা-প্রশাখার ভারাক্রান্ত। সেই অবান্তর অনুপুঙ্খগুলিকে বাদ দিয়ে, রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদের সন্তানগণের সম্পূর্ণ তালিকা যোগ করে ও

রামমোহনের অধস্তন তৃতীয় প্রজন্ম তালিকাটিকে প্রসারিত করে এখানে উদ্ধার করে দেওয়া গেল :

১. ভট্ট নারায়ণ
|
২. আদি বরাহ
|
৩. বৈনতেয়
|
৪. সুবুদ্ধি
|
৫. বিবুধেয়
|
৬. গুঁই > গুহ > গাঁউ
|
৭. গঙ্গাধর
|
৮. পহশো > বহুশ > পশুপতি > সুহাস
|
৯. শকুনি
|
১০. মহেশ্বর বাঁড়ুয্যা (বন্দোপাধ্যায়)
|
১১. মহাদেব
|
১২. দুর্বলী
|
১৩. সংকেত
|
১৪. উৎসাহ
|
১৫. রঘু
|
১৬. নিত্যানন্দ বাঁড়ুয্যা (বন্দোপাধ্যায়)
|
১৭. বরদানন্দ (বরাই)
|
১৮. গোবিন্দ বাঁড়ুয্যা (বন্দোপাধ্যায়)
|
১৯. কমল মিশ্র
|
২০. রামনাথ
|
২১. সুন্দরাচার্য
|
২২. পরশুরাম রায়
|
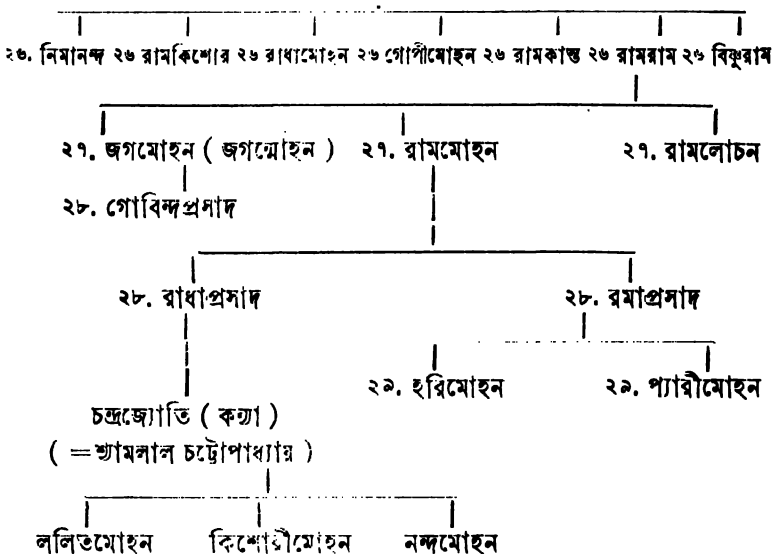
মহেন্দ্রনাথ সংগৃহীত বংশ-তালিকাটি অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে বঙ্গীয় ঘটক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কুলশাস্ত্র বা কুলজী-গ্রন্থগুলিতে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারবর্গের যে বংশ পরিচয় দেওয়া আছে—এটি সেই জাতীয়। তিনি রায়-পরিবারে প্রচলিত ঐতিহ্য কোনো কুলজী-গ্রন্থে সমর্থিত দেখে এর সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছিলেন এমন মনে করবার কারণ আছে। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু উক্ত কুলজী-গ্রন্থাবলীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। সঙ্গত কারণেই আধুনিক ঐতিহাসিক মহলে এ-গ্রন্থ সমাদৃত হয় নি। তবে এর একটি বৈশিষ্ট্য,—কুলশাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করে গ্রন্থকার বঙ্গীয় সমাজের উচ্চ-বর্ণভুক্ত পরিবারগুলির বংশ-পরিচয় যথাসাধ্য এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাধানগরের রায় পরিবারও বাদ যায় নি। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি যে বংশ-

তালিকা সংগ্রহ করেছেন তার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রদত্ত তালিকাটির 'মহেশ্বর বন্দোপাধ্যায়' (বিদ্যানিধির তালিকায় '১০' সংখ্যক পুরুষ) থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অংশ প্রায় অবিকল মিলে যায়। নগেন্দ্রনাথের বিবরণ 'মহেশ্বর থেকেই শুরু—এর উর্ধ্বে আর অগ্রসর হয় নি। সে-হিসাবে বিদ্যানিধি প্রদত্ত তালিকাটি অবশ্যই সম্পূর্ণতর। উভয় তালিকার দশম পুরুষোত্তর অংশে যে সামান্য পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তা এই : বিদ্যানিধি সংগৃহীত বংশ-পরিচয়ের রঘু (১৫) নিত্যানন্দ (১৬) নামদ্বয়ের স্থলে নগেন্দ্রনাথ দিয়েছেন ভিন্ন দুটি নাম—অনিরুদ্ধ (১৫) ও লক্ষ্মীকান্ত (১৬) ; তা ছাড়া নগেন্দ্রনাথের বিবরণে বরদানন্দ বা 'বরাই'এর নাম (যিনি বিদ্যানিধির তালিকায় '১৭' সংখ্যক পুরুষ) অনুপস্থিত (দ্রষ্টব্য, নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৯৭)। উভয় তালিকার এই সাদৃশ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, বিদ্যানিধি সংগৃহীত রামমোহনের পূর্বপুরুষ পরিচয়ের উৎস কুলপঞ্জিকা শ্রেণীর কোনো গ্রন্থ। বিভিন্ন সূত্রে এই বংশ তালিকা বিভিন্ন সময়ে দুই লেখকের হাতে এসেছিল এবং উভয়ের সাদৃশ্য থেকে এ-টুকুও ধারণা করা যাচ্ছে, এই ঐতিহ্যের বুনিয়াদ বেশ দৃঢ় ছিল।

বিদ্যানিধি প্রদত্ত উক্ত ঐতিহ্য সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে বলা হয়েছে রামমোহনের পূর্বপুরুষগণ স্থায়ীভাবে রাধানগরবাসী হওয়ার আগে অন্তত তিনবার বাসস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। বংশের আদি পুরুষ কিংবদন্তী-খ্যাত ভট্ট নারায়ণ কনৌজ থেকে বাংলায় এসে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) কোন অঞ্চলে নিবাস স্থাপন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় কাহিনীতে এই আদি বাসভূমির নামটি উল্লিখিত হয় নি। এইখানে তাঁর বংশ দ্বাদশ পুরুষ বাস করেন। অধস্তন ত্রয়োদশতম বংশধর সংকেত উক্ত আদিনিবাস পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গেরই (বর্তমান বাংলা-দেশের) বাঙ্গাল-পাশা নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই 'বাঙ্গাল-পাশা'র অবস্থান অজ্ঞাত। এখানে তাঁরা পাঁচ পুরুষ বাস করেন। তারপর ভট্টনারায়ণের অধস্তন অষ্টাদশতম বংশধর গোবিন্দ বাঁড়ুয্যা (বন্দোপাধ্যায়) পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আসেন। কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত বেণীপুরে বাস স্থাপন করেছিলেন (নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় কথিত শাঁকাসায় নয়)। এখানে তাঁদের কাটল ছয় প্রজন্ম। উত্তর কালে রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বেণীপুর থেকে উঠে গিয়ে বর্তমান হুগলী (তৎকালীন বর্ধমান) চাকলার অন্তর্গত রাধানগরবাসী হন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বর্ণিত ঐতিহ্যের সঙ্গে নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত কাহিনীর মিল ও অমিল দুই আছে। উভয় মতেই রামমোহনের কৌলিক উপাধি 'বাড়ুয্যা=বন্দোপাধ্যায়'। বিদ্যানিধি এই সূত্রে কিছু অনুপুঙ্খ যোগ করেছেন। তাঁর মতে ভট্টনারায়ণের অধস্তন দশম পুরুষ 'মহেশ্বর'-এর নামের সঙ্গে এই উপাধি সর্বপ্রথম যুক্ত হতে দেখা যায়। মহেশ্বরের বংশধরদের মধ্যে পরে যারা ঐতিহ্যানুসারে বিশেষভাবে 'বন্দোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন নিত্যানন্দ (১৬) ও গোবিন্দ (১৮)। কিন্তু বংশগত ঐতিহ্যে মহেশ্বর অপেক্ষা নিত্যানন্দের খ্যাতি যে কোনো কারণেই হোক অধিক ছিল এবং তাঁর উত্তরপুরুষগণ রামমোহনের কাল পর্যন্ত সমাজে নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের সন্তান রূপেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয়ত বিদ্যানিধি ও নন্দমোহন পরিবেশিত দুই কাহিনী অনুসারেই রায়-পরিবার রাধানগরে স্থায়ী হওয়ার পূর্বে মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত তাঁদের বাসভূমির অবস্থান সম্পর্কে দুই কাহিনী ভিন্নমুখী। নন্দমোহনের মতে তা হল 'শাঁকাসা'; অপর পক্ষে বিদ্যানিধি বলেছিলেন তা বেণীপুর। কিন্তু রায়-বংশের মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নেই এঁদের মতপার্থক্য সর্বাধিক গুরুতর। নন্দমোহন বলেছেন এই বংশে রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্রই সর্বপ্রথম কৌলিক ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন ও সেই সূত্রে 'রায়' (রায়-রায়ান) খেতাব লাভ করেন। বিদ্যানিধি সংগৃহীত পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে কিন্তু দেখা যায়—বংশের প্রথম সরকারী কর্মচারী কৃষ্ণচন্দ্র নন—কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ, অর্থৎ রামমোহনের অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ পরশুরাম। নবাব-সরকার থেকে এই চাকরী সূত্রে পরশুরামই বংশের সর্বপ্রথম 'রায়' খেতাব অর্জনকারী এবং প্রকৃতপক্ষে পরশুরামের কাল থেকেই এই বংশে 'বন্দোপাধ্যায়' উপাধির স্থলে 'রায়' খেতাব ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেণীপুর থেকে রায়-পরিবার রাধানগরে আগত, এবং এই বংশে রামমোহনের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পরশুরামই প্রথম 'রায়' খেতাবে ভূষিত,—বিদ্যানিধির এই সিদ্ধান্তদ্বয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলা রামমোহন-জীবনীতে গৃহীত হয়েছে (দ্রষ্টব্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯২৮, পৃঃ ৬৯৩-৯৫)।

প্রশ্ন হল, আধুনিক পাঠক এই মতপার্থক্যের স্থলে কোন সিদ্ধান্তটি

অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করবেন? দুই লেখকই রায়-পরিবারের সঙ্গে যুক্ত এবং পারিবারিক ঐতিহ্য সংগ্রহ করবার সুযোগ দুজনেরই সমান ছিল। কিন্তু উভয়ের রচনা তুলনা করলে দেখা যায় মহেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান অনেক বেশি ব্যাপক ও তাঁর মন অনেক বেশী বিচারশীল। নন্দমোহন তাঁদের পরিবারে প্রচলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প-সংগ্রহ করেছেন মাত্র, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেগুলির মূল্য-নির্ণয় বা সত্যাসত্য বিচারের কোনো প্রচেষ্টা করেন নি। কোন সূত্র থেকে এ-সকল কাহিনী সংগৃহীত তারও বিশেষ হদিশ তাঁর রচনায় মেলে না। পারিবারিক কিংবদন্তীমাত্রেই সত্য হয় না, তার সঙ্গে অনেক পুরুষের কল্পনার মিশ্রণ থাকে—সমকালীন বহিঃসাক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে তার মূল্য যাচাই করে নিতে হয়। নন্দমোহনের এদিকে প্রবণতা ছিল না। সুতরাং তাঁর গ্রন্থ সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হলেও সর্বত্র কতদূর নির্ভরযোগ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। অপর পক্ষে মহেন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ও সংগৃহীত তথ্যগুলিকে স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার তিনি বিশেষ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর সংগৃহীত বংশ-লতিকা যে অনেকাংশে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রদত্ত পূর্বপুরুষ বিবরণের সঙ্গে মেলে, তা ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে। তিনি রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষগণের বেণীপুর-বাসের প্রমাণ প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেছেন, তাঁর সময় পর্যন্ত, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেণীপুরে রামমোহনের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পরশুরাম রায়ের ভিটার ভগ্নাবশেষ বর্তমান। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এই তথ্যটি পরবর্তীকালের কেউ যাচাই করে দেখতে অগ্রসর হয়েছেন বলে জানা যায় নি। সে ভগ্নস্তূপের অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত আছে কিনা জানি না। বেণীপুরের স্থানীয় ইতিহাস ও লোকস্মৃতি সম্পর্কে সুপরিকল্পিত ভাবে অনুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদ্যানিধি কথিত পরশুরাম বিষয়ক কাহিনীর সত্যতার আর একটি সমর্থন সম্ভবত পাওয়া যায় রামমোহন লিখিত সুবিখ্যাত 'আত্মজীবনী-মূলক' পত্রখানিতে। এই পত্রে নিজের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে রামমোহন বলেছেন: "My ancestors were Brahmins of a high order, and from time immemorial were devoted to the religious duties of their race, down to my fifth progenitor, who about one hundred and forty years ago gave up spiritual exercises for worldly pursuits and aggrandisment," (সম্পূর্ণ পত্রখানি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Collet: *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*

ed. Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli. Calcutta, 1962, pp. 496-98)। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় থেকে গণনা করলে রামমোহনের fifth progenitor বা উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ হন পরশুরাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রামমোহন স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁদের বংশে পরশুরামই প্রথম ব্রাহ্মণোচিত 'যজন-যাজন-পূজা-পাঠ' ইত্যাদি পরিত্যাগ করে ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি লাভের পন্থা অবলম্বন করেন—অর্থাৎ চাকরী দ্বারা বিত্তোপার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। এই সুবিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক পত্রখানি রামমোহনের মৃত্যুর অনতিপরে স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট কর্তৃক ইংলণ্ডের Athenaeum পত্রিকার ৫ অক্টোবার, ১৮৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্তা কলেট এই পত্রখানিকে 'জাল' বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক ডঃ ল্যাণ্ট্ কার্পেণ্টার ও উত্তরকালে মেরী কার্পেণ্টার, ম্যাক্‌স্‌ম্যুলের প্রভৃতি সকলেই এটিকে রামমোহন সম্পর্কিত একটি অকৃত্রিম ও মহামূল্যবান দলিল বলেই গ্রহণ করেছেন। শ্রীযুক্তা কলেট তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোনো যুক্তি দেখাননি। পত্রখানি যে জাল হতে পারে না তার অনেক প্রমাণ আছে—সেগুলির আলোচনা এখানে অবান্তর। তবে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি পরশুরাম সম্পর্কে যে নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন তার ভিত্তিতে এই পত্রখানির অকৃত্রিমতার স্বপক্ষে একটি অতিরিক্ত যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে রামমোহনের উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ প্রথম বিত্তোপার্জনের জন্য ঐহিক বৃত্তি অবলম্বন করেন; উক্ত পত্রে প্রকারান্তরে রামমোহনও তাই বলছেন। পত্রখানি রামমোহন ইংলণ্ড থেকে ১৮৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দের কোন সময়ে সম্ভবত তাঁর ইংরেজ বন্ধু গর্ডনকে লিখেছিলেন। তাঁর fifth progenitor বা উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ সম্পর্কিত যে পারিবারিক ঐতিহ্য তিনি এই পত্রে উল্লেখ করেছেন—তা ইংলণ্ডে কারও পক্ষে জানা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই কারণেই এই পত্র স্যাণ্ডফোর্ড আনর্ট বা অপর কোনো ইংরেজের পক্ষে রচনা করাও সম্ভবপর নয়। মনে রাখতে হবে রামমোহনের মৃত্যুর পর পত্রখানি যখন প্রকাশিত হয় তখন স্যাণ্ডফোর্ড্ আর্নটের সঙ্গে ইংলণ্ডে রামমোহনের ভারতীয় অনুচরদেরও (পালিতপুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে এবং শেষোক্তগণ কার্পেণ্টার-পরিবার, হেয়ার-পরিবার প্রভৃতির আশ্রয়ে বাস করছেন। রামমোহনের প্রতি তাঁর জীবদ্দশায় অসদাচরণ করার জন্য আর্নট তখন রামমোহনের আত্মীয়বন্ধুগণ কর্তৃক প্রকাশ্যে তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত, তাঁর

সঙ্গে এঁদের কারও কোনো যোগাযোগই ছিল না। সুতরাং এঁদের কারও সাহায্যে যে রামমোহন সম্পর্কে আর্নট কোনো পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করবেন তাঁর সে উপায়ও ছিল না। অপর পক্ষে রামমোহনের এককালীন একান্ত সচিব হিসাবে তাঁর কিছু চিঠি ও অন্যান্য কাগজপত্র আর্নটের কাছে যে থেকে যাবে এটাও স্বাভাবিক। রামমোহন যে স্বহস্ত লিখিত নকল রেখে চিঠি পাঠাতেন তার প্রমাণ আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোসটন নিবাসী উইলিয়ম ওয়ার্ড্‌কে লিখিত তাঁর ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮২৪ তারিখের পত্রের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স ও দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানা —দুই স্থানেই বর্তমান লেখক অনুসন্ধান করে পেয়েছেন। এর মধ্যে যে কোনো একখানি নিঃসন্দেহে রামমোহনের হস্তলিখিত 'নকল'। বিদ্যানিধি কথিত পরশুরাম বিষয়ক কাহিনী ও রামমোহনের পত্রে তাঁর fifth progenitor সম্পর্কিত উল্লেখ পরস্পরকে সমর্থন করায় একদিকে যেমন উক্ত পারিবারিক ঐতিহ্যের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তেমনি অপরদিকে রামমোহনের পত্রখানি সম্পর্কে কৃত্রিমতার অভিযোগও এর দ্বারা খণ্ডিত হচ্ছে।

পরশুরাম রায় সরকারী চাকরী কোন সময়ে আরম্ভ করেন, সে সম্পর্কে বিদ্যানিধি কিছু বলেন নি। রামমোহন, তাঁর পত্রে এর একটা আন্দাজ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় তাঁর ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ ঐহিক বৃত্তি গ্রহণ করেন 'about one hundred and forty years ago' অর্থাৎ প্রায় একশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে। এখানে কালনির্দেশ স্পষ্টত আনুমানিক, সুনির্দিষ্ট নয়। যদি ১৮৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে এই পত্র লেখা হয়ে থাকে তাহলে আক্ষরিক অর্থে পরশুরামের সরকারী কর্মগ্রহণের সময় হবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক। কিন্তু অনুমানভিত্তিক উক্তির আক্ষরিক অর্থগ্রহণ করলে ভুল হবে। রামমোহন ব্যবহৃত 'about' শব্দটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে কি অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে পরশুরাম সরকারী কর্মে প্রতিষ্ঠিত হন তাহলে খুব অন্যায় হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঔরংজিব নিযুক্ত বাংলার দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁ (আদি নাম 'কার তলব্ খাঁ') মখ্‌সুসাবাদে (পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নামে সুপরিচিত) তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন ও বাংলার শাসন ব্যবস্থায়, বিশেষত রাজস্ববিভাগে, নিয়ম শৃঙ্খলা ও সংগঠন প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হন। তাঁর শাসননীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, ব্যাপক হারে যোগ্যতাসম্পন্ন, সুশিক্ষিত

হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ। ফার্সী ও উর্দ্দু জানা বহু হিন্দুসন্তান এই সময়ে নবাব-সরকারে উচ্চ পদলাভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। রামমোহনের উক্তি থেকে যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে—তদনুসারে পরশুরাম সরকারী চাকরী আরম্ভ করেন এরই কাছাকাছি কোনো সময়ে—হয়তো বা মুর্শিদ কুলী শাসনবিভাগের নববিন্যাস করবার সামান্য আগে। কিন্তু একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে, চাকরী জীবনে তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়েছিল মুর্শিদ কুলী অনুসৃত হিন্দু-নিয়োগনীতির ফলেই এবং তাঁর 'রায়' উপাধিলাভ বা ধনৈশ্বর্যের ভিত্তিস্থাপনা সবই ঘটেছিল মুর্শিদ কুলীর আমলে। এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে দেখা যাবে বাংলার শাসনকেন্দ্ররূপ মুর্শিদাবাদের পত্তনের কাল থেকেই এই রাজ্যের মুসলমান শাসকগণের সঙ্গে রায়-পরিবার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় নবাব আলিবর্দি খাঁর কর্মচারী ছিলেন এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গেও যে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল তারও প্রমাণ আছে। মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে পরশুরামের চাকরীগত যোগ সম্পর্কে যে-টুকু এখানে বলা গেল তা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর। এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রমাণ কিছু নেই। তবে এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক না হতেও পারে।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সংগৃহীত পারিবারিক ঐতিহ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার স্বপক্ষে কিছু বলবার থাকলেও এর উৎস কুলপঞ্জিকাগ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সন্দিহান। কুলশাস্ত্রশ্রেণীর প্রচলিত গ্রন্থগুলি প্রায়শ অর্বাচীন ও এগুলির মধ্যে কিছু কিছু যে আধুনিক কালের উদ্দেশ্যমূলক রচনা, তাও প্রমাণিত হয়েছে। এক সময়ে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-রচনার কাজে এগুলির সাক্ষ্য ব্যবহার করবার একটা প্রবণতা কোনো কোনো বাঙালী পণ্ডিতের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমালোচনার মুখে সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। এ-অবস্থায় এই জাতীয় গ্রন্থে ধৃত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত পারিবারিক ঐতিহ্যের উপর কতদূর বিশ্বাস রাখা চলে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে কুলশাস্ত্রে রক্ষিত বংশতালিকাসমূহের সুদূর অতীত ভাগের উপর সর্বদা মোটেই নির্ভর করা চলে না, যদি না স্বতন্ত্র কোনো সূত্রে তার সমর্থন পাওয়া যায়। বংশকে মহিমান্বিত করবার জন্য নানা কিংবদন্তী ও কাল্পনিক উপাখ্যান বংশতালিকার আদি অংশে জুড়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। তবে বংশ-তালিকা আধুনিক কালের যত নিকটবর্তী হয় ততই ক্রমে নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে। সুতরাং উর্দ্ধসীমার বিস্তার

কিছুদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবর্ণভুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলি সামাজিক মর্যাদার নিদর্শনস্বরূপ পূর্বপুরুষতালিকা সঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং তৎকালীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বংশজাত কোনো ব্যক্তির পক্ষে নির্ভুলভাবে উর্ধ্বতন দশপুরুষের নাম আবৃত্তি করা অস্বাভাবিক ছিল না। পারিবারিক সূত্র হতে বিদ্যানিধি আমাদের জানিয়েছেন রামমোহন তাঁর অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ পরশুরামের উপরেও দুই-তিন পুরুষের সংবাদ সঠিক ভাবে রাখতেন।

রায়-বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে তৃতীয় একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকার জি. এস. লিওনার্ড। এই কাহিনী অনুযায়ী রামমোহনের পিতৃকুলের আদিপুরুষ সুবিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য নরোত্তমদাস ঠাকুর (ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)। নরোত্তম নাকি রাধানগরে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর বংশধরগণ সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে 'ঠাকুর' বা 'ঠাকুর' উপাধি ধারণ করেছিলেন। এই বংশধরগণ লিওনার্ডের ভাষায়—"were held in high veneration as a family of Vaishnava Brahmans of Bengal down to the fifth progenitor of Rammohum Roy, who acquired for himself and his posterity the title of 'Roys' in lieu of the title of Thakurs by entering the service of the Nawab of Bengal". (দ্রষ্টব্য G. S. Leonard *A History of the Brahmo Samaj* Calcutta, 1879, pp. 8-9)। লিওনার্ড এই কাহিনী কোন সূত্রে সংগ্রহ করেছেন তা জানান নি। এ-সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে রামমোহনের পিতৃকুলকে যুক্ত করবার এটি একটি অত্যন্ত অপটু ও নির্বোধ প্রচেষ্টা। বৈষ্ণব আচার্য নরোত্তমদাস আদৌ ব্রাহ্মণ ছিলেন না; তিনি কায়স্থ সন্তান, তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত। এঁরা রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুর পরগণার অধিপতি ছিলেন; রাধানগরের সঙ্গে এঁদের কোনো সংস্রব ছিল না। কায়স্থ নরোত্তমের পক্ষে কোনো কুলীন ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তা ছাড়া 'রায়' উপাধিতে ভূষিত হবার পূর্বে রামমোহনের পিতৃকুল যে 'ঠাকুর' বা 'ঠাকুর' উপাধিধারী ছিলেন এরও কোনো প্রমাণ নেই। তাঁদের আদি কৌলিক উপাধি যে 'বাড়ুয্যা = বন্দোপাধ্যায়' এ বিষয়ে পারিবারিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। দুঃখের বিষয় যে কাহিনীর অসারতা অতি সহজেই চোখে

পড়ে সেটির মূল্যবিচার করবার মত ঐতিহাসিক জ্ঞান লিওনার্ডের ছিল না, তাই তিনি নির্দ্বিধায় এটিকে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করেছেন। সমগ্রভাবে ঐতিহ্যটি অর্বাচীন ও হাস্যকর। তবে এর একটি অংশ বিদ্যানিধি প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে মেলে। লিওনার্ড পরিবেশিত কাহিনী অনুসারেও রামমোহনের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ সর্বপ্রথম নবাব-সরকারে কর্মগ্রহণ করেন ও 'রায়' পদবীতে ভূষিত হন।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রামমোহন-চর্চার নানা দিক

১৭৭২ না ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ—কোন্‌টি রামমোহনের জন্মসাল এ নিয়ে সম্প্রতি ঘোরতর মসীযুদ্ধ হয়েছে এবং তা শেষ হয়েছে এ কথা বলা যায় না। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দু-চার বছরের ফারাকে খুব বেশি কিছু যায় আসে না। তবু আধুনিক ভারতের প্রথম উদ্‌গাতা রূপে যে পুরুষকে আমরা সম্মান করছি তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে নিশ্চিত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত একান্ত প্রত্যাশিত। রামমোহনের কীর্তির যোগ্য বিচার হবে কোন্‌ প্রেক্ষাপটে? এ বিষয়ে সাম্প্রতিক লেখালেখিতে আলোর চেয়ে আঁধি বেশি। আধুনিক দুনিয়া বলতে, আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে, য়ুরোপকেই বোঝাত। সেই য়ুরোপ আমাদের কাছে দেখা দিয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্‌ডিয়া কোম্পানির উত্তরাধিকারী মারফৎ। সেদিন রামমোহন রায় আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের পরিচয়সাধনের একমাত্র হোতা ছিলেন না। মির্জা আবু তালেব, হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: এঁদের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত। অথচ আমরা তা করি না। রামমোহনকেই একমাত্র আধুনিক ভারতীয় বলে জানি।

নবজাগরণ (রেনেশাঁস) ও রিফর্মেশন: আধুনিক য়ুরোপকে নোতুন জীবনভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। মধ্যযুগের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছিল এই দুই আন্দোলন ও বিজ্ঞানাবিষ্কারের ফলে। ইংরেজি ভাষা মারফৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেইসব মহান উদার আদর্শ স্বপ্ন চিন্তা প্রেরণা আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। নবজাগরণ-উদ্বুদ্ধ য়ুরোপ থেকে সেদিন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ ধাপে উপনীত জরাজীর্ণ ভারতবর্ষ কোন অমৃতের বাণী শুনেছিল? রেনেশাঁস এর মূল কথাগুলি ভারতবর্ষ সেদিন শুনেছিল। মানুষ ও মনুষ্যত্বের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কারানুগত্যের অস্বীকৃতি, যুক্তি ও বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা, দেশকালগণ্ডীর সীমা লঙ্ঘনকারী মানবভাবনা, জীবনকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থাপনার উদ্যোগ, নবমূল্যবোধের সন্ধান, ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেতনার উদ্বোধন। রামমোহনের কৃতিত্ব এইখানে যে তাঁর লেখায় ভাষণে কর্মে এইসব ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও তার

উত্তরোত্তর উন্নতিতে রামমোহন আস্থা প্রকাশ করেছিলেন। য়ুরোপ না গিয়েই তিনি এইসব ভাবনা প্রচার কারন। অবশ্য পরে য়ুরোপ যান।

রামমোহনকে সবদিক থেকে আদর্শ পুরুষ বলে দেখবার একটা প্রয়াস ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এতে ভক্তির আতিশয্য প্রকাশ পায়। সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পায় না। রামমোহনের 'রাজা' উপাধি নিয়ে মাতামাতি করা আজ শোভা পায় না। কারণ রামমোহন আধুনিক মানুষ আবার তিনিই জরাজীর্ণ মুঘলশক্তির প্রতিনিধিরূপে 'রাজা' উপাধিতে বিশিষ্ট—এই দুই বক্তব্য এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতে পারে না। চৈতন্যদেবকে নিয়ে যে সব জীবনী কাব্য মধ্যযুগে লিখিত হয়েছিল সেগুলিকে আমরা আধুনিক অর্থে 'বায়োগ্রাফি' বলে মনে করি না। কারণ ওখানে বাস্তবের চৈতন্যদেবকে বিশেষ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি রামমোহনকে নিয়ে যেসব জীবনী লেখা হচ্ছে তা পড়ে মনে হয় তাঁকে নিয়েও ঐ ধরনের ভক্তিগদ্‌গদ ভাগবত কথা রচিত হচ্ছে। রামমোহন যা করেছেন সব ভালো, এবং তাঁর সাফল্য-অসাফল্য-ত্রুটি সবই আহা মরি: এই মনোভাব সাম্প্রতিক মননের সুস্থতার পরিচায়ক হতে পারে না।

রামমোহন এদেশে যুক্তিবুদ্ধির প্রতিষ্ঠাতা—একথা অনেকে আজকাল বলছেন। সত্যি কি তাই? রামমোহন সারা জীবন ধরে যেসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিশেছিলেন, ধর্মবিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাতে 'রীজন'এই তাঁর প্রতিষ্ঠা, একথা বলা যায় না।

রামমোহন বিদ্রোহী। কিন্তু কোন্ অর্থে? এবং কতটা? তিনি প্রতিমা-পূজা বর্জন করেছিলেন এবং সংস্কৃত ও আরবীতে রচিত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি উপবীত ত্যাগ করেন নি। তিনি বেদান্তের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, কিন্তু তিনিই লাট বেণ্টিঙ্ককে পরামর্শ দিয়েছিলেন সতীপ্রথা রদ-আইন প্রণয়নের পূর্বে এদেশের সমাজের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা বলাই ভালো। রামমোহন স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন, ১৮৩০-এর বিপ্লব ও রিফর্ম বিলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই ভারতে য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিনিই বৃটিশ-রাজের এজেণ্ট হয়ে দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের স্বাধীনতা-খর্ব করায় সক্রিয় ছিলেন। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষতিকারক ফল সম্পর্কে তিনি বৃটিশরাজকে

সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু লাট কর্নওআলিসের শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। তিনি ত নিজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি অংশ ছিলেন। জমিদারি থেকে তাঁর আয় নিতান্ত কম ছিল না। সেই আয়ের উপর নির্ভর করেই তিনি রংপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, বাড়ি কিনেছিলেন, শাস্ত্রচর্চায় ও কুসংস্কার রোধে কেতাব ও পত্রপত্রিকা নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেছিলেন।

অবশ্য একা রামমোহন নন, সেদিনের শিক্ষিত বাঙালিমাত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ভোগ করেছিলেন ও বৃটিশরাজের সমর্থক ছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ (১৮৫৭) বা আধুনিক ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালিরা সিপাহীদের সমর্থ করেন নি, ব্রিটিশরাজকেই সমর্থন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভূস্বামী বা ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং জমিদারি বা ব্যবসায়ে তাঁরা ইংরেজের সমর্থক ও অংশীদার ছিলেন। এটাই তাঁদের শ্রেণীচরিত্র। সে কারণেই রামমোহনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে নব-'ভাগবত' রচনার প্রয়াস সমর্থন করা যায় না।

রামমোহন ইংরেজি, বাংলা, ফার্সিতে কেতাব লিখেছিলেন। তিনি বাংলায় লেখেন ৩৪।৩৫টি বই। তার একটিতেও সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেননি। সে আলোচনা করেছিলেন ইংরেজিতে লেখা নিবন্ধাদিতে। অর্থাৎ সেগুলি ইংরেজিশিক্ষিত সংকীর্ণ গণ্ডীভুক্ত বন্ধুবান্ধবদের জন্য রচিত বৃহত্তর পাঠকসমাজের জন্য নয়।

রামমোহনের কীর্তির মূল্যনিরূপণ করতে গিয়ে এসব বিষয় ভেবে দেখা দরকার। শ্রী আর. কে. চক্রবর্তী এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন রামমোহন-সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক বইয়ের আলোচনায় (নাইনটিন্থ্ সেন্চুরি স্টাডিজ, ১, জানুআরি ১৯৭৩, পৃ. ১১০-১১৬)।

রামমোহনের কৃতিত্ব কোথায়? তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আধুনিক য়ুরোপের অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। য়ুরোপে না গিয়েই তিনি পাশ্চাত্যভাবনা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর প্রশংসা করতে হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনুভূতি বা ইন্‌টুইশনকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা হত। সবচেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হত। ইন্‌টুইশান্ নির্ভর দেশে তিনি যুক্তির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দেখাতে চেয়েছিলেন উপনিষদের প্রতিষ্ঠা যুক্তির উপরে। আর সে-কারণেই তিনি য়ুরোপ

থেকে যুক্তিবাদকে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি য়ুরোপ থেকে ঋণ গ্রহণের একটা মনন-ভিত্তি দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য 'রীজন' বলতে পাশ্চাত্ত্য জগৎ যা বুঝে রামমোহন তাই বুঝেছিলেন, তা বলা কঠিন।

কিন্তু যে দেশে ব্যক্তির জীবনের সব সম্পর্ক ও বিকাশের সব পথ তার জন্মের পূর্ব থেকেই সুনির্ধারিত, সে-দেশে ব্যক্তির মুক্তিসাধন কঠিন কাজ। রামমোহন সেই দুরূহ কর্মে অন্তত কিছুটা এগিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। শাস্ত্রবাণীকে সংস্কৃতের নিগড়ে আর না রেখে লোকভাষায় সকলের কাছে উপস্থিত করেছিলেন এই আশায় যে শাস্ত্রব্যবসায়ীদের একচেটিয়া হৃদয়হীন শাসন ও শোষণ থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে। আর পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই সকল জ্ঞানের উৎস ও বিকাশ ক্ষেত্র, এমন অন্ধ সংস্কারকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি বলেই য়ুরোপ থেকে দু হাত বাড়িয়ে তিনি অনেক-কিছুই নিতে চেয়েছিলেন। পূর্ব-নির্ধারিত বিধি-চালিত সমাজে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনে রামমোহনের সীমাবদ্ধ সাফল্য প্রমাণ করে কী দুরূহ কর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্যক্তি আপন সামর্থ্য ও অভীপ্সা অনুযায়ী তার মতাদর্শ বেছে নেবে। জীবনকে গড়ে তুলবে: এই লক্ষ্যে একদিনেই কোনো সমাজ পৌঁছতে পারে না। রামমোহনের কাজকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যবর্গের দানও এক্ষেত্রে অবশ্যস্বীকার্য।

রামমোহন আধুনিক য়ুরোপ মারফৎ আধুনিক কালকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীদের ত্রাণকর্তা বলে মানেন নি। তিনি সাহসের সঙ্গে মিশনারীদের সঙ্গে লড়াই দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান পণ্ডিত ও মোল্লাদের সঙ্গে। (অবশ্য তৎ-প্রকাশিত সবচেয়ে দুঃসাহসী পত্রিকা 'মীরাড়-উল্-আখ্বার—ফার্সিতে প্রকাশিত—তার প্রকাশ রামমোহন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল নিজেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।)

রামমোহন সম্পর্কে বিতর্ক তাঁর সময় থেকেই শুরু হয়েছে, আজও চলছে: অধুনা তাঁর সম্পর্কে যেসব পরস্পরবিরোধী ধারণা প্রচলিত, সেগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (ক) গত শতকের সূচনায় বাংলাদেশে রেনেসাঁস ও তার ভগীরথ রামমোহন—এ দুটি দাবি অসার। রেনেসাঁস ঘটে নি, ঘটেছিল ঔপনিবেশিক জীবনের বিস্তার এবং রামমোহন 'বাবু'-কাল্চারের

প্রতিনিধি। (খ) পশ্চিমের সংস্পর্শে সত্যিই নবজাগরণ হয়েছিল এবং রামমোহন তার ভগীরথ। (গ) ইংরেজ শাসনের ফলে এদেশে দেখা দেয় সংহত ঐক্যবদ্ধ স্থিতিশীল সমাজ এবং আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়, এবং এ দুয়ের যোগে রেনেসাঁস, তবে কোনো এক ব্যক্তি তার ভগীরথ নন, রামমোহনও নন।

আমাদের রামমোহন-চর্চার নানা দিক ও সমস্যার রূপরেখা এখানে দিলাম। আশাকরি অচিরে আঁধি পেরিয়ে আলোয় পৌঁছানো যাবে।

হরপ্রসাদ মিত্র

বাংলা গদ্যরীতির বৈচিত্র্য ও বিদ্যাসাগর

১৩৫৪ সালে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি মন্দির রচনা উপলক্ষে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা'

এবং—

'ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি'

রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য ভাষার প্রাঙ্গণে নিজেকে যে বিদ্যাসাগরের অতিথি বলেছিলেন, সে নিশ্চয় মনীষীর প্রতি মনীষীর শ্রদ্ধাবোধের অভিব্যক্তি; তাতে একথা বোঝা যায়না যে তিনি বিদ্যাসাগরী রীতিই মেনেছেন।

বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধে প্রশংসার কথা লিখে গেছেন। 'বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনা-সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বঙ্কিমের প্রাসঙ্গিক উক্তি তুলে দেখানো হয়েছে—"বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার পরেও পারে নাই।" এই উক্তির আগের উক্তিটিও ঐ ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়েছে—"ইঁহাদের [বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের] ভাষা সংস্কৃতানুরাগিনী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে।

এই দুটি মন্তব্য থেকে ভূমিকা লেখক শ্রীগোপাল হালদার এই সিদ্ধান্তে পেঁ ৗছেচেন—

> "অতএব মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এই—সংস্কৃতানুরাগিনী ভাষার মধ্যে "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর।" সেই বিশেষ রীতির ভাষায় বিদ্যাসাগরের পূর্বে আর কেউ বাঙলা গদ্য লিখতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের পরে বঙ্কিম নিশ্চয়ই বাঙলা ভাষাকে আরও সচ্ছন্দ ও সুমধুর শ্রী দান করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের ভাষা 'সংস্কৃতানুরাগিনী' ভাষা হয়—অন্তত বঙ্কিম তাই মনে করতেন।"

বঙ্কিম যে বিদ্যাসাগরের বাংলা রচনার সংস্কৃতের প্রাচুর্য দেখে নানা সূত্রে অসন্তোষ প্রকাশ করে গেছেন, সে সব তথ্য সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ এসে বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগর, উভয়েরই সাহিত্যিক কীর্তি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। আবার বিদ্যাসাগরের

গদ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা জানিয়েছেন, শ্রীযুক্ত হালদারের পূর্বোক্ত ভূমিকা থেকেই সে বিষয়ে বিবেচ্য কথাগুলি তুলে দেখা যেতে পারে—

> "রবীন্দ্রনাথই প্রথম বিদ্যাসাগরের দুই প্রত্যক্ষ কীর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—একটি বাঙলা গদ্যে পাঠের সৌকর্যার্থে কমা, সেমিকোলোন প্রভৃতির প্রবর্তন। দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মতর :—বাঙলা গদ্যের ছন্দ সৃষ্টি, অথবা যেভাবে বাঙালীর কণ্ঠ অর্থগত ও স্বরগত নিয়মে বাক্যকে ভাগ করে নেয়—সেই সেন্সগ্রূপ ও ব্রেথগ্রূপকে সমন্বিত করে বাঙলা কথার প্রাণকেন্দ্রকে সৃষ্টি করা। একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। কিন্তু দুইই বিদ্যাসাগরের শিল্পচেতনার প্রমাণ।"

কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস চিন্তনীয়। বাংলা সাহিত্যিক গদ্য-সূচনার পরিপ্রেক্ষিতবোধের জন্যে গোপালবাবু কেরি, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলা সংবাদপত্রের দান উল্লেখ ক'রেছেন। কিন্তু কেরির যে বইখানি তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—'কথোপকথন' (১৮০১), সেটি অঞ্চল বিশেষের কথ্য রীতির নমুনার সংগ্রহ মাত্র, মৌলিক রচনা নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের কোনো কোনো রচনায় বিভিন্ন ধরনের লিপিকৌশল ছিল,—রামমোহনের ক্ষেত্রে সেরকম বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত অনুপস্থিত। ১৮৫৪ সালের 'সংবাদ প্রভাকরের' মন্তব্য তুলে তিনি লিখেছেন—'অর্থাৎ রামমোহন শিল্পী নন—বিচারকুশল তার্কিক। গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর কল্পনায় ছিল না।' এখনকার পাঠক অবশ্য 'সংবাদ প্রভাকরের' এ-মন্তব্য মেনে নিতে পারবেন না যে, রামমোহন 'জলের ন্যায়' বাংলা লিখতেন। কিন্তু হালদার মশাইয়ের কথায়—

> "রামমোহন প্রথম থেকেই (বেদান্তগ্রন্থের অনুবাদ, ১৮১৫) বাংলা বাক্যের মূল প্রকৃতি ধরতে পেরেছিলেন। বাংলা গদ্যভাষার 'অন্বয়'—কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বাক্যমধ্যে যথাযথ স্থান—তিনি তখনই স্থিরভাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁর ব্যাকরণও ভাষাবোধের চমৎকার প্রমাণ। দ্বিতীয়ত রামমোহন বক্তব্যকে সরল করার জন্যই লিখতেন—শব্দ বা বাক্যের খেলা দেখাবার ইচ্ছায় নয়। তৃতীয়ত তার্কিক রামমোহন বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটূক্তি প্রয়োগ করেন নি, এবং অপরের কটূক্তিকে যুক্তির দ্বারা নিরসন করেছেন। তাতে মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যরেখাও দেখা যায়।"

তাছাড়া 'প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদে' রামমোহনের আন্তরিকতার স্পর্শ তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেছেন—এবং লিখেছেন—"বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় এসব গুণের (তার সঙ্গে রসবোধেরও) সমাবেশ ঘটেছে—তাতেই বিদ্যাসাগর গদ্যশিল্পী।

অক্ষয়কুমারের ভাষায় যুক্তিগুণ প্রধান; তা রসরসতাবর্জিত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু—গোপালবাবু এই দুজনের নামোল্লেখ মাত্র করেছেন—এইসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নামও উল্লেখযোগ্য,—বর্ণনাত্মক গদ্যে এঁদের সাবলীলতা ও আন্তরিকতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে যাই হোক, অতঃপর ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদের রচনারীতি অন্য শ্রেণীর এবং সাহিত্যগুণ উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যমান—এইটুকু উল্লেখ ক'রে, বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির কয়েকটি নমুনা দেখা যেতে পারে। কারণ সেটিই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তৎপূর্বে গদ্যের স্বভাব সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি চিন্তা দেখা দেয়!

সাহিত্যিক গদ্যের সংজ্ঞা কি ? এই প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তরে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় লেখা হয়েছে—

> "Literary prose may be best defined as including all forms of literary expression not metrically versified. Its derivation from the Latin adjective prosus (earlier prorsus) 'direct' or 'straight' has led at some periods to the theory that prose should be plain and straightforward and should properly deal with the statement of what is true or provable in fact and reason,"

এই সঙ্গে গদ্যের তিন প্রকারভেদের কথাও বলা হয়েছে—প্রথমত descriptive prose অর্থাৎ বর্ণনাত্মক গদ্য—যাবতীয় বর্ণনানিষ্ঠ গদ্যই—উপন্যাস, গল্প, ইতিহাস ইত্যাদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; দ্বিতীয়ত explanatory prose অর্থাৎ ব্যাখ্যাধর্মী গদ্য—বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির আলোচনা এই শ্রেণীতে পড়ে; তৃতীয়ত emotive prose অর্থাৎ আবেগধর্মী গদ্য—ধর্মোপদেশ বাগ্মিতাধর্মী রচনা ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

এই তিন শ্রেণীর মিশ্রণ ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। লেখকের বিশেষ মর্জি বা তাঁর উদ্দেশ্যের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারেই গদ্যের চালচলন নির্ধারিত হয়।

বিদ্যাসাগর সাধু ক্রিয়াপদ—সেইসঙ্গে সংলাপে চলিত ক্রিয়াপদ ইত্যাদিও, সাধু সর্বনাম, ভূরিপরিমাণে তৎসম শব্দ, মাঝে মাঝে দেশি ও চলিত শব্দও ব্যবহার ক'রে গেছেন। বঙ্কিমের গদ্যেও সে সব লক্ষণ আছে। রবীন্দ্রনাথও সেসব উপাদান সর্বত্র বর্জন করেন নি। কিন্তু এসব দিক থেকে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার গৌণ ব্যাপার। লেখকের প্রকৃতি এবং তাঁর কালের প্রকৃতি—রচনায় এই দুটি ব্যাপারেরই ছায়া পড়ে। বিদ্যাসাগরের গদ্যে তাঁর নিজের এবং তাঁর কালের প্রকৃতি ধরা আছে। সেটিই আসল কথা। তাঁর প্রকৃতিতে বুদ্ধিবিচারই মুখ্য; আর তাঁর আপন কাল ছিল তামসিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যয়ী কর্মীর যুদ্ধ-প্রেরণার অনুকূল। বিদ্যাসাগরের গদ্যের নানা জায়গায় বিশেষ সাহিত্যগুণ অনুভব করা যায়। যা অনুভূতির বিষয়, তার এক একরকম নামকরণ চলতে পারে বটে, কিন্তু সেটা মোটা হিসেবের ব্যাপার,—যেমন রাগের বোধ, অনুরাগের বোধ ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগের ফলে এইসব বোধের স্বাদ যে পরস্পর ব্যবহিত, সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক রীতি-নাম হিসেবে এরকম শ্রেণীনাম নামমাত্র ব'লে মনে হয় না কি? ১৯১৩ সালে স্যর আর্থার কুইলার কাউচ্ 'On the Capital Difficulty of Prose' নামে তাঁর এক বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন—'Pray attend while I impress on you this most necessary warning. In studying literature, and still more in studying to write it distrust all classification!'

কথা উঠবে—নাম বাদ দিলে ব্যাখ্যার কাজ চলবে কী উপায়ে? নামের চেয়ে রূপ প্রত্যক্ষ। নাম তো সংকেতমাত্র। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-রচনার বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে দেখলে তাঁর গদ্যের রূপ দেখা যাবে। তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের ভূগোলের ভাষা কিংবা তাঁর অন্যান্য রচনার ভাষা কি শুধুই 'বর্ণনাত্মক' ও 'ব্যাখ্যানাত্মক' বললে প্রত্যক্ষ হবে? তাঁর গদ্য সম্বন্ধে সংবাদ হিসেবে ঐ দুটি শব্দই যথেষ্ট বটে, কিন্তু—"এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"—তাঁর ভূগোলের (১২৫৮) ভূমিকার এই বাক্যে ব্যাখ্যাও নেই, বর্ণনাও গৌণ,—যা আছে তা সংবাদ ও উপমা,—তৎসম শব্দের প্রাচুর্য,—সাধু রীতির প্রয়োগ। এই উদাহরণে এসব লক্ষণ প্রত্যক্ষ গোচর। দেবেন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগর

উভয়েই তাঁর রচনা যে প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন ক'রে দিতেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই অক্ষয়কুমার যে আত্মনির্ভরশীল সুলেখক হয়ে উঠেছিলেন, রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' থেকে তা জানা যায়। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' নামে বইখানিতে অধ্যাপক সুকুমার সেন এসব আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির কথা বলতে গিয়ে আদিতেই তিনি লিখেছেন—

> "পূর্ববর্তী গদ্যভঙ্গিতে বিভিন্ন ধরনের একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা গ্রথিত হইত। সুতরাং ভাবের বিরুদ্ধতার এবং বাক্যের ভারসাম্যহীনতার জন্য রচনা হইত নিতান্ত কর্কশ এবং লালিত্যহীন। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির লেখায় বাক্যের ভারসাম্যহীনতা কাটিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর আনিলেন লালিত্য ও নমনীয়তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্য লেখকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের বিশিষ্ট রীদ্‌ম্‌ বা তালটি ধরিতে পরিয়াছিলেন। পদ্যের মত গদ্যেরও একটা নিজস্ব ছন্দ বা তাল আছে। বাক্যাংশের অর্ধসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসবায়ু মন্দীভূত হইয়া আসে, এবং তখনই গদ্যের তালে যতি পড়ে। প্রত্যেক ভাষায় গদ্যের যতির রূপ বিভিন্ন। বাঙ্গালা গদ্যের নিজস্ব যতি অনুসারে বিদ্যাসাগর সাহিত্যের ভাষায় সজ্ঞান ভাবে সুষম বাক্যগঠনরীতি প্রবর্তন করিলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখকদিগকে রচনায় সুষম বাক্যগঠনরীতি যে একেবারে মেলেনা তাহা নহে, কিন্তু সে লেখকরা এ বিষয়ে সজ্ঞান বা সাবহিত ছিলেন না।"

অক্ষয়কুমারের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির গদ্য-রীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির অধিকাংশক্ষেত্রেই বিশেষ পার্থক্য নেই। এই মন্তব্যটি আগ্রহী পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে বিদ্যাসাগর 'অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর' থেকে ভাষাকে মুক্ত ক'রে গেছেন,—গদ্যকে 'সর্বব্যবহারযোগ্য' ও 'শোভন' করেছেন, পদগুলির মধ্যে অংশযোজনায় সুনিয়ম স্থাপন করেছেন এবং—'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী' করে গেছেন।

এ মত নিঃসন্দেহে মাননীয়।

বিষয় ও লক্ষ্য—এই দুই দিকে নজর রেখে গোপাল হালদার মশাই তাঁর পূর্বোক্ত ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের "শিক্ষাবিষয়ক রচনা, সমাজসংস্কারমূলক রচনা এবং সাহিত্য ও বিবিধ রচনা"—এই শ্রেণীগুলি উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—

> "সাহিত্যসৃষ্টি বিদ্যাসাগরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। সে উদ্দেশ্য একেবারে অনুপস্থিত ছিল, তাও নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য, সহায়ক পদ্ধতি। তিনি জানতেন—প্রাঞ্জল মার্জিত বাঙলা না হলে পাঠ্যপুস্তক অপাঠ্য। অবশ্য 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি সাহিত্যরচনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলা উচিত।"

এই 'প্রভৃতি'-র বিশদ পরিচয় দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের মোট সাতখানি বইয়ের উল্লেখ করেছেন—(১) 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭); (২) 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩); (৩) 'শকুন্তলা' (ডিসেম্বর, ১৮৫৪); (৪) 'সীতার বনবাস' (১৮৬০); (৫) 'ভ্রান্তিবিলাস' (ডিসেম্বর, ১৮৬৯); (৬) 'বিদ্যাসাগর চরিত' (সেপ্টেম্বর, ১৮৯১), এবং 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' ('সাহিত্য' ১৮৯২)।

বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে (১৮৪৭) ভাষার ত্রুটি ছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু সে বই দুর্লভ। পরবর্তী সংস্করণই এখন পরিচিত। সে যাই হোক, এই সাতখানি বই থেকে অতঃপর বিদ্যাসাগরের গদ্যের কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে—

> (১) হেমকূট নগরে, বিষ্ণুশর্মা নামে, পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় আসক্ত হইল; এবং ক্রমে ক্রমে, পিতার সর্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া, পরিশেষে, অর্থের নিমিত্ত, তস্কর-বৃত্তি অবলম্বন করিল। তখন বিষ্ণুশর্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। [১৭শ উপাখ্যান : বেতালপঞ্চবিংশতি]
>
> (২) সংস্কৃতভাষায় গদ্যসাহিত্যগ্রন্থ অধিক নাই। যে কয়েক-খানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদম্বরী সর্বশ্রেষ্ঠ। কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত।
> [কাদম্বরী : সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব]
>
> (৩) তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া

রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতদের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। অনসূয়া কহিলেন, সখি! এ বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনে থাকুক, কোনও মতে কর্ণান্তর করা হইবেক না; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না; প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ সলিলে নবমালিকার সেচন করে? [শকুন্তলা : চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

(৪) রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণী তীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

[সীতার বনবাস : ১ম পরিচ্ছেদ]

(৫) লাবণ্যময়ীর প্রার্থনা শ্রবণে বিজয়বল্লভ সহাস্য বদনে বলিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আজ আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছি, জন্মাবচ্ছেদে কখনও তাদৃশ আনন্দের অনুভব করি নাই; এবং উত্তরকালেও যে কখনও আর তদ্রূপ আনন্দলাভ ঘটিবেক, তাহা সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। [ভ্রান্তিবিলাস : শেষাংশ]

(৬) পিতামহদেবের দেহত্যাগের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজারনিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। [বিদ্যাসাগর চরিত : ২য় পরিচ্ছেদ]

(৭) বৎসে! কিছু দিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত

না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত।

[প্রভাবতী সম্ভাষণ]

এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে চতুর্থ ও সপ্তম—দুটিই বেশ অনুভূতিচিহ্নিত ও আবেগস্পন্দিত ; বাকি পাঁচটি নিরাবেগ বর্ণনা। বিস্তৃতভাবে খুঁটিয়ে দেখলে শব্দপ্রয়োগে কোনো কোনো কঠিন শব্দের প্রতি বিদ্যাসাগরের ঝোঁক দেখা যাবে, যেমন প্রথম উদাহরণে 'দুরোদর মুখে' ; সুকুমারবাবু যদিও লিখেছেন যে তাঁর রচনায় 'আভিধানিক শব্দের ব্যবহার…নাই বলিলেই হয়', তবু তিনি নিজেই 'বেতালপঞ্চবিংশতির' প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণ থেকে আস্যদেশ, বারযোষিৎ, প্রাড়্‌বিবাক, উৎকলিকাকুল, পুংশ্চলী, তন্তুবাপ, ডিণ্ডিম, কাদাচিৎক, মলিম্লুচ, নিকাম—এই শব্দগুলি তুলে দেখিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য রচনাতেও এই ধরনের শব্দের অভাব নেই। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, নীতিবোধ, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি ছাত্রপাঠ্য বইয়ে এই শ্রেণীর শব্দ নেই, কিন্তু 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' [১৮৭২ ৪র্থ সংস্করণ] বইখানি দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯১৪ সংবৎ) 'বিজ্ঞাপনে'র প্রথম দিকেই 'বুভুৎসুভাবে' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। এরকম শব্দ আরো পাওয়া যায়, তবে খুব বেশি যে নেই, সেকথা ঠিক। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রকৃতি দেখাতে গিয়ে সুকুমারবাবু আরো লিখেছেন—

"বিদ্যাসাগর তদ্ভব ক্রিয়াপদের স্থলে প্রায়ই তৎসম ভাববচন সংবলিত যুক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার রচনা অতটা গুরুগম্ভীর ঠেকে। যেমন গেলেন স্থলে "গমন করিলেন', হরিয়াছে স্থলে 'হরণ করিয়াছে', আনিতে স্থলে 'আনয়ন করিতে'। এইরূপ যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ভাষা কিছু ভারী হইলেও বাক্যের ওজস্বিতা ও মাধুর্য যে বাড়িয়াছে তাহা স্বীকার্য। -ইয়া প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার পরিবর্তে 'প্রযুক্ত', 'পূর্বক' পুরঃসর', 'অন্তর' ইত্যাদি শব্দযুক্ত ভাববচনের অত্যধিক ব্যবহার সেকালের লেখায় ছিল,

বিদ্যাসাগরের লেখায়ও আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও বিরল নয়।"

বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে 'তাহারদের', 'তোমারদের', 'অধিকৃতেরদের' 'পুত্রেরদের', 'কহিবাতে' (পরবর্তী সংস্করণে 'জিজ্ঞাসা করাতে') ইত্যাদি প্রয়োগ সেন মশাই লক্ষ্য করেছেন এবং ব্যাকরণগত আরো কোনো কোনো লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য-রীতি এইসব লক্ষণোল্লেখের মধ্য দিয়ে যতোটা প্রত্যক্ষ হয়, তার চেয়ে বেশি অনুভব করা যায় তাঁর মূল বইগুলি পড়ে দেখলে। তিনি যে মূলতঃ সাহিত্যিক ছিলেন না—রম্য রস বা জীবনানুভূতির রম্য প্রকাশের দিকে যে তাঁর রুচি ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিপরীত মেরুর শিল্পী। পরিণত বয়সের শূন্যতায় 'প্রভাবতী সম্ভাষণে' তাঁর আবেগ তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠ, লক্ষ্যসচেতন, তত্ত্বপ্রচারপরায়ণ মনের বাঁধ ভেঙ্গে ব্যক্ত হয়েছিল। আবার তাঁর কঠিন পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যের পাশাপাশি এক ব্যঙ্গবিদ্রূপসমর্থ তর্কবিজয়ী মনও কাজ করেছে—যার প্রকাশ 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত', 'অতি অল্প হইল' প্রভৃতি বেনামী রচনায় দেখা যায়। সেগুলির নমুনাও বিবেচ্য।

নব্য ন্যায়-চর্চার ফলে এদেশের রসবোধবর্জিত গদ্যভাষার ধারায় বিদ্যাসাগর যে সরসতা, সুবোধ্যতা, সাবলীলতা সঞ্চারের চেষ্টা ক'রে গেছেন, সে কথা পণ্ডিত-মহলে স্বীকৃত। তাঁর বিরোধী দুই দলের উল্লেখ ক'রে সুকুমার বাবুর নিবন্ধে বলা হয়েছে—'একদল সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদল একেলে ইংরেজনবীশ, শেষের দল অবশ্য সংখ্যাবহুল ছিল না।' এই শেষ দলের কথা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই সমালোচকরা করে থাকেন, যেমন সুকুমারবাবু সোজাসুজি লিখেছেন—'মোট কথা বিদ্যাসাগরের যশে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ঈর্ষ্যালু ছিলেন।' এটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র; এখানে একথার বিস্তার অনাবশ্যক।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি জানতেন যে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি বেনামী রচনাগুলি বিদ্যাসাগরেরই সৃষ্টি। গাম্ভীর্যের অন্তরে কৌতুকময় যে দ্বিতীয় সত্তার অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর, এগুলি তাঁর সেই সত্তার আত্মপ্রকাশ। এইসব রচনার কথা-প্রসঙ্গে গোপালবাবু লিখেছেন—'একই কালের কত সাধারণ সহজ উক্তি, প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান—এমন কি, সেদিনের

গ্রাম্য রসিকতায়ও তিনি মুখর।' এই সূত্রেই গদ্যরীতির এই অঞ্চলে রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে সংযোগসূত্রটি হালদার মশাইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার মন্তব্য থেকে ধরা যাবে—

> "সংস্কার-আন্দোলন বাদানুবাদ ছাড়া চলে না—আপনা থেকেই তা সাময়িক তর্কযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়—রামমোহন রায়ের সময় থেকেই তাই 'পলেমিক' লেখা বাঙলায় দেখা দেয়। অনেকের হাতে তা গালিগালাজে মাত্র পর্যবসিত হত। রামমোহনের লেখা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—কিন্তু তাঁর ভাষা তখনও লঘুগতি নয়। বাঙলা 'পলেমিক' রচনায় রামমোহন অপেক্ষাও বিদ্যাসাগর বেশি তৎপর, বেশি পটু।...স্বীকার করতে বাধা নেই, এদিনের রুচিতে আমরা তাঁর কোনো গল্প ও বিদ্রূপকে একেবারে নির্দোষ বলব না—(বঙ্কিমের তাই ছিল অভিযোগ, আর সে অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়।) তবে সেসব ব্যঙ্গও সেদিনের আসরের সমুপযোগী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।"

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত 'অতি অল্প হইল' থেকে বিদ্যাসাগরের এই পলেমিক রীতির একটু নমুনা দেখা যেতে পারে—

> 'যাহা হউক, খুড় কেমন সংস্কৃত লিখেছেন, ইহা দেখিবার জন্য, তাঁর পুস্তকের কিয়দংশ পড়িলাম; পড়িয়া, খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিলাম; দেখিলাম, স্মৃতিবিদ্যা, রচনাবিদ্যা, ব্যাকরণবিদ্যা, খুড় আমার তিন বিদ্যাতেই মূর্তিমন্ত। যদি আর আর বিদ্যাতেও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত। আমি তাঁর উপযুক্ত ভাইপো বটে, কিন্তু তাঁর মত বেহদ্দ পণ্ডিত নই।...খুড়র লেখা দেখিয়া, বোধ হইল, বাবাজী যত জারি করেন, লেখা পড়ায় তত দখল নাই। সংস্কৃত লিখিতে গিয়া, বিলক্ষণ ছরকট করিয়াছেন।'

'ব্রজবিলাসের' দ্বিতীয় উল্লাসের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কয়েকটি কথা—

> 'আমি পূর্বে কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই। একদিন ইচ্ছা হইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে, অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আসিব। তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলাম। অবারিত দ্বার, কেহ বারণ করিল না; একবারে উপরে উঠিয়া, তাঁহার ঘরে প্রবিষ্ট হইলাম; দেখিলাম লোকারণ্য। এক টেবিলের চারিদিকে, সাত আট জন বসিয়া আছেন; আর এক দিকে, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দাঁড়াইয়া আছেন।'

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রাঞ্জলতার দিকটি সকলেই উল্লেখ করেছেন। ১৩১১ সালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষায় লেখক' প্রকাশিত হয়। তাতেও দেখা যায়—'ইনিই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন।' কিন্তু প্রাঞ্জলতাই তাঁর গদ্যরীতির একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর গদ্যধারা সম্বন্ধে বিষয়ের সংকীর্ণতার অভিযোগও ঠিক নয়। এই কথা জানাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাই বিশেষভাবে মনে পড়ে। সংকীর্ণতার অভিযোগ তিনি ঠিক বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে করেন নি,—সাধারণভাবে সেকালের বাংলা গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধেই এই উল্লেখটি বুঝতে হবে। মৌলিক সৃষ্টিধর্মী গদ্য রচনার প্রতি যাতে লেখকদের রীতি বৈচিত্র্যের দিকে আরো উৎসাহ বাড়ে, সেই আগ্রহবশেই বঙ্কিম সেকথা লিখেছিলেন। প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়েই বিদ্যাসাগরের বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন,—

> "গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিক্ষুব্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্বমত সংকীর্ণ পথেই চলিল।"

বিদ্যাসাগরের নিজের লেখার রীতিগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সজাগ ছিলেন না, একথা ঠিক নয়—একথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না। বর্তমান আলোচনায় তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে সেই বৈচিত্র্যের কিছু কিছু উদাহরণ দেখা গেল। জীবনের শেষ অধ্যায়ে লেখা তাঁর মর্মস্পর্শী একখানি চিঠির গদ্যও এই সূত্রে দেখা যাক—১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল,—নিজের মাকে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন—

> "নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি।…

'সংসৃষ্ট' শব্দটি বুঝতে বিদ্যাসাগর-জননীর নিশ্চয় কোনো অসুবিধা হয়নি। বিদ্যাসাগরের সেকালের বোধগম্য প্রাঞ্জল রীতিতেই এই সব চিঠিপত্র লিখেছেন। এই চিঠিতেই 'আপনার', 'আপনকার' দু রকম রূপই বিদ্যমান। তাতেও প্রাঞ্জলতা বিঘ্নিত হয় নি।

প্রাঞ্জলতা সরলতারই প্রতিশব্দ। বোধ হয়, প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের সঙ্গে তার যোগ কম,—শান্ত বিচারবুদ্ধিরই তাতে প্রাধান্য। কিন্তু তা নিরাবেগ নয়। বিদ্যাসাগর তাঁর আপন কালের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং মানব-সংসারের শুভ সাধনের শক্তিতে,—নির্মল বিচার-বুদ্ধির তাড়নায় বাংলা গদ্যের ধারায় আত্মপ্রকাশ ক'রে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা'—তখন পূর্বগামী রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির নাম তিনি নিশ্চয় বিস্মৃত হননি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য যে অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, সেই ধারণার নীচে তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'প্রাঞ্জল' কথাটির ইঙ্গিত বিদ্যাসাগরের 'ঋজুপাঠ—তৃতীয় ভাগের' 'বিজ্ঞাপনে'র একটি উক্তিতে পাওয়া যায়। সেই উক্তিটি হোলো—'বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত গ্রন্থ; পাঠমাত্রেই অর্থপ্রতীতি হয়।' বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের যাবতীয় রচনায় এই 'পাঠমাত্রেই অর্থপ্রতীতি'র দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রথম প্রকাশের পরবর্তী সংস্করণ থেকেই এই লক্ষ্যের দিকে তাঁকে বিশেষ অবহিত থাকতে দেখা গেছে। প্রাঞ্জল বাংলা প্রাবন্ধিক গদ্যের তিনি অন্যতম প্রবর্তক। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-প্রবর্তনা ইত্যাদি তাড়নার সঙ্গে কথাসাহিত্য রচনার ঝোঁক যদি তাঁর অন্তরে দেখা দিতো, তাহলে বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তাঁর আরো কীর্তি থাকতো। গদ্যের ধারায় তিনি যা সৃষ্টি ক'রে গেছেন, সে তো তাঁর নিজের নামাঙ্কচিহ্নিত একটি স্থির মুদ্রা মাত্র নয়,—সে এক অশেষ সচলতার বেগ। সেই সম্ভাবনার প্রাঙ্গণেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিদ্যাসাগরের 'অতিথি' বলে গেছেন। সরল বর্ণনাত্মক গদ্য,—বিতর্কের গম্ভীর গদ্য, আবার ব্যঙ্গদিগ্ধ গদ্য,—কোথাও বা অনুভূতির গদ্য—চার রকম গদ্যেই তিনি ছিলেন সিদ্ধ সাধক। রামমোহনের আমলের পরে যথার্থ আধুনিক গদ্যের সূচনা ঘটেছিল বিদ্যাসাগর-পর্বেই। ইংরেজি ভাষার আধুনিক গদ্যের পুরোধা যেমন ড্রাইডেন; বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তেমনি বিদ্যাসাগর।

আশিস মজুমদার

ভবভূতির উত্তরচরিত এবং বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস

॥ ১ ॥

আমি ভবভূতিকে ভালো চিনতুম না। ওঁর সম্বন্ধে শুধু এটুকু শুনেছিলুম উনি ভালো সংস্কৃত নাটক লিখতে পারতেন। অবশ্য ওঁর একটি বচন খুব ছোটবেলাতে আমার এক মাষ্টার মশাইয়ের মুখে প্রায়ই শুনতাম—

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥

শুনে ভবভূতি লোকটার 'পরে আমার কেমন যেন একটা ভয় এবং শ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে যে লোক আগ বাড়িয়ে বড় গলায় অমন কথা বলতে পারেন তিনি যে যুগপৎ অহঙ্কারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। লোকটির সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু আমার জানা ছিল না। অর্থাৎ উনি যে সপ্তম শতাব্দের লোক, বিদর্ভের পদ্মপুর গ্রামে জন্মেছিলেন, কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের সভায় বসে নাটক-টাটক লিখতেন—এসব কিছুই না জেনে আমি খাসা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলুম। বছরখানেক আগে, একদিন বাড়িতে বসে Romeo Juliet পড়ছিলুম। সংস্কৃত সাহিত্যে ডকটরেট এক বান্ধবী সেদিন আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। কথায়-কথায় বললেন, Romeo Juliet-এর মত সস্কৃতভাষায় একটা নাটক আছে—মালতীমাধব। পড়েছ? বললুম—না তো?—পড়ে দেখো, ভালো লাগবে। বান্ধবীর কথাটা আমার মনে লাগলো। পরদিনই লাইব্রেরী থেকে এক কপি মালতী মাধব এনে পড়তে বসলুম। পড়ে-শুনে আমি তো রীতিমত মুগ্ধ। বুঝলুম ভবভূতির কেন এত Vanity ছিল। কেন উনি Thucydides-এর মত বুক বাজিয়ে বলতেন: My work is not a piece of writing designed to meet the taste of an immediate public, but was done to last for ever.

মালতী-মাধব শেষ করেই আমার ইচ্ছে হোলো—উত্তরচরিতটা পড়ে নিলে কেমন হয়? কিন্তু মফঃস্বলের লাইব্রেরীতে বইটা পাওয়া গেল না।

অগত্যা গাঁটগরচা দিয়ে বইটা কিনেই ফেললাম। অবশ্য বিদ্যাসাগরের এডিশানটা পাওয়া গেল না। তা হোক, যাঁদের এডিশান পেলাম, তাঁরা দাবি করেছেন যে, তাঁরা এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন। এই উত্তরচরিত পড়তে পড়তেই আমার মাথায় একটা প্ল্যান এলো। প্ল্যানটা কী, তাহলে খুলেই বলি। আমার কাছে ঢাকঢাক-গুড়গুড় পাবেন না। আমি মশাই সোজা কথার মানুষ। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানেন 'সীতার বনবাস' বাংলা অনার্সে পাঠ্য হয়েছে। এখন, সীতার বনবাসকে উত্তরচরিতের সঙ্গে জড়িয়ে 'পার্ট ওয়ানের বাংলা অনার্সের সুকুমারমতি ছাত্রদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া' যদি একটা কিছু লিখে ফেলা যায়, তাহলে সে-লেখা যত অপাঠ্যই হোক, 'পাঠ্য' সীতার বনবাসের কল্যাণে ঠিক বাজারে বিকিয়ে যাবে। এবং 'আমিও আমার পরিশ্রম সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব'।

॥ ২ ॥

উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় নন্দ্যান্তে সূত্রধার এসে বললেন, এবমত্রভবন্তো বিদাঙ্কুর্বন্তু—অস্তি তত্রভবান্ কশ্যপঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণতত্ত্বজ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ।

এই দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন ভবভূতির উপাধি ছিল 'শ্রীকণ্ঠ'। ওঁর মায়ের নাম জাতুকর্ণী। উনি কাশ্যপ গোত্রের লোক। ভবভূতির লেখা আর একটি বই বীরচরিতের ভূমিকায় আছে—'অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্'। এবং 'মালতী মাধবে' আছে—দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু'। এসব দেখেশুনে বিদ্যাসাগর থেকে Macdonall সাহেব পর্যন্ত অনেকেই ধরে নিয়েছেন ভবভূতির বাড়ি ছিল দক্ষিণাপথের বিদর্ভের অন্তর্গত পদ্মপুর গ্রামে। আর ঐ দুটি প্রস্তাবনা থেকেই জানা যাচ্ছে যে ভবভূতির বাবার নাম নীলকণ্ঠ এবং ঠাকুরদার নাম ভট্টগোপাল।

ভবভূতি কবেকার লোক এ সম্বন্ধে ঝট করে কিছু বলা মুস্কিল। বিদ্যাসাগর মশাই বলেছেন, 'তিনি কোন্ সময়ের লোক তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি সহস্র বৎসরের কিছু পূর্বে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে বলেছেন—

কবির্বাকপতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্ ॥

কল্‌হনের কথার খেই ধরে অনেকে অনুমান করছেন ভবভূতি কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন এবং সম্ভবত সপ্তম শতকের লোক।

ভবভূতির মোট তিনটি বই। বীরচরিত, উত্তরচরিত এবং মালতী-মাধব। এর মধ্যে বীরচরিত ভবভূতির প্রথম নাটক। নাম শুনেই বোঝা যায় ওটা বীররসের বই। উত্তরচরিতের মত এটিও রামায়ণ নিয়ে লেখা। রামের বিবাহ থেকে রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনাবলী এ নাটকে আছে। বাল্মীকিকে অনুসরণ করলেও ভবভূতি সর্বদাই যে বাল্মীকিকে মান্য করে চলেছেন এমন নয়। বাল্মীকি-রামায়নের যে সব বিষয় ওঁর মনে ধরেনি, সে সব বিষয় উনি তাঁর নাটকে পছন্দমাফিক পরিবর্তন করে নিয়েছেন। আসলে রামচন্দ্রের প্রতি ভবভূতির দুর্বলতা ছিল। রামায়ণে রামের যেসব দোষত্রুটি দেখানো হয়েছে, ভবভূতি সেগুলোকে যথাসম্ভব ঢেকে-ঢেকে, অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। এইজন্যে, তিনি তাঁর এই নাটকে রামের বনবাসের পুরো দায়িত্ব কৈকেয়ীর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। বাল্মীকি-রামায়নের রামচন্দ্র বালিকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন। ভবভূতি কিন্তু তাঁর বীরচরিত নাটকে দেখাতে চেষ্টা করলেন যে বালিকে রাম সম্মুখযুদ্ধেই নিহত করেছেন। বীরচরিত সাত অঙ্কে লেখা—চরিত্র সংখ্যা অজস্র।

বীরচরিত সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি বলতে আমার ভয় করছে। কারণ ও বইটা আমি পড়ি নি। পড়িনি কী বলছি, চোখেই দেখে নি।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা মালতী-মাধব ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু মিষ্টি প্রেমের গল্প বলেই নয়, এ নাটকে ভালো লাগবার মত বহু জিনিষ আছে। শৃঙ্গাররস, হাস্যরস এবং ভয়ানক রসের এক বিচিত্র ককটেইল এই নাটক। মালতীর সঙ্গে মাধব একাই প্রেমে পড়ে নি, আমরা পাঠকেরাও অনেকে মালতীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি। স্কটের Rob Roy পড়ে একজন বলেছিলেন, নায়িকা Di Vernon-এর সঙ্গে যে পাঠক প্রেমে না পড়বে সে অতি হতভাগা। মালতী সম্বন্ধে আমারও তাই ধারণা। শুধু Romeo Juliet কেন বহু বাংলা এবং ইংরেজি উপন্যাসের সঙ্গে মালতীমাধবের মিল আছে। বাবার পছন্দমত ছেলেকে মেয়ে বিয়ে করতে চাইছে না, এতো যেকোনো যুগের যেকোনো সমাজের পক্ষেই সত্য। তবে ভবভূতির ঐ এক দোষ—ভাষা বড্ড খটমটে। সমাস-সন্ধির ঝামেলা তো আছেই, তার ওপর শব্দগুলোও ঠিকমতো সাজানো হয় নি। বিশেষ করে মালতীমাধবের ভাষা যেন সবচেয়ে কঠিন। হাতের কাছে ইংরেজি অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও জায়গায় জায়গায় মালতীমাধব আমি ভালো বুঝতে পারি নি।

॥ ৩ ॥

উত্তরচরিত নাটক। সীতার বনবাস গদ্যকাহিনী। অথচ আশ্চর্যের কথা, সীতার বনবাসের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের প্রায় হুবহু অনুবাদ। সামান্য এদিক-ওদিক আছে। কিন্তু তবু বলা যায়, সংকল্পধর্মী একটি রচনাকে তার প্রায় সবদিক বজায় রেখে বিদ্যাসাগর মশাই বিবরণাত্মক একটি কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন। সংলাপ বা বাদপ্রতিবাদের উত্তাল গতাগতিকে তিনি একটি নিস্তরঙ্গ ধীর প্রবাহে পরিণত করেছেন। এই জন্যেই উত্তরচরিতের প্রস্তাবনা এবং সীতার বনবাসের সুরুটা একটু আলাদা রকমের। উত্তরচরিতের প্রথমে আছে নান্দী বা ঐ জাতের একটা শ্লোক। তাতে কবি পূর্বগামীদের নাম স্মরণ করেছেন এবং তাঁর মনস্কামনা যাতে সিদ্ধ হয় সেজন্যে প্রার্থন করেছেন। তারপর শন্দ্যান্তে এলেন সূত্রধার। তিনি বললেন, বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আজকাল প্রিয়নাথের যাত্রা উৎসবে উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি যে, ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকটি অভিনীত হবে। এবং ধরা যাক, আমরা সবাই লঙ্কাযুদ্ধোত্তর অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হয়েছি। তারপর নট এসে মঞ্চে উপস্থিত হোলো। সে এসে কাহিনীর চুম্বকটি ধরিয়ে দিল। বললো, কৌশল্যা, কৈকেয়ী এঁরা সবাই ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ দেখতে অযোধ্যার বাইরে গেছেন। সীতা গর্ভবতী এবং লোকে সীতার সম্বন্ধে অপবাদ দিচ্ছে। প্রস্তাবনা শেষ হোতে সূত্রধার এবং নট চলে গেলো। রাম এবং সীতা মঞ্চে প্রবেশ করলেন। শাশুড়ীরা সবাই চলে যেতে সীতা যেন একটু মনমরা। সেই নিয়ে রামের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছিল। এমন সময় কঞ্চুকী এসে জানালো—অষ্টবক্র এসেছেন দেখা করতে।

সীতার বনবাসে নান্দীর কোনো ব্যাপার নেই। সূত্রধার এবং নটের কথাবার্তায় আমরা যে কাহিনী-চুম্বকটা পেয়েছি, বিদ্যাসাগর তাকে গল্পের ভূমিকা বা উপক্রমের মত বলে গেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদটি বিদ্যাসাগরের একেবারে নিজস্ব। ভবভূতি যেখানে রামের রাজ্যাভিষেকের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত দিয়েছেন, বিদ্যাসাগর সেখানে তাঁর রাজ্যপরিচালনা, প্রজাপালন এসবের কথাই বেশি করে বলেছেন। এবং ভবভূতির 'তদনুরোধাৎ কঠোরগর্ভামপি বধূং জানকীং বিমুচ্য গুরুজনস্তত্র গতঃ' এই বাক্যের বিনিময়ে বিদ্যাসাগর প্রায় আট/দশ লাইন ব্যয় করেছেন।

হঠাৎ মনে হোতে পারে বিদ্যাসাগরের মত স্বল্পভাষী লোক সীতার বনবাসের সুরুতেই এত কথা খরচ করছেন কেন? এর কারণ দুটি। প্রথমতঃ

সীতার বনবাসে বিদ্যাসাগর মশাই গল্পের মেজাজ আনতে চেয়েছিলেন। এবং কথা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁকে পূর্বকথা বেশ বিস্তৃত করে বলতে হয়েছিল। আর একটা ব্যাপার হোলো, সংস্কৃতের তুলনায় বাংলাভাষা একটু যেন আলগা বা শিথিল। সমাস-সন্ধির গুণে সংস্কৃত ভাষা যেমন জমাট বেঁধে থাকে, বাংলায় সেই জমাটি ভাবটা নেই, আরও একটা কথা। বিদ্যাসাগর এবং ভবভূতির মনমেজাজ সম্পূর্ণ আলাদা। ভবভূতির তুলনায় বিদ্যাসাগরের লেখা অনেক সাজানো-গোছানো; প্রাঞ্জল এবং ঝরঝরে। উত্তরচরিত কিছুটা যেন Clumsy, জটপাকানো। সীতার বনবাসের চেহারা যেমন একহারা, উত্তরচরিত তেমন নয়। কতকটা জবরজংগোচের।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর ভবভূতির ভাব-ভাষা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অনুবাদ জিনিষটা এমনই যে কথার কথা অনুবাদ প্রায়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর সম্ভব হলেও সেটা এমনই উৎকট চেহারা পায় যে পড়তে গেলে 'কেরির বাইবেল' বলে মনে হয়। সেইজন্যে বিদ্যাসাগর মশাই যেখানে হুবহু ভবভূতিকে অনুসরণ করেছেন, সেখানেও দুটি একটি শব্দ যোগ করে, একটি-দুটি শব্দ বাদ দিয়ে, বাক্যের প্রধান অংশ এবং উপবাক্যগুলোকে এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে গিয়ে অনুবাদকে স্বাভাবিক করার প্রয়াস পেয়েছেন। উদাহরণ দিচ্ছি :

রামঃ—নির্বিঘ্নঃ সোমপীতী আবুত্তো মে ভগবান্
ঋষ্যশৃঙ্গঃ আর্যা চ শান্তা ?

বিদ্যাসাগর লিখছেন, রাম জিজ্ঞাসিলেন ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল ? তাঁহার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ? বিনাবাধায় সোমরসপানের ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বিদ্যাসাগরের রাম 'নির্বিঘ্নে যজ্ঞসম্পন্ন' হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। ভবভূতির সীতা জিজ্ঞাসা করছেন, অস্মহে বা স্মরই, বিদ্যাসাগরের সীতা জিজ্ঞেস করলেন—তাঁহারা আমাদিগকে মনে করেন, না একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন ? তারপর

অষ্টাবক্র : (উপবিশ্য)—অথ কিম্। দেবি ভগবান বশিষ্ঠস্ত্বামাহ—
বিশ্বম্ভরা ভগবতী ভবতীমসূত
রাজা প্রজাপতিসমো জনকঃ পিতা তে।

বিদ্যাসাগর লিখলেন, অষ্টাবক্র সকলের কুশলবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, সমুচিত

সম্ভাষণপূর্বক, জানকীকে বলিলেন দেবী! ভগবান বশিষ্টদেব আপনারে বলিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন; সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা। সবই ঠিক আছে। কেবল বিদ্যাসাগর যোগ করেছেন, 'সকলের কুশলবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া'।

আসলে অনুবাদ মানে তো শুধু ভাষান্তর নয়, আর ভাষা বলতে কোনো যান্ত্রিক শব্দসমষ্টিকেও বোঝায় না। ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আরও অনেক কিছু। কোনো গ্রন্থ অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদককে এসব কথাও স্মরণ রাখতে হয়। যেমন ভবভূতির নাটকে চিত্রদর্শন অংশে আছে:

সীতা— বচ্ছ ইঅংবি অবরা কা?

লক্ষ্মণ (সলজ্জস্মিতমপবার্য)—অয়ে উর্মিলাং পৃচ্ছত্যার্যা।

ভবতু অন্যতঃ সঞ্চারয়ামি।

বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে অনুবাদ করলেন, সীতা বুঝিতে পরিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে উর্মিলার দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন···। এখানে কিছু অসুবিধে নেই। বাঙালীর পরিবারজীবনের সঙ্গে দৃশ্যটি খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু রাম যেখানে নিদ্রিতা সীতাকে ত্যাগ করে যাবার আগে—সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা, সীতার চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করলেন, সেখানে বিদ্যাসাগর কী করবেন? রামের মত অবস্থায় পড়লে উনিশ শতকের বাঙালী স্বামীদেবতারা কী করতো? স্ত্রীর পা দুটো মাথায় তুলে নিত? বাধ্য হয়ে বিদ্যাসাগর মশাই ওটুকু বাদ দিয়ে দিলেন। একটু ঘুরিয়ে লিখলেন, এই বলিয়া, গলদশ্রুনয়নে, বিশ্রাম-ভবনে গমনপূর্বক, রাম নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক······ইত্যাদি। অর্থাৎ সীতার পা মাথায় না রেখে বসে তাঁর সামনে জোড়হাত করলেন! ঠিক এইজন্যই রামসীতার বিশ্রম্ভালাপের দৃশ্যে ভবভূতির ভাষা যেমন সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, বিদ্যাসাগরের ভাষা তেমন নয়। কিছুটা যেন কৃত্রিম। আসল কথা হচ্ছে, অনুবাদ করতে বসেও বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশকে একেবারে ভুলতে পারেন নি।

অনুবাদ যে কখনো মৌলিক রচনাকে ছাড়িয়ে যায় এমন কথা কোথাও শুনিনি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের অন্ততঃ দুটি বাক্য যে

ভবভূতির মূল রচনাকে অতিক্রম করে গেছে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সীতার বনবাসের সেই দুটি লাইন আমাদের সকলেরই প্রায় মুখস্থ আছে :

এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবন গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

এরপর ভবভূতির বর্ণনা :

অয়মবিরলানোকহানিবহনিরন্তর স্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্য
পরিণদ্ধ গোদাবরীমুখরকন্দরঃ
সন্ততমভিষ্যন্দমানমেঘদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ

প্রস্রবনো শম, পড়ে বাঙালী পাঠকের মন অন্তত ভরবে না।

॥ ৪ ॥

উত্তরচরিতের সবটাই বিদ্যাসাগরের কাজে লাগে নি। ঐ নাটকের প্রথম অঙ্কটি কেবল তিনি সীতার বনবাসের জন্যে ব্যবহার করেছেন। সীতার বনবাসের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেই নিয়েছেন—'এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে।' উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের ঘটনাগুলোকে বিদ্যাসাগর মশাই দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে শুধু আলেখ্যদর্শন আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাদবাকী রাম ও সীতার দাম্পত্য আলাপ, সীতার নিদ্রাবেশ, দুর্মুখের সংবাদ আনয়ন, রামের বিলাপ ইত্যাদি সব রয়েছে। যদিও বিদ্যাসাগর এবং ভবভূতি উভয়েরই আলোচনার বিষয় রামায়ণের উত্তরকাণ্ড এবং ভবভূতির নাটক সাত অঙ্ক দীর্ঘ, তথাপি তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই বিদ্যাসাগর ভবভূতিকে বর্জন করেছেন। এবং সীতার বনবাসের পরবর্তী ছয়টি পরিচ্ছেদ তিনি ভবভূতির সাহায্য ছাড়াই লিখে গেছেন। ভবভূতিকে পত্রপাঠ বিদায় দেওয়ার কারণ

বোধহয় এই যে, ওঁর নাটকে অতিলৌকিক এবং আজগুবি কাহিনীর বড় বাড়াবাড়ি। যেমন উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে আছে পঞ্চবটী বনে সীতা রামের সামনে অদৃশ্যভাবে ঘোরাফেরা করছেন। রাম তাঁকে দেখেও দেখছেন না। ওর ওপর আবার সপ্তম অঙ্কে শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের মতন নাটকের মধ্যে নাটক উপস্থিত করা হয়েছে। ব্যাপারটা এই রকম। বাল্মীকির নির্দেশে সীতার শেষ পরিণাম রামচন্দ্রের সামনে অভিনয় করে দেখানো হোলো। সীতার পাতাল প্রবেশের অভিনয় দেখে রামচন্দ্র ভাবলেন সত্যি বুঝি সীতা পাতালে চলে গেলেন। তাই-না ভেবে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন আসল সীতাকে রামচন্দ্রের সামনে নিয়ে আসা হোলো। এবং

সীতা (সসম্ভ্রমমুপসৃত্য রামং স্পৃশন্তী)—

সমসমসিহ্ন অজ্জউত্তো।

সত্যিকারের সীতাকে দেখে রাম জ্ঞান এবং সান্ত্বনা ফিরে পেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর সীতার বনবাসে এ ধরণের উদ্ভট ব্যাপারকে স্থান দেন নি। তিনি সীতার কাহিনীকে যথাসম্ভব বাস্তবিক এবং স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি সীতার পাতালে প্রবেশের মত ঐতিহ্যানুসারী স্বতঃপ্রমাণ বিষয়কেও বিদ্যাসাগর প্রামাণিক এবং বিশ্বাস্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাই বিদ্যাসাগরের সীতা রামের কঠিন বাক্য শুনে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হোলো। খামোকা পাতালে যাবার আর দরকার হোলো না।*

* এই লেখাটা লেখবার আগে আমি সারদারঞ্জন রায়, ইন্দ্রমিত্র, Keith, ভাণ্ডারকর, Macdonal, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এঁদের কিছু কিছু লেখা পড়ে নিয়েছিলুম।

শ্রীমন্তকুমার জানা

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

"কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়—মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বহিঃরঙ্গের দিক্ থেকে বাঙালী জাতির প্রতি একটু রূঢ় হতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের যে সুবিস্তীর্ণ ইতিহাস, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মময় জীবনের চরিত্র মাহাত্ম্য পর্যালোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত মন্তব্য সত্যের যথার্থ গৌরবে দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে তথাকথিত যে রেঁনেসাস বা নবজগারণের উদ্ভব ঘটে তার লক্ষ্য ছিল ঐতিহ্যচেতনা ও নবোন্নয়ন। ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা ও শিল্প প্রভৃতি নানা দিকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার উদ্যম চলতে থাকে। এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, য়ুরোপে যেমন, তেমনি আমাদের দেশেও নবজাগরণের ভাবগত মৌল বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু যাচাই করে নিয়ে সর্বপ্রকার কুসংস্কার, অবিচার, অত্যাচার ও অসত্যের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মানবিকতার অধিকারকে স্বীকার করতে হবে—এই হচ্ছে নবজাগরণের বাণী।

সৃষ্টিশীলতা দিয়েই মানবিকতাকে বুঝতে হবে। সৃষ্টি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে—আবার সৃষ্টি সমাজের সমষ্টিগত মানুষের দিক্ থেকেও বটে। যদি ব্যক্তি কিংবা কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাদর্শ দেশের নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে জীবনের সর্বস্তরে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ না পায়—তবে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই স্বল্পকালের মধ্যে তার প্রভাবক্রিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশী।

বিদ্যাসাগর ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন বড় হিউম্যানিষ্ট। তিনি নবজাগরণজাত সমস্ত চিন্তাদর্শকে নানা জনহিতকর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে সমাজে সকল মানুষের মধ্যে প্রসারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমস্ত চিন্তা সৃষ্টি ও কর্মপ্রচেষ্টার মূলে সক্রিয় ছিল তাঁর চরিত্রধর্ম—তাঁর অক্ষয়

পৌরুষ ও উদার মনুষ্যত্ববোধ। অন্তরের এই বৃহৎ মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে বিদ্যাসাগর বাঙালী হয়েও চিরকালের মানুষ। প্রকৃত মানুষের ধর্ম বলতে যা বুঝায় বিদ্যাসাগর সেই আদর্শের প্রতিভূ। বিদ্যাসাগর একদিকে যুগন্ধর পুরুষ ও অন্যদিকে চিরকালের মানুষ। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের এই চরিত্ররূপই বার বার ধরা পড়েছে।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রথম রচনা 'বিদ্যাসাগর চরিত' (ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২) এই প্রবন্ধে জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রথিত হয় নি। বিদ্যাসাগরের জীবনের যে সমস্ত ঘটনা তাঁর অন্তর্নিহিত বৃহৎ মনুষ্য প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত করে কবি সেগুলিরই পর্যালোচনা করেছেন।

কবির মতে বিদ্যাসাগরের পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্য বা অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বস্তু। এই চরিত্রমাহাত্ম্য আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। একটা জাতির আত্মপ্রকাশ ও আত্মসাধনার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত ভাষাসম্পদ। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলাভাষার সাংগঠনিক সৌষম্য রূপ ছিল না বললেই চলে। বিদ্যাসাগর ভাষাকে বৈয়াকরণিক গঠন পারিপাট্যে সুপরিচ্ছন্নতা দান করেন। শুধু এই নয়, বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা ভাষা ধ্বনি সামঞ্জস্য ও ছন্দস্রোতের পরিপূর্ণতায় শিল্পসৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে উঠল। এটাই বিদ্যাসাগরের অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন—এই একটি মাত্র বাক্যে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভার যে মূল্যায়ণ করেছেন তা যথার্থত বটেই—পরন্তু এই উক্তি গভীর তাৎপর্যবাহী। পূর্ববর্তী বাংলাগদ্যের সঙ্গে তুলনায় বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষা যে কিরূপ শিল্প সৌকর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে এবং এদিক থেকে তিনি যে বাংলাগদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একজন যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক—তা যথেষ্ট অলোচনা সাপেক্ষ।

যাহোক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চরিত্র মহত্বকে প্রতিভার ঊর্ধ্বে স্থান দিলেন।—

"প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। ‥ চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।"

কবির মতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রমাহাত্ম্যের মধ্যে Originality বা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিদ্যমান।—

"অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে *ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎব্যক্তিরা এই নিজত্ব* প্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক, অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর।"

বেশে-ভূষায়, পোষাকে পরিচ্ছদে. আচার ব্যবহারে বিদ্যাসাগর বাঙালী-জাতিরই একজন। কিন্তু নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মনির্ভরতায় বিদ্যাসাগর সমকালীন কর্মকীর্তিবিহীন অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের থেকে অনেক দূরবর্তী। এই গুণগুলি য়ুরোপীয় মনীষীদের চরিত্রধর্ম বলে বিদ্যাসাগরকে য়ুরোপীয় বলা যেতে পারে। কিন্তু যথার্থ বিচারে এগুলি স্থানকাল পাত্রের উর্ধে চিরন্তন মুক্ত মানব সত্তারই আদর্শ।

ক্ষুদ্রকর্মা, ভীরু হৃদয়ের দেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এক রহস্যময় ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন পারিবারিক জীবনে বিদ্যাসাগরের চরিত্র গঠনের উপযোগী প্রচুর মহত্বের উপকরণ বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের চরিত্রে ছিল অনমনীয় দৃঢ়তা, ও অকপট সারল্য। বলিষ্ঠ উন্নত চরিত্র, সদাহাস্যপরায়ণ তর্কভূষণের এই গুণগুলি বিদ্যাসাগরের চরিত্রগঠনে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই।—

"এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সে চরিত্র মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিরতিশয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন। পিতৃদেবের আত্মনির্ভরশীলতার আদর্শ বিদ্যাসাগরের মনোজীবন গঠনে প্রভূত সহায়তা করেছে।

বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী স্নেহ করুণা ও দয়াশীলতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। দুঃখ-দারিদ্র্য মোচন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের দ্বারা যে মনুষ্য সেবা সম্পাদিত হয়, তাকে তিনি দেবপূজা বলেই মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে মহৎনারীর ইতিহাস তাঁর পুত্রের চরিত্রে রচিত হতে থাকে।

যা হ'ক কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বারা বিদ্যাসাগর ছাত্রজীবনে সাফল্য অর্জন করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়ম কলেজের সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কার্যোপলক্ষে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হয়ে ওঠেন।

ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করবার জন্য বিদ্যাসাগর সে সময় অন্যদের মত স্বদেশীয় গৌরব ও মর্যাদা নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সত্য, ন্যায় ও মানব কল্যাণ ছিল বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মৌলিক উপাদান। তিনি কখনও এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হননি।—তিনি কখনও নিজের মস্তক কোথাও অবনত করেননি।

বেথুন সাহেবের সহায়তায় বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা ও বিস্তারে বিদ্যাসাগর প্রভূত পরিশ্রম করেন। অতঃপর তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রহিত আন্দোলন শুরু করেন। নারী জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ ও ভক্তি ছিল। তথাকথিত সমাজপালকদের ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা ও প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করে এবং শাস্ত্রের নজীর তুলে ধরে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও বহুবিবাহ শাস্ত্ররহিত।

ইংরেজী শিক্ষার জন্য মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি। ইংরেজী শিক্ষা দেশের পক্ষে হিতকর,—জ্ঞানের সাধনা সত্যের সাধনা—এস্থলে দেশকালের কোন বাধাবিরোধ থাকতে পারে না—এই ছিল বিদ্যাসাগরের পরিশীলিত চিন্তা।

দানশীলতার জন্য বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর বা করুণারসিন্ধু নামে পরিচিত। রবীন্দ্রমতে এই দয়াধর্ম বিদ্যাসাগরের অন্তরনিহিত অক্ষয় মনুষ্যত্ব ধর্মেরই ভিন্নতর প্রকাশ মাত্র।—

"দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নয়; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত।"

শিক্ষা, সাধনা, ব্যক্তিগতজীবন চর্চা, সাহিত্য সাধনা, দানশীলতা ও চাকুরীজীবন—সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বিদ্যাসাগরের বৈচিত্র্যময় জীবনচরিতের সামগ্রিক পরিচয় এইভাবে ব্যক্ত করলেন,—

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

১৩০৫ সালে লিখিত বিদ্যাসাগর প্রবন্ধটি উপরোক্ত চিন্তাধারারই পরিপূরক। এই প্রবন্ধে কবি মননক্রিয়াকে অন্যভাবে মনুষ্যত্বনামে অভিহিত

করেছেন। “স জীবতি মনোযস্ত মননে নহি জীবতি।’—এই শ্লোকটির ভাবাদর্শ অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের জীবনালেখ্য অঙ্কিত করেছেন।

মানুষের জীবন দুইকোটিতে অবস্থিত। একটা তার জৈবপ্রকৃতি—এখানে সে নিজের সুখ সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধির অধীন—এজীবন নিতান্ত গতানুগতিক। আর একটি তার আত্মিক প্রকৃতি—এখানে সে বৃহত্তর সাধনার ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। এটাই তার মননজীবন বা অন্তর্জীবন বা পারমার্থিক-জীবন।—

“মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম মহল ও খাস মহলের দুই কর্তা—স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া চলাই মানব-জীবনের আদর্শ।

আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন, গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ’। অর্থাৎ লোকে গতানুগতিক হইয়া থাকে, পারমার্থিক লোক দেখা যায় না।

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না, তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্য জীবন ছিল।”

রবীন্দ্রনাথ মনীষী কার্লাইলের উক্তি উদ্ধৃত করে বোঝাতে চেয়েছেন যে অন্তর রাজ্যে অর্থাৎ চিন্তাদর্শে যিনি সত্য, সুন্দর, ও চিরন্তন—তিনি বীর। সজীব মনুষ্যত্বের অপর নাম বীরত্ব। মানব সমাজের যাঁরা বীর পুরুষ তাঁরা নিজের চিন্তাদর্শ বিচিত্র কর্মের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে মানুষের চিত্তকে পারমার্থ চিন্তায় সক্রিয় করে পূর্ণতা লাভের পথে অগ্রগতিতে সহায়তা করেন। মননশক্তির সাহায্যে বিদ্যাসাগর একাকী বীরাচারীতান্ত্রিকের মত বঙ্গ হৃদয়ে প্রাণ সৃষ্টিতে অক্লান্ত সাধনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—“তাঁহার মননজীবী অন্তঃকরণ তাঁহাকে প্রবল আবেগে কাজ করাইয়াছিল, কিন্তু গতজীবন বহিঃসংসার তাঁহাকে আশ্বাস দেয় নাই। তিনি যে শবসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তরসাধকও ছিলেন তিনি নিজে।”

য়ুরোপীয় মনীষীদের মধ্যে একমাত্র জনসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। কোমলতা ও কঠোরতায় এবং নির্মল হাস্যপরায়ণতায় দুজনেই পরস্পরের হৃদয়ের একান্ত কাছাকাছি। অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধপরায়ণতা, স্নেহপ্রবণতা ও পরহিতৈষীতায়; নির্ভীক মত প্রকাশ, সর্বোপরি দুঃখসহিষ্ণুতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি

উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে দু'জনেই সমগোত্রীয়। জনসন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই অতি সহজ ও সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে কথাবার্তায় হাস্যপরিহাসের মধ্যে অনেক মূল্যবান আদর্শ প্রচার করেছেন। জনসনের জীবনীকার বস্‌ওয়েল সেগুলির কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ এই যে— "···বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা সরলতা গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে; অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।"

১৩২৯ সালে (ভাদ্র) রচিত 'বিদ্যাসাগর শীর্ষক' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে আধুনিক ভাবপ্রবক্তা হিসাবে দেখেছেন। কবির মতে আধুনিক জিনিষটি চিরন্তনত্বের পরিচায়ক। যাহা চিরায়ত, মানব কল্যাণের সহায়ক ও যুগে যুগে প্রবহমান তাহাই আধুনিক—"দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। বহমান কাল—গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।"

বিদ্যাসাগরের চরিত্রবলই প্রধান গৌরবের বস্তু। মানবহিতকর সমস্ত কর্মই এর থেকে সম্পাদিত হয়। সদাশয় ব্যক্তি সমাজে অনেকেই থাকেন, মানুষের ভালো করার আকাঙ্খা অনেকেরই থাকে, কিন্তু চরিত্রবলের অভাবে তাহা বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

মানুষের সত্য সাধনার কোনো জিওগ্রাফি নেই। সত্য কাল থেকে কালান্তরে নিত্য বহবান। গতিশীল জীবনসত্যেরই অপর নাম প্রগতি। কিন্তু মানব ইতিহাসের বিশেষ পর্বে সেই সত্যের গতিপথ রুদ্ধ করে দেয় নানা প্রকার অসত্যের স্তূপীকৃত জঞ্জাল। তবে সুখের বিষয় এই যে, অন্যায়, অসত্য দূরীকরণের দুর্বারশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হন মুক্তাত্মা মহাপুরুষগণ। তাঁরা বিদ্রোহী যৌবনসত্তার প্রতীক। বিদ্যাসাগর তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম।

বিদ্যাসাগর দেশের অন্যায় প্রথা, সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করেছেন। কিন্তু কেবল ধ্বংস কার্যের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মহত্ব নয়। তিনি মানব জীবনকে সুন্দরতর রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বিদ্যার সাধনা অন্যভাবে সত্যের সাধনা। বিদ্যাই মানুষকে অবিদ্যা থেকে মুক্ত করে প্রকৃত জীবনযাত্রার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। বিদ্যাসাগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাসম্মিলনের জন্য প্রাণপাত করে গেছেন।

দেশের বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে যোগসাধন করে বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দেওয়ার সাধনাই প্রকৃত স্বদেশ সাধনা। বিদ্যাসাগর প্রাচীন শাস্ত্রীয় আদর্শকে বহমানকালের মধ্যে ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়ে তাকে ভবিষ্যতের দিকে প্রগতিশীল করার জন্য সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন। এদিক দিয়ে তিনি চিরকালের মানবসাধনের পথ-প্রদর্শক ও সহযাত্রী। কবির বক্তব্য যেদিন সেই মহৎ আদর্শে দেশের প্রত্যেক মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে, সেদিন যথার্থ-ই আমাদের জীবনের উন্নতি ও স্বদেশের গৌরব সাধিত হবে।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ প্রবন্ধ "বিদ্যাসাগর স্মৃতি" (১৩৪৬ সাল ৩০ অগ্রহায়ণ)। এই প্রবন্ধে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের রূপ-সৌন্দর্য স্রষ্টা হিসাবে বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক পরিচয়টি খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর সৃষ্টিকার্যে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। পরন্তু তা, তাঁর সৃষ্টি কর্মে শক্তি ও প্রেরণা দিয়েছে, এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম অ-পূর্ব শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে প্রচুর শব্দ নিয়ে বিদ্যাসাগর সেগুলিকে বাংলা ভাষার প্রাণধর্মের সঙ্গে একাকার করে মিশিয়ে দিয়েছেন। বড়শিল্পী ছাড়া একাজটি সম্ভব হয় না। বাংলা ভাষায় নব নব চিন্তা ও বিচিত্র ভাব প্রকাশের পথ বিদ্যাসাগরই প্রথম তৈরী করে দিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাসাগরের পরবর্তী কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তিকে সম্মান দিতে গেলে প্রথমে বিদ্যাসাগরকে মর্যাদা দিতে হবে। নতুবা সত্যের অমর্যাদা ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ নিজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বললেন—

"...বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিদ্যাসাগরের চরিত্র মাহাত্ম্যের কথা বললেন। বিদ্যাসাগরের অন্তরের বীরত্ব বা নৈতিক শক্তিই কবিচিত্তকে বার বার উদ্দীপ্ত করেছে। বিদ্যাসাগরের চরিত্র মানে একটা প্রবল প্রচণ্ড শক্তিক্রিয়া—যার অন্তস্তলে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রবর্তনাই প্রধান। অন্যভাবে বলা

যেতে পারে অন্তহীন কারুণ্যের বাধাবন্ধহীন উৎসারণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের চরিচত্রধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের করুণা—মানুষের কল্যাণের জন্য। ব্যাপকার্থে এর থেকেই তাঁর জীবনচর্চা—সাহিত্যসাধনা, কর্মসাধনা সব কিছুই। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের এই করুণাঘন স্থির গম্ভীর বীরমূর্তি নিরন্তর উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে—যিনি বঙ্গমৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান,—কিন্তু তাঁর জীবনদৃষ্টি কালসীমার লোকায়ত পরিধির ঊর্ধে যুগযুগধাবিত মানবযাত্রীর দিকে প্রসারিত।

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

ভারতদূত রামমোহন

"I now felt a strong wish to visit Europe, and obtain by personal observation, a more thorough insight into its manners, customs, religion, and political institution...... My expectations having been at length realised, in November 1830, I embarked for England, as the discussion of the East India Company's charter was expected to come on, by which the treatment of the natives of India, and its future government, would be determined for many years to come and an appeal to the king in council, against the abolition of the practice of burning widows, was to be heard before the Privy Council. and his Majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me to bring before tbe authorities in England certain encroachments on his rights by the East India Company. I accordingly arrived in England in April 1831."—রামমোহন

রামমোহন ইউরোপে বেড়িয়ে আসার কথা চিন্তা করেন। তিনি সে দেশের মানুষের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন, ধর্ম এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে আসার কথা ভাবেন। দিল্লীর সম্রাট খবর পেলেন, রামমোহন ইংলণ্ডে যাবার পরিকল্পনা করেছেন। সম্রাট কাউকে তাঁর দূত হিসেবে ইংলণ্ডে পাঠাবেন বলে যোগ্য লোকের সন্ধান করছিলেন। দিল্লীর কাছে কয়েকটি জমিদারীর বৃত্তিতে সম্রাটের অধিকার আছে দাবী করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে আবেদন করেন। কিন্তু কোম্পানী সম্রাটের দাবী নাকচ করে দেন। সম্রাট একখানি আবেদনপত্র তাঁর দূত মারফত ইংলণ্ডের রাজার কাছে পাঠাতে চাইলেন।

সম্রাট দবীরদ্দৌলাকে রামমোহনের কাছে পাঠালেন। দবীরদ্দৌলা কলকাতায় রামমোহনের বাড়ীতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। রামমোহন ১৮২৮ সালের ২রা মার্চ তারিখে সম্রাটকে জানালেন, তিনি এ প্রস্তাবে রাজী।

সম্রাট রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। রামমোহন রাজা উপাধি গ্রহণ করে তাঁর সহকারী হিসেবে মণ্টগোমারি মার্টিনকে নিযুক্ত করলেন।

১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসের আট তারিখে রামমোহন গভর্ণর জেনারেলকে চিঠিতে লেখেন: কয়েকমাস আগে আমি জানতে পেরেছিলাম, দিল্লীর সম্রাট আমাকে গ্রেট ব্রিটেনের রাজসভায় দূতরূপে পাঠানর জন্যে নিযুক্ত করেছেন। এবং তাঁর কর্মচারী হিসেবে এই পদের সম্মানের জন্যে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আমি উপাধিমূলক সম্মানে ব্যাকুল নই, আমি এতদিন পর্যন্ত বাদশা কর্তৃক এ ধরনের সম্মান গ্রহণে বিরত ছিলাম। আমি জানাই দিল্লীর বাদশার অভিমত এই, তাঁদের রাজবংশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী মহারাজের রাজসভায় আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপার মিটিয়ে ফেলার ভারও আমাকে দেওয়া হয়েছে।

রামমোহনের এই আবেদন গভর্ণর জেনারেল নাকচ করে দেন এবং তাঁর সেক্রেটারী মিঃ স্টার্লিং রামমোহনকে জানান, সরকার আপনাকে গ্রেট ব্রিটেনের রাজসভায় বাদশার দূত হিসেবে প্রেরণ এবং বাদশার দেওয়া উপাধি কোনটাই অনুমোদন করতে পারেন না।

রামমোহন ঠিক করলেন, তিনি বাদশার দূত হিসেবে যাবেন না, তিনি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে ইংলণ্ডে যাবেন। এই মর্মে তিনি গভর্ণর জেনারেলকে লিখলেন: I am now resolved to proceed to that land of liberty by one of the vessels that will sail in November, and from a due regard to the purport of late Mr. Secretary Starling's letter of 15th January last and other consideration I have determined not to appear there as the Envoy of his Majesty Akbar the Second but as a private individual.

এরপর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হল, অ্যালবিয়ান নামক জাহাজে রামমোহন রায় যে ইংলণ্ডে যেতে চান তা মঞ্জুর করা হল। রামমোহন ঠিক করলেন, তাঁর সঙ্গে পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় আর রাম হরিদাস যাবেন। ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে রামমোহন অ্যালবিয়ন জাহাজে লিভারপুলের পথে যাত্রা করেন।

শ্রদ্ধেয় জেমস সাদারল্যাণ্ড রামমোহনের সঙ্গে এই জাহাজে ছিলেন। তিনি লিখেছেন: জাহাজে রামমোহন নিজের কেবিনে বসে খেতেন, রান্না করার আলাদা জায়গা ছিল না বলে প্রথমে তাঁকে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তাঁর চাকররা গুরুতরভাবে সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা রামমোহনের ঘরেই শুয়ে থাকে, দরদী মহাপ্রাণ রামমোহন তাদের ঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাননি।

মিঃ সাদারল্যাণ্ড লিখেছেন: দিনের বেশীরভাগ সময় সংস্কৃত আর হিব্রু পড়ে কাটাতেন। বিকেল এবং সন্ধ্যের সময় তিনি জাহাজের ডেকে এসে বসতেন, যাত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ আলোচনা করতেন।

১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে রামমোহন লিভারপুলে এসে পৌঁছলেন। উইলিয়ম রসবেন রাজাকে তাঁর গ্রীনব্যাংকের বাড়ীতে থাকতে অনুরোধ জানালেন। রামমোহন স্বাধীনভাবে আলাদা থাকা পছন্দ করলেন। তিনি রাডলেস হোটেলে এসে উঠলেন। রামমোহন এবার নিজেকে দিল্লীর বাদশার দূত বলে ঘোষণা করলেন।

উইলিয়ম রস্কো রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি রামমোহন এদেশে আসছেন শুনে খুব খুশী হন। তিনি তখন পক্ষাঘাত রোগে ভুগছিলেন। রামমোহন লিভারপুলে বেশীদিন থাকতে পারেন নি। রিফর্ম বিলের কি পরিণতি হয় এটাই তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। উইলিয়াম রস্কো রামমোহনকে একখানি পরিচয়-পত্র লিখে দেন। রস্কো লিখলেন: One great reason, as I understood for his haste to leave this for London, is to be present to witness the great measure that will be taken by your Lordship and your illustrious colleagues for promoting the long wished for reform of his native country.

১৮৩১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে বেঙ্গল হরকরার একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে ইণ্ডিয়া গেজেট জানালেন: The following extracts from one of our communications by the Minerva, though not intended, like the others we receive from the same intelligent quarter, for publication, will, we have no doubt, be interesting to our subscribers generally, and to native and other friends of that excellent and enterprizing person, Baboo Rammohan Roy.

লণ্ডন ১৮৩১ সালের ৬ই মে তারিখে এক সাংবাদিক জানাচ্ছেন আমরা লিভারপুলে এক সপ্তাহ ছিলাম। এখানে রামমোহন রায়ের সঙ্গে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আলাপ করে গেছেন। সকালবেলা, দুপুরবেলা, রাত্রিবেলা কত লোক যে রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। কটা দিন রামমোহন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন।

আমরা ম্যাঞ্চেস্টারের পথে ট্রেনে চলেছি। রামমোহন মুগ্ধ বিস্ময়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝে বলছেন Oh Lord! ট্রেন থেকে নামলাম। আমরা রয়্যাল হোটেলের পথে চললাম। রাস্তায় মাঝে মাঝে ভিড় লেগে যায়। অনেকে শুনেছে ভারত থেকে রাজা এসেছে। রামমোহন দাঁড়িয়ে পথচারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।

রিভারপুলে ন দিন কাটিয়ে আমরা লণ্ডনের পথে যাত্রা করলাম। বার্মিংহামে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হল। বার্মিংহামের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি খুশীমনে রাজারামের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

রামমোহন তখন শুয়ে পড়েছেন। মনীষী জেরিমী বেন্থাম হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বেন্থাম শুনলেন, রাজা শুয়ে পড়েছেন। তিনি রাজাকে বিরক্ত করতে চাইলেন না। তিনি একখানা কাগজে রামমোহনের উদ্দেশ্যে কিছু লিখে বিদায় নিলেন।

দুই

রামমোহন লণ্ডনে এসে ১২৫ রিজেন্ট স্ট্রীটের বাসায় উঠলেন। তিনি এখানে ক'মাস ছিলেন। ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসের আট তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেট রামমোহনের একখানা চিঠি প্রকাশ করে। এই চিঠিখানি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। রামমোহন কেন ইংলণ্ডে বেড়াতে এসেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য, সংক্ষেপে এই চিঠিতে বর্ণনা করেছেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে তিনি ঠিকমত কাজ করতে পারেন নি। রামমোহন লিখেছেন :

এদেশে আসার আমার এক উদ্দেশ্য ইংরেজ জনগণের সামনে সংক্ষেপে ভারতের অতীত চিত্র এবং সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজের মতামত জানিয়ে দেওয়া।

Indisposition and constant engagements since my arrival have hitherto prevented me before arranging my ideas on

the subject. শারীরিক অসুস্থতার জন্ত এবং লোকজনের সঙ্গে ক্রমাগত সাক্ষাৎকারের জন্তে আমি নিজে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারিনি!

But perceiving that different parties-friends or strangers to me, I know not, have been making contradictory statements regarding the India question, I beg to say that as soon as my health, now convalescent, permits, I shall hasten to publish in a printed form, my opinions on the above subject, however humble and insignificant they may be.

ভারতের শাসনপদ্ধতিতে রামমোহন আগে সংস্কারের প্রস্তাব রাখেন। তিনি প্রস্তাব করেন, পারসী ভাষার পরিবর্তে সরকারী কাজকর্মে ইংরেজী চালু করা হোক। পঞ্চায়েত প্রথা চালু করা হোক। পঞ্চায়েত প্রথা চালু করা প্রয়োজন। বিচারক আর রেভিনিউ অফিসারদের অফিস আলাদা করা উচিত। কোন আইন বিধিবদ্ধ করার আগে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৩১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন প্রস্তাব করেন, যদি ভারতের জনসাধারণ ধর্মীয় কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারে, যদি তারা মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়, তাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে।

ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন ইউনিট্যারিয়ান অ্যাসোসিয়েসানের বার্ষিক সভায় রামমোহন আমন্ত্রিত হন। ১৮৩১ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেটির সম্পাদকীয় কলমে মন্তব্য করা হল: We subjoin here a report of the speeches of Dr. Bowring and Rammohan Roy, delivered at the anniversary of the British and Foreign unitarian Association, which has reached us.

ডাঃ বাউরিং রামমোহনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি রামমোহনকে প্রাচ্যের বিশিষ্ট বন্ধু বলে আখ্যা দেন। ডাঃ বাউরিং জানান, যিনি হাজার মাইল দূর থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমরা সুখী। তিনি রামমোহনের প্রচেষ্টাকে দুঃসাহসিক বলে আখ্যা দেন। ডাঃ বাউরিং বলেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন কঠোর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এর আগে কেউ চালাতে পারেন নি, কেউ এত সম্মানের অধিকারীও হতে পারেন নি। একথা বলতে বাধ্য, রামমোহন নিজের দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য দূর করার জন্তে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এটা আমাদের কাছে এক

আনন্দময় স্বপ্ন বলে মনে হয় যখন ভাবি আমরা রাজা রামমোহন রায়কে অভ্যর্থনা জানাতে এখানে মিলিত হয়েছি। আজকের দিনটি আমাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামমোহন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জানালেন, আমি অত্যন্ত অসুস্থ এবং এত ক্লান্ত যে এই সভায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারছি না। আমি ডাঃ ফির্কল্যাণ্ড (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সভাপতি) ও ডাঃ বাউরিং এর কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। তাঁরা আমাকে সোসাইটির একজন সদস্য ও ভাই মনে করে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আমি নিজে জানিনা, আমি কি কাজ করেছি। আর আমি যদি কিছু করেও থাকি, তা তুচ্ছ, তা অতি সামান্য। আমাকে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। হিন্দুরা এবং ব্রাহ্মণরা আমার বিপক্ষে, এমন কি অনেক খ্রীষ্টান আমার কাজে বাধা দিয়েছে, প্রকাশ্যে আমার বিরোধিতা করেছে। খ্রীষ্টান জাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর কিন্তু তাঁরা সবসময় আমার কাজে বাধার সৃষ্টি করেছেন। এখানে আমি কয়েকজনকে দেখেছি, আমাদের দেশে এমন অনেকে রয়েছেন। ভারতে এমন চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে যার ফলে আমার কাজ এগোয় নি, কাজের অগ্রগতি সামান্য, অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি তেমন কাজ করতে পারিনি। সবশেষে রামমোহন বললেন, আমি বড় ক্লান্ত, আপনারা সময়ে সময়ে আমার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তা আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে রাখব।

১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসের আট তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেট জানালেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রামমোহন রায়কে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছেন। ইণ্ডিয়া গেজেট লিখেছেন: গত বুধবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডন শহরে রামমোহন রায়কে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। কোম্পানীর চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিমশাই প্রথমে রামমোহনের সুস্বাস্থ্যের কামনা করে বলেন, এখানে সকলেই জানেন, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ রামমোহন ভারতীয় জনসাধারণের জন্যে কত মহান কাজ করেছেন। মৌমাছি যেমন বাগানের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, ব্রাহ্মণ প্রচুর পড়াশোনা করে সীমাহীন জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন।

রামমোহন রায় উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আজকের দিনটি স্মরণীয়, এই সভার পরিবেশ আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। রামমোহন বলেন, যাঁদের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছেন তাঁদের মনুষ্যত্ব, তাঁদের মহানুভবতার কাছে ভারতের

জনগণ ঋণী। তাঁরা ভারতে শুধু শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে চলেছেন। এই দেশ যেদিন ভারতের শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়েছেন, সেদিন থেকে সে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তিনি লর্ড কর্নওয়ালিশ, ওয়েলেসলী, হেষ্টিংস যাঁরা ভারতের গভর্নর জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং বর্তমানে মহান লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। ভারতের অগ্রগতিতে তিনি গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ।

মেরী কার্পেন্টার তাঁর 'দি লাস্ট ডেজ ইন ইংল্যাণ্ড অফ রাজা রামমোহন রায়' গ্রন্থে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর এক সুন্দর বিবরণ লিখেছেন। আমার জীবনে একবার মাত্র রাজা রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ডাক্তার আর্লটের দেয়া এক ভোজসভায় এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। রবার্ট ওয়েন ছিলেন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। তিনি একজন সাম্যবাদী নেতা। তিনি নিজের মতামত রামমোহনকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন। রামমোহনের এই বিষয়টি বেশ ভালরকম জানা ছিল। তিনি নির্ভুল ইংরেজীতে ওয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তর্ক বেধে গেল। রামমোহন ধীর স্থির কিন্তু ওয়েল ধৈর্য হারালেন। প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন, তিনি এ ধরণের ঘটনা এর আগে কখনও দেখেন নি।

ভারতবাসীদের মর্যাদা যাতে বাড়ে রামমোহন তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি পার্লামেন্টের সামনে প্রস্তাব রেখেছিলেন, যে সব ভারতীয় সুশিক্ষিত, তাদের যোগ্য পদে নিযুক্ত করা হোক। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, প্রত্যেক ইউরোপীয় জজের সঙ্গে তাঁর কাজের সুবিধের জন্যে একজন দেশীয় লোককে জজের পদে নিযুক্ত করা হোক। তিনি প্রস্তাব দেন, ভারতীয়দের কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করা হোক। তাঁরা কম মাইনেতে এ কাজ করতে পারবেন।

রামমোহন ফ্রান্সে যান। তাঁর সঙ্গে যান হেয়ার সাহেবের ভাই। সেটা ১৮৩২ সাল। সম্রাট লুই ফিলিপ রামমোহনকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ব্রিষ্টল নগরে আসেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর জ্বর বেড়ে গেল। ডাক্তারদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৮৩৩ সালে সাতাশে সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা রামমোহন রায় মারা গেলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।"

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কার 'সম্ভাষণ'?

সম্ভবত সব মানুষের জীবনেই কিছু কিছু একান্ত মুহূর্ত আসে যখন সে কতকটা স্বগতোক্তির মত খুব নীচু সুরে কথা বলে নিজের মুখোমুখি হয়। স্বভাবতই সেই মহার্ঘ মুহূর্ত নির্জনতাময় এবং সেই অন্তরঙ্গ কথামালা কবিতার কাছাকাছি।

গত শতকের নানান্ কর্মকাণ্ডের নায়ক বিদ্যাসাগর যাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায় বহুবিধ সমাজহিতৈষণায়, শিক্ষাসংস্কারে—বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় যিনি নিবেদিতপ্রাণ, সেই ব্যস্ততম মানুষটি কি কখনো নিজের মুখোমুখি হয়েছিলেন কোন নির্জন অবসরে, কোন কিছু হারানোর বেদনা কি তীব্র হয়ে বেজেছিল কখনো—অন্তত তাঁর রচনায়?

বড় কৌতূহল নিয়েই সদ্যোপ্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' এর পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। সহসা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম বিদ্যাসাগরও ব্যতিক্রমবিহীন। জীবনে একবার, অন্তত একবার, তাঁর রচনায় তিনি নিজেকে নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছিলেন এবং সেই আশ্চর্য উন্মোচন ঘটেছিল এই 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এই।

অকপটতাই যাঁর চারিত্র্য সুযোগ পেলে 'জীবন চরিতে' সেই বিদ্যাসাগর হয়তো সকল আবরণ সকল আভরণ খুলে বেরিয়ে আসতেন, অসম্পূর্ণ চরিত কথায় তার আভাসও আছে। কিন্তু ভূমিকামাত্র করেই বস্তুত বিদ্যাসাগরকে ছুটি নিতে হয়—যেখানে তিনি সমস্ত রকম কর্মকাণ্ডের মূলাধার সেই অবধি তাঁর আর যাওয়া হল না, আর তাঁর অবশিষ্ট যাবতীয় সাহিত্য কর্মই তো অনুবাদমূলক, যদিও সেখানেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়ভাবেই উপস্থিত। অগত্যা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত নিরুপায় আমাদের নাতিদীর্ঘ এই 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এরই শরণ নিতে হয়।

"প্রভাবতীসম্ভাষণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১২৯৯ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ, পৃঃ ৩-১০) এই অপ্রকাশিত রচনাটি মুদ্রিত করেন। সমাজপতি মহাশয়ের মতে ইহা ১৭৮৬ শকাব্দের ১লা বৈশাখ লিখিত হয়—ইংরেজি মতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস।" এই প্রবন্ধ রচনার

একটু ইতিহাস আছে। সমাজপতি মহাশয়ের ভাষায় তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, মাতামহদেবের বিশেষ সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রভাবতী এই রচনার বিষয়। ১৭৮২ শকে ২৩শে মাঘ প্রভাবতীর জন্ম হয়; ১৭৮৫ শকের ৪ঠা ফাল্গুন, তিন বৎসর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। মাতামহদেব, প্রভাবতীকে অপত্যনির্বিশেষে ভালবাসিতেন। এই সময়ে, নানাবিধ কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বিরক্ত ও বীতরাগ হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়।·· প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের এই নির্দেশিকার তথ্যগত মূল্য অপরিসীম হলেও তত্ত্বগত মূল্য সঠিক নয়। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'কে কোনক্রমেই প্রবন্ধ শ্রেণীর রচনা বলা যায় না। সংহতিগুণ যা যে-কোন প্রবন্ধের অবশ্য বৈশিষ্ট্য এবং যুক্তিজাল বিস্তার প্রবন্ধকে অন্য শ্রেণীর রচনা থেকে যা পৃথক্ করে তা নিদারুণ ভাবে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এ অনুপস্থিত। বস্তুত করুণ রসাত্মক গীতিকবিতার সুরই এই রচনার একমাত্র আশ্রয়। প্রবন্ধ না বলে এই রচনাটিকে তাই গদ্যকাব্য বলাই যুক্তিসঙ্গত।

'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ'এর তৃতীয় খণ্ডে শ্রীগোপাল হালদার একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন। "প্রভাবতী সম্ভাষণ' সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বৎসরের মেয়েটির মৃত্যু বিদ্যাসাগরের শোকের কারণ। বিদ্যাসাগরের বিশুদ্ধ সংস্কৃতাশ্রিত ভাষারীতিতে তা বিধৃত। সে ভাষা মুখের ভাষা নয়, কিন্তু মনের ভাষা—শোকাহত বিদ্যাসাগরের তা স্বভাষা। 'সম্ভাষণ'-এর প্রতি বাক্য গভীর শোকাভিভূত হৃদয়ের এক একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস—শোকোচ্ছ্বাস হলেও তাতে কৃত্রিমতার লেশও নেই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আর একটি জিনিসও নেই,—শিল্পীর ভাব সংযম। 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' এই জন্যই শ্রেষ্ঠ শিল্পের মাত্রায় বাঁধা শিল্পরচনা নয়—স্বতঃস্ফূর্ত পবিত্র একটি মানসকুসুম। এত পবিত্র এই হৃদয় বেদনা যে শিল্পরূপে তার বিচারও অসমীচীন।'

শ্রীহালদারের এই মন্তব্যের শেষাংশের প্রতিবাদ প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু তার আগে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এর পাঠপ্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই। 'বিদ্যাসাগর' প্রণেতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এর যে পাঠ

দিয়েছেন তার সঙ্গে রচনাসংগ্রহের পাঠের বিস্তর প্রভেদ। অনুমান অসঙ্গত নয়, বিদ্যাসাগর যিনি প্রতি সংস্করণেই নিজের লেখা পরিমার্জিত করতেন ঐ পাঠান্তর হয়তো তারই ফলশ্রুতি। চণ্ডীচরণ গৃহীত পাঠের প্রায় প্রারম্ভেই 'দৃষ্টি' শব্দের পরিবর্তে 'নয়নে'র সঙ্গত ব্যবহার চোখ এড়িয়ে যায় না। এ-সব শব্দের ব্যবহার ছাড়াও বেশ কিছু গ্রহণ বর্জনের ছাপ দুটি লেখার মধ্যেই দেখা যায়। চণ্ডীচরণের স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁর পাঠ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ নয়—'বালিকার রাজত্ববিস্তার, তাহার বিচ্ছেদ এবং তন্নিবন্ধন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাতরতার পরিচায়ক কয়েক পঙ্‌ক্তি 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম' (বিদ্যাসাগর : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তম সংস্করণ, পৃঃ ৪৪৯)—স্পষ্টই বোঝা যায় 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাই চণ্ডীচরণের মূল উৎস।

কোন্‌টি আদিপাঠ সেই কূটপ্রশ্নে প্রবেশ না করেও বলা যায় 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এর দুটি পাঠেরই মূল স্বর মোটামুটি এক—মৃত্যুকাতর এক সরল আত্মার করুণ ক্রন্দন। কিন্তু এ ক্রন্দন বিহ্বল হলেও শ্রীহালদার কথিত মাত্রাহীন নয়। বরং শিল্পীজনোচিত সংযমে ঋদ্ধ। অভিনিবিষ্ট পাঠে লক্ষ্য করা যায় বিদ্যাসাগরের গদ্যভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, তাঁর পরিবর্তিত পাঙক্চুয়েশনের সার্থক ব্যবহার এবং মুখের ভাষার অসাধারণ প্রয়োগে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' যথার্থই শিল্পকীর্তি।

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই মনে হতে পারে এই রচনাটি নিছক আবেগ-উচ্ছ্বাসে বেসামাল, তিন বৎসরের একটি বালিকার মৃত্যু উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের এই এই দার্শনিক কাব্যিকতাও অসঙ্গত ঠেকতে পারে। কিন্তু যে-কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখার তা হল : প্রভাবতীর মৃত্যু এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে বিদ্যাসাগর প্রভাবতীর মৃত্যুমুকুরে নিজের মুখ দেখতে চেয়েছেন, একান্তে দু-দণ্ড নিজের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন।

প্রত্যাশিত ছিল দেশজ শব্দের বৈভব এবং ঋজুতা যা তাঁর জীবন চরিতের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; তার কিছু-কিছু আভাস হয়তো এ-রচনায়ও লক্ষ্য করা যাবে। বিশেষত ব্যক্তিগত অনুভূতি যে রচনার উৎস স্বভাবতই 'সেই প্রভাবতী সম্ভাষণ'এ বিদ্যাসাগরীয় ভঙ্গির উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মৃত্যুই যার পটভূমি তাতে লঘুচালের ও দ্রুততালের দেশজ শব্দ খাপ খায় কি ? বস্তুত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এর বিষাদমন্থর ভাবটি ফোটাতে তৎসমের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া বিদ্যাসাগরের গতি ছিল না। অনির্বার্যভাবে

এখানে মনে পড়ে যায় 'সীতার বনবাস'-এর কথা। অব্যবহিত পূর্ববর্তী শকুন্তলায় বিদ্যাসাগর যেখানে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ভাষার ব্যবহার করেছেন ঠিক তারই পরবর্তী 'সীতার বনবাস'-এ কেন সেই ধীর স্থির তৎসমের মৃদুমন্দ গতি—সেকি সীতার মৃত্যুশোককেই গাঢ় করে তোলার জন্য নয় ?

তৎসম শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্যই নয়, শিশুর মুখের কথারও অনবদ্য ব্যবহারের জন্য 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' স্মরণীয়। 'নীনা' 'দুখুনি' 'মাগী শোলো' 'নাফাসনি' ইত্যাদির নিপুণ প্রয়োগ সহৃদয় পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করে। এমন কি এই শোকগাথায় একটু লক্ষ্য করলে পাঠকের নজরে পড়বে বিদ্যাসাগরের গদ্যের সেই কৌতুকপ্রিয়তা যা রবীন্দ্রনাথকেও একদা আকৃষ্ট করেছিল জীবন চরিতে। অবশ্য পটভূমির পরিবর্তনহেতু এই কৌতুকপ্রিয়তা পূর্বের মত নির্মল নয় বরং হৃদয়বিদারক। মানুষ সব কিছু হারালে তার মুখে যে-ধরনের রিক্ততার হাসি ফুটে ওঠে এ-ও যেন তেমনি করুণ কৌতুক যা আসলে কান্নারই নামান্তর। দু'একটি উদাহরণ রেখে কথাগুলি বোঝানো দরকার।

১। যেন তুমি, বাহিরে আসিবার নিমিত্ত আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ এবং সিঁড়ি নামিবার পূর্বক্ষণে, আমার চিবুকধারণপূর্বক, আকুলচিত্তে বলিতেছ, 'নাফাসনি. পড়ে যাব।' আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিতেছি, না আমি লাফাব। তুমি অমনি ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছ, 'দেখ দিখি মা আমার কথা শোনে না।'

২। কখনো কখনো 'স্বামী আসিয়াছেন' বলিয়া ঘোমটা দিয়া সঙ্কুচিত-ভাবে, একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে ; এবং সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায় অতি মৃদুস্বরে' উত্তর দিতে।

কবি বিদ্যাসাগরের রোমাণ্টিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্বপ্নাবিষ্ট এই স্তবকে : একদিন দিবাভাগে আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল সেইদিন, সেই সময়ে ক্ষণকালের জন্য তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া অভূতপূর্ব আগ্রহ সহকারে, ক্রোড়ে লইয়া প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহুদ্বারা পীড়নপূর্বক, সজলনয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময় এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন বিদ্যাসাগরের পাঙ্‌কচুয়েশনের সতর্কতা। অবিশ্রান্ত ––– কমা এই বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলাভাষায় ইংরেজির অনুসরণে 'কমা'

'কোলন' 'যতি' ইত্যাদির ব্যবহার করলেন। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলির স্বগতোচ্চারণে কী সুন্দর সঙ্গীত উঠে আসে। বিদ্যাসাগরের গদ্যের এই মাধুর্য লক্ষ্য করেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর।'

'প্রভাবতীসম্ভাষণ'-এর রচনাশৈলীটিও ভারি অভিনব। সাধারণভাবে প্রভাবতীর স্মৃতিচারণ করতে করতেই বিদ্যাসাগর কতগুলি সংহত পদাবলীর সৃষ্টি করেছেন যাকে বলা যায় প্রভাবতীর স্মৃতিসৌধের সোপান স্বরূপ। এই পদাবলী সংখ্যানুক্রমী, সংক্ষিপ্ত ও মন্ত্রের মত অমোঘ।

'প্রভাবতীসম্ভাষণ'-এর বড় মর্মস্পর্শী এই স্বীকারোক্তি : বৎসে, কিছুদিন হইল আমি নানাকারণে সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে…।

বিদ্যাসাগর এই বিরস ও বিষময় জীবনে দু-দণ্ড শান্তি পেতেন কেবল প্রভাবতীর মত নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে এবং কার্মাটাড়ের সরল সাঁওতাল সাহচর্যে। তথাকথিত সভ্যমানুষের সংশ্রবও এ-সময় তাঁর অসহ্য মনে হত।

নৈরাশ্য তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'-এর অন্তিম স্তবকে এসে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ পুনর্জন্মের প্রসঙ্গও আনতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে। প্রভাবতী সমীপে তাঁর কাতর অনুরোধ : যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিতে না হয়।

বিদ্যাসাগর স্বয়ং যা উপলব্ধি করতেন না তেমন কোন কল্পলোকে পাঠককেও নিয়ে যেতে চাইতেন না। এমন কি শকুন্তলার অনুবাদ কর্মেও তিনি স্বাধীনতা নিয়ে যেখানে যেখানে অলৌকিকতার গন্ধ ছিল তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন (স্মরণীয় অভিজ্ঞানশকুন্তলমের ৪র্থ অঙ্কে পতিগৃহ-গমনোন্মুখ শকুন্তলাকে বনদেবীর অলঙ্কার দান, ষষ্ঠ অঙ্কে মাতলির অপ্রাকৃত আবির্ভাব, ৭ম অঙ্কে রাজকুমার ভরতের স্বর্ণবলয়ের অলৌকিকতা) অথচ প্রভাবতীসম্ভাষণ-এ পুনর্জন্ম প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল।

অবশ্য 'যদি' শব্দটি এখানে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। বিদ্যাসাগরের দ্বিধান্বিত মনের প্রকাশ যেন এই 'যদি'।

অনুপুঙ্খ আলোচনায় এ-কথাই মনে হয় প্রভাবতীসম্ভাষণ একজন যথার্থ শিল্পীর ভাবসংযমসংযুক্ত রচনা—এর গঠন-প্রণালী থেকে শব্দ চয়ণ, ভাব থেকে

ভাষা সর্বত্রই সেই মহান শিল্পীর কলানৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে। সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী পাঠকের বুঝতে আর বাকি থাকে না ক্রমাগত অনাচার ও প্রবঞ্চনায়, অতিষ্ঠ হয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাস প্রায় হারাতে বসেছিলেন যে বিদ্যাসাগর, 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' সেই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের মর্মন্তুদ হাহাকার। কিন্তু সেই হাহাকারও, কী আশ্চর্য, মাত্রায় বাঁধা!

মূলত যিনি একজন কর্মযোগী এবং লেখা ব্যাপারটি যাঁর কাছে ঐ কর্মেরই পরিপূরক অস্ত্রমাত্র, ভেবে অবাক হই, কী সুন্দর শুদ্ধ শিল্পনিদর্শন রেখে গেলেন তিনি প্রভাবতীসম্ভাষণ'-এ। এই করুণ রসাত্মক গদ্যকাব্যটি বিদ্যাসাগরের অঙ্গুলিমেয় মৌলিক রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—প্রথানুগ সমালোচকগণ যাই বলুন কেন।

পরিশেষে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক জেনেও একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ'-এ বিদ্যাসাগরী বানানের যে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে তার নাম স্বাধীনতা নয়, স্বেচ্ছাচার। বিদ্যাসাগরের প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য থাকলে এ-ধরনের ধৃষ্টতা সম্ভব হত না। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অধিকাংশ উৎকলন মূলত এই 'রচনা সংগ্রহ' থেকেই নেওয়া এই জন্য যে পাঙ্‌কচুয়েশনকে অক্ষুণ্ণ রেখে কেবল হ্রস্ব বিলোপ বা বানান সংস্কার একটি রচনার কী শোচনীয় বিপর্যয় আনতে পারে সেটাই দেখানো।

উজ্জ্বল মজুমদার

বাঙলা গদ্যের পরিমার্জনা : শকুন্তলা ও সীতার বনবাস

বিদ্যাসাগরের আগে কোনো কোনো গদ্য লেখকের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে বাঙলা গদ্যের একটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন রূপ যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের রচনা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সংবাদপত্রকে নির্ভর করে বা সংবাদপত্রের প্রেরণা পেয়ে যাঁরা স্বাধীনভাবে গদ্যচর্চায় নেমেছিলেন তাঁদের রচনা বিশেষভাবেই বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি প্রবর্তনে সহায়তা করেছিল। সহায়তা দুদিক থেকে করেছে মনে হয়। পূর্ববর্তীদের রচনার দোষ ত্রুটি বিদ্যাসাগরকে যেমন সচেতন করেছে একদিকে, অন্যদিকে কোনো কোনো গদ্যলেখকের সাধু গদ্য রচনার আংশিক সাফল্য বিদ্যাসাগরকে একটা আদর্শ বা ভিত্তির দৃঢ়তা দিয়ে থাকবে। আসলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনার কোনো কোনো অংশের সাধু স্বচ্ছ গদ্যরীতিকে কিছুটা সংস্কার করেই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর সাধু গদ্যভাষার আদর্শ বা যাকে বলে Common style তাই তৈরি করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকের রচনা, খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের গদ্যরীতি এবং রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার—কারুর গদ্যেই বিদ্যাসাগরের ভাবসাম্যবোধ বা বাক্যগঠনে সুমিতিবোধ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ যে গদ্য লিখেছেন তাতে বিদ্যাসাগর-পূর্ব যুগের ভারসাম্যহীনতাই চোখে পড়ে। একমাত্র অক্ষয়কুমারের গদ্যেই শৈথিল্যহীন ঋজুতা খুঁজে পাই। কিন্তু সে গদ্যও বিদ্যাসাগরের সংশোধনের ফল। তবে সংশোধন করলেও বিদ্যাসাগর নিজেই অক্ষয়কুমারের গদ্যকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গদ্য বলে সম্মান দিয়েছেন। তবু বলবো, বিদ্যাসাগরের নিখুঁত ভারসাম্যময় ধ্বনিসংগীতযুক্ত রুচিকর গদ্য অক্ষয়কুমারের ঋজু পরিচ্ছন্ন গদ্যকে এক ধাপ অতিক্রম করে গেছে। এবং তার কারণ বিদ্যাসাগরের মতো আর কেউই সে যুগে গদ্যের স্বচ্ছতা ও ধ্বনিময়তার জন্য এতখানি আপ্রাণ চেষ্টা করেননি।

তাঁর মতো 'নিয়ত' সচেতন গদ্যশিল্পীকে চিনতে গেলে তাঁর রচনার

বিভিন্ন সংস্করণের তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' এই দুটি বইএর বিভিন্ন সংস্করণে বিদ্যাসাগরের সংস্কার চেষ্টার কিছু প্রমাণ উদ্ধার করা যেতে পারে। তাতে বক্তব্য স্পষ্ট হবে বলে মনে করি। বিভিন্ন সংস্করণের তুলনায় দেখা যাবে কীভাবে সতর্ক প্রহরীর মতো বিদ্যাসাগর পরিশ্রমী অথচ শিল্পী মন নিয়ে বারবার রচনা সংশোধন করেছেন। বাক্যকে সহজ করেছেন। বাক্যের অন্তর্লীন পদক্ষেপকে ছোট করে, তার ছন্দস্রোতকে আরও নিয়মিত করে, শব্দকে সেই রুচিকর ধ্বনিময়তার খাতিরে প্রয়োজন মতো বদলে গদ্যশিল্পে সংহতি আনবার চেষ্টা করেছেন।

শকুন্তলার তিনটি সংস্করণ তুলনার জন্য ব্যবহার করছি। প্রথমটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালের সংস্করণ, একাদশ সংস্করণ ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত। দ্বিতীয়টিও তাঁর জীবিতকালের সংস্করণ, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত। তৃতীয়টি পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরেকার সংস্করণ অর্থাৎ পুনর্মুদ্রণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত সংস্করণে ১৮৮৫ সালের সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে। এই সংস্করণের সঙ্গে ১৮৯৭ সালের সংস্করণের বিশেষ পার্থক্য নেই। কয়েকটি যতি চিহ্ন ছাড়া। মনে হয় ১৮৮৫ সালের সংস্করণেই বিদ্যাসাগরের শেষ সংশোধনের কাজ রয়েছে। হয়তো এই সংস্করণ প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগর ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য সামান্য কিছু সংশোধন করে গিয়েছিলেন। কিছু সম্বোধন চিহ্ন সরিয়ে কমা বসিয়ে সে কাজ সারা হয়েছে।

সীতার বনবাস-এর প্রথমটি ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত উনবিংশ সংস্করণ। দ্বিতীয়টি ১৮৮০ সালের প্রকাশিত পঞ্চবিংশ সংস্করণ। এটিই বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'সীতার বনবাস'-এ এই সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে। তৃতীয়তঃ ১৮৯৭ সালের সংস্করণ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরেকার সংস্করণ এটি। বলাবাহুল্য এর সঙ্গে পঞ্চবিংশ সংস্করণের কোনো প্রভেদ নেই।

২

প্রথমে 'শকুন্তলা'র উল্লিখিত তিনটি (প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংস্করণের কোনো পার্থক্য নেই) সংস্করণের তুলনা করা যাক।

একাদশ সংস্করণের শেষ অনুচ্ছেদটির উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:

'পরে, কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বৎস!

তোমরা এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপ অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া, উত্তরকালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক, তদনুসারে কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ প্রদানার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, পত্নীপুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন।'

চতুর্দশ বা পঞ্চদশ সংস্করণে এই অনুচ্ছেদটির পরিবর্তিত রূপ হলো :

'পরে, কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বৎস, তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া, উত্তরকালে, ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন, আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কিনা সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণা করা আবশ্যক। তদনুসারে, কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ প্রদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস, বহুদিবস হইল, রাজধানী হইতে আসিয়াছ; অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণপূর্বক, পত্নী ও পুত্রসমভিব্যাহারে, প্রস্থান কর। তখন রাজা মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক, সপুত্র, রথে আহোরণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক, পরমসুখে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।'

এখন এই দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে সংশোধনগুলি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম বাক্যটিতে পূর্বসংস্করণের তুলনায় তিনটি কমা বেশি বসেছে (কশ্যপ, এবং, উত্তরকালে—এই তিনটি শব্দের পর)। চতুর্থবাক্যে চারটি নতুন কমা ব্যবহৃত

হয়েছে। একটি ক্ষেত্রে কমা সরিয়ে সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া 'পত্নীপুত্রসমভিব্যাহারে'-এই সমাসবদ্ধপদটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম বা শেষবাক্যে চারটি নতুন কমা ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চদশ সংস্করণে বৎস, ভগবন্ ইত্যাদি সম্বোধনের পর কমা আছে। অবশ্য বোধহয় সংস্কৃতের সম্বোধন চিহ্ন আর রাখতে চাইছেন না। কমা দিয়েই বাঙলায় সে কাজ সারতে চাইছেন। সাম্প্রতিককালে বাঙলা গদ্যে বিস্ময় বা অতীব ভয় বা আনন্দ প্রকাশেই আমরা ওই চিহ্ন রেখেছি। সম্বোধনে '!' চিহ্ন প্রায় ব্যবহারই করি না।

যাই হোক, এই পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সমস্ত কমা ব্যবহার করা হয়েছে তার অভাবে অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটবে বলে তা করা হয়নি। করা হয়েছে বাক্যকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ ক'রে পড়বার জন্য, বাক্যের মেরুদণ্ডকে সর্বজনবোধ্য করবার জন্য এবং প্রত্যেকটি বিরামকে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিহ্নিত করবার জন্য। যেখানে কমা সরিয়ে সেমিকোলন আনা হয়েছে সেখানে প্রকৃতপক্ষে বাক্য শেষ হয়েছে অথচ বক্তব্য বা ভাব শেষ হয় নি বলে অতএব দিয়ে পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে। কাজেই স্থিরতর চিন্তায় মনে হয় এখানে কমার চেয়ে দীর্ঘতরকালের বিরতিজ্ঞাপক চিহ্ন সেমিকোলন যুক্তিযুক্তই হয়েছে। এই উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্রও দেখি কমার বদলে দাঁড়ি দিয়ে বাক্যকে ছোট যেমন করা হয়েছে তেমনি কমার অপব্যবহারকেও সংশোধন করা হয়েছে। যেমন, একাদশ সংস্করণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সূচনায় দেখছি :

> নদীতে স্নান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চল-প্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ভ্রষ্ট হইবামাত্র এক অতিবৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে।

পঞ্চদশ সংস্করণে রয়েছে :

> নদীতে স্নান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয়, শকুন্তলার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে, সলিলে পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবামাত্র, এক অতিবৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে।

বোধহয় বক্তব্য বা ভাব সম্পূর্ণ হওয়াতেই কমার বদলে দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। এখন পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি দুটির আলোচনার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে সমাসবদ্ধপদটিকে ভাঙবার উদ্দেশ্য সরলতা আনবারই চেষ্টা! অন্যত্রও এই সরলীকরণের চেষ্টা দেখা যায়। যেমন একাদশ সংস্করণের 'শরপ্রতিসংহার-পূর্বক' সংশোধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'শরের প্রতিসংহরণ পূর্বক'। কাজেই

বিদ্যাসাগর নতুন নতুন সংস্করণে যে পরিবর্তন এনেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল যতি-পতনের সূক্ষ্ম ভেদগুলিকে চিহ্নিত করা, বাক্যে শৃঙ্খলা আনা এবং সামগ্রিকভাবে ভাষায় সরলতা আনা।

কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ উক্তিগুলিতে উর্ধ্বকমা বসিয়েছেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় প্রয়োজনে। যেমন, সপ্তম পরিচ্ছেদে কশ্যপের উক্তি :

একাদশ সংস্করণ :

> 'তিনি কুপিত হইয়া, তোমায় এই শাপ দিয়া চলিয়া যান, তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনো তোরে স্মরণ করিবেক না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই।'

পঞ্চদশ সংস্করণ :

> 'তিনি কুপিত হইয়া, তোমায় এই শাপ দিয়া চলিয়া যান, "তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনও তোরে স্মরণ করিবেক না।" তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই।'

এক্ষেত্রে একজনের উক্তির মধ্যে অন্যের উক্তি মিশে আছে বলে অন্যের উক্তিকে উর্ধ্বকমার মধ্যে বিশিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। চতুর্দশ সংস্করণে এই পরিবর্তন করা হয় নি। এইরকম সমস্যা ছাড়া সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ উক্তিকে বিদ্যাসাগর উর্ধ্বকমার মধ্যে রাখেন নি। আরেকটি স্থানে দাঁড়ি তুলে দিয়ে সেমিকোলনের সার্থক ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে :

একাদশ সংস্করণ :

> 'এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যান নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।'

চতুর্দশ, পঞ্চদশ সংস্করণ :

> 'এই নিমিত্ত, আমি সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি; শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যান নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।'

পূর্ববর্তী বাক্য শেষ হলেও ভাব বা বক্তব্য শেষ হয় নি। সেই কথা ভেবেই খুব সম্ভবতঃ দাঁড়ি সরিয়ে সেমিকোলন বসানো হয়েছে।

বহু ক্ষেত্রেই পূর্বসংস্করণের পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন বিদ্যাসাগর। 'সীতার বনবাস'-এর অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি :

উনবিংশ সংস্করণ :

> তিনি আশার উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল অবস্থা ঘটিতে পারে, তিনি সে সমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বাস্তব ঘটনাকালে সেই সমস্ত অবলোকন করিয়া অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না।

পঞ্চবিংশ, সপ্তবিংশ সংস্করণ :

> তিনি. আশার উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন।—রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে. তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন ; রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না ;······

দেখা যাচ্ছে 'এবং বাস্তব ঘটনাজ্ঞানে······লাগিলেন' পর্যন্ত বাক্যাংশটি পরে বাদ দিয়েছেন। বাদ দেওয়ার কারণ বোধহয় এই যে, 'চিত্তপটে চিত্রিত' বলার পর আবার 'বাস্তব ঘটনাজ্ঞানে সেই সমস্ত অবলোকন,' করার ব্যাপারটাতে পুনরাবৃত্তিদোষ এসে যায়।

শব্দ পরিবর্তন খুব বেশী দেখা যায় না। মনে হয় শব্দ নির্বাচনে তাঁর তীক্ষ্ণ শ্রুতিক্ষমতা প্রায় ক্ষেত্রেই প্রথম নির্বাচনকেই শেষ নির্বাচন করে তুলতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের ঝোঁকে কিছু কিছু বদল চোখে পড়ে। যেমন 'কহিলেন' স্থানে পরবর্তী সংস্করণে 'বলিলেন' লিখেছেন, অবশ্য সর্বত্র নয়। 'আজি' হয়েছে 'আজ'। 'লাভ করেন' স্থানে 'পাইয়াছিলেন'। 'প্রদান করিয়াছিলেন' স্থানে 'দিয়াছিলেন'। অনেক সময়ে ক্রিয়াপদের শেষে যে 'ক' ব্যবহার করতেন, পরে তা বর্জন করেছেন। যেমন, 'আশ্রয় করিবেক' স্থলে 'আশ্রয় গ্রহণ করিবে।' লক্ষ্য করেছি অনেক সময় 'অবলোকন' ক্রিয়াপদটি বদলেছেন, যেমন 'সীতার বনবাসে'র উনবিংশ সংস্করণে আছে : 'এদিকে মিথিলাবৃত্তান্ত অবলোকন করুন।' সপ্তবিংশ সংস্করণে রয়েছে : এদিকে মিথিলাবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন।' বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অর্থ

'অবলোকন' শব্দে প্রকাশিত হয় না ভেবেই 'দৃষ্টিপাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'শকুন্তলা'র একাদশ সংস্করণে রয়েছে 'এই বলিয়া, তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া রাজা অনিমেষ নয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' আড়াল থেকে তপস্বী কন্যাদের যৌবনমাধুরী দেখবার ইচ্ছা তীব্র বলেই 'অবলোকন' শব্দের পরিবর্তে নিরীক্ষণ শব্দের দ্বারা 'খুঁটিয়ে দেখা' অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অনেক সময় মূলানুগ না ক'রে স্বচ্ছন্দ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী সংস্করণে। 'শকুন্তলা'র একাদশ সংস্করণে রয়েছ : 'মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত, ইহাকে সাদর মনে সেচন ও সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।' চতুর্দশ বা পঞ্চদশ সংস্করণে দেখছি : 'মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত, উহাকে ['সতত:'-পঞ্চদশ সং] সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।'

এছাড়াও কিছু শব্দ বদলেছেন অর্থের বিশেষ স্পষ্টতার দিকে তাকিয়ে। যেমন 'শকুন্তলা'র মধ্যে 'শরসন্ধান' স্থানে করেছেন 'সংহিত শর'। যে শর নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এই অর্থ অভিপ্রেত ভেবে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'পরিপূর্ণ' স্থানে করেছেন 'পরিপূরিত', করেছেন কর্মবাচ্যের ভাব আনতে গিয়ে। 'ভর্তৃসন্নিধানে' স্থানে বসিয়েছেন 'পতিসন্নিধানে।' সহজবোধ্য করারই চেষ্টা মনে হয়। সেই চেষ্টাতেই সংস্কৃতের শাসনমুক্ত ক'রে লিখেছেন 'ফলমূল আদি আহরণ করিবেন' স্থানে 'ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন।' অর্থ বিশেষ স্পষ্ট করবার জন্য নতুন শব্দ বসিয়েছেন। যেমন সীতার বনবাসে : 'চিত্রদর্শনে জনস্থান বৃত্তান্ত বর্তমানবৎ বোধ হইতেছে।'—এই বাক্যে 'চিত্রদর্শনে'-র পরে 'চিরাতীত' শব্দটি নতুন যোগ করেছেন। বোধহয় 'বর্তমানবৎ' শব্দটির বৈপরীত্যে 'চিরাতীত' শব্দটি বসিয়ে চিরাগত অতীত স্মৃতিতে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করবার ভাবটি আনতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সীতার বনবাসের আলোচ্য কোনো সংস্করণেই প্রস্রবণ গিরির বর্ণনায় 'জলধর পটল সংযোগ' পাইনি। পেয়েছি 'জলধর মণ্ডলীর যোগে'। 'পটল' শব্দটির খাদ্যানুষঙ্গ প্রাকৃতিক বর্ণনায় শ্রুতিকটু ঠেকায় পূর্ববর্তী কোনো সংস্করণে বাদ দিয়ে থাকবেন।'

যাই হোক, বিভিন্ন সংস্করণের এই তুলনাত্মক আলোচনা এই কথাই কি প্রমাণ করে না যে বিদ্যাসাগর সমসাময়িক গদ্যলেখকদের তুলনায় সবচেয়ে সজাগ সতর্ক গদ্যলেখক। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অতিরিক্ত সতর্কতায় তিনি ব্যক্তিক রীতি বা individual style গড়তে চান নি। বরং সার্বজনীন

রীতি বা common style গড়ে তোলার জন্ম প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যক্তিচেতনাকে সজাগ রেখে (বিভিন্ন যতিচিহ্নের প্রয়োগ, বিভিন্ন চিহ্নের পার্থক্য অনুযায়ী ব্যবহারের চেষ্টা, শব্দ নির্বাচনে সুবোধ্যতা ও সুরুচি প্রকাশের চেষ্টা, জটিল বাক্যভার থেকে মুক্ত থাকবার চেষ্টা ইত্যাদি) সজাগ রেখে বিদ্যাসাগর গদ্যের রাজপথ তৈরি করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিকরীতি-প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই কমন স্টাইলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলেই মনে করি।

অজয়েন্দ্রনাথ সরকার

॥ "সতী" ও বৈধব্য সমস্যার সমাধানে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রেরণা ও রণনীতি ॥

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় আইন পাস করে; তার প্রায় সাতাশ বছর পরে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই প্রবর্তন করা হয় বিধবাবিবাহের;—ঐ একই ভাবে, আইন চালু করে। ঐ বছরেরই ২১শে আগস্ট জনৈক মহিলা একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন "সংবাদ ভাস্করে।" "শ্রীবিদ্যাদেবী" নামের ঐ মহিলা বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তনে আনন্দিত হয়ে লিখেছিলেন—

> "…রামমোহন রায় সতীগমন নিষেধ করাইয়া শারীরিক দাহ নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শারীরিক ও মানসিক দাহ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিলেন,…"

বিধবানারীর সমস্যা সমাধানে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কীর্তির এই-ই হলো বাস্তব-মূল্যায়ণ। এই মূল্যায়ণে পত্রলেখিকার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্যেই তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সতীপ্রথারদকারী রামমোহনকেও স্মরণ করতে পেরেছিলেন।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যুগন্ধর রামমোহন তাঁর উত্তর সাধকদের জন্যে পথ খুলে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সামনেও সে পথ ছিল খোলা। পথ চলার মন্ত্র তাঁর অনেকটা নতুন হতে পারে, কিন্তু হেঁটেছেন তিনি সেই পথেই।—

জন্ম তারিখের বিচারে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছেচল্লিশ (বা আটচল্লিশ) বছরের। কিন্তু এই সময়গত ব্যবধান বিদ্যাসাগরকে রামমোহনের চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি; তা অবশ্য সম্ভবও নয়। বিষয়টি একটু খুলেই আলোচনা করা যাক।

১৮২৯ সালে যখন সতীপ্রথা রদ হয়, বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ন' বছরের সামান্য কিছু বেশি।—সবে তখন সংস্কৃত কলেজে পাঠ নিতে শুরু করেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, স্বাভাবিক কারণেই তখন ঐ আইন পাশ সংক্রান্ত ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রভাব তাঁর মনে কার্যকরী হয় নি। কিন্তু ক'বছর পরেই যে

ঐ প্রথা রদের ঘটনা ও সমসাময়িক রামমোহন-আলোচনা তাঁর কিশোর মানসে একটি স্পষ্ট ছাপ ফেলতে পেরেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রামমোহন যখন মারা যান (১৮৩৩, ২৭ সেপ্টেম্বর) তখন বিদ্যাসাগর ছিলেন তের বছরের কিশোর। সেই সময়ের আগে থেকেই সতীদাহ নিষেধক রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে রীতিমত সামাজিক আলোড়ন দানা বেঁধে উঠছিল। ঐ বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়বার জন্যেই রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "ধর্মসভা" (১৮৩০)। প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও তখন উঠে পড়ে লেগেছিলেন ;—লর্ড বেন্টিঙ্ককে তাঁরা সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছিলেন, রামমোহনকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছিলেন এবং আরও যা' করণীয় তার ব্যবস্থায় উদ্‌যোগী হচ্ছিলেন। তারপরে—রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এবং আরও পরবর্তী সময়ে রামমোহনের শোকসভার অনুষ্ঠান, তাঁর স্মৃতিরক্ষার আলোচনা ইত্যাদি বিষয়গুলিও সহরকে সরগরম করে রেখেছিল। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন তের ছাড়িয়ে আরও ক' বছর এগিয়ে গিয়েছিল ; অর্থাৎ রামমোহন কে, কি তিনি করেছিলেন, তা' ভালো না মন্দ, সাধারণভাবে সে সব বুঝবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে তখন দেখা দিয়েছিল। বস্তুতঃ পক্ষে নব্যবঙ্গের পীঠস্থান কলকাতার বুকের ওপর অবস্থিত হিন্দু কলেজের পাশে সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মেধাবী তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিশোর বিদ্যাসাগরের পক্ষে রামমোহন ভাবনা থেকে দূরে থাকা সম্ভবপর ছিল না। ঐ বয়সেই যে তিনি সতীপ্রথারদ আইন সমর্থন করেছিলেন তাও অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় ; কেন না বাল্যবয়সেই রাইমনির সংস্পর্শে এসে তিনি সমগ্র নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই ঐ আইনে নারী জাতির বিশেষ ক'রে বিধবা নারীর মঙ্গল হবে ভেবে তিনি যে সুখী হয়েছিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি!—সেই সময়েই বিদ্যাসাগর (হয়ত বা অবচেতন মনেই) শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁর পূর্বসূরী রামমোহনকে। কিশোর বয়স "হিরো ওয়র্সিপের" সময় ; কাজেই এই অনুমান অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় না। রামমোহনের প্রতি তাঁর এই বাল্যশ্রদ্ধাই পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছিল পথিকৃৎ রামমোহনের প্রতি পথিক বিদ্যাসাগরের ভক্তি ও প্রেরণায়। প্রথম বিধবা-বিবাহে উপস্থিত থাকবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী রামমোহন-পুত্রের প্রতি বিদ্যাসাগর যে ধিক্কার বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যেই আমাদের বক্তব্যের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

"রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম।' এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।' এরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন। *

[দ্রঃ বিদ্যাসাগর : বিহারী লাল সরকার]

কিন্তু বিধবা নারীর দু'টি বড়ো সমস্যার সমাধানে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে পূর্ব ও উত্তর সুরীর সম্পর্ক থাকলেও দেখা যায়, ঐ সমস্যা সমাধানে উভয়ের প্রেরণা ও রণনীতি নির্দ্ধারক চিন্তাধারার মধ্যে বেশ খানিকটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে।—উভয়ের মধ্যকার সময়গত ব্যবধান এবং মনোগত এক বি-সমতাই ছিল এর মূলে।—

সমাজ সংস্কার করবার প্রেরণা উভয়ের ক্ষেত্রেই এসেছিল সম সাময়িক যুগ-পরিবেশ থেকে,—সামাজিক তাগিদ হ'তে। নব জাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মন তখন সামাজিক আধ্যাত্মিক সবকিছু সম্বন্ধেই আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিয়েছিল। তারই পরিণামে গড়ে উঠেছিল নানা আন্দোলন (প্রতি আন্দোলনও)।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর সংগঠিত আন্দোলন সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। বিদ্যাসাগরের বেলায় এছাড়া আরও একটি প্রেরণার উৎস ছিল;—তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। পূর্বে রাইমণির উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের

এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষ করা যায়।

*মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁর পিতৃদেবের মুখ হতে শুনেছিলেন, বিদ্যাসাগরকে রমাপ্রসাদ বলেছিলেন "আমার পিতা সমাজ সংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা বৃথা;" [দ্রঃ বিদ্যাসাগর : বিহারী লাল সরকার] এই অজুহাত দেখিয়ে রমাপ্রসাদ বিধবা বিবাহ সভায় উপস্থিত হ'তে চান নি। বলা বাহুল্য, এ পলায়নী মনোভাব ছাড়া আর কিছু নয়। বিদ্যাসাগরকে তিনি ঠিক কি বলেছিলেন তা' নিয়ে মতভেদ থাকলেও এটা সত্য যে রমাপ্রসাদ বিবাহ সভায় যেতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগর রামমোহনের ছবি দেখিয়ে রমাপ্রসাদকে যা বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে কেও কোন বিপরীত বক্তব্য রাখেন নি। বিদ্যাসাগরের পক্ষে রমাপ্রসাদকে ওই কথা বলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে রাইমনির স্থান ও প্রভাব ছিল অপরিসীম। বাল্যকালে যে রাইমনির স্নেহে ও বাৎসল্যে তিনি ধন্য হয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধে পরিণত বয়সে তিনি বলেছিলেন—

> "যে ব্যক্তি রাইমনির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার—তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

["স্বরচিত জীবন চরিত"—বিদ্যাসাগর]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, রাইমনি ছিলেন বিধবা নারী। রাইমনির স্নেহ দয়া বিদ্যাসাগরকে সমগ্র নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছিল এবং নারীজাতির মঙ্গলবিধানে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গিয়েছেন। কিন্তু শুধু রাইমনি নন, তাঁর শিক্ষক বৃদ্ধ শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বালিকা বধুর বিধবা হবার ঘটনাও তাঁকে বিধবা বিবাহের সম্পর্কে ভাবিত করে তুলেছিল।

[দ্রঃ "বিদ্যাসাগর চরিত"—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঠিক এই ধরণের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রামমোহনকে সতীপ্রথা বন্ধ-করণে প্রেরণা দিয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। দু'টি ঘটনার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে; কিন্তু তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় রয়েছে। একটি ঘটনা নাকি ঘটেছিল তাঁর তিব্বত ভ্রমণের সময়। সেখানে তিব্বতী পুরুষদের চক্রান্তে তাঁর জীবন যখন বিপন্ন হয়েছিল তিব্বতীরমণীরাই তখন তাঁকে সযত্নে রক্ষা করেছিল। এই ঘটনার উল্লেখ রামমোহনের ক'জন জীবনীরচয়িতা এবং অনুগামী ভক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের স্মৃতিসভায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> "তাঁহার জীবনের শেষভাগেও যখন এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু বহিতে থাকিত।" [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক, ১৮১৩ শক, ৫৭৯ সংখ্যা]

কিন্তু তিনি আদৌ তিব্বতে গিয়েছিলেন কিনা তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। প্রমাণ থাকলে বলা যেত, নারীজাতির প্রতি তাঁর এই কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা তাঁকে পরোক্ষে নারীর দুঃখ মোচনে—সতীপ্রথা বন্ধে প্রেরণা জুগিয়েছিল। অন্য ঘটনাটিও রামমোহন প্রসঙ্গে বারবার শোনা যায়। রামমোহন নাকি

সহমরণে উদ্যতা স্বীয় ভ্রাতৃবধূকে দেখেই সতীপ্রথা রদ করণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ভ্রাতার মৃত্যু সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে মনে হয় না।*

নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না ; সহমরণ সংক্রান্ত গ্রন্থেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন যে যুক্তিতে সহমরণ অশাস্ত্রীয় প্রতিপন্ন করে, বিধবাদের ব্রহ্মচর্যের বিধান মেনে নিয়েছিলেন, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সে যুক্তির অবতারণা তিনি করতেই পারতেন না। কিন্তু তবুও বলতে হয়, আমাদের জানা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোন প্রামাণিক ঘটনা বা অভিজ্ঞতা তাঁকে সতীদাহপ্রথা রদে অনুপ্রাণিত করেনি। নব জাগরণের প্রেক্ষাপটই এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রেরণাস্বরূপ হয়েছিল।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার কার্যের নীতির মধ্যেও মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।—

রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী ;—সাকার সাধনার ঘোর বিরোধী। ধর্ম সংস্কারকের ভূমিকাতেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ছিলেন একবারেই মৌন। যাকে বিশুদ্ধ হিউম্যানিষ্ট বলা হয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তাই-ই। অবশ্য এ কথা বক্তব্য নয় যে, রামমোহনের চিন্তা ও কর্ম মানবাভিমুখীন ছিল না। কিন্তু তবুও বলতে হয়, একেশ্বরবাদী মনই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে প্রায় সর্বক্ষেত্রে। তৎকালে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে রামমোহনকে নিরাকার একেশ্বরের কথা প্রচার করতে হয়েছিল। সমসাময়িক নানা আক্রমণ ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের নির্মল রূপ তুলে ধরাই ছিল রামমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার কথা প্রচার করে তিনি একই সঙ্গে প্রতিহত করেছিলেন খৃষ্টান পাদ্রীর কুৎসা আর রক্ষণশীল হিন্দুর গোঁড়ামিকে। রামমোহন প্রমাণ করেছিলেন পৌত্তলিকতা প্রকৃত হিন্দুধর্মে স্বীকৃত হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন, ধর্মের নামে যে সব সামাজিক কুসংস্কার চলে আসছে সেগুলি আসলে পৌত্তলিকতারই প্রশ্রয় প্রাপ্ত। এই কারণেই নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার জন্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা (১৮১৫) এবং ব্রাহ্মসমাজে (১৮২৮) নানা সামাজিক কুসংস্কারের বিষয়ও আলোচিত হত। তাই একথা বলা যায়, রামমোহনের ধর্মবোধ ও চিন্তা কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর ঐ আন্দোলন যে তাঁর ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস বিযুক্ত নয় সে সম্বন্ধে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একমত ছিলেন।—

*অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায়, এই বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যাদি পরিবেশন করা হ'ল না।

"কিন্তু তিনি যে সকল নূতন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রকার নূতন সংস্কার সুদৃঢ় ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে স্বীয় ধর্ম্ম পিপাসার বলে জ্ঞানের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ঋষিদিগের সেই পুরাতন ধর্ম্ম আনয়ন করিলেন; পরে সেই ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিতে সামাজিক প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়ই আলোকিত করিয়া দেখিলেন যে, এই সকলেও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকার রাজত্ব করিতেছে। তখন তিনি ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়াইয়া সকলপ্রকার কুসংস্কারই উন্মূলন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিলেন এবং প্রায় সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইলেন।" [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক, ১৮১৩ শক, ৫৮৯ সংখ্যা]

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। আধুনিক অর্থে যাকে সমাজসচেতন বলা হয়, বিদ্যাসাগর একান্তভাবে ছিলেন তাই-ই। তাঁর কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের পিছনে ছিল তাঁর বিশুদ্ধ মানবকল্যাণবোধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্ভূত বেদনাবোধ। তৎকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই অবশ্য তাঁর এই মানবকল্যাণবোধ ও বেদনাবোধ বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছিল; কিন্তু ধর্মবোধের বা আধ্যাত্মিক চিন্তার কোন স্থান সেখানে ছিল না। ধর্মসম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে একবার তিনি বলেছিলেন, "ধর্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।"

[বিদ্যাসাগর জীবন চরিত—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ধর্মমত কি ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ঈশ্বর বিশ্বাস করলেও রামমোহনের মত নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই হয়তো বা তিনি মানতেন। কিন্তু তিনি ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে যাই ভাবুন না কেন, তাঁর সমাজসংস্কার প্রচেষ্টায়, সেই ভাবনার কোন ভূমিকাই ছিল না।

র্যাশানালিজম নবজাগরণের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়ের মধ্যেই এর বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য এখানেই যে উভয়ের ক্ষেত্রে ঐ যুক্তিবাদের প্রয়োগ ঘটেছিল দু'টি স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সূত্র ধরে। রামমোহন বিশ্বাস করতেন বিচারবুদ্ধিহীন বিশ্বাসই হ'ল ভ্রান্ত ধর্মবোধের মূলে; ঐ ভ্রান্ত ধর্মবোধই আবার প্রশ্রয় দিয়েছে নানা সামাজিক কুসংস্কারকে। একেবারে শৈশব থেকেই মানুষ তার নিজস্ব সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রশংসা বাক্য শুনে সে সবের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে এ-সব বিষয় যাচাই

করবার মানসিকতা তার মধ্যে আর গড়ে ওঠে না। [দ্রঃ "তুহ ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্"] রামমোহন এই বুদ্ধি ও যুক্তির অস্ত্রে শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; আর ঐ সূত্রেই সামাজিক নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শাস্ত্রীয় বচনের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরও যুক্তিবাদী ছিলেন; কিন্তু কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা ঐশ্বরিক চিন্তা পুষ্ট মন নিয়ে তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি বিস্তার করেন নি।

রামমোহন ছিলেন ধর্মীয় আচরণে জ্ঞানমার্গের পথিক; তাই পৌত্তলিকতা বিরোধী একেশ্বরবাদী। এই একই কারণে কামনামূলক ধর্মীয় আচরণকে তিনি প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত বলে মনে করতে পারেন নি। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি তাঁর এই বিশ্বাস ও মতেরই সাহায্য নিয়েছিলেন। সহমরণের পক্ষ সমর্থনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন, সদ্যবিধবা রমনী স্বামীর জলন্তচিতারোহন করলে স্বর্গলাভের অধিকারী হতে পারে, স্বর্গে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, ঘোর অপরাধী পতিকেও অপরাধ হতে মুক্ত করতে পারে, ইত্যাদি। এই যুক্তি হতেই বুঝা যায়, নানা বিষয়ে কামনা করে বা নানা প্রলোভনে লুব্ধ হয়েই সতীনারী চিতায় আরোহন করত (বা করতে বাধ্য হ'ত)। জ্ঞানমার্গের পথিক রামমোহন কামনামূলক ধর্মাচারকে নিন্দনীয় মনে করতেন বলেই নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে বলেছিলেন, কামনামূলক ধর্ম নিন্দার্হ; আর সেইজন্য সতীপ্রথাও যথার্থ নিন্দার যোগ্য;—নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য পালনই বিধবা নারীর পবিত্র ও শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে এইভাবে যুক্তিজাল বিস্তার করে রামমোহন সামাজিক সমস্যার সমাধানে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবোধপুষ্ট বিচার বুদ্ধিরই প্রয়োগ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর কিন্তু তা করেন নি। আগেই বলা হয়েছে সমাজসংস্কারে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের (যদি থেকেও থাকে) কোন প্রভাব পড়ে নি। তিনি যে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন তা তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সঙ্গে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কেন তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে লড়তে গিয়ে শাস্ত্রীয় বচনের সাহায্য নিয়েছিলেন সে বিষয়ে তিনি যা বলে গিয়েছেন তাতেই এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে :—

> "..... কিন্তু যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে (বিধবা-বিবাহ) কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে কর্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।……অতএব বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক।"

[দ্রঃ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব]

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, সামাজিক অসুখটি ধরতে পেরেই তিনি রোগীদের ওপর শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রয়োগ করেছিলেন।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা গেলেও বলতে হয়, বিদ্যাসাগর ছিলেন রামমোহনেরই উত্তরসাধক; তাঁর আরব্ধ কাজের প্রকৃত সম্পাদক। তাঁরই নেতৃত্বে ঐ কাজ হয়েছিল সুসম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর কেউই সতীদাহ প্রথার নিবারণ ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তন সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রথম সাংগঠনিক নন; কিন্তু তাঁদেরই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও প্রযত্নে যে ঐ সমস্যা দুটির আইন সম্মত সমাধান হয়েছিল, এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। ১৮২৯ সালে রামমোহনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিধবানারীর বেঁচে থাকবার সমস্যাটি দূরীভূত হয়েছিল। বিধবা বিবাহের ব্যাপারেও রামমোহন মনোযোগী হয়েছিলেন। সমাজের নানাব্যক্তি ও গোষ্ঠিও নানাসময়ে নানাভাবে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা সুরু করে দিয়েছিল। এব্যাপারে কিঞ্চিৎ চেষ্টাও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু প্রকৃত নেতার ও কর্মীর অভাবে এই সমস্যা থেকেই যাচ্ছিল। এমনি অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। রামমোহন ও প্রগতিশীল সমাজের ইচ্ছা ও দাবীর সঙ্গে তাঁর নিজের ইচ্ছা ও দাবীও মিলে গিয়েছিল। তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সঙ্গে প্রাণপণ করে শেষপর্যন্ত সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। আর তারই ফলে, রামমোহনের প্রযত্ন ও নেতৃত্বে যারা রক্ষা পেয়েছিল চিতাগ্নির মৃত্যুফাঁদ থেকে, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে তারাই রক্ষা পেয়েছিল জীবনমৃত্যুর যন্ত্রণা হতে।—"শ্রীবিদ্যাদেবীর"র বক্তব্যের তাৎপর্য সত্যিই অনস্বীকার্য।

সুধীরকুমার নন্দী

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত পথিক রামমোহন

রবীন্দ্রনাথ কল্পনার দৃষ্টিতে অসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত ভারতপথের পথিক রামমোহনকে বারবার দেখিয়াছেন ভিন্নতর মূর্তিতে। কখন ভারত-পথিক স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় পরিব্রাজক রূপে ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি মূর্তি পূজাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। কখনও বা দেখি সমাজ সংস্কারক রামমোহন সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। আবার কখনও বা "নব্য ভারতের আধুনিক কবি" রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে দেখিয়াছেন শহীদের মূর্তিতে : Rammuhan suffers martyrdom in his fime and paid the price of his greatness (18 February, 1933)। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিলেন যে শহীদ রামমোহনের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়াই নব্য ভারত নূতন করিয়া বাঁচিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে দেখিলেন প্রাচীন-কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধকরূপে : এই সমন্বয়ের সাধনা করিয়াছেন রাজা রামমোহন। রবীন্দ্রনাথ তপস্বী রামমোহনকে প্রত্যক্ষ করিলেন ভারতবর্ষের সমকালীন অনাচার ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে; ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক, ব্রাহ্মধর্মের উদ্গাতা রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিলেন হিন্দু সমাজের মর্মান্তিক প্রয়োজন বোধের ভিতর দিয়া তাহার অন্তর্গত শক্তি ও উদ্যমের নব অভ্যুদয়ের প্রতীক হিসাবে। স্থান-কাল নিরপেক্ষ রামমোহনের যে ভাবমূর্তির কল্পনা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য। নানান রঙে নানান রেখায় রবীন্দ্রনাথ 'অভ্রভেদী অচল শিখর প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল' যে অতিমানব রামমোহনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আরেক কবিবরের কবিতা হইতে পংক্তি উদ্ধার করিয়া আমরা বলিতে পারি :

> 'নমি তোমায় নরদেব,
> কি গর্বে গৌরবে দাঁড়ায়েছ তুমি,
> সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ
> পদে শস্প ভূমি।'

ভারতীয় সাধকদের দীর্ঘকালের সাধনার ধারা সম্যকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল রামমোহন রায়ের জীবনে: একথা রবীন্দ্রনাথ বলিলেন (ভাদ্র, ১৩৩২)। রামমোহন উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানকে সত্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন; তিনি কাহাকেও বর্জন করেন নাই। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি তৎকালীন ভেদবাদীদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করিতে গিয়া কখন কখনও নিন্দাকেও বরণ করিয়াছিলেন। কবীর, দাদূ ও নানক ভারতের যে সত্য সাধনাকে বহন করিয়াছিলেন, রামমোহনের মধ্যে সেই সত্য সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রাচীন কালকে আধুনিক কালের সহিত যুক্ত করিয়া রামমোহন শুধু যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনার সহিত আধুনিক ভারতের মনন সাধনাকে যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, রামমোহন ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যোগ সেতু। পূর্ব ও পশ্চিমের জাতিপুঞ্জের মধ্যে সর্ববিধ ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া গিয়া যদি আমরা অবিচ্ছিন্নতাটুকু অনুভব করিতে পারি, বর্তমান পৃথিবীতে তাহার মূল্য অপরিমেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ কল্পনানেত্রে অবলোকন করিলেন, পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন সেদিনের ভারত সর্বপ্রথম রামমোহনের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যা লব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যে অর্থাৎ পরমাত্মীয় সকল আত্মার ঐক্য ও বিশ্বাসের মধ্যেই সর্ব মানবের মিলনের শাশ্বত উপলব্ধি করিয়াছিলেন (পৌষ ১৩২৪)। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তনা করিয়া রামমোহন হিন্দু 'সমাজ' হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই। বিদ্রোহী রামমোহনের যে ভূমিকা সকলে সেদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন হিন্দু সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেই রামমোহনকে বিদ্রোহী' বা 'বিপ্লবী' আখ্যা রবীন্দ্রনাথ দেন নাই। তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া দেই: 'রামমোহন তাঁহার চারিদিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চে উঠিয়াছেন, সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। একথা কোন মতেই বলিতে পারিব না যে, তিনি হিন্দু নহেন। কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে নীচে ছিল এবং নীচে থাকিয়াও তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে।' 'রামমোহন হিন্দু, এই গালভরা কথা যুক্তিবিহীন-অসার দাম্ভিকের ভূমিকায়, রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই। তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'কেন বলিতে পারিব না?' তাহার উত্তরে তিনি আবার বলিয়াছেন, 'কেননা, একথা সত্য নহে। কেননা, তিনি যে নিশ্চিত হিন্দু

ছিলেন। অতএব তাহার মাহাত্ম্য হইতে কখনোই হিন্দু সমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দু সমাজের বহুশত লোক যদি এক হইয়া সকল স্বয়ং বিধাতার কাছে এইজন্য দরখাস্ত করে, তথাপি পারিবে না। শেক্সপীয়রের, নিউটনের প্রভাব অসাধারণ হইলেও, তাহা যেমন স্বাধীন ইংরেজের সামগ্রী, তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয়, তবে তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজেরও সত্য মত (বৈশাখ ১৩১৯)। রবীন্দ্রনাথের চোখে হিন্দুরূপে প্রতিভাত হইয়াও রামমোহন কিন্তু ছিলেন মূর্তি ভাঙার কালাপাহাড়দের দলে।

রামমোহন মূর্তি পূজার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল ও প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তি পূজাকে কোনমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না; রবীন্দ্রনাথ এই মহৎ সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রামমোহন হিন্দু হইয়াও কেন মূর্তি পূজাকে স্বীকার করিতে পারিলেন না তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্ব মানবের হৃদয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বমানবের হৃদয় বাসা বাঁধে সেই মানুষ তো কখনোই দেশকালের সীমার দ্বারা চিহ্নিত ও দেশকালে পরিপুষ্ট মূর্তি পূজাকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। মূর্তি পূজা দেশিক এবং কালিক। রামমোহনের সর্ব মানবতা বাদে উৎসর্গীকৃত দৃষ্টি সবসময়ই সামগ্রিকতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। খণ্ডিত ঈশ্বর সত্তাকে দেশকালের বেড়া দিয়া বাঁধিয়া কোন বিশেষ মূর্তিতে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা রামমোহন করেন নাই। 'মূর্তি পূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে, বিশেষ জাতিকে, বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত একান্ত পৃথক করিয়া দেখে—সে বলে, যেহেতু আমার এই বিশেষ দীক্ষা, সেই হেতু আমার এই বিশেষ মঙ্গল; তখন সে বলে, আমার এই সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল লাভ নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবও না।' রামমোহন বাল্যকালে অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে উদ্দীপিত করেন না, অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন, অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি আমার দেবতা হইতে পারেন না। কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনখানেই বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই

সম্ভব হয় না ; এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য। এতাদৃশ উক্তি রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন, ১১ই মাঘ ১৩১৮ তারিখে। এই মানুষের দেবত্ব সন্ধান কল্পেই রামমোহন আজীবন সাধনা করিয়াছেন। তাই তিনি যে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনা করিলেন তাহার মধ্যে মানুষের সমস্ত বোধকে অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসটুকু আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'সেইজন্যই আমরা দেখিলাম, জীবনের কর্মক্ষেত্রে মানুষ্যত্বের সকল প্রয়াসে, মানুষের জীবন সাধনার সকল বৃত্ত'বলয়ে রামমোহনের কৃতির স্বাক্ষর পড়িল নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে। সমগ্রতাবাদী রামমোহন উত্তর জীবনের সমগ্রতাবাদী বেনেজেও ক্রোচের মতই সমগ্র মানুষ্যত্বকে আপনার বিরাট কর্মক্ষেত্র রূপে কল্পনা করিলেন। তাইতো কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িল: "রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্মনীতি সকল দিকেই তাঁহার চিন্তা পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তিকে স্বভাবতঃ প্রচার করাই তাঁহার মূল প্রেরণা নহে— ব্রহ্মবোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল।"

এই ব্রহ্মের বোধের মধ্য দিয়া রামমোহন মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকে এমন বড় করিয়া এমন সত্য করিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি ছিল সংস্কার মুক্ত। সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্ত শক্তির বন্ধন মোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে। মানুষ যেখানে কোন মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড় করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনা করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্ম সাধনাকে নবরূপে নূতন মর্যাদায় ভারতবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করিয়া বিশ্বব্যাপী করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহনের সকল চিন্তায়, সকল চেষ্টায় মানুষের প্রতি তাঁহার প্রেম, দেশের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য, সমখিত হইয়া এ সমস্তই ব্রহ্ম সাধনাকে আশ্রয় করিয়া উদার ঐক্য লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবনের সহিত এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু, কেবলমাত্র জ্ঞানের বস্তু করিয়া তাহাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেখেন নাই। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব ইতিহাসে, বিশ্ব ধর্মে, বিশ্ব কর্মে সর্বত্রই সত্য করিয়া দেখিবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করিয়া প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়ে নূতন যুগের প্রবর্তন করিলেন। এই মহৎ সত্যটুকু রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিয়াছিলেন

১২ই মার্চ, ১৩১৭ তারিখে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন আকাঙ্খাকে বহন করিয়া রামমোহন আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতবর্ষে তিনি যে নূতন ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নহে; ভারতবর্ষ, যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তং-শিবংদ্বৈতম্, সেখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব সাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে রামমোহন ছিলেন সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক। এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার মধ্যে সর্ব ধর্মের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। রামমোহন ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম গ্রন্থ হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া সাধারণের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য লজ্জার সহিত ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়া দেন নাই, আমাদের অধিকার যে কোনখানে ছিল তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই শাল প্রাংশু মহাভুজ রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কল্পনা নেত্রে; কোন বাধা, কোন সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি যে পশ্চিমের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিতে পরিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। আপনাকে বিকাইয়া দিয়া পরানুকরণ করা ছিল রামমোহনের স্বভাববিরুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, রামমোহনের চরিত্র আলোচনা করার একটি গুরুতর আবশ্যকতা আছে। তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া দেই: "আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি 'রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের আজ বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাকপটু লোক, আমাদের তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী, আমাদের আত্ম বিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘু প্রকৃতি, জীবনের সর্বদিকে চরিত্র গৌরবের প্রভাবে আমাদের অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে চিরন্তন আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও (৫ই মাঘ, ১২৯১ সাল)।'

রামমোহনের এই যে লোক-শিক্ষক মূর্তিটি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরাও গর্বের সহিত বলিতে পারি যে, রামমোহন যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পাইয়াছিল। রামমোহন আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই। এই সূত্রে তিনি ভারতীয় ঋষিদের উত্তরসাধক। সত্যের উদ্ঘাটন ও সকলের কল্যাণ সাধনাই ছিল এই নব্য যুগের মহর্ষির জীবন সাধনা। সবার সহিত যুক্ত হইয়া সামগ্রিক কল্যাণের মহৎ ইচ্ছাটুকু রামমোহন সযত্নে পোষণ করিয়াছিলেন; সেই মহৎ ইচ্ছাই বঙ্গ সমাজের মধ্যে মহা মহীরুহ রূপে পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের এই মহৎ ইচ্ছাকে বঙ্গ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্রিয়াশীল শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রামমোহনের আত্মধারণাশক্তি ছিল অসাধারণ। এই আত্ম ধারণা শক্তি তাঁহাকে আহৃত জ্ঞানের বন্যার মধ্যে অটল করিয়া রাখিয়াছিল। দেশের ধ্রুব মঙ্গলের দিক হইতে তাঁহার দৃষ্টি কখনও বিচ্যুত হয় নাই। তাঁহার অসামান্য ধৈর্য, অসীম উদারতা ও সত্য লাভের জন্য অনির্বাণ তৃষ্ণাকে প্রত্যক্ষ করিয়া 'যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন, আমরাও সেই প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়া বলি: 'হে অন্তর্যামীন্ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখী না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্ব নিয়ন্তা করিয়া দৃঢ় রূপে আমরাণাস্ত জানি এমং অনুগ্রহ কর। ইতি। ওং তৎসৎ॥'

এই অন্তর্মুখীন অন্বেষণই রামমোহনকে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শানুসন্ধান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সেই আদর্শ তাঁহার নিজের নহে। তিনি একথা বলিলেন না যে আমার নূতন রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন ইচ্ছাই আদেশ, ঈশ্বরাদেশ। তিনি একথা বলিলেন, সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সত্যকে যুক্তির দ্বারা গ্রহণ করিয়া সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। তিনি বেদ, পুরাণ-তন্ত্রের সার ভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর করিলেন, সেই বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে। আমরা মুক্তাকে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিলেও শুক্তি খণ্ডটিকে হৃদয়ের মধ্যে এতদিন বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। রামমোহন আমাদের সেই ভ্রান্তি দূর করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, যোগের মধ্য দিয়াই ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। যখন আমরা আমাদের আত্মার ঐশ্বর্যকে লোকালয়ের মধ্যস্থলে উপস্থাপিত করতে পারি তখনই আমরা মনে মনে জানি যে, আমাদের আত্মিক ঐশ্বর্যে আমরা নিঃস্ব হইয়া যাই নাই।

সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ 'শৃন্বন্ত বিশ্বে' মন্ত্রটির উদ্ধার করিয়া বলিলেন যে, ভারতীয় জীবন সাধনার শাশ্বত মহা সত্যটুকু রামমোহনের অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি তাঁহার সাধনা লব্ধ সত্যকে কোন অবস্থায় গোপন করিতে পারেন নাই। দেশের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে, তাঁহাকে নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াছে। তবুও তিনি যে সত্যটুকু অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারেন নাই। হাজার তিরস্কার, লাঞ্ছনা তাঁহার সত্য ধর্মকে পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই। এই মহতী ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'রামমোহন রায়ের অন্য' গতি ছিল না—সত্য শিখায় তাঁহার অন্তরাত্মা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা, যত নির্যাতন করুক তিনি সেই আলোক কোথায় গোপন করিবেন, তখন হইতেই তাঁহার বিশ্রাম নাই, নিভৃত গৃহবাসে সুখ নাই। বঙ্গ সমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীরণ করিতে হইবে (আশ্বিন ১৩১৩)'। রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। ভারতের সনাতন সত্যাদর্শের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়াছিল রামমোহনের জীবনব্যাপী প্রয়াসে। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব কখন কখন রামমোহনের সহিত একই গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মুখমণ্ডলে একটি নির্মল, নিঃশব্দ তপোপরায়ণ বিষাদ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও মানস নেত্রে এই বিষাদটুকুকে প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। রামমোহনের মুখাবয়বে এই বিষাদ ছায়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিই : 'হিমালয়ে দুর্গম, নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটা নির্মল, নিঃশব্দ তপঃ পরায়ণ বিষাদ-বিরাজ করে, রামমোহন রায়ের বিষাদ' সেই বিষাদ—তাহা অবসান নহে, সন্ন্যাস নহে। তাঁহার দূরগামী সংকল্প, দূর প্রসারিত দৃষ্টিতে সুদূর ব্যাপী, মহাপ্রকৃতির ধ্যানদুর্বার বিশালতা অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমার সহিত তুলনীয়। রামমোহনের এই বিষাদ তাহাদের জন্য, যাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে যাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে যাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি স্বদেশের মানুষদের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের অভাব কোনদিনই হয় নাই। তিনি ইহাদের একজনা হইলেও তাঁহার সার্বিক দৃষ্টি তাঁহার আপন দেশের এবং কালের সীমাকে সহজেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। রামমোহন যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন যদি সেই সঙ্কীর্ণ বর্তমান

কালের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতেন, তাহা হইলে তিনি যেভাবে নিরন্তর কর্ম করিয়া বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে বিশ্বজনীনতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি কখনও করিতে পারিতেন না। এই বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সমাজ সংস্কার করিয়াছেন। তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনকরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। নব্য বঙ্গের আদি পুরুষ রামমোহন দূর প্রসারিত দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্যটিতে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইলে গদ্য সাহিত্যের সাহায্য লইতে হইবে; গদ্যের বাহনেই সেই মহতী সত্যকে সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। তাই ত বাংলা গদ্যের জনক রূপে রামমোহনের আবির্ভাব ঘটিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনকরূপে রামমোহনকে সাধুবাদ জানাইয়াছেন।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি হইল 'ঈশা বাস্যা' মন্ত্রটি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-আচ্ছন্ন সত্তারূপে থাকিবার শিক্ষা উপনিষদ দিয়াছে। এই এক-কে জানার সাধনাই হইল রামমোহনের সাধনা। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের বিশেষত্বটুকু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বহুর মধ্যে একেকে আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিদের মত একদিকে যেমন দেশের সুপ্রাচীন সাহিত্য ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ রামমোহনের ছিল, অন্যদিকে আবার আধুনিক মননশীলতাতে রামমোহনের জুড়ি মেলা ভার। তাঁহার কর্ম জীবনের বিচিত্র অসংখ্য প্রকাশ পথে তিনি আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। মানুষের প্রতি সুগভীর সমবেদনাই তাঁহাকে সতীদাহ প্রথা রোধ করিতে বদ্ধ পরিকর করিয়াছিল। যাহা শাশ্বত তাহাই নিত্য সত্য; তাই রামমোহনের দৃষ্টিতে যে অন্ধ সংস্কার তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া নিরন্তর আঘাত করিতেছিল, তাহা তাঁহার কাছে শাশ্বত সত্যের মর্যাদা দাবী করিতে পারিল না। রামমোহন সেই নিশ্চলতাকে প্রথমেই আঘাত করিলেন। ফলে তাঁহার দেশ এবং কালকে এবং সেই দেশের শাসনযন্ত্রের কর্মধারদের তিনি অস্বীকার করিলেন। অবশ্য এই অসহিষ্ণু শাসকদের দ্বারাই তৎকালীন সমাজে তাঁহার মহোচ্চতা সর্বকালের কাছে ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে উজান বহিয়া চলিয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবনে বিরোধিতা ও বিমুখতার অসদ্ভাব কখনও ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিলেন: 'দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে।' তাঁহার সমকালীন ইতিহাস হইল বৈপরীত্যের ইতিহাস। রামমোহনের আবির্ভাব কালে সমকালীন সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিল; তখন

প্রবল রাজশক্তির হাত ধরিয়া খৃষ্টান ধর্ম দেশে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। রামমোহন শত অপমান অত্যাচার স্বীকার করিয়াও ধর্মের সার্বজনীন সত্যের সহিত মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মিলাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মানবলোকে যাঁহারা মহাত্মা তাঁহাদের ইহাই সর্বপ্রধান লক্ষ্য। সর্বমানবে একাত্মা প্রতিষ্ঠাই ইঁহাদের জীবনের ব্রত। রামমোহন ইঁহাদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই দেখি তিনি আমাদের শাস্ত্রীয় সত্যকে সর্বসাধারণের বোধের মধ্যে মুক্তি দিলেন। এই সাধারণী-করণের মাধ্যমে তাঁহার নূতন ধর্ম চিন্তা দেশে উৎসবের সূচনা করিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে উৎসবের সূচনায় ধর্মে যাহা ছিল একান্তভাবে শাস্ত্রগত বিচ্ছিন্ন, তাহাই সর্বসাধারণের সম্পদ রূপে পরিগণিত হইল। সেই মহৎ কার্যটি সম্পন্ন করিলেন ভারত-পথিক রামমোহন রায়। তাঁহার চিত্তে সর্ববিদ্যার সমন্বয় হইয়াছিল। এই সমন্বয় সাধনের ফলেই তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে মুক্তি প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল। 'বুদ্ধি', 'জ্ঞান'ও 'আত্মিক সম্পদে'র ক্ষেত্রে তাঁহার এই ঐক্য সাধনার বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ এই আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন যে রামমোহনের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় আসিয়া মিলিত হইতে পারিয়াছিল। তাহার কারণ, তাঁহার চিত্তভূমিতে ভারত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশটুকু প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল। ভারতীয় বিদ্যা ও ধর্মকে তিনি আপনার সাধনার ক্ষেত্রে সমন্বিত করিয়াছিলেন। ভারত পথ-পরিক্রমায় তাহাই ছিল তাঁহার পাথেয়। এই ভারত-পথের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন : 'আধুনিক যুগে মানবের ঐক্য বাণী যিনি বহন করে এনেছেন তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারত পথের যে গান গেয়েছেন তাই উদ্ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি—

> 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে···
> হেথা একদিন বিরাম বিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি,
> হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
> তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
> বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
> সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
> হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এস খৃষ্টান,
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ॥'

সকল বর্ণ সকল জাতির পরশ-পবিত্র মহাভারতের তীর্থভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ভারত-পথিক রামমোহনের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে রামমোহনের প্রশস্তি রচনা করিবার প্রয়াস করি নাই। সে মহৎ প্রতিভা আপন শক্তির বিদ্যুৎ বিকিরণে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষের আকাশকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই প্রতিভার স্বভাবটুকু ধরিয়া যে অসংখ্য আলোক বর্তিকা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল আমরা তাহারই সংখ্যা গণনার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। রামমোহনের প্রতিভার সম্যক বর্ণনাও মূল্যায়ন করিবার সময় এখনও আসে নাই। দুই শত বৎসরের ব্যবধানে কোন এক মহতী প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নহে। নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার যে প্রাকৃতিক সহজ পন্থা সেই পথ ধরিয়াই প্রতিভার মূল্যায়ন করিতে হয়। আমাদের মতে স্বাধীন সমালোচকদের মধ্যে যাহারা অসীম প্রতিভাধর, তাহারা সমকালীন মানুষের মূল্যায়নও করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার প্রসাদ গুণে তাঁহারা যে মানসিক দূরত্বটুকু অর্জন করিয়াছিলেন, যে বৈরাগ্যের সহজেই অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহাই তাহাদের এই মূল্যায়ন করিবার হাতিয়ার হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন রামমোহনের মূল্যায়ন করিয়াছেন তখন তাহা সত্য মূল্যে গৃহীত হইয়াছে। তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা; তাই আমরা নূতন করিয়া রামমোহনের কর্ম ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করিবার প্রয়াস না করিয়া রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নটুকুকে সবিনয়ে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারই উদ্ধার করিয়াছি।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রামমোহনের ধর্মচেতনা

রামমোহনকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল "বিশ্বমানব" আখ্যা দিয়েছেন। এটাই রামমোহনের প্রথম ও প্রধান পরিচয়। মানুষের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাঁর ছিল অপরিসীম দরদ। তবে তিনি নিজে ভারতীয় হওয়াতে ও ভারতবর্ষের দুর্দশা সেই সময় প্রকট হয়ে ওঠাতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভারতের ও ভারতবাসীর কল্যাণের কথা আগে ভেবেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যমের প্রবণতা সে দিকে। ভারতপথিক রামমোহনের পক্ষেই বিশ্বপথিক রামমোহন হয়ে ওঠা সম্ভব। গতিহীন নিশ্চল ভারতীয় সমাজে তিনি আবার প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেই কারণে সমাজের সর্ববিধ সংস্কার-সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর সংস্কারকের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এটা তাঁর কাছে শুধু কথার কথা ছিল না, এটা ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। মানুষের সব চেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ এবং মানুষরূপে তার কতকগুলি স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার আছে। এই অধিকারগুলিকে পদদলিত হ'তে দেখে রামমোহন অবিচলিত থাকতে পারেন নি। একজন মানুষের অপমান তিনি মানবতার অপমান মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—"মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব ক'রে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।"

রামমোহনের ধর্মচেতনাকে তাঁর মানবিকতা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আবার তাঁর আস্তিক্যবোধ, তাঁর ঈশ্বরে আস্থা, তাঁকে মানবকল্যাণের দিকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর ধর্মচেতনা ও মানবিকতা একটি অপরটির পরিপূরক। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাই তাঁকে 'theo-philantropist' নামে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীতে ধর্মের নামেই সবচেয়ে বড় অধর্ম করা হয়েছে, নজরুল ইসলাম যাকে চলিত কথায় বলেছেন জাত নিয়ে বজ্জাতি। এই কঠিন সত্য রামমোহনের কাছে ছিল মর্মন্তুদ। তিনি দেখেছিলেন, এই সব অশান্তির মূলে থাকে মানুষের আবেগপ্রবণতা ও আচার সর্বস্ব কুসংস্কার, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নয়। তাই তিনি চাইলেন

ধর্মকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে, মানুষকে যুক্তিবাদী ক'রে তুলতে। তথাকথিত ধর্মনেতা ধর্মগুরুরা যে অলৌকিকতার আড়ালে অনেক সময় অসত্য ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন, এ কথা তিনি জনসাধারণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন—"অধিকাংশ লোককেই এই সব নেতারা তাঁদের দিকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছেন যে, ঐ অসহায় মানুষগুলি বাধ্যতা ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এবং তাদের দেখবার চোখ ও বুঝবার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। তাই নেতাদের হুকুম তামিল করবার সময় তারা সত্যিকার মঙ্গল ও সুস্পষ্ট পাপের মধ্যে প্রভেদ করাকেও অপরাধ বলে মনে করে। এবং যদিও মানুষ হিসাবে তারা মূলতঃ একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র, তবু শুধু তাদের মতবাদের জন্য ও সম্প্রদায়ের খাতিরে অন্যকে বধ করা বা নির্যাতন করা বিশেষ পুণ্য কাজ বলেই মনে করে। মিথ্যাচার, চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার প্রভৃতি নিকৃষ্টতম দুষ্কার্য--যা আত্মার পক্ষে পারত্রিক অমঙ্গলজনক এবং মানব সাধারণের পক্ষে ঐহিক অনিষ্টকর—এই প্রকার পাপ হ'তে তারা শুধু তাদের নেতাদের উপর অবিচলিত বিশ্বাস রাখলেই মুক্তি পাবে বলে মনে করে। মানুষ তাদের অমূল্য সময় এমন সব পুরাণ কাহিনী পাঠ করে কাটায় যেগুলো বিশ্বাস করাও কঠিন। অথচ এতেই প্রাচীন ও নবীন নেতাদের উপর বিশ্বাস যেন আরও দৃঢ় হয়।" (তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌' বা 'একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার', বঙ্গানুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস।)

রামমোহন ভারতীয়দের কথা বিশ্ববাসীকে সত্যানুশীলনে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। আর প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীকে তার বুদ্ধির ব্যবহার করতে হবে যে বুদ্ধি ঈশ্বরেরই দান। ব্রাহ্মণের সবচেয়ে বড় মন্ত্র গায়ত্রীতেও প্রার্থনা জানানো হয়েছে যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়। এই মন্ত্র রামমোহনের যুক্তিবাদী মনকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি একাধিকবার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। যদি আমরা ধর্মকে খোলা মন ও নিরঞ্জন দৃষ্টি নিয়ে দেখি তা হ'লে আচার ও প্রথা আমাদের কাছে ঈশ্বরের চেয়ে বড় হয়ে উঠবে না। প্রচলিত ধর্মমতগুলির প্রধান অসুবিধা এই যে, যদিও এগুলি আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরকেন্দ্রিক, এগুলির মধ্যে এমন অনেক জিনিস প্রবেশ করেছে যেগুলি সংকীর্ণ, অন্যায় ও অপবিত্র। এই গ্লানি থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে ধর্মকে শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও ঈশ্বরমুখী হ'তে হবে। আর বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেলেও ঐশী শক্তি অনন্ত ও অখণ্ড। তাই আমাদের উচিত সেই

শক্তিকে অখণ্ডভাবেই উপাসনা করা। এই চিন্তা থেকেই রামমোহনের একেশ্বরবাদের সূত্রপাত। বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে তিনি তাঁর আদর্শকে খুঁজে পেলেন। খুঁজে পেলেন তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তর। তাই যে উপনিষদের উপর বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত সেই উপনিষদের মহিমা তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন। উপনিষদের বাঙ্‌লা অনুবাদ করলেন (১৮১৬-১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

ইতিপূর্বে অবশ্য রামমোহন ব্রহ্মসূত্রের সঠিক অনুবাদ 'বেদান্তগ্রন্থ' এবং বেদান্ততত্ত্বের সার-সংকলন 'বেদান্তসার' (১৮১৫) রচনা করেছেন। তিনি তাঁর অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন প্রথম গ্রন্থের ভূমিকায়—"লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকও এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।" ভূমিকায় রামমোহন যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলির অন্যতম হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব। এটি প্রাচীন মত নয়, তাঁর নিজস্ব মত। যাঁরা অদ্বৈতবাদী ও শঙ্করাচার্যের অনুগামী, তাঁরা বিশ্বাস করেন জগতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো কিছুর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। আর ঈশ্বর অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনসগোচর, তাঁর কোনো প্রকৃতি, বৃত্তি বা গুণ সেই। জগতে নানাবিধ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞান থেকে। অদ্বৈত-দর্শন অনুসারে, ব্রহ্ম যেহেতু নির্গুণ, তিনি আমাদের উপাস্য হ'তে পারেন না। রামমোহন নিজে অদ্বৈতবাদী কিন্তু প্রচলিত অদ্বৈতবাদে কিছু পরিবর্তন এনেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন—"রামমোহন শঙ্কর-শিষ্য ও অদ্বৈতবাদী হ'য়েও সংসার বিমুখ হলেন না, এইটিই হল নবমতের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন জানতেন অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম নির্গুণ। সেই নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকল্প ব্রহ্ম নেতিধর্মী। অর্থাৎ ব্রহ্মকে নেতি নেতি অসংখ্যবার ব'লেও তাঁকে ইতিবাচক করা যায় না। সুতরাং তাঁকে সগুণরূপে উপাসনা করতে হবে। তবে সগুণ ও সাকার প্রতিশব্দবাচক নয়।"

এর মধ্যে অসঙ্গতি চোখে পড়া অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের ধর্মচেতনায় কিছু কিছু অন্যান্য অসঙ্গতি এবং বিরোধাভাসও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অদ্বৈত-দর্শন অনুসারে অবিদ্যা দূর করার ও জ্ঞান লাভ করার প্রধান উপায় যচ্ছে শ্রদ্ধা এবং প্রত্যাদেশ। 'যুক্তিবাদী' রামমোহন অদ্বৈতবাদের প্রয়োজনে সময় সময় বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য অস্বীকার করতে কিন্তু কুণ্ঠিত নন। কুণ্ঠিত নন উপলব্ধিকে বোধের চেয়ে বড় আসনে বসাতে। তবে এটাও ঠিক, ঈশ্বরনিষ্ঠা বোধ থেকে আসে না, অন্তরের উপলব্ধি থেকে আসে ('believing where we cannot prove')। তাই ধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক হ'লেও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে রয়েছে তাঁর অনুভূতি। মহান্ তাঁদের চিন্তায় অনেক সময়ই অসঙ্গতি থাকে যেটা তাঁদের মহত্বের লক্ষণ, যে জন্য এমার্সন তাঁর 'সেল্‌ফ্-রিলায়ান্‌স্' প্রবন্ধে বলেছেন—"A foolish consistency is the hobgoblin of little minds……With consistency a great soul has simply nothing to do."

'বেদান্তসার' পুস্তিকাটিতে রামমোহন ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিষদাদি গ্রন্থ থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। ব্রহ্মকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি না; রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের মধ্য দিয়ে তিনি ধরা দেন না। কিন্তু ব্রহ্মের সগুণত্ব তিনি এখানে অস্বীকার করছেন না, তাই তাঁর কাছে ব্রহ্মের উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই উপাসনার জন্য আবশ্যক চিত্তের স্থিরতা। সুতরাং, রামমোহনের মতে, "ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্য কোনো তীর্থের কোনো দেশের অপেক্ষা নাই। যেখানে চিত্তের স্থৈর্য হয়, সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক ইহাতে দেশের এবং তীর্থাদের নিয়ম নাই যেহেতু বেদে কহিতেছেন। যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক।" গ্রন্থের উপসংহারে রামমোহন আরও লিখেছেন—"বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন।" এখানে "শাস্ত্র এবং যুক্তি" ও "বুদ্ধির বিবেচনা" বাক্যাংশগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। এই গ্রন্থে আর একটি জিনিস রয়েছে লক্ষ্য করবার। রামমোহন সংসারকে প্রপঞ্চময় বা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেন নি। সাধারণ অদ্বৈতবাদীর ভঙ্গীতে জগৎকে 'মায়া' ভেবে অস্বীকার করেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মুক্তি খুঁজেছেন বৈরাগ্য-সাধনে নয়, সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মাঝে।

এই পুস্তিকার স্বরচিত ইংরাজী অনুবাদের জন্য রামমোহন একটি ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি তাঁর পুস্তিকা-প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতার পথ পরিহার ক'রে একেশ্বরবাদের নূতন পথে পা বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকল শ্রেণীর হিন্দুর তিনি নিন্দাভাজন হয়েছিলেন কিন্তু এ নিন্দা তাঁর প্রাপ্য ছিল না যেহেতু প্রাচীন ভারতীয়েরাও তাঁর মতো একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁর রচনায় এইটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়—"My constant reflections on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindoo idolatry which, more than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error : and by making them acquainted with their scriptures, enable them to contemplate with true devotion the unity and omnipresence of Nature's God." ('The English Works of Raja Rammohun Roy 'ed. Nag & Burman Part II, 1945, P. 60.)

"সংস্কৃত ভাষার কৃষ্ণ যবনিকার আবরণে ঢাকা" শাস্ত্রাদিকে লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসাকে রামমোহন নিজের কর্তব্য মনে করেছিলেন। যে পাঁচখানি উপনিষদের তিনি বঙ্গানুবাদ করেন সেগুলি হচ্ছে তলবকার বা কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। উপনিষদ্-কথাটির শঙ্করাচার্য সংজ্ঞা দিয়েছেন—"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ" অর্থাৎ এ সেই ব্রহ্মবিদ্যা যা সহেতুক সংসারের অত্যন্ত অবসাদন করে বা সংসারকারণের সমূলে বিনাশ করে। যেহেতু রামমোহন সংসার বর্জনের পক্ষপাতী নন, তাই তিনি শঙ্করাচার্যের সংজ্ঞার "ব্রহ্মবিদ্যা" অংশটুকু গ্রহণ ক'রে লিখলেন—"ব্রহ্মবিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষদ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষদ শব্দে কহি।" অবশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা উপনিষদগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—"ব্রহ্ম অতিসূক্ষ্ম হয়েন, ইহার কারণ দিতেছেন। ব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই; অতএব তাঁহাকে শুনিতে, স্পর্শ করিতে, দেখিতে, আস্বাদন করিতে, আঘ্রাণ করিতে কেহ পারে না।" ('কঠোপনিষদ্', ১৷৩৷১৫, রামমোহনের অনুবাদ।)

"যাঁহাকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারেন না, আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীরা কহেন, তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান। অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।" ('কেন', ১।৫, রামমোহনের অনুবাদ)

এই সব ভাবধারাই রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীতের মূল প্রেরণা—

"মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।
ইচ্ছা মাত্র করিলে যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছা মতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।"

উপনিষদের যে সব অংশের একাধিক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে সে সব স্থানে সাধারণতঃ রামমোহন আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যাকে প্রামাণ্য মনে করেছেন। একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় শ্লোকাংশ—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন—'সেই ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত দ্রব্যের দ্বারা ভোগ করিবে। শঙ্করাচার্য কিন্তু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—'সেই হেতু ত্যাগের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিবে।' রামমোহন শঙ্করাচার্যকেই অনুসরণ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য ও রামমোহনের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। তিনি 'ধর্ম'গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্মপ্রচার প্রবন্ধে এই অংশের অনুবাদ করেছেন এইভাবে—'তিনি (ঈশ্বর) যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে।'

মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভূমিকার প্রথমাংশে রামমোহন বলেছেন যে জাগতিক অস্তিত্বের সত্য তখনই যখন জগৎ ঈশ্বরের প্রতিরূপ—"এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর, তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবে যে, এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।" ভূমিকার শেষাংশে তিনি এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন—"ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্ন সর্বদা করিবেন; কিন্তু অন্তঃকরণে সর্বদা জানিবেন এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।" ('উপনিষদ', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১৯৭০, পৃ. ১৫৫, ১৭৫।) দেখা যাচ্ছে, সমন্বয়বাদী রামমোহন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সমন্বয়ে উদ্যোগী। (অদ্বৈতবাদ শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বস্তু, আত্মা এবং ঈশ্বর এই ত্রিবিধ অস্তিত্ব স্বীকৃত।) পাশ্চাত্ত্য জগতের কর্মের আদর্শের সঙ্গে প্রাচ্যের ধ্যান ও মননের আদর্শকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধিরও রামমোহন সমন্বয় করতে চেয়েছেন, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে যুক্তির।

ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ব্রহ্ম যেমন গভীর, সর্বব্যাপী ও অনন্ত, ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনই সীমাহীন। এই সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের 'দ্য ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' পত্রিকার একটি সংখ্যায় লেখেন—"He deeply felt that the idea of God, the Great First Cause.—the Primitive and Infinite Intelligence—is the most sublime and comprehensive of all ideas." (A, K. Sen রচিত 'Raja Rammohun Roy: The Representative Man', 1967, গ্রন্থে উদ্ধৃত।) এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রসারই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব'লে রামমোহন মনে করতেন। এই জ্ঞানের কাছে অন্য সব জ্ঞান তুচ্ছ। এই জ্ঞানই মানুষের উন্নতির ভিত্তি। এই জ্ঞানই সুখের সোপান, ইহলোকে ও পরলোকে।

ঈশ্বরের অন্বেষণে রামমোহন ছিলেন অনলস। ধর্ম থেকে ধর্মান্তরে, গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে তিনি পরাবিদ্যার অনুসন্ধান করেছেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ তাঁকে বেশ আকৃষ্ট করে এবং তিনি কোরাণের সযত্ন অধ্যয়ন করেন। এ জন্য তিনি 'জবরদস্ত মৌলবী' বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইসলামের কোনো কোনো বিষয় তাঁর কাছে উদ্বেজক মনে হয় এবং তিনি নির্দ্বিধায় সে সবের সমালোচনা করেন। খ্রীষ্টানধর্মের দিকেও রামমোহন আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর বাইব্‌ল্‌-প্রীতি তাঁকে শিক্ষাব্রতী মিশনারি ডাফ্ সাহেবের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। খ্রীষ্টের উপদেশাবলী একত্রে সংকলিত ক'রে রামমোহন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৮২০)। গ্রন্থটিকে তিনি "সুখ ও শান্তির পথনির্দেশক" রূপে নামপত্রে বর্ণনা করেন। সংস্কৃত ও বাঙলা অনুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। বাইব্‌লের বিশ্ববিশ্রুত প্রার্থনা 'দ্য লর্ডস্ প্রেয়ার' রামমোহনের বিশেষ প্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি যীশুখ্রীষ্টকে ভগবানের অবতার রূপে স্বীকার করতে পারেন নি। রামমোহন তুলনামূলক ধর্মচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ।

সকল ধর্মের মধ্যে রামমোহন একটি ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করতে

পেরেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন সেই ঐক্যসূত্রটি সকলের সামনে তুলে ধরতে। একটি ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধই এতদিন বড় করে দেখা হত; রামমোহনই প্রথম ভারতীয় যিনি একটি ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি দেখালেন, বিশেষ ক'রে 'তুহ্ফৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্' নামক ফার্সী রচনায়, যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও নিরাসক্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস সব ধর্মেরই মুখ্য বৈশিষ্ট্য। মানুষের আত্মার অস্তিত্বও মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। পরলোকের অস্তিত্বের কথাও সব ধর্মে মেনে নেওয়া হয়েছে, যে পরলোকে ইহলোকের পাপ-পুণ্য অনুসারে মানুষ তার শাস্তি বা পুরস্কার পাবে। এই বিষয়গুলির উপর জোর দিলে দেখা যাবে ধর্মে ধর্মে কোন বিসংবাদ থাকবে না, বরং বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। তাদের পরস্পরের সংযোগ পরস্পরকে সম্পূর্ণতর করে তুলবে, কিন্তু প্রতিটি ধর্মের বিকাশের ধারা হবে স্বতন্ত্র। তাঁর নিজের জীবনে রামমোহন সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাই লিখেছেন--These historic cults and cultures had been fused in one discipline of universal Humanity in his soul." ('Rammohun: The Universal Man) তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে রামমোহন স্থান দিয়েছেন ব্রহ্মকে, যে পরমেশ্বর সকল জীবের প্রভু, সকল জীবের পালনকর্তা, যিনি মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন।

ধর্মপ্রাণ রামমোহন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন 'above all and beneath all a religious personality'। এ উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। ধর্মের জন্যেই ধর্মের প্রয়োজন তো আছেই, সমাজের মঙ্গলের জন্যও ধর্মের প্রয়োজন অপরিসীম, এ বিশ্বাস রামমোহনের ছিল। তাই তিনি ভারতবর্ষে এমন এক ধর্মের প্রচলন চেয়েছিলেন যা সমাজকে শতধা বিভক্ত করবে না, সমাজকে নিবিড় ঐক্যের বন্ধনে গ্রথিত করবে। (ধর্ম-শব্দটি ধৃ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, তাই এর আক্ষরিক অর্থ 'যা ধারণ করে', 'লোকধারক'।) এই উদ্দেশ্য নিয়েই রামমোহন আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন করেন এবং ব্রহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এর ফলে লোকের চিত্তশুদ্ধি সহজ হবে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ জাগ্রত হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ কোন সংকীর্ণতাকে বা গোষ্ঠীগত মনোভাবকে প্রশ্রয় দেবে না। তাই ব্রাহ্মসমাজের দলিলে আমরা দেখতে পাই—"...no sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered made or used in

such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the universe to the promotion of charity morality piety benevolence virtue at the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds." (ডঃ অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত 'রামমোহন রচনাবলী', ১৯৭৩, ভূমিকা, পৃঃ উনিশ।) এটা দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্মসমাজের বিকাশের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাবো রামমোহনের এই মহান্ আদর্শ পরবর্তী কালে যথাযথ মূল্য পায় নি।

রামমোহনের ধর্মমতে সব ধর্মেরই প্রভাব রয়েছে কিন্তু বেদান্তই এর মূল ভিত্তি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তিনি বিরোধী ছিলেন না কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল পৌত্তলিকতা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্মত নয়। তিনি চেয়েছিলেন সব কিছু অসার পরিত্যাগ ক'রে সর্বোত্তম ব্রহ্মের উপাসনায় তাঁর দেশবাসী মগ্ন হ'ক, তিনি নিজে যেমন হয়েছিলেন। গৃহস্থ-ধর্মের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই যদি আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি।" তবেই আমরা যা কিছু করব আমাদের সেই সব কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করতে পারব ("যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ") এবং কোন কিছু থেকেই আর আমাদের ভয় থাকবে না কারণ সেই ব্রহ্মের আনন্দ যে জেনেছে তার কিছুতে ভয় নেই ("আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন্")।

রামমোহনের ধর্ম এমন এক ধর্ম যা সমস্ত বিশ্বের কাছে গ্রহণীয়, তাই একে বিশ্বধর্ম বা universal religion বলতে কোন বাধা নেই। বিশ্বমানব রামমোহনের কাছে আমরা এই ধরনের ধর্মই আশা করব। তিনি সাধারণ তীর্থযাত্রী নন, বিশ্বকল্যাণের মন্দির অভিমুখে তাঁর পরিক্রমণ। তাই তিনি বিশ্বপথিক। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়—"বাস্তবিক রাজা অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন। এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণ-সাধনকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন।" ('মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়')

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তা

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক কিছুই এ-পর্যন্ত লেখা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বশ্রেণীর লেখক আছেন। বেশ কিছু লেখা খুবই উচ্চ ধরনের।

ঐ সব লেখা পড়ে, বিশেষতঃ প্রগতিশীলদের রচনাদি পড়ে, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে-সব ধারণা সাধারণ পাঠকের মনে গড়ে ওঠে, তার দু'একটিকে কিছু নাড়াচাড়া করতে চাই। আমার পাঠকরা স্মরণ রাখবেন, আমি স্বতঃই ভক্তিপরায়ণ, এবং ভীরু। আমার ভীরুতা আমার ভক্তিকে মজবুত করেছে। সুতরাং বৃহৎ লেখকদের প্রবল বক্তব্যের সঙ্গে সমঝোতায় নামবার ইচ্ছা বা শক্তি আমার নেই। তবে মানুষ মাত্রেরই মনে দ্বিতীয় চিন্তা ওঠে—তারই কিছু নিবেদন করতে চাই।

বিদ্যাসাগর-বিষয়ক রচনাদি পড়ে আমার মনে হয়েছে :

(১) বিদ্যাসাগরের প্রধান কাজ ছিল বিধবাদের ধরে ধরে বিয়ে দেওয়া ; অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল, তিনি যেন প্রায় প্রতি রাত্রে কেঁদে বলতেন—হে হরি! আরও একটি দিন কেটে গেল কিন্তু বিধবার বর জোগাড় করতে পারলুম না!

(২) বিদ্যাসাগর যতই ধুতি-চাদর পরুন, পায়ে তালতলার চটি দিন, আসলে তিনি সাহেব। কারো কারো মতে, বাজে ইংরেজ সাহেব নন, খাঁটি রেনেসাঁসী সাহেব।

এই জাতীয় ধারণা, আমার সন্দেহ হচ্ছিল, আমার কূট মনেই বুঝি শুধু জেগেছে। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বিদ্যাসাগর-ভক্ত সরল কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাঁরা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে যেসব কথা ভক্তিভরে বলেছেন, তার থেকে উপরের দুটি ধারণার সমর্থন পেয়েছি।

পাঠকগণ আশ্বস্ত হোন, বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠক হিসাবে আমার জানা আছে—বিধবা বিয়ে প্রবর্তন ব্যাপারটা বিদ্যাসাগরের জীবনে কত বড় ঘটনা ছিল। আমি এও জানি, বিদ্যাসাগর নাকি বিধবা বিয়ে প্রবর্তনকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি মনে করতেন।

ঠিক, তবে, বিদ্যাসাগরের তুলনায় বিদ্যাসাগরের কীর্তি কারো কারো কাছে ছোট ব্যাপার, যেমন ধরা যাক, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। বিবেকানন্দ খুবই বিদ্যাসাগর-ভক্ত। তাঁর ভক্তি, বিদ্যাসাগর-বিষয়ে অনেক লেখকের চেয়ে কম পাকা নয়। তিনি সানন্দে বলেছেন, উত্তর ভারতে তাঁর বয়সের এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যার উপরে বিদ্যাসাগরের ছায়া পড়েনি। তিনি একথাও সগৌরবে বলেছেন, রামকৃষ্ণের পরেই আমি বিদ্যাসাগরের অনুগামী। সুতরাং বিবেকানন্দের বিদ্যাসাগর-ভক্তির অভাব ছিল না। তারই জোরে তিনি মনে করতে পেরেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর বিরাট শক্তিকে এমন একটি সংস্কারে প্রয়োগ করেছেন—যা জনগণের জীবনকে বিশেষ স্পর্শ করে না। আর বিবেকানন্দের ছিল জনগণ-'বাতিক।' তিনি সবকিছুরই হিসাব করতেন—ব্যাপক জনসমষ্টির কল্যাণের মাপকাঠিতে। বিধবাবিয়ের সমস্যা, তাঁর মতে, বড় জোর হিন্দু উচ্চশ্রেণীর কিছু মানুষের সমস্যা। নিম্নবর্ণে বিধবা বিয়ে পূর্বাবধি প্রচলিত। তাছাড়া সমস্যাটার উৎপত্তির পিছনে ধর্মনৈতিক কারণের মত অর্থনৈতিক কারণও যথেষ্ট। জনসমষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হারের প্রশ্নও আছে। যে-দেশে কুমারী মেয়ের বিয়ে হয় না, সে দেশে বিধবাবিয়ের জন্য ব্যস্ত না হলেও চলে। আসল সমস্যা বিধবাবিয়ের নয়—তা বাল্যবিবাহের এবং বহুবিবাহের। পুরুষের বহুবিবাহ যদি বন্ধ করা যায়, বিধবা বিয়ের সমস্যা প্রায় থাকে না—এবং নারীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করলে বালবিধবা হওয়ার সম্ভাবনাও দূর হয়। বিবেকানন্দ বলতেন, যে-লোক বাল্যবিবাহ দিতে পারে, তাকে আমি খুন করতেও পারি।

সুতরাং বিধবাবিয়ে প্রবর্তনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর যতখানি হৃদয়চালিত, ততখানি বুদ্ধিচালিত নন। ভরসা করি, একথা বললে কেউ রাগ করবেন না, রামমোহনের মনীষা বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাই বিভিন্ন সংস্কার সাধনে রামমোহনের তুল্য সাফল্য লাভ করতে বিদ্যাসাগর পারেন নি।

তাহলেও, অনেকের সঙ্গে আমি জানি, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কী প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুসমাজ মূলে নাড়া খেয়েছিল। সেই শিহরিত সমাজ নতুন চিন্তায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রস্তুত হয়েছিল পরিবর্তনের জন্য। বিদ্যাসাগর বহুসংখ্যক বিধবার বিয়ে হয়ত দিয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁর দেহান্তের পরেও বিধবাবিয়ের যথেষ্ট চল হয় নি, কিন্তু তিনি যে-সামাজিক নবচেতনার সৃষ্টি করেছিলেন, তার দ্বারা পরবর্তী সংস্কার আনা সহজ হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য কালের

তাগিদের মূল্য যথেষ্ট। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন-সংস্কারের চেয়ে অনেক বড় বৈপ্লবিক সংস্কার, বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ কার্যতঃ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছে পরবর্তীকালে। এক্ষেত্রে কালের তাগিদের কথা মনে রেখেও বলতে হবে—বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলেই এ-জিনিস হিন্দুসমাজে সহজে ঘটতে পেরেছে, যা ঘটেনি, ধরা যাক, মুসলমান সমাজে, যেখানে এখনও পুরুষের বহু বিবাহের অবাধ সুযোগ এবং সমাজের প্রায় অর্ধাংশ বোরখাবন্দী, কারণ—ঐ সমাজে বিদ্যাসাগর জাতীয়েরা আবির্ভূত হননি।

এ সব কথা জানি, মানি, তবু—ঐ সব কিছুই হয়েছে পরোক্ষ ফল হিসাবে। প্রত্যক্ষ ফলের হিসাবে—বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন-সংস্কার ব্যর্থ, কারণ, আগেই বলেছি, যথেষ্ট সংখ্যক বিবাহযোগ্য বিধবা তখনি বিবাহিত হয়নি, আর আজকে, কাল পরিবর্তিত হয়েছে বলে, বিধবাদের বিয়ে বা সধবাদের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে সমাজ মাথা ঘামাচ্ছে না। এক্ষেত্রে একান্নবর্তী পরিবার প্রথার ক্রমবিলয় এবং সাধারণের মন গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়াই প্রধান পরিবর্তন-কারণ। পুরাতন সংস্কার যতক্ষণ প্রবল ছিল বিদ্যাসাগর শত চেষ্টাতেও কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে দোষ দেয়, তিনি নাকি শরীরধর্মী বিধবা দেখলে গুলি করে মারতেন। দরদী শরৎচন্দ্র খুব কাঁদাকাটা ক'রে এই কথা বলেছেন, যদিও একই শরৎচন্দ্র বিধবা বাঈজীকে এমন বড় প্রেম দিয়েছেন, যা জড়িয়ে কাছে না টেনে এনে কেবলই দূরে ঠেলে দেয়। এবং রবীন্দ্রনাথ, সংস্কারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম-পন্থায় বিধবা রোহিনীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা না ক'রে বিধবা বিনোদিনীর জন্য মৃদুতর শাস্তিব্যবস্থা করেছিলেন—যাবজ্জীবন কারাবাস, না—কাশীবাস!

কথায় কথায় সরে গেছি। বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমার কিন্তু কদাপি সন্দেহ হয় নি—বিদ্যাসাগর বিধবা দেখলেই পাত্রী-বিবেচনা করতেন! বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজেরই মানুষ ছিলেন—হিন্দুসংস্কারকে তিনি যথেষ্ট মান্য করতেন। তিনি নিশ্চয় বিধবাদের বিয়ে দেওয়াকে, গৌরীদান করার মত পুণ্যকর্ম মনে করতেন না। মাঝে মাঝে সে রকম মনে হয় বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংস্কারকরা বিশেষ ঝোঁকে থাকেন বলে সময় বিশেষে সংস্কার বিষয়ে পরিমাণহীন জোর দিয়ে ফেলেন—বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আসল ব্যাপার, বিদ্যাসাগর মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনো সামাজিক প্রথার নাম ক'রে মানুষের সহজ অধিকার

অস্বীকার করাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি—তারই বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। বিধবাদের যদি ইচ্ছা হয় তো তারা যেন বিয়ে করতে পারে, সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার সমাজের নেই, বিশেষতঃ পুরুষ যখন যথেচ্ছ বিবাহে অধিকারী। বিধবা বিয়ের পক্ষে বিদ্যাসাগরের লড়াইকে আমি মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই বলেই মনে করতে চাই।

উল্টোপক্ষে যদি কেউ আধুনিকতায় আক্রান্ত হয়ে এমন মনে করেন যে, বিদ্যাসাগর অবাধ যৌন স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন কিংবা আত্মশাসনকে অনুচিত মনে করতেন, তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে, তিনি বিদ্যাসাগরকে কড়াক্রান্তিও বোঝেন নি। বিদ্যাসাগর, যিনি নিজ জীবনে কেবলই ত্যাগ ক'রে গেছেন (ত্যাগের আধুনিক প্রতিশব্দ 'আত্মনিগ্রহ')—তিনি ত্যাগের মর্যাদা নষ্ট ক'রে ভোগকে বদন ব্যাদান করবার সুবিধা ক'রে দিতে প্রাণপাত করেছিলেন, এমন অশালীন কথাবার্তা না বলাই ভাল। মনে করিয়ে দেব, বিদ্যাসাগরের আদর্শ মানুষেরা ত্যাগেরই বিগ্রহ—ভোগের নয়। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর রীতিমত ঐতিহ্যবাদী। বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ার পড়েছিলেন, শেক্সপীয়ারের অনুরাগীও ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক কালিদাস। এবং বিদ্যাসাগরের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নারী চরিত্র হল সীতা। সীতার বনবাসের শেষে সীতাচরিত্রের বন্দনা ক'রে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধহয়, বিধাতা মানব জাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণ-সম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূ-মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্না পতি পাইয়া কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।"

হা বিধাতঃ! বিদ্যাসাগর এ কী করলেন!! সর্বকালে পৃথিবীর সর্বোত্তম নারী হলেন পাতিব্রত্যধর্মের প্রতিমা—ত্যাগ বা আত্মনিগ্রহকে বরণ করেই যিনি বিদ্যাসাগরের চোখে মহিমান্বিতা!!! এবং বিদ্যাসাগর কী জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল—তিনি সীতার প্রতি প্রভূত অন্যায়কারী রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সীতার মুখে বা মনে অভিযোগমাত্র দিলেন না ('সীতার বনবাস' অনুযায়ী বলছি)—যা এমন কি সীতার আদিস্রষ্টা বাল্মীকি পর্যন্ত না দিয়ে পারেননি!

বিচিত্র কথা, সীতার বন্দনায় খ্রীস্টান মধুসূদন (যিনি বানরনেতা রামচন্দ্রকে মোটে পছন্দ করতেন না), অজ্ঞেয়বাদী (উহুঁ) বিদ্যাসাগর এবং অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ জোটবদ্ধ। এই সীতা, পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ভোগবতী নন, ত্যাগব্রতী।

সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হচ্ছে, বিদ্যাসাগর যদিও স্বাভাবিক দেহধর্মকে স্বীকার করতেন, স্বাভাবিক জীবন যাপনে মানুষের অধিকার আছে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর নিজ হৃদয়ে ত্যাগ-তপস্যার প্রতিমার জন্যই পূজাবেদী নির্মিত ছিল, এবং তিনি নিজ জীবনের ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা ঐ দেবীর পূজার যোগ্যতা চূড়ান্তভাবে অর্জন করেছিলেন।

॥ ২ ॥

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে আকস্মিক বিচ্ছিন্ন আবির্ভাব—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের বিরাটত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই ঐ কথা বলেছেন, বড়জোর এইটুকু মেনে নিতে পারি, নচেৎ আমরা তো এই জানি—'বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়', এটা নিছক কাব্যিক প্রবচন এবং ইতিহাসের গর্ভে ঐতিহাসিক পুরুষেরা জন্ম নেন, এটা কাব্যিক শোনালেও বাস্তব সত্য। বিদ্যাসাগরকে সৃষ্টি করবার মত শক্তি এই সমাজের না থাকলে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটত না কদাপি।

বিদ্যাসাগর ধুতি চাদর-পরা ইংরেজ—এও একটি কাব্যচমৎকার কথা। বিদ্যাসাগর আদ্যন্ত ভারতীয়, কোনো সন্দেহ না রেখে। কোনো মানুষ যদি বড় হয়ে পড়েন, যদি তিনি সামাজিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, অমনি তিনি বিদেশী হয়ে পড়বেন—এ বড় মজার কথা। একথা মানলে লেনিন রাশিয়ান নন, মার্কস জার্মান নন, মাও সে তুং চীনা নন। স্বদেশী দৃষ্টান্তে ফিরে এলে বলতে হয়—রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র—কেউ ভারতীয় নন। কথাটা আমি একেবারে উল্টে বলতে চাই—বিদ্যাসাগর যেহেতু নিজ সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন সমাজের কল্যাণের জন্য—তাই তাঁর থেকে বড় স্বাদেশিক সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরকে পৌরুষের মহাপ্রকাশ বলেছেন—সেই পৌরুষ বিদ্যাসাগরকে আত্মমর্যাদা দিয়েছিল—যার জোরে সদর্পে সগৌরবে তিনি তাঁর ভারতীয়ত্ব নিয়ে বিচরণ করতেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যিনি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিবেকানন্দের বিদ্যাসাগর-আনুগত্যের মূলে বিদ্যাসাগরের এই ভারতীয়

দর্প। বিবেকানন্দ বারবার বিদ্যাসাগরের একটি গল্প বলতেন : বিদ্যাসাগরকে বড়লাট আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ধুতি চাদর চটি পরেই বিদ্যাসাগর সেখানে হাজির হন ; তাঁর অ-দরবারী পোষাক দেখে তাঁকে গেটে আটকানো হলে তিনি অনবদ্য নাটকীয় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—'কেন আ-মা-কে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়নি !' বিদ্যাসাগর বলতে চেয়েছিলেন—আমার পোষাককে নয়, আমি মানুষটিকেই তো আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, ধুতি চাদর নিয়েই যে আমি গড়ে উঠেছি ! পরানুকরণপ্রিয় পরমুখাপেক্ষী তৎকালীন শিক্ষাভিমানী ভারতীয় উচ্চসমাজে বিদ্যাসাগর তাই ভারতীয় মর্যাদার প্রতীক—বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে।

সুতরাং বিদ্যাসাগরী চটি নিয়ে (যা আমাদের শিরোধার্য) বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকুন—তাঁকে রেনেসাঁসী বুট পরিয়ে বিপদে ফেলার প্রয়োজন নেই। সংস্কারক বিদ্যাসাগর এখনো বেঁচে থাকলে অবশ্যই কৌতুক বোধ করতেন যদি দেখতেন, তিনিই সংস্কারযোগ্য মনুষ্য হয়ে উঠেছেন ! আর, স্মরণ করিয়ে দেব, বিদ্যাসাগর তাঁর এই আত্মমর্যাদা 'নিস্তেজ' ভারতীয় রক্ত এবং 'অধঃপতিত' ভারতীয় সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর বিষয়ে তাঁর অনবদ্য রচনায় বিদ্যাসাগরকে 'মাতার পুত্র' বলে বিভূষিত করেছেন। সার্থক কথা। বিদ্যাসাগর তাঁর মাতার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন, দেখতেই পাই। এই সমাজের আরও অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন। করুণার দেবীকে দেখেছিলেন বিধবা রাইমণির মধ্যে, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বশীলতা এবং পরার্থপরতাকে দেখেছিলেন মায়ের বড় মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণের মধ্যে। পরিবর্তিত সমাজে একান্নবর্তী পরিবার অচল, একথা বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার-চক্রকে যেখানে ত্যাগ ও প্রেমের রক্তস্নেহ ঢেলে সচল রাখা হয়েছিল, সেখানে তাঁর অকুণ্ঠ প্রণতি। পুরাতন ভারতীয় ধারার মনুষ্য রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিছু বক্তব্য :

"অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ...ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে-অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদরে

অতিথিসেবা ও অতিথি পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।...অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদমোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, একদিন একক্ষণের জন্যও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত অমায়িক, পরোপকারী ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।"

'পাতুলনিবাসী মুখটী' রাধামোহন বিদ্যাভূষণ নামক ইংরাজের কাছে সুতরাং বিদ্যাসাগর অনেক কিছু শিখেছিলেন।

রাধামোহনের চরিতকথা বলবার সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁর হৃদয়বত্তার কথাই বেশী বলেছেন। আর নিজ ঠাকুর্দার কথা বলবার সময়ে তাঁর পৌরুষবীর্যের উপরই বিদ্যাসাগর অধিক জোর দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের অসমাপ্ত 'আত্মচরিতে'র আদর্শপুরুষ কোনো সন্দেহ না রেখে রামজয় তর্কভূষণ। এবং, এখানে আমি বলতে বাধ্য, প্রগতিশীল মানবিকতার দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের মনোভাব অত্যন্ত গর্হিত।

আধুনিক চিন্তাশীলতা, যুক্তিশীলতা কাউকে পরোয়া করতে দায়বদ্ধ নয়। পত্নীর প্রতি রামচন্দ্রের অবিচারের জন্য লক্ষ্মণ বা সীতার চেয়ে বেশী কান্না কলমে কেঁদেছেন একালের মানুষ। শ্রীচৈতন্যের পত্নীত্যাগ এবং পত্নীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচলিত দাম্পত্য আচরণের অভাব নিয়ে ফোঁস্ ফাঁস্ অনেক শুনেছি। সন্ন্যাস নামক উৎপাতটা ভারতবর্ষের কত সর্বনাশ করছে, সে বিষয়েও আমরা অবহিত। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর—প্রগতিশীল বিদ্যাসাগর—তাঁর নিতান্ত অবিচারী, নিষ্ঠুর, দায়িত্বহীন ঠাকুর্দার প্রতি অমন ভক্তিপরায়ণ হলেন কি করে? তাহলে কি বিদ্যাসাগর নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বংশাভিমানের দুর্বলতায় ধরা দিয়েছিলেন !!

বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত থেকে আমরা জেনেছি—

রামজয় তর্কভূষণ উপামতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মেছিল। তর্কভূষণের সঙ্গে তাঁর দুই বড় ভাইয়ের মনকষাকষি হয়। বড় ভাইয়েরা 'অবমাননাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগ' করেন। তাতে তাঁর 'অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত' হয়।

এবং তিনি স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেত সাতটি প্রাণীকে শ্বাপদবৎ ভাইদের কাছে ফেলে 'কাহাকেও কিছু না বলিয়া এককালে দেশত্যাগী হন।

তারপর কী হল? দেবরদের হাতে বহু লাঞ্ছনার পরে দুর্গাদেবী ৬টি নাবালক ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বাপের বাড়ি গেলেন। বাবা স্নেহে সমাদরে তাঁদের গ্রহণ করলেন, কিন্তু ভাই ও ভাইয়ের বৌ দেখলেন মহা আপদ। "কিছুদিনের মধ্যেই পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ। অনিয়ত কালের জন্য সাতজনের ভরণপোষণের ভারবহনে তাঁহারা কোনোমতে সম্মত নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্রকন্যাদিগকে গলগ্রহবোধ করিতে আরম্ভ লাগিলেন। রামসুন্দরের বনিতা কথায় কথায় দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন।" এক্ষেত্রে দুর্গাদেবীর বাবার কিছু করার ছিল না—একমাত্র করণীয় রূপে তিনি 'সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত'চিত্তে 'স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটীর নির্মিত করিয়া' দিতে পেরেছিলেন। সেখানে দুর্গাদেবী আশ্রয় নিয়ে সুতো কেটে সাতজনের ভরণপোষণ যেভাবে হওয়া সম্ভব সেইভাবে ক'রে গেলেন বছরের পর বছর। অবস্থা এই পর্যায়ে পেঁাছেছিল যে, তাঁর বড় ছেলে ঠাকুরদাসের বয়স ১৪।১৫ হলে একাকী তাঁকে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, স্পষ্টবাদী বিদ্যাসাগর নিছক আত্মসম্মানের প্রেরণায় ছয় সন্তানের জনক ঠাকুর্দার গৃহত্যাগ করাকে—যার ফল স্ত্রী পুত্রকন্যার সর্বনাশ—মোটেই নিন্দা করেননি, বরং এই ব্যক্তির প্রতি সর্বোচ্চ প্রশস্তি বর্ষণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের চোখে তিনি 'সাক্ষাৎ ঋষি' বিদ্যাসাগরের জন্মকালে তিনি যে পরিহাসবাক্য বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে বহু সমাদরে উল্লেখ করেছেন, এবং বিদ্যাসাগরের ব্রাহ্ম জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মপরায়ণ যোগী তীর্থপর্যটনকারী' রামজয় তর্কভূষণের অলৌকিক স্বপ্নদর্শনের উল্লেখ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, যার দ্বারা রামজয় জানতে পেরেছিলেন, "তাঁহার বংশে এক শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষের আগমন হইবে, সে শিশু উত্তরকালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহার কার্যকলাপে দেশের গৌরব বর্ধিত হইবে, সে দয়ার অবতার হইয়া তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে।" জীবনীকার আরও অগ্রসর হয়ে লিখেছেন, "শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র উক্ত সিদ্ধপুরুষ রামজয় তর্কভূষণ শিশুর জিহ্বার তলে আলতায় কিছু লিখিয়া বলিয়াছিলেন, এ শিশু

উত্তরকালে সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে। চারিদিক কম্পিত হইবে, দয়াদাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হইবে। আমিই ইহার দীক্ষাগুরু হইলাম, এ বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করিবে না; আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হইল, আমার বংশ পবিত্র হইল।" পিতামহ সূতিকাগৃহেই তাঁর দৈবশক্তিসম্পন্ন পৌত্রের নাম 'ঈশ্বরচন্দ্র' রেখেছিলেন, একথাও উক্ত জীবনী থেকে জানতে পারি। 'দৈববলসম্পন্ন মহাপুরুষ'দের জন্মকাণ্ডে 'অলৌকিকতা' থাকতে পারে, ব্রাহ্ম জীবনীকার তা মেনে নিয়েছেন, এবং বিদ্যাসাগরের 'পূর্বপুরুষ ও শৈশবচরিত-বিষয়ক বিবরণের অধিকাংশ (যে) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত শৈশবচরিত হইতে গৃহীত হইয়াছে' তাও জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে জেনেছি, বাকি 'বর্ণিত বিষয়ের কোনো কোনো অংশ তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) নিকট শুনিবার সুযোগ'ও উক্ত গ্রন্থকারের হয়েছিল।

রামজয় বিদ্যাসাগরের দীক্ষাগুরু—একথা কি চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই শুনেছিলেন? এই কথাটা পূর্ববর্তী শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনীতেও আছে। কিন্তু কেবল শম্ভুচন্দ্রের উপর নির্ভর ক'রে সংবাদ বণ্টনের ইচ্ছা চণ্ডীচরণের ছিল না, আমরা জানি।

সে যাইহোক, জন্মমাত্রে পিতামহকে দীক্ষাগুরুরূপে-বিদ্যাসাগর পান বা না পান—পিতামহের চরিত্র যে বিদ্যাসাগরের লেখা থেকেই আমরা পাই। তাঁর বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনও প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন।...উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কারণে তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল।"

ভাইদের নীচতায় পীড়িত রামজয় গৃহত্যাগ করেছিলেন। বহু বৎসর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি শ্যালকের নীচতায় ও উৎপীড়নের সম্মুখীন হলেন। এবার গৃহত্যাগ করলেন না, সদর্পে অবজ্ঞা ক'রে চললেন।

"তর্কভূষণ মহাশয়... সর্বদা সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, এ-গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু।"

গ্রামের সকলেই গরু, একথাটা তর্কভূষণ মহাশয় সন্দেহাতীতভাবে ঘোষণা করার জন্য অব্যর্থ দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। একদা বিষ্ঠাপূর্ণ একটি স্থানের উপর

দিয়ে যেতে তাঁকে নিষেধ করা হলে তিনি বলেছিলেন—"এখানে বিষ্ঠা কোথায়? আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। যে-গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক?"

তাই বলে তর্কভূষণ উগ্র অহঙ্কারী ছিলেন না। তিনি "নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন।"

তবু তাঁকে অহঙ্কারী মনে হত কেন, সেকথাও বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যা করেছেন:

"তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন।"

আর ছিল তাঁর ভয়ঙ্কর সরলতা:

"তিনি যাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।"

তর্কভূষণ নামক ধার্মিক মানুষটি যে সর্বদা অহিংসাচর্চা করাকেই ধর্মচর্চা করা বলে বিবেচনা করতেন না, তার দৃষ্টান্তও সানন্দে বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। তিনি "অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া কখনও বাটীর বাহির হইতেন না।" এই লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তিনি কিভাবে হিংস্র মানুষ-ডাকাত, এবং পশু-ভালুককে সায়েস্তা করেছিলেন, তার বিশেষ বিবরণ বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। সগৌরবে লিখেছেন, ভালুকের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত শরীরে ধারণ করেছিলেন।

পিতামহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মোট বক্তব্য:

"তিনি একাহারী, নিরামিষাসী, সদাচারপূত ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন।"

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের রচনা বিদ্যাসাগর-মানসকে অনেকখানি প্রকাশ করেছে। সাংসারিক ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল, বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরের আদর্শ পুরুষ নন, দায়িত্বহীন,

আপোষবিরোধী রামজয় তাই। রামজয়ের বিষয়ে লিখবার সময়ে বিদ্যাসাগর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আত্মকথাই বলে গেছেন। ও-কাহিনী যতখানি রামজয়ের, সেই পরিমাণে বিদ্যাসাগরের।

পুরাতন কথায় ফিরে আসা যাক। রামজয় তর্কভূষণের জন্ম ইংলণ্ডে নয়, বা ফ্রান্স, জার্মানী বা রোমে নয়—ভারতবর্ষেই। চীনে, রাশিয়ায় বা আমেরিকায় নয়—বাংলাদেশে। বিদ্যাসাগর এই বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষেরই মানুষ। এ দেশে অবিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগর দুইই আছে। অবিদ্যাসাগরের তীর থেকে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে, চোখ বন্ধ ক'রে ছুটতে ছুটতে শহরের সাজানো অ্যাপার্টমেণ্ট (যার ঘরে লাগোয়া পায়খানা) ঢুকে পড়লে বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি কোথায় তা দৃষ্টির অগোচরে থেকেই যাবে। বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানের নাম বীরসিংহ—ইংরেজ আমলের আগেই ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল।

ভুপেন্দ্রনাথ শীল

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে রামমোহন ও ডাফ্

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে রাজা রামমোহন রায় ও ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামমোহনের জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনকে আমরা দেখতে পাই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যে মানসিক উৎকর্ষ আছে তৎকালীন বংগসমাজে সেই মানসিক উৎকর্ষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই রামমোহন দেশবাসীকে ইংরেজী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বাংলার তৎকালীন সমাজকে রিপুর মত গ্রাস করেছিল। রামমোহন স্থির করেছিলেন যে পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার মধ্যদিয়েই দেশবাসীর মনের মধ্যযুগীয় অন্ধকার দূর করতে হবে। শুধু মাত্র সংস্কৃত ভাষার চর্চা করে এই অন্ধকারকে দূর করা যাবে না। তাই ইংরেজী শিক্ষার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি স্কটল্যাণ্ডের মিশনারি ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ডঃ ডাফের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ ছিল মাত্র কয়েক মাসের। ডঃ ডাফ্ কলকাতায় এসেছিলেন ২৭মে ১৮৩০ অব্দে চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ডের মিশনারি হয়ে। রামমোহনের সংগে তাঁর দেখা হয় জুলাই মাসে ও রামমোহনকে তিনি তাঁর অন্যতম সহযোগীরূপে পান। কিন্তু ঐ বছরের নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ড যান। তারপর ডঃ ডাফের সংগে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়। কিন্তু যোগাযোগ অল্পদিনের হলেও তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশের ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। চিরদিনই ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের নামের সংগে রাজা রামমোহন রায়ের নাম জড়িত হয়ে থাকবে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে রাজা রামমোহনই ছিলেন ডঃ ডাফের ভারতে মিশনারি হয়ে আসার অন্যতম কারণ। তিনি নিজে ১৮২৪ সালে জেনারেল এসেমব্লিজের কাছে ভারতে মিশনারি পাঠানোর জন্য যে আবেদন করা হয় সেই আবেদনের চিঠিতে স্বাক্ষর দেন। তাঁরই সম্মতি অনুসারে চার্চ অফ্

স্কটল্যাণ্ড ভারতে সর্বপ্রথম মিশনারিদের পাঠান। কলকাতায় চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ডের পুরোহিত ডঃ ব্রাইন তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন :

Encouraged by the approbation of Rammohan I presented to the General Assembly of 1824 the petition and memorial which first directed the attention of the church of scotland to British India as a field of missionary exertions. একথা বলা প্রয়োজন যে রামমোহন ছিলেন কলকাতায় স্কচ চার্চের একজন নিয়মিত শ্রোতা।

কলকাতায় আসার পর ডঃ ডাফের দিনগুলো অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটছিল। মিশনারি হিসেবে তাঁর অন্যতম কর্তব্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা। ধর্মই ছিল ডঃ ডাফের শিক্ষাদানের ভিত্তি। সব রকমের ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভূ্ক্ত ছিল। ডঃ ডাফ্ স্থির করলেন যে তাঁর প্রতিদিনের শিক্ষার অন্যতম বিষয় হবে প্রত্যেক শ্রেণীতেই নিয়মিতভাবে বাইবেল থেকে পাঠ করা। ডঃ ডাফ্ বিশ্বাস করতেন যে ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করলে চিত্তের পরিবর্তন আসে, মানুষ প্রকৃতই ঈশ্বরের অনুগামী হয়। ডঃ ডাফ্ আরও বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রার্থনায় মন আলোকিত হয়, বিবেক জাগ্রত হয়। মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ডঃ ডাফ্ একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারিত করতে পারলে এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে উন্নত করা যাবে। কিন্তু এই ভেবে তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে তিনি একজন বিদেশী ও মিশনারি। তাঁর বয়সও তখন মাত্র চব্বিশ। বাংলা দেশের রক্ষণশীল সমাজের প্রতিকূলতায় তাঁর প্রচেষ্টা নিশ্চয় ব্যাহত হবে। সত্যই ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাথমিক বাধার সম্মুখীন তাঁকে হতে হল। এই সময় ডঃ ডাফ্ তাঁর বন্ধুদের পরামর্শে রাজা রামমোহনের সংগে তাঁর কলকাতার বাগানবাড়ীতে দেখা করলেন। রামমোহনের বয়স তখন ছাপ্পান্ন। রামমোহনের সংগে পরিচিত হবার পর ডঃ ডাফ্ তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার কথা জানালেন। রামমোহন দেশবাসীর শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। অনেক আগেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন। তাই তিনি এই মিশনারির কথায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। ডঃ ডাফ্‌কে তাঁর আত্মবিশ্বাসের কথা জানিয়ে রামমোহন বললেন,

ধর্মই প্রকৃত শিক্ষার মূল। এই শিক্ষা মানুষকে অন্তর্মুখী করে, মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, হৃদয়ের আবেগকে সংযত করে। ডঃ ডাফ্‌কে রামমোহন তাঁর বাইবেল পাঠের অভিজ্ঞতার কথাও বললেন। তিনি জানালেন যে তাঁর মতে ধর্ম ও নীতির দিক থেকে বাইবেলে যীশুর প্রার্থনাটির তুলনা নেই। ডঃ ডাফের মতকে সমর্থন করে রামমোহন বললেন যে একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে তিনিও মনে করেন যে প্রতিদিন পাঠ আরম্ভ হওয়ার আগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা উচিত। যে কোন কাজ শুরু হওয়ার আগে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করা উচিত। রামমোহন ডঃ ডাফ্‌কে আরও বললেন যে যীশুর প্রার্থনা শেখানোর সময় তিনি ইংরেজী ভাষার ব্যবহার নাও করতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁকে নিশ্চয়ই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতে হবে। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের আগ্রহের কথা ডঃ ডাফ্‌কে তিনি জানালেন। রামমোহন মনে করতেন যে এই ধরনের বিদ্যালয়ে দেশের জনসাধারণ উন্নত সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখার সুযোগ লাভ করবে। এই শিক্ষা দেশবাসীর মনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে দূর করবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একমাত্র খ্রীষ্টধর্মীয় সংস্কারই দেশের সমাজ জীবনকে গ্লানিমুক্ত করতে পারবে। রামমোহনের সংগে ধর্ম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার পর ডঃ ডাফ্ আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ভেবে নিরুৎসাহিত হলেন যে কি উপায়ে তাঁর এই বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি বাড়ী পাওয়া যাবে। ডঃ ডাফ্ ভারতীয়দের জাতিধর্মের কুসংস্কার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র-পাওয়াও ছিল তাঁর আর একটি অন্যতম সমস্যা, ডঃ ডাফ্ চিন্তিত হলেন যে কিভাবে দেশের অভিজাত পরিবার থেকে তিনি ছাত্র পাবেন। কারণ তিনি ত প্রতিদিনই তাঁর বিদ্যালয়ে বাইবেল থেকে শিক্ষা দেওয়ার মনস্থ করেছেন। তিনি জানতেন যে রক্ষণশীল হিন্দুরা ভাবতেন যে বাইবেল পাঠ করলে তাঁদের নিজেদের ধর্মকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু রামমোহনের সাহায্যে ডঃ ডাফের সব সমস্যার সমাধান হল। রামমোহন প্রথমেই ডঃ ডাফের বিদ্যালয়ের জন্য কলকাতার চিৎপুর রোডে তাঁর ব্রাহ্মসভার ঘরটি ছেড়ে দিলেন। এই ঘরটির জন্য রামমোহন মাসে ৫ পাউণ্ড করে ভাড়া দিতেন। তিনি ডঃ ডাফের জন্য ভাড়া আরও কমিয়ে প্রতিমাসে ৪ পাউণ্ড হিসেবে নির্ধারিত করে দিলেন। এর পর বিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য রামমোহন তাঁর বন্ধুদের ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানালেন যে তাঁরা যেন তাঁদের ছেলেদের ডঃ ডাফের বিদ্যালয়ে ভর্তি

হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। কিছুদিনের মধ্যেই পাঁচজন যুবক ডঃ ডাফের কাছে এলেন ও তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলেন। পরিচয়ের জন্য রামমোহনের চিঠি তাঁরা সংগে নিয়ে এসে ডঃ ডাফ্‌কে দেখালেন। চিঠিতে রামমোহন লিখেছিলেন যে এই পাঁচজন যুবক তাঁদের পিতাদের পূর্ণ সম্মতি নিয়েই এসেছেন। রামমোহনের সাহায্যেই ডঃ ডাফ্‌ তাঁর প্রথম পাঁচজন ছাত্র পেলেন। কিছু দিনের মধ্যেই অন্যান্য যুবকেরা ডঃ ডাফের প্রতি আকৃষ্ট হলেন ও তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলেন। তারপর ডঃ ডাফের ইংরেজী বিদ্যালয় জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউসনের আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করার জন্য দিন স্থির হল ১৩ই জুলাই (১৮৩০), সময় সকাল ১০টা। ঐ দিন প্রথম থেকেই রামমোহন ডঃ ডাফের সহায়ক হিসেবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত রইলেন। রামমোহন প্রথমেই ছাত্রদের যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে, খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠে তাঁদের কোন বাধা নেই। তারপর যীশুর প্রার্থনাটি বাংলায় পাঠ করার সময় ডঃ ডাফ্‌ ও রামমোহন উভয়েই উঠে দাঁড়ালেন। ডঃ ডাফ্‌ তাঁর ছাত্রদের তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের হাতে একখানি করে বাইবেল দেওয়ার পর বাঙালী ছাত্ররা বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বাইবেল পাঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন, 'এ ত খ্রীষ্টানদের শাস্ত্র, আমরা ত খ্রীষ্টান নই। আমরা কি করে এ পাঠ করব? এ আমাদের খ্রীষ্টান করে দিতে পারে। তাহলে আমাদের বন্ধুরা আমাদের জাতিচ্যুত করবে।' তখন রামমোহনই যুক্তি দিয়ে সত্য ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের বললেন, 'ডঃ হোরেশ হেম্যান উইলসনের মত একজন খ্রীষ্টান ত হিন্দুশাস্ত্র পড়েছেন। কিন্তু তোমরা ত জান যে তিনি হিন্দু্‌ হয়ে যান নি। আমি নিজে সমগ্র কোরাণ বারবার পড়েছি। কিন্তু তাতে আমি কি মুসলমান হয়ে গেছি? না। আমি সমগ্র বাইবেল পাঠ করেছি এবং তোমরা ত জান আমি খ্রীষ্টান হয়ে যায়নি।' রামমোহন ছাত্রদের বাইবেল পাঠ করে তাঁদের নিজেদের বাইবেলের বিষয়বস্তুর বিচার করতে বললেন এবং বাইবেল পাঠের ভয় থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। রামমোহনের এই উত্তরের পর প্রতিবাদকারী ছাত্রদের অনেকেই নীরব হলেন। পরের মাস প্রতিদিনই সকাল ১০টায় বাইবেল পাঠের সময় রামমোহন ডঃ ডাফের জেনারেল এসেমব্লিজ ইষ্টিটিউসনে উপস্থিত থাকতেন। এবং যতদিন তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন প্রায়ই এই বিদ্যালয়ে এসে ডঃ ডাফের সংগে দেখা করে যেতেন।

রামমোহনের সাহায্যেই ডঃ ডাফ্ তাঁর ইংরেজী শিক্ষার প্রচেষ্টায় সফল হতে পেরেছিলেন এবং প্রতিদিনই তাঁর বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে বাইবেল থেকে শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন। ডঃ ডাফ্ তাঁর জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌স্টিটিউসন প্রতিষ্ঠা করে বাংলা দেশে একজন মিশনারি শিক্ষাবিদ্ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌স্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ডঃ ডাফের ছাত্রদের অনেকেই পরে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়ে ছিলেন। বাংলার অনেক বিশিষ্ট সন্তান ডঃ ডাফের প্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউসনের ছাত্র ছিলেন। এই জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউসনই আজ স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও স্কটিশচার্চ কলেজ। রাজা রামমোহনের কাছে যে তিনি কত ঋণী একথা বহু রচনায় ও বক্তৃতায় ডঃ ডাফ্ ব্যক্ত করেছেন। ডঃ ডাফ্ সব সময়েই রামমোহনকে তাঁর মিশনারি জীবনের পরম সহায়ক বলে স্মরণ করেছেন।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সংস্কৃতির জগতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর আজ যুগ্মপ্রতীক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার বিচিত্র সম্মেলনের দিক থেকে এ দুই মনীষীর জীবন ও মননের ইতিহাস আজ বিশ্বমানসের গৌরবময় উত্তরাধিকার। চিন্তার ধারাবাহিকতার দিক থেকেও দু'জনে দু'জনের পরিপূরক। আর আমাদের বাংলাভাষার ইতিহাসেও দু'জনেরই পথিকৃতের বিশিষ্ট সম্মান। সাহিত্যিক, মনীষী, মানুষ—সর্বোপরি মানবপ্রেমিক ও আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রবক্তা—দু'জনের সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। এমন কি আজকের দিনে আধুনিক সংস্কৃতি বলতে রবীন্দ্রনাথের আগে এ দু'জনের কথাই কারু কারু মনে জাগে। এ দুই মহাপুরুষের জীবন ও ভাবনাধারা পাশাপাশি রেখে কিছু বক্তব্য পাঠকের কাছে তুলে ধরা চলে।

প্রথমত: সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যে আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা যায়, তা থেকে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর দুজনেই আশ্চর্যরকম মুক্ত। নিজের জন্য বা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ভেবেছেন নিশ্চয়, কিন্তু চারপাশের জীবনপ্রবাহ, সমাজ, স্বদেশ, সাহিত্য ও মানবকল্যাণের উদ্দেশেই এঁদের জীবনধারণ। উচ্চতম বিদ্যালাভ এঁদের বিশ্বজনের প্রয়োজনে। তাই ব্যক্তি হয়েও এঁরা এক একটি যুগ ও জীবনচেতনার প্রতীক। তাঁদের পরিচয়েই আমাদের অনেকের মানস-পরিচয়।

বলা বাহুল্য, এমন ধরণের মানুষ যাঁরা—তাঁদের প্রশংসা ও নিন্দা—দুয়েরই পরিমাণ অনেক বেশী। প্রশংসার ক্ষেত্রে কল্পনার আতিশয্য ঘটে, নিন্দার ক্ষেত্রে তা ঘটা আরো স্বাভাবিক। আর আমাদের এই স্থিতিশীলতার দেশে প্রচলিত পন্থার বাইরে একটুও পা-বাড়ানো যে কী দুঃসাহসের ব্যাপার, তা যাঁরা জীবনজিজ্ঞাসার প্রয়োজনে কখনো সে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন, আজো পেরে থাকেন। আজ থেকে দু'শো কি দেড়শো বছর আগে সে-জাতীয় প্রচেষ্টা তো একহিসাবে যেচে মৃত্যুবরণ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর দু'জনেই অপঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা জানতেন, কিন্তু তার চেয়ে কঠোরতর দণ্ড দিল প্রতিদিনের পরিচিতজনদের মধ্যে থেকেও আপন আদর্শের অনুরোধে স্বেচ্ছানির্বাসন। সমকাল থেকে দু'জনেই এত

ঊর্ধ্বে, তাই এতো একক। তাঁদের সেই দিগন্তস্পর্শী মহীরুহব্যক্তিত্বে ঈর্ষা, দ্বেষ, মূঢ়তার ঝড় বারবার এসে নির্মম আক্রমণ করে গেছে, তারপর একদিন সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে তাঁদের ব্যক্তিত্ব উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে জাতির আদর্শকে সমুন্নত করে চলেছে।

কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের মনুষ্যত্বের বিচার কৃতকর্মের পরিমাণে নয়, কর্মের অনুপ্রেরণায়। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর সমাজে সাহিত্যে প্রত্যক্ষ যা দিয়ে গেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত বাঙালী ও ভারতবাসীর জীবনচেতনায়। সমাজ ও ধর্মের অহেতুকী অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কল্পনা থেকে মুক্ত করে নতুন সমাজবিন্যাসের কথা এঁরা প্রধানতঃ নারীদের দিক থেকেই ভেবেছেন। কিন্তু সংস্কারমুক্তির প্রচেষ্টা যে জাতীয় চৈতন্যের মূলসত্তাকে অবলম্বন করেই সম্ভব, বিদেশী পুঁথি বা আন্দোলনের সাময়িক অনুকরণে নয়, একথা এঁরা দুজনেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রমাণিত করেছেন। সমকালীন ডিরোজিও গোষ্ঠীর সংস্কার সঙ্কল্পের তুলনায় সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে রামমোহন বিদ্যাসাগরের দান তাই সমাজবীক্ষার দিক থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

বাংলাসাহিত্যে রামমোহনের দান মননসাহিত্যের প্রতিষ্ঠায়, আর বিদ্যাসাগরের দান ভাষাশিল্পের সঞ্জীবনীমহিমায়। বাংলা গদ্যের জনক—এঁদের দু'জনের কেউ ন'ন। বহুজনের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলা গদ্যের শ্রী ও প্রসার। কিন্তু প্রাথমিক পর্বে যে মননপ্রয়াস রামমোহনের দ্বারা আরব্ধ, তারই পরবর্তী ব্যাপ্ত ফলাফল দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ প্রমুখ সার্থকতর লেখকদের প্রচেষ্টায়। আর বিদ্যাসাগরই যে বাংলা গদ্যের মূলস্রোতটি প্রবাহিত করেছিলেন, সেকথা রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যের পরে আর পুনরুক্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবু মনে হয় রামমোহনের মননসংগ্রাম যদি অন্যতম প্রেরণা না হতো, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধসাহিত্যের এত দ্রুত প্রগতি সম্ভব হতো না। একহিসাবে এঁরা দু'জনেই অনুবাদক। কিন্তু সেই অনুবাদই আমাদের মনের গতি ও লেখার ঝোঁক—এ দুয়ের নিয়ন্ত্রণীশক্তি। ধর্মচেতনাই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূচনায় কেন্দ্রবিন্দু। রামমোহন সে বিন্দুটিতে অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন জাতীয় চৈতন্যের উৎস অনুসন্ধানের প্রেরণায়। তাই বেদান্ত চর্চা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে শুধু মননবিলাস নয়, একান্ত আবশ্যিক প্রাথমিক সর্ত। রামমোহনের উপনিষদ প্রচারে বিশেষ মতবাদের প্রবণতা প্রাধান্য পেলেও বেদান্তচর্চার

সার্বভৌম অধিকার এনে দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মননের ভিত্তিটি তিনি অচলপ্রতিষ্ঠায় সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। পরবর্তী ব্রাহ্ম-আন্দোলন যতই পরিবর্তিত পন্থায় আবর্তিত হোক, শ্রেষ্ঠ মননের জন্য আমাদের আর বৈদেশিক ভাবনার দ্বারস্থ হতে হয় নি। খ্রীষ্টধর্ম এর পরে ভারতপন্থার অনুপূরক হয়েছে— কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বও উপনিষদের ভাবমাহাত্ম্যকে বিন্দুমাত্র অতিক্রম করতে পারে নি। অপরপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের জীবব্রহ্মসম্বন্ধের অন্তর্নিহিত ভক্তিচেতনাকে অনুধাবন করতে না পারায় ব্রাহ্মধর্ম এক অভিজাত সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থেকে গেল। মহানির্বাণতন্ত্রের উত্তরসাধক রামমোহন যে শক্তিসাধনার বিষয়ে নীরব থেকেও বৈষ্ণবসাধনা ও দর্শনসম্বন্ধে কঠোরভাষী, সে একদেশদর্শিতা স্বীকৃতিযোগ্য না হলেও বিচারনিষ্ঠ মননের দিক থেকে তাঁর প্রবণতা পরবর্তী ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে সহায়ক হয়েছে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাধনায় ও দর্শনে জ্ঞান ও ভক্তির অহেতুক দ্বন্দ্বের নিরসন হয়েছে, সে নিরসনের পূর্বপক্ষ হিসাবে রামমোহনের চিন্তাধারা অভিনিবেশযোগ্য।

ধর্মচর্চার সঙ্গে মানবিকতার বিরোধ কিছু আছে—এ ধারণা সাম্প্রতিক কালের। একদা ধর্মই আমাদের কর্মের নিয়ামক ছিল। তখন মানবিকতার দিকগুলি প্রকাশ পেত ধর্মের আশ্রয়ে। তত্ত্ববিচারের দিক থেকে বিভিন্ন মতবাদের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আধুনিক মন অন্ততঃ ধর্মের ক্ষেত্রে নিরুৎসুক। সেক্ষেত্রে রামমোহনের চেয়ে বিদ্যাসাগরের মানব-বিষয়ক আগ্রহ একালের মানুষকে আন্দোলিত করে বেশী। এমন কি শিক্ষাসংস্কার করতে চেয়ে বিদ্যাসাগর যখন বেদান্তকে বাতিল করতে চান, তখন আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের পত্রে বেদান্ত শিক্ষার বিরোধিতার কথাও আমাদের মনে জাগে। কিন্তু রামমোহনের এ-জাতীয় মন্তব্য তাঁর মাত্র সমগ্র জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেই বরং এ সিদ্ধান্ত অনেকটা স্বভাবজ। তবু মনে হয়, জীবন সত্যের মূল প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে বেদান্তই ভারতীয় মনীষার সত্যোপলব্ধির তুঙ্গসীমা। এই বৈদান্তিক আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের আদর্শই বিবেকানন্দের মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে পরম মমতা ও চরম অনাসক্তির এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছে। রামমোহনের অনুগামীরূপে বিবেকানন্দ এই বেদান্তচেতনার ঋণ স্বীকার করেছেন। বিদ্যাসাগরের মহত্ব তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই বিচলিত করেছে, কিন্তু বেদান্ত-সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের দ্বারাই বেশী প্রভাবিত।

ধর্ম ও মানবিকতার অন্বয়চেতনাই ভারতীয় চেতনায় ইতিহাসের অনুকূল। সেকথাটি রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—দু'জনের জীবনে বিভিন্নভাবে প্রমাণিত। রামমোহন প্রত্যক্ষবাদী বাস্তবপন্থীদের মতো কিছু পরিমাণে জীবনযাপন করলেও তাঁর সমগ্র জীবনচেতনায় এক ইতিমূলক ব্রহ্মচেতনাই শেষ অবধি অন্বিষ্ট। ফলে ব্রিষ্টলের সমাধিক্ষেত্রে শয়ান এই মহাপুরুষের প্রতি স্বদেশ ও বিদেশের মানুষের আত্মীয়তাবোধ ক্রমবর্ধমান। মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র তাঁর কাছে শুধু অন্নবস্ত্রের সমীকরণ সত্য নয়, সর্বমানবের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম-সত্যই তাঁর কাছে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি।

বিদ্যাসাগরের অন্তিমযাত্রার একটি ছবি সেকালে তুলে রাখা হয়েছিল। আত্মীয়জনপরিবেষ্টিত শ্মশানদৃশ্যটি পারিবারিক বিয়োগান্ত নাটকের স্বাভাবিক দৃশ্যেরই মতো। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে ক্রমে ক্রমে তথাকথিত সভ্যজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানবদরদী তাঁর মনের মানুষ আর খুঁজে পেতেন না। আত্মীয় ছিল, আত্মজনেরা অনুপস্থিত। এমন কি বিধবাবিবাহকারী পুত্রও আর আপনজন নয়। অর্থ, করুণা, প্রতিদানপ্রত্যাশাহীন ভালোবাসা—এ সব কিছু সত্বেও কেন এ একাকিত্ব? আসলে হয়তো মহৎ মানুষ মাত্রই নিজের জগতের মানুষ—যে জগৎকে খুব অল্প লোকেই ধরতে ছুঁতে বুঝে উঠতে পারে! আবার হয়তো এও সত্য যে, মানবচৈতন্যের মূলগত ঐক্য যে আত্মিকচেতনায় তাকে উপেক্ষা করারই এই পরিণতি। অথচ তাঁর মহাপ্রয়াণেই বাঙালীর সবচেয়ে বড়ো আত্মীয়বিয়োগ।

দেহের ক্ষুধা, মননের ক্ষুধা ও আত্মানুসন্ধানের ক্ষুধা—এ সব কয়টির সমন্বিত নিরসনই সভ্যতার অন্বিষ্ট। আজীবন বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যার বিস্তারে সদা সচেষ্ট রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বর্ণের বিচারে ব্রাহ্মণের ব্রতই উদ্‌যাপন করেছেন। সে ব্রত এসে মহৎ মননের সিংহদ্বারে উপনীত। মানুষের হৃদয়মন্দিরে পরমজ্যোতির প্রকাশে তার সার্থকতা। মনীষা ও হৃদয়বত্তার শ্রেষ্ঠ বিকাশেই সে সার্থকতার প্রস্তুতি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরে সেই প্রস্তুতিপর্ব সুসম্পন্ন।

বিষ্ণুপ্রসাদ চক্রবর্তী

রাজা রামমোহন ও বিশ্ব-মানস

রাজা রামমোহন বিদ্রোহী; রাজা রামমোহন বিদ্রোহী নন। তাঁর বিদ্রোহের সুরে আপোষ এবং আপোষের সুরে বিদ্রোহ। কখনও রামমোহনের ব্যক্তি-চেতনা সমাজ-চেতনার কাছে বিপর্যস্ত, আবার কখনও সমাজ-চেতনা রামমোহনের ব্যক্তি-চেতনার কাছে পর্যুদস্ত। এক ভয়াবহ আত্মদ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ বিকাশই রাজা রামমোহনের ইতিহাস। ইতিহাসের রাজা রামমোহন কিন্তু রাজা রামমোহনের ইতিহাস নয়। ইতিহাস রামমোহনের ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছে, নতুবা তাঁকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আধুনিক ইতিহাসেও সেই সংকট উপস্থিত। কারও মতে রাজা রামমোহন ব্যর্থতার ইতিহাস। আবার কারও মতে রামমোহন সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। এই দ্বন্দ্বের প্রকৃত তাৎপর্য কি? ইতিহাসের দ্বন্দ্ব কি দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস? ইতিহাসের আবর্তন আসলে আবর্তনেরই ইতিহাস।

রাজা রামমোহন ইতিহাসের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের অসাধারণতায় তিনি ছিলেন যুগের কর্ণধার। যুগ অতিক্রমণের দুঃসাহসিকতায় তিনি বরেণ্য। প্রকৃত অর্থে তিনি ভারত পথিক—আধুনিক ভারতের সূচনা রামমোহনকে কেন্দ্র করেই সম্ভবপর হয়েছে। একটা অন্ধকারময় যুগে তাঁর জন্ম। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি যুগের অন্ধকারের স্বরূপ উপলব্ধির প্রচেষ্টা চালান। যুগের ভয়াবহতায় দাঁড়িয়ে মৃতপ্রায় একটা জাতির প্রাণস্পন্দনকে তিনি দ্রুত প্রায় করে তোলেন। অরাজকতার মধ্যে রামমোহন জীবনদর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ব্যক্তি-মানসকে বিশ্ব-মানসের মধ্যে মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন। অন্ধকারে আলোর অনুসন্ধান করেছেন, অর্থাৎ যা ছিল না তারই অন্বেষণ করেছেন। পরিশেষে যা ছিল না তাকে পেতে গিয়ে যা ছিল তাকে হারিয়ে রামমোহন আপন জীবনধারায় এক জটিল দ্বন্দ্বের অবতারণা করেন।

রাজা রামমোহন নিজের যুগকে অতিক্রম করতে পারেন নি এবং আপন যুগকে অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়। ইতিহাসকে পরিচালিত করতে গিয়ে রামমোহন ইতিহাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের তখন শেষ। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত

দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে। একদিকে শেষ, আরেকদিকে শুরু। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শুরুতেই মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ, অথবা মুঘলদের শেষে ইংরেজদের শুরু। এ যুগের প্রকৃত স্বরূপ স্বরূপবিহীন। ধর্ম অধর্মে রূপান্তরিত এবং অধর্মই তখন ধর্ম। এ যুগে আত্মপ্রবঞ্চনাই আত্মসমীক্ষা বলে পরিগণিত হত। বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ অবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অবিশ্বাসকেই লোকে বিশ্বাস করতো। অবাস্তবতাই এই যুগে বাস্তবতার রূপ গ্রহণ করেছিল। এ যুগের সতীদাহ প্রথা আসলে চরম বিপর্যয়ের এক শোচনীয় পরিণাম।

যে কোনও যুগের দ্বন্দ্ব সে যুগের ব্যক্তি ও সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে সমাজ-চেতনার সংঘর্ষ লেগে যায়। রাজা রামমোহনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় নি। বার বার তিনি এই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষে নিষ্পেষিত। দ্বন্দ্বের থেকে মুক্তি পরিশেষে মুক্তির দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাস শাইলকের জন্ম দিয়েছে, আবার ইতিহাস মার্টিন লুথারকেও সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শাইলক মার্টিন লুথারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে বুঝতে হবে যে ব্যক্তি মানসের সঙ্গে বিশ্ব-মানসের এক ভয়াবহ দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে। রামমোহনের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গতানুগতিক ধারায় তিনিও সুদের ব্যবসা ফেঁদে বসলেন, জমিদারির মালিকানায় নিজেকে যুক্ত করলেন। ইতিহাসে শাইলক জন্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু সেই শাইলক একদিন নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। রাজা রামমোহন নিজের ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চাইলেন। নিজের পরিবার থেকে নির্বাসিত হলেন। কেন? কারণ শাইলকের ব্যক্তি-মানসে বিশ্বমানসের সুর বেজে উঠল। মার্টিন লুথার জন্ম গ্রহণ করলেন। মানুষের অন্তরাত্মার হল শুভমুক্তি। আবেদন করলেন অনন্তকালের অপরিবর্তিত মানুষের দেবতার কাছে—ওঠো, জাগো। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! প্রতিবাদ করো, খুলে দাও ক্যাথলিকদের শয়তানির মুখোশ। ইউরোপ কেঁপে উঠল। জেগে উঠলেন রাজা রামমোহন। ধর্মের বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনি হলেন প্রথম বিদ্রোহী। উন্মুক্ত করে দিতে চাইলেন মানুষের অন্তরাত্মাকে। অশান্ত চঞ্চল করে দিলেন যুগের স্থবিরতাকে। ধীর প্রবাহমানতাকে প্রচণ্ড গতিশীল করে তুললেন। রাজা রামমোহনের ইতিহাস আসলে ইতিহাসের জটিলতাকে সাবলীল করে তোলার প্রচেষ্টা। ব্যক্তি-মানসের বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটালেন বিশ্ব-মানসে। ব্যক্তির ইতিহাস রূপান্তরিত হল ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিকতায়। এই রূপান্তর কি ব্যর্থ? রামমোহনের এই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব আসলে দ্বন্দ্বের ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো, কারণ তাঁর

জীবনের পরবর্তী ইতিহাস বিগত জীবনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। সমসাময়িক সামাজিক কলুষতার বিরুদ্ধে রামমোহন ছিলেন বিদ্রোহী। ফলে সমসাময়িক সমাজ ছিল রামমোহনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। হিন্দুদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। ফলে হিন্দু সমাজ ছিল রামমোহনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে রাজা রামমোহন নিজেকে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুললেন।

রাজা রামমোহন শুধু বিদ্রোহী নন। তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। তাঁকে হেয় করার প্রচেষ্টা চলেছে। রামমোহন এই প্রতিবিদ্রোহের স্বরূপ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁকে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে হয়েছিল, যদিও তাঁর মতবাদ সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সমাজ-চেতনার কাছে রামমোহনের ব্যক্তি-চেতনা বার বার পরাজিত হয়েছে। এমন কি শিক্ষা ব্যাপারেও তাঁর প্রচেষ্টা সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে নি, তাই নিজের বিদ্যালয় স্থাপন করেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এক কথায় সমাজ-সংস্কারক হিসেবে রামমোহনের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতায় নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে নি।

রাজা রামমোহনের এই আত্মদ্বন্দ্বের উৎস কোথায়। তাঁর জন্মের ইতিহাসে এক অভিনব বৈপরীত্যের সমাবেশ দেখা যায়। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক মার্টিন হায়ডেগারের ভাষায় রামমোহনের ইতিহাসের মধ্যেই আমরা a hole in being বা সত্তার বিপর্যয় দেখতে পাই। পারিবারিক ইতিহাস এই বিপর্যয়কে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। কি ঘর কি বাহির সর্বত্রই রাজা রামমোহন নির্বাসিত। কোথাও তাঁর ঘর নেই, কোথাও তাঁর স্থান নেই। তিনি যেন সত্তা বহির্ভূত সত্তা—যাকে ফরাসী দার্শনিক জঁা-পল সার্ত্রে the most irreplaceable being বলে উল্লেখ করেছেন। ঘরের দ্বন্দ্ব রাজা রামমোহনের আত্মদ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন এমন একটি সত্তা যে নিজের সত্তার মধ্যেই এক ভয়াবহ ফাটল দেখতে পেয়েছিলেন। অস্তিত্বের মধ্যেই যিনি অনস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় ছিলেন মনে প্রাণে বৈষ্ণব; অথচ মুসলমান শাসকদের অনুগ্রহে এবং নিজের বিচক্ষণতায় তিনি বিশেষ পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। ব্রজবিনোদ একদিকে বৈষ্ণব, অন্যদিকে মুসলমান শাসকদের কৃপাপ্রার্থী। তাঁর এই বৈপরীত্য সমগ্র পরিবারকে এক সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। এক প্রকার

জোর করেই ব্রজবিনোদ রামমোহনের পিতা রমাকান্ত রায়কে শৈবধর্মাবলম্বী তারিনী দেবীর সঙ্গে বিয়ে দেন। রাজা রামমোহনের মধ্যে এই চরম বৈপরীত্য ভাঙনের পথ বেছে নেয়।

রাজা রামমোহন ছিলেন আপন যুগের বিষময় ফল। তাঁর সমগ্র সত্তার বহিঃপ্রকাশ তাঁকে নিজের কাছে ও যুগের কাছে ভয়ংকর করে তুলেছিল। ফরাসী কবি মালার্মের Crepescular existence-এর সঙ্গে আমরা রামমোহনের সত্তার তুলনা করতে পারি। এর বৈশিষ্ঠ্য হল যে, সত্তা নিজেই নিজের কাছে বিদ্রোহী। আপন স্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কাছে ফিরে আসে আপন গতিহীনতায়, সে গতিবেগের চঞ্চলতা উপলব্ধি করে। একদিকে সে প্রচণ্ড কর্মক্ষম, অন্যদিকে সে একান্ত অসহায়। একদিকে সে বন্দী, অন্যদিকে সে মুক্তবিহঙ্গ। একদিকে আপন ব্যক্তি-মানসে জর্জরিত, অন্যদিকে বিশ্ব-মানসের প্রশান্তিতে সে সত্তাময়-চেতনাময়। সত্তার এই বিপর্যয় মাতা ও পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। মা আপন পুত্রের মধ্যে নিজের সত্তাকে প্রতিফলিত দেখেন এবং পুত্র মায়ের মধ্যে আপন সত্তার সহঅবস্থান লক্ষ্য করে! ইংরাজীতে ছেলেকে বলা হয় extension of mother's being। রাজা রামমোহনও আপন জননীর সঙ্গে ছিলেন একাত্ম; এক নিবিড় বন্ধনে সংযুক্ত। কিন্তু পারিবারিক বৈপরীত্যের তাড়নায় রাজা রামমোহন এই নিবিড়তাকেও ভেঙে দিলেন—অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ইতিহাসের শবচ্ছেদ করলেন। রামমোহনের মাতা তারিনী দেবী ছিলেন সে যুগের নারী। এ যুগে নারীদের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা বলতে কিছুই ছিল না। সতীদাহ প্রথার কবলে নারীকে স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। সতীদাহের যুগে ভারতীয় নারীরা শুধু অবলাই ছিলেন, তাঁরা ছিলেন জীবনে মৃত এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবিত। রাজা রামমোহন একদিন বিদ্রোহী হলেন—সমাজের বিরুদ্ধে, এমন কি নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে। কিন্তু রামমোহনের মা—রামমোহনের সত্তার বিস্তার বা extension of his own being—বিদ্রোহী না হয়ে আপন স্বামীর প্রতি আনুগত্য দেখালেন—সমর্থন করলেন তাঁকে যার বিরুদ্ধে তাঁর ছেলে বিদ্রোহী। আপন সত্তায় রাজা রামমোহন বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কা অনুভব করলেন। একদিকে বিদ্রোহ, একদিকে আপোষ। রামমোহনের বিদ্রোহের সুরে আপোষের রাগ; রামমোহনের আপোষের মধ্যে বিদ্রোহের ভৈরবী। এই আত্মিক দ্বন্দ্ব পরিশেষে ইতিহাসের দ্বন্দ্বরূপে দেখা দিল।

সত্তার এই বিপর্যয় ও বিপর্যয় বোধেই রাজা রামমোহনের ইতিহাস

আবর্তিত। ধর্মের ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও, ইতিহাসের ধর্মকে তিনি যথার্থ অনুসরণ করতে পরেন নি। আপন মুক্তির অনুসন্ধানে রাজা রামমোহন আবিষ্কার করলেন যে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাই মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য। বিশ্ব-মানসের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে রামমোহন ব্যক্তি-মানসের বিপর্যয় থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু রামমোহনের সত্তার চিরাচরিত বিপর্যয় পরিশেষে প্রচেষ্টার মধ্যেও বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে। আপোষ ও বিদ্রোহ, অস্বীকার ও অনুমোদন রাজা রামমোহনের জীবনে একই রেখায় গতিশীল। তুফাতে বর্ণিত মহীউদ্দীনের সকল ধারণাকে রাজা রামমোহন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুমোদন করেছেন; কিন্তু সারিয়াতের সকল নির্দেশকে অগ্রাহ্য করেছেন। রাজা রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম এডামের মতে খৃষ্টধর্মের সকল মতবাদ রামমোহন অগ্রাহ্য করেছেন; কিন্তু তিনি খৃষ্টধর্মের সকল নৈতিক দায়িত্ব শুধু স্বীকারই করেন নি, নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। হিন্দু পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন আজীবন বিদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম সেবাধি পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের সার্বজনীনতা প্রসঙ্গে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা বিস্ময়কর ও গভীর উপলব্ধির পরিচায়ক। একদিকে রাজা রামমোহন আপোষহীন সংগ্রাম চলিয়ে যান; আরেকদিকে রামমোহন অনুমোদন করতে দ্বিধা বোধ করেন না। রামমোহনের ইতিহাস আপোষের মধ্যে বিদ্রোহের ইতিহাস এবং বিদ্রোহের মধ্যে আপোষের ইতিহাস।

যে কোনও যুগের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের ইতিহাসের মধ্যে। ব্যক্তি স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ফলস্বরূপ। আত্মনিয়ন্ত্রণ যখন হরণ করা হয় তখন বুঝতে হবে ইতিহাস সংকটময়। পাঠক হয়তো অবাক হবেন যে আত্মত্যাগও অনেক সময়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের রূপ নেয়। ব্যক্তি-মানস থেকে বিশ্ব-মানসে রূপান্তরের ইতিহাস এই আত্মত্যাগের ইতিহাস। ক্রিশ্চিয়ান মিষ্টিকরা অনেক সময় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যেও ভারতীয় মনীষা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। এমনকি ফরাসী ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদও এই আত্মত্যাগের মধ্যে আপন আত্মার পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত The Symposium গ্রন্থে এই আত্মত্যাগের এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে নিজেকে ত্যাগ না করতে পারলে অথবা ব্যক্তি-মানসের মৃত্যু না

ঘটলে বিশ্ব-মানসের বিকাশ সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথও এই ব্যক্তি-মানসকে অতিক্রম করে বিশ্ব-মানসের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ফরাসী সাহিত্যিক জঁ। জেনের জীবন দর্শনের আলোচনা করতে গিয়ে জঁা-পল সার্ত্রে বিশ্ব-মানস ও চেতনার প্রতিক্রিয়ার সবিশেষ আলোচনা করেছেন। একদিকে মানুষের চেতনা ব্যক্তি-মানসের নির্যাস; যাবতীয় রূপ ও দৃশ্য আমাদের চেতনার ওপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চেতনাময় ও অনুভূতিময় করে তোলে। চেতনার প্রতিফলনে এটা সম্ভবপর বলে চেতনায় এই বিশেষ রূপটিকে প্রতিফলিত চেতনা বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মানুষ কিন্তু শুধুমাত্র চেতনা; তাই চেতনা ও প্রতিফলিত চেতনার দ্বন্দ্বে আত্মসচেতনার জন্ম। আমার টেবিলের ওপর একটা কলম রয়েছে। এটা দেখে আমার চেতনা দোয়াতের আকারে প্রতিফলিত চেতনায় রূপান্তরিত হল। আমি বুঝতে পারলুম যে কলম সম্বন্ধে আমি সচেতন; আমি এটাও বুঝতে পারলুম যে আমি কলম নই। একদিকে চেতনা রূপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, অন্যদিকে চেতনার কোন রূপ নেই—সে নিরাকার। প্রতিফলিত চেতনা অনেকটা জলের মত; যে আধারে রাখা যায় তাকে অবলম্বন করেই সে স্থিতিলাভ করে। কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনার কোন রূপ বা আকার নেই—এটা শুধুমাত্র pure thought। কোন বস্তু বা ভাবের সংস্পর্শে আমরা সচেতন হই। কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা সম্বন্ধে মানুষ সজাগ হতে পারে না, কারণ বিশুদ্ধ চেতনা স্বয়ম্ভু। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিশেষ অবস্থা, ঘটনা, ও সময়ে বেঁচে থাকতে হয়। এই জন্যই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত চেতনার রূপ ফুটে ওঠে এবং ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি করে। এই ব্যক্তি-মানস contingent অথবা অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এই আবার চেতনা স্বয়ম্ভু বলে আমাদের মধ্যে বিশ্ব-মানসের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি সর্বদাই আপন মানসকে উত্তরণ করতে চায়; সে প্রার্থনা করে বিশ্ব-মানসের সান্নিধ্য। চেতনার এই দ্বন্দ্ব-ব্যক্তি-মানস ও বিশ্ব-মানসের সংঘাতের জন্যই দার্শনিক হেগেল চেতনাকে অশান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

রাজা রামমোহনের যুগে ইংরেজিপনা শুরু হলেও তার প্রভাব ছিল ওপর মহলেই। দেশের সাধারণ লোক ছিল চরম দুর্দিন ও সংকটের সম্মুখীন। ভারতবর্ষ ছিল কৃষিপ্রধান ও কৃষকের মূল্যায়ন হত গরু মহিষের সঙ্গে এক পাল্লায়। শিল্প বলতে একমাত্র কুটিরশিল্পেরই ছিল প্রাধান্য। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় ভারতের রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। দেশ তখন চরম অর্থনৈতিক সংকটের

শেষ অবস্থায়। এমন সময় ইংরেজ প্রভুর আবির্ভাব হল এবং গোলামীতে অভ্যস্ত ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশী মনিবের কিছু উগ্র সমর্থক জুটে গেল। চরম অব্যবস্থায় প্রতিটি ভারতীয়ই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। এছাড়া কুটিরশিল্প ও কৃষিপ্রধান দেশের বৈশিষ্ট্য হল যে, মানুষ তার জর্জরিত ও বিপর্যস্ত ব্যক্তি-মানস থেকে বিশ্ব-মানসে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা চালায়। ভ্রান্ত ধারণা ও ধর্মকে অবলম্বন করে সে অবাস্তব আধ্যাত্মিকতায় জড়িয়ে পড়ে। রাজা রামমোহন এর ব্যতিক্রম নয়। যুগের বিশিষ্টতাকে কেন্দ্র করেই তিনি আপন স্বকীয়তায় বিশ্ব-মানসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে ইতিহাসের ধারা বুর্জোয়াঁদের প্রভাবে দিক্ পরিবর্তন করেছে। ইউরোপে বুর্জোয়াঁ মানসের সৃষ্টিকর্তা ফরাসী দার্শনিক রেণে ডেকার্টে। Cartesian Cogito আবিষ্কার করে তিনি সভ্যতাকে এক ভ্রান্ত পথে চালিয়ে দেন। এমন কি কাণ্টের Categorical imperativeও এই ভ্রান্ত ধারণার ফল। কিন্তু ইতিহাস পাল্টে গেছে। বিশ্ব-মানসের প্রতিচ্ছবি এখন আমরা বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পের প্রচণ্ড ও অভাবনীয় প্রগতির মধ্যে প্রতিফলিত দেখি। তাই বর্তমান যুগে বিশ্বমানসকে জানার মধ্যে আমরা নতুনত্ব দেখি না। ব্যক্তি-মানসকেই আমরা জানতে চাই। আজকের দিনে সাইকিয়াট্রির প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আমেরিকায় ঘরে ঘরে বিভ্রান্ত ব্যক্তি-মানসের এক বিচিত্র সমন্বয়। আধুনিক সভ্যতায় এটা হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিসের অভিশাপ। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সমাজের তথাকথিত অনুশাসনগুলিকে আহারে, বিহারে, পোষাকে এমনকি চিন্তায় পর্যন্ত রূপান্তরিত করে দিয়েছি। মানুষ আজ এক ভ্রান্ত সামাজিক জীব। মানুষের এই সামাজিকতার এক নির্মম ও নিদারুণ বর্ণনা জাঁ জেনে প্রসঙ্গে সার্ত্রে আলোচনা করেছেন। এই বর্ণনা আমাদের আতংকিত করে তোলে। ব্যক্তি-চেতনা তথাকথিত বুর্জোয়াঁ সমাজ চেতনায় নির্বাসিত। তাই বিশ্ব-মানসকে ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তি-মানসের রহস্য উদ্ঘাটনে আমরা বিশেষ আগ্রহী। এই কারণেই মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে মার্টিন হায়ডেগার সোচ্চার হয়ে অস্তিত্ববাদী দর্শনের এক ভয়াবহ ও কঠিন চিত্রাংকন করলেন। এমনকি ফেলোমেনোলজি ও দ্বন্দ্ববাদের আশ্রয় নিয়ে জাঁ-পল সার্ত্রেও বেশ কিছুদিন অস্তিত্ববাদের প্রধান পুরোহিত হয়ে দেখা দিলেন; যদিও বর্তমানে তিনি মার্কসীয় দর্শনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন। ইউরোপে অস্তিত্ববাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তার রাজত্বে আমাদের এমনই দৈন্য যে, বর্তমান ভারতে অস্তিত্ববাদ ও ফেলোমেনোলজির যথেষ্ট সার্থকতা রয়েছে।

ইতিহাসের এই বিচিত্র প্রবাহ রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মকে অভিজাত সম্প্রদায়ের এক ভ্রান্ত নৈতিকতায় পরিণত করেছে। শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় ব্রাহ্মধর্ম জীবন দর্শন থেকে নির্বাসিত। সমাজে থেকেও সে পরিত্যক্ত। দেশের জনসাধারণের প্রতি ব্রাহ্মধর্মের কোন আবেদন নেই বললেই চলে। আজকের দিনের মানুষ বিশ্ব-মানসে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে না। মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণময় প্রচেষ্টার মধ্যেই আজকের ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত, যদিও ঈশ্বরের ধরণা দুর্বল মস্তিষ্কের ভ্রান্ত চিন্তার নির্যাস। একদিন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মানুষের ভেতরকার এক বিশেষ শক্তির বহিঃপ্রকাশকেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করেছিলেন। জাঁ-পল সার্ত্রে ও কার্ল মার্কসের Social imperative সামাজিক শক্তির কাছে ইমানুয়েল কান্ট পর্যুদস্ত হয়ে গেছেন। রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত সমাজের সামাজিকতা আজ মানুষের কর্মে প্রেরণা জোগায়। মানুষ নিজের মুক্তি পেতে পারে না; তাকে সমগ্র জাতির মুক্তির মধ্য দিয়ে আপন মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম নৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিল; কিন্তু সে যুগে সমাজের রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল না। রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি ছাড়া শুধুমাত্র ধর্মের সমন্বয় দেশের কোন হিতসাধন করতে পারে না। ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের কার্যকলাপ অনেক ব্যাপক ও ফলপ্রসূ হয়েছিল তার একমাত্র কারণ যে এদের পেছনে সক্রিয় রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। সমাজের গুটিকয়েক লোক নিয়ে বিরাট কিছু করা যায় না। সামাজিক সমর্থন না থাকার জন্যই ব্রাহ্মধর্মের ক্রমবিকাশ সংহত হয়ে পড়ে এবং ধারণাগুলি কতগুলি ভ্রান্ত নীতিবাক্যে রূপান্তরিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা একটা অপ্রিয় সত্য কথার উল্লেখ করতে পারি। বর্তমান ভারতে নানা ধরনের দেশী ও বিদেশী মিশনারীদের কার্যকলাপ এখনও অব্যাহত আছে। কতগুলি কার্যকলাপ বুর্জোয়া সংস্কৃতি ঘেষা। ধর্মের দর্শন নিয়ে এদের যথেষ্ট মাথাব্যথা। কিন্তু সকলেই জানেন যে, অনুন্নত দেশে এই মিশনারীরা মানুষকে এক ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায় মানুষের যে সামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে, যে কোনও মিশনারীদের দ্বারা তা সম্ভবপর নয়।

সোফিয়া ডবসন কলেট রামমোহন প্রসঙ্গে এক অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য সর্বধর্মের সমন্বয় করা। ইউরোপীয় ধর্মের ক্রমবিকাশ আলোচনা

করতে গিয়ে কোন প্রখ্যাত ভেনিস লেখক লিখেছেন—the characteristic of a religious personality is syncertism। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মকে সর্বধর্মের সমন্বয় বলতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করবেন; ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব কখনই ব্যাপক হতে পারে নি, কারণ প্রকৃত ধর্মের সমন্বয় এর মধ্যে ছিল না। রামমোহনের সময়ে ধর্ম বলতে এক প্রকার ভ্রান্ত আধ্যাত্মিকতাকে বোঝাতো। এই ভ্রান্তির মূল ধর্মের দর্শন এবং এর প্রকাশ হয়েছিল ধর্মের আচরণে। জীবনধারণের তাগিদ থেকেই মানুষের জীবনবোধ ও আচরণের পদ্ধতি স্থির হয়। জীবন দর্শন কখনই জীবন ধারণের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত কবতে পারে না। রাজা রামমোহন গাছের গোড়ায় জল না ঢেলে গাছের মাথায় জল ঢেলেছিলেন। ধর্মকে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় না করার ফলে রামমোহন বহুক্ষেত্রে ধর্মের দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। সমাজে ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা ও নারী স্বাধীনতার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণী। ঈশ্বরের সঙ্গে সত্তার সহঅবস্থান অথবা ঈশ্বর সত্তাতীত সত্তা এ বিষয়ে রাজা রামমোহনের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। রাজা রামমোহন প্রসঙ্গে অনেকেই যুক্তিবাদের কথা উল্লেখ করেন। ফরাসী rationalism বা যুক্তিবাদ ইংরেজদের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কিন্তু ভারতীয় সমস্যায় যুক্তিবাদের অবতারণা করতে সমসাময়িক লেখকরা অভ্যস্ত ছিলেন না। এমন কি ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এখনও যুক্তিবাদ ও দ্বন্দ্ববাদ প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। সত্তা বা Being-এর একমাত্র যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রথম জার্মাণ দার্শনিক মার্টিন হায়ডেগারই করেন এবং সত্তাতীত সত্তা বা Being of beings-এর ব্যাখ্যাতে হায়ডেগার ফেনোমেনোলজির সাহায্য নিলেও বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। মণিয়ার উইলিয়াম রাজা রামমোহনকে ধর্মবিজ্ঞানের একজন উৎসাহী ছাত্র বলে উল্লেখ করেছেন এবং একথা বিনা সংশয়ে বলা চলে যে সত্তাতীত সত্তা বা Being of beings উপলব্ধিতে রাজা রামমোহন পৌঁছতে পারেন নি। কোনও এক সঙ্গীতে রাজা রামমোহন বিশ্ব-মানস ও আত্মাকে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। এটাও একটা রোমান্টিক কল্পনা। বহুক্ষেত্রে আপন ব্যক্তি-মানসকেই রাজা রামমোহন বিশ্ব-মানস বলে ভুল করেছেন। এটাও একপ্রকার ভ্রান্ত যুক্তিবাদের পরিণাম এবং Place প্রসঙ্গে প্লেটো এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রকৃত বিশ্ব-মানসের সন্ধান খুঁজে পেলে রাজা রামমোহনকে ইংরেজের কৃপাপ্রার্থী হতে হোত না বা বিদেশে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করতে হত না। দেশের

জনসাধারণ তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াত। একটা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক সামগ্রিকতা বা Social collectivity-র ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন ততক্ষণ তাঁকে চিন্তানায়ক বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

রাজা রামমোহন বিশ্ব-মানসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব-মানসের অনুভূতি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের ভেতর দিয়ে আমরা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্ব-মানসের সান্নিধ্য লাভ করি। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সকরুণ ও বেদনাময় কারণ একদিকে কবি বিশ্ব-মানসের দিকে ধাবিত, আরেকদিকে ব্যক্তি-মানসের নির্জন অসহায়তা এই বিশ্ব-মানসের কাছে নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছে। ইউরোপে অপেরা সঙ্গীতে গ্লুকের জুড়ি নেই। তাঁর অপেরার গানগুলি এই ব্যক্তি-মানস ও বিশ্ব-মানসের ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের শ্রোতাকে বিহ্বল করে দেয়। কিন্তু বিহ্বলতায় রবীন্দ্র সংগীত কখনও কখনও গ্লুকের সংগীতকেও অতিক্রম করে। গ্লুক বা ভার্দি সংগীতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু, কবি ছিলেন না। কবি রবীন্দ্রনাথ সহজেই সংগীতের ডানায় ভর করে বিশ্ব-মানসের জগতে পাড়ি দিয়েছেন। রাজা রামমোহন ব্যক্তি-মানসের মুক্তি দেখেছিলেন বিশ্ব-মানসে বা Universal-এ। রবীন্দ্রনাথের জীবন পরিক্রমা ব্যক্তি-মানস থেকে বিশ্ব-মানসে ও বিশ্ব-মানস থেকে ব্যক্তি-মানসে। রবীন্দ্রনাথের এই পারাপার তাঁকে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার আপন ব্যক্তি-মানসের রহস্য উদ্‌ঘাটনে অধিকতর প্রয়াসী। বিশ্ব-মানসের অনুভূতি তখন মুক্তির পথ দেখাতে অসমর্থ হবে।

কোনও এক প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে ইতিহাস সর্বদাই ঘটনাকে ব্যক্ত করে চলেছে এবং সময়ের তালে তালে এই ঘটনার সত্যতা নির্দ্ধারিত হয়। তিনি লিখেছেন—History is the revealation of facts justified by Time. এটা এক ধরণের রোমান্টিক মূর্খতা। ইতিহাস কখনই ঘটনাকে ব্যক্ত করে না; কেবলমাত্র ঐতিহাসিকই আপন যুগধর্ম দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ইতিহাস থেকে খুশীমত ঘটনা বাছাই করে নেয়। ইতিহাসের ধারা সর্বদাই আপন পথে প্রবাহিত এবং সময় বা ঐতিহাসিকের অনুমোদনের জন্য ইতিহাস কখনই অপেক্ষা করে না। ইতিহাস এক নির্মম বিচারক। কিন্তু ভারতের গিবনের মতে ইতিহাস বিচারক নয়, ইতিহাস বিচারপ্রার্থী। ইংরেজের ঘরে কৃপাপ্রার্থীর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে এধরণের ঐতিহাসিকের জন্ম। ইতিহাসের সমষ্টি (totalisation) প্রতি মুহূর্তেই

আপন বৈপরীত্যের সংঘাতে (detotalisation) ভেঙে গিয়ে ইতিহাসের নতুন সামগ্রিকতার (retotalisation) বিকাশ ঘটাচ্ছে। আমাদের ঐতিহাসিকদের মতবাদ ভূয়োদর্শন লব্ধ বা empirical। ফেনোমেনোলজির কোন ধারণা থাকার ফলে ইতিহাসের যথার্থ রূপটি আবিষ্কার করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা অক্ষম।

আধুনিক কোন ঐতিহাসিক এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি ইতিহাসকে রাজা রামমোহনের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। এই স্বনামধন্য ব্যক্তিটি কিন্তু একটি ব্যাপারে অক্ষম। তিনি কিন্তু রাজা রামমোহনকে ইতিহাসের কাছ থেকে আলাদা করতে পারেন নি। নানা পুঁথিপত্র ঘেটে ইনি প্রমাণ করেছেন যে, সে যুগের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে রাজা রামমোহন সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। এই ঘটনার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও সতীদাহ প্রথার বিলোপ। সক্রিয় অংশ বলতে এই ঐতিহাসিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। মার্কস কি সক্রিয়ভাবে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? তাঁর প্রভাব কি সেখানে পড়ে নি? ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলতো পরিষ্কার লিখেছেন, যে স্লাভোনিক জাতিদের প্রতি মার্কসের কিছুটা বিদ্বেষ ছিল। তবে তাঁর প্রভাব সেখানে এলো কি করে? এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে, রাজা রামমোহন আপন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা যিনি নিজের জীবন দিয়ে যুগের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। যুগের সমস্যা তিনি অনেকটাই ধরতে পেরেছিলেন; কিন্তু রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য তিনি পথের সন্ধান খুঁজে বার করতে পারেন নি। প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার জন্য রাজা রামমোহন না-গ্রহণ্ করাকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন negation-এর মূর্ত প্রতীক। হিন্দুরা রাজা রামমোহনকে অস্বীকার করে negation কেই অস্বীকার করেছিল। তৎকালীন ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইষ্টের কাছে আবেদন করেছিলেন যে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজা রামমোহনের কাছ থেকে কোন অর্থ সাহায্য গ্রহণ না করা হয়। এই আবেদন এটাই প্রমাণিত করে যে হিন্দুরা রাজা রামমোহনকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে negationকেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আমরা জানি যে negation of negation is an affirmation. রাজা রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, আজকের দুর্গোৎসব প্রমাণ করে যে পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন করতে

রাজা রামমোহন ব্যর্থ হয়েছেন। আজকের দুর্গোৎসব কি পৌত্তলিকতা না সামাজিক উৎসব বিশেষ? অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিষ্পেষণে বাঙালী জাতি এই জাতীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। এটা পৌত্তলিকতা নয়।

ইংরেজদের প্রতি রাজা রামমোহন আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। অনেকের ধারণা যে দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই জটিল প্রশ্নের অবতারণার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ নয়। বিশ্ব-মানসের মধ্য দিয়ে আপন জটিল ব্যক্তি-মানসের যে মুক্তি রাজা রামমোহন খুঁজেছিলেন তা কালক্রমে ব্যর্থ হয়ে যায়। ধর্ম বা আইডিয়া মানুষের জীবনবোধকে পাল্টে দিতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সুষ্ঠু জীবন-ধারণই মানুষের জীবন দর্শনকে পাল্টে দেয়। একথা সমসাময়িক ভারতীয়দের কল্পনার অতীত ছিল। যুগের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রথম বলি ছিলেন রাজা রামমোহন। নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এই ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছিলেন। যা ছিল সুপ্ত তাকে প্রকাশ করে রাজা রামমোহন আপন যুগকে আত্মসচেতন করে দেন। এই আত্মসচেতনতাই সমাজকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের ধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। এদিক থেকে আমরা রাজা রামমোহনের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী

রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কাল

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের পর দুইশত বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু আজও তাঁর জন্মসন নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়নি। গত ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে রামমোহনের স্বদেশবাসীগণ তাঁর জন্মোৎসব পালন করেছে। এর পূর্বে শুধু তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হত, কারণ তাঁর জন্মসন, তারিখ প্রভৃতি কারো জানা ছিল না।

অনেকেরই ধারণা যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের তিরোধানের পর থেকে তাঁর জন্মসন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। পুরনো সংবাদপত্রের ফাইল থেকে জানা যায় যে এ বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজার জীবদ্দশাতেই এবং রাজা নিজে বা তাঁর কোন বন্ধু এ বিতর্কে একেবারে নীরব ছিলেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, *Missionary Register*, রামমোহনের TRANSLATION OF AN ABRIDGEMENT OF THE VEDANT বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করে। এতে বলা হল—

"Off Rammohun Roy, we have received reports from several friends. He is a Brahmin, about 32 years of age, of extensive landed property, and of great consideration and influence."

এই মত অনুযায়ী রামমোহনের জন্ম হয়েছিল ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এর কোন প্রতিবাদ হয়নি। এর পর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে রামমোহনের "*The Precepts of Jesus*" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মিঃ রীস (Rees) লেখেন—

"Rammohun was born about the year 1780, at Bordouan, in the province of Bengal" (*Preface by Rees, London. 1823 Edition, Page III, Second Edition, London, 1834, Page V. New York Edition, 1825*).

এই গ্রন্থ রীস ১৮২৩ সালের ১৬ই জুন রামমোহনকে ভারতে পাঠান।

বই পেয়ে রামমোহন রীসকে দীর্ঘ এক পত্র লেখেন, কিন্তু নিজের জন্মসন সম্বন্ধে একটি কথাও লিখলেন না। এ থেকেই রাজার জীবদ্দশাতেই চালু হয়ে যায় যে তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয় (*Monthly Repository*, 1820) এতে বলা হ'ল রামমোহনের বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি। কলকাতার একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে তারা এই সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। এই মত অনুযায়ীও রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। এরও কোন প্রতিবাদ হয় নি।

এর পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে Victor Jacquemont তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন "Rammohun Roy is 50 years of age (*Indian Messenger*, dated 29. 9. 1889, পৃষ্ঠা ৩৫ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ তিনিও ধরে নিয়েছেন যে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়।

রামমোহনের সমসাময়িক দুজন মিশনারীও তাঁর জন্ম সনের উল্লেখ করেছেন। কেরী লিখেছেন যে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়। কিন্তু মার্শম্যান জানতেন ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম।

আর একটি সমসাময়িক সাক্ষ্যের প্রতি রামমোহনের চরিতকার মিস্ কলেট আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের মনিব ও বন্ধু জন ডিগ্‌বী বিলেত থেকে রামমোহনের লেখা *Kena Upanisad and Abridgement of the Vedanta* গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সন তারিখ হীন এই গ্রন্থের ভূমিকায় ডিগবী বলেন—

"Rammohun Roy····is ··about forty-three years of age. At the age of twentytwo he commenced the study of English language, which not pursuing with application, he five years afterwards, when I became acquainted with him, could merely speak it well enough to understand upon the most common topics of discourse, but could not write it with any degree of correctness,"

ডিগ্‌বীর মন্তব্যের প্রথম অংশ অনুযায়ী রামমোহনের জন্ম ১৭৭৪ সালে হলেও হতে পারে। কিন্তু এতে ডিগ্‌বী বলেছেন "about forty three years" অর্থাৎ রামমোহনের বয়স ৪২, ৪৩, ৪৪ সবই হতে পারে। তাছাড়া

ডিগ্‌বীর কাছে এ সম্বন্ধে কোন তথ্য থাকলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর মন্তব্য করতেন। আর জন্মসন জানা থাকলে তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। ডিগ্‌বীর মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী যখন রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে তখন রামমোহনের বয়স ছিল ২৭ বছর। এই দুটি মন্তব্য পরস্পর বিরোধী কারণ ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল কলকাতায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু অন্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে অন্তত ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত রামমোহন কলকাতায়ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। ডিগ্‌বী লিখেছেন যে যখন তাঁদের পরিচয় ঘটে তখন রামমোহন শুদ্ধ ইংরেজী লিখতে পারতেন না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নবাগত সিভিলিয়ান ডিগ্‌বীকে চেনে কে? রামমোহন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে যাবেনই বা কেন? আর প্রথম আলাপেই ডিগ্‌বী বুঝে ফেল্লেন যে রামমোহন শুদ্ধ করে ইংরেজী লিখতে পারেন না! ডিগ্‌বীর পক্ষে এটা আবিষ্কার করা সম্ভব যখন রামমোহন তাঁর কাছে প্রথম চাকরী করতে যান। আর তা হয়েছিল ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। এর প্রমাণ হ'ল ডিগ্‌বীর ১৮০৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের চিঠিটি।[১] এতে তিনি লিখেছেন—

"...as from the opinion I have formed of his probity and general qualifications in a five years acquaintance with him, I am convinced that he is well adapted for the situation of Dewan of a collector's office."

এখানে ডিগ্‌বী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে ৩০. ১২. ১৮০৯ তারিখে রামমোহন ও ডিগ্‌বীর মধ্যে মোট পাঁচ বছরের পরিচয় ছিল। তাহলে প্রথম পরিচয় ১৮০৫ সালেই হয়। ১৮০৫ সালে রামমোহনের ২৭ বছর বয়স হলে আমরা তাঁর জন্ম সন পাই ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ।

এ বিষয়ে ড: মজুমদারের[২] অভিমত হল যে, "When I became acquainted with 'him"—এর অর্থ দুজনের প্রথম পরিচয় নয়, আর "five year's acquaintance with him"—এর অর্থ হ'ল যে কয় বছর দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। অর্থাৎ ড: মজুমদার আমাদের জোর করে

১। Proceedings of the Board of Revenue, 15th January, 1810 No. 10, (Chanda and DasGupta's Book, page 42)

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৫ পৃ: ৬৭২ এবং Satis Chakravorty : Rammohun Roy : Story of his life, Centenary Publicity Booklet No. I, page 31, Note 10 দ্রষ্টব্য।

২। Dr R. C. Majumdar : On Rammohan Roy, page 9.

বোঝাতে চাইছেন যে ১৮০১ সালে দুজনের মধ্যে একবার মুখ দেখাদেখি হয়েছিল এবং তারপর ১৮০১ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে মাঝে মাঝে দুজনের দেখা-সাক্ষাত হ'ত। তারপর ১৮০৫ থেকে দুজনে প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এ হতে পারে না। ডিগ্‌বীকে তখন চেনে কে? তাঁর হাতে তখন ক্ষমতা কোথায়? আর কি উদ্দেশ্যেই বা রামমোহন তাঁর পেছনে ঘুরবেন?

রমেশবাবুর যুক্তি কেন গ্রহণযোগ্য নয় এবার তা বলা যাক্। ১৮০০ থেকে ১৮০৫ খৃস্টাব্দ—এ পাঁচ বছরের রামমোহনের জীবনের ঘটনাবলী অজ্ঞাত রয়েছে বলা চলে। রামমোহনের মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়ে ১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। এখানে তিনি একটি তেজারতি ব্যবসা ও গদি স্থাপন করেন। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাছাড়া সহরের কয়েকজন নামকরা আর্বী ও ফার্সী পণ্ডিতের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। কিন্তু এর দু বছর পরে রামমোহন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চলে যাবার সংকল্প করেন। এবং ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিন বাস করবার তাঁর পরিকল্পনা ছিল। প্রবাসে বাসকালে তাঁর মৃত্যু হলে ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই মর্মে তিনি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর একটি উইল স্বাক্ষর করেন। এর কিছুদিন পরে সম্ভবত ১৮০০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রামমোহন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় এই পর্যন্ত সংবাদ আমাদের জানা ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই সময়কার আরো কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রজেনবাবু[৩] লিখেছেন যে রামমোহন বিদেশে বেশিদিন থাকেন নি। ১৮০১ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ডিগ্‌বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (যেন ডিগ্‌বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে তাঁকে বেনারস থেকে ফিরে আসতে হয়) এবং পরবর্তী দুবছর তিনি কলকাতাতেই অবস্থান করেন। কিন্তু ব্রজেনবাবু এর স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। রামমোহনের খাজাঞ্চি গোপীমোহন চ্যাটার্জি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে রামমোহনের আদেশে তিনি কোম্পানীর কর্মচারী উডফোর্ড (Wood-forde) সাহেবকে ১৮০২ সালে পাঁচহাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। সাহেব তখন ত্রিপুরায় কর্মরত ছিলেন। এই ঘটনা থেকে রামমোহনের কলকাতায় উপস্থিতি প্রমাণিত হয়

৩। ব্রজেন বাবুর মতের জন্যে সাহিত্য সাধক চরিতমালায় তাঁর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

না। পত্রযোগেও তিনি এ ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে পারেন।' তাছাড়া ঋণ গ্রহণের সময় উডফোর্ডও কলকাতায় ছিলেন না, অন্তত সরকারী কাগজপত্র অনুযায়ী। ব্রজেনবাবুর অভিমত গ্রহণ না করার আরো কারণ আছে। ব্রজেনবাবু লিখেছেন "রামমোহন ঢাকা-জালালপুরে (বর্তমান ফরিদপুর) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (৭ই মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই।...রামমোহনের এই দেওয়ানী পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দুই মাস পরেই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন।" এদিকে বোর্ড অফ্ রেভিনিউ-এর অস্থায়ী সভাপতি মিঃ ক্রিপ্স তাঁর ফাইলে লিখলেন—ডিগবী যাকে দেওয়ান পদের জন্যে সুপারিশ করেছেন দেখা যাচ্ছে তিনি উডফোর্ডের খাস কেরানী ছিলেন ঢাকা-জালালপুরে। ক্রিপ্সের প্রশ্নের কোন জবাব ডিগবী দেন নি। রামমোহন উডফোর্ডের খাস মুন্সী বা তার অধীনে অন্য কোন চাকরী করে থাকলে ডিগবী নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতেন। তারপর ব্রজেনবাবু লিখেছেন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন মুর্শিদাবাদে উডফোর্ডের কাছে যান। তাঁর মতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে উডফোর্ড মুর্শিদাবাদে বদলী হ'ন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট উডফোর্ড মুর্শিদাবাদে কাজে যোগদান করেছেন।[৪] আসলে রামমোহন মুর্শিদাবাদে কবে যান এ সম্বন্ধে ব্রজেনবাবুর কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। মামলার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রামমোহন কলকাতা থেকে বহুদূরে পাটনা, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। ব্রজেনবাবুর মতে রামমোহনের পুরনো বন্ধু র‍্যামসে (Ramsay) তখন কাশীতে ছিলেন বলে তিনি কাশী গিয়েছিলেন। ব্রজেনবাবুর এ তথ্যও ঠিক নয়। কারণ ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি গাজীপুরে ছিলেন।[৫] র‍্যামজের আকর্ষণে যদি রামমোহন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে থাকেন এবং তার চাকরী করে থাকেন তাহলে ধ'রে নিতে হবে রামমোহন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত গাজীপুরে ছিলেন। কিন্তু এর পরই দেখতে পাচ্ছি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত রামমোহন মাসিক একশত টাকা বেতনে কাশীতে কমিশনারের অপিসে কেরানী বা

৪। **General Register of Bengal Civil Servants from 1790 to 1842 by Ram Chandra Das, 1844, page 431.**

৫। ঐ পৃষ্ঠা ৩০৭ দ্রষ্টব্য।

রাইটারের কাজ করছেন।[৬] এর আগে বেনারস বা গাজীপুর কোথায় ছিলেন তা ঠিক করে বলা যাবে না। কারণ কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় নি। এই তথ্যই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে রামমোহন ফরিদপুরে উডফোর্ডের অধীনে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে কোন কাজ করেন নি। কারণ সে যুগে একই লোকের পক্ষে একই সঙ্গে কাশী ও ফরিদপুরে চাকরী করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ব্রজেনবাবুর মতে রামমোহন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ঢাকা-জালালপুরে উডফোর্ড-এর চাকরীতে যোগদান করেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল উডফোর্ড ঢাকার কালেকটররূপে যোগদান করেন।[৭] আরো মজার ব্যাপার ৭ই মার্চ তিনি ভারতেও ছিলেন না। এ থেকে এই মনে হয় যে রামমোহন কাগজে কলমে ঢাকায় চাকরী পেয়েছিলেন, কিন্তু ঐ কাজে তিনি কোনদিন যোগদান করেন নি। পিতার মৃত্যুর সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না।[৮] আগুশ্রাদ্ধ হয়ে যাবার অনেক পরে তিনি দেশে ফেরেন—১৮০৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে। ফিরে এসে তিনি পৈত্রিক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি বৈষয়িক কাজকর্ম সেরে সম্ভবত ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে উডফোর্ডের কর্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে উডফোর্ড বেকার হয়ে পড়লে সম্ভবত তাঁরই অনুরোধে রামমোহন ডিগবী সাহেবের নিকট কর্ম প্রার্থনা করেন। মনে হয় উডফোর্ডের সুপারিশেই রামমোহনকে ডিগবী গ্রহণ করেছিলেন। আগেকার দিনে সাহেবরা চলে যাবার সময় তাদের নেটিভ প্রিয়পাত্রকে অন্যকোন সহকর্মীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ডিগবী ও রামমোহনের পরিচয় যে হয় নি তার আরও একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী R. Montogomari Martin বলেছেন যে ডিগবীর নিকট রামমোহনকে কর্ম প্রার্থনা করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় রামমোহন যখন ঐ চাকরী গ্রহণ

৬। **Allahabad Central Record Officc : Misce, Revenue Records of the Banaras Comissioner's Office, ·Vol. XVII, P. 29.**

৭। **Vide R. C. Das, page 481।**

৮। আডাম সাহেব কখনও বলেন নি যে পিতার মৃত্যুর সময়ে রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন—**"He died, as Rammohan Roy himself imformed me, with the most religions devotion, and trust, calling on the name of the God in whom he believed."** রামমোহন বাড়ীর লোকেদের কাছে পিতার শেষ সময়ের কথা শুনে থাকবেন।

করেন তখন "a written agreement was signed by Mr Digby to the effect that Rammohan should never be kept standing …in presence of the collector and that no order should be issued to him as a mere Hindu functionary" (Mr R. Montogomari Martin, in Court Journal October 5, 1833). মনিব ও কর্মচারীর সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকলে এ ধরণের চুক্তি হওয়া অসম্ভব। আসলে ১৮০৫ সালে উডফোর্ডই রামমোহনকে ডিগবীর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রজেন বাবু কোনদিন এসব সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করেন নি। কারণ, তাহলে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে যে রামমোহন ও ডিগবীর পরিচয় হ'তে পারে না তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ৪৩ পৃষ্ঠার টাইপ করা একটি নোট আমি ডঃ মজুমদারকে দিয়েছিলাম। তিনি তাঁর গ্রন্থে এটিকেই "an unpublished article by Suresh Prasad Niyogi" বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধে আমি এই সমস্যাটি উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু রমেশ বাবুও সমস্যাটি সমাধান করবার কোন চেষ্টা না করে লিখেছেন[১]—

> "But whatever may be the date of the first acquaintance between Digby and Rammohan, the clear statement in unambiguous term that Rammohan was 27 years of age when the two met, definitely proves that Rammohan was not born in 1772, for in that case the date of the meeting would fall in 1799, where as Digby arrived in Calcutta in December, 1800. There is hardly any doubt that this is the reason why such desperate attempts are made to reject this very important piece of evidence by supposing, unnecessary, an incosistency between the two statements."

ডঃ রমেশচন্দ্রের এ উক্তির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করবার প্রয়োজন নেই। কারণ ডিগ্‌বীর নির্ভরযোগ্য সার্ভিস রেকর্ড পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন। ডিগবী ১৭৯৯ সালেই কলকাতায় আসুন

১। On Rammohan Roy, pp. 9-10. এটা অবশ্য রমেশবাবুর কোন গবেষণা নয়, এ ধরণের যুক্তি সর্বপ্রথম ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখান।

আর নাই আসুন[১০], তাঁর মন্তব্য দুটি পরস্পর বিরোধী বলে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।

সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়[১১] লিখেছেন—

"ডিগবীর উল্লিখিত বয়সের প্রামাণিকতা স্বীকার করতে হয় দুটি কারণে। প্রথমতঃ, ডিগবীর সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশ কয়েক বছর যাবৎ। চাকরির জন্য আবেদন করেছেন তাঁর কাছে। অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে বয়সটাও তাতে উল্লেখ করতে হয়েছে এবং ডিগ্‌বী তা দেখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ অন্যের লেখা বইপত্রে তাঁর জন্মাব্দ যাই থাক না কেন, নিজের বইয়ে যাতে সঠিক সাল তারিখ থাকে সে বিষয়ে রামমোহন স্বভাবতঃই যত্ন নেবেন ; ডিগ্‌বি ভুল করলে তার সংশোধন করবেন।"

এ যুগে চাকুরী ক্ষেত্রে বয়সের উপর যেরকম জোর দেওয়া হয় কোম্পানীর রাজত্বে সেরূপ ছিল না। চাকরীর তখন কোন পেন্সন ছিল না এবং পাকাও হত না। কালেক্টর চলে গেলে চাকরীও শেষ। এ ক্ষেত্রে রামমোহনের আবেদন পত্রে বয়স উল্লেখ থাকবার কথা নয়। তাছাড়া ডিগবী সময়ে সময়ে কলকাতায় রামমোহন সম্বন্ধে যে সব নোট পাঠিয়েছেন, তার কোথাও বয়সের উল্লেখ নেই। এ সব নোটে শুধু তাঁর যোগ্যতা ও কোন কোন সাহেবের অধীনে চাকরী করেছেন এই সব তথ্যই পাওয়া যায়।

আর রামমোহনের নিজের রচিত বই বলে রামমোহন যত্ন নেবেন একথার অর্থ কি? রামমোহনের রচিত বই ডিগবী বিলেতে গিয়ে পুনর্মুদ্রণ করেছেন তাঁর নিজের দায়িত্বে। বিলেতে এধরণের রামমোহনের আরো বইর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বেই দেখিয়েছি যে সেগুলিতেও নানা রকম জন্মসন রয়েছে। আসল কথা হ'ল—যে কোন কারণেই হোক রামমোহন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের তাঁর জন্ম সন জানতে দেন নি। যে যা লিখেছে রামমোহন তারও কোন প্রতিবাদ করেন নি। সম্ভবত ব্যক্তিগত জীবনের এসব তুচ্ছ ব্যাপারে রামমোহন নির্লিপ্ত থাকতেন। সমসাময়িকরা সকলেই তাঁর বয়স নির্ধারণ করতে গিয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন।

এবার দেখা যাক যাঁরা রামমোহনকে জানতেন তাঁরা রামমোহনের মৃত্যুর পর কি বলেছেন। মিঃ মণ্টগোমেরি মার্টিন রামমোহনের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

১০। এ বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস।
১১। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মাব্দ, ইতিহাস, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ৬৭।

রামমোহন গোষ্ঠীর পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরাল্ডের' তিনি সম্পাদক ছিলেন। মার্টিন বহুদিন রামমোহনের বাড়ীতেও বাস করেছেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কোর্ট জার্নালের প্রবন্ধে লেখেন[১২]—

"He was born at Burdwan, in the Province of Bengal, in the year 1780, of illustrious ancestors."

ইংলণ্ড যাত্রার সময় জেমস্ সাদারল্যাণ্ড নামে এক ভদ্রলোক রামমোহনের সহযাত্রী ছিলেন। ১৮৩৯ সালে ইনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৮৩৪ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—Rammohan's life "closed in his Sixtieth year" এ উক্তি অনুযায়ী রামমোহনের জন্ম ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হতে পারে। কিন্তু এর বেশ কিছুদিন আগে আর একজন ইংরেজ ডঃ কার্পেণ্টার বলেছেন যে "খুব সম্ভবত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি" সময়ে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। এ জন্যে সাদারল্যাণ্ডের মন্তব্যের গুরুত্ব অনেকটা কমে যাচ্ছে। আর যেভাবে তিনি তাঁর মন্তব্যটি পেশ করেছেন তা অনুমান (guess) ছাড়া আর কিছুই নয়। ডঃ মজুমদার এই উক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একজন বিদ্যাসাগর-গবেষক হিসেবে সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে বর্তমান লেখকের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ভারতীয়দের বয়স নির্ধারণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এই ইংরেজ ভদ্রলোকের। ১৮৩৮ এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে হিন্দু ল-এর পরীক্ষা করেন। প্রথমবার বিদ্যাসাগর কৃতকার্য হতে পারেন নি। দ্বিতীয়বার তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ল কমিটির পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৩৯ সালের ১৬ই মে তারিখে Hindoo Law Comittee of Examination এর সেক্রেটারী হিসেবে সাদারল্যাণ্ড বিদ্যাসাগরকে যে সরকারী সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন তাতে বিদ্যাসাগরের বয়স এইভাবে দেখিয়েছেন—"Issur Chunder Vidyasagar Aged 22 years." আমরা জানি ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর মশাই জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ১৯ বছর পূর্ণ হয় নি। আর সাহেব তার চেহারা দেখে অনুমান করে লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের বয়স ২২ বছর। রামমোহনের বয়সও তিনি এইভাবে নির্ধারণ করেছেন কিনা জানি না। তবে তিনি এবং তাঁকে

১২। **India Gazettee, 18th February 1884.** এখানে আর একটি কথা বলা যেতে পারে যে বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বাকিংহাম বলেছেন যে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়। মার্টিন তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে এ পর্যন্ত যারা রাজার জন্মসন সম্বন্ধে কিছু বলেছেন সব ভুল হয়েছে। তিনি রাজার মুখেই শুনেছেন যে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। সমসাময়িক সাক্ষ্যের মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে কেউ রাজার জন্মসন উল্লেখ করেন নি।

অনুকরণ করে যারা "Sixtieth year"-এর উল্লেখ করেছেন তাদের বক্তব্যের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করব না।

রামমোহনের আর একজন সমসাময়িক ব্যক্তি হলেন ডাঃ ল্যান্ট কার্পেন্টার। রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি "A Biographical sketch of the Rajah Rammohun Roy" প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে এই বইটি "Biographical Memoir of the Late Rajah Rammohun Roy with a series of illustrative extracts from his writings." নামে পুর্নমুদ্রিত হয়। ডঃ কার্পেন্টার লিখেছেন—

> "the son took up his abode in the district of Burdwan, where he had landed property. There Rammohun Roy was born, most probably about 1774".

কার্পেন্টার রাজার মুখে শুনে এবং অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে তাঁর বইর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বলে জানিয়েছেন এবং এই বইগুলির তালিকাও প্রকাশ করেছেন। আর এই তথাকথিত প্রামাণিক বইগুলিতে রাজার জন্মসন ১৭৮৪ আছে, ১৭৭৪ কোথাও নেই। গ্রন্থকার রাজার জন্মসন সম্বন্ধে রাজার মুখ থেকে কিছু শুনে থাকলে তিনি তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। আর রামমোহন যদি তাকে কিছু বলে থাকতেন তাহলে লেখক "most probably about 1774" লিখবেন কেন? ডঃ কার্পেন্টার এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন সম্ভবত ডিগবীর ভূমিকা থেকে। কারণ ইংলণ্ডে তখন ১৭৮০ ও ১৭৮৪ সাল প্রচলিত ছিল। ডঃ কার্পেন্টারের কথা গ্রহণ করা যেতে পারে না। কারণ তিনি "most probably" এবং "about" এই দুটি কথা ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর বক্তব্যের জোর কমে গেছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই "most probably about 1774" তরুণ লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্রের হাতে শুধু "1774" হয়েছে, কোন কারণ না দেখিয়ে।

ডঃ কার্পেন্টারের বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ মজুমদার[১৩] লিখেছেন—

> "It is pointed out by the supporters of 1772 theory that the two words "about" and "most probably" take away the value of the evidence as a convincing one.

১৩। **On Rammohan Roy, page 10.**

But it must be admitted that the words certainly make the date 1774 as a very probable one, though we may not regard it as a conclusive evidence. This probability is heightened by the fact, mentioned above, that both Sutherland and Devendranath Tagore agreed that Rammohan died in his sixtieth year."

সাদারল্যাণ্ডের কথা আগেই বলা হয়েছে। এবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা বলা যাক। শ্রীগোরা মিত্রের মতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৭২ সালের ২২শে মে।[১৪] মহর্ষির এ ধরণের উক্তির কোন সন্ধান এ পর্যন্ত পাইনি! তবে তিনি রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ১৭৭২ সালই সমর্থন করে। ১৮৬৪ খৃঃ একটি বক্তৃতায় মহর্ষি বলেছেন[১৫] —

"তাঁর এই ভাব ছিল যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্বরা করিব। অতএব রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা না করিয়াছেন, তাহার শতগুণ এক ব্রাহ্মধর্মকে সংস্থাপনের জন্যে তাঁহার করিতে হইয়াছিল,—ইহার জন্যে তিনি শরীর মন ধন সকলি দিয়াছিলেন। এক দিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষষ্টি বৎসর পর্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ন ছিল।"

মহর্ষি বলেছেন ব্রাহ্মসমাজের কাজে রামমোহন দেহ ও মন দিয়েছেন, কিন্তু প্রাণ দিয়েছেন একথা বলেন নি। আর তা বলতেও পারেন না। কারণ রামমোহন বিলাত গিয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্ম বা সমাজের কাজের জন্যে নয়। নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্মসূচি নিয়ে গিয়েছিলেন আর এতে ব্রাহ্মধর্মের নাম গন্ধও নেই। তাই মহর্ষির এ উক্তির তাৎপর্য হল ভারতবর্ষে থেকে রামমোহন সমাজের জন্যে যে কাজ করেছেন তাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে নভেম্বর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর জন্ম হয়ে থাকলে তাঁর জীবনের উনষষ্টিতম বর্ষেই ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে। মহর্ষি যে উক্ত বক্তৃতায়

১৪। দ্রষ্টব্য: রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম সন প্রসঙ্গে—পাঠকের মতামত, যুগান্তর ৮-১২-১৯৭০।

১৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" (পৃঃ ১০)।

১৭৭২ সালই মেনে নিয়েছেন তার সমর্থন পাওয়া যাবে ব্রাহ্মধর্মের ঐতিহাসিক ডঃ প্রসন্নকুমার সেনের রচনায়। ডঃ সেন[১৬] লিখেছেন—

"It may be noted that this earlier date [1772] agrees with the date adopted by Maharshi Devendra Nath Tagore in his Bengali address entitled "My Twenty-five years' Experience in the Brahmo Samaj" published in 1864."

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার একটি হাস্যকর সমসাময়িক সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন।[১৭] তিনি লিখেছেন—

"9. Kishorichand Mitra, who knew the Raja very well, wrote in the *Calcutta Review* is 1845, that the Raja was born in 1774."

কিশোরীচাঁদের জন্ম ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। সুতরাং রামমোহনের বিলাতযাত্রার সময় তাঁর বয়স ছিল ৮ বছর। এই আট বছরের ছেলের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন দেশের প্রবীণতম ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এ সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

তরুণ কিশোরীচাঁদই (বয়স ২৩ বছর) সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁর সামনে তখন ১৭৭৬, ১৭৮০, ১৭৮৪, ১৭৭৪ এতগুলি জন্মাব্দ নিয়ে বিতর্ক চলছিল। হঠাৎ তিনি কোন্ তথ্যের জোরে ১৭৭৩ লিখলেন তা কাউকে জানালেননা। তিনি যদি সত্যিই রাজার জন্মসন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পেয়ে থাকতেন তাহলে তিনি সে প্রমাণ অথবা রাজার জন্ম তারিখ ও মাস উল্লেখ করতেন। তাই মনে হয় তিনি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছেন। তবে লেখক তাঁর প্রবন্ধে তাঁর উক্তির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না দিলেও তিনি এ তথ্য কোথায় পেয়েছেন তা বের করা খুব কঠিন নয়। কলিকাতা রিভিউ এর প্রবন্ধটি একটি বইর সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত। এই বইটির নাম—"Biographical memoir of the late Rajah Rammohun Roy with a series of illustrative extracts

১৬। Dr P. K. Sen : Biography of a New Faith, volume one, pages 18-19 footnote. [Published in 1950]

১৭। On Rammohan Roy page 7. কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধটির জন্যে *Calcutta Review*, Vol. No. 8, October 1845 page 855 দ্রষ্টব্য।

from his writings" (1834). পূর্বেই বলেছি এটি ডাঃ কার্পেন্টারের বইর কলকাতা সংস্করণ। কিশোরীচাঁদ যে বইর সমালোচনা লিখেছেন সে বইয়ে আছে—"most probably about 1774." আর কিশোরীচাঁদ কোন কারণ না দেখিয়ে তাকে শুধু 1774 করে দিলেন। কিশোরীচাঁদের যে কয়টি জীবনীমূলক রচনা পাওয়া গেছে তাতে সন তারিখ ও তথ্যের প্রচুর ভুল আছে। কোন তথ্য ভাল করে অনুসন্ধান না করে তিনি গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিশোরীচাঁদের এই প্রবন্ধের উপর নির্ভর করলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় রামমোহন উৎকোচ গ্রহণ করে প্রচুর সম্পত্তি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করবার পূর্বেই তিনি ব্যবসা করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একজন সমালোচক[১৮] লিখেছেন—

> "রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-সংক্রান্ত কোনও সন্দেহযুক্ত তথ্যের বা তারিখের মীমাংসা করিতে হইলে কিশোরীচাঁদ মিত্রের নজীর দেওয়া বৃথা।···তথ্য ও তারিখ সম্বন্ধে তিনি এত অধিক অসতর্ক ছিলেন এবং অনুসন্ধান না করিয়া অনুমানের উপর এত অধিক নির্ভর করিতেন যে তাহার কোনও কথাতে বিনা পরীক্ষায় নির্ভর করা যায় না।"

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মসন ১৭৭৪ প্রমাণ করবার জন্যে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার[১৯] মৃত যোগেশচন্দ্র বাগলের অন্ধদশায় তাঁর নামে প্রচারিত একটি উক্তি টেনে এনেছেন। তিনি লিখেছেন—

> "Bagal refers to an additional evidence, namely, a case in the Supreme court against Rammohun in which Rammohan was fined one rupee. Bagal also cites other evidence from the Court records. Unfortunately his recent death prevents me from the advantage of his help in tracing these records."

বাগলের বক্তব্যটি শ্রীনির্মল খাঁ সম্পাদিত "শতরূপায়" প্রকাশিত হয়েছিল। ডঃ মজুমদার শ্রীখানের কাছে এসব তথ্য কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল জানতে চান, কিন্তু শ্রীখাঁ ডঃ মজুমদারকে কোন উত্তর দেননি বলে তিনি জানিয়েছেন।

১৮। প্রবাসী, ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা ২৭০ দ্রষ্টব্য।

১৯। On Rammohan Roy p. 17; শতরূপা বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭, পৃঃ ২৬২ ও ২৭৪-২৭৬ দ্রষ্টব্য।

"সংবাদ কৌমুদীতে" রামমোহনের এক টাকা জরিমানা হওয়ায় কাহিনীটি প্রকাশিত হবার ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক। কারণ "সংবাদ কৌমুদী"র একটি সংখ্যাও পাওয়া যায় নি। এই সংবাদ পত্রের কিছু কিছু সংবাদ অন্যান্য সংবাদপত্রে পুর্নমুদ্রিত হয়। এগুলি ৺ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সেখানে বা অন্য কোন উৎস থেকে এ সংবাদের সমর্থন মেলে না। তা হলে এ সংবাদটি প্রচারিত হ'ল কি করে? ব্রজেনবাবুর সংবাদপত্র সেকালের কথায় সংকলিত সমাচার দর্পনের সংবাদটি শ্রীগোরা মিত্র[২০] এইভাবে প্রচার করেন।

"সুপ্রীম কোর্টের সরকারী উকিল ওয়াইট সাহেব ভারতীয়গণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলায় ১৮৩০ সালের অক্টোবর তারিখে রামমোহন সাহেবকে 'গালি' দেন, ফলে বিচারে তাঁর এক টাকা অর্থদণ্ড হয়। কোর্টের আদেশ পত্রে রামমোহনের জন্ম সাল ও মাস উল্লেখ আছে (সংবাদ কৌমুদী—১২৩৭-২৭ কার্তিক)।"

অনুসন্ধান না করে শ্রীনির্মল খাঁ তাঁর প্রবন্ধে এই তথ্যটি গ্রহণ করে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখলেন—"কোর্টের আদেশপত্রে রামমোহনের জন্ম সাল ও মাস ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস বলে উল্লেখ আছে।" যোগেশ বাবু বলেছেন—"মিথ্যা বার বার প্রচারের ফলে এক সময়ে সত্যের মর্যাদা লাভ করে।" দুঃখের বিষয় এ মিথ্যে তথ্যটি স্বয়ং যোগেশ বাবুর কাছে সত্যের মর্যাদা লাভ করেছে! অধিক মন্তব্য নিষ্প্রোয়জন।

ওয়াইট সাহেবের মামলার ব্যাপারটি কিন্তু মিথ্যে নয়। মিথ্যে হ'ল মামলার কাগজপত্রে রামমোহনের জন্ম তারিখ উল্লেখ আছে এবং সে সংবাদটি সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। আর ঘটনাটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঘটেছিল। এই মামলায় রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি আসামী ছিলেন। সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে শ্রাবণ (ইংরেজী ৮ই আগস্ট ১৮২৯) তারিখের "সমাচার দর্পণে।" সংবাদটি এই—

"সুপ্রিমকোর্ট।—গত বুধবার বাঙ্গাল হেরেল্ড নামক সমাচারপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মার্ত্তিন সাহেব ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্তবাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের নামে সুপ্রিমকোর্টের ওয়াইট নামক উকীল সাহেবের গ্লানিপ্রকাশকরণাপরাধিবিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা

২০। রামমোহন রায়ের জন্ম তারিখ—চিঠিপত্র, যুগান্তর ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ দ্রষ্টব্য।

গ্রান্দজুরীর সাহেবরা গ্রাহ্য করিলেন। নালিশ ইহাতে জন্মিল যে বাঙ্গাল হেরেল্ডেতে ফরিয়াদী সাহেবের ওকালতী কর্মের বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মানহানি হয়।"

এ থেকে দেখা যাচ্ছে রামমোহনের শাস্তি ও আদালতের আদেশে তাঁর জন্ম সনের কোন উল্লেখ নেই। এই মামলায় অভিযুক্ত রামমোহনের বন্ধু মার্টিন সাহেব বলেছেন (১৮৩৪ সালে) যে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়। আদালতের রায়ে রামমোহনের বয়সের কোন উল্লেখ থাকলে মার্টিন সাহেবের ত তা ভুলে যাবার কথা নয়।

এই মামলার পূর্ণ বিবরণ ১৮২৯ সালের ২২শে আগস্ট তারিখের 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, নীলরতন হালদার ও রামমোহন রায় এই তিনজন ছিলেন ঐ কাগজের মালিক, আর সম্পাদক ছিলেন মার্টিন সাহেব। কাগজটি (মাসিক চাঁদা দুই টাকা) বের হ'ত ৭নং ডেকার্স লেন থেকে। মামলায় প্রধান আসামী মার্টিন সাহেব সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে বলেন যে অভিযুক্ত অপর তিন ব্যক্তি কাগজের মালিকমাত্র, ঐ রচনার কোন দায়িত্ব তাদের নেই। আদালত একথা মানতে অস্বীকার করে। এখন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়ের মত সম্মানী ব্যক্তিদের ক্রিমিন্যাল মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আদালতে হাজির হলে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। জজকে বোঝান হ'ল যে এরা নেটিভ। ক্রিমিনাল মামলাকে ভীষণ ভয় করে, তারপর যদি কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হয় তবে আরো বিপদ। রামমোহন প্রভৃতি তাঁদের দোষ স্বীকার করায় তাঁদের আদালতে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এদের জেরাও করা হয় নি। তাই মামলার কাগজপত্রে এদের বয়স আসবে কি করে? জজ সাহেব মার্টিনকে ৫০০ টাকা ও অপর তিনজনকে এক টাকা করে জরিমানা করেন। মামলার রায়ে (বেঙ্গল হেরাল্ডে প্রকাশিত) এই সব সম্মানিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হয় নি, আর বেঙ্গল হেরাল্ডও তা গোপন রেখেছে। আর 'সংবাদ কৌমুদী' তা ফাঁস করে দেবে?

যোগেশবাবু কোর্টের দলিলপত্র বিশেষ করে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ও রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সাক্ষ্যের কথা বলেছেন। এ তথ্যও শ্রীমিত্র সর্বপ্রথম প্রচার করেন তাঁর ঐ একই চিঠিতে। তিনি লিখেছেন—

"ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়, রামমোহনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেছিলেন—এতে তাঁর বাল্য বয়সেই পরিচিত নন্দকুমার

বিদ্যালঙ্কার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন (পরে নন্দকুমার সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী)। সেই সাক্ষ্যে আছে ১৬৯৬ শকাব্দে ভাদ্র মাসে রামমোহনের জন্ম।'

শতরূপার সম্পাদক এ তথ্যটিও বিচার না করে তার প্রবন্ধে হুবহু ছেপেছেন (২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রেও বার বার প্রচারের ফলে মিথ্যের ভূত যোগেশবাবুর মত একজন অভিজ্ঞ গবেষকের ঘাড়ে চেপে বসেছে সত্যের মর্যাদা নিয়ে। শুধু তাই নয় দেশের প্রবীণতম ঐতিহাসিককেও বিচলিত করে তুলেছে। তাঁর ধারণা হয়েছে যে যোগেশবাবু বেঁচে থাকলে এমন তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হত। মামলার কাগজপত্রও এখনও রক্ষিত আছে, এর জন্যে ত যোগেশবাবুর বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এসব কাগজপত্র রমাপ্রসাদ চন্দ ও ডঃ যতীকুমার মজুমদারের সম্পাদনায় "Selections from the official letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohan" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। অন্যতম সম্পাদক ডঃ মজুমদার ত এখনও বেঁচে আছেন। দুঃখের বিষয় রমেশবাবু এই সব দলিলপত্র নিজে বিচার না করে তাঁর শ্রোতা ও পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে রামমোহনের মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র উদ্ধার করা ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্ষয় কীর্তি। এ সব দলিলপত্রের কোথাও রাজার জন্ম সন সংক্রান্ত তথ্য থাকলে নিশ্চয়ই তিনি তা উল্লেখ করতেন। তাছাড়া, রমাপ্রসাদ চন্দ ও যতীকুমার মজুমদার তাদের গ্রন্থে রাজার জন্ম সন ১৭৭২ বলেই উল্লেখ করেছেন। রমাপ্রসাদ চন্দও মামলার নথিপত্র নিয়ে প্রবাসীতে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। উৎসাহী পাঠকগণ এসব প্রবন্ধ পাঠ করে দেখতে পারেন।[২১] এই প্রসঙ্গের উপসংহারে এইটুকু দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আবিষ্কৃত মামলার নথিপত্রের মধ্যে রামমোহনের বয়স বা জন্মসন সম্বন্ধে কোন সংবাদ নেই।

যুগান্তরে প্রকাশিত পত্রে শ্রীমিত্র আরও একটি সমসাময়িক প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখেছেন যে ১৮১২ সালের স্পেনের সংবিধানটি রাজা রামমোহন রায়ের নামে উৎসর্গ করা হয় এবং ঐ সংবিধানের ভূমিকায় রাজার জন্মসন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর লেখা। ১৮১২ সালে রামমোহন রংপুর কালেক্টরীতে একজন কেরানী। ভারতবর্ষে এমন কি রাজধানী

২১। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৩, ৬৮৪-৬৯২ পৃষ্ঠা; কার্ত্তিক ১৩৪৩; পৌষ ১৩৪৪; আশ্বিন ১৩৪৩ দ্রষ্টব্য।

কলকাতাতেই তাঁর তখন পরিচিতি ঘটে নি। আর সুদূর স্পেন দেশের জনগণ তাদের সংবিধান রামমোহনকে উৎসর্গ করে বসলেন। এ তথ্য কে বিশ্বাস করবেন? তাছাড়া কোন দেশের সংবিধান কি কোন ব্যক্তিবিশেষকে (তাও আবার বিদেশীকে) উৎসর্গ করা যায়? আসল ব্যাপার হল "La Compania Die Filipines" ঐ সংবিধানের একটি খণ্ড হাতে এঁকে রামমোহনকে উপহার দিয়েছিলেন সম্ভবত লণ্ডনে। আর ঐ খণ্ডটিতে রামমোহনের জীবনী বা জন্ম সাল সংক্রান্ত কোন ভূমিকা নেই। আশ্চর্যের বিষয় শ্রী খাঁ তাঁর প্রবন্ধে এ তথ্যটিও গ্রহণ করেছেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত সরকারের রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম সন নির্ধারণ কমিটির অধিবেশনে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ প্রসঙ্গটি একবার উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এশিয়াটিক সোটাইটির ভাষণে এ প্রসঙ্গ আর তোলেন নি। এ বিষয়ে আমার চিঠির উত্তরে স্পেন দেশের সরকার আমাকে যা জানিয়েছেন পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

"We have been informed that in none of the editions of that Constitution existing to-day in Spain there is a printed dedication to Raja Rammohun Roy, which is natural because, being a legislative text, it is not normal to be dedicated to anybody. What the histoical authorities in Spain think is that it is possible that such a dedication was written by hand before the text of the Constitution by one of the Spanish Politicians of the time who might have known Raja Rammohun Roy. It is also possible that it was written by one of the imigrant Spaniards residing in London around 1831—the time when Raja Rammohun Roy visited Europe for the first time."

তথাকথিত সমসাময়িক প্রমাণগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণটির কথা এবার আলোচনা করা যাক। ১৭৭৪ সালের সমর্থকগণ বলেন যে রাজার বন্ধু ও সহকর্মী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর স্টেপলটন গ্রোভের কাঁচা সমাধি থেকে রাজার দেহাবশেষ আরনোস্ ভেল সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করে তার উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে বর্তমান স্মৃতি ফলকটি উৎকীর্ণ করেছেন।

জন্ম সন ১৭৭৪ ঠিকভাবে জেনেই প্রিন্স তা খোদিত করে গেছেন। এরা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেছেন যে বৃষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি মন্দিরটি দ্বারকানাথ নির্মাণ করেছেন এবং স্মৃতি ফলকটি তিনিই উৎকীর্ণ করেছেন বা করিয়েছেন। এটা একটি কিংবদন্তী মাত্র। ঘটনা নয় একেবারে রটনা। ঐ ব্যাপারে দ্বারকানাথের আদৌও কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে। দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলেত যাত্রা করেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ। এবং ঐ বছরের শেষ ভাগে ভারতে ফিরে আসেন।[২২] তাঁর যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ তাঁকে রাজার দেহাবশেষ উপযুক্ত কোন স্থানে স্থানান্তরিত করে সেটি রক্ষা করবার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ তাঁর প্রথমবারের ইংলণ্ড ভ্রমণের স্বল্পকালের মধ্যে এ কাজ সমাপ্ত করতে পারেন নি। ইংলণ্ডে তিনি প্রধানত শিল্পনগরীগুলি পরিভ্রমণ করেছেন। দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তার একটি তালিকা যোগেশবাবু দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। এখানে বৃষ্টলের নাম নেই। বিলেত থেকে দ্বারকানাথের ভ্রমণ ও কার্যকলাপের বহু সংবাদ ও চিঠিপত্র এসেছে এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়েছে। এ সব সংবাদেও রাজার সমাধির কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া প্রিন্স দ্বারকানাথের ভ্রমণ ডায়েরী ও কিশোরীচাঁদের গ্রন্থেও এ সংবাদটি নেই। দেশে তিনি এত খবর পাঠালেন আর দেশবাসী তাঁর উপর যে কাজের ভার দিলেন তাই তিনি দেশবাসীকে জানাতে ভুলে গেলেন। আর দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে গিয়ে তাঁর দেশবাসীর জন্যে কোন কাজ করেন নি তারও প্রমাণ আছে। ইয়ং বেঙ্গল দলের কাগজ "Bengal Spectator"[২৩] এ বিষয়ে দ্বারকানাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর লিখেছেন—

> "দ্বারকানাথ বাবু সাধারণের অথবা আপনার কোন কর্ম্মের ভারগ্রস্ত হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন নাই, তিনি শুদ্ধ আমোদের নিমিত্ত ও নানাবিধ আশ্চর্য্য বিষয় সন্দর্শন ও দেশভ্রমণের জন্য গমন করিয়াছেন…"

এ সংবাদটি ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি তাঁর "বিলাতে দ্বারকনাথ ঠাকুরের সম্মান" প্রবন্ধে সংবাদটি মুদ্রিত করেন।

এরপর আর কি হবে? তাই রটিয়ে দেওয়া হ'ল যে হ্যাঁ একটু ভুল হয়েছে। দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার যখন ইংলণ্ড যান তখন তিনি রাজার

২২। বাগল : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ১৫

২৩। Bengal Spectator 1st, January 1843, page 7.

দেহাবশেষ সরিয়ে আর্নোস ভেলের সমাধি ক্ষেত্রে প্রোথিত করেন। ৺যোগেশচন্দ্র বাগল এবং আরো অনেকে লিখেছেন যে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন ১৮৪৫ সালের ৮ই মার্চ 'বেন্টিক' জাহাজে[২৪] এবং ১৮৪৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি লণ্ডনে দেহত্যাগ করেন। এই দ্বিতীয়বার দ্বারকানাথ রাজার সমাধি দর্শন করে থাকলেও করতে পারেন। কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত এর কোন প্রমাণ পাইনি। কিন্তু তখন রামমোহনের দেহাবশেষ স্থানান্তরিত ও প্রোথিত হয়ে গেছে এবং সমাধি মন্দিরটিও নির্মাণ হয়ে গেছে। তাই দ্বারকানাথ সেখানে গেলেন আর না গেলেন তাতে কি আসে যায়?

এর কিছুদিন পরে ঐ একই কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

> "The remains of Rammohun Ray, who died at Stapletone Grove, near Bristol the residence of M. H. CASTLE Esq. several years since and was burried in the ground adjoining the house, have been removed to the cemetery at Arnol's value, and interned in that portion appropriated to dissenters. A sum has been forwarded from India for the purpose of erecting a Stately monument on the spot. It will be in the Hindu style of architecture and upwards of 30 feet in height." (*date 24.8.1843. Vol. II. No. 25*, Page—249)[২৫]

রাজার দেহাবশেষ ১৮৪৩ সালের ২৯শে মে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং মেরি কার্পেন্টারের মতে সমাধিমন্দিরটি ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে নির্মিত হয়। কিন্তু আমরা জানি ১৮৪৩ এবং ১৮৪৪ সালে রাজার বন্ধু দ্বারকানাথ ভারতবর্ষেই ছিলেন। তাছাড়া, দেহাবশেষ সরান ও মন্দিরটি নির্মাণের ব্যয়ভারও প্রিন্স একা বহন করেন নি। টাকা গিয়েছিল ভারত থেকে। রামমোহনের স্মৃতি রক্ষার জন্যে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তাই থেকে টাকা পাঠান হয় বিলেতে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে রামমোহনের সমাধিমন্দিরটির সঙ্গে বা স্মৃতিফলকটির সঙ্গে দ্বারকানাথের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

২৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ২৫।

২৫। বাংলা সংবাদটি এরূপ—"বিষ্টলের নিকট ষ্টেপলটন গ্রো নামক স্থানের এম. এইচ কাষ্টল সাহেবের বাটীতে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় এবং সেই বাটীর সমীপে তাহার মৃত শরীরের কবর হইয়াছিল আর্নোবেল নামে ডিসেণ্টরদিগের গোরস্থানে তাঁহার ঐ গোর উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরে স্তম্ভ নির্মাণের নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে কিঞ্চিৎ টাকা প্রেরিত হইয়াছে ঐ স্তম্ভ উচ্চে ৩০ ফিট এবং হিন্দুদিগের রীত্যানুসারে হইবেক।" পৃঃ ২৪৯।

Bengal Spectator, Vol. II No. 25, dated 24.8.1843, page 249

নেই। তাহলে প্রশ্ন উঠে এটি রটল কি ভাবে? সে কথা পরে বলছি। এই সংবাদটি দ্বারকানাথের সুযোগ্য বংশধর শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশাইকে জানালে তিনি আমায় বলেছিলেন এটা রটনা হতে পারে তবে আমি জানি ঠাকুরবাড়ি থেকে অনেক টাকা গিয়েছিল। হাঁ: এ কথা সত্য। রামমোহনের স্মৃতিরক্ষা তহবিলে ঠাকুরবাড়ীর অনেকেই চাঁদা দিয়েছিলেন এবং কে কত দিয়েছিলেন তা নিম্নে দেখান হ'ল[২৬]—

দ্বারকানাথ ঠাকুর	……	১০০০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	……	১০০০
রমানাথ ঠাকুর	……	২০০
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	…	১০০
মথুরনাথ ঠাকুর	……	৫০
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	…	১০০০
মোট	…..	৩৩৫০ টাকা

এই ভুল সংবাদটি সর্বপ্রথম প্রচার করেন কুমারী কার্পেণ্টার। তিনি লিখেছেন—

"It was right that the public should have access to his grave, and should see a befitting monument erected over it. This could not be done at Stapletone Grave, which had now passed out of the castle family. The Rajah's friend, the celabrated Dwarkanath Tagore desired to pay this mark of respect to his memory and it was therefore arranged that the case containing the coffin should be removed to the beautiful cemetery of Arno's vale, near Bristol. This was suitably accomplished on the 29th of May, 1843, and a handsome monument was erected in the spring of the year following by his friend. (Last days in England of the Raja Rammohun Ray 1866)".

২৬। সমাচার দর্পণ, ২০ এপ্রিল ১৮৩৪ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত)

এ থেকে দেখা যাচ্ছে দ্বারকানাথের ইচ্ছায় রাজার দেহাবশেষ সরান হয়েছিল এবং সমাধি মন্দিরটি তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রথম বার ইংলণ্ডে বাস করবার সময় দ্বারকানাথ তাঁর বন্ধুদের কাছে রাজার দেহাবশেষ সরিয়ে একটি ভাল যায়গায় প্রোথিত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকতে পারেন। এ অনুমান মাত্র। কিন্তু দেহাবশেষ সরান, নতুন স্থানে প্রোথিত করা এবং সমাধি মন্দিরটি নির্মাণ—এ সবই হয় দ্বারকানাথের অনুপস্থিতিতে। সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ও তিনি করেন নি।

মিস্ কার্পেণ্টারের গ্রন্থ প্রকাশের পর (অথবা তার পূর্বে যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন) দ্বারকানাথের নামটি এর সঙ্গে রটে গেল। এর পর যাঁরা বিলেতে এসেছেন—যেমন কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন ঠাকুর প্রভৃতি এঁরাও তাই প্রচার করতে শুরু করে দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এক বক্তৃতায় বললেন—

"For years he lay unnoticed in his humble tomb which the piety of his English friends had raised for him. and it was not until the arrival of Dwarkanath Tagore in England that suitable monument was raised over the remains of the greatest Hindu reformer of modern times" (Speech dated 27.9.1888.)

এর আগে ১৮৭০ সালের জুন মাসে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন ব্রিষ্টলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কুমারী কার্পেণ্টারের অতিথি হয়েছিলেন। কেশব বাবুর রামমোহনের সমাধি দর্শনের রিপোর্টটি[২৭] এখানে উদ্ধৃত করছি—

"In the afternoon, Mr. Sen made a pilgrimage to the Raja's grave. In accordance with the known wishes of the deceased, the noble stranger had been first laid in a shady spot in the garden house where he breathed his last sorrounded by deeply sorrowing friends; but, as his distinguished country man, Dwaraka Nath Tagore, wished to erect a suitable monument over his grave, the

২৭। **Keshub Chander Sen in England, Third Edition, 1988. (Navavidhan Publication Committee) Page 297** ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দেহাবশেষ সরান হয় নি, বা দ্বারকানাথ তখন বিলেতেও যান নি। এখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত কাজ দ্বারকানাথের ইচ্ছেতেই করা হয়েছে।

coffin was removed, in 1841, to the beautiful cemetery of Arno's Vale, where a noble-looking Oriental monument marks the sacred spot…"

এর পর মিস্ কলেট লিখলেন—

"……Ten years later, a new home was found for the earthly remains in the cemetery of Arno's Vale near Bristol. There the Rajah's great friend and Comrade Dwarkanath Tagore who had come from India on pious pilgrimage to the place where the Master died, erected a tomb of stone."

এতো পরিষ্কার মিস্ কার্পেন্টারের প্রতিধ্বনি। তারপর রামমোহনের বাংলা জীবনীগ্রন্থ ও স্কুল পাঠ্য পুস্তকের কল্যাণে খবরটি ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে, যেমন ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে থিয়েটার দেখতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের উক্ত সাহেবকে চটি ছুড়ে মারা।

রামমোহনের সমাধিমন্দির নির্মাণ, এবং ঐ মন্দিরগাত্রে খোদিত ফলকটির সঙ্গে প্রিন্স দ্বারকানাথের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করাতে ডঃ মজুমদার একটু বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর মতে দুজন মেম সাহেব যখন লিখেছেন এবং ভারতে প্রচলিত "ট্রাডিসন" যখন তা সমর্থন করে তখন বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না কেবলমাত্র সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় তার উল্লেখ নেই বলে। কিন্তু আমি পূর্বেই দেখিয়েছি যে দ্বারকানাথ দেশে ফেরার পর সংবাদ পত্রে সংবাদ বের হয়েছিল যে দ্বারকানাথ জনসাধারণের কোন কাজ করে দেশে ফেরেন নি। তাছাড়া মেম সাহেবরা বল্লেই তা মানতে হবে কেন? পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রাজার দেহাবশেষ সরান, নতুন স্থানে প্রোথিত করা এবং সমাধি মন্দিরটি নির্মাণ করা সবই হয়েছে দ্বারকানাথের অনুপস্থিতিতে। ডঃ মজুমদার এটা মানতে চাইছেন না কেন? তিনি যুক্তি হিসেবে দ্বারকানাথের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের একটি "ভাষণ" এর উল্লেখ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারমর্ম ডঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

এর সাহায্যেই ডঃ মজুমদার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রামমোহনের দেহাবশেষ প্রিন্স দ্বারকানাথ অন্যত্র নিয়ে গিয়ে প্রোথিত করেছেন এবং সমাধিমন্দিরটি তিনিই নির্মাণ করিয়েছেন। ডঃ মজুমদার আরো প্রমাণ

করতে চেয়েছেন যে ১৮৬৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ যখন তাঁর ছাত্রজীবনে সমাধি-মন্দিরটি দেখতে যান তখনও সেখানে ঐ বড় লিপিটি ছিল। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় স্মৃতি থেকে সমাধিলিপিটি উদ্ধৃত করেন। এ সব উক্তি একজন ছাত্র করলে কোন প্রতিবাদ করতাম না, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক লিখেছেন বলেই একটু বিস্তারিত সমালোচনা করতে হচ্ছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে (যেদিন সিটি কলেজ হলে সত্যেন্দ্রনাথ তথাকথিত ভাষণটি দিয়েছিলেন) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় ছিলেন? সত্যেন্দ্রনাথের চাকুরীর নথীপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগস্ট পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ একটানা শোলাপুর—বিজাপুরের জেলা-জজ এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কোন ছুটি নেন নি। তাহলে তিনি সোলাপুর থেকে কলকাতায় এসে বক্তৃতাটি দিলেন কি করে? মুদ্রিত বক্তৃতাটি পাঠ করলেই দেখা যাবে, এটা বক্তৃতা নয়, একটি প্রবন্ধ। সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিক্ষেত্রেই নিজেকে "present writer" বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি লিখিত ভাষণ পাঠিয়েছিলেন, তিনি মিটিংএ উপস্থিত হতে পারেন নি। এই প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ আসলে কি লিখেছেন পাঠকদের অবগতির জন্যে এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

"In 1843, Dwarakanath Tagore, the grand father of the present writer, visited Stapleton Grove where lay the remains of his friend. It was considered desirable that the coffin should be removed to the beautiful cemetery of Arno's Vale near Bristol and Dwarakanath Tagore desired to pay this mark of respect to the Raja's memory. This was suitably accomplished on the 29th May 1843 and a handsome monument was erected in the spring of the following year. I give below the inscriptions on it ·" (Page 14-15)

এর পর সমাধিলিপি থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি আছে। খানিকটা পরে তিনি আবার লিখেছেন—

"The tomb is well-worth a visit. I myself remember to have made a pilgrimage to the spot in 1863 during my Sojourn in England as a student." (page 15)

এই অংশটি পাঠ করলেই দেখা যাবে সত্যেন্দ্রনাথ মিস্ কার্পেণ্টারের বই থেকে তাঁর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। শুধু তাই নয় কার্পেণ্টারের কয়েকটি লাইনও বিনা স্বীকৃতিতেই তিনি তাঁর প্রবন্ধে গ্রহণ করেছেন। ১৮৭২ সালে যে সমাধি লিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে ১৮৮৯ সালে রচিত কোন প্রবন্ধে সেটি থেকে অংশবিশেষ কি উদ্ধৃত করা যায় না? সত্যেন্দ্রনাথ যে সমাধিলিপিটি দেখেছেন তাও তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া তাঁর এ 'সংকলনে' (compilation) একটি মারাত্মক ভুলও আছে। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ স্টেপলটন্ গ্রোভে গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতেই ছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। কারণ তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কোন তথ্য পরিবেশন করেন নি। অন্যান্য ভারতীয়দের মত তিনিও মিস্ কার্পেণ্টারের রচনা বিশ্বাস করেছেন।

এবারে সমাধি লিপিটির কথা আলোচনা করা যাক। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মিস্ কার্পেণ্টার তাঁর বই লেখেন। এতে সমাধি ফলকের কোন উল্লেখ নেই। কার্পেণ্টার রাজার শেষের কয়টি দিনের উপর তাঁর বই লিখেছেন, তাঁর মৃত্যু, প্রোথিত করা, দেহাবশেষ অন্যত্র প্রোথিত করা এবং মন্দিরটি নির্মাণ করার কথাও বলেছেন। কিন্তু সমাধিলিপিটি সম্বন্ধে তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। এ থেকে মনে হয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মন্দির গাত্রে জন্মসন সম্বলিত কোন লিপি ছিল না। থাকলে তা খৃষ্টান লেখিকার দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না।

কিন্তু এর প্রায় ২০ বছর পর মিস কলেট যখন তাঁর বই লেখেন তিনি কিন্তু সমাধি লিপিটির কথা উল্লেখ করতে একটুও ভোলেন নি। তিনি লিখেছেন—

> "…It was in 1872—nearly 40 years after Rammohan Ray passed out of the region of sensuous existence—that this inscription was added."

সুতরাং কলেটের বক্তব্য হ'ল রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় ৪০ বছর পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঐ লিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়। সুতরাং এটি পরবর্তীকালের (অর্থাৎ সমাধি মন্দির নির্মাণের) সংযোজন। আর এ লিপি যে প্রিন্স দ্বারকানাথ উৎকীর্ণ করেন নি তার প্রমাণ সমাধি লিপিতেই আছে। এতে বলা হয়েছে

"This TABLET
RECORDS THE SORROW AND PRIDE WITH
WHICH HIS MEMORY
IS CHERISHED BY HIS DESCENDENTS."[২৮]

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহ যে সমাধিলিপিটি দ্বারকানাথের নয়। ডঃ মজুমদারও আমার এ যুক্তি গ্রহণ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল রাজার এই বংশধরগণ কারা এবং এতদিন পরেই বা তারা এদিকে নজর দিলেন কেন? এসম্বন্ধে মেরি কার্পেণ্টারের গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে[২৯] আছে—

"In 1872 the tomb was put into beautiful repairs at the expense of the Executors of the Rajah and the following inscription has been carved on it at their desire."

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৮৭২ সালে মন্দিরটি মেরামত করা হয় রাজার সম্পত্তির কার্যদর্শীদের খরচে এবং তাদের ইচ্ছেতেই ঐ লিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়। কিন্তু রাজার সম্পত্তির কার্যদর্শী এরা কারা? রাজার সম্পত্তি দু ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। রাধাপ্রসাদের পুত্র ছিল না বলে তাঁর অংশ চট্টোপাধ্যায় পরিবার পান। যতদূর জানি রমাপ্রসাদ রায়ের উত্তরাধিকারীগণ ১৭৭৪ সাল বিশ্বাস করতেন না। চট্টোপাধ্যায়দের মধ্যে ললিতবাবু সম্ভবত ১৭৭২ এর সমর্থক ছিলেন, ৺নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৭৭৪ সমর্থন করেছেন। কিশোরী বাবুর মতামত আমরা জানি না। যতদূর মনে হয় এই চট্টোপাধ্যায়গণ তাঁদেরই অর্থে সমাধি মন্দিরের সংস্কার করান এবং ঐ ফলকটি লাগাবার ব্যবস্থা করেন। কারণ সমাধিক্ষেত্রের যে সামান্য কাগজপত্রের সন্ধান পেয়েছি তাতে চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে যোগাযোগ সুস্পষ্ট। সমাধিক্ষেত্রের দর্শক বইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে একমাত্র বাঙ্গালী রাধিকাপ্রসাদ ঘোষের নাম পাই ২২. ৬. ১৮৭২ তারিখে। ইনি কে? ইনি কি কাজকর্ম দেখাশুনার জন্যে বিলেতে প্রেরিত হয়েছিলেন? কেশবচন্দ্র সেন ভারতে ফেরার পরই সমাধিমন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। এ থেকে আমার মনে হয় তিনি দেশে ফিরে এসে সমাধিমন্দিরটির তৎকালীন করুণ অবস্থার কথা জানান। তারই ফলে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়।

২৮। এই লিপিটির প্রতি লেখক ডঃ মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধটিতে।

২৯। Miss Carpenters, book, Calcutta 1915, Appendix 'F' Page 227.

এবার সমাধি লিপিটির গুরুত্ব আলোচনা করা যাক। আমার মতে এটি পরবর্তীকালের সংযোজন এবং এর বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত হ'ল সমাধিমন্দিরটিতে একটি ক্ষুদ্র লিপি ছিল এতে শুধু রাজার নাম, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ বা সাল লেখা ছিল। সেই জন্য কার্পেন্টার সেটির উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এ গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। একজন খৃষ্টান মহিলা এক জনের সমাধি মন্দিরের কথা লিখছেন—আর তার সমাধি লিপিটির উল্লেখ করবেন না, এ হয় না। রমেশবাবু আর একটি যুক্তি দেখিয়েছেন। মিস্ কলেটের "It was in 1872 that this inscription was added"-এর "this"-এর অর্থ করেছেন আগে একটি লিপি ছিল এবং ১৮৭২ সালে নতুন একটি (যেটি তিনি তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন) উৎকীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু 'this' শব্দের অর্থ স্পষ্টতই "following". তাছাড়া কলেট খুব খুঁতখুঁতে লেখিকা ছিলেন। আগে জন্মসন সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র লিপি থাকলে তা তিনি স্পষ্ট করেই উল্লেখ করতেন। তাই ডঃ মজুমদারের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ-যোগ্য নয়। সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়[৩০] একটি নতুন খবর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"দ্বারকানাথ ঠাকুর সমাধি নির্মাণ করবার পর থেকে ১৮৭২ সালে নতুন লিপি না খোদাই করা পর্যন্ত সমাধির উপরে শুধু এই কটি কথা ছিল: Rajah Ram Mohan Roy died 27 September 1833. এই স্মৃতিলিপিতে ১৭৭৪ বা অন্য কোনো সালকেই জন্মাব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি।" উপযুক্ত প্রমাণ থাকলে এটি গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। কিন্তু চিত্তবাবু এ তথ্য কোথায় পেয়েছেন তা জানান নি।[৩১]

রমেশবাবু আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ডঃ পি. কে. সেনের[৩২] গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় স্টেপলস্টন গ্রোভের যে স্থানে প্রথমে রামমোহনকে সমাহিত করা হয় তার একটি আলোক চিত্র ছাপা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে একটি পাথরে অস্পষ্ট কতকগুলি লাইন খোদিত আছে। ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত হ'ল নিঃসন্দেহে সেটি হ'ল রামমোহনের সমাধির আদি স্মৃতিফলক। এখানে তাঁর অন্তত জন্ম ও মৃত্যু তারিখ লেখা আছে যদিও পড়া যায় না। এই লিপির পাঠ উদ্ধার না করেই ডঃ মজুমদারের মত একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক লিখছেন[৩৩]—

৩০। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মাব্দ, ইতিহাস, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ৬৯।

৩১। বর্তমান লেখককে তিনি বলেছেন বিলেত থেকে এ তথ্য পেয়েছেন। আদি ফলকটি British Museum-এ আছে।

৩২। P. K. Sen: Biography of a New Faith, vol I, P. 49.

৩৩। Majumdar: On Rammohan Roy, pp. 12-18.

"The photograph of the cemetery stone at Stapleton Grove makes it almost certain that a short tablet recording the dates of birth and death was already existent before the coffin was removed to Arno's Vale."

তারপর Arno's vale-এর লিপি সম্বন্ধে বলছেন—

"If we accept this view the tablet on the monument does not lose its value as an evidence of the date of birth, for it is almost certain that the date would have taken from the earlier and discarded tablet."

ডঃ মজুমদারের তথাকথিত আদি স্মৃতিফলকের পাঠ উদ্ধার না করে কি ভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সেখানে ১৭৭৪ই লেখা ছিল? রামমোহনের মৃত্যুর সময় তাঁর সর্বাধিক গৃহীত জন্মসন ছিল ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ। কে বলতে পারে যে সেখানে এই ১৭৮০ উৎকীর্ণ করা ছিল না? তাছাড়া, চিত্তবাবুর সংবাদটি সত্য হলে বলতে হবে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দেও রাজার জন্মসন জানা ছিল না কারো; আর ১৮৩৩ সালে তাঁর জন্মসন দিয়ে স্মৃতিফলক বসান হ'ল। এ হ'তেই পারে না।

রামমোহনের আদি সমাধিক্ষেত্রে যে কোন ফলক ছিল না এবার তার প্রমাণ দিচ্ছি। ডঃ পি. কে. সেন লিখেছেন—

"When the present author visited Stapleton Grove last in 1900, it was the Rectory of Stapleton village. The spot under the elms where the Rajas remains had originally been interred was still marked by a pile of rude granite stones which the Rector described to him as the burial place of "Some Indian Prince or celebrity."

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ডঃ সেন সেখানে কোন লিপি দেখতে পান নি, থাকলে তাঁকে রেক্টরকে কার সমাধি এ প্রশ্ন করতে হ'ত না। আর লিপিটি পাঠের অযোগ্য হলে তিনি নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতেন। সেন সাহেব কখনও বলেন নি যে ছবিটি ১৯০০ সালের তোলা। ছবিটি দেখলেই দেখা যাবে ঐটি অতি আধুনিক কালের এবং বাড়ীগুলি সংস্কার করে এমন করা হয়েছে যে নতুন বলে মনে হচ্ছে। স্টেপলটন গ্রোভের একটি প্রাচীন ছবি "The Father of Modern India—Commemoration Volume" এর দ্বিতীয়

পার্টের ১০০ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। সেন সাহেবের গ্রন্থে মুদ্রিত ছবিটি করে তোলা এটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। তা হলে পাথরের গায়ে ঐ খোদাই করা লাইনগুলি এল কি করে? ১৯৩৩ সালে রাজার মৃত্যু শতবার্ষিকীর কিছুপূর্বে এই খোদিত পাথরটি বসান হয়েছে—যাতে দর্শকরা জানতে পারে কোথায় রাজাকে প্রথম সমাহিত করা হয়েছিল। এর প্রমাণও আছে। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় হাই কমিশনের শিক্ষাসচিব শ্রীপি. কে. দত্তের নেতৃত্বে একদল লোক ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃস্টলে তীর্থ করতে গিয়েছিল। ঐ স্থানের কথা উল্লেখ করে মি. দত্ত তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন—

"We visited the room where the Raja lived and died, and the site in the grounds of the house where the Raja was first buried under elm trees on 18th October 1833. A stone tablet has recently been erected at this place to mark the site of the interment."[৩৪]

আশা করি এর পর আর কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

তারপর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৮৯ সালের বক্তৃতাটির ভাব উদ্ধৃত করে ডঃ মজুমদার বলতে চাইছেন যে সমাধি মন্দিরের লিপিটি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই (অন্তত ১৮৬৩) উৎকীর্ণ হয়েছিল। ডঃ মজুমদার তাঁর নিজের বাক্যজালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। ঐ লিপিটি সত্যেন ঠাকুর দেখতে পেলেন বড়, আর ক্ষুদ্র বলে মিস কার্পেন্টার উদ্ধৃত করলেন না। এ কি যুক্তি? আর সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সমাধিলিপিটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছিলেন ব'লে ধরে নিতে হবে যে তিনি সেটি ১৮৬৩ সালেই দেখেছিলেন? এতেও কোন যুক্তি নেই। ১৮৮৯ সালের বহু পূর্বেই লিপিটি অনেকেরই বাড়ীতে এসে গেছে।

সবশেষে, ডঃ মজুমদার বলেছেন যে যদি এসব যুক্তি গ্রহণযোগ্য নাও হয়, তবে এটা অবশ্যই মানতে হবে যে অন্তত ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজার পরিবারের জানা ছিল যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজার জন্ম হয়েছিল। রাজার পরিবার বলতে রমাপ্রসাদ রায়ের পরিবারকে বোঝায়, এইটেই রায় পরিবার। এই পরিবারের ট্রাডিসন অন্য, সে কথা পরে বলব। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কন্যার পুত্রদের অন্তত একজন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ মেনে নিয়েছেন। এদের পক্ষ থেকেই সমাধি ফলকটি উৎকীর্ণ হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা ত রাজার পরিবার নন। তাছাড়া, এদের কারা কারা এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন

৩৪। The Father of Modern India, Part I, page 186.

তাদেরও নাম পাওয়া যায় না। তাছাড়া রাজার এত দূরের বংশধরদের ট্রাডিসনের ঐতিহাসিক মূল্যই বা কতটুকু? আর আমি এটাকে ট্রাডিসনও বলতে চাই না। কারণ এঁদের কাছে কোন প্রমাণ থাকলে ১৭৭৪ সাল ছাড়া লিপিটিতে আরো কিছু উৎকীর্ণ থাকত। আসলে এ সনটা তখন দেশে খুব চলছিল। অর্থাৎ ১৭৮০র সমর্থকের চাইতে ১৭৭৪র সমর্থকের সংখ্যা ছিল বেশি। ফলে যাঁরা লিপিটি উৎকীর্ণ করেছেন তাঁরা অধিক প্রচলিত সনটিই গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁদের কাছে কোন প্রমাণ ছিল না। এমত অবস্থায় ঐ স্মৃতিলিপিটির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই।[৩৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এ সব তথাকথিত সমসাময়িক সাক্ষ্যের দ্বারা সমস্যার কোন সমাধান হবে না। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সমর্থকগণ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সমর্থক হিসেবে পরবর্তীকালের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম করেছেন। এঁরা হলেন ডঃ এস, কে, দে, ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ৺যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি। এদের মধ্যে একমাত্র ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাম্প্রতিককালে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার রাজা রামমোহন রায়ের জন্মসন নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাই সকলের মতামত এখানে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

রামমোহনের জন্মসন নিয়ে প্রথম সার্থক গবেষণা করেন রায়বংশের বংশধর মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি। এর পর মিস্ কলেটের নাম করতে হয়। কলেটেরই পরিত্যক্ত একটি তথ্যের উপর ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ব্রজেনবাবু লিখেছেন[৩৬]—

> "The only contemporary data about Rammohun's age we have at present the two statements of Mr. Digby that when he met Rammohun first, the latter was 27 and that in 1817 he was about 43. We shall see below that there is reason to think that Digby first met Rammohun in 1801. This as well as the other statement would give 1774 as the year of Rammohun's Birth. I am inclined to accept this provisionally, though it would not be safe to dogmatise about it."

৩৫। গত ৩০.১১.১৯৭১ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে শ্রীশচীপতি রায় বলেছেন তাঁর মতে রাজার জন্ম হয়েছিল ১১৭৯ বঙ্গাব্দে বা ইংরেজী ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি এ পক্ষে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন তাতে রাজার জন্মসনের কোন উল্লেখ নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্রজেনবাবু পাকাপাকিভাবে ১৭৭৪ সাল গ্রহণ করেন নি। এবং এর পক্ষে গোঁড়ামির প্রশ্রয় না দেবার জন্যে তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন। তিনি তাঁর বাংলা গ্রন্থেও এ সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান করতে পারেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আজকাল ১৭৭৪এর সপক্ষে যে সব তথ্য উল্লেখ করা হয়, ব্রজেনবাবুর হাতে এর সবগুলিই ছিল। বরং ব্রজেনবাবুর মৃত্যুর পর ১৭৭২ সালের পক্ষে নির্ভরযোগ্য অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ব্রজেনবাবু ১৭৭৪ এর পক্ষে একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসেবে ডিগবীর মন্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ডিগবীর ৩০,১২,১৮০৯ তারিখের পত্রটি (যা তাঁর নিজেরই আবিষ্কার,) রামমোহনের জন্মসন বিচারের সময় ব্যবহার করেন নি ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ ডিগবীর পরস্পর বিরোধী মন্তব্য দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করবার মত তথ্য তাঁর হাতে ছিল না, আজও নেই কারো কাছে।

এবার ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা। রামমোহনের জন্মসন সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের মতের কোন স্থিরতা নেই। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি অল্প দিন পর পরই তাঁর মত পরিবর্তন করছেন। যতদূর জানা গেছে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতের এই প্রবীণ ঐতিহাসিক ১৭৭২ সনকেই সমর্থন করেছেন। ১৯৬২ সালে[৩৭] প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তিনি বলেছেন—"He was born about 1772"—এর পর তাঁর সম্পাদনায় ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত ইতিহাসে[৩৮] তিনি বলেছেন—"He was born, probably, in 1774" এখানে প্রমাণ হিসেবে তিনি রামমোহনের সমাধিলিপিটির উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে অবশ্য তিনি ডিগবী ও রামমোহনের প্রথম পরিচয় ১৮০৫ এ হয়েছিল বলে অন্যের মত গ্রহণ করেছেন। এরপর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত একটি সরকারী কমিটির অধিবেশনে তিনি বলেছেন যে ১৭৭৪ সালেই রাজার জন্ম হয়। তিনি আরো বলেছেন যে রামমোহন ও ডিগবীর প্রথম পরিচয়ের উপর অত গুরুত্ব আরোপ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই তাঁর "বাংলা দেশের ইতিহাস—আধুনিক যুগ" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকাটি তিনি ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে লিখেছেন। গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মধর্মের কথা বলতে গিয়ে তিনি রাজার

৩৬। Calcutta Review December 31, 1938. p. p. 234—235

৩৭। Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century.

৩৮। The History and Culture of the Indian People—British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II.

আবির্ভাব কাল ১৭৭২—১৮৩৩ গ্রহণ করেছেন। ভূমিকাটি লেখার মাত্র ১২ দিন পূর্বে তিনি সরকারী কমিটিতে ১৭৭৪ সাল বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। অথচ ভূমিকায় তিনি এই মত পরিবর্তনের কোন উল্লেখ করলেন না। আমরা তাঁর মত কোনটিকে ধরব? ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কমিটির—অর্থাৎ সরকারের মত ঘোষিত হবার পর তিনি এর বিরোধিতা করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। এ বিষয়ে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শতরূপার প্রবন্ধে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৯] লিখেছেন—"প্রায় দশ বছর আগে আমার "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ রচনা কালে এই বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করেছিলাম। আমি তখন যে সমস্ত তথ্য পেয়েছিলাম, এখন দেখছি অনেকেই সেই সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। এতে আমি আনন্দিত। সমস্ত তথ্য প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্য অনুমানের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ সালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উক্ত গ্রন্থে রামমোহনের জন্মসন নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। তবে তাঁর গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—"রামমোহন ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃঃ) বেয়াল্লিস বৎসর বয়সে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন।" এই মত অনুযায়ী অসিতবাবুকে কিন্তু ১৭৭২ এর সমর্থক বলতে হবে।

॥ ২ ॥

এবার আর এক ধরণের মতবাদ আলোচনা করা হবে। এই মতবাদটিকে সবাই উপেক্ষা করেছেন।

ইংরেজী ১৮৪২ সালে অক্ষয় কুমার দত্ত লেখেন[৪০]—"রামকান্ত রায় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি রাধানগরে আসিয়া বসতি করিলেন। এই স্থানে আমাদিগের দেশোজ্জ্বলকারী রামমোহন রায় বাংলা ১১৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন" অর্থাৎ তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করেন। এর তিন বছর পরে ঐ একই সভার আর একজন সদস্য কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখলেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। অক্ষয়কুমার প্রচলিত মত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কিশোরীচাঁদ কোন কারণ দেখালেন না।

৩৯। শতরূপা, পৃঃ ২৬৯

৪০। 'মৃত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত'—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৬৪ শকের ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু লিখলেন[৩১]—"হুগলী জেলার অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে ঐ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।" এই সর্বপ্রথম একটি নতুন মত পাওয়া গেল। ১৬৯৫ শক ইংরেজী ১৭৭৩-৭৪ সাল ১৭৭৩ বা ১৭৭৪ দুইই হ'তে পারে। এবং মাস না জানা থাকলে এ সালের কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু এ শক সাল কোথায় পেলেন তা কখনও জানান নি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দই সমর্থন করে তা পূর্বেই বলেছি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঐতিহাসিক ডঃ পি. কে. সেনের রচনাতেও এ তত্ত্বের সমর্থন মেলে। কেশবচন্দ্র সেন সরাসরি কোন সাল উল্লেখের মধ্যে গেলেন না। তিনি লিখলেন Rammmohan "died in Aswin 1755 (1833) in sixtieth year of his age". স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কেশব বাবু সাদারল্যাণ্ডের মত গ্রহণ করেছেন। জন্মমাস জানা না থাকলে রামমোহনের জীবনের ষষ্ঠিতম বর্ষ ঠিক ভাবে হিসেব করা সম্ভব নয়। ব্রাহ্ম সংবাদপত্র ইণ্ডিয়ান মীরর সব সময়েই লিখেছেন "about 1774" এ থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যেতে পারে যে পুরাতন ব্রাহ্ম নেতাদের কারোই রাজার জন্মসন সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রাজার নতুন সমাধিতে জন্মসন সম্বলিত কোন ফলক ছিল না বলে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। ছোট একটি ফলকে কার সমাধি নির্দেশ করবার জন্যে "Raja Ram Mohun Roy died 27 September 1833" এই কথা কটি লেখা ছিল ১৮৭২ সাল পর্যন্ত। প্রিন্স দ্বারকানাথের জীবদ্দশায় নতুন সমাধি মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। আর সে সমাধিতে এ ধরণের ফলক থাকার অর্থ প্রিন্স দ্বারকানাথ অথবা কারোই রাজার জন্মসন জানা ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালের ব্রাহ্ম নেতাদের অথবা যাঁরা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফলকটি লাগিয়েছেন তাঁদের মতের কোন দাম নেই।

ঐ ফলকটিতে লেখা হ'ল—"he was born in Radhanagar, in Bengal in 1774." কিন্তু দেশে ও বিদেশে অনেকেই এ সনটি গ্রহণ করলেন না। যেমন ১৮৭৪ খৃঃ একটি জীবনীকোষে লেখা হ'ল "Rammohan Ray a Hindu Reformer and Linguist was born in Bengal

---

৩১। ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২৪ পৌষ ১৭৮২ শক। **Indian Mirror 1865, Raja Rammohan Ray in "The Brahma Samaj-Discourses and writings, Part I, Page 17.**

in 1776"[৪২]. ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস্ ভারতে বসে রাজার জন্মসন পেলেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাস। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানবিদ্ W. W. Hunter লিখলেন রাজার ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল। সুদূর ফরাসী দেশে বসে বার্থ সাহেব ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বললেন রামমোহনের জন্ম হয়েছিল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। ঐ একই বছর পাদরী ম্যাক্‌ডোনাল্ড বললেন রাজার জন্ম হয়েছিল ১৭৮০ খৃঃ। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান ব্রাহ্ম (নববিধান) ডাল সাহেব বললেন যে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি ১৭৮০, ১৭৭৪ এবং ১৬৯৫ শকের মধ্যেই তাঁর পছন্দ আবদ্ধ রাখলেন। ভুলেও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কথা উচ্চারণ করলেন না। আমরা জানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এ গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মনেতাদের মতামত অগ্রাহ্য করা সম্ভব হ'ল না। তাই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। ব্রাহ্ম নেতাদের মত ১৬৯৫ শক আর স্মৃতিসৌধের তারিখ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি এই দুটি মতের মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করলেন এক অভিনব পন্থায়। তিনি লিখলেন—"মহাত্মা রামমোহন রায়, হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকের শেষভাগে (১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ) জন্মগ্রহন করেন।" এই মত অনুযায়ী রামমোহনের জন্ম হতে হলে তাঁকে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের পৌষ থেকে চৈত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এত ভাবার চাতুরী। জন্মমাস না জেনে তিনি কি করে বললেন যে ১৬৯৫ শকের শেষভাগে রাজার জন্ম হয়। আর জন্মমাস জানা না গেলে কোন নিরপেক্ষ আধুনিক ঐতিহাসিক এ মত গ্রহণ করবেন না। আমার নিজের ধারণা নগেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ বিশ্বাস করতেন, কিন্তু বিশেষ কারণে তাঁর পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব হয় নি। কারণ তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনাতে তাঁর অন্তরের সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তিনি লিখেছেন—"রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে) বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন।" ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাজার বয়স ৪২ বছর হলে তাঁর জন্মসন আমরা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দই পাই। ১৮৮১র পর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম লেখকই নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করেছেন।

৪২। Universal Dictionary of Biography and Mythology, vol II 1874, page 1865.

॥ ৩ ॥

অনেকেরই ধারণা মিস্ কলেটই সর্বপ্রথম ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কথা বলেন। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। মিস্ কলেটের রচনা প্রকাশিত হবার বহু পূর্বেই ১৭৭২ এর কথা শোনা গেছে। ঠিক কবে এর উৎপত্তি বলা শক্ত। শ্রীগোরা মিত্রের মতে ১৮৪৩ সালে সর্বপ্রথম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বলেন যে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে রামমোহনের জন্ম হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঐতিহাসিক ডঃ সেনও তাঁকে ১৭৭২ সালের সমর্থক বলেছেন। মহর্ষির পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও এই মতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।[৪৩]

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এনসাইকোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা গ্রন্থে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এ অংশের রচয়িতার নাম W. W. Hunter.

> "BRAHMA SAMAJ, the new Theistic Church in India owes its origin to Raja Rammohun Roy, one of the leading man whom India has produced in later time. Rammohun Roy was born in the District of Burdwan in 1772"—W. W. H. (Vol. IV Bok-Can), 1878, Ninth edition, page—200).

হাণ্টার সাহেব একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের অধিকর্তা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি শিক্ষা কমিশনের সভাপতিও ছিলেন। তিনি অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থও লিখে গেছেন। রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। একদা কেশবচন্দ্র সেনের ইংরেজী জীবনী রচনার ভারও তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিল। তাছাড়া ভারত সরকারের অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকায় বহু সরকারী দলিলপত্র তিনি দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর সাক্ষ্য অতি মূল্যবান। কিন্তু তিনি কোথায় এ সংবাদটি পেয়েছিলেন তা জানাননি। তিনি জন্ম মাসটিরও উল্লেখ করেননি। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ মনিয়র উইলিয়ম্ কলকাতায় আসেন। এখানে তিনি রামমোহন ও ভারতীয় একেশ্বরবাদী আন্দোলন নিয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তিনি এই বিষয়ে লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছেন[৪৪]—

৪৩। জন্মভূমি ১৩০২ সাল দ্রষ্টব্য।

৪৪। **Journal of the Royal Asiatic Society 1881, Article I, Page 4.**

"What little is known of his early history is soon told. He was born in May, 1772 at a village called Radhanagar in the district of Murshidabad"

এই সর্বপ্রথম আমরা মাস সম্বলিত রাজার জন্মসন পেলাম। উৎস হিসেবে তিনি বলেছেন যে তাঁর বক্তৃতার উপকরণ ভারতেই সংগৃহীত হয়েছিল। তবে তাঁর তথ্যে একটি ভুল আছে। তিনি রাধানগরকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বলেছেন। এ থেকে মনে হয় প্রচলিত কোন উৎস থেকে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেন নি। নানা লোকজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। মনিয়র উইলিয়মস্-এর এ তথ্যের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কেউ প্রতিবাদ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এমন কি ১৭৭৪ সালের সমর্থক মিস কলেটও প্রতিবাদ করতে সাহস পেলেন না। বরং মনিয়র উইলিয়মসের এই তথ্য তাঁকে রাজার জন্মসন নিয়ে আরো অনুসন্ধান করবার অনুপ্রেরণা যোগায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী লেখক এ. বার্থ[৪৫] *Encyclopediedes Sciences Religieuses*-এ ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি রাজার জন্মসন ১৭৭২ বলে উল্লেখ করেন। ঐ প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ "The Religions of India" ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেও রাজার জন্মসন ১৭৭২ই দেখান হয়েছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান ব্রাহ্ম মহাত্মা ডালের চিঠিটি প্রকাশিত হয়।[৪৬]

"THE YEAR AND THE MONTH IN WHICH RAMMOHUN ROY WAS BORN

To the Editor of the INDIAN MIRROR

Sir,

There need be no doubt whatever as to the year and the month in which Rammohun Roy was born. His son Roma Prasad Roy, Chief Pleader of the Supreme Court, made the matter clear to a circle of Visitors and clients, in 1858 at his residence, the well-known house of his father in Calcutta. Kissorychand Mitter was present and Dr. Rajendra

৪৫। এ সংবাদটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস।

৪৬। **Indian Mirror, Vol. XX No. 15, Sunday Edition, dated 18th January, 1880, page 4.**

Lala Mittra ; and I was one of the listeners, I put the words on record at the time and here they are—

"My father was born at Radhanagar near Krishnagar in the month of May 1772 or according to the Bengali era, in the month of Jaista 1179".

I asked for the day and Romaparshad replied—"that I cannot tell without consulting the horoscope, which at the distance of time, is not easy to be found."

After this, it need not be surmised that the Great Rammohun was born "in 1774" or in "1780."

We need not guess, since we have the highest authority for saying that Rammohun was born in May, 1772.

Yours etc.
—DALL."

এই চিঠিটি প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পূর্বে রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড লেখেন যে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মের প্রথম শতবর্ষ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হবে। এই উক্তির প্রতিবাদেই মহাত্মা ডাল এই চিঠিটি লেখেন। ১৮৭২, ১৮৭৩, ১৮৭৪ অথবা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজার প্রথম জন্ম শত বছর পালিত হয়নি! তাঁর জন্মদিনও কখনও পালিত হয় নি। এমন কি প্রকাশ্যভাবে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পালিত হয় নি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম টাউন হলে জনসাধারণ উদ্যোগে রামমোহনের মৃত্যুদিবস পালিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে বিশেষ করে বৃস্টলে রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হত।

১৭৭৪এর সমর্থকগণ মহাত্মা ডালের উক্তির প্রামাণিকতা ও রমাপ্রসাদ রায়ের উক্তির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। রমাপ্রসাদ রায় তখন সদর দেওয়ানী আদালতের সিনিয়র উকিল এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় জজ নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অকাল মৃত্যুর জন্যে আসনে বসতে পারেন নি। এরকম কৃতী পুত্র তাঁর বাবার জন্ম তারিখ নিয়ে ছেলেমানুষের মতো উক্তি করবেন এ বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া একসঙ্গে বাংলা ও ইংরেজী সাল ও মাস বলাতে তাঁর উক্তির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হচ্ছে। আর তিনি আন্দাজেও বলেন নি। বাবার একটা কুষ্ঠি আছে সে কথাও উল্লেখ তিনি করেন। তবে বলেন যে মে মাসের ঠিক কত তারিখে তাঁর জন্ম হয়েছিল তা কুষ্ঠি না দেখে তিনি বলতে পারবেন না। এ থেকেও রমাপ্রসাদ রায়ের উক্তির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

মহাত্মা ডালকে দেশ ভুলে গেছে। ডেভিড হেয়ারের পর কলকাতার লোক ডালের মত আর কোন বিদেশীকে এত ভাল বাসেনি। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার লোকেরাই তাঁকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ১৮৫৪ সালে তিনি এ দেশে আসেন। রামমোহন সম্বন্ধে প্রথম থেকেই তাঁর কৌতূহল ছিল। কলকাতা আসবার কিছুদিন পর থেকেই তিনি রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এর প্রমাণ আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম তালিকাভুক্ত হন। এ হেন লোক বিদেশী হলেও তথ্যের বিকৃতি ঘটাবেন কেন? এতে তাঁর কি স্বার্থ থাকতে পারে? তাছাড়া তাঁর এ পত্রের কোন প্রতিবাদও কেউ কোনদিন করেন নি। মহাত্মা ডাল তাঁর স্মৃতি থেকে রমাপ্রসাদ রায়ের উক্তিটি উদ্ধৃত করেন নি। সে সময়ে তিনি যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন (ডায়েরী বা অন্য কোথাও) সেখান থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ডাল কোন রকম অসত্য আচরণ করলে কেশবচন্দ্র সেন বা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁকে ছেড়ে দিতেন না। তাছাড়া, ডাল্ত স্পষ্টই বলেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সামনেই কথা হয়েছে। ১৭৭৪ এর সমর্থকদের কেউই ডালের কথার প্রতিবাদ করল না।[৪৭] এথেকেই প্রমাণিত হয় যে সমাধিমন্দিরের তারিখের সমর্থকরা কখনই রাজার জন্মসন সম্বন্ধে সন্দেহহীন ছিলেন না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজার যে বংশধরেরা রাজার সমাধিমন্দিরের লিপিটি লাগিয়েছিলেন তাঁরাও তখন সবাই বেঁচে ছিলেন। তারাই বা নীরব ছিলেন কেন? সুতরাং ডালের মাধ্যমে রমাপ্রসাদ রায়ের যে উক্তি মিররে প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে খাঁটি। তাই আমরা বলতে পারি "Ramaprosad Roy had positive knowledge about the birth year and month of his father; because his knowledge was based on the horoscope."

ডালের উক্তি সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার বলেছেন যে "Normally speaking, in the absence of anything to the contrary one would be justified in accepting the view expressed by Rev Dall." কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আরো কতগুলি বিষয় ভাবা দরকার।

৪৭। এ বিষয়ে সমসামযিক ইংরেজী ও বাংলা প্রায় ২০.২২ খানা পত্র পত্রিকা খুঁজেছি—কোন প্রতিবাদ কোথাও নেই।

এর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হ'ল রমাপ্রসাদ আসলে কি বলেছিলেন তা জানতে হচ্ছে বাইশ বছর পরে একজন বিদেশীর মাধ্যমে। আর এ দীর্ঘ বাইশ বছরই বা তিনি কেন নীরব ছিলেন তা একটা রহস্য। এবং রমেশবাবু রায় দিয়েছেন[৪৮]

> "In any case Dall's statement should be treated as a hearsay evidence and can not rank with the direct statements made by Digby and Carpenter."

রমেশবাবুর এসব প্রশ্নের জবাব তাঁর নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করেই সে সব চেপে গেছেন। সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করেছেন। কলকাতা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি ১৮৫৮ সালে রামমোহনের Precepts of Jesus প্রকাশ করে। ডাল সাহেব ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। তত্ত্বকৌমুদী থেকে[৪৯] জানতে পারা যায় যে ঐ পুস্তকটি মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় ডাল বহন করেছিলেন। তাঁর অনাথ আশ্রমের প্রতিটি বাসিন্দাকে তিনি বিনামূল্যে এই বই বিতরণ করতেন।

রামমোহনের গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকারের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে—

> "He was born···in the month of (Jastee, 1179 Bengali style) May AD 1772."

রমেশবাবু এ তথ্যটি না ছেপে ঐ ভূমিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় আশ্রয় নিলেন। এখানে বলা হয়েছে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪২ বছর হয়েছিল। এই হিসাবে তাঁর জন্মসন ১৭৭২ হয়। কিন্তু রমেশবাবু এটা আলোচনা না করে নীরব রইলেন কেন? আলোচনা করলেই তাঁকে ১৭৭২ খৃ গ্রহণ করতে হ'ত। ডালের বিরুদ্ধে তিনি যে সব অভিযোগ এনেছেন তা এর দ্বারাইত খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে, ১৮৫৮ সালেই ডাল তাঁর সমিতির দ্বারা সংবাদটি প্রচার করেছিলেন, তিনিও ২২ বছর মোটেই নীরব ছিলেন না। আর রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্রও নিশ্চয়ই এ বই দেখে থাকবেন। তাঁরা কেউত প্রতিবাদ করেননি, করলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি এটি পুনরায় প্রচার করতে সাহসী হতেন না।

৪৮। See Majumder, page 14.

৪৯। "মৃত মহাত্মা ডাল সাহেব"—তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৮ শক, ১ ভাদ্র পৃ ১০৫ [1886 AD].

চিত্তবাবু অবশ্য কতকগুলি ফ্যাকড়া তুলেছেন। এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথমত ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে ডাল যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তার তালিকায় রমাপ্রসাদ রায়ের নাম নেই। অথচ Precepts of Jesus ১৮৫৮ সালের যে মাসে ছাপতে যায়। তাহলে রমাপ্রসাদ রায়ের উক্তি বইটিতে এল কি করে? রামমোহনের জন্মসন মূল বইটিতে নেই, ছাপা হয়েছে ভূমিকায়। আর ভূমিকাটি ছাপা হয়েছে মূল বইটি ছাপা হবার পর, তার রোমান পৃষ্ঠাঙ্কই তা প্রমাণ করে। এটি লেখাও হয়েছে পরে। আর সম্পূর্ণ বইটি তো জুন মাসের মধ্যে ছেপে বাজারে বের হয় নি। তাই চিত্তবাবু অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডালের পক্ষে সংবাদটি ভূমিকায় ঢোকান কি খুব অসুবিধে? চিত্তবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি—১৮৭১ সালে ডাল একটি বক্তৃতায় বলেছেন "his pure beneficent and studious life of "more than 60 years" এ অভিযোগের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতে চাইনে। কারণ সন মাস দিন হিসেব করে কেউ বক্তৃতা করেন না। মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে "more than 60 years" ও more than 61 years"-এর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ মনে রাখতে হবে ১৮৭১ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখের ঐ বক্তৃতায় ডাল রামমোহনের জন্মসন নিয়ে আলোচনা করছিলেন না।

চিত্তবাবুর তৃতীয় আপত্তি হ'ল ডালের চিঠিটিতে প্রকাশ যে রমাপ্রসাদ রায় যখন তাঁর পিতার জন্ম মাস ও সাল বলেন তখন কিশোরীচাঁদ মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। "কিশোরীচাঁদ কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় (১৮৬৬) কার্পেন্টারের 'দি লাস্ট ডেইজ' সমালোচনা উপলক্ষ্যে ১৭৭৪ সালকে নতুন করে সমর্থন করেছেন। তিনি রমাপ্রসাদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করায় ডাল সাহেবের তথ্য কতদূর নির্ভরযোগ্য, সে বিষয়ে সংশয় জাগে। তাছাড়া, বাইশ বছর এ মূল্যবান তথ্যটি তিনি কেন জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন, তার কারণ বুঝা যায় না।" ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও এ ধরণের উক্তি করেছেন। এর উত্তরে বলা যায় যে তথ্যটি ডাল সাহেব ২২ বছর গোপন যে রাখেন নি তার প্রমাণত স্বয়ং চিত্তবাবুই দিয়েছেন। রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের প্রথম শতবর্ষ পূর্তির কথা ঘোষণা না করলে কেউ কিছুই জানতে পারতেন না। ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এর উক্তির প্রতিবাদেই ডাল সাহেব মিরারে ঐ পত্রটি প্রকাশ করেছিলেন। এবার

কিশোরীচাঁদ। প্রথমত কিশোরীচাঁদের রচনাটি রামমোহন রায়ের জীবনের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে, তাঁর জন্ম সন সম্বন্ধে নয়। তাই জন্মসন সম্বন্ধে কিশোরী-চাঁদের আলোচনার সুযোগ কোথায়? ঐ প্রবন্ধের কোথাও তিনি "১৭৭৪" কে পুনরায় সমর্থন করেন নি। তিনি যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি৫০—

"If relates very little of antecedents and gives but an imperfect position of his early life. In No VIII, Vol IV of the *Calcutta Review* the writer of this paper endeavoured to give an account of the parentage, education and labour of the great Hindu and he does, not, therefore, think it necessary to reproduce it here. We have perhaps no right to find fault with the authoress for skipping over the early part of his career, in as much as the task she proposed to herself namely, to decifer the last days of the Hindu reformer has been very fairly performed."

এ থেকে কি মনে হয় যে কিশোরীচাঁদ পুনরায় ১৭৭৪ সমর্থন করেছেন, না তাঁর পূর্ববর্তী লেখাটিকে 'casually refer' করেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন হ'ল কিশোরীচাঁদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধের মাঝখানে ২১ বছরের ব্যবধান। এবং এই সময়ের মধ্যে কিশোরীচাঁদের অনেক তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধেও কিশোরীচাঁদ সেগুলি সংশোধন করেন নি। আসলে কিশোরীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের অনেকেই তাঁদের রচনায় ভুল বের হলে তারা তা সংশোধন করতেন না। তারা একবার যা লিখতেন তাই চূড়ান্ত। এটা তাঁদের "ego" বলতে পারা যায়। সুতরাং এখন আর এসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলর ব্রিষ্টলে একটি বক্তৃতা দেন। এতে তিনি সমাধিলিপির উল্লেখ করে বলেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তিনি শ্রোতাদের এও জানান যে তিনি রামমোহনের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট শুনেছেন যে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

৫০। Calcutta Review, XLIV No 89 July 1866.

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকাতে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়[৫১]—

"Raja Rammohun Roy (or Ray), the founder of the BRAHMA SAMAJ or THEISTIC CHURCH OF INDIA was born at Radhanagar, Bengal in May 1772, of an ancient and honourable Brahman family."

এটা মিস্ ডবসন কলেটের লেখা। সম্পূর্ণ রচনাটি ব্রাহ্ম সংবাদপত্র Indian Messenger-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাত রামকিশোরের বংশধর মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এই সংবাদটি পাঠ করে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট মিস্ কলেটকে নিম্নলিখিত পত্রটি লেখেন—

"Sometime ago I read in the column of the INDIAN MESSENGER, a passage quoted from Britanica Encyclopaedia regarding the birth date of the Raja. As far as I remember it exactly tallies with the date 22nd May 1772, as given in your letter to me. I shall esteem it a great favour if you kindly inform me of the definite authority of the Rajah's date of birth."

উত্তরে মিস্ কলেট লেখেন—

"The date of The Rajah's birth is the 22nd May of 1772. The fact came to me from Babu P. B. Mukherjee of Rajshahi College, who had it from Babu Rabindra Nath Tagore, who had it from Babu Lalit Mohan Chatterjee, great grandson of the Raja."

মিস্ কলেটের চিঠি পেয়ে বিদ্যানিধি রাধাপ্রসাদ রায়ের কন্যা চন্দ্রজ্যোতি দেবীর পুত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন ব্যাপারটি জানার জন্যে। ললিতবাবু উত্তরে বলেন—

"I have heard from my grandfather the late Babu Radha Prashad Roy the first born of the celebrated Rammohun Roy that his father died in his 62nd year (sixty second) date and month unknown.

—Lalit Mohun Chatterjee".

ললিতবাবুর চিঠিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি পরিষ্কার জানালেন যে রাজার জন্মসন বা মাস এসব প্রভৃতি তিনি কিছুই জানেন না। তবে তিনি তাঁর

৫১। Encyclopaedia Britanica, Ninth Edition, vol XXI, Page 34 1886.

মাতামহ রাধাপ্রসাদ রায়ের কাছে শুনেছেন যে রামমোহন তাঁর ষিষষ্টিতম বর্ষে ইহলোক ত্যাগ করেন। পেছন থেকে হিসেব করলে আমরা ১৭৭২ সালেই রাজার জন্ম সন পাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে শুধু রমাপ্রসাদ রায়ই নয়, রামমোহনের অপর পুত্রও জানতেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতার জন্ম হয়েছিল। সুতরাং ফ্যামিলি ট্রাডিসন যদি ধরতেই হয় তবে রামমোহনের প্রথম অধস্তন পুরুষদের ট্রাডিসনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে পরিবারের লোকেরা সমাধিলিপিটি লাগিয়েছেন তাঁদেরই পরিবারের কর্তা ছিলেন ৺ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। দেখা যাচ্ছে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সমাধিলিপিটি লাগাবার পরেও এর ট্রাডিসন ১৭৭২ রয়ে গেছে। এইসব কারণে এবং পূর্বে আলোচিত কারণগুলির জন্য ঐ সমাধিলিপির উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে না। আসলে আন্দাজে ঐ সালটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, রমেশবাবু একে ফ্যামিলী ট্রাডিসন বলে জাতে তোলবার চেষ্টা করেছেন।*

ললিতমোহনের উক্তি অনুযায়ী হিসেব করলে জন্মমাস ও সাল হিসেবে মে ১৭৭২ পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এটুকু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অধ্যাপক ফণীভূষণ মুখার্জির কাছ থেকে বিষয়টি জানবার চেষ্টা না করে রামমোহনের কুষ্ঠীটি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু রমাপ্রসাদবাবুর পত্নী তাঁকে জানান যে কুষ্ঠিটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের রীতি অনুসারে জাতকের মৃত্যু হলে তার কুষ্ঠী জলে ফেলে দিতে হয়। যে সব পণ্ডিতদের কাছে ঐ কুষ্ঠির নকল থাকা সম্ভব তাদের কাছেও খোঁজ করে কিছু পাওয়া যায় নি।

মিস্ কলেট ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বই প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন—"Rammohun Roy was born in the village of Radhanagar near Krishnagar in the zillah of Hugli on the 22nd of May 1772." রাজার এই আবির্ভাব কাল তিনি কেন গ্রহণ করেছেন গ্রন্থের পাদটীকায় তা বলেছেন। মে ১৭৭২ তিনি নিয়েছেন রমাপ্রসাদ রায়ের উক্তি থেকে। আর ২২শে মে পেয়েছেন অধ্যাপক ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ-এর কাছ থেকে এ তথ্যটি যাচাই করে নেননি। এটা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিকের মত কাজ

* বিদ্যানিধির চিঠিপত্রের জন্য জন্মভূমি, পঞ্চম খণ্ড, ১৩০১-০২ নং ৮, শ্রাবণ ১৩০২, পৃঃ ৪৭১—৪৮১ দ্রষ্টব্য। মিস্ কলেটের বই প্রকাশের পাঁচ বছর পূর্বে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়।

হয় নি। কিন্তু বিষয়টিকে একেবারে উড়িয়ে দেবারও উপায় নেই। কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এর সঙ্গে জড়িত আছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অথবা ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন কলেটের বই প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বকবি হন নি। তিনি তখন একজন একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম কর্মী ও নেতা। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্ম আন্দোলনের একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া রামমোহনের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। যে কবি সারাজীবন সত্যের সাধনা করে গেছেন, তাঁর আদর্শ পুরুষ সম্বন্ধে একটি মিথ্যে খবর তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর তিনি সেটা নীরবে মেনে নিয়েছেন এ বিশ্বাস করা যায় না। এমনও হতে পারে যে কবি খবরটি পেয়েছিলেন তাঁর বন্ধু অধ্যক্ষ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ফনী বাবু ভুলে একে রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে যে তাঁর হিরোর জন্ম হয়েছিল কবি একথা সত্যিই জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন। ১৯৩৩ সালে তাঁরই সভাপতিত্বে গঠিত রামমোহন শতবার্ষিকী সমিতি ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছে যে ঐ তারিখেই রাজার জন্ম হয়েছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ সালই ত মেনে নিয়েছেন। জন্ম তারিখটি আমরা মানি আর নাই মানি, জন্ম মাস ও সাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ঐটুকুই ঐতিহাসিক বিচারে টেকে। বাংলা চরিতকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও শেষ পর্যন্ত এটুকু মেনে নেন।[৫৩]

রামমোহনের নিজের একটি উক্তিও যে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ সমর্থন করে। রামমোহন তাঁর আত্মজীবনী মূলক পত্রটিতে লিখেছেন—

> "When about the age of sixteen, I composed a manuscript calling in question the validity of the idoltrous system of the Hindoos. This, together with my known sentiments on the subject having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels······when I had reached the age of twenty, my father recalled me, and restored me to his favour."

৫৩। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, চতুর্থ সং, পরিশিষ্ট পৃ ৬৯৯ দ্রষ্টব্য। এইটেই তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ।

এ ঘটনা সম্বন্ধে ডঃ কার্পেণ্টার লিখেছেন[৫৪]—

"Without disputing the authority of his father, he often sought from him information as to the reasons of his faith; he obtained no satisfaction, and he at least determined at the early age of 15, to leave the paternal home and Sojourn for a time in Tibet, that he might see another form of religious faith."

এ উক্তির পদাটীকায় তিনি-লিখেছেন—"I have heard from the Rajah himself in London and again at Stapleton grove." এ থেকে দেখা যাচ্ছে রাজা যখন পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করনে কার্পেণ্টারের লেখা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। আর জীবনীমূলক চিঠি অনুযায়ী তাঁর বয়স তখন ছিল ১৬ বছরের কাছাকাছি। এই দুটি উক্তি পাশাপাশি রাখলে এই দাঁড়ায় যে গৃহত্যাগের সময় তাঁর বয়স ১৫ পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু ১৬ পূর্ণ হয় নি—অর্থাৎ ১৫ বছর কয়েক মাস। পৈত্রিক গৃহের বাইরে রামমোহন কতদিন ছিলেন এ বিষয়ে ডঃ কার্পেণ্টার তাঁর মুখে কিছু শোনেন নি। কিন্তু উক্ত পত্রটিতে আছে "when I had reached the age of twenty" (অর্থাৎ যখন আমি বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করলাম) তখন তিনি পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। সুতরাং পিতা যখন তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে আনলেন তখন তাঁর বয়স ১৯ বছরের বেশি কিন্তু বিশ পূর্ণ হয় নি। আধুনিক গবেষকগণ[৫৫] দেশের বাড়ীতে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহনকে পেয়েছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজার জন্ম হলে রামমোহন যখন গৃহে ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স হয় ১৯ বছর আট মাস (ডিসেম্বর ১৭৯১ ধরে হিসেব)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজার আত্মজীবনীমূলক রচনাটি ১৭৭২ সালের মে মাসেই রাজার জন্ম হয়ে ছিল এ তথ্য সমর্থন করছে। তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরেই নি যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল তাহলে ১৭৯৪ খৃর পূর্বে তাঁকে কিছুতেই দেশের বাড়ীতে পাওয়া যাবে না। এই এত বছরের ফাঁক ১৭৭৪ সালের সমর্থকরা কোন যুক্তি দিয়ে পূরণ করবেন? সুতরাং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পরে কোন মতেই রামমোহনের জন্ম হতে পারে না এ একরকম ধ্রুব সত্য।

৫৪। Review of the Labours Opinions and character of Rammohan Ray, 1833, pp 101-102

৫৫। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস প্রভৃতি।

আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই লর্ড কার্জনের সময় ভারত সরকারের Department of Preservation of Ancient Monuments রামমোহনের মাণিকতলা ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে দুটি স্মারক ফলক বসান। মাণিকতলার বাড়ীতে এই কথা কটি আছে—

FROM 1814—1830
THIS HOUSE WAS THE RESIDENCE
OF
RAJA RAMMOHAN ROY
FOUNDER OF BRAHMO SAMAJ
BORN 1772 — DIED 1833

আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীর ফলকে আছে—

THIS HOUSE WAS THE FAMILY RESIDENCE
OF
RAJA RAMMOHAN ROY
FOUNDER OF THE BRAHMO SAMAJ
BORN 1772 — DIED 1833

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারত সরকার রাজার দুটো বাড়ীতেই যে ফলক লাগিয়েছেন তাতে তাঁর আবির্ভাবকাল দেখানো হয়েছে ১৭৭২ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন যে তাঁর সমাধি মন্দির গাত্রে জন্মসন ১৭৭৪ লেখা আছে। এ থেকে মনে হয় ভারত সরকার ভাল করে অনুসন্ধান করেই ঐ আবির্ভাবকাল গ্রহণ করেছিলেন। আর রাজার বাড়ী দুটো তখন পড়ো বাড়ী ছিল না। তাঁর বংশধরদের অনুমতি নিয়েই এ কাজ করা হয়েছে। রাজার বংশধরগণের ট্রাডিসন যদি ১৭৭৪ সাল হত তাহলে তাঁরা কিছুতেই ঐ ফলক লাগাতে দিতেন না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে রাজার আমহার্স্ট স্ট্রীটের বিশাল অট্টালিকাটি তখন রমাপ্রসাদ রায়ের বংশধরের দখলে ছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটী ও জাতীয় গ্রন্থাগার তাঁদের অথর ক্যাটালগে রাজার আবির্ভাবকাল ১৭৭২-১৮৩৩ গ্রহণ করেছেন। Encyclopaedia Britanica (1968, page 672 vol. 19), the Chambers Biographical

Dictionary, Freedom Movement in Bengal (Edu Deptt, West Bengal 1968), A Dictionary of Indian History (Calcutta University) এবং অসংখ্য ঐতিহাসিক, গবেষক, প্রবন্ধকার গ্রন্থাকার রাজার আবির্ভাব কাল ১৭৭২-১৮৩৩ গ্রহণ করেছেন। রামমোহন যুগের বাংলার সবচেয়ে প্রামাণিক ইতিহাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal (edited by Dr. N. K. Sinha) ও রাজার আবির্ভাবকাল ১৭৭২-১৮৩৩ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া ১৩৭৮-এর মাঘ (জানুয়ারী ১৯৭২)এ প্রকাশিত "বাংলা দেশের ইতিহাস—আধুনিক যুগ" গ্রন্থে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার রামমোহনের আবির্ভাবকাল ১৭৭২—১৮৩৩ গ্রহণ করেছেন। (পৃষ্ঠা ১৬৯ দ্রষ্টব্য)

দেশে এবং বিদেশে রামমোহনের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তুলাদণ্ডে এগুলি মেপে এবং দীর্ঘ পাঁচ বছরের অনুসন্ধানের পর আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পর কোনমতেই হ'তে পারে না। তাঁর আবির্ভাব কাল যে ১৭৭২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩।*

---

* ১৯৬৮ সাল থেকে রাজা রামমোহনের জন্ম সন নির্দ্ধারণের জন্যে বাংলা সংবাদপত্রে চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে এ বিষয়টি দানা বাধে। ১৯৭২ সালে রাজার জন্মের দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে বলে ঘোষণা হবার পর রাজার জন্ম সন নির্দ্ধারণের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এদিকে ১৯৭১ সালে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে একটি জন্মসন অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। এই সমিতির জন্যে লেখক একটি ৪৩ পৃষ্ঠার ইংরেজী প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন। এর একটি কপি তিনি ডঃ মজুমদারকেও দেন। ইতিমধ্যে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় এই কমিটির বৈঠক বসে। বর্তমান লেখক রামমোহনের জন্মসন নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন বলে ডঃ মজুমদার উক্ত সমিতিকে বর্তমান লেখকের বক্তব্য শোনবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই কমিটির জন্যে লেখক একটি সংশোধিত প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং নির্দ্ধারিত দিনে গুরুদশার মধ্যে মিটিংএ উপস্থিত হন। উক্ত মিটিংএ ডঃ মজুমদার অবশ্য ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস ও বর্তমান লেখক ডঃ মজুমদারের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃপ্রতুল গুপ্ত, ডঃ প্রসাদ, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি ডঃ মজুমদারের যুক্তি গ্রহণ করেন নি। উক্ত কমিটি রাজার জন্মসন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।—

"The Committee resolved as follows :—

Relatively, the most decisive evidence on the issue in dispute, was

that of Ramaprased, the son of Raja Rammohun Roy, whose statement as recorded by Mr. Dall, gave not only the English month and year but also the corresponding month and year according to the Bengali Calender. In other words, this date (May 1772=Jaistha 1179 B.S.) represented the tradition as known to and recognised by the nearest Kin of the Raja. The Committee felt that unless some definite and positively conclusive evidence to the contrary were found, the month and year of the birth of the Raja given in the family tradition should not be disturbed."

কমিটির এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে লেখকও একমত। তবে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ না করে শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞানসম্মত হয় নি। সেই ছিদ্র ধরেই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষণটি দেন; এতে তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করে বলেন যে "1774 is the most likely date of Rammohan's birth." সংবাদপত্রগুলিতে ডঃ মজুমদারের ভাষণের সারাংশ প্রকাশিত হয়। বর্তমান লেখক ডঃ মজুমদারে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। গত ১৪. ৩. ১৯৭২ সালের Statesman পত্রিকায় লেখকের প্রতিবাদটি প্রকাশিত হয়।

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

উর্দু লেখক সম্মেলন। গত ৩ ও ৪ মার্চ দিল্লির গালিব আকাদমি হলে উর্দু লেখকদের দুই দিন ব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত উর্দু লেখক ডঃ কোথার রাইস। এই সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ রাইস বলেন: 'এই আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য হল, স্বাধীনতার পরবর্তী উর্দু সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা। প্রথম অধিবেশন ছিল গল্প-উপন্যাসের উপর। এতে শ্রীমতী সাজ্জাদ জাহীর, আবিদ সোহাইল, কাউসের চন্দ্রপুরী এবং ইকবাল মজিদ স্বাধীনতার পরবর্তী উর্দু গল্প-উপন্যাসের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর সেই সব প্রবন্ধের উপর আলোচনা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন আনওয়ার আজিম, কাজী আবদুল সত্তার, নিয়াজ হায়দার, ডঃ জি. সি. নারাও প্রমুখ। সকলের ভাষণেই মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি পায় যে, দেশের বৃহত্তম গণসমাজকে বাদ দিয়ে কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং উর্দু গল্প-উপন্যাস সে দায়িত্ব পালন করেছে

সমালোচনা বিভাগের আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন সিদ্দিকুর রহমন কিদোয়াই, তাকি হাইদার, ডঃ এম. মহম্মদ অকিল, আফস জাহীর প্রমুখ। আলোচকরা অনেকেই স্বীকার করেন যে, গল্প-কবিতায় উর্দু সাহিত্য সমৃদ্ধ হলেও বিজ্ঞান সম্মত যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনার ক্ষেত্রটি এখনও যথেষ্ট দুর্বল।

কবিতা বিভাগে সাম্প্রতিক উর্দু কবিতার গতি প্রকৃতির উপর কয়েকটি প্রবন্ধ পড়েন আনওয়ান চিসটি, আমীক হানফি, আজমল আজমালি এবং আসলাম পারভেজ। এই সব প্রবন্ধে বলা হয় যে, উর্দু কবিতা উর্দু গল্প-উপন্যাসের মতই সমৃদ্ধ। বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ধারায় কবিতা রচনা করে চলেছেন। ভারতীয় কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এ ভাবেই উর্দু কবিতা একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রগতিশীল হিন্দি লেখক সম্মেলন। গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী বান্দায় প্রগতিশীল হিন্দি লেখকদের একটি সর্ব ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন ডঃ কেদারনাথ আগরওয়ালা এবং ডঃ রঞ্জিত। নবীন ও প্রবীন সমস্ত লেখককেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রবীন লেখকই এতে অনুপস্থিত থাকেন। আর অন্যদিকে নবীন লেখকদের মধ্যে খুব উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে হিন্দি সাহিত্যের গতি প্রকৃতি বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। কবিতা শাখায় রাজীব সকসেনা এবং বিশ্বম্ভরনাথ উপাধ্যায়; কথা সাহিত্য শাখায় চন্দ্রভূষণ তেওয়ারি; সমালোচনা শাখায় বিশ্বনাথ ত্রিপাঠি প্রমুখ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর যে আলোচনা হয়, তাতে অংশ গ্রহণ করেন সুরেন্দ্র চৌধুরী, আনন্দ প্রকাশ, করণ সিং চৌহান, ধূমিল, এম. এন. তেওয়ারি, রমেশ উপাধ্যায় প্রমুখ একালের বিশিষ্ট হিন্দি কবি লেখকরা।

সম্মেলনে ডঃ কেদারনাথ আগরওয়াল ও ডঃ রণজিৎকে আহ্বায়ক করে ২২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে।

রবীন্দ্র সদনে কবি সম্মেলন॥ রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্র সদন সমিতি কর্তৃক এক কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু সংবাদপত্রে দেখেছি, সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা, হৈ-চৈ ইত্যাদি হয়েছে। ঘটনাটি যে খুবই দুঃখের, তাতে সন্দেহ নেই। আমরা প্রার্থনা করবো, যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কিন্তু কবিতার অনুরাগী হিসেবে কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের মনেও জাগছে। এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে কারা ছিলেন এবং কিভাবে কবিদের নির্বাচন করা হয়েছিল? কয়েকজন তরুণ কবি কিভাবে প্রতিবারই আমন্ত্রণ পান? অথচ অনেক বিশিষ্ট প্রবীন ও নবীন কবির কবিতা পাঠ তো দূরের কথা, উপস্থিত থাকার পর্যন্ত কোন আমন্ত্রণ পান না। যদি এটা কোন বেসরকারী সংস্থা হত, তাহলে বলার কিছু ছিল না। তাঁরা তাঁদের মত ও আদর্শ অনুযায়ী অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু যেটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সেখানে কি কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার দুর্নীতি বছরের পর বছর চলতে পারে? যদি বেশি লোককে ডাকা সম্ভব না হয়, তা হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন কবিদের আহ্বান করা যেতে পারে। ইদানিং এ ব্যাপারটা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট বাংলা কবিতার যে সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন, সেখানেও অনুরূপ ইচ্ছা অনিচ্ছার দুর্নীতি লক্ষ্য করা যাবে। এগুলি সংশোধন করার এখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত হীন প্রবণতা নিশ্চিতভাবে কাব্যামোদীদের কাছে সুখের কারণ নয়।

এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার। এবার সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর "সোনা রূপা নয়" গ্রন্থটির জন্য। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী লেখিকা হিসেবে পাঠক সমাজে সম্যক পরিচিত না হলেও তাঁর রচনা যথেষ্ট অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। তাঁর জন্ম হয় জয়পুরে ১৮৯৩ সালে। অতুল বৈভব এবং সমৃদ্ধির মধ্যেই তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর রচিত অধিকাংশ গল্পেই রয়েছে এই পরিবেশ। শোক ও দুঃখের এক অপূর্ব সমাবেশ তাঁর গল্পধারাকে করেছে আরো রসময়। "আগাছা", "ঝাঁপি", "রাজযোটক" প্রভৃতি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উজ্জল নিদর্শন। "আরাবল্লীর আড়ালে", "আরাবল্লীর কাহিনী", "ব্যাও মাস্টারের মা" প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ।"

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন দিনকর। প্রখ্যাত হিন্দি কবি রামধারী সিং দিনকর এবারের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর এই নতুন সম্মানে সাহিত্যরসিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন বলে আশা করি। শ্রীদিনকরের পুরস্কৃত গ্রন্থের নাম "উর্বশী"। ১৯৬১ সালে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে পুরুরবা এবং উর্বশীর প্রেম কাহিনীকে কবি নতুন প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে আধুনিক সমাজের ক্রটি বিচ্যুতিগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রীদিনকরের বর্তমান বয়স ৬৫ বৎসর। বিহারের মুঙ্গের জেলায় তাঁর জন্ম। ১৯৫৯-এ তাঁর "সংস্কৃতির চার অধ্যায়" গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদমির পুরস্কার অর্জন করে। সেই বছরে ভারত সরকার তাঁকে "পদ্মভূষণ" উপাধিতেও সম্মানিত করেন। কিছুকাল তিনি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কুমারণ আস্মান শতবার্ষিকী। প্রখ্যাত মালয়ালম কবি কুমারণ আস্মানের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব এ বছর ভারতের বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ১৪ এপ্রিল ফোর্ঝিফর্ডে ফেরথ সাহিত্য পরিষদের ৩৩তম অধিবেশনেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়। রাষ্ট্রপতি এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন "জনগণের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে লেখকদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। জনগণকে ঘনিষ্ঠ করা এবং উচ্চ সম্পদময় সমৃদ্ধভাবে ভাবিত করার দায়িত্বও লেখকদের পালন করতে হবে।"

সংক্ষিপ্ত সমাচার। গত ৩১ মার্চ **সরোজকুমার রায়চৌধুরীর পঞ্চম**

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। শিবরাম চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, রাণা বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী প্রমুখ সরোজকুমারের প্রতিভার উল্লেখ করে ভাষণ দেন।

জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের কবি শামসুর রাহমান ও আল মহমুদ। **তুলসী রামায়ণের** ৪০০ বছর উপলক্ষে নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এতে ভাষণ দেন।

রাণাঘাটের রবীন্দ্র ভবনে গত ১৩ মে এক সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন গোবিন্দ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে মণীন্দ্র রায় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আশিস সান্যাল উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিধান সভার সদস্য নরেশ চাকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গোবিন্দ চক্রবর্তী, নিজন দে চৌধুরী, কার্তিক মোদক, প্রাণেশ সরকার, কুশল চৌধুরী, আশিস সান্যাল প্রমুখ কয়েকজন। মহকুমা শাসক রসময় মালাকার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলনের উদ্যোগে ১১ মে সন্ধ্যায় এক কবিতা পাঠের আসর বসে। কবিতা পড়েন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীকান্ত গুহ, মণীন্দ্র রায়, কবিতা সিংহ, আশিস সান্যাল ও শুভ মুখোপাধ্যায়।

মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত **'অক্ষরম্'** পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় কবিতা সংখ্যা হিসেবে। এতে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী কবির কবিতার মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যতদূর জানা গেছে যাঁদের কবিতা অনূদিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় শংখ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরো কয়েকজন।

ঝাড়গ্রাম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশন হয়ে গেল। এবার সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে তিনি বাংলা সাহিত্যে মেদিনীপুর জেলার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে,—সাহিত্যেই বাঙালী সত্তা জীবিত, অন্ততঃ গদ্য সাহিত্যেই বাঙালী এখনও তার আত্মিক সত্তা হারিয়ে ফেলেনি।

উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ রমা চৌধুরী সাহিত্য-শিল্পের অমল পথেই চিরকাম্য শাশ্বতী শান্তি—এ বিশ্বাস পোষণ করেন।

অনুষ্ঠানের সুরুতে মঙ্গলাচরণ করেন স্বামী অনন্তানন্দ জী।

দ্বিতীয়দিনে ১লা বৈশাখ সকালে নাট্য সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্য শাখার এবং বিকালে কথা সাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। নাট্য সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়, কাব্য সাহিত্যে শ্রীমণীন্দ্র রায় ও কথা সাহিত্যে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। উপস্থিত অন্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন,—রাধারাণী দেবী, অনিল সেন, গোপাল ভৌমিক, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও আরো অনেকে।

এ সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজা নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

জব্বলপুরে বাংলা সাহিত্য সম্মেলন। সম্প্রতি জব্বলপুরের শহীদ স্মারক ভবনে বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের পঞ্চম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীকালিকাপ্রসাদ দীক্ষিত জী। তিনি হিন্দী সাহিত্যের ওপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ও সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনীরেন চক্রবর্তী। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন।

বিচিত্রা সম্পাদক কুসুমবিহারী চৌধুরী বিচিত্রার বাইশ বছরের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এর পর স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান—কবি হালদার, রমাব্রত ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ মিশ্র, শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি বাংলা পত্র পত্রিকার প্রদর্শনী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরলোকে সুরেশ চক্রবর্তী। উত্তরা সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী গত ১৪ মে সোমবার বারাণসীতে তাঁর বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর।

সুরেশবাবু একদা যাঁর সান্নিধ্যে ও অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তিনি অতুলপ্রসাদ সেন। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তখন শ্রীচক্রবর্তী ছিলেন এই সম্মেলনে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় সমাসীন। 'আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ' শীর্ষক স্মৃতিকথামূলক রচনাটি ধারাবাহিকভাবে 'কালি ও কলমে' প্রকাশের পর তাঁরই সম্পাদনায় 'অতুলপ্রসাদ সেন' গ্রন্থভুক্ত হয়। সাহিত্যের সাংগঠনিক নানা কাজেও তাঁর দান অতুলনীয়।

কালি ও কলম-এর প্রতি তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি ছিল, তিনি নানাভাবে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীর লোকান্তরে আমরা গভীরভাবে স্বজন বিয়োগের ব্যথা অনুভব করছি।

শিশু শিল্প মেলা। গত ছাব্বিশে জানুয়ারী বাইশ পল্লী সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সুভাষ উদ্যানে শিশুদের পঞ্চম বার্ষিক 'বসে আঁকো' চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। গত ৫ই মে সন্ধ্যায় তার ফলাফল ঘোষণা করে পুরস্কার বিতরণ করা হল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅম্লান দত্ত এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সুরু হয়। এর পর সভাপতির ভাষণে শ্রীঅম্লান দত্ত এই ধরণের শিল্প প্রতিযোগীতার গুরুত্ব ও শিশুমনে শিল্পের অবশ্যম্ভাবী সুফলের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীমতী অমলাশঙ্কর এর পর একে একে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে কালি ও কলম পত্রিকার তরফ থেকেও একটি পুরস্কার বিতরিত হয়।

শিশু বিভাগে প্রথম পুরস্কার পায়: পার্থ দে, দ্বিতীয় পুরস্কার: শিবম্ প্রিয়দর্শিনী, তৃতীয় পুরস্কার: দীপা দে। বালক-বালিকা বিভাগে প্রথম পুরস্কার: উজ্জ্বলকুমার দত্তরায়, দ্বিতীয় পুরস্কার: শিখা প্রামাণিক, তৃতীয় পুরস্কার: শতরূপা দাস। কিশোর বিভাগে প্রথম পুরস্কার: প্রভিন মুখিয়া, দ্বিতীয় পুরস্কার: প্রদীপ সাহা, তৃতীয় পুরস্কার: প্রণতি সেন। এ ছাড়া প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককেই সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয় ও ক্রমিক স্থানাধিকারীদের অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হয়। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সর্বাপেক্ষা বেশী পুরস্কার পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অনুষ্ঠানের শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সাহিত্য বাসরে সাহিত্য পুরস্কার। অন্যান্য প্রতি বছরের মতই এবারও ৫ই জ্যৈষ্ঠের সুন্দর সন্ধ্যায় সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠানে সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠান শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের সুপরিবেশিত সঙ্গীত দিয়ে সুরু হয়।

এ বছর অমৃতবাজার, যুগান্তর ও অমৃত প্রদত্ত শিশিরকুমার এবং মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র এবং মৌচাক পত্রিকার দেওয়া সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়। এছাড়া প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ ক্ষুদিরাম দাস।

আরো একটি সাহিত্য পুরস্কার ও পত্রিকা শতবার্ষিকী পদক দেওয়া হবে একথা শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এ দিনের অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন নাট্য সাহিত্যের ওপর একটি বাড়তি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে এবং তার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হবে।

এ দিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বিশেষ বুদ্ধিজীবিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কালি ও কলম

সাহিত্য পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ • ত্রয়োদশ সংখ্যা

ভাদ্র ১৩৮০

কালি ও কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়কপত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ ভাদ্র ১৩৮০

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের মালিনী : ভাবনার কয়েকটি তরঙ্গ ॥ রামদুলাল বসু
রাধামোহন সেন-কৃত সঙ্গীত-তরঙ্গ ॥ শচীন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৬৭

ভ্রমণ কাহিনী

মস্কো থেকে দেখা ॥ কৃষ্ণ ধর ॥ ১৫

গল্প

হুড়কায় নমঃ ॥ গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী ৩৩
চোখ ॥ শচীন বিশ্বাস ॥ ৯১

নাটক

বরং আলেয়া ভালো ॥ কমল লাহিড়ী ৪৫

ধারাবাহিক উপন্যাস

উত্তর জাহ্নবী ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ১০৯

জীবনী উপন্যাস

অপুর পাঁচালী ॥ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ॥ ৭৭

কবিতা

আমি আর কারো জন্য ॥ কায়সুল হক ॥ ৭৩
সুদেষ্ণার কাছে চিঠি ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক ॥ ৭৪
রাকার জন্য ॥ যোগব্রত চক্রবর্তী ॥ ৭৫
তোমার অসুস্থ মুখ দেখে ॥ প্রশান্ত রায় ৭৬
সাহিত্যের খবর ॥ সুচরিতা সান্যাল ॥

প্রচ্ছদপট—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সহ সম্পাদক : শুভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

নিয়োগকর্তাদের জ্ঞাতার্থে

প্রতি মাসে আপনাদের কর্মচারীদের **বেতন** দেবার সময়ে খেয়াল রাখবেন, যে—

(ক) মাসের আনুমানিক বেতন ও ভাতার (অন্যান্য অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা সমেত) পরিমাণ মিলিয়ে যদি পাঁচ হাজার টাকার বেশি হয়, তাহলে তার থেকে **সঠিক কর কেটে নিতে হবে** এবং

(খ) ঐ করের টাকা **এক সপ্তাহের** মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতায় **জমা দিতে হবে**।

আইনতঃ যা করণীয় তা অনুগ্রহ করে **পালন করুন** যাতে আপনাকে শাস্তিমূলক সুদ, জরিমানা বা আদালতের **ঝঞ্ঝাটে না পড়তে হয়**।

বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার আয়কর নিরূপক আধিকারিক বা আয়কর বিভাগের জনসংযোগ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দি ডিরেক্টোরেট অফ ইন্সপেকশান

(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স অ্যান্ড পাবলিকেশান)

ময়ূর ভবন, কনট সার্কাস

নতুন দিল্লী

॥ সপ্তম বর্ষ ॥
॥ প্রথম সংখ্যা ॥
॥ ভাদ্র ১৩৮০ ॥

আমাদের কথা

ইতিহাস পড়তে গেলে আমরা প্রথমেই "কলচরল ডেকাডেনস্" বা সাংস্কৃতিক অবক্ষয় কথাটার সম্মুখীন হই। যুগে যুগে, কালে কালে দেখা যায় নবজাগরণের (রনেসাঁস) পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছে একটা নিষ্ফলা সময়ের পরিসর যখন সাংস্কৃতিক প্রগতি স্তব্ধ হয়েছে—অগ্রগতির স্থান নিয়েছে অবক্ষয়।

বাংলাদেশে এই অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছে বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, গোটা উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও তার ধারা ছিল অব্যাহত। যুদ্ধোত্তর এই প্রায় তিরিশ বছরে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে, বাংলাদেশে সেই অগ্রগতির প্রায় অচল অবস্থা।

সেই অন্ধকারের রাতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংস্কৃতির যে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের উত্তরসূরীরা সেই আলোর শিখাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আজকের যুগের বাঙ্গালী সেই ঐতিহ্যের আড়ালে নিজের অক্ষমতাকে লুকিয়ে রেখে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সংস্কৃতির শিকার হয়ে ক্রমশঃ অন্ধকারের পথে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রকাশ হয়েছে মুখ্যতঃ সাহিত্যের মাধ্যমে। মাইকেল বঙ্কিম থেকে যার আরম্ভ, আর রবীন্দ্রনাথে যার চরম উৎকর্ষতা, রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে সামান্যসংখ্যক সাহিত্যিকের রচনাতেই সৎ সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা ও প্রকৃত শৈল্পিক গুণের পরিসমাপ্তি। পরবর্তী কালের সাহিত্য যুগকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে নেত্রপাত করলেও দেখা যাবে প্রায় একই চিত্র। চারুশিল্প—চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের পরে তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে নবসৃষ্টির যে উল্লাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা আজ সম্পূর্ণ অবসিত। নকলনবীশি উগ্র আধুনিকতা আজ অজস্র, সহস্রধারায় প্রবাহিত, কিন্তু চরিতার্থতায় তা

সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর ভাস্কর্য স্থাপত্য—? সে তো গৌড়ের ধ্বংসাবশেষেই আবদ্ধ।

বাংলা সঙ্গীতের একটা নিজস্ব ধারা প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছিল। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এবং নজরুল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল, তারপরেও কিছু মধ্যমস্তরের গীতিকার ও শিল্পী কিছুদিন অবধি আসর মাত করে রেখেছিলেন। তারপর গত তিরিশ বছরের 'আধুনিক' বাংলা গঠন—? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চেও নবজাগরণ মাইকেল-দীনবন্ধুর সময় থেকে। শতবর্ষের শেষ পাদে তার আদলটাও সুখকর নয়। সেখানেও নকলনবীশি আর কুশীলকবৃত্তি। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহ-সঙ্গীত, অভিনয় আজ ভীষণ এগিয়েছে; কিন্তু, মূলবস্তু নাটক থমকে দাঁড়িয়ে। নাট্যকারের সন্ধানে চরিত্রেরা আজ ছোটাছুটি করছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন আমদানি-সিনেমা। বাংলা সিনেমা সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে নিশ্চয়ই গর্বিত। কিন্তু, কোথায় সত্যজিৎ রায়ের উত্তরসূরী! আর সিনেমাকে কি কালজয়ী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা চলে! ফিলম্ নয় পুঁথির পাতা; শ্রুতি ও স্মৃতিকে আশ্রয় করে তা চিরন্তন হতে পারবে না বলেই ধারণা।

শিক্ষা সংস্কৃতিরই অঙ্গ। বাংলাদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন করে না, বোধহয়। বস্তাপচা পাঠক্রম, নোট-মুখস্ত করে পরীক্ষা-বৈতরণী অতিক্রম। শতকরা একজনেরও কম প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের ঘন অন্ধকারে, বুদ্ধির দীপ্তিতে পিছু হঠে যাওয়া জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মার খাওয়া···শিক্ষার নামে এ কোন প্রহসন!

সংস্কৃতির অপর নাম জীবনচর্যা। জীবনচর্যার ক্ষেত্রে বঙ্গসন্তানের সমস্ত সদগুণ আজ কোথায় উবে গেছে। আর্থিক দৈন্যে যারা আবর্তিত তারা তো পশুর জীবনযাপন করছে? সচ্ছলতায় আজও যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লালিত, তাদের দিনলিপিতে কতটুকু সংস্কৃতির ছাপ অবশিষ্ট? ট্রামে-বাসে-ট্রেনে, অপিসে-আদালতে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্বোপরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বঙ্গসন্তানের আচার-ব্যবহার-আচরণ দেখে নিরন্তরই সন্দেহ জাগে আমরা কি সত্যিই রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্রের অধস্তন পুরুষ?

রামদুলাল বসু

রবীন্দ্রনাথের মালিনী : ভাবনার কয়েকটি তরঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকের ভূমিকাংশ বিচার করেই আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে। এই নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্রনির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।...সত্য যার স্বভাবে যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম-জটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।'

'আমার এ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির পরিশোধ'এ।* যেকথা ভেবে দেখার যোগ্য। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।'

ভূমিকাংশ বিচার করে আমরা তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। (১) এই নাটকরচনায় উৎসে আছে কবির ধর্মপ্রেরণা। যে প্রেরণা বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।

(২) প্রকৃতির প্রতিশোধে এই ভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়েছিল।

(৩) নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে হয় তো তারও আগে এর অভ্যাস পাওয়া যায়।

এই নাটকের নায়িকা মালিনীর জীবনবোধে যে ধর্মপ্রেরণা, তা 'নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না'। কিম্বা নির্বিকার তত্ত্বের আকারে স্থিতিশীল হয়ে থাকতে চায়নি। সে প্রেরণা বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করেছে। তার অন্তরের অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে পরিপূর্ণ 'মানবদেবতা'র আবির্ভাব ঘটিয়েছে। মানবী থেকে দেবী এবং

* প্রকৃতির প্রতিশোধ।

দেবী থেকে মানবীতে রূপান্তরের ধারা মালিনীচরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও মঙ্গল ও মৈত্রী প্রকাশ কোথাও স্তব্ধ হয়ে যায় নি। আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তার যথার্থ স্বরূপও প্রকাশিত হয়েছে। কবির ধর্মসম্পর্কিত আত্মভাবের উপরেই মালিনীর প্রতিষ্ঠা। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞা হওয়া সত্ত্বেও মালিনী কল্যাণ ধর্মের প্রেরণায় বৃহৎ সংসারে বিরোধী ভাবাপন্ন মানুষের সামনে এসে সহজেই তার মধুর আহ্বান ও দেবীসুলভ ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাদের মন জয় করে নিতে পেরেছে। এর মূলে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বপ্রেমবোধ। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের তত্ত্বকে প্রাধান্য দেননি, দিয়েছেন ধর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কল্যাণধর্মী চেতনাকে। তত্ত্বের গভীরে যে ধর্ম আশ্রয় গ্রহণ করে, তা নির্বিকার গতিহীন নিঃস্পন্দ। মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে মানবলোকে প্রকাশের ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। ধর্মের এই স্বতঃস্ফূর্ত সর্বজনীন আবেদনই রবীন্দ্রনাথের বোধে ধরা পড়েছে। আর এই বোধদীপ্ত ধর্ম-মনই মূর্ত হয়ে উঠেছে মালিনীর মধ্যে।

সর্বলোকে
যাব আমি—রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির সংসার।

মালিনী স্বয়ং সেই ধর্মের প্রতিভূ—যে ধর্ম তত্ত্বের কূপে গতিশীলতা হারিয়ে না ফেলে বিশ্বজননী হয়ে ওঠে। যে বন্ধনমুক্ত হয়ে দুর্নিবার ভাবাবেগে মানব হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে চায়—যে মানুষের সঙ্গে সংকীর্ণ আত্মীয়তার বন্ধন মেনে না নিয়ে বৃহৎ মানবাত্মার অখণ্ড স্রোতে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে ধর্মের সার্থকতা খুঁজে পেতে চায়। এই ভাবের প্রেরণায় মালিনী বলে,—

বন্ধ কেটে দাও মহারাজ
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নাই আজ
নাই রাজসুতা—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী সেই শুধু আমি।

এখন প্রশ্ন, মালিনীর এই জাতীয় বিশ্বগত ধর্মচেতনা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অবসিত হতে চেয়েছিল কেন? তার উত্তর আলোচনাকালে দেবার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত আলোচনাকালে আমরা দেখব, প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মালিনীর যে ভাবসূত্রের অঙ্কুর আছে বলে জানিয়েছেন তার স্বরূপ কেমন। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের ভাবরাজ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসম্পর্কিত

যে বোধটি ধরা পড়েছে, তার সঙ্গে মালিনীর ভাবসম্পর্কের সূত্র স্পষ্ট। নাটক দুটির মিল কেবলমাত্র আঙ্গিকেই নয়। অর্থাৎ উভয় নাটকই কাব্যের মাধ্যমে লেখা এটাই উভয়ের সম্পর্করচনার একমাত্র সূত্র নয়। সূত্র আরও গভীরে—ভাবের ক্ষেত্রে। প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ মূল চরিত্র দুটি। সন্ন্যাসী ও রঘু-দুহিতা অস্পৃশ্যা বালিকা। সন্ন্যাসী-চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের ধর্মসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিরূপণের পরীক্ষা ক্ষেত্র। অন্ধকার গিরিগুহায় তপস্বী সন্ন্যাসী একদিন 'কামনার বহ্নিময় কশাঘাতে' পথ-পথান্তরে ছুটেছেন। কিন্তু বাসনা তাঁকে নিয়ে গেছে দুর্ভিক্ষের মধ্যে। তারপর সাধনা শুরু—গিরিগুহায়। যেখানে 'বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে'। সংসার জীবনকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছে। পৃথিবী তার কাছে বদ্ধ ক্ষুদ্র। আর 'আলোক ত কারাগার নিষ্ঠুর কঠিন বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর'। এই রৌদ্রালোকিত জগৎ সন্ন্যাসীর ধ্যানদৃষ্টিতে অন্ধকার—ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে কারাগার। এহেন সন্ন্যাসীর জীবনে একদিন আত্মীয়বান্ধবহীন নিঃস্ব দুঃস্থ অনাদৃত অস্পৃশ্য রঘুকন্যার আবির্ভাব সন্ন্যাসীর ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে অলক্ষে সংশয়ের জন্ম দিল। যে অসীমের অন্বেষণপর হয়ে সন্ন্যাসী গিরিগুহাবাসী ধ্যানী, সেই অসীমকেই যেন সন্ন্যাসী প্রত্যক্ষ করলেন বালিকার মধ্যে—

> তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন,
> সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমারে দ্বারে।'

সংশয়ের তরঙ্গস্নাত সন্ন্যাসী সত্যকে নতুন আলোকে উপলব্ধি করলেন। ভাবেন, 'আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া, অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!' 'সীমা সে ত ভ্রম।' জগৎ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ধর্মের মূল সত্য—এই ধারণা সন্ন্যাসীর মনে ধরা পড়ে। তারপর দ্বন্দ্ব তার সংস্কারবাদী ধর্মচেতনার সঙ্গে উপলব্ধ ধর্ম-সত্য। দ্বন্দ্বের দীর্ঘপর্ব শেষে সন্ন্যাসী ভাবলেন,—

> 'জগৎ তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে,
> মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।'

তারপর জগৎ বরণের পালা। সন্ন্যাসীদের কথা অস্বীকার। মানুষকে ভাই বলে আলিঙ্গন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর যেন প্রভাত উৎসবের গান গাওয়া—

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

কিন্তু যে বালিকার সান্নিধ্য সন্ন্যাসীকে নবচৈতন্য দান করল—ধর্মের পরমতম সত্তাটিকে উপলব্ধি করাল, তাকে হারিয়ে সন্ন্যাসীর বুকফাটা আর্তনাদ, জগৎ ও জীবন তথা মানুষের প্রতি চরম ভালোবাসার দিকটিই উদঘাটিত করে দেয়। এবারে মালিনীর ভূমিকায় কবিকথিত ধর্মভাবের সঙ্গে সন্ন্যাসীর রূপান্তরিত ধর্মপ্রেরণার কোনো বিরোধ বোধহয় খুঁজে পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসীর নবধর্ম প্রেরণাও '…নির্মল নির্বিকল্প হয়ে শুষ্ক ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।' আর মালিনী? সেও ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিসরে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অচলায়তনের অন্তরালে রাজগৃহে বাসকালেই গুরু কাশ্যপের আশীর্বাদ-অন্তে হৃদয়ের গভীরে 'মহাক্ষণ'এর প্রকাশ উপলব্ধি করেছিল। তার ধর্মপ্রেরণা মানবলোকে মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছিল। বৃহৎ বিপুল জগৎ সংসারের মানুষের সামনে এসে মালিনী মানুষের সঙ্গে দুঃখময় বসুন্ধরার দুঃখের পরিচয় নিতে চেয়েছেন।

'আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আসে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে।'

কিম্বা সুপ্রিয়ের দৃষ্টিতে ধৃত মালিনীর নেত্রালোকে পরিস্ফুট এ বিশ্বশাস্ত্রের লিখন—

'যেথা দয়া সেথা ধর্ম যেথা প্রেম স্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।'

কিন্তু মালিনীর বিশ্বপ্রেম শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রেমে এসে নরনারীর সম্পর্ক পরিণামমুখী হয়েছে। মানব প্রকৃতিকে বঞ্চিত করে সেই বঞ্চনার ভিতে মহত্তর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তা অকস্মাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সুপ্রিয়ের সান্নিধ্যে এসে মালিনী হারিয়ে ফেলে তার দিব্য প্রেরণা—

'হায় বিপ্রবর,
যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মত।

যে দেবতা মর্মে মোর বজ্রালোক হানি,
বলেছিল একদিন বিদ্যুন্ময়ী বাণী
সে আজি কোথায় গেল।'

প্রকৃতির প্রতিশোধে সন্ন্যাসী ও মানবপ্রকৃতিকে বঞ্চিত করে ক্ষুধিত রেখে এক শূন্যতার উপর জীবনের বেদী রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু একদা তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নাটকের শেষে বালিকার মৃত্যুজনিত সন্ন্যাসীর আক্ষেপ-উক্তিতে সেই সত্য উচ্চারিত হয়েছে।

'বাছা বাছা কোথা গেলি!
কী করিলি রে—

হায় হায় একী নিদারুণ প্রতিশোধ! প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর নামকরণের তাৎপর্যও এখানে নিহিত। মালিনীর সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর ভাবগত ঐক্যের সূত্রও এখানে পাওয়া যায়।

এবারে তৃতীয় সিদ্ধান্ত। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে এই ভাবের আভাস পাওয়া যায়। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় কবির বন্ধন মুক্তির উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে। মানসিক জগতে যে সীমিত পরিধিতে কবি বিচরণ করে চলেছিলেন সেই সীমার বন্ধন কেটে বাঁধভাঙা বন্যার মত হৃদয়উচ্ছ্বাসের প্রবাহ এসে স্পর্শ করেছে সর্ববিধ জাগতিক সত্তাকে। প্রাণের এই জাগরণ কবিকে এক নতুন উপলব্ধির সম্মুখীন করেছে। অবরুদ্ধ প্রেমচেতনা সীমিত বন্ধন ছিন্ন করে সর্বজনীন হতে চেয়েছে। 'প্রভাত উৎসব'কে তাই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের উপসংহার রূপে গ্রহণ করা চলে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এবং অনিবার্যভাবেই 'প্রভাত-উৎসবে'র আবির্ভাব। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গকে কবি তাঁর 'সমস্ত কাব্যের ভূমিকা' রূপে গণ্য করেছেন এবং প্রভাত সঙ্গীত তাঁর 'অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস'। অবরুদ্ধ ভাবাবেগ সীমার বন্ধন ভেঙে যেমন অসীমের অভিসারী হলো, তেমনি ক্ষুদ্র আমি থেকে কবির বৃহৎ আমির ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটল। ব্যক্তিগতবোধ বিশ্বগত হতে চাইল। তাঁর আবেগ চৈতন্যের প্রবাহ বিশ্বের প্রাণভূমিতে এসে মিলিত হতে চাইল।

'আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।'

নবধর্মের উপলব্ধিতে মালিনীর উক্তি—

'সর্বলোকে
যাব আমি রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির সংসার। জানিনা কী কাজ আছে
আসিয়াছে মহাক্ষণ।'

প্রভাত উৎসবে জগতের সঙ্গে হৃদয়-ভূমিতে কোলাকুলি। জগতের সর্ববিধ সত্তা হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি করে আত্মলীন হয়ে যাবার ভাব প্রভাত উৎসবের মূলকথা। মালিনীর ক্ষেত্রেও এই বোধ সত্য হয়ে প্রকাশ পায়, যখন সে বলে—

'ওগো পিতা আজ আমি হয়েছি সবার।'

কিম্বা 'মা আমার
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে লুকাতে
তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্বলোক—দেহ নাই মোর বাধা নাই
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।'

মালিনীর মধ্যে নিহিত ভাবের অঙ্কুরের আভাস নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে আমরা খুঁজে পেলাম।

২। মালিনীর বিষয়বস্তুর মূলে দেখি নবধর্মের সঙ্গে আচার সর্বস্ব সনাতন ধর্মের বিরোধের পটভূমিতে নরনারীর মানসিক জীবনের দ্বন্দ্ব সংশয়জনিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। নাটকের দ্বন্দ্ব এখানে বাইরের ঘটনা নির্ভর নয়। মানসিক সংশয়ের ধাপ ধরে সে দ্বন্দ্বের জটিল তন্তুজাল বিস্তার করেছে। এবং ক্রমশঃ আত্মগ্লানির অনুশোচনার মধ্য দিয়ে শুদ্ধিলাভ করতে চেয়েছে। নাটকের যেটুকু দ্বন্দ্ব তার রস মানসিক ক্ষেত্রেই আন্দোলিত। নাটকটিকে দুটি পর্বে বিভক্ত করলে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সবিশেষ পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব। প্রথম তিনটি দৃশ্য মিলিয়ে প্রথম পর্ব ও শেষের দৃশ্যটি নিয়ে দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বের মধ্যে আমরা তিনটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করি।

এক। দেবী মালিনীর জনসমক্ষে আবির্ভাব ও জনমন হরণ।

দুই। সুপ্রিয়কে স্বধর্মে বিশ্বাসী রেখে নবধর্মের বিনাশ সাধন মানসে সৈন্যসংগ্রহের জন্য ক্ষেমংকরের গৃহত্যাগ।

তিন। প্রজাগণের মাতারূপে মালিনীকে স্বীকৃতিদান ও রাজার দৃষ্টিতে 'জনপারাবার মাঝে লোকলক্ষ্মী মাতাররূপে' মালিনীকে দর্শন।

দ্বিতীয় পর্বেও দেখি তিনটি বিষয়।

এক। সুপ্রিয়ের সান্নিধ্যে এসে দেবী মালিনীর মানবীতে রূপান্তর।

দুই। ক্ষেমংকরের প্রতি সুপ্রিয়ের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আত্মানুশোচনা।

তিন। ক্ষেমংকর কর্তৃক সুপ্রিয় হত্যা ও ক্ষেমংকরের জন্য মালিনীর ক্ষমা প্রার্থনা। প্রথম পর্বের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের মূল বক্তব্যটি মোটামুটি পরিস্ফুট হয়ে যায়। এই পর্বের দ্বন্দ্বের মূলে আছে বাইরের ঘটনা। তারপর বাহ্যিক ঘটনাজাত দ্বন্দ্বের অবসানে বক্তব্য একটি দ্বন্দ্বাতীত লক্ষ্যে উপনীত হলো। নাটকের মূল বক্তব্য এভাবে পরিণামমুখী হবার পর চতুর্থ দৃশ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে। মনে হয় কবি প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেছেন, মানবমনে মালিনীর ধর্মভাবের দিকটি সঞ্চারিত করে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার বিষয়টি উপস্থাপিত করে। এক্ষেত্রে, সুপ্রিয় গবেষণা ক্ষেত্ররূপে গৃহীত হয়েছে। নাটকের প্রথম পর্বে যুক্তিবাদী অথচ ব্যক্তিত্বদুর্বল সুপ্রিয়কে আমরা যেমন নবধর্মের মূল প্রেরণায় বিশ্বাসী হয়ে বিতর্কের সম্মুখীন হতে দেখেছি, তেমনি ক্ষেমংকরের আচারসর্বস্ব ধর্মপ্রেরণার স্থূলবোধে আত্মসমর্পণ করতেও দেখি। যে সুপ্রিয় মালিনীর নির্বাসনের বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করে বলেছিল, যে শাস্ত্রের অনুগামী এ ব্রাহ্মণ, সে শাস্ত্র কোথাও লেখে নাই 'শক্তি যার ধর্ম তার'। মালিনীর দর্শন না পেয়েও সে বলেছিল 'মিথ্যারে সে সত্য বলে করেনি প্রচার'—সেই সুপ্রিয়ই ক্ষেমংকরের বন্ধুত্বের আবেদনে পূর্ণ মাত্রায় সাড়া দিয়ে এবং ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে ক্ষেমংকরকে আশ্বাস দিয়েছে—'সখে, কুহক নূতন, আমি তো নূতন নহি।

তুমি পুরাতন আর আমি পুরাতন।'

প্রথম পর্বে, মালিনীর নবধর্মের প্রতি সুপ্রিয়ের প্রবণতার লক্ষণ সন্ধান করা গেলেও সুপ্রিয়ের সামগ্রিক পরিচয়ের ভিত্তিতে এই পর্বে দেখা যায় যে, সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের ধর্মমত ও আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেনি আত্মসমর্পণ করে চরিতার্থতা লাভ করতে চেয়েছে! অথচ সুপ্রিয়কে নাটকের দ্বিতীয় পর্বে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানসিকতার অধিকারীরূপে দেখা গেল। এই পর্বে, মালিনী যেমন সুপ্রিয়র নিকট সংস্পর্শে এসে রক্তে মাংসে গড়া মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি সুপ্রিয় কোন এক অদৃশ্য মানসিক দ্বন্দ্বের ধাপ পার হয়ে, মালিনীকে দেবীরূপে বরণ করে তাকে ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছে। মালিনী যত

মাত্রায় মানবীতে পর্যবেশিত হয়েছে সুপ্রিয় ততোধিক মাত্রায় যেন মালিনীকে দেবীরূপে সত্যের তথা ধর্মের বিগ্রহরূপে গ্রহণ করেছে। সুপ্রিয়ের উপর মালিনীর হৃদয় দৌর্বল্যের প্রকাশ ঘটলেও, মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়ের হৃদয় দৌর্বল্যের প্রত্যক্ষ অবকাশ ঘটেনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সে মালিনীকে দেবীত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

মালিনীর পরিবর্তনের পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকা সম্ভব। সাধনা-লব্ধহীন ধর্মকে সে দীর্ঘদিন ধারণ করে থাকতে পারে না। তাই তার বিশ্বগত প্রেমবোধ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আশ্রয় পেতে চেয়েছিল। এই পর্বে আমরা যে তাকে দেবীত্বের আবরণহীন মানবীতে রূপান্তরিত হতে দেখি, তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন এই সর্গের প্রয়োজনীয়তা অথবা সার্থকতা কোথায়? নাটকের প্রথম পর্বে, যে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের প্রস্তুতি লক্ষ্য করেছি এই পর্বে তারই বা পরিচয় কোথায়? তবে কি, এই পর্ব মূল নাটকের বক্তব্য পরিস্ফুটনে অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে? মনে হয় একটু গভীরে প্রবেশ করলে এই পর্বের প্রয়োজনীয়তার দিকটি আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে ধর্মকে তত্ত্বের বেষ্টনী দিয়ে বেঁধে রাখার সার্থকতা খুঁজে পাননি। তার বিগলিত রূপকেই মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। আর সেই কারণেই মালিনীর ধর্মচেতনা সুপ্রিয়র মধ্যে সঞ্চারিত করে তার প্রতিক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন। সুপ্রিয় এই নাটকের ধর্ম-পরীক্ষার গবেষণাগৃহ। প্রথম পর্বে ঘটনাগত নাটকীয় দ্বন্দ্বের ধারা অন্তর্জীবনের গভীরে প্রবেশ করে মানসিক ভূমিতে এসে স্থান খুঁজে নিয়েছে। এবং মূর্ত হয়েছে সচল স্বরূপে।

সুপ্রিয় মালিনীর ধর্মমতের মধ্যে ধর্মের সনাতন সত্যটি প্রত্যক্ষ করেছে। ক্ষেমংকরের অন্তর্ধানের পর, সুপ্রিয় মালিনীর নিকট-সান্নিধ্য লাভ করে, তাকে দেবীরূপে বরণ করে তার অশান্ত বিদ্রোহী ধর্মমানসকে পরিতৃপ্ত করেছে। কিন্তু সে ভুলতে পারেনি যে সে বন্ধুত্বকে বিক্রয় করে কত বড় অন্যায় করেছে। সুপ্রিয়র অন্তরে অভিব্যক্ত আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার সঙ্গে নাটকের মূল দ্বন্দ্বের আপাত বিরোধ থাকলেও, একথা মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে, নাটকের দ্বন্দ্বটি রূপান্তরিত হয়ে সুপ্রিয়র মনে জন্ম নিয়েছে। নাটকের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব সংকোচন লাভে সংযত ও সংহতরূপে তার মানসিক জগতে প্রবেশ করে তাকে আন্দোলিত করেছে। মালিনী নাটকে

ক্ষেমংকরকে একটি ধর্মের প্রতিভূরূপে দেখতে পাই। সুপ্রিয়র সঙ্গে তার বন্ধুত্বের দিকটি তার ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক চিহ্ন। অন্যথায় যে ধর্মজীবী সাধারণ মানুষের নিকট আত্মীয়। সুপ্রিয়ের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা যে তাকে ক্ষেমংকরের আদর্শ থেকে চ্যুত করেছে একথা সত্য। অপর দিকে 'নূতন কুহকে' না ভুলবার সংকল্প জানিয়েও সে 'কুহকে'ই ভুলেছে এবং সেজন্য তার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে আত্মগ্লানির পীড়নে সে হাহাকার করেছে। সুপ্রিয়র এই হাহাকারের মধ্য দিয়ে বন্ধুর প্রতি কর্তব্যহীনতার তথা বিশ্বাসঘাতকার বিবেক শাসিত দণ্ড ঘোষিত হয়েছে এবং অপর দিকে এই হাহাকার দ্বিধাহীনভাবে মালিনীর ধর্মমতের সমর্থন জানিয়েছে। ক্ষেমংকরের ধর্মমতকে অস্বীকার করে এবং তার নির্দেশিত মত ও পথের বিরোধীতা করে, বন্ধুর প্রতি কর্তব্যহীনতার হৃদয় বিদারক বেদনার গভীরতা সুপ্রিয়কে ক্রমশ শুদ্ধস্নাত করে তুলেছে। তার প্রত্যয়-সিদ্ধ মনটি আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে নিঃশেষ নির্মলরূপে বিকাশ লাভ করতে চেয়েছে। ধর্মবোধটি অবরুদ্ধ থাকেনি, থাকতে চায়নি। সে অনুতাপ দীর্ণ বক্ষ ভেদ করেও নবধর্মের স্বীকৃতিবাণী উচ্চারণ করেছে।

মালিনীর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষেমংকর সম্পর্কে সে যা বলে তার মধ্য দিয়ে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সুপ্রিয়র নিজের চরিত্রও পরিস্ফুট। সে বলে—

'বন্ধু, ভাই,
প্রভু। সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ ; বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহপাশ। বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটল চিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান।......
লৌহময় তরী
হোকনা যতই দৃঢ়, যদি রাখে ধরি
বক্ষতলে ক্ষুদ্র ছিদ্রটিরে, একদিন
সংকট সমুদ্র মাঝে উপায় বিহীন
ডুবিতে হইবে তারে। বন্ধু চিরন্তন,
তোমারে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন।

এই বন্ধু ভাই প্রভু সূর্যরূপ ক্ষেমংকরকে ডুবিয়ে সুপ্রিয় স্বস্তিবোধ করেনি বা মালিনীর ধর্মমতে আস্থা স্থাপন করে বন্ধু তথা আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রতিভূ

ক্ষেমংকরের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করতে পারেনি। মনের নিভৃততম প্রদেশে তাই বিশ্বাসঘাতকতার বিষবাষ্প পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় তার মন ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তাই রাজহস্ত থেকে পুরস্কার গ্রহণের বিষয়টি প্রচণ্ড মানসিক বিক্ষোভের কারণ হয়েছে।

রাজহস্ত হতে পুরস্কার।
কী করেছি? আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
করেছি বিক্রয়—আমি তারি বিনিময়ে
লয়ে যাব শিরে করে আপন আলয়ে
পরিপূর্ণ সার্থকতা? তপস্যা করিয়া
মাগিব পরমসিদ্ধি জন্মান্ত ধরিয়া—
জন্মান্তরে পাই যদি তবে তাই হোক—
বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্তস্বর্গলোক
চাহিনা লভিতে।

একদিকে তীব্র অনুপাতজনিত আত্মযন্ত্রণা, অন্যদিকে মালিনীর নব-ধর্মের প্রতি আস্থাবোধ,—

ও গো দেবী জ্যোতির্ময়ী তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

কিম্বা, আর কিছু চাহিব না—
দিতেছ নিখিলময় যে শুভ কামনা
মনে করে অভাগারে তারি এক কণা
দিয়ো মনে মনে।

কিম্বা সে যখন ক্ষেমংকরকে জানায়—

মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীনমর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবন বিহীন;
ওই দুটি নেত্রে জলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্ব শাস্ত্রে লিখা
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেম স্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।

তখন আর সন্দেহ থাকে না যে মালিনীর ধর্মমতে সুপ্রিয়র অনুমাত্র সংশয়

আছে। ক্ষেমংকরের কাছে অকপটে সব স্বীকার করে সুপ্রিয় অন্তর্দাহের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। অন্তর্দাহের আগুনে পুড়ে তার ধর্মমতটি তাই আরো স্পষ্ট ও সংশয়াতীত হয়ে ওঠে। তরঙ্গহীন সরোবরের বুকে, বর্ষণমুক্ত আকাশের নীচে শ্বেত শতদলের মত সে স্নিগ্ধকান্তিযুক্ত। নির্বেদঅন্তে মালিনীর ধর্মমত পরীক্ষিত হয়ে ব্যক্ত হয় তার কথায়।

> হে দেবী তোমারি জয়। নিজ পদ্মকরে
> যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
> জ্বালায়েছ—আজি হল পরীক্ষা তাহার
> তুমি হলে জয়ী। সর্ব অপমান তার
> সকল নিষ্ঠুরাঘাত করিনু গ্রহণ।'

মালিনীর ধর্মমতের প্রতি চরম স্বীকৃতি ও বন্ধু ক্ষেমংকরের প্রতি বিশ্বাসহীন আচরণজনিত আত্মপীড়া এই দুই ভাবের সূক্ষ্মদ্বন্দ্বে সুপ্রিয় চরিত্র আন্দোলিত। এই ভাবগুলির পুষ্টি সাধনের সহায়ক শক্তি তার ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা। তার চরিত্রে দ্বন্দ্ব তাকে তীব্র আত্ম-যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছে। তার মনের এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সে সচেতন। এই দ্বন্দ্বের আগুনে পুড়ে এবং মানসিক সংকটের তীব্র আলোড়নের মধ্য দিয়ে সে তার উপলব্ধ ধর্মবোধটির প্রতি চরম বিশ্বাসের প্রমাণ রেখেছে। ক্ষেমংকরের কাছে তার অপরাধী মনটিকে সে বিনা দ্বিধায় মুক্ত করে দিয়ে বন্ধু হস্তের করুণ বিচার সে মেনে নিয়েছে। একান্ত অসহায় ভাবে নয়, নবধর্মের প্রতি চরম বিশ্বাসের স্বীকৃতি জানিয়ে—'বন্ধু তাই হোক।' নাটকের প্রথমপর্বে ক্ষেমংকরের ব্যক্তিত্ব ও বন্ধুত্বের আকর্ষণে সুপ্রিয়কে 'সংশয়ের স্রোতে' ভাসমান দেখা যায়। তার দোলাচলবৃত্তি এই পর্বে প্রকট। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে তার মানসিকতা সমস্ত সংশয়ের উর্ধ্বে একটি দৃঢ় বিশ্বাসের বিন্দুতে এসে আশ্রয় পেয়েছে। ক্ষেমংকরের সঙ্গে এই পর্বে তার দেখা হলেও সুপ্রিয়র মনে নতুন কোন সংশয়ের সৃষ্টি করেনি। দ্বন্দ্ব ও নির্বেদমুক্ত মনে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে দেবীর জয়ধ্বনি করে নবধর্মের প্রতি দ্বিধাহীন আস্থা প্রকাশ করেছে।

৩। চতুর্থ দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকের ভাবাদর্শটি পরীক্ষার ভিত্তিতে গ্রহণ করার বিস্তৃত ক্ষেত্র রচনা করেছেন। মূল দ্বন্দ্ব এখানে আরও সংহত ও সূক্ষ্মসূত্র সৃষ্টি করে সুপ্রিয়ের মনে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে এবং অবশেষে মানসিক ভাব বিপ্লবের অবসানে শুভস্নাত দ্বন্দ্বাতীত মনে সুপ্রিয় দেবী মালিনীর জয়ধ্বনি করে এই কথাই আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, নাটকের মূল বক্তব্য

অবারিত হয়ে ধর্মতত্ত্বের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করে 'বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।' মালিনীর অন্তরের 'অপরিমেয় করুণা' তার অন্তঃকরণে স্থিত 'পরিপূর্ণ মানব দেবতা' সুপ্রিয়ের চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে তার 'যথার্থ স্বরূপ' প্রকাশ করেছে। মালিনীর 'বিদ্যুন্ময়ী বাণী' স্তব্ধ হয়ে গেছে কিন্তু সেই বজ্রালোকে-র আগুনে দীপ্তচিত্ত সুপ্রিয় দেবী মালিনীর ধর্মোপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মালিনীর ধর্মমত পরীক্ষিত হয়ে সর্বমানবলোকে প্রবেশের অধিকার এমনি ভাবেই লাভ করেছে। এর পরে নাটকের শেষে মালিনীর সর্বশেষ উক্তি বিচারের প্রসঙ্গ। নাটকের শেষে মালিনীকে আমরা কোনক্রমেই আর দেবী মালিনী রূপে দেখতে পাই না। মালিনী তখন রক্তে মাংসে গড়া মানবী মালিনীতে রূপান্তরিত। ক্ষেমংকরকে সুপ্রিয়-হত্যার শাস্তির জন্য, রাজা যখন ঘাতককে খড়্গ আনতে বললেন, তখনই মালিনীর মুখ দিয়ে নির্গত হলো পরম ক্ষমার বাণী—'মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমংকরে।' মালিনীর মুখনিঃসৃত এ জাতীয় উক্তি এই নাটকের ভূমিকায় কথিত রবীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে অপূর্ব সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করেছে। মালিনীর দেবসত্তার অবসানে তার মুখ থেকে এই ধরণের ধর্মবাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকাপাত ঘটানোর ব্যাপারে আপাত অসঙ্গতি লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রিয়তম হন্তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা মালিনীর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব। মালিনী অভিজ্ঞতার সূত্রে জেনেছে সত্য তথা নিত্য ধর্মের প্রবক্তা দেবী মালিনীর ধর্মবাণী মিথ্যা নয়। প্রাণ দিয়েও সেই ধর্মমতের সত্যতা প্রমাণ করেছে সুপ্রিয়। যে ধর্মমতের প্রবক্তা স্বয়ং সে, সেই ধর্মমতের পরীক্ষিত সত্যতা সম্পর্কে মানবী মালিনীর আর সংশয় থাকেনি। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে দেবী মালিনীর ধর্মধারণায় নিঃসংশয়ে বিশ্বাসিনী হতে পেরেছে। তাই যথা সময়ে তার উক্তি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়ে ধর্মের সত্য বাণীটিকে মূর্ত করে তুলেছে, 'মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমংকরে।'

এই নাটকে ধর্মপ্রেরণা তত্ত্বের গভীরে হারিয়ে যায়নি। কিম্বা আবির্ভাব জনিত উত্তেজনার অবসান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি,—সে অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করে দ্বন্দ্বাতীত সত্তায় পরিণত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই প্রকাশের আলোকে মানবী মালিনীর নব চৈতন্যোদয় ঘটেছে। সে বন্ধনমুক্ত হয়ে 'বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে' পেরেছে।

কৃষ্ণ ধর

মস্কো থেকে দেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

মস্কোতে এসে হঠাৎ যদি বাংলা কথা শোনা যায় তাহলে চমক ও আনন্দ দুইই মন ভরিয়ে দেয়। হোটেল রোসিয়ায় খাবার ঘরে যাবার মুখে শুনি কে একজন বলছে, এই কামরুদ্দিন শোন তো।

ফিরে দেখি তিনটি অল্পবয়সী যুবক। পরণে পাঞ্জাবি, পাজামা। দেখেই বুঝলুম বঙ্গসন্তান। ওরা আমাদের ঠিক ঠাহর করতে পারছিলনা। আমাদের পরণে কোটপ্যান্ট, গলার টাই। গায়ের রঙে ঠিক কোন দেশের চেনা যায়না এই বিদেশে। পাকিস্তান বা সিংহলের হলেও তো হতে পারি। কিন্তু ওদের পোশাকেই এবং মুখের ভাষায় বলে দিল, বাংলাদেশ থেকে এসেছে ওরা।

'আপনারা বাঙালী নিশ্চয়ই।' আমি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করি।

শর্মাজী, মূর্তি ও নায়ার কৌতূহলী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। কালুগিনও।

আপনিও তো বাঙালী। ছেলেটি বলে, আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা। এখানে এসেছি চিকিৎসার জন্য। আমরা পঞ্চাশজন আহত হয়ে এসেছি সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে এখানকার হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে।

আমি বললাম, আপনাদের দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। বিদেশে বাংলা কথা শুনে এত ভাল লাগছে যে কি বলব।

'আমাদেরও।' ছেলেটি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

আমার সহযাত্রীরা বললে, তোমরা বাঙালীরা যে নিজের ভাষায় কথা বলছো, কিছু বুঝতে পারছিনা। আমাদেরও আনন্দের ভাগ দাও।

আমি বললাম, ছাখো আমরা বাংলাভাষীরা একসঙ্গে মিললেই নিজেদের ভাষায় কথা বলতে ভালবাসি! আমরা এক ভাষার কিন্তু দুই দেশের লোক। আমি পশ্চিমের ওরা পুবের। একই ছিলাম আমরা, এখন এক থেকে দুই। তবু প্রাণের টানে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি। বাংলাদেশের জন্ম হওয়াতে বাংলাভাষা ও বাঙালীর প্রতি পৃথিবীর নজর পড়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরাও যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছে পুবের বাংলাকে যা এতদিন পাকিস্তানের লোহার বর্মে ছিল ঢাকা।

আমি বললাম, জানো একদিন আমারও দেশ ছিল ওই পুবের বাংলাই। ওখানেই আমার জন্ম। ষোল বছর বয়সে ইস্কুলের পড়া শেষ করে চলে আসি কলকাতায়। কলেজ ও য়ুনিভার্সিটির পাঠ কলকাতাতেই। তখনও ছুটিতে দেশে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম! শরতের শিউলি ফুটলে কিংবা বৈশাখে আমের বোল ধরলেই মন ছুটে যেত পদ্মা পেরিয়ে যেখানে আমার ছোট্ট গ্রাম আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সাতচল্লিশে দেশভাগ হল। তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি আমাদের জন্মভূমি সত্যিই বিদেশ হয়ে যাবে। বাবা মা ভাই বোনেরা তখনও ছিলেন গ্রামে। পঞ্চাশের দাঙ্গায় সব হারিয়ে খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে সব চলে এলেন।

আমার দেশ চিরকালের জন্য বিদেশ হয়ে গেল।

ছেলেটি বললে, এবার আসুন। নিজের দেশ দেখে যান। আমরা নতুন মানুষের জন্য বাংলাদেশ গড়ব। তার জন্যেই দিয়েছি এত রক্ত।

'এই রক্ত দেওয়া যেন ব্যর্থ না হয় ভাই।' আমি বলি, 'তোমরা তো জানো কত বড় ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দেশ তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এককোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল দরিদ্র ভারত মানবতার তাগিদে। আমাদের সৈন্যের বুকের রক্তে তোমার বাংলাদেশের মাটি হয়েছে লাল। এ যে রক্তের ঋণ। ভুলোনা।'

ছেলেটি আমার হাত দুহাতে মুঠো করে বললে, আমরা কি ভুলতে পারি?

মস্কোর হোটেলে বসে আমি যেন একসঙ্গে ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা উল্টিয়ে গেলাম। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭২। এ ইতিহাস অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গেল। আমি জানিনা আমার সহযাত্রীরা ঠিক এমন করে বাংলার ভাগ্যবিবর্তনের ইতিহাসকে দেখেছিলেন কিনা।

রক্ত জলের চেয়ে গাঢ়তর। ভাষা ও সংস্কৃতির টান রক্তের মতোই গাঢ়। পুব ও পশ্চিম একই ভাষা ও একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

মস্কো খুব পুরনো শহর। পাঁচ শো বছর তার বয়স। জারের আমলেই মস্কো ইয়োরোপের অন্যতম আকর্ষণ। রুশ জাতির বিবর্তনের ইতিহাসে মস্কোর স্থান বিশিষ্ট ও অনন্য।

বিপ্লব সুরু হয়েছিল পেট্রোগ্রাডে। পরে তার নাম হয় লেনিনগ্রাদ। কিন্তু মস্কো দখলের পরেই সোভিয়েট শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয় পশ্চিম ইয়োরোপ।

মস্কো রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্র। তার ক্রেমলিন নতুন রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। এত বৃহৎ শহরকে অল্প সময়ে জানা যায় না। জানবার চেষ্টাও হবে বাতুলতা।

মস্কো ক্রমশ তার পরিধি বাড়াচ্ছে। আমাদের কলকাতা যেমন বাড়ছে তো বাড়ছেই। পার্থক্য এই এ শহর অগোছালো নয়। অপরিকল্পিত নয় এর বৃদ্ধি। সুদৃশ্য, সুশৃংখল এবং নয়নাভিরাম এই শহর। সংযত, গম্ভীর কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। সোভিয়েট শক্তি প্রতিষ্ঠার পর এর কোনো অতীত নিদর্শন নষ্ট করা হয়নি। জারের আমলের বিশাল বিলাস প্রাসাদগুলোকে রূপান্তরিত করা হয়েছে ম্যুজিয়মে। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে পরিণত করা হয়েছে আরোগ্যশালা বা গ্রন্থাগারে।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সত্তর বছর বয়সে রাশিয়া পরিদর্শনে এসেছিলেন। বিপ্লবের বারো বছর পর। সোভিয়েট রাষ্ট্র ঘোষণার আট বছরের মধ্যে তিনি এদেশের বিরাট কর্মকাণ্ড দেখে অভিভূত হয়েছিলেনও। সেই কর্মযজ্ঞ এখনও চলেছে সমানে। এই পঞ্চাশ বছরে গোটা দেশের চেহারা গেছে পাল্টে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ এক মহাশক্তি। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র অর্থনীতিতে, সমাজ উন্নয়নে, উৎপাদন ব্যবস্থায়, বিজ্ঞান গবেষণায় আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি।

মস্কো শহরে এলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবলি নিত্যনতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায়। নতুন নতুন আবাসগৃহ শ্রমজীবীদের জন্য। অপরিচ্ছন্ন, রং ধুয়ে যাওয়া কিংবা জীর্ণ ঘরবাড়ি একটিও চোখে পড়েনি। সবই তকতকে, ঝকঝকে। দেখেই মনে হয় রাষ্ট্রের সতর্ক ও সযত্ন চক্ষু সব সময়ে শহরটিকে লাবণ্যময় করে রাখছে।

আমাদের কলকাতায় একটি মাত্র ময়দান, এই জনাকীর্ণ শহরের ফুসফুস। তাকে শ্বাসরোধ করে মারার জন্য চারদিক থেকে কত চেষ্টা। মস্কো শহরে খানিক দূরে দূরেই প্রশস্ত পার্ক, খেলার জায়গা, বেড়াবার মাঠ। শহরটাকে গাছে গাছে শ্যামল করে রাখা হয়েছে। আমি গেছি সেপ্টেম্বরে। তখন ফুল ফোটার সময় নয়। কিন্তু সবুজের সমারোহ তখনও। কত যত্নে তারা শহরের কংক্রিট পরিবেশকে করে রেখেছে সবুজ তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কলকারখানা তো বিস্তর। কিন্তু শহরে কোনো ধোঁয়া নেই, ধোঁয়াশা নেই। কোথায় কীভাবে যে তারা শহরটিকে ধোঁয়া মুক্ত রেখেছে জানিনে। আমাদের বিশেষজ্ঞরা এসে তা দেখে গেলে পারেন।

মস্কোভা নদী খুব বড় নয়। শহরের গায়ে একে একটি বড় খাল মনে হয়। এই নদীটিকে তারা ব্যবহার করছে নানা কাজে। স্টীম বোট, ছোট জাহাজ চলাচল করে। বেড়াবার জন্য আছে প্রমোদতরণী। কয়েকবছর

আগে কলকারখানা থেকে ফেলে দেওয়া আবর্জনায় মস্কোভার জল দূষিত হয়ে গেছল। মাছ পাওয়া যাচ্ছিল না। রাশিয়ানদের প্রিয় ক্যাভিয়ার হয়ে উঠল দুষ্প্রাপ্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেল জল খারাপ হয়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। তক্ষুনি নির্দেশ গেল কারখানাগুলোতে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেফিউজ নদীতে ফেললে ম্যানেজারের শাস্তি হবে। তখন জল পরিষ্কার! আবার মাছ পাওয়া যাচ্ছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, কয়েকজন মৎস্য-শিকারী ছিপ ফেলে বসে আছেন। মাছ উঠবে।

দিনটা ছিল রবিবার। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই সাতটা। গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হতে সময় লাগল। একটু ঠাণ্ডাও লেগেছিল। প্রথম রাতে ভুলে কম্বল গায়ে না দিয়ে শোবার ফল। এক কাপ গরম চায়ের জন্য তৃষিত হয়ে আছি। এখানে হোটেলের ঘরে পালঙ্কে চা দেবার রেওয়াজ নেই। এ সমস্ত বুর্জোয়া-বিলাস। আমাদের বাবুদের তো ঘুম থেকে উঠে বিছানাতেই এক কাপ গরম চা কি কফি না হলে চলে না।

একটা গল্প শুনিয়েছিলেন মস্কো-বাসী সুন্দরম্। একবার আলি জাহির মশায় এসেছেন মস্কোতে। লখনৌ-র খানদানী ব্যক্তি। মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়েছিলেন। আরাম কাকে বলে তা ভালভাবেই জানেন। ঘুম থেকে উঠেই বেল বাজালেন। কোনো সাড়া নেই। জাহির সাহেব বিরক্ত। আমাদের দেশে তো বেল বাজাতে না বাজাতেই দোরগোড়ায় বরকন্দাজ হাজির। কী চাই? এখানে তার পাত্তা নেই। কয়েকবার বেল বাজাবার পর টেলিফোন সজীব হয়ে উঠল: কেন ডাকছেন?

'বেড টী চাই। এক পট চা নিয়ে আসুন ঘরে।'

'কেন? আপনি কি অসুস্থ?' ওপার থেকে প্রশ্ন। 'রেস্তোরাঁয় এসে চা খেয়ে যান।

একমাত্র অসুস্থ হলেই ঘরে চা ও খাবার দেবার নিয়ম।

জাহির সাহেব বুঝলেন, এ দেশ ঠিক অন্য দেশের মতো নয়। আমাদের নবাব-বাদশা, জমিদারেরা অনেক আরাম শিখিয়ে গেছেন আমাদের। এদেশেও জারের আমলে আরাম-বিলাসিতার অন্ত ছিল না। এখন আরাম মানেই হারাম। কাজ করো, গায়ে-গতরে খাটো, খাও, জীবনে নিশ্চিতি আনো।

পোষাক-আশাক পরে চা কফি সকাল বেলার ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিই।

সাশা বললে, চলো আজ লেনিন সমাধিতে যাব।

লেনিনই সব। লেনিন সর্বত্র। মস্কোতে নেমে যেদিকে তাকাই বড় বড় অক্ষরে লেনিনের কথা, লেনিনের নির্দেশ। কাজ করো, সজাগ থাকো, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েটকে মজবুত করো।

লেনিনের প্রতিকৃতি, তাঁর ডান হাত এগিয়ে দিয়ে কথা বলার ভঙ্গিতে স্ট্যাচু বহুজায়গায়।

আমাদের হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয় ক্রেমলিন। ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে।

কৃষ্ণমূর্তি অনেক আগেই প্রস্তুত। নায়ার চুলটা আঁচড়ে নিয়ে গায়ে কোট চাপিয়ে লাউঞ্জে এসে দাঁড়ায়। শর্মাজীর সঙ্গে কারা দেখা করতে এসেছিল। ওর জন্যে খানিক অপেক্ষা করতে হল। ন'টা নাগাদ সবাই হেঁটে রওনা হলাম রেড স্কোয়ারের দিকে। সেদিন রবিবার। ছুটির দিন। সাধারণত ছুটির দিনেই লেনিনের স্মৃতিসৌধ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ক্রেমলিন কথার রুশ অর্থ হল দুর্গ। মস্কো নদীর তীরে প্রাচীর ঘেরা এই দুর্গের ভিতরে ছিল জারের প্রাসাদ। এখান থেকেই শাসিত হত তাদের বিশাল সাম্রাজ্য। অক্টোবর বিপ্লবের পর ক্রেমলিনেই স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সরকারের মন্ত্রণালয়। লেনিন বাস করতেন এখানেই।

বিপ্লবের পর খুব বেশি সময় তিনি পাননি। ১৯২৪ সালেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রতিবিপ্লবী আততায়ীর গুলির আঘাতে আহত হয়েছিলেন তিনি এর আগে। সেই আঘাতই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ বলে সবার অনুমান।

সোভিয়েট তখন একটা শিশু রাষ্ট্র। তার চারিদিকে শত্রু, ভিতরে শত্রু। লেনিনের মরদেহ নষ্ট হতে দেওয়া হল না। কাঁচের কফিনে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় সেই অতুলনীয় বিপ্লবী যোদ্ধা, শিক্ষক ও দার্শনিকের মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় রাখা হল ক্রেমলিনের সামনে বিশেষ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে। আড়ম্বরহীন এই স্মৃতিসৌধ। তার প্রবেশ তোরণে রুশ অক্ষরে খোদাই করা একটি নাম—লেনিন। রেড স্কোয়ারের মুখোমুখি। তারই ভিতরে চিরনিদ্রায় শায়িত ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (লেনিন)। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন আজ শুধু রাশিয়ার নেতা নন, দুনিয়ার সর্বত্র শোষিত মানুষের প্রিয় নেতা।

ক্রেমলিনের ভিতরে ছুটির দিনের ভীড়। কত দেশের মানুষ এসেছে। দেখছে সাগ্রহ বিস্ময়ে। এই ক্রেমলিন ইতিহাসের সাক্ষী। তার বিরুদ্ধে

কত কুৎসা। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি। প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন সব নিখুঁত ভাবে রাখা। কোন কিছু নষ্ট হতে দেওয়া হয়নি। ১৯২৪ সালে যেমন ছিল তেমনি। রুশরা নতুন দেশ, নতুন সমাজ গড়ছে। কিন্তু ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত নন। শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ঐতিহ্যে তারা গৌরব বোধ করে। লেনিনই তাদের এ কথা শিখিয়েছেন।

ক্রেমলিন ঘুরে দেখে ফিরে আসি রেড স্কোয়ারে। প্রাচীন রুশে রেড মানে সুন্দর। সেই থেকেই এই সুদৃশ্য চকটির নাম হয়েছে রেড স্কোয়ার। গত পঞ্চাশ বছরে এই রেড স্কোয়ার পেয়েছে জগৎ-জোড়া খ্যাতি। নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী দিবসে এখানে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ ও সমরাস্ত্র প্রদর্শনী দেখবার মতো।

সাশা বললে, আর কিছুদিন পরে এলে নভেম্বর প্যারেড দেখতে পেতে।

আমি বললাম, থাকার তো ইচ্ছে। কিন্তু এখুনি, এই সেপ্টেম্বরে যা শীত, আমি কলকাতার বাবু বাঙালী নভেম্বরের শীত সইতে পারব না।

সাশা হেসে বলে, খুব পারবে। আমি তোমাদের বোম্বাইয়ে তিনবছর কাটিয়ে এলুম। যা গরম। তুমি শীতে মস্কোতে থাকতে পারবে না কেন? ইচ্ছে করলেই পারবে।

শুনেছি তোমাদের কলকাতায় গরম নাকি আরও অসহ্য।

কলকাতার কোন রকম বদনাম শুনলেই প্রতিবাদের ইচ্ছা করে।

আমি বলি, তা তেমন কি আর গরম। বিকেলে গঙ্গার হাওয়া পাবে। সমুদ্র যদিও দূর, সাগরের হাওয়াও আসে দক্ষিণ থেকে।

মনে হল না সাশা খুব আশ্বস্ত হল। বললে, আমার আবার বাংলাদেশে যাবার কথা।

'তাহলে তো কলকাতার কাছেই। গেলে অবিশ্যি একবার আসবে কলকাতায়।'

আমি আগাম নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখি।

রেড স্কোয়ারে তখন সুদীর্ঘ মানুষের সারি। ক্রেমলিন পেরিয়ে দক্ষিণের বড় রাস্তা অব্দি সেই প্রতীক্ষমান মানুষের সারি। পাশাপাশি দুজন করে। লম্বায় মাইল দেড়েক হবে।

ছাত্র, যুবক, শিশু, সেনাবাহিনীর লোক, কর্মী এবং অকর্মী সবাই সার দিয়ে লেনিনকে দেখবার জন্য দূর দূরান্তর থেকে, দেশ দেশান্তর থেকে ওরা সব এসেছেন।

সবাই নীরব, সুশৃংখল। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কোনো হুড়োহুড়ি নেই। কেউ অধৈর্য নয়।

দেবতার মন্দিরে প্রবেশের জন্যও এত শ্রদ্ধাবোধ, এত ধৈর্য, শৃংখলা কোনোদিন দেখিনি।

আমরা কোথায় দাঁড়াব?

সাশা বললে, এসো আমার সঙ্গে।

রেড স্কোয়ার তখন যেন মেলা। ক্রেমলিনের সঠিক বিপরীত দিকে হল মস্কোর অন্যতম বৃহৎ বিভাগীয় বিপণি—খুম। দোকানের ভিতরে ও বাইরে ভীড়। ফুটপাথে দুএকজন দাঁড়িয়ে মস্কোর ছবি বিক্রী করছে। আইসক্রীমও খাচ্ছে কেউ কেউ।

সারা চত্বরটা পাহারা দিচ্ছে সেনাবাহিনীর লোক।

সাশা এগিয়ে গিয়ে একজন সৈনিকের সঙ্গে কথা বলল। নিজের পরিচয় দিল। বললে, এরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। লেখক ও সাংবাদিক। লেনিনের স্মৃতিসৌধ দেখতে চান। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মতো কাজ হয়ে গেল। তরুণ সৈনিকটি আমাদের নিয়ে গিয়ে লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবার জায়গা করে দিল।

একমাত্র বিদেশীদের বেলাতেই তা করা হয়।

আমরা চারজন দাঁড়িয়ে গেলাম লাইনে। আমার পেছনে ছিলেন এক ভদ্রলোক, তার স্ত্রী এবং দুটি ছোট বাচ্চা।

ভদ্রলোককে দেখে এশিয়ার লোক বলেই মনে হল। আমি আন্দাজ করেছিলুম, দক্ষিণ ভারতের হবে।

তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোত্থেকে আসছেন? পাকিস্তান থেকে কি?

হঠাৎ পাকিস্তানের কথা ভদ্রলোকের কী করে মনে এল জানিনে। তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক খুব ভাল যাচ্ছিল না। আমাদের পোষাকে পাকিস্তানের কোনো চিহ্নও ছিল না।

বললুম, আমরা ভারতীয়।

ভদ্রলোক বললেন, আমি সিংহলী, মস্কো দূতাবাসে কাজ করি। চার বছর এখানে আছি। এবার দেশে ফিরছি। ফেরার আগে লেনিনকে আবার দেখে যাচ্ছি।

আমি বললুম, এই প্রথম।

—না, এ নিয়ে চারবার হলো।

লাইন এগোচ্ছে একটু একটু করে। নরম রোদে আমরা দাঁড়িয়ে। আরও অনেক মানুষ রেড স্কোয়ারের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের এবং লেনিন সমাধির দ্বাররক্ষী দুই তরুণ সান্ত্রীকে। নীল পোষাক-পরা দুই সান্ত্রী দরজার মুখে দু পাশে খোলা বেয়োনেট হাতে লেনিনের স্মৃতি সৌধে অতন্দ্র প্রহারায় নিযুক্ত। যেন চোখের পলকও পড়ে না এমন স্থির পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর পর হয় সান্ত্রী বদল। সেও এক দেখবার দৃশ্য। কত লোক দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী বদল দেখবার জন্যই।

সান্ত্রীদের পার হয়ে ঢুকলাম আমরা সমাধির ভিতরে। সিঁড়ি বেয়ে আরও একটু নিচে নেমে সমাধির গর্ভগৃহ। সেখানেও সান্ত্রীরা রয়েছে পাহারায়। টপ টপ জুতোর আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে টিনের ছাতে বৃষ্টি পড়লে এমনি অবিরাম জলধারার শব্দ শুনতুম। লেনিনের সমাধির ভিতরে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য তন্ময়তায় আমার মন চলে গেল শৈশবের দিনগুলিতে।

একটি বিরাট কাঁচের কফিনে শায়িত ছোটখাটো একটি মানুষ যাঁর নাম ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

পৃথিবীর ইতিহাসের গতি পাল্টে দিয়ে গেছেন বর্তমান শতাব্দীতে যে মানুষ তাঁর নাম লেনিন। তিনিই আমার চোখের সামনে মহাসমাধিস্থ। বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার জন্মেরও আগে লেনিনের জীবনাবসান। আর আজ আমি তাঁর মৃত্যুর ৪৮ বছর পর তাঁর মৃতদেহ দেখছি. অবিকৃত, অবিকল।

আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা লেনিনের মৃতদেহ রক্ষা করেছেন উত্তরকালের মানুষের জন্য। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম।

কালো স্যুট, কালো টাই পরা সেই মানুষটি। সেই উন্নত ললাট, ভ্রূযুগলে তেমনি বিপ্লবীর সংকল্প। শুধু দেখতে পেলুম না সেই উজ্জ্বল চোখ। মহানিদ্রায় তা চিরকালের জন্য নীমিলিত।

'লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।'

সুকান্তর কবিতার কথাই আমার মনে পড়ছিল লেনিনের মুখের দিকে তাকিয়ে। বাংলার এক কিশোর সেদিন বলতে পেরেছিল 'বিপ্লবস্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।'

লেনিন শতাব্দীর বিস্ময়। তিনি বিপ্লবের আগুন জ্বালান এক হাতে, অন্য

হাতে দুঃখী মানুষের চোখের জল দেন মুছে। তিনি শিল্পীর মতো গড়েন দেশের প্রতিমা। ভালবাসা না থাকলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। এই ভালবাসাই লেনিনকে দিয়েছিল প্রেরণা রুশদেশকে পাল্টে দিতে। আজ দুনিয়ার মানুষ এই মানুষটির উদ্দেশে হৃদয়ের সব ভালবাসা দিচ্ছে উজাড় করে।

মাত্র কয়েক মিনিট দেখার সুযোগ মেলে প্রত্যেকের। রেলিং দিয়ে ঘেরা শবাধার। সেটি প্রদক্ষিণ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে যায় সবাই। মিছিল চলেছে সামনে এবং পিছনে। দাঁড়াবার জো নেই। সমস্ত মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত লেনিনের প্রতি। শেষ বারের মতো লেনিনকে দেখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসি।

ক্রেমলিনের বাইরের দেওয়ালের পাশে রুশ নায়কদের সমাধি এবং প্রতিকৃতি। দেখলাম স্ট্যালিনের একটি নতুন প্রতিকৃতিও রয়েছে। জে, ভি, স্ট্যালিন অন্য আর পাঁচজন রুশ নেতার মতোই একটি নাম। তাঁর সব স্মৃতি মুছে ফেলা হয়েছে। ব্যক্তিপূজার সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি ওরা ভুলে যেতে চান। অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল তাদের। তবে সবটাই কি মুছে ফেলার? কিছুই কি তাঁর ছিল না মনে রাখবার মতো, তুলে ধরবার মতো?

এ প্রশ্ন আমার মনে উঁকি দিয়েছে বার বার। মস্কোর এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিগ্যেস করেছিলাম।

জানতে চেয়েছিলাম, ওরা কি ভাবেন দেশের নেতাদের বিষয়ে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ইংরেজি জানেন না। নায়ার ওকে একটি বিড়ি দিল। ম্যাঙ্গালোরের বিড়ি, বিখ্যাত।

নায়ার বিড়ি ছাড়া কিছু খাননা। ড্রাইভারটি প্রথমে ইতস্তত করল। ভাবলে বোধ হয় মারিজুয়ানা হবে। নায়ার হেসে বললে, ভয় নেই। এহল পিপলস্ সিগারেট।

স্পাসিব।

ড্রাইভার একটি বিড়ি ধরালে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্যাকেট থেকে কসাক সিগারেট দিল আমাদের সবাইকে।

বিড়িতে টান দিয়ে বললে, চমৎকার।

শর্মাজী ততক্ষণ চুপ করেছিলেন। বললেন, এ হলো হাতে তৈরি। শ্রমিকরা নিজের হাতে তৈরি করে। কোনো মেসিন লাগে না। দেখছো তো কত সুন্দর জিনিষ বানাতে পারে আমাদের শ্রমিকরা।

ড্রাইভারটি বয়স্ক। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স। ভারী গলায় রুশীতে বলল, দুনিয়ার শ্রমিক এক জাত।

আমি বললুম, কেমন চলছে তোমাদের দেশ।

ও বললে, ভাল, খুব ভাল। ও সব লীডাররা জানেন। আমাদের লেনিন যে পথ দেখিয়ে গেছেন সে পথেই চলছে দেশ।

'কী ভাবো লেনিন সম্পর্কে!'

'মহান লেনিন। খরোশো নেতা।'

'স্টালিন!' আমি বলবার আগেই শর্মাজী প্রশ্ন করেন, খুব খারাপ লোক ছিল!

নিয়েৎ! ড্রাইভার মাথা নাড়ে, স্ট্যালিন খরোশো।

কেন স্ট্যালিন খরোশো সে কথা আর জিগ্যেস করার সময় হয়নি। এর বেশি ও কিছু বলল না।

সুন্দরমও বলেছিলেন, স্ট্যালিনের সময়ে বাড়াবাড়ি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়ার কাজে স্ট্যালিনের ভূমিকা নিয়ে আবার নতুন মূল্যায়ন হচ্ছে এদেশের বুদ্ধিবাদী মহলে।

শর্মা বললেন, খ্রুশ্চভ তো স্ট্যালিনকে শবাধার থেকে তুলে এনে কবর দিয়ে দিলেন।

সুন্দরম বললেন, খ্রুশ্চভের কবর কোথায় তা বোধ হয় রাশিয়ানরা জানেও না। খ্রুশ্চভের মৃত্যু সংবাদ মাত্র চার লাইন ছাপা হয়েছিল।

নায়ার বললেন, খ্রুশ্চভকে আমি পছন্দ করতুম। ভারতবর্ষের বন্ধু ছিলেন তিনি। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এই মানুষটির দান অসামান্য। খ্রুশ্চভের মৃত্যুর পর আমি কেরালা ইসলামের পক্ষ থেকে একটি শোকবার্তা পাঠিয়েছিলাম।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অনেক মানুষ আসেন, চলে যান। কেউ কেউ থাকেন অবিস্মরণীয় হয়ে। কলকাতায় যখন বুলগানিন ও খ্রুশ্চভ এসেছিলেন তখন গোটা শহর ভেঙে পড়েছিল তাঁদের দেখতে। এ কি শুধু লোক দুটিকে দেখবার জন্য? তা নয়। এই প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই সর্বোচ্চ নেতা এলেন ভারত সফরে। শ্বেতাঙ্গদের এত কাল আমরা দেখে এসেছি প্রভু হিসেবে। শাসনদণ্ড নিয়ে তারা এসেছিল ভারতবর্ষে। এরা শ্বেতাঙ্গ এবং ইয়োরোপীয়। কিন্তু এঁরা এসেছিলেন লেনিনের দেশের জননায়করূপে, স্বাধীন ভারতবর্ষের কাছে মৈত্রীর বাণী নিয়ে। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম

লক্ষ মানুষের ভীড়ে আমাদের বন্ধু, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের দুই নেতাকে দেখবার জন্য। খোলাগাড়িতে ওঁরা যাচ্ছিলেন। শাদা রঙের পোষাক-পরা। মাথায় শাদা টুপি খুলে জনতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। লাল টকটকে চেহারা। শুনলুম আমার পাশে দাঁড়ানো এক বুড়িমা তার নাতনীকে বলছেন, হ্যাঁ রাজার মতো চেহারা বটে। কী গায়ের রঙ। চোখ দুটো কী নীল!

রাজা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি তিনি। শাদারা যে আমাদের দেশে দুশো বছর রাজত্ব করে গেছে।

আমি বললুম, বুড়িমা ওরা রাজা ন'ন। আমাদের মতোই সাধারণ ঘরের মানুষ। রাজাদের তাড়িয়ে ওদের দেশে মজুরদের রাজত্ব কায়েম করেছেন।

আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কথাটা বিশ্বাস হল না।

মজুররা আবার রাজা হবে কি! ওরা তো শুধু খাটবে, হুকুম তামিল করবে।

ইংরেজরা আসার আগেও রাজা বাদশারাই দেশ শাসন করেছে আমাদের। রামচন্দ্রও রাজাই ছিলেন। রাজা ও প্রজা এই দুটি জাত নিয়েই আমাদের ইতিহাস। দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের দেশের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের কাছে রাজা বদলই হল সত্যি। শিক্ষার প্রসার ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। এই অশিক্ষা একদিন রাশিয়াতেও ছিল। তবে শাসিত সাম্রাজ্যে শিক্ষার সুযোগ ছিল ধনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য। সাধারণ মানুষের কাছে তা ছিল দুষ্প্রাপ্য। লেনিন সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে প্রথমেই জোর দিয়েছিলেন ব্যাপক গণশিক্ষার ওপর। প্রতিটি মানুষই এখন শিক্ষিত। অন্ধ মূঢ় আনুগত্য সামন্ততন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তাকে রক্ষাও করা যায় না।

বার বার আমার মনে এল নিজের দেশের কথা। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের অবস্থার অনেক মিল ছিল। ভারতের মতোই রাশিয়া বহু জাতি ও বহুভাষার দেশ। রুশ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনার সময় এই দিকটির ওপরই বেশি জোর দিয়েছি। সোভিয়েট থেকে আমরা কি শিখতে পারি? মস্কো য়ুনিভার্সিটির ছাত্র আনাতোলির উজ্জ্বল উৎসাহ ভোলবার নয়। ইতিহাসের ছাত্র। গোটা ইতিহাস তার নখ দর্পনে। এক সঙ্গে কফির টেবিলে বসে গল্প হচ্ছিল।

আনাতোলি এসেছে ভ্লাদিভোস্টক অঞ্চল থেকে। ওরা বলে সোভিয়েট ফার ঈস্ট। দূর প্রাচ্যই বটে। মস্কোতে রয়েছে সোভিয়েট অর্থনীতিক কৃতিত্বের স্থায়ী প্রদর্শনী। বিশাল এলাকা দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন। প্রায় একশো প্যাভিলিয়ন। এক একটিতে রয়েছে সোভিয়েট অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের পরিচয়। রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতির নিদর্শন। মিনিবাসে করে যাত্রীরা গোটা প্রদর্শনী ঘুরতে পারে। এক একটি প্যাভিলিয়নের সামনে নেমে ঢুকলে গাইড সব বুঝিয়ে দেন। আনাতোলি তেমনি একজন গাইড। য়ুনিভার্সিটির ছাত্র। অবসর সময়ে এই কাজ করছে ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করার জন্য। আনাতোলি ইংরেজি শিখছে। তেইশ বছরের যুবক। ছ'ফুটের ওপর লম্বা। সাধাসিধে পোষাক। সরল চোখ মুখের চাওনি।

'তোমার দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক মিল।' আমি বলি।

আনাতোলি ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু শুনেছে। খুব ভাল জানে না।

'শুনেছি তোমাদের দেশে যোগী আছে, গণক আছে যারা ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে।' আনাতোলি হাসতে হাসতে বলে।

'আছে তারা। কিন্তু ভবিষ্যৎ বলতে পারে কিনা জানিনে। তার চেয়ে তোমরা ভালো ভবিষ্যৎ বলতে পারো। বর্তমান যার হাতের মুঠোয় তারাই তো দিতে পারে ভবিষ্যতের হদিশ।' আমি বলি।

আনাতোলি মাথা নাড়ে। আমার সহযাত্রী কৃষ্ণমূর্তি ওকে একটি হায়দরাবাদী কাজ করা রূপোর পদক উপহার দেয় স্মারক হিসেবে।

উপহার পেয়ে সে খুব খুশি। আমাদেরও কয়েকটি স্মারক পদক সে দেয় প্রদর্শনীর।

আনাতোলি যখন ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল এক একটি প্যাভিলিয়ন, তার চোখে মুখে এবং কথায় পেয়েছি জাতির কৃতিত্বের জন্য গৌরববোধ।

'এটা হল লুনাখোদের মডেল।' আনাতোলি বলে, 'আমরা চাঁদে পাঠিয়েছিলাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য।' গাগারিন যে মহাকাশযানে পাড়ি দিয়েছিলেন মহাশূন্যে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ, তার মডেলটিও দেখলাম। আরও বিচিত্র সব মডেল, মহাকাশযাত্রীদের পোষাক, সূক্ষ্মযন্ত্রপাতি। দলে দলে লোক আসছে, দেখছে। সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে গাইড। তরুণ তরুণী। স্কুলে যেভাবে শিক্ষকরা পড়া বুঝিয়ে দেন ঠিক সেরকম ওদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা।

আমি আনাতোলিকে বলি, তোমরা তো চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারলে না। আমেরিকানরা পর পর কতবার পাঠাল।

আনাতোলি জবাব দেয়, ছাখো। মানুষ পাঠিয়ে যে তথ্য ওরা আনছে, আমরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র পাঠিয়ে তাই আনছি। মানুষ পাঠানোতে বড় রকম ঝুঁকি আছে স্বীকার করো তো? আমাদের বৈজ্ঞানিকরা তাই মানুষের বদলে যন্ত্র দিয়েই চাঁদের সব রহস্য উদ্ঘাটন করছেন।

আমি তা জানতাম। মহাকাশ অভিযানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীই পথিকৃৎ। মনে আছে আমি তখন নিউজ ডেস্কে কাজ করি। নানান খবর আসছে টেলিপ্রিন্টারে। গতানুগতিক সব খবর। তাতে খুব উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। এমন খবর চাইছিলাম যা বড় শিরোনামায় দিয়ে প্রভাতী পাঠকদের চমকে দেওয়া যায়।

আমার সহকর্মী টেলিপ্রিন্টার থেকে কাগজ ছিঁড়ে এনে দিলেন। বললেন, দেখুন তো খবরটা।

খবর পড়ে চমকে উঠলাম। মস্কো থেকে রয়টার জানাচ্ছে, সোভিয়েট রাশিয়া মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে যার নাম স্পুৎনিক। পৃথিবীর চারদিকে সে ঘুরছে।

সাড়া পড়ে গেল নিউজ-রুমে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রথম ঝাঁপ দিল। মহাকাশ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। স্পুৎনিক যুগের সুরু।

সোভিয়েট মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মানুষের অনেক দিনের স্বপ্ন সফল করতে চলেছেন।

বিপ্...বিপ্...বিপ্।

স্পুৎনিক পৃথিবীর চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে মহাকাশের সঙ্গী হয়ে।

বিস্ময় ছাড়া আমাদের আর কিছু ছিল না সেদিন। কিন্তু আরও বিস্ময় ছিল বাকি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে বিস্মিত চোখ নিয়ে তাকাল সারা দুনিয়া। জোডরেল ব্যাঙ্ক থেকে নিয়মিত অনুসন্ধান চালান হল স্পুৎনিকের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে। আমেরিকা স্তব্ধবাক। ওরা ভাবতেই পারেনি, যে কাজ ওরা করতে পারেনি রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা তা এমন নিখুঁত ভাবে তা আগেভাগেই করে দেবেন।

সুরু হল মহাকাশের প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় রাশিয়া এগিয়ে। পিছনের দিকে আর তাকানো নয়। চরৈবেতি। এগিয়ে চলাই হল বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

আবার চমকে উঠল সবাই।

এবার আর প্রাণহীন স্পুৎনিক নয়। সোজা আস্ত গোটা মানুষ উড়লেন মহাকাশে, সোভিয়েটের মানুষ।

ইয়ুরি গাগারিণ তাঁর নাম। নব্বুই মিনিটে রুশ মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা করলেন তিনি। সে এক দশকের আগের কথা। জলপাই পাতার মুকুট এবারও পেল সোভিয়েটের মানুষ। গাগারিণ চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে।

পৃথিবীর বাইরে, মহাশূন্যে ভাসমান রুশ ভোস্টকযান থেকে গাগারিণ দেখলেন এই শ্যামল ধরিত্রীকে। দেখলেন তিনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ গ্রহান্তরের অপরূপ দৃশ্য।

বার্তা পাঠালেন, এ দৃশ্য অকল্পনীয়। এমন সুন্দর আমাদের এই গ্রহ, এত রমণীয় এই মহাকাশ। দি প্লেস ইজ ওয়েটিং ফর ইটস্ পোয়েটস্ এ্যাণ্ড পেণ্টারস্। কবি আর শিল্পীদের জন্য মহাকাশ অপেক্ষা করে আছে—কবে তার এই কুমারী সৌন্দর্য রূপায়িত হবে কবিতায়, প্রাণ পাবে চিত্রকরের তুলিতে।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রাশিয়া অনেক অসম্ভবকে করেছে সম্ভব। মানুষের প্রতিভাকে করেছে উন্মোচিত। শোষণহীন সমাজ প্রত্যেক মানুষকে এনে দিয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। ঘোড়ার গাড়ির যুগ থেকে মহাকাশযানের যুগে এই উত্তরণ ইতিহাসের বিস্ময়। ডিম ফোটার আগেই বলশেভিক মুর্গির বাচ্চাটাকে গলা টিপে মারতে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। লেনিনের জন্যই তারা তা পারেনি। পারেনি রাশিয়ার মানুষের জন্য। প্রতিবিপ্লবীদের সব আক্রমণ হয়েছে পর্যুদস্ত। বলশেভিক মুর্গির বাচ্চাটা আজও সতেজ, সবল। প্রতি ভোরে সূর্য ওঠার সংকেত তার সবল কণ্ঠে। নাথিং হিউম্যান ইজ এলিয়েন টুমি। মার্ক্স এ কথা বলতেন।

মার্ক্সের উত্তরাধিকারী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সেই বাণীকেই রূপায়িত করে মানুষের অযুত সম্ভাবনার বিজয় বৈজয়ন্তী স্থাপন করে গেছেন ক্রেমলিনের চূড়ায়।

ক্রেমলিনের শীর্ষে চিরজাগ্রত, চির উজ্জ্বল লাল তারা তারই প্রতীক।

বিস্ময়কর এ প্রদর্শনী। আমি ভাবি, এমন একটা স্থায়ী প্রদর্শনী আমাদের দেশে হয় না কেন?

যা কিছু কাজ হয়েছে, পঞ্চবার্ষিক যোজনার কতটুকু ফল আমরা পেয়েছি

তার পরিচয় তো দেশবাসীকে জানানো যায় এমনি অর্থনৈতিক কৃতিত্বের প্রদর্শনীর মাধ্যমে। আমাদেরও তো রয়েছে কতো অঙ্গরাজ্য। প্রত্যেক রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচয় তাতে থাকতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ তা দেখে বুঝতে পারবে, কতটা আমরা এগিয়েছি, কোথায় কোথায় আছে ইস্পাত কারখানা, কোথায় নদী বাঁধ, কোথায় সবুজ শস্যের শান্তির বিপ্লব।

তোমাদের দেশে কি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম? শর্মাজী প্রশ্ন করেন আনাতোলিকে।

কেন? আমরা তো পাচ্ছি প্রয়োজন মতো।' আনাতোলি বলে।

দেখেছি মস্কোর বিভাগীয় দোকানগুলোতে সব সময় ভীড়। বিশাল সব দোকান।

হেন বস্তু নেই যে পাওয়া যায় না। ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ থেকে সুরু করে রেডিও টেলিভিশন সেট, জামা-কাপড়, রেকর্ড সবই। ফ্যাশনেবল জিনিস খুব বেশি নেই। কিন্তু জিনিস প্রচুর, লোকের হাতে রুবলও প্রচুর। পছন্দমত জিনিস দোকানে এলে নিমেষে তা উধাও। আমার একটা ঘড়ি কেনার ইচ্ছে ছিল। রেডস্কোয়ারের বিপরীত দিকে বড় বিভাগীয় বিপণিতে গেলাম ঘড়ির খোঁজে।

দোকানে লম্বা কিউ। সবাই কিউ দিয়ে দাঁড়ায় জিনিস কেনার জন্য। আমার সামনে এক ভদ্রলোককে দেখে মনে হল ভারতীয়।

ইংরেজির শরণাপন্ন হয়ে জিগ্যেস করি, আই থিংক ইউ আর ফ্রম ইণ্ডিয়া?

হ্যাঁ, আমি এসেছি আসাম থেকে। গৌহাটি য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর।

কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এসেছি পরমাণু বিজ্ঞান বিষয়ে জানবার জন্যে।

অধ্যাপক কাকতি বেশ শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। আমাদের পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। ওঁর স্ত্রীর জন্য একটি ঘড়ি চাই। ঘড়ি পছন্দ করতে পারছিলেন না।

দোকানী তরুণীটিকে বোঝাতেও পারছিলেন না।

আমি একটা ঘড়ি ওঁকে পছন্দ করে দিই। ত্রিশ রুবলে চমৎকার একটি ঘড়ি।

আমাদের দেশের মতো অঢেল ভোগ্যপন্য তৈরি করে অযথা বিলাসের সুযোগ এখানে দেওয়া হয় না ঠিকই। কিন্তু জিনিস কম নয়, দাম ন্যায্য এবং

সর্বত্র এক। বিলাস বর্জিত সোভিয়েট সমাজ। অথচ সুরুচির অভাব নেই কোথাও। পোষাকে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু জাঁকজমক নেই। পোষাকের প্রদর্শনীও চোখে পড়েনা। শান্ত সংযত ও ভব্য। পশ্চিম য়ুরোপীয়রা এদের ওই সংযত জীবনযাত্রাকে ব্যাখ্যা করতে চায় অর্থের অনটন বলে। বলতে চায়, সোভিয়েট সমাজ মানুষকে ইচ্ছামত বিলাস করতে দিচ্ছে না, কিংবা দেবার সাধ্য নেই। আমাদের দেশ তো দরিদ্র, কিন্তু বাবুশ্রেণীর লোকেরা পোষাকে, আহারে, বিহারে, বিলাসের কুৎসিৎ ও অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য দেখায়। তাদের অনুকরণ করবার লোকেরও অভাব নেই। বুর্জোয়া সমাজের অনুকরণ করি আমরা। এরা তা করে না।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ মস্কো এসে লিখেছিলেন বাহির থেকে মস্কো শহরে যখন চোখ পড়ল দেখলুম—য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন। রাস্তায় যারা চলেছে তারা একজনও শৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে-কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোশাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবাই মিলেই শ্রমিকদের পাড়া; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কিরকম বদল হয়েছে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিম্বা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দরলোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।'

এরপর তিন দশক পার হয়ে গেছে। সোভিয়েট সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি বেড়েছে প্রভূত ভাবে। কিন্তু বাইরের পোষাকী বিলাসিতাকে সেই যে নির্বাসন দিয়েছে বিপ্লবের সময়ে, তার পুনর্বাসন ঘটেনি। পোশাকের বিলাসিতাকে ভদ্রলোকের সংস্কৃতি বলে ভুল করা হয়। সে দেশের মানুষ এই ভদ্রলোকের মেকী সংস্কৃতি বর্জন করে মানবিক সংস্কৃতির পত্তন করেছে তাদের দেশে—সুস্থ ও শোভন। এ শুধু মস্কো শহরে নয় তাজিকিস্থান কিংবা আজার বাইজানেও একই রীতি, একই লক্ষ্য।

মেয়েরা সাধারণত পোষাক প্রিয়। নিত্য নতুন ফ্যাশন তাদের আকর্ষণ করে। রুশী মেয়েদের মধ্যে কিন্তু ফ্যাশনের অনুরক্তি কম। যতটুকু আছে তা স্বাভাবিক ও সহজ। মস্কোর রাস্তায় ট্রামে কি মেট্রোর ট্রেনে মেয়েদের দেখেছি। সাধাসিধে পোষাক নানান রঙের কার্ডিগান উগ্রতা নেই কোথাও। প্রসাধন প্রলেপ সাফল্য, চোখে পড়বার মতো নয়। চুলের খোঁপার বাহার চোখে পড়ে না। কোথাও কোনো বিজ্ঞাপনে নারী দেহের ব্যবহার নেই।

নারীরা পুরুষের সহকর্মী, সহযাত্রী, প্রিয়া অথবা জননী। তার সম্মান ও মর্যাদা এখানে সুস্থিত; সুপ্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম ইয়োরোপের মানুষেরা একেই বলে থাকেন ধূসর বিবর্ণ জীবন। আমার তা মনে হয়নি। আমরা তো নারীদের ওই রূপেরই স্তব করি। গৃহিণী সচিব ও সখি। ওই শান্ত সৌন্দর্য এখানেই আবিষ্কার করেছি।

সত্যিকারের মুক্তি ঘটেছে নারীর। পুরুষের কৃপায় নয়, নিজেদের অধিকারে।

গত মহাযুদ্ধে বিপুল লোকক্ষয় ঘটেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের। এক কোটির মত হতাহত হয়েছে রাশিয়ার মানুষ, মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার পবিত্র যুদ্ধে। সেই ক্ষত এখনো শুকোয়নি। কথনো আমরা আশ্চর্য হতুম যখন দেখেছি একটি হাত বা একটি পা নেই এমন অনেক মানুষ বাসে ট্রামে চলছেন। এরা সবই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন বহন করছেন। পুরুষের অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে নারী। সমস্ত কাজে তারা পুরুষের সহকর্মী। সর্বত্রই তাই মেয়েদের চোখে পড়েছে কাজ করতে। আমাদের সমাজে যে-কাজে পুরুষদের প্রাধান্য রাশিয়ায় সেখানে মেয়েরাই নিজেদের হাতে নিয়েছে সে কাজ।

সাশাকে জিগ্যেস করেছিলুম, মনে আছে তোমার যুদ্ধের কথা?

সাশার জন্ম ১৯৩৯ সাল। কী করেই বা মনে থাকবে?

বলেছিল, আবছা মনে আছে। মস্কোতে সাইরেন বেজেছে। আমাকে নিয়ে মা আশ্রয় নিয়েছেন ট্রেঞ্চে। মনে আছে বাবা একবার একটা পিস্তল দেখিয়েছিলেন আমাকে।

মস্কো শহর ছিল সোভিয়েটের দুর্গ। অজেয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নাৎসীদের কামানের গোলা এসে পড়ত মস্কোর উপকণ্ঠে। তার বিমান এসে চালাত আক্রমণ। কিন্তু পারেনি রুশদের গর্ব ও সাধনার প্রতীক এই শহরকে কাবু করতে।

মস্কোকে এত সহজে আবিষ্কার করা যায় না। তাকে উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। তাকে জানতে হয় সহানুভূতি দিয়ে। বাইরের চাকচিক্য নয়, অন্তরের গভীর সৌন্দর্যে সে রূপসী।

মস্কো এক আশ্চর্য প্রাণবন্ত শহর। সোভিয়েত শক্তি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

(ক্রমশ)

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

ছড়কায় নমঃ

[উইথ্ ম্যালিশ্ OR মালিশ টু নান্]

কিছুদিন আগে নানান পত্র-পত্রিকায় বিস্তর ধুমধাড়াক্কার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচার নিয়ে স্তূপাকার আলোচনা চলছিল। এখনো কিছু কিছু চলে। ছাপার অক্ষরে অস্পষ্ট হয়ে এলেও, বিদ্বান-পণ্ডিত মহলে এখনো সে বিতর্কের তুফান একেবারে থেমে যায় নি, প্রত্যক্ষ করে এলাম এবার কলকাতা গিয়ে। ধারণা ছিল, বাংলা সাহিত্যের পীঠস্থানের বাহিরেই অবাঙ্গালী-বাঙ্গালী পাঠকেরা এই নিয়ে আমাদের দুয়ো দিয়ে থাকেন। দেখলাম, খাস কলকাতাতেও তাই নিয়ে আলোচনার রেশ (না, রেস ?) এখনো বেশ চলছে।

এ সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীদের মতামত আমাদের জানা আছে। অমর জীবন-শিল্পী তারাশঙ্কর পরিষ্কার মতামত ব্যক্ত করে গেছেন—"সাহিত্যে ওসব টিঁকবেনা"। একটি পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর ডায়েরীর কিছু অংশ পড়লাম,—"একখানা ওমুক বই, (তিনি নাম উল্লেখ করেছেন) বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না"।

সে যাইহোক, আমি পণ্ডিত নই। বিদ্বান নই। লেখক না, পাঠক না। প্রকৃত অর্থে কিচ্ছুটি না। পুরু কাঁচের চশমা চোখে লাগিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বইয়ের পোকা বেচে খেতে, বা সোনা খুঁটে তুলতে পিঠে আমার কুঁজ গজায় নি বটে, তবে কিছু কিছু লেখাপড়া করে থাকি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যশস্বী সাহিত্যিকদের বহু লেখা আমার বেশ ভাল লাগে। বহু কবিতা তাঁদের বিশ্বের সাহিত্যহাটে স্থান পাবার যোগ্য বলে আমার বিশ্বাস।

তাঁদের দু চার জনের সঙ্গে দু চার মিনিট বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবার। ছিলেন সেদিন সর্বশ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নব নাগ। সুনীলবাবু এবং শক্তিবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল দেখে নববাবু বললেন, আপনারা সাহিত্যিকরা আলোচনা সেরে নিন, তারপর আমরা কথা বলব।

সাহিত্যিক ? আমি ?

করজোড়ে বললাম, I can never claim to be. সাহিত্যিক হবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। কারণ, আমি জানি, যে লেখে সে লেখক হতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যিক হওয়া শক্ত। আবার সাহিত্যিক মাত্রেই শিল্পী না-ও হতে পারেন। যে ডিক্টেশন লেখে, সে-ও লেখক। বিহারের অপিসগুলোতে দেখি কেরাণীবাবুদের বলা হয় "লিপীক"। বড় কেরাণীর ঘরের বাইরে ফলক আঁটা থাকে—প্রধান লিপীক। তারা কি সবাই সাহিত্যিক, না শিল্পী? তবে লিপিক না হয়ে লিপীক কেন হলেন আমি জানি না।

আমি তো একজন লিপিক বা লিপীক পর্যন্ত না। নিজেকে সাহিত্যিক ঠাওরাবো এতবড় আস্পর্দা আমার ঠাকুরদাও সাহস করে শিখিয়ে যান নি। তবে, সাহিত্যে (এবং বা জীবনে) শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। নিবেদন করবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

১৯৩৪ সালের বিহারের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের কথা আপনাদের ক'জনের মনে আছে জানি না, তবে বিহারের আজকের ছোক্‌রারাও মনে রাখে। বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনে শুনে সে সব কথা তারাও বলাবলি করে এখনো। 'বনফুল' তখন ভাগলপুরে। এখন তিনি আপনাদের কলকাতায়। তাঁর কাছে জানতে পারবেন, কী ঘটেছিল। জানি, বলবেন, সেকি মশায়? বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে বসে, সাড়ে তিন যুগ আগেকার ভূমিকম্পের কথা তুলছেন কেন? তুলছি এই কারণে, সে ভূমিকম্প না হলে, বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার কথা শুনে আজ আমার এমন করে হৃৎকম্প হোত না। ঝাড়া আড়াই মিনিট পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। সামনে চার্চ ঘরবাড়ি ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ছে। বড় পোস্ট-অফিসের জানলা দরজা দিয়ে কেরাণীবাবুরা (তখন লিপিক নন) মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছেন। মুঙ্গেরে আমাদের নিয়ে গেলেন সেবাকর্মের জন্যে রেভারেণ্ড এস. কে. তরফদার। হাজার হাজার মৃত মানুষ। হাজার হাজার বিকলাঙ্গ মানুষ। চারিদিকে ডেব্রিজ। ইট কাঠগুলো যে কোনকালে কোথাও খাড়া ছিল বোঝবার উপায় নেই। গুঁড়িয়ে গেছে। ধুলো আর পচা দুর্গন্ধে ছেয়ে গেছে আকাশ-বাতাস। আজ তো মুঙ্গের নতুন শহর। চেনা যায় না। দিনের পর দিন আতঙ্ক বাড়ছে। অনেক 'চেতাবনী' হাণ্ডবিল ছাপা হচ্ছে,—ওমুক তারিখ, এতো ঘণ্টা গতে, এত সেকেণ্ডে এবার (শুধু ভূমিকম্প নয়) ব্রহ্মাণ্ডকম্প হবে।

সৃষ্টি রসাতলে যাবে। অবিশ্বাস করি কেমন করে? কোথাও মাটি ফেটে ফোয়ারার জলে ভেসে গেছে। কোথাও গঙ্গার কাছের জায়গাগুলো ফেটে আটফাটা। এক একটা নালা সৃষ্টি হয়ে আছে। টপ্‌কাতে মালকোচা দিতে হয়। ছা-পোষা গেরস্তর কি অবস্থা, ভেবে দেখুন। জানুয়ারীর ঐ প্রচণ্ড শীতে তাঁবু বিনা, চট মশারী টাঙিয়ে মাঠে মাঠে কম্যুনিটি বেডরুম সৃষ্টি করে পাড়ায় পাড়ায় লোক ইস্ট নাম জপছে। খোকাদের ভয় দেখিয়ে বড়রা বলছে, চুপ করে বোস। ঐ দেখ কাক ডাকছে, এবার ভূমিকম্প হবে।

কঞ্চির চোং একটার সাথে একটা ফিট্ করে তার মুখে বিড়ি গুঁজে আমরা একে অপরকে সুলগে দিচ্ছি। তাঁবুতে পড়ে পড়ে টানছি। অবিশ্যি আমার আরো একটা বাড়তি কাজ ছিল। নম্বুর বাব্‌রি ঠিক দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যের কায়দায় ক্ষুর দিয়ে ঘাড় চেঁচে দেওয়া। তখন সবে চণ্ডীদাস দেখে নম্বু দুগ্‌গা বাঁড়ুয্যের কায়দায় বাব্‌রি রাখতে আরম্ভ করেছে। ধোপা নাপিত সবাই প্রাণ ভয়ে ব্রহ্মাণ্ডকম্পের ক্ষণ গুনছে আর বাচ্চা সামলাচ্ছে। অতএব নম্বুকে দুগ্‌গাদাস সাজাতে আমাকে ক্ষুর ধারণ করতে হোত। ভাটিকান পোপের মাথায় যেমন গোল টুপি থাকে, তার চেয়ে আকারে বড় একটা এনামেলের বাটি নম্বুর মাথায় বসিয়ে নিখুঁত তার ঘাড় কামিয়ে দিতাম। সাবান মেখে ঝাঁকড়া চুলে বার কয়েক ঝাড়া দিয়ে নম্বু কায়দা করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলত, দেখতো, ঠিক দেখাচ্ছে?

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে সুর করে বলে উঠতাম, চণ্ডীঠাকুর, একি সত্যি?

ভাবছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কি এলো-গেলো মশাই?

সেই কথায় আসছি।

ভগলুদা এসে বললেন, থিয়েটার করতে হবে টিকিট করে। দুর্গতদের সাহায্যার্থে। কালাচাঁদদা আমাদের ডিরেক্টার। তিনি এখন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালনায় আদমপুরের রাজবাটীতে আমাদের থিয়েটার হোল। ঐ রাজবাটীতেই আগে দেখেছি অশোককুমারকে। তিনি তখন বোম্বেতে কংগন-বন্ধন নিয়ে চিত্রজগতে উদীয়মান।

তবু সময় কাটে না।

নম্বু বললে, আয় সাহিত্য করি।

এমনিতেই আমাদের দলটি 'শরৎ-পাগল' ছিলাম। বাপ-কাকা পাড়া-পড়শীদের মুখে 'ন্যাড়ার' গল্প এত শুনতাম যে অভিভূত হয়ে পড়তাম। হাতে পেলাম রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, শ্রীকান্ত। আর যায় কোথা। ন্যাড়া আর ইন্দ্রনাথের (রাজেন মজুমদার) গল্প লোকমুখে শুনতে শুনতে আমাদের দলটি শ্রীকান্তের লীলাভূমি আবিষ্কারের কাজে লেগে গেলাম। শরৎচন্দ্রের বহু আত্মীয় পরিবার ভাগলপুরেই ছিলেন। তাঁর মাতুলত্রয় সুরেন-উপেন-গিরীন গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীনবাবুর দুই ছেলে মন্তু-সন্তু পরে আমার সহপাঠী ছিল। তাদের কাছেই দেখতাম শরৎচন্দ্রের হাতে লেখা সুন্দর ইংরাজী চিঠিগুলো। এখনো মন্তুর কাছে শরৎবাবু সম্বন্ধে অনেক দলিল দস্তাবেজ আছে।

সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে শ্রীকান্ত-বিখ্যাত সেই আমবাগান। তার ওপারে রাজেন মজুমদারের বাড়ি। যে বাগানে এসে নাকি ইন্দ্রনাথ বাঁশী বাজালে শ্রীকান্ত গৃহত্যাগ করত। তারপর উভয়ে উধাও।

সেই বাগানে বাঁদর-বোবা আমগাছের নিচে বসে (এক কামড় খেলে বাঁদর বোবা হয়ে যেত, এত টক) আমরা জটলা করতাম। খুঁজে বেড়াতাম, কোথায় ছিল অন্নদাদিদির আস্তানা, শাহজীর আড্ডা। খঞ্জনপুরের কোন ঘাটে বাঁধা থাকত ইন্দ্রনাথের ছোট্ট সেই ডিঙিটা ?

তাই, নন্দুর 'আয় সাহিত্য করি' আহ্বানে সবাই নেচে উঠলাম। বললাম, দাঁড়া, আগে একজন জ্যান্ত সাহিত্যিককে চাক্ষুষ করি, তবে তো সাহিত্য করব। খুঁজে বের করলাম স্টেশনরোডে স্বদেশী নেতা পটলবাবুর বাড়ির কাছে 'বনফুলের' Sero-Bactro Clinic। আশা ছিল, তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই আমরা শুভকার্যে নেমে পড়ব। কিন্তু ঘেঁসে কার সাধ্যি ? যা গম্ভীর মানুষ। প্রায়ই সন্ধ্যায় গুরুগম্ভীর মুখে 'বনফুল' বুড়ানাথ রোড দিয়ে নিজের মনে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতেন। আমাদের কলেজের সহপাঠী তাঁর ভাই ঢুলু, (এখন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) তবু আমরা 'বনফুলের' সদা-গম্ভীর মুখ দেখে কাছে ঘেঁসতে সাহস করতাম না। কোথাও মনের সুখে বিড়ি ধরিয়েছি। কেউ যদি ছুটে এসে বলত, 'বনফুল' আসছে, পালা। আমরা এগলি-সেগলি দিয়ে ছুটে পালিয়ে বাঁচতাম। বড়দের শ্রদ্ধা করা, সমীহ করার একটা বদঅভ্যেস সে যুগে তখনো একেবারে লোপাট হয়ে যায় নি। আধুনিক কিছু বীরের মত আমরা বলতে পারতাম না, বে-ইস্ কচ্চি। ওর পয়সায় খোড়াই খাচ্ছি ? অবশ্য বললেও,

'বনফুলের' একটা পাঁপড়ির কণাও তাতে খসে পড়বার কোন আশঙ্কা ছিল না।

নসু দুগ্‌গাদাসের মত বাব্‌রি রাখে, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা পরে। চমৎকার ছবি আঁকে। অতএব ওকেই আমরা সম্পাদক মনোনীত করে হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বার করলাম। নসু নাম দিলে—চিত্রা। আমরা কোন আপত্তি করলাম না। প্রচ্ছদ আর প্রত্যেক পাতায় সুন্দর ইলাসট্রেশন নসুরই কীর্তি মানতে হবে। অতএব ওর যা খুশি নাম দিতে অবশ্যই পারে বলে আমরা মেনে নিলাম।

নসুর বড় ভাই, হারানদার হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। বারান্দায় একখানা বড় পিঁড়ের ওপর দামী আইভরি কাগজে চীনে-কালীতে হারানদা প্রতিদিন আমাদের চিত্রার প্রতিটি পাতা সযত্নে লিখে দিতেন। রগচটা লোক ছিলেন বলে আমরা তাঁকে ভয় পেতাম।

মরক্কো চামড়ায় বাঁধা চিত্রা পাড়ায় পাড়ায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াত। খুব সুখ্যাত হোল। আমার ধারাবাহিক লেখা 'গারো পাহাড়ের গুহায়' শেষ হতেই একদিন ভুর্‌রার (প্রবোধ সান্যালের বুর্‌রা নয়। চিটেগুড় বিহীন তামাক মাত্র) কল্কের গায়ে ভেজা ন্যাকড়া জড়াতে জড়াতে নসু বললে, ওসব এডভেঞ্চার ট্যাডভেঞ্চার দিয়ে কাগজ চলবে না। গাল পোড়ার 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি' টাইপের কবিতাও চলবে না। সকলকে বলে দিয়েছি। বেশ একটা জমিয়ে রসিয়ে প্রেমের গল্প লেখতো দেখি।

সম্পাদকীয় চালে কথাগুলো বলে নসু একমনে ভুর্‌রার কল্কে টেনে চলল।

বলে কি? প্রেমের গল্প? কোথায় পাবো?

ভুর্‌রার কল্কেটা ন্যাকড়া সমেত আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে নাকমুখ দিয়ে একপেট ধোঁয়া ছেড়ে নসু বলল, প্রেমের গল্প না থাকলে কাগজ চলে না, বুঝলি? তাছাড়া নিরিমিষ কাগজের সম্পাদকেরও কোন প্রেস্টিজ্‌ নেই।

অনেক চিন্তা করে, কয়েকদিন চেষ্টা করে একটা নতুন লেখা লিখে নিয়ে নসুর কাছে গেলাম। ও তখন চোখ বুঁজে তবলা বাজাচ্ছে। আমিই তাকে শিখিয়েছি। সামনে বোলের খাতাটা খোলা। আমারই সামনে চাঁটির পাঁয়তাঁড়া দেখাচ্ছে, তেরে কেটে গদি গেনি ধা। তিন ফেরতা তেহাই মেরে আমার দিকে চাইল।

বললাম, লেখাটা দিলাম।

হাতদিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে বেশ সম্পাদকীয় চালে বলল, কাল সন্ধ্যায় মতামত নিয়ে যেও।

কিছুদিন যাবৎই দেখছি নন্থ একটু চাল মেরে কথা বলে। আমরাই ওকে সম্পাদক করলাম, আমাদের কাছেই চাল? এক এক সময় রাগ হোত। কিন্তু উপায় নেই। আইভরি কাগজ, চীনে কালি, হারানদা সবই তার বাড়িতে। পরদিন বিকেলে গিয়ে দেখি নন্থ দপ্তর সাজিয়ে বসে। ওর বাবা অপিশ থেকে আসবার আগেই দপ্তর উঠে যায়।

বললাম, লেখাটা কেমন লাগল? .

নন্থ নাকমুখ কুঁচকে বলল, এসব চৈতন্যমার্কা প্রেম চলবে না বুঝলি? এটা সাহিত্য। দহিবড়া খাওয়ার মত অত সহজ নয়। বেশ ঘামিয়ে লিখতে হবে। ওসব স্বর্গীয়-টর্গিয় ছাড়্।

কি বলছিস নন্থ? শরৎবাবু…

বাধা দিয়ে বলল, শরৎবাবুই বাংলা সাহিত্যের বারোটা বাজিয়ে গেছে। ওসব নৈঃস্বর্গিক চিত্রায় চলবে না। দেহ চাই। দেহই প্রেমের আধার বুঝলি? দেবদাস তো পার্বতীর স্বর্গীয় প্রেম পেয়েছিল। তবে আর পারুর বিয়ের পর অমন ভেউ ভেউ করে কেঁদে কেঁদে মরল কেন, বল? ঐ দেহটার জন্যেই তো। ফেরৎ নিয়ে যা তোর লেখা। একটা রিয়েল প্রেমের গল্প লিখে আনবি। বেশ দেহ-ঘটিত।

আমাকে চিন্তিত দেখে বলল, তার জন্যে লেবার করতে হবে। গালপোড়া, সোহাগ, নীলু, সবাইকে বলে দিয়েছি।

অনুরোধ করলাম, দু চারটে পয়েন্ট বলে দে না।

—পয়েন্টে হয় না। অনুশীলন চাই। প্রেম করতে হবে।

প্রেম করতে হবে? কোথায়?

পথে বেরিয়ে দেখি বেশ সেজেগুজে বারীন যাচ্ছে।

কোথায় রে?

প্রেম করতে।

প্রেম করতে?

হ্যাঁ। নন্থটা যা বিপদেই ফেলেছে না। বলে এক্স্‌পিরীয়েন্স না হলে প্রেমের কবিতা লেখা যাবে না।

বাচ্চা বয়েসে স্টোভ ফেটে বারীনের ডানদিকের গাল, গলার কিছু অংশ

পুড়ে গেছিল। তাই ওকে গালপোড়া বলে ডাকা হোত। বললাম, এক্স্‌পিরীয়েন্স্‌ গ্যাদার করতে যাবার মুখেই এত সাবান হিমানী পাউডার? শোন গালপোড়া, আমার দ্বারা ওসব হবে না। মেয়েদের যেমন মান অপমান আছে, আমারো আছে। আমি কোন মেয়ের পেছনে ঘুরতে পারব না, তাতে সাহিত্য যদি চুলোয় যায়, যাক। কোন মেয়ে যদি একবার অপমান করে দেয়, ঘেন্নায় মরে যাবি না? গালপোড়া মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল।

চিন্তা করে বলল, কিন্তু, প্রেম? আমার কবিতা? সামনের মাঠটায় দুজনে গিয়ে বসে বিড়ি ধরালাম।

বারীন বলল, সোহাগের বোনকে তোর মনে আছে?

আছে।

ওর কথা আমার মনে পড়ে। যেবার অঙ্কে ফেল করলাম, কি কান্না। মাঞ্জার সময় কাঁচ লেই শুদ্ধ্‌ আমার লাটাইয়ের সুতো ধরে হাত কেটে কত রক্ত। তবু সুতো ছাড়েনি। যেবার ওরা কাটিহার যায়, কত করে বলে গেল, যেও বারীনদা। নিশ্চয়ই যেও।

গেছিলি?

না। তাইতো দুঃখ রয়ে গেল। কি সুন্দর গান গাইত, "মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেবো খোপায় তারার ফুল।" বারীনের চোখ দুটো কেমন সজল হয়ে উঠল। জ্বলন্ত বিড়িটা হাতে কচলে আগুন সমেত গুঁড়ো করে ফেলল। শেষ টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিলাম। বারীন হাতটা মুঠো করে ধরেই আছে।

আস্তে আস্তে বললাম, বাড়ি ফিরে যা বারীন।

পরদিন দেখি সোহাগ হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে।

কি রে? কোথায়?

বিজয়ীর হাসি হেসে বলল, থার্টি পারসেণ্ট সাকসেস্‌। আজ লাস্ট স্ট্রাইকটা দেবো?

মানে?

মানে আজ সামনা সামনি। একটা হেস্ত নেস্ত।

কোথায়?

মলি।

ওরে বাবা। ওর বাবার স্তূপাকার ভুঁড়িটা দেখেছিস? যদি গড়িয়ে তোর ঘাড়ে পড়ে জখম হয়ে যাবি।

এ সময় ওর বাবা বাড়ি থাকে না। ও বাগানে ঘোরে। আজ গিয়ে বলব, বড় তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল খাওয়াবেন? নিশ্চয়ই আনবে। ওর হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে বলব, আমি আপনার পানিগ্রহণ করলাম। ব্যস্।

তাহলেই প্রেম হয়ে যাবে?

কি করব বল? নন্টু…

নীলু বলল, কি থাটুনিটাই না পড়েছে মাইরি। দশটায় ওমুক গার্লস্ স্কুল, চারটেয় ওমুক। সন্ধ্যা সাতটায় অর্গান বাজিয়ে গান করে ঐ স্নেহলতা বাড়ির মেয়েটা। জানলা খোলা থাকে।

আর তুই?

রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকি।

তাহলেই প্রেম হয়ে যাবে?

না, না। এগুলো ত ট্রায়েল বেসিসে রেখেছি। রিয়েল যা চলছে। বসরাই গোলাপ দুটি।

কোনটা? তোর কোনটা?

বোথ্।

বোথ্?

সে কি রে? দাদুর সাথে দুই নাতনী তো রোজ ওরা বেড়াতে যায় স্যাণ্ডিস্ কম্পাউণ্ডে। ওরা ইহুদী। জানি। আমিও যাই রাস্তার এদিক দিয়ে।

তাহলেই বোথ্? আর প্রেমই যদি হল তবে একটার সাথে না হয়ে একেবারে বোথ্?

কি করব বল…একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তো। চিত্রায় লেখা দিতে হবে না?

* * *

নন্টুর চিত্রা দপ্তরে ঝুপঝাপ্ লেখা পড়তে লাগল। সম্পাদকীয় চালে নন্টু আমায় বললে, তোমার লেখার জন্যে চিত্রার ইস্যু ওয়েট্ করতে পারে না। কালকের মধ্যে লেখা না দিলে, অফার বাতিল।

অন্যান্য লেখাগুলো আমিও পড়ছিলাম।

বললাম, এই সব দিবি? সকলের বাড়ি বাড়ি চিত্রা যায়। বুড়োরাও পড়ে।

নন্তু বিড়ি ধরিয়ে বলল, ওরা কি সব বোস্টোম্? ওরা মুখে যতই বলুক, মনে মনে দেহরসের গল্প সবাই চায়। বোস্টোম্ টোম্ টোম্ টোম্ টোম্। ঝোলার মধ্যে মালা রেখে পাঁঠা খাবার যম।

আঁতুড় ঘর থেকে শ্মশান পর্যন্ত মানুষের জীবন ভাবতে বসে গেলাম। নন্তু বলেছে, ওসব চলবে। জীবনের যা সত্য সবই সাহিত্যে আসবে। তাহলে সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া নানান কলাকৌশলসহ আঁতুড়ের সমস্ত কিসসাই তো জীবনের সত্য। তা নিয়ে সাহিত্য করতে বাধা কোথায়।

হুস্ হুস্ করে কলম ধেয়ে চলল। সকলকে টেক্কা দিতে হবে। আর দশজনের দেখে, নন্তুর উস্কানীতে আমারও বাসনা জেগেছে। লেখা শেষ করে টের পেলাম, ঘরময় কেমন কাঁচা-কাঁচা গন্ধ। দোয়াত কলম টেবিল, সব যেন দুর্গন্ধে দম আটকে গেছে। কাগজগুলো কোনমতে পিন্-আপ্ করে একটা বড় খামে বন্ধ করে ফেললাম। না। তবু সেই দুর্গন্ধ। ১৯৩৪ সালের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহ থেকে যে শ্বাসরুদ্ধকারী দুর্গন্ধ মুঙ্গেরের আকাশ-বাতাস ছেয়ে রেখেছিল, ঠিক সেই দুর্গন্ধ আবার আমার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রইল। গা-বমি বমি করছে।

গ্র্যাণ্ড! নন্তু সানন্দে আমায় অভ্যর্থনা জানাল একটা স্পোর্টসম্যান সিগারেট এগিয়ে দিয়ে। সম্পাদক হওয়ার পর বিড়ি একেবারে না ছাড়লেও নন্তু হাতের কাছে ইঞ্জিন, ঈগল, তিন আম ছাপ, ভুট্টা, পাসিংশো, স্পোর্টসম্যান ইত্যাদি মার্কা সিগারেট রাখত।

দিন দুই শরীরটা খারাপ, চিত্রার দপ্তরে যেতে পারিনি। বাবা বললেন, অত্রির কাছে যা, ওষুধ নিয়ে আয়। লক্ষণসমূহ শুনে অত্রিকাকা বললেন, পিত্তিবৃদ্ধি হয়েছে। মোটা মোটা অনেক বই খুলে বিস্তর বিবেচনা করে কাগজের পুরিয়া মুড়ে যখন সাবুদানার চাইতেও ছোট ছোট বড়ি দিয়ে বললেন, প্রাতে খালিপেটে এক খোরাক, রাতে শোবার আগে এক খোরাক, তখন সত্যিই অনুভব করলাম, ঘেন্নার না হলেও পিত্তির নাড়ি আমার বিদ্যমান। অত বড় বড় বই দেখে, এত খুদে খুদে ওষুধ? কাঁহুদের বাড়ির সামনে নালায় পুরিয়া দুটো বিসর্জন দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তবু গা-বমি বমি করছে।

পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ নন্তুদের খিড়কির খোলা দরজা পার হয়ে উঠোনে পা দিয়ে কেমন ভিমরি লাগার দশা হল আমার।

এ যে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে প্রবেশ করলাম।

ফটাস্ ফটাস্ শব্দের সাথে, ওরে বাপ্ মরে গেলাম চীৎকার। অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নন্থ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে ঠাকুমার ঠাকুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল। পেছনে পেছনে তাড়া করে ছুটে এলেন হারানদা, হাতে হুড়কো। দড়াম করে ঠাকুর ঘরের দরজায় পদাঘাত করতেই পাল্লা দুটি দুদিকের দেয়ালে প্রচণ্ড শব্দে গিয়ে আঘাত করে খুলে গেল। আবার ফটাস্ ফটাস্ নিদারুণ শব্দ। ঠাকুমা চেঁচাচ্ছেন, ওরে হারান, ওটা আমার ঠাকুরঘর বাবা, তোর দোহাই লাগে, আর মারিস না। শেষে হেগেমুতে ঠাকুরঘরটা আমার।······

ফটাস্।

ওউফঃ। মরে গেলাম।

হারানদার গলা ভেঙ্গে গেছে। চীৎকার করে উঠলেন। বল, আর সাহিত্য করবি?

নন্থ গোঁ গোঁ করে কি বললে বুঝতে পারলাম না। উঠোনময় চিত্রার আইভরি কাগজ, পাণ্ডুলিপিগুলোর ছেঁড়া কাগজ ফর্ ফর্ করে উড়ছে। চীনেকালির দোয়াতটা তুলসীতলায় মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে।

আবার ফটাস্। সঙ্গে সঙ্গে নন্থর সক্রন্দন আর্তনাদ, মরে যাব দাদা, মরে যাব।

বল, আর সাহিত্য করবি? গর্জে উঠলেন হারানদা। গোঙানী শোনা গেল। নাঁ নাঁ.নাঁ।

হতচ্ছাড়া সব, বলে হারানদা স-হুড়কো অন্য ঘরে পায়ের দুম্ দুম্ শব্দ করতে করতে চলে গেলেন।

চোখের সামনে আমাদের সম্পাদককে এমন নির্দয়ভাবে হুড়কোপেটা হতে দেখে, আমি তখন খিড়কির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থর থর কাঁপছি।

ঠাকুরঘর থেকে সদ্য-প্রহৃত সম্পাদক যন্ত্রণায় আঁ আঁ শব্দ করছে।

ধীরে ধীরে জানলায় উঠে দেখলাম, নন্থ কাত হয়ে পড়ে আছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। যে দেহরস নিয়ে তার আদেশ বর্ষিত হত আমাদের ওপর তা যেন তার দুই চক্ষের ধারায় গলে গলে পড়ছে। মারের চোটে সারা দেহ ফুলে-ফেটে একশা। পিঠ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

অশ্রুজলপ্লাবিত ফোলা চোখ দুটো একটু খুলে জানলায় নন্থ আমায় দেখেই কালশিরে-পড়া ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ধরে আবার চোখ বুঁজল।

আমার সমস্ত শরীর হিম। দুর্গাদাস প্যাটার্নের বাব্‌রির বেশ কিছু চুল ছিঁড়ে দুচার থোকা ঘরে ছড়িয়ে। আবেগ দমনের চেষ্টায় তার সমস্ত শরীর দুলে দুলে উঠল।

হঠাৎ নস্থ পাগলের মত চীৎকার করে উঠল, ওরে গৌর, দাদা তোকেও খুঁজছে, তুই পালিয়ে যা।

জানলা থেকে নামতে পারার আগেই তবেরে হারামজাদা বলে হাতে হুড়কো নিয়ে হারানদা তেড়ে বেরিয়ে আসতেই গুহভিলার বাঁশবন ভেঙ্গে মৃত্যুপণ ছুট দিলাম। যে প্রহার সম্পাদক সহ্য করেছে তার শতাংশও এই লেখক পারবে না। দে ছুট, দে ছুট। পায়ের চটি পা ঝেড়ে ফেলে ছুট।

কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে এসে পেছন ফিরে দেখি, হারানদা ফ্যাসফেঁসে গলায় কি যেন তড়পাচ্ছেন, আর মাটিতে হুড়কো পট্‌কাচ্ছেন। আমাকে দাঁড়াতে দেখে আবার তিনি ছুটতে লাগলেন। আবার ছুট ছুট। আজো সে ছোটা আমার যেন থামেনি। তাই দশজনের দেখে হাজার বাসনা জাগলেও হারানদার হুড়কো আমায় আবার বাঁশবনে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। পারি না। জীবনের সব সত্য সাহিত্যে উপস্থিত করতে পারি না।

কমল লাহিড়ী

বরং আলেয়া ভালো

আলো থেকে অন্ধকার—অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণ। জীবন থেকে মৃত্যু আবার মৃত্যুর অমৃতলোক থেকে জীবন দর্শনে ফিরে আসা, চলমান জীবনে মানুষের এক অপরিহার্য জীবনবেদ। চলাই জীবন, উপনিষদের মহান বাণী "চরৈবেতি" সেই বাণী বিক্ষুব্ধ, আশাহত মানুষের মনে এনে দিয়েছে বারবার অমৃতলোকের সন্ধান।

ঈশ্বরের আবাস এই পৃথিবীতেই রয়েছে সে আলোর পথ। আলেয়ার আলো অনুসরণ করেও মানুষ সে পথের শুরু খুঁজে পেতে পারে। হোক না সে আলেয়া তবুও তো আলো—অন্ধকারের অতলে পড়া মানুষগুলোর মনে এক বারের জন্যও তো তা আলোর দিশারী হতে পারে।

: চরিত্র লিপি :

(১)	লোকটা (প্রফেসর উমানাথ সান্ন্যাল)	—দর্শনের প্রফেসর, আপাত দৃষ্টিতে পাগল—ভবঘুরে।
(২)	শ্যামাকান্ত	—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, ওয়াগন ব্রেকারদের দলপতি।
(৩)	ভটাং	—শিক্ষিত বেকার, ঐ দলভুক্ত।
(৪)	ন্যাপলা	ঐ
(৫)	শশীভূষণ	—পূর্ববঙ্গ ত্যাগী স্কুল মাষ্টার। উমানাথের বাল্যবন্ধু।
(৬)	রাজাসাহেব	—সমাজের ইনেটেলেকচুয়াল গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যবসায়ী।
(৭)	দেউকিপ্রসাদ	—ব্যবসায়ী।
(৮)	সুপ্রকাশ	—মধ্যবিত্ত করনিক, অফিস পাড়ার ক্লাবগুলোর মধ্যমণি।
(৯)	জয়তী	—উমানাথের স্ত্রী।

[একটি অন্ধগলির শেষ অংশ। লাইট পোষ্টের সেড্‌ভাঙ্গা বিজলী বাতিটা জলছে। পাশে একটি ডাষ্টবিন। রাস্তার গায়েই একটি বাড়ী। সামান্য একটু রোয়াক। রিক্সার টুং-টাং শব্দ। একটা কুকুর মাঝে মাঝে করুণ সুরে ডাকছে। একজন বয়স্ক লোক বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, ছেঁড়া জামা—উস্কো-খুস্কো চুল—বিভ্রান্ত। দেহের অর্দ্ধেক স্টেজের বাইরে ডাষ্টবিনের দিকে]

লোকটা ॥ (সামনে মুখ তুলে কয়েকটা ছেঁড়া খবরের কাগজ ছড়িয়ে দেয়। অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠেই স্থির হয়ে যায়। দর্শকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে) না কিছু নেই, কোথাও নেই। তা হ'লে কি নিয়ে বাঁচবো। (চিন্তা করে) কিন্তু বাঁচতে যে হবেই। বেদনার সুরেই যে জীবন খুঁজতে হবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ কান্নার সুরে জীবন—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts—saddest thoughts—saddest thoughts.

[বলতে বলতে পিছিয়ে আসে। বাইরে কথা শোনা যায়। দু'জন অনুচর নিয়ে ঢোকে শ্যামাকান্ত। লোকটা ডাষ্টবিনের পাশে বসে পড়ে]

শ্যামা ॥ তোকে পই-পই করে বারণ করে দিয়েছিলাম গ্যাপলা যে, মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি আমার ভাল লাগে না। ওদের নিয়ে কোনও কথা আমার সামনে বলবি না। আর তুই—।

গ্যাপলা ॥ এই কান নাক মলছি গুরু ও কিস্‌স্যা বিলকুল খতম। তবে কি জান, স্না ভদ্দরলোকের মেয়েরা সব আজকাল যা শুরু করছে না, তাতে বাজারেগুলোর অন্ন ঘুচলো।

ভটাং ॥ তাতে তোর কি রে! আমরা শুধু পেটো সামলে নিজেদের কারবার গুছিয়ে লিব—কি বল ওস্তাদ।

শ্যামা ॥ ঠিক—। তিন নম্বর কেসটায় যা ব্রেকডাউন হয়ে গেল, সে তো তোর ওই মেয়েদের দিকে নজর দিতে গিয়েই। তখন কত করে নিষেধ করলাম গ্যাপলা ভুলে যা। ওই সব প্রেম পরিণয় আমাদের জীবনের জন্য নয়। ও সব হয়ত একদিন ছিল, হতেও পারত। কিন্তু এখন আমাদের কী পরিচয় বল্‌—কি আমরা!

গ্যাপলা ॥ (মাথা নীচু করে) ভুলেই তো থাকি গুরু। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপগুলোই মনে করিয়ে দিতে চায়—আমরাও ভদ্দরলোক হতে চেয়ে ছিলাম।

শ্যামা ॥ চেয়েছিলাম—হতে তো পারি নি। তাই সে কথা মনে এনে দুঃখ পাওয়া কেন! এখন আমাদের যা ছাপ সেইটে ভাব আর মন দিয়ে লাইনের কাজ কর বুঝলি?

ভটাং ॥ ঠিক কথা ওস্তাদ। এই তো আমি দেখনা—বইপত্তরের সঙ্গে সের দরে সার্টিফিকেটগুলোও ঝেড়ে দিয়েছি। ওসব রেখে মায়া করে কি করতে পেরেছিলাম। তুমি যদি লাইনের খবর না দিতে তো শালার বাপের চিকিৎসেও হ'ত না—বোন দু'টোকেও পার করতে পারতাম না।

শ্যামা ॥ কিন্তু আমি নিজেই কি ঠিক লাইনে চলছি রে। আসলে আমরা যে কি করছি সেটা নিজেরাই জানি না। শুয়োরের খোঁয়াড় দেখেছিস ভটাং—আমরা শালা সব সেই শুয়োরের খোঁয়াড়ে থাকা জন্তু। মান আর হুস বিসর্জন দিয়েই এ খোঁয়াড়ে ঢুকতে হয়।

ন্যাপলা ॥ (ইতস্ততঃ করে) একটা কথা ছিল গুরু।

শ্যামা ॥ বলে ফেল।

ন্যাপলা ॥ (ভটাংয়ের দিকে তাকিয়ে) না থাক—পরে বলব।

ভটাং ॥ ন্যাকা—পেটে ক্ষিদে রয়েছে মুখে লাজ।

ন্যাপলা ॥ (ধমকের সুরে) ভটাং সব সময় ফিচলেমি করবি না। মন মেজাজ ঠিক নেই।

ভটাং ॥ কেন চাঁদ—ওস্তাদ মেয়েছেলের দিব্বি দিয়েছে বলে?

শ্যামা ॥ আহ্—তোরা একটু থামতো। এক সাথে হলেই শুধু কচ্‌কচি! কাজের কথা কিছু ছাড় তো। আজ আবার দেউকিপ্রসাদের সঙ্গে রাজা সাহেবও আসবেন। নতুন একটা ভারি অপারেশানের প্ল্যান বলতে।

ন্যাপলা ॥ কোথায় আসবে, এখানে?

শ্যামা ॥ হ্যাঁ—আমি তাই বলেছি। দেউকির গদীতে বারবার যেতে আমার লজ্জা করে। অনেক চেনামুখের যাতায়াত ওখানে।

ভটাং ॥ হ্যাঁ—ওস্তাদ আমার কাকারও ওখানে যাতায়াত আছে।

ন্যাপলা ॥ আরে রেখে দে, তোর কাকা, শালা পয়লা নম্বরের চিটার। তাকে দেখে আবার আব্রু।

ভটাং ॥ মুখ সামলে কথা বলবি ন্যাপলা। নিজেরা না হয় জাত খুইয়ে নাম লিখিয়েছি। তা বলে বাপ-কাকার সম্মান দেব না!

ন্যাপলা ॥ ইস—কি আমার সম্মানের পুষ্যিপুত্তুর এয়েছেন রে। কেন, তোর বাবা রিটায়ার করে যখন ঘরে বসল, তখন তোর ওই যুধিষ্ঠির

কাকা কি তোদের দেখেছিল? তুই তো বলেছিলি—বাবার প্রফিডেণ্ড ফণ্ডের টাকাগুলোও কেমন ব্যবসার নাম করে ঝেড়ে দিয়েছে।

শ্যামা॥ তাই না কি রে।

ভটাং॥ (মাথা নীচু করে) হ্যাঁ ওস্তাদ। কাকাটা শালা একটা আস্ত শয়তান। বাবার টাকা ছাড়াও আমার বড়দিকে উল্টো ডাঙ্গায় ওর কি এক কারখানায় চাকরি দেবার নাম করে ঘরের বার করেছে।

স্যাপলা॥ ওর সে দিদি তো এখন উড়ে বেরাচ্ছে গুরু।

ভটাং॥ (উত্তেজিত ভাবে স্যাপলার জামা ধরে) খাল খিঁচে নেব শালা, দিদির নামে একটা কথা বের করেছ কি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব ওস্তাদের সামনে।

শ্যামা॥ (উঠে) এই ভটাং ছেড়েদে, জামাটা ছিঁড়ে যাবে।

[ভটাং জামা ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। স্যাপলা অপ্রস্তুত হয়ে শ্যামাকান্তের কাছে আসে। মুখ তলে কেউ আর তাকাতে পারে না]

শ্যামা॥ (সিগারেট বের করে) নে ধরা। (একটু থেমে) এরকম বাহাদুরি নিজেদের মধ্যে না করে অপারেশানগুলোর সময় করলে তো মোটা মাল ঘরে আসে। তা তখন তো আমাকেই আগে যেতে হয়। এই ভটাং, তোর দিদির কথা আমিও জানিরে। তা সে যাক গে—এ তো হবেই। এই তো এখনকার আসল চেহারা। বাপ-কাকারাই মুখের রেখাগুলোকে নিজের হাতে মুছে ফেলে নিজেদের নামও নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। তাই ও নিয়ে দুঃখ করে কি হবে নে-হাত মিলিয়ে নে।

[ভটাং এগিয়ে এসে স্যাপলার সিগারেট ধরিয়ে দেয়। তারপর—দু'জনেই জোরে হেসে ওঠে। ওদের হাসি থামতেই লোকটা সেই হাসির জের টেনে হাসতে হাসতে ওদের দিকে এগিয়ে আসে। তারপর শ্যামাকান্তর দিকে চেয়ে বলে]

লোকটা॥ বেশ বলেছ ভাই বেশ বলেছ—হাত মিলিয়ে নে। কিন্তু কে-কার হাত মেলাবে। হাত যে অনেক লম্বা হয়ে গেছে। ধরতে পারা যাচ্ছে না কিছুতেই। মেলাবে কেমন করে! হা—হা—হা—

মিলবে না—মিলবে না, কিছুতেই মিলবে না। হাত মিললেই তো অংক মিলে গেল। আর অংক মিললেই নিজেকে জানা হল। না—না—না তা কি করে হয়, তা কি করে হবে।

ভটাং ॥ এই ভাগ্—যত সব আপদ।

শ্যামা ॥ এই ভটাং চুপ কর। লোকটাকে আমি চিনি। উনি আমাদের প্রফেসার ছিলেন।

ন্যাপলা ॥ (বড় বড় চোখে) কি বললে গুরু প্র—ফে—স—র।

শ্যামা ॥ হঁ্যা—ফিলসফির প্রফেসার।

ভটাং ॥ তা ওর এ দশা কি করে!

ন্যাপলা ॥ এখানে তো আরও কয়েকবার দেখেছি। অন্য রাস্তাতেও ঘুরে বেড়ায়। শেলী হেমিংওয়ে এ সব থেকে লেকচার দেয়। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে শোনায়।

শ্যামা ॥ সবই কপাল বুঝলি, আর শালা বউটাও ছেনালের বেহদ্দ। তার জন্যই তো সারের এই অবস্থা। এখন অবশ্যি কাউকেই চিনতে পারেন না।

লোকটা ॥ (উত্তেজিত ভাবে) কে বলেছে চিনতে পারি না। Who told you, who is that baster! আমাকে আমি চিনবো না। নিশ্চয়ই চিনি, হাজার বার চিনি। আর আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি বলেই তো জয়ন্তীকে চিনতে কষ্ট হয় নি। (হেসে) একটুও কষ্ট হয় নি—একটুও না—।

[কথা বলতে বলতে আবার ডাষ্টবিনের পাশে চলে যায়]

ভটাং ॥ সত্যি ওস্তাদ এদের মত লোকের ভাল হয়ে থাকাটাই যেন পাপ, তাই না? তার চেয়ে এই বেশ আছে।

ন্যাপলা ॥ ঠিক বলেছিস্।

শ্যামা ॥ এই তো, আমাদেরই দেখনা। কলেজ থেকে বেরিয়ে কত স্বপ্নই না দেখেছিলাম। তোরও একটা কামনা ছিল, ভটাংয়েরও। কিন্তু হল কিছু? ডালহৌসির অফিস তো চষে ফেলেছি। ঘরে বাইরে শুধু উপদেশ আর বাণী ছাড়া মিলেছে কিছু?

ভটাং ॥ কি যে বল ওস্তাদ, মেলেনি আবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছাড়া নামের শেষে বিশেষ বিশেষ যে ডিগ্রিগুলো যোগ হয়েছে, সে তো ওই ঘুরে বেড়ানোর ফলেই।

স্থাপলা ॥ (জোরে হেসে) বেড়ে বলেছিস। এখন শালা ওই মস্তানী ডিগ্রির জোরেই নিজেরা খেয়ে ঘরকে খাওয়াচ্ছি।

শ্যামা ॥ তুই এখন সার্টিফিকেটগুলো বেচে দেবার কথা বলছিলি না ভটাং? খুব ভুল করেছিস ভাই। মনের সব বৃত্তিগুলো এখনও মরে যায় নি রে। হয়ত একটা চান্স পেলে একবার ট্রাই নেওয়া যেতে পারত। আমি কিন্তু আমার সার্টিফিকেটগুলো এখনও সঙ্গে নিয়েই ঘুরি।

স্থাপলা ॥ কেন গুরু—।

শ্যামা ॥ না মানে—এই—।

ভটাং ॥ বুঝেছি ওস্তাদ তোমার মোহমুক্তি এখনও হয় নি। মিথ্যেই তুমি ওস্তাদি কর। (একটু চড়া গলায়) তুমি কি এখনও বিশ্বাস কর ওস্তাদ, সৎপথে থেকে রুজির পথ সত্যিই আমরা পাব?

শ্যামা ॥ বিশ্বাস হারানোটা কিন্তু পাপ বুঝলি? এই যে দেউকিপ্রসাদ রাজাসাহেব এদের হাজার হাজার টাকার কারবার, রাতের অন্ধকারে— আমরা কি করি ওরা কি সে সময় আমাদের পরখ করতে আসে। আমাদের একটা কিছু বিশ্বাস করে বলেই, সেইটুকু টাকা দিয়ে কিনে নিতে চায়।

স্থাপলা ॥ বড় ক্ষিদে পেয়েছে গুরু। এ সব বেলাইনি ভদ্দর কথা শুনতে শুনতে মনটা কেমন ঝিমিয়ে আসছে। তোমার বাবুর আসতে তো দেরীই হবে। চল না বটুর রেষ্টুরেণ্টটা ঘুরে আসি।

শ্যামা ॥ না—না এখন আমার কোথাও যাওয়া চলবে না। তোরাই বরং ঘুরে আয়।

স্থাপলা ॥ (খেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়) গুরু—।

শ্যামা ॥ কি!

স্থাপলা ॥ তুমি না গেলে যদি আবার জগুর দলের মুখে পড়ে যাই আর—।

ভটাং ॥ ঠিক ওস্তাদ, সেদিন যা এক টক্কর হয়ে গেল! ওরা সব শানিয়ে আছে।

শ্যামা ॥ সে সব আমি হাফিজ করে দিয়েছি। জগুর সঙ্গে আমার লায়েলাপ্পা হয়ে গেছে। এখন থেকে রাজাসাহেবের অপারেশানে জগুকেও সঙ্গে নেব।

স্যাপলা ॥ পায়ের ধুলো দাও গুরু। ঠিক এই কথাটাই আমারও মনে এসেছিল। দলটা একটু মাথে মাথে করতে না পারলে, শালা বাকীদের সঙ্গে বেসামাল হয়ে পড়ছিলাম।

শ্যামা ॥ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তোকে আর দলের কথা ভাবতে হবে না। এখন যাওতো তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এস। বেশী টেনে আবার ফিচলেমী শুরু করো না। আমার কিন্তু সামলে নেবার সময় আজ একদম নেই।

ভটাং ॥ তুমি কিসস্যু ভেব না ওস্তাদ। এটাকে ম্যানেজ করে ঠিক টাইমে নিয়ে আসব আমি। নে চল স্যাপলা, ওস্তাদকে মৌতাত আনতে দে। (প্রস্থান)

[ওরা চলে যেতেই শ্যামাকান্ত রোয়াকে বসে একটা সিগারেট ধরায়। লোকটা ধীর পায়ে এগিয়ে আসে। শ্যামাকান্তর দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে]

লোকটা ॥ (গম্ভীর হয়ে) তোমার মুখের ছাপ খুঁজে পাচ্ছিনা কেন—Why ! মুখটা কোথায় দেখেছি বলতো !

শ্যাম৷ ॥ আপনি সার আমাদের কলেজে পড়াতেন। সদানন্দ কলেজে পড়তাম আমি। আমার নাম শ্যামাকান্ত আচার্য। কলেজ এ্যাথেলেটে—চাম্পিয়ান ছিলাম, মনে নেই আপনার ?

লোকটা ॥ কলেজ ! কিসের কলেজ ? বিদ্যাক্ষেত্র—পড়াশোনা। ধূর-ধূর। সব ভস্মে ঘি ঢালা। শেষ হয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সব। কে তুমি, তোমাকে আমি চিনি না। কাকে সার বলছ ! I am now researching evolution of human culture.
(একটু থেমে) জয়তী সান্যালকে চেন তুমি ! My wife—অভিনেত্রী। অফিসে অফিসে অভিনয় করে। নায়িকা সাজে। রোজ রাতে নতুন নায়ক বদলায়। She is generous and I am a fool (ফিস ফিস করে) You Mr. জয়তীকে কোথায় নিয়ে যাবে আজ, আমাকে একটু বলবে ?

শ্যামা ॥ আপনি কি বলছেন সার—আমি ঠিক—

লোকটা ॥ বুঝতে পারছো না, তাই না ?

শ্যামা ॥ আজ্ঞে—হ্যাঁ—

লোকটা ॥ হা—হা—হা—আমি জানি তুমি ধরা দেবে না। কিন্তু ধরা

তোমাকে পড়তেই হবে। ওসব নকল সোনা। কষ্টি পাথরে কষলেই বেরিয়ে পড়বে আসল চেহারা। তখন—তখন কাকে ফাঁকি দেবে তুমি? কাকে—। যাকগে—একটা ধোঁওয়া হবে ব্রাদার, গন্ধে মনে হচ্ছে বেশ কড়া নিকোটিন রয়েছে তোমারটাতে। একটা দাও না। আমি ঐ কোণে বসে টানি। না-না তোমায় সামনে খাব না।

[শ্যামা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করতেই লোকটা প্রায় ছিনিয়ে নেয় ওর হাত থেকে। তারপর হেসে বলে]

লোকটা ॥ তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে হে—অনেক দুঃখ আছে।

[শ্যামাকান্তর দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের জায়গায় চলে যায়। বাইরে মোটরের হর্ন শোনা যায়। সচকিত হয়ে শ্যামাকান্ত লাইট পোষ্টের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। কথা বলতে বলতে ঢোকে রাজাসাহেব আর দেউকিপ্রসাদ]

দেউকি ॥ সে যা বলিয়েছেন রাজাবাবু, ফাসকিলাস্। একদম বড়িয়া চীজ আছে—জোতি দেবী। লেকিন কিমত একটু কম হলে আউর ভি জলদি কাম করতে সুবিস্তা হোবে।

রাজা ॥ কমতি কি বলছ প্রসাদ। অলরেডি টপ্ দু'জন ডিরেক্টারের সঙ্গে ওর কথা হয়ে গেছে। একটা বই রিলিজ হয়ে একবার বাজারে নাম ছড়ালে তখন কি আর ধরা যাবে ওকে?
আর নামটা জোতি নয় জয়ন্তীদেবী। তোমাকে তো গাড়ীতে সবই বললাম। ব্ল্যাক মানিকে সাদা করার এ একটা বেশ সহজ রাস্তা। তা ছাড়া—তোমাদের অনেকেই তো এ লাইনে রয়েছে।

দেউকি ॥ হাঁ—হাঁ সে তো ঠিক বাত আছে রাজাবাবু। আচ্ছা আউর যো বাত ইসকা বারেসে হোবে ওসব হামার—গদ্দীকা ঘরমে হো জায়গা। আভি কালকা অপ্রেশান কা যো বাত বলতে এসেছি—ও তো কিজিয়ে।

রাজা ॥ সেই জন্যই তো এখানে এলাম। কিন্তু ওরা সব গেল কোথায়।

দেউকি ॥ হাঁ হাঁ—দেখিয়ে তো এখন রাতভি হয়ে গেল। আমাকে গদ্দীতে একবার যেতেই হোবে।

রাজা ॥ আরে রেখে দাও তোমায় গদ্দী, আগে কাজের কথায় এস। টাকাটা ঠিকমত এনেছ তো?

দেউকি ॥ (হেসে) হেঁ-হেঁ-হেঁ দেউকি প্রসাদ কভি বে-ইমানি কা বাত বোলে না বাবু সাব। জবান হামার এক আছে। এক হাতমে কাম কা বাত—আউর দুসরা হাতমে উসকা ইনাম। এহি তো হামারা ধরম বাবুজী।

রাজা ॥ ঠিক আছে টাকাটা দাও।

দেউকি ॥ লেকিন বাত পাক্কা নেহি—।

রাজা ॥ প্রসাদ—আমারও সময়ের দাম আছে সেটা ভুলে যেও না।

দেউকি ॥ হাঁ-হাঁ।

[ভয়ে ভয়ে টাকাগুলো বের করে রাজার হাতে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে শ্যামাকান্ত পা টিপে এসে দাঁড়ায়]

শ্যামা ॥ বড় দেরী করে এলেন সার।

রাজা ॥ (টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে) কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

শ্যামা ॥ আস্তাকুঁড়ে।

রাজা ॥ তোমার আজকাল বড় ঘুরিয়ে কথা বলার অভ্যেস হয়েছে কান্ত।

শ্যামা ॥ কি করি বলুন—অপারেশন করতে করতে নিজেদের আসল রূপগুলোকেই যে পাল্টে ফেলেছি। তাই কথাও মাঝে মাঝে বে-লাইনে হয়ে পড়ে।

দেউকি ॥ জানে দিজিয়ে রাজাবাবু—কান্ত বহুত চালাক আদমী হয়েছে। ছিপ্—ছিপ্কে হামাদোনকা বাত শুনা তো ক্যাহুয়া। ওভি তো ঘরকা সমান হ্যায়।

শ্যামা ॥ ঠিক বলেছ প্রসাদজী—ঘরকা সমান হয়ে গেছি কিন্তু ঘরে ওঠার পাসপোর্ট পাইনি।

রাজা ॥ বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় এস।

শ্যামা ॥ আমিও তো তাই বলছি সার। কালকের অপারেশনে জগুকেও সঙ্গে নিচ্ছি। তাই মাল কড়ির আগামটা একটু মোটা হলে ভাল হয়।

রাজা ॥ ওদের কেন !

শ্যামা ॥ কি করি সার—এক পাড়ায় বাস করে দু'টো দল গড়লে নিজেদেরই লোকসান। তা ছাড়া, গুরুর কৃপায় এক একটা অপারেশানে গুদামে মাল তো কম জমা পড়ছে না। তাই একটু সামলে যাওয়াই ভাল।

রাজা ॥ যা বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল।

শ্যামা ॥ স্পষ্ট করেই তো বলছি সার, বাংলা কথা আপনার বুঝতে না পারার কথা তো নয়।

রাজা ॥ (রেগে) কান্ত।

শ্যামা ॥ চোখ রাঙ্গাবেন না সার—চোখ রাঙ্গাবেন না। আমি যা করছি সব অপরেশানের ভালর জন্যই।

দেউকি ॥ কান্ত ভাইকা সাথ ঝগড়া কাহে রাজাবাবু। কামকা বাত উস্‌কা পর ছোড় দিজিয়ে। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

শ্যামা ॥ কারেক্ট বলেছ প্রসাদজী। যে ডাক্তার অপারেশান করবে যন্ত্রপাতি-গুলো তাকে পরীক্ষা করতে দিলেই ফল ভাল হবে, অপারেশন সাকসেসফুল। কি বলেন সার—ঠিক বলি নি ?

রাজা ॥ ওদের দলে আনলে বাড়তি কত দিতে হবে ?

শ্যামা ॥ তা ধরুন—সব ঝক্কি সামলে অপারেশান পিছু পাঁচের কম হবে না।

রাজা ॥ টাকা কি গাছের ফল—যে তুমি ঝাঁকি দিলেই অমনি কোঁচড় ভরে উঠবে ?

শ্যামা ॥ (এগিয়ে এসে) রাতের অন্ধকারে গায়ে রং মেখে, রেলের ইয়ার্ড টপকে, গভর্নমেণ্টের গাড়ী থেকে মাল খালাস করে আবার চার মাইল রাস্তা লরী চালিয়ে আপনাদের গো-ডাউনে সে মাল পাচার করাটাও সুইচ টেপা মেশিনের কাজ নয় সার।

রাজা ॥ তিনের বেশী এক পয়সাও দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্যামা ॥ টাকাটা কিন্তু আপনার নয় সার।

রাজা ॥ তোমার গণ্ডি কিন্তু ছাড়িয়ে যাচ্ছ কান্ত, ভুলে যেও না—।

শ্যামা ॥ ভুলে আমরা যাই না সার—ভুল আপনাদেরই হয়। না হলে এতদিন এভাবে পড়ে থাকার কথা তো আপনার সঙ্গে ছিল না।

রাজা ॥ কোন অন্যায় করেছি কি ! ব্লাড ব্যাঙ্কে লাইন দিয়ে রক্ত বেচে ভিক্ষে নিয়ে বেঁচেছিলে। সেখান থেকে উদ্ধার করাটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে, কি বল ?

শ্যামা ॥ না, সেজন্য—সত্যিই কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু আপনি তখন কথা দিয়েছিলেন, আপনার ফার্মে একটা চাকরি আমাকে দেবেন।

রাজা ॥ কেন—চাকরি তো তুমি করছো।

শ্যামা ॥ (হেসে) ঠিক বলেছেন সার চাকরিই বটে। (একটু থেমে) কিন্তু বিশ্বাস করুন সার সত্যি এভাবে টাকা নিতে আমি চাইনি। ওই ন্যাপলা-ভটাং-জগু-ওদের মনের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমি ওরা কেউ-ই এভাবে বাঁচতে চায়নি।

দেউকি ॥ বহুত দেরী হয়ে যাচ্ছে—রাজা সাব। আভি তিন চারঠো ভারি কেস্ কা বাত—দুসরা আগামে করতে হোবে। ফির জোতি দেবীজী কা সাথ মুলাকাত। এ কান্ত ভাইয়া কাহে গুস্সা মে হো—।

রাজা ॥ তোমার কথা আমি নতুন করেই ভাববো—শ্যামাকান্ত। সত্যি প্রতিশ্রুতির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যাকগে—তুমি মনে-করিয়ে দিয়ে ভালই করলে। এখন এস কালকের প্ল্যানটা বুঝে নাও।

[রাজা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে একবার বাইরেটা দেখে শ্যামাকে কি সব বোঝাতে থাকে।]

শ্যামা ॥ কিন্তু সার ফোর নাইন জিরো আবার ভুল করে সেবারের মত ডাইরেকট অ্যাকসান চালাবে না তো? ওই ভুলের জন্য ভটাংটাকে পা নিয়ে খুব ভুগতে হয়েছিল।

রাজা ॥ না—সে সব কোনও চিন্তা নেই। আজ ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। দু'একটা ব্ল্যাংক ফায়ার ছাড়া তোমাদের দিকে তাকাবেও না—ওরা। তা সেও লরী বেরিয়ে যাবার পর সুতরাং—।

শ্যামা। বুঝেছি সার, এবারে বড় নৌকায় দড়ি বেঁধেছেন। আচ্ছা তা হলে কিস্তিটা—ছাড়ুন।

রাজা ॥ (পকেট থেকে বাণ্ডিল বেরকরে গুণে এক হাজার টাকা শ্যামার দিকে এগিয়ে দেয়) নাও এটা খরচ হিসেবে রাখ। বাকীটা অপারেশনের পর।

শ্যামা ॥ না সার অন্ততঃ আরও এক আজ দিতেই হবে। ন্যাপলাদের কিছু টাকার দরকার। আর জগুকেও কথা দিয়েছি।

রাজা ॥ বেশ তো, একটু ম্যানেজ করে নাও না—কালতো সবই পাবে।

শ্যামা ॥ না কাল নয় আজ এখুনি—।

[কথার মাঝে লোকটা এসে পিছনে দাঁড়ায়, দেউকি প্রসাদ ভূত দেখার মত চমকে ওঠে]

লোকটা ॥ না-না-না অমন কাজ করো না ভাই। কালের জন্য কিছু ফেলে রাখতে নেই। Be-quick, আজের জিনিষ আজই বুঝে নাও।

রাজা ॥ (ক্রুদ্ধ-ভাবে) এই, কে তুমি।

দেউকি ॥ সীয়ারাম—সীয়ারাম—। যত ঝুট-ঝামেলা-কৌন হায় রে।

লোকটা ॥ নাম নেই—ছিল একদিন (রাজার দিকে) একটা টাকা দাও না একটু কফি খাব-ব্ল্যাক কফি।

রাজা ॥ খাওযাও খেটে খেতে পার না। বেশ তো চেহারা খানা রয়েছে

দেউকি ॥ হামার গদ্দীমে মাল খালাস করতে লাগিয়ে দিব বাবুজী।

রাজা ॥ সব সময় কথা বলতে এস না প্রসাদ, চুপ কর তুমি!

লোকটা ॥ মালতো কবেই খালাস করেছি। আবার নতুন করে কি করবো। There is nothing pending now.

(হঠাৎ রাজার মুখটা ভাল করে দেখে)

তোমাকে যে খুউব চেনা-চেনা লাগছে। yes, I have seen you, কোথায় দেখেছি বলতো। (একটু থেমে) হ্যাঁ—হ্যাঁ এই তো ধরেছি, জয়তীর গাড়ীতে—বাড়ীর সামনে হাসাহাসি টানাটানি—সব ওয়াচ করেছি। হা-হা-হা সব দেখেছি—।

রাজা ॥ (শ্যামাকে) একটু দেখনা কান্ত।

শ্যামা ॥ আপনি যান সার, টাকা আমি দেব আপনাকে।

লোকটা ॥ কেন, why তুমি টাকা দেবে কেন? ওই দেবে। He must give me money. জয়তীকে নিয়েছে আর টাকা দেবে না—নিশ্চয়ই দেবে।

দেউকি ॥ জলদি করুন রাজাসাব। বেশী গোলমাল হলে দুসরা কোই আ জায়েগা তো ভারি মুসকিল হোবে—হাঁ।

রাজা ॥ (আরও একহাজার টাকা গুনে শ্যামাকে দেয়) এই নাও তোমার কথাই রইল। পুরো দু'হাজারই দিলাম। কাল কিন্তু টাইমলি কাজ ফিনিস হওয়া চাই।

শ্যামা ॥ সব ঠিক হয়ে যাবে সার—নিমকের দাম আমরা দিতে জানি।

[রাজা—দেউকিপ্রসাদ দ্রুত বেরিয়ে যায়। শ্যামাকান্ত টাকাগুলো গুনতে থাকে। লোকটা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, তারপর শ্যামাকান্তের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে]

লোকটা ॥ পালিয়ে গেল—দেখলে তো। ওকে আমি চিনতে পেয়েছি, তাই আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। ভীতু কোথাকার—কাওয়ার্ড।

শ্যামা ॥ আপনি কিছু খাবেন সার?

লোকটা ॥ এ্যাঁ—খাওয়া—না—না খেয়েছি। আজ আর খাব না। একটু কফি খাওয়াতে পার? বেশ কড়া করে এক কাপ ব্ল্যাক কফি। জয়তী বেশ বানাত। কিছুতেই ঘুম আসছে না।

শ্যামা ॥ আপনি একটু বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

(বেরিয়ে যায়)

লোকটা ॥ তুমি আর আসবে না—সে আমি জানি। জয়ন্তীও তো একটু আসছি বলে বেরিয়ে যেত। তারপর সারারাত রিডিং রুমে বসে বসে আমি ভোরের আলো দেখতে পেতাম। কিন্তু সে তো ফিরে আসতো না।

(হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে আসে)

কিন্তু একি এসব কি বলছি আমি, মাঝে মাঝে কি যে হয়, লোকটিকে নিশ্চয়ই জয়ন্তীর সঙ্গে দেখেছি। সিনেমা লাইনের লোক, আমাকে কিন্তু না চেনার ভান করলো। তবে এই ছেলেটি তো ঠিক চিনেছে। Once upon a time আমি যে অধ্যাপক ছিলাম সেটা তো ভোলেনি ও। তাহলে—তাহলে এখনও কি কিছু সৎবৃত্তি বেঁচে আছে? (আবার ভাবান্তর হয় চিৎকার করে বলে)

না—না—না নেই। মায়া মমতা ভালবাসা সব মরে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে সব।

[মাথায় চুল ধরে উপরের দিকে তাকায়। তারপর বলে]

কেন, why—কেন তুমি আমাকে এভাবে সৃষ্টি করেছিলে? You—you—you—I say you. মান আর হুঁস দিয়ে কেন তুমি আমাকে পাঠিয়েছিলে? বল, জবাব দাও—কেন—কেন—কেন—।

[শেষের কথাগুলো কান্নার আবেগে বাজতে থাকে। স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে লোকটা উপরের দিকেই তাকিয়ে থাকে। কথা শেষ হতেই লোকটারই বয়সী আর একজন ধীর পায়ে এগিয়ে আসে রোয়াকের উপর বসে। খুব পরিশ্রান্ত। হাতে খবরের কাগজের একটা প্যাকেট]

শশীভূষণ ॥ (প্যাকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে। উঠে লোকটার দিকে এগিয়ে বলে) আমাকে একটু আগুন দিতে পারেন কর্তা ?

লোকটা ॥ (চমকে—ঘুরে) আগুন!

শশী ॥ হঁ, বিড়িটা ধরাইতাম।

লোকটা ॥ আগুনে কি বিড়ি ধরে? আগুন তো ঘর পোড়ায়। মন পুড়িয়ে খাক করে দেয়। (একটা হাত টেনে বুকে রেখে) এই

দেখ এখানটা হাত দিয়ে দেখ দাউ—দাউ করে আগুন জ্বলছে। ধরিয়ে নাও না।

শশী। পাগল না কি।

লোকটা। (হেসে) এইবার ঠিক ধরেছ ব্রাদার, পাগোল মাথা গোল সব একাকার হয়ে এই পৃথিবীটাকেও তালগোল করে ফেলেছে। আর তাইতেই তো চারিদিকে এত হট্টগোল মিছিল—বন্যা—ভূমিকম্প—টাইফুন—ধ্বংস। আর এরই মধ্যে বেঁচে থেকে তুমি সুখে বিড়ি টানতে চাও।

শশী। আইচ্ছা—ঝামেলায় পড়লাম দেখি। না দাদু, আমার বিড়ি খাওয়োন মাথায় থাউক। অখন একটু বসি। গলাটা কাঠ হইয়া গেছে।

লোকটা। (পকেট থেকেই দেশলাই বের করে) আমাকেও একটা খাইসিস্ দাওনা। দুজনে এক সঙ্গে আগুন ধরিয়ে, বেশ আয়েস করে টানা যাবে।

শশী। (বিড়ি বের করে) তাই কও। খাশা চাপছে। আরে ভাই আমিও তোমার মতন ওই সগগল কথা কইতাম। উনতিরিশ বচ্ছর মাষ্টারি করতাছি (জিভে কামড় খেয়ে) ভুল কইলাম—অখন আর করিনা। অখন যে কি করি আমি নিজেই জানিনা। তা তুমি বস। শলাইটা দাও, জ্বালি।

[গভীর মনযোগ দিয়ে লোকটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শশীভূষণের দিকে। তারপর দেশলাইয়ের কাঠিটা জেলে মুখের সামনে স্থির ভাবে ধরে থাকে। ভয় পেয়ে শশীভূষণ উঠে দাঁড়ায়। কাঠিটা নিভে যায়। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বলে।]

লোকটা। তোমাকে চিনতে বোধহয় আমার ভুল হয়নি শশী নিয়োগী।

শশী। (চমকে) আরে হ আমার নাম তো শশীভূষণ নিয়োগী ঠিকই কইছ। কিন্তু তোমারে ঠিক।

লোকটা। মনে করতে পারছো না—তাই তো—।

শশী। হ, কিন্তু গলার আওয়াজখান য্যান খুবই চেনা চেনা লাগে।

লোকটা। তুমি মহেন্দ্রপুরে ছিলে, তাই না?

শশী। (কাছে গিয়ে) তুমি য্যান উমানাথ ঠ্যাকে।

উমানাথ॥ (চমকে) না—না—আমি পাগল। উমানাথ এখন দিগম্বর। তোমাকে আমি চিনি না। তুমি যাও, চলে যাও।

শশী॥ পালাইবা কই? ঠিকই ধরছি। আরে ভাই তোমার ঠিকানা লইয়া কত খোঁজ করছি। কেউ কইতে পারে না। বাড়ীতে তো ঢুইকতেই পারলাম না। শ্যাষে একদিন রাস্তায় তালে থাইক্যা, তোমার চাকরটারে জিগাইলাম সে তো তোমার বউয়ের নামে তোমার নাম মিলাইয়া কি যে সব মাথামুণ্ডু কইলো, কিছুই বুঝি নাই। তা তুমি এভাবে আছ কেন!

উমা॥ (কান্নার আবেগে) কেন আছি তাতো জানি না ভাই। তবে চিনতে যখন পেরেছ, তখন আমার কথা থাক। তোমার কথা বল। অন্য একদিন এই আস্তানায় এসে আমার কথা শুনে যেও।

[দেশলাই জেলে দু'জনাই বিড়ি ধরায়]

শশী॥ (জোরে বিড়ি টান দিয়ে) আমার কথা কি আর কমুরে ভাই। বেশ আছিলাম। কিসের যে টানে পড়লাম। সগগলেই দেখি রাইতে রাইতে ঘর ছাড়ে। চাইরদিকে খালি ফুসুর-ফাসুর আর চাপাচাপি। মন খুইলা কথা কেউ কয় না।

উমা॥ তুমি কবে এলে?

শশী॥ তা ধর দুই আড়াইমাস হইয়া গেছে।

উমা॥ তোমার মেয়েরা কোথায়?

শশী॥ বড়টারে পার করছি। তোমারে তো বিয়ার চিঠি পাঠাইছিলাম। ছোট মাইয়ারে লইয়া আইসা পড়লাম।

উমা॥ কোথায় আছ?

শশী॥ ধাক্কা খাইয়া সীমানা পারাইয়া, দুই দিন তো গাছতলায় রাইত কাটাইছি। তা যাই কও উমানাথ, তোমাগো এই দ্যাশের মানুষগুলান সব শকুনের লাগান। মাইয়া মানুষ দ্যাখলে ছোঁ পাইতা আসে।

উমা॥ (হেসে) এতক্ষণ একটা কথার মত কথা বলেছ হে শশী। শকুন তো ভাল। পচা-গলা মাংস খায়। এরা সব জ্যান্ত খেগো দেবতা। মেয়ে মানুষদের মহাপূজার বলি মনে করে কাঁচা খেয়ে ফেলে। খুব সাবধান।

শশী॥ সে আর তোমারে কইতে হইবো না। মাইয়ারে লইয়া আমি একখান ঘর ভাড়া করছি। তোমারে চুপ কইরা কই। মাষ্টারী কইরা তো কিছুই

করতে পারি নাই। সোনার মায়ের কয়খান গয়না আছিলো, তাই লইয়া দুর্গার নাম কইয়া পাড়ি তো দিলাম। তা ভয় ধরলো খুব। মাইয়ারেও কই নাই। শ্যাষে সীমানায় আইসা দেখি, আমার ছাত্র—তফাজ্জুল হোসেন হইছে পার করনের কর্তা। তাই ওইগুলান লইয়া কিছু ঝামেলা হয় নাই।

উমা॥ তা হলে তো তুমি ভাগ্যবান।

শশী॥ এই দেখ—আসল কথাটাই ভুইলা গেছি। তুমি ঠিকই কইছ, ভাগ্য আমার ফিরাইতে ইচ্ছা নাই। তোমাগো ভাগ্য—ফিরাইয়া দেওনের একখান কাম আমি পাইয়া গেছি।

উমা॥ কি রকম!

শশী॥ আরে ভাই কইলকাত্তা শহরে দেখি সগগলেই ভাগ্য ফিরাইতে উইঠা পইরা লাগছে। কয়দিন তো সকল চেনা জায়গায় ঘুইরা ঘুইরা পাও দুইটারে কুলাইয়া কালাইলাম। শ্যাষে গত মাসে শিয়ালদর রাস্তায় আমাগো যোগেশের লগে দেখা।

উমা॥ যোগেশ—

শশী॥ তুমি চিনবা না—হ্যাশের পোলা। অর বাপেরে আমি পড়াইছি। দেখি কি সেই যোগেশ একখান দোকান ফাঁদাইয়া বইছে। মেলা ভিড় সরাইয়া কাছে গিয়া দেখি লাল-নীল সব টিকিট সাজাইয়া আছে যোগেশ। আমারে চিনে নাই। কিন্তু পোলাটা ভাল। ভিড় একটু কমলে, আমি পরিচয় দেওনে চা আইনা খুব খাতির করল।

উমা॥ আপ্যায়নে ভুলে গিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে বসলে তুমি। আরে এতো জানা গল্প। এর পরের ঘটনা বলে দিতে পারি আমি।

শশী॥ তুমি বড় বাজে কথা কও উমানাথ। আমি যোগেশেরে নিমন্ত্রণ দিমু কেমনে। ওতো নিজেই আমার কথা শুইনা খুব আফশোষ করলো। পরের দিনই আমার শ্যামবাজারের বাসায় আইসা হাজির। মাইয়ার জন্তেও চেষ্টা করবো কইলো। আর আমারে এই টিকিট বেচনের ভার দিল। এই দেখ।

[কাগজের প্যাকেট খুলে লটারি টিকিট বের করে]

এই সপ্তাহেই আছে পাঞ্জাব না হরিয়ানা কোন খানের য্যান দুই টাকায় দশ লাখ। তুমি একখান টিকিট কিনবা ভাই—আইজ বেশী বিক্রি হয় নাই।

উমা ॥ ভাল মক্কেল পেয়েছ। নিজের ভাগ্য আমি নিজেই ফিরিয়ে ছিলাম শশী। পুরুষকারকে জয় করেছিলাম। কিন্তু কি পেলাম তাতে। জালতো ঠিকই ফেলেছিলাম গুটিয়ে আনতে পারলাম কোথায়। এ পৃথিবীতে সেটা সম্ভবও নয়। একটা ধ্বংস চাই বুঝলে, তারপর আসবে আলো। Be and make মোটোতে এখন আর চলবে না। এখন সবাই ফানুষের নেশায় মেতেছে বুঁদ হয়ে ঘুরছে চক্রে।

শশী ॥ এই আবার শুরু করলা তো। টিকিট আইজ না কেনো কাইল কিনো। কিন্তু কেন যদি আমার থিকাই কেন—।

উমা ॥ (রেগে) না-না টিকিট-ফিকিট আমি কিনি না। ওসব জয়তীকে বলো। সে টাকা চায়। অ-নে-ক টাকা। আকাশ ছোঁওয়া-প্রাসাদ গড়ার টাকা। সবাই তাই চাইছে। সেও চায়—অন্যায় কি—টাকা যেমন করেই হোক চাই-ই চাই-ই।

শশী ॥ তোমার কি শরীর খারাপ করলো ?

উমা ॥ মাথা খারাপ—পাগল—Mad—Insanity বুঝেছ ? যাও যাও সরে পড়। তোমাকে আমি চিনি না। কে তুমি! দালাল—ফেরিওয়ালা জয়তীকে ভাগ্যবতী করতে এসেছ তুমি! এই চেহারায় হা-হা-হা পালিয়ে যাও পালিয়ে যাও। সে এসে দেখলে টাইগার ডেকে তোমায় রক্ত বের করিয়ে দেবে। পালাও তুমি পালাও।

(উদ্ভ্রান্তের মত বেরিয়ে যায়)

[শশীভূষণ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর টিকিটগুলো গুছিয়ে প্যাকেট করে নেয়]

শশী ॥ মাথাটা একেবারেই গেছে। তাইলে যা শুনছিলাম ঠিকই। কিন্তু একটা খট্‌কা লাগতে আছে। বাইশ বচ্ছর পর আমারে ঠিক চিনলো কেমনে! তাইলে তো পাগল না। অরে ধরনই লাগবো। যাই—অরে অ-উমানাথ উ-মা-না-থ।

[ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যায়—জয়তীও ঢুকছে, দুজনে ধাক্কা খায়। বোকার মত জয়তীর দিকে তাকিয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নেয় শশীভূষণ। তারপর দ্রুত বেরিয়ে যায়। জয়তী একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে কাপড়টা ঝেড়ে ফেলে। অপর দিক দিয়ে হাতে একটা সুটকেশ নিয়ে প্রবেশ করে সুপ্রকাশ]

সুপ্রকাশ ॥ একি তুমি এখানে।

জয়তী ॥ আমারও তো সেই প্রশ্ন তুমি এভাবে। আমি সমস্ত জায়গা খুঁজে মরছি। শেষে তোমার ঘরের রাস্তাতেই আসতে হ'ল। আচ্ছা কি করে চলে এলে বলতো? আমি তখনো মেক-আপ তুলিনি। অনুতোষের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে, সব ভুলে গেলে।

সুপ্রকাশ ॥ না কিছুই ভুলিনি। তবে কি জান, তোমাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি তোমার অনুতোষ মানে বাইরের জগতের রাজাসাহেবটি একটি আফ্রিকান গিরগিটি। ওর রং বদলানোর কায়দা তুমি বুঝবে না

জয়তী ॥ ওটা তোমার জেলাসী।

সুপ্রকাশ ॥ আবার ভুল করছো। ওই সব মানুষের ওপর এক ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না আমি।

জয়তী ॥ তা হলে বল এভাবে কোথায় যাচ্ছ?

সুপ্রকাশ ॥ বললাম তো জানি না, শুধু এইটুকু জানি, যাবার সময় হল বিহঙ্গের তাই যেতে হবে।

জয়তী ॥ না, তোমার যাওয়া হবে না।

সুপ্রকাশ ॥ বাধা কিসের? ইতি কথার পরে আর কথা থাকে না।

জয়তী ॥ থাকে বই কি, পুনশ্চ দিয়েও তো নতুন পাতা লেখা হয়।

সুপ্রকাশ ॥ পথ ছাড় এবারে, সত্যি যেতে হবে। তোমার নতুন প্রভাত মধুময় হোক—এই কামনাটুকু রেখে গেলাম।

জয়তী ॥ ও কথা বলো না সুপ্রকাশ। তোমার কামনায় প্রতিফলন জীবনে এঁকেছি বলেই উঠতে পেরেছি। এবার তুমি আমাকে নাও—পূর্ণ কর আমার দ্বিতীয় সত্তাকে।

সুপ্রকাশ ॥ তা হয় না জয়তী। তোমাকে বহুবার বলেছি তুমি ভুল করছ, অফিস পাড়ার ক্লাবগুলোতে মেয়েদের যোগাযোগ করিয়ে দেবার দুর্নাম আমার আছে ঠিক। কিন্তু তার বিনিময়ে সেই মেয়েদের উপভোগ করার মন আমার নয়। তাছাড়া আমার পুতুলের সত্তার সঙ্গে তুমি মিশে যেতে পারবে না।

জয়তী ॥ ভুল—এ তোমার ভুল ধারণা। তুমি ভাবলে কি করে—আমার জীবন ছন্দে তোমার সুরের মূর্ছনা নেই?

সু ॥ কেন মিথ্যে কথার জাল বুনছো। তুমি ভাল করেই জান, তোমার

পরিবেশে আমি কতখানি বে-মানান। আর দেবার মত আমার কিছু নেই।

জয়ন্তী॥ কিছুই কি নেই?

সু॥ কণামাত্রও নেই। উজাড় করে দিয়েছি সব, জলন্ত আগুন নিয়ে এখন তুমি নতুন খেলায় মেতেছ। সে আগুন শুধু পুড়িয়েই নিভবে না হয়ত—

জয়ন্তী॥ আমি নিজেও তাতে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব এই তো!

সু॥ না, ঠিক তা নয়। তবে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পেয়ে এবার—তুমি চিত্রজগতের সামনে অধিষ্ঠিতা হতে চলেছ—আর আমার প্রয়োজন কী?

জয়ন্তী॥ তোমার ওসব কথার চমক এখন থাক। এখন তোমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না।

সু॥ কি করতে চাও আমাকে নিয়ে। দাবী কি কিছু বাকী আছে?

জয়ন্তী॥ দাবী নয়—দেয়া।

সু॥ কিন্তু আমাকে মিডিয়াম করে তোমার সে দাবী তো মিটবে না।

জয়ন্তী॥ সত্যিই কিন্তু পরিবেশটা অসহ্য হয়ে উঠছে।

সু॥ তা হলে পথ ছাড়, ধূসর অতীতে ফিরে যাই আমি।

জয়ন্তী॥ না—এখন আর তা হয় না।

সু॥ ধৈর্যের সীমা আমারও আছে জয়ন্তী।

জয়ন্তী॥ আমার নেই।

সু॥ আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশী আছে। না হলে কি আর রাজাসাহেব দরবারে আসেন।

জয়ন্তী॥ তুমি ঘৃণারও অযোগ্য সুপ্রকাশ। বড় ছোট তোমার মন।

সু॥ একটা দুর্লভ মহৎ প্রাণকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে—জলন্ত কামনা নিয়ে যেদিন অর্থ আর প্রতিষ্ঠার দিকে ঝাঁপ দিয়েছিলে, সেদিন কিন্তু অনেক লোভাতুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে এই ছোট মনের মানুষটাই তোমাকে জায়গা করে দিয়েছিল।

জয়ন্তী॥ বার বার ওই ফেলে আসা জীবনটার কথা তুমি আমাকে কেন মনে করিয়ে দাও—কেন—। তুমি কি আমার বিধাতা?

সু॥ সে দুঃসাহস আমার নেই। তবে তোমার স্বামী, প্রফেসার সান্যালের জন্য আমার অন্তরে হয়ত কিছু জায়গা আছে। তাই তোমার পিছলে পড়া রাস্তাগুলোতে বার বারই তার মুখের ছবি আমি আঁকতে চেষ্টা করছি।

জয়ন্তী ॥ (হেসে) সাধু বাবাদের জন্য পাহাড়ের গুহা আর অরণ্যের পথই তো খোলা রয়েছে। মায়ায় তারা জড়ায় কেন? (উত্তেজিত হয়ে) তা ছাড়া কি দিতে পেরেছে তোমাদের ও প্রফেসার। বাড়ী, গাড়ী, অর্থ— একটাও তার নেই। যশ—বই পড়িয়ে যশের লিপসা, আমার তাতে কী! পৃথিবীর সমস্ত অসৎ মানুষগুলোকে উনি উপনিষদের বাণীতে সৎ করে তুলবেন। বোগাস্—অ্যাবসার্ড। জীবন থেকে যারা পালাতে চায়— তারাই ওকথা বলে, বুঝেছ?

সু ॥ তোমার জিনিষ তুমিই যখন বোঝনি, আমার বুঝে লাভ কি! তুমি যাও জয়ন্তী। অনুতোষ হয়ত প্রডিউসারকে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

জয়ন্তী ॥ এই তাহলে তোমার শেষ কথা?

সু ॥ না—এই শেষ নয়। তোমার তলিয়ে যাবার আগে আরও একটা অনুরোধ। এখনও সময় আছে, পার যদি ওই পাগল লোকটার পুতুলের সঙ্গেই তোমার স্বপ্নের পুতুলকে এক করে নিও—শান্তি পাবে। (জয়ন্তীকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, জয়ন্তী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জলন্ত আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে।)

জয়ন্তী ॥ ব্রুট কাওয়ার্ড—সেলফিস্ জায়েন্ট।

[মঞ্চের আলো কমে আসে। জয়ন্তী আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঢোকেন উমানাথ]

উমানাথ ॥ যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীটা ধ্বংস হবে। চাঁদে মানুষ উঠছে। সে ভারি মজার ব্যাপার। চাঁদকে তো ভেঙ্গে দু'টুকরো করতে পারবে না। তাহলে তো শশী মাষ্টারকে আর লটারীর টিকিট বেচতে হবে না। ভাল হবে, সে খুউব ভাল হবে। আমিও চাঁদে যাব। শশী আর আমি আবার গগন পণ্ডিতের পাঠশালায় নতুন করে ধারাপাত পড়বো। সুর করে বলবো—'চ'রৈ বেতি—চ'রৈ বেতি—চ'রৈ বেতি।

[জয়ন্তী বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। উমানাথকে এগোতে দেখে পাশ কাটাতে চায়। মুখোমুখি এসে পড়েন উমানাথ]

উমা ॥ কে—কে তুমি, চাঁদের দেশের মানুষ? না—জন্তু। না-না জন্তু হবে কেন! এই তো আমার মত হাত-পা-মাথা। ওকি ভয় পাচ্ছ কেন? আমাকে দেখে ভয় কিসের? আমি মানুষ—পৃথিবীর মানুষ।

[মুখে আচল দিয়ে হঠাৎ জয়ন্তী ফুঁফিয়ে ওঠে]

উমা ॥ কান্না—এখানে কান্না কেন! আলোর দেশে শুধু হাসি। (ভাবান্তর হয়) কিন্তু কি করে হাসতে হয়। হাসতে হাসতে কান্না—আবার কান্না থেকে হাসি। সে তো অভিনয়। অভিনেত্রী—। জয়তী সান্ন্যাল থেকে জয়ন্তী দেবী। কিন্তু তুমি তা জানলে কি করে? তবে কি তুমি?

জয়তী ॥ না আমি তোমার কেউ নই। সরে যাও তুমি, আমাকে ধরতে এস না—সরে যাও।

[উমানাথ এগিয়ে যায়, জয়তী পিছিয়ে যায়]

উমা ॥ তা হলে ঠিক ধরেছি—তুমিই অভিনেত্রী। ধরেছি যখন তখন তো ছাড়বো না। অভিনয়টা জীবন নয়, জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাটাই অভিনয়। তুমি কি বেঁচে আছ? বল তুমি কি জীবিত না মৃত! আত্মা-না-প্রেতাত্মা—?

জয়তী ॥ আর কাছে এস না—আমি কিন্তু চিৎকার করবো।

উমা ॥ সেটাও যে অভিনয় হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার হাত ধর। এস আমরা চাঁদের দেশে যাই।

জয়তী ॥ খবরদার আর একপাও এগিও না। শুনছো না—শুনলে না—তবে মর—।

[উমানাথ এগিয়ে যেতেই ধাক্কা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় জয়তী, টলতে টলতে উমানাথ গিয়ে পড়ে ডাষ্টবিনের উপর। মাথাটা কেটে যায়। রক্ত গড়িয়ে পড়ে। অস্ফুট শব্দ করে উমানাথ আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়ান। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আলো পড়ে উমানাথের মুখে]

উমা ॥ বন্দরের বন্ধা কাল-এবারের মত হল শেষ'।
　　নতুন উষার-স্বর্ণদ্বার,
　　খুলিতে বিলম্ব কত আর—তারপর—
তারপর কি। বল, বলে দাও—কে আছ, বল আর কত দেরী পৌঁছতে। আমাকে বলে দাও।

[এগিয়ে এসে মাথার রক্ত দুহাতে মেখে]

শোণিত ধারায় হোক আজ আত্মশুদ্ধি। মহামানবের ঘুম ভাঙুক। জয়তীদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে টেনে নিক। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন! আসনশুদ্ধি কি এখনও হয়নি? সব যে তলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটা ঘুরছে। তবে কি—তবে কি আরও চলতে হবে—আরও।

[কথায় শেষে—শ্যামাকান্ত এক হাতে কেটলি আর এক হাতে একটা বড় ভাঁড় নিয়ে ঢোকে]

শ্যামা ॥ নিন সার একেবারে আসল ব্ল্যাক কফি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়ে নিয়ে এলাম। (উমানাথ বিড়বিড় করে বলতে থাকেন)

উমা ॥ চরৈবেতি—চরৈবেতি—চরৈবেতি। (শ্যামাকে দেখে) কে—কে তুমি—তুমি কি দণ্ডপাণি ?

শ্যামা ॥ কফি সার—ব্ল্যাক কফি।

উমা ॥ না—না—আর ব্ল্যাক নয়—হোয়াইট—সাদা। কালোর আবরণ দূরে সরিয়ে দাও। আলোর ইশারার দিকে তাকাও।

শ্যামা ॥ ইস্—আপনার কপালটা কাটলো কি করে সার ? রক্ত পড়ছে যে।

উমা ॥ লাল রং তো—উজ্জ্বল টকটকে লাল রংয়ের রক্ত। নতুন সূর্যের প্রথম রশ্মির মত লাল। তাই না। না না-না হাত দিও না—মুছে ফেল না—ওটা রক্ত তিলক, জয়টীকা।

এগিয়ে চল—বুঝলে শ্যামাকান্ত এগিয়ে চললেই জীবন খুঁজে পাবে। তুমি—ভটাং—ন্যাপলা—জয়তী—রাজা দেউকিপ্রসাদ সবাই পাবে। পথ পেতেই হবে। সাধনা কখনও মিথ্যে হতে পারে—না।

আলোর দিকে যাও। অন্ধকারের পথ ছেড়ে বরং আলেয়ার আলোকেও চিনে নিতে চেষ্টা কর। সেখানেও মিলবে পথ।

[বোকার মত উমানাথের দিকে একটু দেখে শ্যামাকান্ত হেসে বলে]

শ্যামা ॥ এই তো সার আপনি ভাল হয়ে গেছেন। আমাদের নামগুলো সব ঠিক-ঠাক বলে গেলেন। চলুন সার আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি।

উমানাথ ॥ (মুখে আঙুল দিয়ে) চুপ—ওকথা বলো না—আমি পাগল সবাই তাই জানুক। তুমিও তাই জানবে। আমাকে পাগল হয়েই থাকতে দাও। তোমরা শুরু কর। আমার যে এখনও কাজ বাকী আছে। জয়ন্তীকে জয়তী করার ব্রত যে আমায় শেষ হয়নি। আলোর রেখা ধরে নতুন প্রভাতের দিকে এগিয়ে যাও তোমরা—নতুন করে শুরু কর। সুর করে বল, আবার—

"অসতো মা সদগময় ;
তমসো মা জ্যোতির্গময় ;
মৃত্যোমামৃতং গময় ;
অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু"।

[মঞ্চের আলো প্রফেসারের চলার দিক অনুসরণ করে। সবের মধ্যে উদাত্তকণ্ঠে ভেসে আসে—"অসতো মা—' স্তব্ধ হয়ে একটু থেমে শ্যামাকান্ত প্রফেসারের চলার দিক অনুসরণ করে এগিয়ে যায়]

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

রাধামোহন সেন-কৃত সঙ্গীত তরঙ্গ

(পূর্বানুবৃত্তি)

আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে "গ্রন্থকারের গুণ-পরিচয়" প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, রাধামোহন সঙ্গীত তরঙ্গ ছাড়া আরও দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—অন্নপূর্ণা মঙ্গল ও রস-সার-সঙ্গীত। অপর পক্ষে কৃষ্ণস্বামীর (মৈলাপুর, মাদ্রাজ) তালিকায় দেখা যাচ্ছে সঙ্গীত-তরঙ্গ প্রণেতার আরও দুটি গ্রন্থ—সঙ্গীত রত্ন ও নাটক দর্পণ সূত্র—তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কৃষ্ণস্বামীর তালিকার মধ্যে তদানীন্তনকালে সংগৃহীত গ্রন্থাদির নামই উল্লিখিত হয়েছে; অসংগৃহীত অতিরিক্ত গ্রন্থাদি সম্পর্কে এ ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়। কিন্তু মূল সঙ্গীত-তরঙ্গের মধ্যে সঙ্গীত-রত্ন ও নাটক দর্পণ সূত্র নামক গ্রন্থদুটির সংবাদ উল্লিখিত হলো না কেন সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে। সঙ্গীত-তরঙ্গের মধ্যে "ভরত-মতানুগ্" সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। ভরতমুনি পৃথকভাবে কোন সঙ্গীতশাস্ত্র লিখে যাননি; তাঁর নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু হিসাবেই সঙ্গীত-কলা-বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে। সুতরাং সঙ্গীত-তরঙ্গের গ্রন্থকারও যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং সেই আমলের তৌর্য্যত্রিক্‌দের মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে সঙ্গীত তথা গীত-বাদ্য-নৃত্যের প্রয়োগ পরিবেশনা সম্পর্কে কিছু ধ্যান ধারণা পোষণ করতেন এমন অনুমান অসঙ্গত নয় এবং মধ্যযুগের পুণ্ডরিক বিঠ্‌ঠল কর্ণাটকী (১৫৯৯ খৃঃ) যেমন রাগমালা, রাগমঞ্জরী, সদ্রাগচন্দ্রোদয় প্রভৃতি সঙ্গীত-গ্রন্থ ছাড়াও পৃথকভাবে "নর্ত্তন-নির্ণয়" রচনা করে গিয়েছিলেন তেমনি রাধামোহনও হয়তো ভরত-মতানুগ্ মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য-মন্তব্য পত্রস্থ করবার বাসনা পোষণ করেছিলেন; বিশেষতঃ তাঁর জীবদ্দশাতেই যখন সহর কোলকাতার ডোমতলা অঞ্চলে হেরোসিম্ লেবেডফ্ সাহেব ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাঙ্গালী নট-নটীদের দ্বারা মঞ্চাভিনয় করিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য স্বনামধন্য টপ্পাশিল্পী নিধুবাবুও (রামনিধি গুপ্ত) ছিলেন রাধামোহনের সমসাময়িককালের গুণী এবং নিধুবাবু বিরচিত যে দুটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি তার মধ্যে একটির নাম ছিল "রসিক মনোরঞ্জন", প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ রাধামোহনের সঙ্গীত তরঙ্গ প্রকাশিত হবার দু' বৎসর পরে। নিধুবাবুর অপর

গ্রন্থটির নাম ছিল "গীত রত্ন" প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ; অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। এখন বিবেচ্য, কৃষ্ণধামী তাঁর তালিকায় মধ্যে "গীত রত্নের" সঙ্গে "সঙ্গীত রত্নের" গোলমাল করে ফেলেছিলেন কিনা। এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করেও আমরা কিছু জানতে পারিনি। আশা করি সমস্যাটা গুণীজ্ঞানীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অতঃপর গ্রন্থারম্ভ করা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, আলোচনার সুবিধার জন্য গ্রন্থোক্ত দুটি পংক্তি—একটি সূত্র—এই হিসাবে সংখ্যাপাত্র করেছি আমরা। মূল গ্রন্থে সূত্র-সংখ্যা নির্দ্দেশিত হয়নি।

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

সঙ্গীত তরঙ্গ

নমস্কার-সূত্র।

অচল সচল জীব সৃজিত যাঁহার।
অপদ সপদ দুই সৃজন তাঁহার ॥ ১
হস্ত-পদ-হীন যারা তাহারা সচল।
যাঁহার ইচ্ছায় হয় এ রূপ সকল ॥ ২
অপরূপ রূপ যিনি করিলেন সৃষ্টি।
তিনি দিয়াছেন চক্ষু করিবার দৃষ্টি ॥ ৩
নার্থ সার্থ আদি শব্দ যাঁহার সৃজন।
তিনি দিয়াছেন শ্রুতি করিতে শ্রবণ ॥ ৪
যাঁর দত্ত দেহে শক্তি ভক্তি বুদ্ধি জ্ঞান।
তিনি দিয়াছেন মন করিবারে ধ্যান ॥ ৫
যাঁহার আদেশে বহে নিশ্বাস প্রশ্বাস।
যাঁহার লিপসায় স্বর কণ্ঠে করে বাস ॥ ৬
তাঁর উদ্দেশে আমার অসঙ্খ্য প্রণাম।
করিব সঙ্গীত-ভাষা এই মনস্কাম ॥ ৭

ইতি—নমস্কার-সূত্র ॥

হস্ত-পদ হীন যারা তাহারা সচল। আমাদের মনে হয় ছাপার ভুলে "অচল" স্থানে "সচল" হয়ে গিয়েছে।—১/২

ভূমিকা

সঙ্গীত-বিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবতের ভাষা করা যুক্তিমত নয়॥　১
অতএব কতগুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া॥　২
সংস্কৃত আদি তাতে যে সব বচন।
গদ্য পদ্য রূপে তাহা করিব রচন॥　৩
সোমেশ্বর মত আদি যত মত আছে।
শ্রেণীমত না রুচি, রচিব আগে পাছে॥　৪
হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানা দেশ।
কলিকাতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালার শেষ॥　৫
হিন্দুস্থানী লোক, কি বাঙ্গালি লোক যত।
সকলের অতি গ্রাহ্য হনূমান মত॥　৬
তত্রাপি রচিব আমি এরূপ নিয়মে।
নাদ-পুরাণের মত প্রকাশ প্রথমে॥　৭
মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য মত প্রকাশিব।
সর্বশেষে হনূমান-মত বিরচিব॥　৮
গ্রন্থ-সাগর কবিতা-সালিল কল্পিত।
নানা মত নদ নদী তাহাতে মিলিত॥　৯
ভাব রস ছন্দ অলঙ্কার আদি যত।
জল-জন্তু জলচর পক্ষিগণ মত॥　১০
পায়্যা রাগ-বাদ্য-রূপ পবনের সঙ্গ।
সঙ্গীত নামেতে তায় উঠিল তরঙ্গ॥　১১
বুদ্ধি-রূপ ক্ষুদ্র তার তাহাতে ডুবিল।
জ্ঞান সমারূঢ় ছিল—ভাসিতে লাগিল॥　১২
উদ্ধার-কারণে মন উপায় করিল।
পয়ার ছন্দের সূত্রে তাহাকে বান্ধিল॥　১৩
ভাষা-পুঁথি-রূপ তটে টানিয়া তুলিল।
সঙ্গীত-তরঙ্গ নাম তদর্থে হইল॥　১৪

জপকোটি-গুণং ধ্যানং ধ্যানকোটি-গুণোলয়ঃ।
লয়কোটি-গুণং গানং, গানাৎ পরতরং নহি॥ ১৫
জপ হৈতে কোটি গুণ একবার ধ্যানে।
ধ্যান হৈতে কোটি-গুণ-প্রাপ্তি লয়-জ্ঞানে॥ ১৬
লয়-কোটি গুণ গানে স্মৃতির বচন।
গানের সমান আর নাহিক ভজন॥ ১৭
আর এক নিবেদন কর অবধান।
সাম বেদে মন্ত্র আদি সমুদায় গান॥ ১৮
নাদ-পুরাণাদি আর নানান সঙ্গীত।
অপার সমুদ্র-সম তম-তরঙ্গিত॥ ১৯
সঙ্গীত-দর্পণ আর দেখ দামোদর।
রত্নাকর-মকরন্দ-রূপ রত্নাকর॥ ২০
মান কুতূহল সভা-বিনোদ-সঙ্গীত।
পারিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত॥ ২১
সোমেশ্বর সৃষ্টি কৈলা গান-বিদ্যা-রস।
গায়ক-সংহিতাকার শিষ্য অষ্টাদশ॥ ২২
দেবতার মধ্যে দুই দুর্গা সরস্বতী।
নাগ-লোক মধ্যে শেষ ভুজঙ্গের পতি॥ ২৩
দেব ঋষি মধ্যে ঋষি নারদ প্রধান।
ভরত কশ্যপ শাখা-মৃগ হনূমান॥ ২৪
গন্ধর্বের মধ্যে কলানাথ সার দল।
তুম্বুরু আসাব দেসা হো-হো-ই কোহল॥ ২৫
হা-হা হু-হু রাবণ অর্জুন নিরূপণ।
কিন্নর গায়ক যত কে কার গণন॥ ২৬
একদিন ব্রহ্ম-লোকে দেব-সভা হৈল।
মহারুদ্র ঈশ্বরের গুণ-গান কৈল॥ ২৭
বাজায়্যা পিণাক-যন্ত্র নাচায় বেতাল।
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী, তাল দেই তাল॥ ২৮

মহেশের গানে মগ্ন হৈলা দেবগন।
বিষ্ণু হইলেন দ্রব তথির কারণ॥ ২৯
হেন মতে গান-বিদ্যা প্রকাশ পাইল।
কলিযুগে নর-লোকে অনেকে শিক্ষিল॥ ৩০
এইরূপে কলির অনেক দিন যায়।
সংগ্রহ করিল কালায়ত লোক তায়॥ ৩১
পার্সীক ভাষায় লিপি করিয়া লইল।
সর্বসাধারণ-বোধে কঠিন হইল॥ ৩২
অধিকন্তু সংস্কৃত ভাষায় যা আছে।
তাহাও কঠিন প্রায় অনেকের কাছে॥ ৩৩
অতএব সেই সব গ্রন্থের বচন।
প্রাকৃত ভাষায় করিলাম সঙ্কলন॥ ৩৪
সকল পণ্ডিতগণে করি পরিহার।
কারপুট-পূর্বকে আমার নমস্কার॥ ৩৫
যদি কোন অশুদ্ধ দেখহ বুধগণ।
শুধিয়া দিবেন তবে এই নিবেদন॥ ৩৬
অপ্রাচর্য্য বাক্য যত আছে রচনায়।
প্রকাশিয়া রচিবার নাহিক উপায়॥ ৩৭
টীকা বিনা অর্থ পরিষ্কার নাহি হয়।
অতএব মনে বড় পাইয়াছি ভয়॥ ৩৮
কি করিব—ভারা-কবিতার নাহি টীকা।
পয়ার প্রবন্ধে বিরচিলাম ভূমিকা॥ ৩৯

[ক্রমশঃ]

কায়সুল হক

আমি আর কারো জন্য

আমি আর কারো জন্য প্রতীক্ষা করি না।
এখন বুঝেছি
শেষ পর্যন্ত থাকে না সঙ্গে কেউ।

মাঝপথে দাঁড়ালেই
ক্লান্তি বাড়ে।
তখন পিছুতে হয়।
সরাসরি তাকে মার-খাওয়া বলা যেতে পারে।

কারো জন্য আমি আর প্রতীক্ষা করি না।
দৃষ্টি সামনে রাখাই ভালো।
চশমার কাচ যথাসময়ে বদলে ফেলা ভালো।
দৃষ্টির ঘোলাটে ভাব
বিপদে ফেলবে, ফেলবেই একদিন।

সঙ্গের লোককে
সব সময় কি
সঙ্গে রাখা যায়?

সকলের নিজ নিজ শেষ আছে।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সুদেষ্ণার কাছে চিঠি

অনেক কাল দেশে ছিলুম না, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।
সমতলে গিয়েছিলুম জরিপের কাজে। জানোই তো
সে বড় ঘোরাঘুরির ব্যাপার।
মাপজোকের ব্যস্ততায় সময় কাটাতে হয় সারাক্ষণ।

কালই গিয়েছিলুম তোমাদের বাগান বাড়িতে।
ভেবেছিলুম, তোমার সেই হলুদ রঙের শাড়িটা দেখতে পাব বারান্দায়।
না দেখে সন্দেহ হল, হয়তো তুমি বাড়ি নেই।
হয়তো তুমি আসছি বলে বেরিয়ে গেছ
ভালোবাসার গল্প শুনতে।

আমি দৌড়ে তোমার বানানো সেই গুহাটার কাছে গিয়েছিলুম।
মনে পড়ে, তুমিই আমাকে প্রথম ওখানে যাবার পথ চিনিয়েছিলে।
গিয়ে দেখি, গুহাটার ভেতরে আরেকটা গুহা,
তার ভেতরে আরেকটা, তার ভেতরে…? তারপর?…
এমনি করে গুহার পর গুহা পেরিয়ে আমি ডাকলুম,
সু—দে—ষ্ণা—।

কোনো উত্তর পাইনি।
গুহাটা আমার ডাক ফিরিয়ে দিয়েছে
অবহেলায়।

এখন আমার ভারি ভয় করছে, সুদেষ্ণা,
তোমার গলার স্বর নকল করে একজন মহিলা আজ আমার কাছে
এসেছিলেন।
আমি কিভাবে শরীর বদল করি?
আমি কিভাবে গলার স্বর পালটে ফেলে তোমার কাছে যাই
প্রতিশ্রুতি ফেরত দিতে?

যোগব্রত চক্রবর্তী

রাকার জন্য

বাইরে থেকে তালা পড়লো হৃদয় জুড়ে আলো
এই মায়া কি সেই মায়া তার
প্রশ্ন উঠেছিল ?

আমি চমকে গেলাম তখন
যখন এইখানে সেইখানে
অনাস্তিকে প্রশ্ন ওঠে সেই কথাটার মানে।

আমার যাবার আগের দিন
সেদিন সুদিন কি দুর্দিন
কেউ কি বলেছিলো ?

একলা ঘরে বসিয়ে রেখে
কে যে বলেছিল
"একটু খানি বলো" ?

আমি সেই থেকেতো একা
হাতের মধ্যে হাত ছিল তার
কোথায় তুমি রাকা ?

প্রশান্ত রায়

তোমার অসুস্থ মুখ দেখে

তোমার অসুখ—খবর পেলাম ধূসর হাওয়ায়
রোদ না ওটা সকালবেলা
দেখতে পেলাম
রেলিং ধ'রে নিবিড় ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে
যেন তোমার সারা মুখে ক্লান্ত-বিকেল
খানিক বাদে ঘরের ভিতর হারিয়ে গেলে…

অথচ এই একলা আমি সারা সকাল সারা দুপুর
সমস্ত দিন
ঠিক—অবিকল দেখছি—তুমি রেলিং ধ'রে……
তোমার জন্য রোদ ওঠেনি, মেঘলা আকাশ

আমার ঘরে ম্লান-জানালায় আনমনা হই
গভীর আশা
দেখতে পাবো বিষণ্ন কোন্ বিকেলবেলায়
তোমার চোখে পদ্মপাতায়
ছড়িয়ে আছে শরৎকালীন ঝর্ণা-সকাল!

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
অপুর পাঁচালী

॥ ১০ ॥

রোদনভরা বসন্তে

আমায় কেমন যেন মনে হয় অপুর মতো বিভূতি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতেন, যাযাবর ইহুদীদের মতো quo vadis, কিম্বা কুত্র গচ্ছসি—কোথায় চলেছ? সময়ের বুকের ওপর দিয়ে দামাল ছেলের মতো, কোথাও দু-দণ্ড দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই আবার স্থানান্তরে। যেন কতো কাজ সেই না-পৌঁছনো ঠাঁইটিতে তোমার জন্যে বসে রয়েছে। আসলে যেখানে এসেছিলে সেখানেও বিনা কাজের আকর্ষণ যেমন টেনে এনেছিল, তেমনি অন্য কোনোখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য একই নিঃসঙ্গতার তাগিদে তোমায় টানছে। হলো দেখা, হলো মেলা—সাঙ্গ হল এখানকার খেলা। তাই অন্যত্র নিঃসঙ্গতাকে পাবার নেশার টান তোমার।

১৯৩৭-এর পূজোর ছুটীতে বিভূতিভূষণের দিনলিপি দেখলে তা-ই মনে হবে। তিনি লিখছেন 'এবার ভারী চমৎকার 'পূজো কাটল। সপ্তমীতে প্রতিমা দেখলুম চট্টগ্রামে, অষ্টমীতে চন্দ্রনাথে, নবমীতে কলকাতায় বিভূতিদের বাড়ি, দশমীর প্রতিমা বনগাঁয়ে ও বারাকপুরে...।'

এর কিছুদিন আগের একটি বর্ষণ দুর্যোগময় রাত্রে বসে বসে ভাবছেন: ১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্যের ঘোর, এখনো আমার সে ঘোর কাটে নি। বরং অনেক—অনেক ঘনীভূত হয়েছে। জীবনে তখন ছিলুম একা, এখন আরো সব অনেক এসেছে। যেমন সুপ্রভা, খুকু, মিনু, রেণু—এরা সব। সেই সামনের রবিবারে ত খুকুর সঙ্গে দেখা হবে ছ'ঘরেতে—তারপর ৯ই অক্টোবর সুপ্রভা আসবে শিলং থেকে।...ওর সঙ্গেও দেখা হবে। তারপর আমি চাটগাঁ যাবো ইচ্ছে আছে, সেখানে রেণুর সঙ্গে দেখা হবেই। এরা এখন জীবনে এসে আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে—তবুও দশ-এগারো বছর আগেকার সেই বনে, পথে প্রান্তরে, অরণ্য সীমায় যাপিত দিনরাত্রিগুলির স্মৃতি ফিরে এলে মনটা কেমন হয়ে যায়......।

'অভিজ্ঞতা অর্জন যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়—(তবে) আমি সেদিক দিয়ে ধনী...।'

বলা যেতে পারে এই কালটি তাঁর জীবনের পথে একটা তাৎপর্যময় অধ্যায়। আমরা দু-এক বছর পিছন থেকে দেখতে শুরু করলে সূত্রটি সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাবো।

নদীতে যেমন জোয়ার জীবনে তেমনি যৌবন। এদিকে ওদিকে কূল উপচে প্লাবনের ঘটা চলে। এমন জোয়ারের বেলাতে মানুষের মন কবি হয়ে পড়ে। আর কখনো বা সেই কালে সহজাত মনের ভাব সহজ উচ্ছ্বাসে ছন্দের আকারে আত্মপ্রকাশ করে :—

"ওগো সখি, ওগো মোর প্রিয়া, তব স্মৃতিখানি
মধুমাখা আঁকা রবে মম হৃদি তলে
চিরদিন। বহু প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে
এ জীবনে রাঙাইলে স্বপ্নমধুরিমা,
ভুলিবার নহে যাহা কভু। নিশীথের মর্মর
বাতাসে, অবিশ্রান্ত বিহগ কূজন-স্বনে—
কত নিশা, কত জ্যোছনা-যামিনী,
শরতের শান্ত সন্ধ্যা—পউষের স্বর্ণরাঙা মধুর বৈকাল
আমারে হেরিয়া প্রীতিপূর্ণ হাসিমাখা ডাগর নয়নে
সিঞ্চিয়াছে স্বর্গের অমৃত। কত ঢিল
ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে, কিশোরীর
কত চঞ্চলতা মন মর্ম
ঘুরিয়া ফিরিবে। ...যবে ঘাট
থেকে সিক্ত দেহে, আসিতে উঠিয়া—
আমি কত ছল করি লোভাতুর
দৃষ্টি মেলে রহিতাম চাহি—
বলিতাম—বড় ভাল দেখি তোরে স্নানার্দ্র বসনে।
তুমি হেসে শাসনের ছলে তর্জনী
তুলিয়া চলে যেতে দ্রুতপদে। সিক্ত
চরণের দুটি চিহ্ন বহু যুগ ধরি
আঁকা রবে সে-ঘাটের মৃত্তিকার পথে।" ॥ উৎকর্ণ ॥

বিভূতিভূষণের গদ্যের ভাষা কাব্যময় হলেও যেহেতু জীবনে কবিতা তিনি খুব কমই লিখেছেন সেহেতু এই বিরল সৃষ্টি যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে

তাতে সংশয় নেই। বস্তুতঃ দু-একটি গান ছাড়া তাঁর পরিণত কালের লেখনী থেকে আমরা আর কোনও কবিতা পাই নি।

'উৎকর্ণ' দিনলিপির গ্রন্থ থেকে এই কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। যদিও গ্রন্থের শেষে এটি মুদ্রিত হয়েছে, যতদূর মনে পড়ে পাণ্ডুলিপিতে সেভাবে সজ্জিত ছিল না। স্বাতন্ত্র্য দেবার জন্যই বোধহয় এইভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

বিদেশে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জার্নাল, ডায়েরি এবং আত্মজীবনীতে প্রেমকে আমাদের দেশের মতো নিষিদ্ধ বা রহস্যের অন্তরালে ধামা চাপা দেওয়ার বস্তু হিসেবে দেখা হয় না। সেকালে শিবনাথ শাস্ত্রী বা এ আমলে মহাত্মা গান্ধী ছাড়া এই ধরণের মানসিক বলিষ্ঠতাসম্পন্ন আত্মজীবনী রচনার নজীর বড় একটা চোখে পড়ে না। বিভূতিভূষণ আত্মজীবনী লেখেন নি। কিন্তু 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে সেই ধরণের একটা সংকল্পের প্রতিফলন ঘটেছে। বিভূতি রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়মশাইও এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সর্বোপরি 'উৎকর্ণে'র আরম্ভে বিভূতিভূষণের মানসিক উচ্চারণটি তাৎপর্যময়। 'আজ এই ডায়েরিটা প্রথম আরম্ভ করলুম, জানিনে কতদিনে শেষ হবে, কিন্তু এইজন্যে আরম্ভ করলুম যে সবদিক থেকে আজকের দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন।'

কি কি কারণে স্মরণীয়? দেশের বাড়িতে আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে তাঁর প্রথম স্ত্রী গৌরীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার হয়েছিল। 'তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। ...আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়।'...'আমার এত মনে আছে, থাকবেও চিরকাল।'

এই দিনটি স্মরণীয় তার আর একটি কারণ, দেশে এমন বন্যা আগে কখনও আসেনি। কুঠির মাঠে অবধি সাঁতার জল হয়েছে, গাছপালা সব ডুবে গেছে—শুধু মাথাগুলো জেগে আছে। 'যেখানে আর-বছর ব্যায়াম করতুম বিকেলে, যেখানে বসে কেলেকোঁড়ার ফুলের সুবাস উপভোগ করতুম, সে-সব জায়গা দিয়ে বড় বড় নৌকো চলেছে।' অতএব এমন ভরাবুক নদীর উপর ন-দি, রামপদ, পিসীমা, জগোদের নিয়ে নৌকোয় ক'রে বেলেডাঙ্গা, লতিডাঙ্গা হয়ে বাঁশতলার ঘাটে বেড়ানো চাই বই কি। মনে পড়ে সেই গানের সুর—'বানের জলে দেশ ভেসেছে রাখাল ছেলে' দেশে এসেছে কিন্তু বোয়ালমাছের সঙ্গে মনের কথা যে কইবে সেই বিরহিনী পল্লীরাধিকা আজ কোথায়!

আর শেষ হলেও তুচ্ছ নয় যে কারণটি সেটি হ'ল, 'তারপর বৈকালে খুকুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম আজ চারমাস পরে। সে কি আনন্দ যাবার

সময়ে। কত গল্প এই চারমাসে জমা হয়েচে, ওকে সে সব গল্প করতে হবে। প্রথমে খুড়িমা, তারপরেই এল খুকু।'

'উৎকর্ণ'র গোড়াতেই তিনি বলেছেন—'আমি এই ডায়েরিটা লিখব এমনভাবে যে, আমার মনের সকল গোপনীয় কথাই এতে থাকবে, কিছু চেপে রাখব না, কাজেই কথাগুলো সব লিখতে হবেই।'

মনের হদিস মেঘের মতোই পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই সংকল্পে আর কাজে সব সময় সঙ্গতি থাকে না। তছাড়া সমাজের শ্লাংশন নেই। এমন ব্যাপার লিপিবদ্ধ করলে ব্যক্তিগতভাবে লেখক ছাড়া অন্তকে তার প্রতিক্রিয়া স্পর্শ করার সম্ভাবনা কলমকে সংযত করে বইকি। অতএব আমরা লিখিত অংশের বাইরে অনুমানের ওপর ভিত্তি করব না, এমন কি তাঁর মুখ থেকে শোনা তথ্যও সর্বত্র ব্যবহার করতে ইচ্ছে নেই।

শিলং-এ বেড়াতে যাবার আগের দিনের কথা দিয়ে উৎকর্ণর সূত্রপাত। খুকুকে বই কাপড় আর চারমাস ধরে খুকুর জন্ত জমিয়ে রাখা দিল্লীর মশলা মাখানো সুগন্ধি সুপুরিগুলো দিয়ে রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরলেন। রাত বারোটায় বসে বসে ডায়েরীতে লিখছেন: এখানে মীটিং, ওখানে engagement, এখানে পার্টি, হয়তো আসলে দেখচি যে টাকাকড়ি মন্দ আসচে না, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা ওখানে কৈ? ...অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ শহরের জীবনে অনেক কিছু পাবার ও নেবার আছে বটে স্বীকার করি, কিন্তু মনন ও ধ্যানের অবকাশ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না রাখলে হয়তো অপরের চলতে পারে কিন্তু আমার তো একেবারেই চলে না।' '...গভীর অনুভূতির আনন্দ জীবনে সার্থকতা আনে—অন্ততঃ আমার।'

মাটির সঙ্গে মনের যোগ রাখার আন্তরিক পিপাসা তারাশঙ্করের চরিত্রেও লক্ষ্য করা যায়। প্রৌঢ়ত্বে প্রকোষ্ঠে তিনি বারবার এই নাগরিক নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করার তাগিদে ছটফট করেছেন। সে অন্য কাহিনী। কিন্তু মাটির সঙ্গে যোগই পূর্ণতার স্বাদ দিতে পারে না। মানুষের সঙ্গ চাই। যে মানুষ আমার ভাবের দোসর হবে তেমন মানুষই চাই। শুধু 'আদর্শ হিন্দু হোটেলের' নায়ক হাজারী পরোটা বা জ্ঞানী গুণী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা নীরদচন্দ্র চৌধুরীও ষোল আনা সেই মানুষ হতে পারেন না। দেবব্রত, রেণু এবং তার চেয়েও নিকটতর খুকুর মতো মেয়ে, যার কাছে বলবার জন্ত চারমাস ধরে কতো গল্প সযত্নে মনের ভাণ্ডারে মজুত রাখা হয়, যার ওষ্ঠ প্রান্তে ভালোলাগার

আবেশ দেখে মন তৃপ্ত হয় তেমন মানুষের সঙ্গ চাই। সেইরকম আর একটি সংবেদনশীলতার আধার সুপ্রভা। শিলং যাত্রার সঙ্গে যার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। ছুটিতে এত জায়গা থাকতে শিলং-এ বেড়াতে যাবার একটি কারণ যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ তেমনি সেখানে সুপ্রভার অবস্থিতিও আর একটি আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' এর কিছুকাল আগেই প্রকাশিত হয়েছে। নায়ক অমিত বেছে বেছে শিলং পাহাড়েই গিয়েছিল। বলাবাহুল্য রবি ঠাকুরের এই উপন্যাসখানি সে সময়ে বাংলার গুণী-মহলে সাড়া কিছু কম জাগায় নি। হয়তো বা কবির বর্ণনা মাহাত্ম্যও বিভূতিকে শিলং-এর প্রতি আকৃষ্ট করে থাকবে।

অবশ্য কথা কথান্তরের মধ্যে না গিয়ে এটুকু স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারতো যে, মানুষটির ত ঘুরে বেড়ানো বাতিকই ছিল তবে কেন গবেষকদের মতো তিলকে তাল বানানোর প্যাঁচ কষা হচ্ছে? না, প্যাঁচ এর মধ্যে এক বর্ণও নেই।

গৌহাটী থেকে শিলং পৌঁছে সেইদিনই বিকেলে তিনি সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করবার জন্য লাবানের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। পথের মধ্যে হঠাৎ সাক্ষাতের চিত্রটি তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি, 'পথে দেখি সুপ্রভার মত একটি মেয়ে যাচ্ছে। ভাবলুম কে না কে! একটু পরে দেখি মেয়েটি পিছন ফিরে আমার দিকে বারবার চাইচে। তারপর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল—বলে উঠল—আপনি!' অথচ এই সুপ্রভাই বিভূতির জন্য দুপুরে পুলিশ বাজারের কাছে মোটর স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিল। লোকটি ফিরে গিয়ে বিভূতি আসেননি এই সংবাদটুকু দিয়েছে। এই দৃশ্যের মধ্যে একটি ছবি সুস্পষ্ট, এঁরা মানসিক জগতে যতখানি পরস্পরের পরিচিত বাস্তবে সে তুলনায় অল্প পরিচিত ছিলেন। সেদিন বিকেলে সুপ্রভাদের বাড়িতে চা পান পর্ব সেরে সুপ্রভার বান্ধবী বীণাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোনো হল। সঙ্গে সুপ্রার ভাইপোও রইল। লাবান থেকে ক্রিনোলাইন ফল্‌স্ খুব বেশি দূর নয়। তাছাড়া জায়গাটা জনবিরল হলেও সেখানে লোকালয়ের সান্নিধ্য আছে। বিভূতিভূষণের কাছে তাই এই অপ্রতুল ঝরণার মাধুর্য তেমন আহামরি কিছু নয়। সম্ভবতঃ সেটা আন্দাজ করে সুপ্রভা সত্যিকার বনশ্রীমণ্ডিত স্পেড্‌ঈগল ফল্‌স দেখাবার উৎসাহে অতিথিকে নিয়ে পা-বাড়ালেন।

লেডী কিন্‌স্ কলেজের এই তরুণী অধ্যাপিকা তখন ভাবতেই পারেন নি যে পথ ভুল হতে পারে। কিন্তু তা-ই হ'ল। শহর থেকে দূরে পাইন বনের জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেল। দিনের আলো শেষ হয়ে এসেছে। এরপর নামবে অন্ধকার। এমনিতেই ভয়ে বুক টিপ্-টিপ্ করছিল, তার উপর দু'জন 'ষণ্ডামার্কা' লোককে এগিয়ে আসতে দেখে সুপ্রভা আর থাকতে না পেরে মুখ ফুটে বলেই ফেল্লেন—'আমার বড় ভয় করছে।' শিকেয় উঠল ঝরণা অভিযান। খাশিয়া ডাকাতের হাত থেকে পালানোটাই এখন জরুরী।

সুপ্রভা সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে মন্তব্যটুকু মিষ্টি—···ছেলেমানুষের কাণ্ড। তবে বলেছিল কেন যে আমি স্প্রেড্ ঈগ্‌ল ফল্‌সের পথ চিনি।···না, তেমন কোনো বিপদই হয়নি। শেষ পর্যন্ত শহরের বুকে ফিরে সুপ্রভাদের ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তিনি হোটেলে ফিরলেন। অবশ্য লাবান থেকে বিভূতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে পায়ে হেঁটেই ডেরায় হাজির হন। এই দিনটি তাঁর কাছে অবশ্য স্মরণীয় হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব আগেই সৃষ্টি হয়ে বসেছিল। তার সঙ্গে সঙ্গৎ করেছে পাইনবন আর 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রেন গুচ্ছ', পথপাশে পুচ্ছ নাচানো পাখীর দল, আর পথের প্রান্তে হঠাৎ-দেখার আলোর ঝলকানী আর অভাবনীর পথ হারানো। মুগ্ধ নায়ক অপুর মতোই তিনি ডায়েরীতে লিখলেন: যেন অন্য জগতে এসে গিয়েছি। শিলং-এর শোভা ত অদ্ভুত বটেই—তা ছাড়া সুপ্রভার মতো মমতাময়ী মেয়ের সাহচর্য ও সহানুভূতি ক'জন পায়?

মমতা বা সাহচর্য সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে অনুমান করতে পারি, কিন্তু সহানুভূতি কেন? তবে কি সুপ্রভা এই মানুষটির নিঃসঙ্গতার বেদনা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন? মুখচোরা অপু ত কোনোদিন দুনিয়ার কারুর কাছে নিজের অভিযোগ নিয়ে দরবার করতে পারে নি, অপুর জনকও সেই প্রকৃতির মানুষ।

অপরের গভীর অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। এই দিনের ডায়েরীতে তিনি যে বুড়ো রিকশাওয়ালার কথা উল্লেখ করেছেন, তার উপর অবিচার করেছেন কলকাতা থেকে শিলং যাত্রার সময়ে—ভাড়া কম দিয়েছেন উপরন্তু যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিয়েছেন, সেজন্য কাল ট্রেনে বসে আফশোসও হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যাওয়ার কথা। কিন্তু আজ সংকল্প করে বসলেন ভবিষ্যতে যদি কোনদিন তার দেখা পান তাহলে 'নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত' করবেন। হৃদয় এখানে সমুদ্রের মতো উদার বিস্তারে অস্তিত্বের দিগন্তকে স্পর্শ করেছে।

ব্যক্তিগত সংস্পর্শের দৌলতে বড়দার চরিত্রের কিছু কিছু লক্ষণ আমার জানা হয়ে গিয়েছে। তিনি বলতেন, কোনো একটা গভীর বেদনার বা আনন্দের অনুভূতিকে ফোটাতে হ'লে তার চারপাশে অতি তুচ্ছ কিছুর অবতারনা করতে হয়। আগেই হোক বা পরেই হোক ঘটনা বা বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের অবতারণা করলে মূল ব্যাপারটা বেশি গুরুত্ব পায়। একটা রেখা টানলে তাকে লম্বা দেখাতে চাও তো পাশে বিন্দু বা তার কাছাকাছি মাপের একটি দাগ টানতেই হবে তোমায়। এখানেও তেমনি সুপ্রভার সঙ্গে বিকেল কাটানোর মাধুর্য ওই বুড়ো গরীব রিকশাওয়ালার হাজিরীতে যেন যথার্থ রসায়তন পেয়েছে।

সুপ্রভা যে তাঁকে অভিভূত করেছেন এটা দিনলিপিতে সুস্পষ্ট। শিলং-এ মাত্র ক'টি দিনের অবস্থিতি এবং তার মধ্যে উভয়ের সাক্ষাতের সময় পরিধিও খুব বেশি পরিমাণ নয়। তবে উভয়ের পরস্পরের প্রতি চৌম্বক আকর্ষণের নিবিড়তায় আবৃত আগ্রহের দিকটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। দ্বিতীয় দিন সকালে 'সুপ্রভাদের ওখানে যাব বলে বেরিয়েছি, দেখি সুপ্রভা ও আরও দুটি মেয়ে আসচে, পথে দেখা হ'ল।' একজন যদি দেখা করতে যান ত অপরজন নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে আসেন। পাইন মাউন্ট স্কুলের কাছাকাছি পাহাড়ের মাথায় পাইনবনের মনোরম দৃশ্য। কেঞ্চ-ট্রাসে দিয়ে উৎরাই আবার পাইনের বীথি, সেখানে নিরিবিলিতে আলাপ-আলোনায় বেশ কিছুক্ষণ কাটল। বিকেলে আপার শিলং। বিচিত্রবর্ণের বনফুল আর ফার্নের শোভোস্তৃত পথে মোটরে করে এলিফ্যান্ট ফল্‌স্‌-এ একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। রোদ বৃষ্টির লুকোচুরি খেলায় প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালীপনার মধ্যে পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে তৈরী করা সোপান দিয়ে নামা-ওঠা আর স্বাভাবিকভাবে গড়ে' ওঠা পাহাড়ের ছাদের তলায় আশ্রয় নেওয়ার অনাস্বাদিত পূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে বিকেলটা মনোরম হয়ে উঠেছিল তাতে সংশয় নেই।

আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা আর আদর আপ্যায়ন। রোমান্টিক উপন্যাসের আদর্শ পরিবেশ ত বটেই। তবে ছোটনাগপুরের অরণ্যমর্মরের বন্য রুক্ষ ঔদাস্য যাঁকে মুগ্ধ করে তাঁর কাছে চিরপাইন ফার্ন আর বর্ষণকান্তিতে রসসিক্ত সর্বদাই সেজেগুজে বাহারী বড়লোকী 'পুতু পুতু' ভাবের ভূমিশ্রীর আবেদন না থাকা বিচিত্র নয়। তিনি একজায়গায় বলেছেন কি ভিজে "rain rain go to

৬

spain." বলেই কিন্তু সংশোধন করছেন গৌহাটি থেকে শিলং-এ আসার পথ বাদ দিয়ে ধরতে হবে। একে ঠাণ্ডা শীতের জায়গা, তার উপর যদি রোদ না থাকে, বিষ্টির প্যান্‌প্যানানী কারই বা ভালো লাগে!

তার চেয়েও বড় কথা শুকনো একটা পাথর নেই যেখানে দুদণ্ড বসে থাকা যায়। চেরাপুঞ্জীতে তাঁকে একাই ঘুরে আসতে হ'ল কেন না মোটর পাওয়া যায় নি ব'লে সুপ্রভাদের যাওয়া হয় নি। কিন্তু চেরা থেকে ফিরে বাস স্ট্যাণ্ডে সুপ্রভাকে দেখবেন আশা করেছিলেন। না, কেউ নেই। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পরও যখন কারুর দেখা মিলল না তখন হোটেলের দিকে না গিয়ে লাবানে সনৎকুটীরে গেলেন। সেখানে চা সহযোগে বীণা ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজবে কাটল। বীণার উপহার সাদা গোলাপের একটি তোড়া। আর পরদিন সীলেট যাওয়ার প্রোগ্রাম হ'ল—ট্যাক্সি নিয়ে সুপ্রভা আর বীণা সকাল আটটায় তাঁকে তুলে নেবেন।

ইতিহাসের বিধাতা যে মানুষ নয় তা আর একবার প্রত্যক্ষ হল। সকালে উঠে ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গেলেন, শিশির ভেজা গাছপালা পাইনবনের বীথি ছাড়িয়ে দূরে লাবান হিলএর শীর্ষদেশ বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু হাতে সময় নেই—পাতানো মেয়ে রেণুকে লেখা চিঠিখানি ডাকে দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরলেন বিভূতি, সীলেট যাওয়ার তাড়া আছে। স্নানাহার সেরে সুপ্রভাদের জন্যে বসে আছেন। বসে আছেন ত বসেই আছেন। কেউ আর আসে না। অবশেষে সুপ্রভার ভাই এসে তাঁকে দেখে খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কী আপনি যান নি?

তার মানে? ক্রমে রহস্য উদঘাটিত হ'ল। সুপ্রভারা যথাসময়ে এসেছিলেন। হোটেলের ম্যানেজার খোঁজ খবর না নিয়ে বলে দিয়েছেন, হয়ত ট্যাক্সি আসতে দেরী দেখে বিভূতি রওনা হয়ে গেছেন। আসলে ভোরে উঠে বেরিয়ে যাওটাই ম্যানেজারের নজরে পড়েছিল, তারপর যে তিনি ফিরেছেন এটা লক্ষ্য করেন নি ভদ্রলোক। স্রেফ বলে দিয়েছেন সুপ্রভাদের দেরী দেখেই বিভূতি চলে গিয়েছেন। ফলে, সুপ্রভারা চলে গেছেন। পরে যখন সুপ্রভার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন তিনিও বলেছিলেন—'পুঁটুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল তাই শুনে। সে খুব দুঃখিত হয়েচে মনে হল।'

'কি বিশ্রী ব্যাপার! রাগে দুঃখে তো আমার চোখে জল এল। আমি হাঁ ক'রে বসে আছি সকাল থেকে সেজেগুজে গাড়ির জন্যে—'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত স্থির। ট্যাক্সি—। ট্যাক্সিকে বত্রিশ মিনিটের মধ্যে ১৪

মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হবে। নঙমালকীর গেটের এপারে ওদের ধরতে হবে। তারপরই খুলবে গেট এবং এপারে জমে থাকা গাড়ি-গুলোকে ছেড়ে দেবে। গৌহাটি থেকে শিলংএর পথে যেমন 'নং-পোর' গেট দুতরফের গাড়ি যাতায়াতে খেয়ার কাজ ক'রে থাকে, আপার শিলং হয়ে সিলেটের পথে তেমনি তখনকার কালে ছিল নঙমালকীর গেট। এই বত্রিশ মিনিট যেন জীবনের খেয়া পারাপারের চূড়ান্তক্ষণ! না, কোনো মোড়ে বা বাঁকে ট্যাক্সির গতি কমানো নয়। ড্রাইভার বলছে 'গাড়ি উল্টে যাবে বাবু..' '...চালাও চালাও, আরও জোর দাও। ত্রিশ কেন, চল্লিশ করো না!'...

দূর থেকে নঙ্‌মালকির গেটে দুখানা বাস আর একখানা ট্যাক্সিকে দেখে আশা হ'ল বুঝিবা শেষ রক্ষা হবে। কিন্তু না, ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে দেখা গেল সাহেব-আর-মেম! খবর নিয়ে জানা গেল সাদা রংএর একটি ট্যাক্সিতে দুজন বাঙালী মহিলা আর এক ভদ্রলোকে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন। সুপ্রভাদের নাগাল মিলল না।

একরাশ নৈরাশ্য। এরপর শিলং যেন শূন্য শ্মশানের মতো দুঃসহ হয়ে দাঁড়াল। এখানে আর কে থাকে—কি জন্যে থাকা! মেলভ্যানে টিকিটের বন্দোবস্ত ক'রে হোটেলে ফিরলেন। বীণার দেওয়া সাদা গোলাপ ঘরখানিকে সুবাসিত করে রেখেছে। সেই সৌরভের সঙ্গে বিয়োগ বেদনা, কিছু তাজা মধুর স্মৃতিলোক তাঁকে যে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়নি তা কে বলতে পারে। শেষের কবিতার বাস্তব একটি নিদর্শনের মতো,—ঠিক যেমন অমিত আর লাবণ্য নির্জন ঘন বনের ছায়াতে পাশে বসে তাকিয়ে দেখেছিল পাশের সরু পথটি নীচে কোনো খাসিয়া গাঁয়ের দিকে নেমেছে তেমনি বাইরের নীরবতা আর মনের মুখরতায় গভীর অনুভূতিমাখা পরিবেশে বিভূতি যে সান্নিধ্যের স্বাদ পেয়েছিলেন সেই স্মৃতি ফিরে এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিম্বা অমিত যেমন বলেছিল—'সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন-এর বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ লাইন আমার মাথায় আসত না।' আর তার জবাবে লাবণ্য প্রশ্ন করেছিল—'আবিষ্কার?' ডন-এর কবিতার চরণ দুটির অনুবাদও অমিত ক'রে বলেছিল—'দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর। ভালোবাসিবারে দে অবসর।' তেমন কোনো পরিচয় যদিও দিনলিপিতে অনুচ্চারিত তবু আমরা এটুকু জেনেছি উৎকর্ণ থেকে যে, সুপ্রভার সেই বৈদগ্ধ্য ও মানসলোকে কাব্যানুভূতি ছিল। লাবণ্যের মতো নয়, সুপ্রভার নিজের মতোই। মননশীলতায় ইনি অসামান্যাই যদি না হবেন ত তাঁর ব্রাউনিং-এর

'Rudel to the prince of Tripali-র তর্জমা বিচিত্রায় প্রকাশিত হবে কেন! এসব অবশ্য পরের কথা।

সেদিন বেলা একটার মেল গাড়িতে তিনি সিলেট যাত্রা করলেন। পাইউম্ স্লে গেটে গাড়ি দাঁড়াল। এখানে ছদিকের গাড়ি এসে জড়ো হয়—বহু বাস ও প্রাইভেট কার দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে এপাশ-ওপাশে একটু ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ কে ছাড়ে! সেই সময়ে 'দূরে সিলেটের সমতলভূমি মেঘের মত দেখা যাচ্ছে। আমি কেবলই ভাবচি—কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে সুপ্রভা এইখান দিয়ে গিয়েচে—এখন যদি সে থাকত, দুজনে কত গল্প করতুম! সত্যি, সারা পথটাতে যখনই সৌন্দর্যের অপূর্বতায় বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েচি, তখনই ওর কথা আমার মনে হয়েচে। হর্ষবিষাদে ছুটেছে আজকের গোটা অপরাহ্নটির এ বিচিত্র যাত্রাপথ।'

শিলং পর্বের প্রথম অধ্যায়ে যদি বা এই যাত্রা ও অবস্থিতিকে পূর্বরাগ হিসেবে আমল না দিয়ে যদি ভাবা যায় যে সাধারণ একটি মেলামেশা আর মামুলি সামাজিক সৌজন্যকে ঔপন্যাসিক প্যাঁচ দিয়ে অথবা ঘোরালো ক'রে দেখানো হচ্চে তাহলে— ? কিন্তু তাহলে ভুল হবে।

কেন না, কলকাতায় ফিরেও সিলেটের পথের কথাই তাঁর বারবার মনে হয়েছে। সেই সুগভীর নদীখাত, তার মধ্যে নিবিড় অরণ্যানী।...কোথাও শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে সেই ট্রিফার্ণ শোভিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। তেমনি মনে হয়েছে এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য বিসারিত পথে সঙ্গে যার থাকার কথা সেই সুপ্রভাই ছিল না। সেই অপূর্ব পথের সৌন্দর্যে মগ্ন নিঃসঙ্গ মানুষটি থেকে থেকে সচেতন হয়ে হায়-হায় করে উঠেচেন, তাঁর মনে হয়েচে —'আহা, সুপ্রভা যদি থাকত, তবেই এটা দেখাতুম, ওটা বলতুম, আহা সে নেই, কাকেই বা বলি? ...পাহাড়ের সানুদেশ আলো করে রেখেছে সেই লাল ফুলটাতে—সুপ্রভা বলেছিল যেটা সিলেটের সমতল ভূমিতেও দেখা যায়।'

পূজোর ছুটীর শুরু সেবার শিলং দিয়ে, শ্রীহট্ট চাঁদপুর হয়ে গোয়ালন্দ দিয়ে চিটাগং মেলে ফেরা। প্রত্যেক তীর্থযাত্রায় যেমন সুকৃতির মহিমা থাকে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই স্বগত উপলব্ধি হ'ল—'তা ছাড়া সুপ্রভাকে কতদিন দেখিনি, ওর আদর যত্নে এবারকার ভ্রমণস্মৃতি মধুর হয়ে থাকবে চিরকাল।'

পূর্ণতার পিপাসা মানুষে মানুষে ভিন্ন, ভিন্ন তার অভিব্যক্তি আর তেমনি প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় চরিতার্থতার বিচিত্র রূপে। বিভূতিভূষণ যখন সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে খ্যাত ও স্বীকৃতির বরমাল্য পেতে শুরু করেছেন তখনই বোধ করি অনুভব করতে থাকলেন দোসর জনের অভাব। আর সেই

অভাববোধ, নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর তাগিদ তাঁকে দয়িতার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করল। ঠিক বিবাহ, কি নিজের সংসার রচনার উদ্যোগ এককভাবে তাঁর দ্বারা সম্ভব ছিল না। তাই প্রীতির পসরা নিয়ে আপন গন্ধে কস্তুরী মৃগের মতো কখনো রেণু, কখনো বা খুকু আবার কখনো সুপ্রভার মতো মমতাময়ীর সান্নিধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই। সেবার পুজোর ছুটিতে আবার গাঁয়ে ফিরলেন। 'খুকু এখানে আছে, ও রোজ সকালে স্নানের আগে ও দুপুরে আসে।' বন্যার জল নেমে গিয়েছে। মাছ ধরা, নদীতে স্নান করা আর কুঠীর মাঠে শোভা দেখা। নব্বই বছরের আইনদ্দী বুড়োর সঙ্গে গিয়ে গল্প করা। এইভাবে ক'টা দিন কাটলো। সবই যেমন ফুরোয় একদিন তেমনি পুজোর ছুটীও ফুরোলো।

গাঁয়ের ঘাট থেকে ইছামতীর বুকে নৌকো ভাসিয়ে দুপুরের নীলাকাশে শাদা শাদা বকের দলের দিকে তাকিয়ে বিদায় বিষাদে বিধুর মন যেন অপুকেই আঁকে। 'গ্রাম ছেড়ে যেতে, ইছামতী নদী ছেড়ে যেতে, খুকুকে ছেড়ে যেতে (মনে কেমন একটা বিষাদ)। তার ওপর দেখে এলুম খুকুর জ্বর হয়েচে, আজ সকাল থেকে সে শুয়েই আছে। কিচমিচ পাখী ডাকচে চালতে পোতার বাঁকে ঝোপে ঝোপে।...কিছু ভালো লাগচে না। কেন এমন হয়? যাদের ভালোবাসি, কাছে রাখতে চাই, তাদের কেন কাছে পাইনে? কোথায় সুপ্রভা পড়ে রইল শিলং-এ, দেখবার ইচ্ছে হলেই কি তাকে দেখবার উপায় আছে? কোথায় পড়ে রইল খুকু। এই যে ওর অসুখ দেখে এলুম, কিছুই করবার নেই আমার—করতে গেলেই যত নিন্দা, যত কানাকানি হবে এইসব পাড়াগাঁয়ে।'

খুকু আর সুপ্রভা। একজন ঘেঁটুবন বাঁশঝাড় জঙ্গল পরিবেশে বাংলার নিতান্ত সাধারণ পল্লীবালা, অপরজন আধুনিক উচ্চকোটির আলোকপ্রাপ্ত সমাজের হীরকদ্যুতি। একটি মনের মধ্যে ওরা আশ্চর্যভাবে পাশাপাশি ঠাঁই করে নিয়েছে।

চন্দননগরে সভা করতে গিয়েছেন। সেখানে নৃত্যগোপাল পাঠাগারের আসরে কথাবার্তার মধ্যে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন নির্জন ছাদে। হেথা নয়, হেথা নয়—অন্য কোনখানে। সেখানে শীতের পড়ন্ত রোদের সোনা ছড়ানো আলোয় বাঁশ ঝাড়ের দিকে চেয়ে মানসপথে স্মৃতিচারণায় মগ্ন হয়ে দেখলেন। '...সুপ্রভা আর খুকু আজ এই অপরাহ্নে কি করচে।... খুকু এখন পড়ন্ত বেলায় তাদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছে, কিম্বা পাঁচীর সঙ্গে

গল্প করতে এসেছে এ বাড়ি। সুপ্রভার আজ ছুটি, হয়ত পাইন মাউণ্ট স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচে।' সুপ্রভার দেওয়া রুমালখানার কথা মনে পড়ল। পকেটেই সেটি আছে। দীর্ঘ ব্যবহারে ময়লা হয়ে গেছে। এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। 'বড্ড ময়লা হয়ে গেছে।'

মনের একটি কোণে নীড় বাঁধার আকর্ষণ ক্রমেই জেঁকে বসছে, রাজপুরে যাবার সময় চলমান ট্রেন থেকে কসবা, ঢাকুরিয়ার গৃহস্থ বাড়িগুলি দেখে সন্ধ্যায় চাপা আলোতে শান্তি, শ্রী, মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পান পিছনে ফেলে আসা জীবনের গ্রাম্য পরিবেশে। মাধুর্যের সেখানে নিত্য আরতি চলছে। 'যেখানেই একটা এঁদো পড়া পুকুর ঘাটে বসে এই সন্ধ্যাবেলা বাসন মাজচে, সেখানেই তাকে ঘিরে যেন চারিপাশে গভীর রহস্য। মেয়েরা না থাকলে জগৎটা কি মরুভূমিই হ'ত তাই ভাবি।' দেশে গেলে এমনিতে লোকজনের ভিড় পছন্দ হয় না কিন্তু খুকুদের বাড়ি যাওয়া, খুকুর সঙ্গে গল্প করা এসব ভালোই লাগে। লেখা বা লেখার চিন্তা করা, ভালো ভালো গান শোনা, সভাসমিতি, স্কুল—দৈনন্দিন সব কিছুই চলছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে, এগুলি ছাড়িয়েই নিভৃত মানসলোকের অস্তিত্ব।

'প্রভাতী সংঘের' ডাকে পাটনাতে সভা করতে গিয়েছেন। শনিচক্রের বুদ্ধিজীবী মাতব্বরেরা সকলেই আছেন: ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নীরদ দাশগুপ্ত ও পরিমল গোস্বামী। সঙ্গী হিসেবে এঁরা প্রত্যেকেই বিভূতির ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। পরিবেশও নিজেকে গুটিয়ে বা সরিয়ে নেবার মতো নয়। কিন্তু তবু শীতের দুপুরে মিষ্টি রোদের মধ্যে পার্কে একাই বসে বসে ডালিয়া আর ক্যালেণ্ডুলা ফুলের দিকে চেয়ে মনের গতি হয় উধাও···বকুলের ছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম, ছোট্ট নদী আর—আর—! ···আবার পরক্ষণেই লাবান, লেডি কীন্‌স্ কলেজ, পাইন মাউণ্ট স্কুলের সেই পথ, 'সুপ্রভার কথা সব সময়েই মনে হচ্ছে, আহা কোথায় কতদূরে রয়েচে পড়ে, ওর বাবার আবার অসুখ—ছেলেমানুষ, তাই নিয়ে ওর মন খুব খারাপ হবারই কথা।'

শুধুই কি দুপুরে পার্কে? বি. এন. কলেজে বিরাট সভা। সেখানে প্রবাসী বাঙালীরা সভার আগে ও পরে সব সময়ে ঘিরে রেখেছেন এই সম্মানিত অতিথিদের। অনেক পুরনো পরিচিতের সঙ্গে ন-দশ বছর পরে দেখা, কতো নতুনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত ঘটল। কিন্তু এগুলো যেন মনের বৈঠকখানার বিষয়, অন্দরমহলের এক ঝলক আমরা দেখতে পাই সভাকক্ষের বাইরে জ্যোৎস্নাস্নাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের কথা তাঁর

মনে পড়ছে। বাংলাদেশের বিরাট পরিসর ক্রমে ঘনীভূত হয়ে স্থির ছুটি অন্তর বিন্দুতে দাঁড়ায়। 'এতক্ষণ কি সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে?'

'ওরা সবাই?...

'সুপ্রভাও?...'

এই নিভৃত হৃদয়াকাশে নক্ষত্রের উজ্জল প্রভার মতো ক্ষণকালটুকু যেন চিরকালেরই প্রতিচ্ছটা।

পাটনা থেকে ফিরেই তিনি খবর পেলেন সুপ্রভা কলকাতায় এসেচেন এবং সেই রাত্রেই গেলেন দেখা করতে। আর তারপর শনিবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাওয়া, এবারের যাত্রায় কথাগুলো আলাপ-আলোচনা ছাড়িয়ে গানে নির্বাসিত হ'ল। সুপ্রভা যে এত ভালো গাইতে পারেন এ আবিষ্কার গঙ্গাতীরের ছায়ামায়া ঘেরা ওই বাগানেই প্রথম। হয়ত সেদিন আকুল আবেগভরা কণ্ঠে ধ্বনিতে হয়েছিল, 'তুমি গাহিছ বসি জীবনে মম...'। অথবা 'যৌবন সরসী নীরে...?' গানের রচয়িতা যে বাণীই লিপিতে লিখে থাকুন না কেন, গায়িকার কণ্ঠে অন্তরের সুরই ধ্বনিত হয়েছিল। গানে গল্পে হাতের মুঠোর সময় যেন এমনি ক'রে খরচ হয়ে গেল। সুপ্রভার বিদায় বেলার অনুরোধ: 'আপনি শীগ্‌গির কিন্তু একবার শিলং যাবেন। আমি বেশীদিন বাঁচব না। সত্যি আমার আয়ু কম, জ্যোতিষী বলেচে।' সুপ্রভারা পুরী চলে যাচ্ছেন সেখান থেকে শিলংএ ফিরলে নিশ্চয় বিভূতি যাবেন।

বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বনগাঁ। রাতটা এক বিয়ে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর বাসাতে কাটালেন। পরদিন দুপুরে নিজের গাঁয়ে। কিন্তু ঘরে ত কেউ নেই। মুসলমান পাড়ার ভেতর দিয়ে খুকুদের বাড়ি যখন পৌঁছলেন, খাওয়াদাওয়া হচ্ছে, বিভূতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একহারা উদাত্ত কণ্ঠে বললেন— 'খুড়িমা, অতিথি আছে।' গল্পেগুজবে বিকেল এসে পড়ল। নদীর দিকে পথ। খেজুর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নদীর দিকে ওপারের মুক্ত তৃণাবৃত চরভূমির দিকে তাকিয়ে নিঃসঙ্গ নিজের সঙ্গে আলাপ।

সুপ্রভার কথা: কবে মরে যাব টেরও পাবেন না।

খুকুও তো বিয়ে হ'লে চলে যাবে বারাকপুর ছেড়ে। তখন আবার যে নির্জন, সেই নির্জন।

গৌরী চলে গেছে কতকাল আগে। আরও কতই ত এল গেল এই জীবনে। এগুলি যেমন রূঢ় সত্য তেমনি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সকলকে দেখার, কাছে ধরে রাখার পিপাসা। বিকেল সন্ধ্যের কলকাতা যখন হাজার মানুষের ঘরে ফেরার মিছিলে মশগুল তখন লালদীঘির ধারে জলের ওপর

হেলে পড়া জিপিওর ঘড়ির ছায়ার দিকে তাকিয়ে দলছুট চল্লিশের কাছাকাছি বয়সী মানুষটি, যাঁকে কিছুক্ষণ আগে রেডিও অফিসে দেখা গিয়েছিল তিনি বসে বসে ভাবছেন : যশোর জেলার দূর এক গ্রামে—তাতে সেই মেয়েটি এখন তাদের বাড়ির সামনে বকুল তলাতে হয়তো আপন মনে বসে আছে। সুপ্রভা হয়তো পুরীতে সমুদ্রের ধারে বসে ভাবচে!···কী ভাবচে? সমুদ্রের হৃদয় রহস্য গভীর, আর নারীর? কে জানে হয়তো সেই গানের সুরে ভরা শিবপুরের গঙ্গাতীরে রেখে যাওয়া বিকেলটির কথা ভাবচে।

সুপ্রভা যা-ই ভাবুন না কেন বিভূতির মন যে কিছুতেই নাই তা দিনলিপিতে ঘোষিত হচ্ছে। না কলকাতায়, না-বনগাঁয়ে, না রাজপুরে, না-জাঙ্গিপাড়ায় কোথাও স্থির হ'তে পারছেন না। মাঝে মাঝে নিজের উপলব্ধিতে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন—অথবা এও বলা চলে যে, তত্ত্বটা নূতন নয় উপলব্ধিটাই সাম্প্রতিক, তাই তাকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ। যেমন ধরুন : 'যাকে ভালোবাসা যায় বেশি, তাকে দুঃখ দিলে ভালোবাসা বর্ধিত হয়—আদর দিলে তত হয় না। এ পরীক্ষিত সত্য। এতে যে সন্দেহ করে, সে ভালোবাসার ব্যাপার কিছু জানে না। যাকে ভালোবাসো, তাকে খুব আদর দিও না, ভালোবাসা কমে যাবে। মাঝে মাঝে তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো, ভালোবাসার সঙ্গে করুণা ও অনুকম্পা মিশে ভালোবাসার ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।' মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য যতো যাই করুন সুপ্রভার দিকে আকর্ষণটা রোধ করা যাচ্ছে না। পুরী যাওয়া স্থির করলেন। হাতের ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগে একবার ঘুরে না এলে, এরপর কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। শীতকালে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তাই কি—দুর্যোগের কথা ভেবে ত আর হাতপা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। অতএব টিকিট কেটে আনলেন। যাওয়া স্থির।

এমন সময়ে সুপ্রভার চিঠি এল, তাঁরা পুরী থেকে চলে গেছেন ওয়াল্টেয়ারে। অগত্যা যাত্রা নাকচ ক'রে বারাকপুরে চলে গেলেন। সরস্বতী পুজোয় খুকুদের সঙ্গে আর নদীর ধারে, আর জমীর দেওয়ালীর বিধবা বৃদ্ধার সঙ্গে দুটো কথা ব'লে ও কিছু সাহায্য ক'রে নেবুফুলের সৌরভে আনন্দ ভরে নিলেন অন্তরে।

এই দিনের স্মৃতিচিত্রে খুকুর ভূমিকা অসাধারণ প্রাধান্য পেয়েছে। বলছেন : 'আজ চার বছর এই প্রথম বসন্তের দিনে এখানে ফুল ফোটা দেখি। আজ চার বছর নানা সন্ধ্যায় নানা ছুটির দিনে নানা বিকেলে খুকু আমার

আনন্দ দিয়াছে—কত ভাবে, কত কথায়।...' 'খুকু কতবার এল, সেকথা কেবলই শুক্র তারকার দিকে চেয়ে ভাবি...।' ধাবমান রেলগাড়িতে বসে ফেলে আসা দিনের কথা মনকে জুড়ে থাকে—তারপরই মনে এল ইন্দু রায়ের কথা। প্রতিবেশী ইন্দু হয়ত এখন ছেঁড়া মাদুরে বসে আছে। ...চন্দননগরে সাহিত্যসভা একদিকে সজনীকান্ত, সদ্য বিলাত ফেরৎ নীহার রায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকারের সঙ্গে দিনটা কাটছে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ গঙ্গার উপর যে বোটে বাস করছেন সেখানে দুর্লভ পরিবেশের মধ্যেও 'ধলেশ্বরী নদীতীরে'র গ্রামের মতো মনের পটে বারাকপুর আর খুকু—! লিখছেন: '...রবীন্দ্রনাথের বোটটা চমৎকার। মেঘ করেছে আকাশে। ...অনেকদূরের একটা গ্রাম এই সান্ধ্য আকাশের তলায় কেমন দেখাচ্ছে!'

কখনো খুকু, কখনো সুপ্রভা। কখনো শিলং, কখনো বনগাঁ-বারাকপুর। অবাক ক'রে দেবার জন্যই হয়ত না জানিয়ে বিভূতি শিলং চলে এলেন। হয়ত তার আরও একটা কারণ ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার একরাশ খাতা দেখা শেষ ক'রে প্রচণ্ড গরম আর জনকোলাহলের হাত থেকে, শহরে ঘরবন্দী দশা থেকে দূরে মুক্তির ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্যেই শিলং চলে এসেছেন। কিন্তু সুপ্রভা নেই। প্রায় সর্বহারার মতোই কাউন্সিল হাউসের সিঁড়িতে বসে কাটালেন। উদাস বাউল! মন নেই কিছুতেই। শূন্য, রিক্ত—এমন মুক্তি কে চায়! এখানে আবহাওয়া শীতল। কিন্তু শুধু এইজন্যেই কয়েকশ' মাইল পথ ট্রেনে, ষ্টীমারে আর মোটরবাসের ধকল সয়ে'ত আসা হয়নি। একবার ইচ্ছে করে এই মুহূর্তেই শিলং ছেড়ে চলে যেতে। আজকের দিনটা কষ্টে-সৃষ্টে যদিবা কাটানো যায় কাল আর কিছুতেই নয়। বর্তমানে প্রথম ও একমাত্র কাজ সুপ্রভাকে একটি চিঠি লেখা। অবুঝ বেকার মন একটা কাজ, মনের মতো কাজ পেয়েছে। কিন্তু পোস্টমাস্টারেরই পাত্তা নেই। অনেকক্ষণ অধীর ভাবে কাটে। আর কিছু না পেয়ে সামনের দর্জির সঙ্গেই কথাবার্তা কইতে লাগলেন। অবশেষে পোস্ট-অফিসের দরজা খুলল।

চিঠি লেখার পর বেকার সময়কে নিয়ে মহামমস্যা। যেটাই 'করব' ভাবেন তাতেই গা নেই। না লাইটমৃথ্রাতে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া, অন্ততঃ শিলং পীকে একবার উঠলে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যেত প্রাকৃতিক শোভা দেখে কিন্তু তাতেও অনীহা—'সুপ্রভা না থাকাতে কোনো কাজেই

উৎসাহ নেই।' হোটেলের ঘরে বসে অলস উদাস মন কখনো ইছামতীর স্নিগ্ধ জলে নাইতে নামে, হলুদ কর্ণিকার ফুলের হাওয়ায় ঝম্‌ঝমে দুলুনি, 'খুকুর আস্তে আস্তে আসা ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে, এইসব স্বপ্ন-স্বপ্ন ছবি ছ্যাখে, কখনো বা হোটেলের বাসিন্দাদের স্থূল রুচির সমালোচনা—'সবাই কেবল খাচ্ছে আর শরীর সারাচ্ছে—কোনো কিছু দেখবার উৎসাহ নেই।' আর বৃষ্টি-বৃষ্টি-বৃষ্টি। একি কোনো বিরহী যক্ষের অন্তরের বেদনাধারা? দূরের পাইন বনে বনে ছেয়ে যাওয়া কোনো পাহাড়ের চূড়ায় এই বৃষ্টি আকাশ-পাতালকে একাকার করে দিয়েছে।

গ্রীষ্মের বাকী ছুটিটা গাঁয়েই কাটলো। কিছু লেখালেখি, কিছু বা কাছাকাছি ঘোরাঘুরি। কিন্তু এখানকার প্রায় নিষ্ক্রিয় বৈচিত্র্যহীন জীবন যেন অকারণ ক্লান্তি এনে দিয়েছে। এমনি এক দুঃসহ মুহূর্ত তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে: 'এই বিরাট বিশ্বচরাচর, এতে কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নীহারিকা-রাজি, কত Globular Cluster, কত নাক্ষত্রিক বিশ্ব, এদের মধ্যে কত আমাদের মত প্রাণী রয়েছে। Jeans-এর দল যা-ই বলুন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে শুধু আমাদের এই পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, আর কোথাও নেই। তা যদি থাকে, ধরেই নেওয়া থাক, তবে তাদের মধ্যে অনেকে কষ্ট পাচ্ছে—আজ আমি তাদের দলের একজন। দুঃখে তাদের সঙ্গে আমি এক হয়ে গিয়েচি।'

এর কিছুদিন আগে লিখেছেন: 'মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিষ। লোকে মুখে যা-ই বলুক, বা চিঠিতে যে কথাই লিখুক, তার মন সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। মুখের কথায় আর মনের কথায় এইজন্যেই মিল প্রায় হয় না।'

কখনো কল্পনা করছেন যদি কলকাতার কাজ সারাদিন ধরে ক'রে খুব দ্রুতগামী মোটরে বেলেডাঙার পুলের মুখে এসে প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নিজেকে হাজির করা যেত ত বেশ হ'ত। কলকাতা আর ইছামতী তীরের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা আর উড়ি-ধানের ক্ষেতের ধারে বসে থাকার জন্যে তাঁর নিজস্ব একটা এরোপ্লেন থাকা একান্ত প্রয়োজন। হয়ত সেই এরোপ্লেন শিলং, চট্টগ্রাম, পাটনার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে। তিনি যেন সেই তরুণ অভিশপ্ত দেবতা যার গতি আছে কিন্তু পরিণতি নেই।

জনশূন্য মাঠের মাঝে বাব্‌লা গাছের গায়ে জড়িয়ে ওঠা লতাবিতানের মাথায় নীল আকাশের রং দেখে গাছতলায় গামছা পেতে ঘাসের ওপর শুয়ে

থাকা আর আকাশের রং দেখতে দেখতে ভূতধাত্রী ধরিত্রীর রূপরস গন্ধের পিছনে অতিমানস শক্তির লীলা দেখেন। মনে হয় কোনো বিরাট শিশু এ বিশ্ব নিয়ে যে খেলা খেলছে তারই সঙ্গে তিনিও ত সেই লীলার মালায় গাঁথা। অনুভূতির এই আলোতে আনন্দের আস্বাদ পেয়েই তিনি খুশি। মনই সব, মন পৃথিবীকে দেখায়, জীবনকে দেখায়—মন যে জগৎ তৈরী করে সেটা তার নিজস্ব। সেই জগতেই বাসিন্দা হয়ে সেই ভাবনার জানলা দিয়েই সে সব কিছু বিচার করে, সুখ দুঃখ পায়।

ভালোবাসার আইনই আলাদা। যে অজস্র বর্ষণ শিলংকে তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছিল তেমনি এক বৃষ্টির দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিলং নন্দনকাননের মতো মোহনীয় হয়ে উঠেছে। যদি তা না-ই হবে তবে কেন সুপ্রভার হস্টেলে গিয়ে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফেরার পরও যাত্রা স্থগিত করলেন? সুপ্রভা বারণ করেছে বলে! এবং দুপুরে যখন বাবাকে সঙ্গে করে সুপ্রভা সদলবলে হোটেলে এলেন বিভূতিকে মোটর বাসে তুলে দেবার জন্য—এমন কি চকোলেট, ফুল এসব উপহারও এসেছে অনুষ্ঠানকে সুরভিত করতে—আনন্দিত বিভূতি তখন ঘোষণা করলেন সুপ্রভার ইচ্ছেয় জয়যুক্ত সেদিনটা থাকাই স্থির। ...এমনি আরও কত নিবিড় অনুরাগ বিচিত্রিত ছবিই আমরা দিনলিপির পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত দেখি। কাছে বসে' বিভূতির গায়ে পরা জামার ছেঁড়া হাতা সেলাই ক'রে দেওয়াও তার মধ্যে পড়ে বই কি। শিলং, দেওঘর, কলকাতায় সুপ্রভার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করেছেন। তার জন্যে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফুল সংগ্রহ ক'রে চিঠির সঙ্গে পাঠানো এও বিচিত্র আত্মপ্রকাশ। সুপ্রভার কাছ থেকে নানা উপহার পেয়েছেন। রুমাল থেকে বালিশের বাহারী খোল যেমন ব্যবহারিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েছে, তেমনি 'যৌবন সরসী নীরে মিলন শতদল কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল' কিম্বা 'রোদনভরা এ বসন্ত কখনো আসে নি বুঝি আগে' গানের সুরের মধ্য দিয়ে মানসিক অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হয়েছে। সুপ্রভাকে তিনি যথার্থ বন্ধু বলেও স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমিত আর লাবণ্যর মতো সামাজিক বিবাহের স্বাক্ষরে সেই প্রেম সীমাবদ্ধ হয় নি।

জীবন আঁধার হ'ল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপে চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।'

আর খুকু? সেখানেও ভালোবাসার পরিণতি ভালোবাসাতেই। মধুর সম্পর্কটির সুযোগ নিয়ে সাধারণ প্রেমিক নায়কের মতো তিনি কিম্বা নায়িকার মতো খুকুও বিবাহের কথা ভাবেন নি। একদিনের একটি ছবি থেকে খুকুর মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। 'কাল দুপুরে ন' দিদিদের দালানে বসে যখন পুষ্পের কথা পড়ে শোনালুম নতুন বই থেকে, খুকু খুবই খুশি। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে, বললে—সব বইতে কেবল তুমি আর আমি, ওই নিয়েই গল্প—এটা নতুন ধরণের হয়েছে।'

পুষ্প আর যতীন 'দেবযানে' নায়ক, নায়িকা। এই বইতে অলৌকিক বা পরলোকের যে জগত-জীবনের কথা বলা হয়েছে খুকুর সঙ্গে বিবাহে সে আত্মীয়তার বাধা। ইহলোকের এই মিলনাকাঙ্ক্ষা পরলোকে দেহাতীত মিলনে পর্যবসিত হ'তে বাধা ছিল না।

মনোভূমিতে এই কালে নারীর প্রতি আকর্ষণ এবং জীবনের অঙ্গীভূত করার প্রবণতা—জায়া-জননী-ভগ্নী বা নায়িকা সর্বরূপে চাওয়ার পরিচয় সুপ্রকাশ। তিনি 'বিচিত্র জগৎ' (১৯৩৭) রেণুকে, 'চাঁদের পাহাড় (১৩৩৮) খুকুকে এবং 'জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৩৮) সুপ্রভাকে উৎসর্গ করলেন। আসলে এই মানুষটির মৌলিক এবং অকৃত্রিম সত্তার যে দার্শনিকতার আধিক্য সে তুলনায় বাস্তবের স্থূল প্যাশন কম। প্যাশনের বেশিরভাগই অন্তরলোকে বিচরণে ব্যস্ত এবং পরিতৃপ্তও। মানুষ আর প্রকৃতি—সমগ্র জীবন আর বৃহৎবিশ্ব যেখানে প্রকট সেখানে যৌনকামনার স্থান ব্যক্তিত্বের অনুশীলনে এক-এক মানুষে এক-এক রকম। বাল্যসূত্র ধরে' অগ্রসর হ'য়ে আমরা এই পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিকে ব্যবহারিক দাবি দাওয়ার ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত বা Introvert দেখতে পাই। প্রকৃতি যেহেতু প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখেই দান করে সেহেতু প্রকৃতির সামনে তার যতো মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা জাগতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ার উন্মোচন ঘটে। কিন্তু সমাজ-সংসারের মানুষের সম্পর্ক বিবিধ রকমের আদান প্রদান একটি প্রধান উপাদান দিয়ে তৈরী হয় এবং টিকে থাকে। খুকু বা সুপ্রভার শারীরিক উপস্থিতির প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য এবং অনুপস্থিত কালেও পরোক্ষ-আন্তরিক সঙ্গ শিল্পীর মনে রসসঞ্চার করেছে হয়ত বা সৃষ্টিকে অনুপ্রেরিতও করেছে। উদাহরণ হিসেবে তাঁর নিজের উক্তিতে ইছামতীর উভয়তীরের জীবন প্রবাহ নিয়ে সম্ভাব্য উপন্যাসে খুকুকে স্থান দেওয়ার ইচ্ছাকে হাজির করা যায়। একথা যেমন সত্য তেমনি আর একটি সত্য অনুচ্চারিত হলেও অস্বীকার করা সঙ্গত হবে না। বিবাহিত

জীবন সম্পর্কে সংশয়! স্মৃতিতে অনুরাগসিক্ত গৌরীর সঙ্গে ক'দিনের দাম্পত্য জীবনের কথা যেমন অক্ষয় হয়ে আছে, এই বয়সে নতুন ক'রে শুরু করলে যে তেমনটি হবে না তা ঠিক কিন্তু যদি তার বিপরীত কিছু হয়? সুপ্রভাকে বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে তৎকালের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায়ের পরামর্শ চেয়েছিলেন। সুনীতিকুমার সামাজিক অসমতার প্রশ্নটা উস্কে দিয়েছিলেন। সঙ্গত প্রশ্ন বই কি। কেন না প্রথম বিবাহের পরে শ্বশুরমহাশয়ের ব্যবহারে বিভূতির দারিদ্র্যের প্রতি যে সূক্ষ্ম অবজ্ঞা দেখা গিয়েছিল তা বিভূতি ভোলেন নি। নিজেকে ইছামতী তীরের জগৎ থেকে নগর জীবনে উপড়ে আনা তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না, তেমনি যদি সুপ্রভা গাঁয়ে গিয়ে সুখী না হয়? এমনতরো অনেক জিজ্ঞাসাই তাঁকে বিরত ক'রে থাকতে পারে।

ভগ্নিপতির অকাল বিয়োগে বোন জাহ্নবীর দায়দায়িত্ব বিভূতি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বনগাঁয়ে বাসা ক'রে তাঁর দুই কচি ছেলেমেয়ে শান্ত আর উমাকে রেখেছিলেন। সেই সময়ের দিনলিপিতে তাই লিখেছেন এখন আর আমি নিছক দর্শকমাত্র নই। পুরোপুরি সংসারী না হলেও সংসারের বোঝা বইছিলেন। হয়ত এইভাবেই চলত। কিন্তু ইছামতীতে জাহ্নবী ডুবে গেলেন। সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিল। খুকুর বিয়ে হয়ে গেছে, সুপ্রভারও বিয়ে হয়ে গেল, এতদিনের আস্তানা ৪১ নম্বর মির্জাপুরের মেসটা উঠে গেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, সুনাম আরও বেড়েছে। আর বেড়েছে দুঃসহ নিঃসঙ্গতা। যে-সুপ্রভাকে 'দোসর জনা' করা যেত সেই হাতের ধরা ধরতে গিয়ে ঢেউ দিয়ে তায়' (তাকে)—' দূরে ঠেলে দিয়েছেন। কে জানে সুপ্রভাকে অসুখী হয়ে সারা জীবন কাঁদতে হবে। চিঠি লেখেন সুপ্রভা! তাঁর always loyal and unfailing friend!

এ সেই ধরণের অনুভূতি যা দুঃখে মধুর, যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফুরিয়ে যাওয়া আতরের শিশিতে রয়ে যাওয়া সৌরভ হয়ে বেঁচে থাকে।

জীবনের এই নূতন নিঃসঙ্গ অধ্যায়ের শুরুতে—জাহ্নবীর মৃত্যুর ঠিক দুদিন পরে বনগ্রাম স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী আর তাঁর বোন বনগাঁয়ের বাসাতে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের অটোগ্রাফ নেবার জন্যে হাজির হ'ল। এবং যথারীতি তিনি লিখলেন—'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু।' পরবর্তীকালে

যখন অন্তত্র আমি এই লেখাকেই হস্তলিপির প্রতি কটাক্ষ ক'রে পড়েছি 'পতিই জীবন পতির দৈন্যই মৃত্যু।' তখন কিন্তু কল্যাণী বৌদির অটোগ্রাফের খাতায় লেখা' বাণীটির সংবাদ জানা ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শচীন বিশ্বাস
চোখ

এই হাসপাতালে সুনেত্রার মা নার্সের কাজ করেন। এবং সুনেত্রাও মার কাছেই থাকে, স্থানীয় কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। এই তথ্যটুকু এখন মনে পড়ছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত প্রণবকে এ-সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। প্রণব কাকাবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত। এখনও সে বুড়ো কাকার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হাত পা টিপে আঙুল টেনে বৃদ্ধের অবশ ভাবটা দূর করার চেষ্টা করছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় কাকাবাবু অসহায় শিশুর মত প্রণবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর এই আধ ঘণ্টার বেশি সময় প্রণব তাঁর পরিচর্যা করছে, প্রিয়-সান্নিধ্য সৃষ্টি করেছে। বিনয়েন্দ্র কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে দেখল। ঘর ভর্তি চোখের রোগী। কারো কারো চোখ অপারেশন হয়েছে, কারো হয়নি—তারা অপেক্ষা করছে। বিনয়েন্দ্র অস্বস্তিবোধ করছিল। নিজের চোখ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে পড়ছিল। চোখ জ্বালা করছিল। প্রণবকে বলে সে হাসপাতালের বাইরে ফুল বাগানের ধারে দাঁড়াল। সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ। ঘন সবুজ পাতার মধ্যে কয়েক থোকা লাল ফুল। বর্ষার ভারে আকাশ থমথম করছে। যে কোন সময় ঝমঝম করে নেমে পড়তে পারে। অঞ্জনা নদী, নামে নদী—এখন গতিহীন। শ্যাওলা কচুরি পানার মধ্যে জল আছে কি নেই বোঝা যায় না। আরও নিচে সরকারের মৎস চাষ কেন্দ্র। অঞ্জনার তীরে এই আরোগ্য নিকেতনে জীবন রক্ষার লড়াই চলেছে সর্বক্ষণ। অপর পাড়ে ইট ভাটা, রেল কোয়ার্টাস, গুডস শেড, ডান পাশে স্টেশনের অংশ দেখা যায়। রেল লাইন পেরিয়ে ধান পাটের মাঠ! কী বিশাল ফাঁকা প্রান্তর। এখানে এখন ব্যস্ততা, কোলাহল। যুবক যুবতী ছেলে বুড়ো সাইকেল রিকসো চা স্টল ফলের দোকান। চারদিকে প্রাণের সাড়া। হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীদের মাঝখানে এতক্ষণ হাঁফিয়ে উঠেছিল। এখন এখানে দাঁড়িয়ে বিনয়েন্দ্র অনেকটা হাল্কাবোধ করল। সে এখন সুনেত্রাদের কথা ভাবল। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না।

দুই

সুনেত্রার মা আরও কিছুটা এগিয়ে এসে বুঝতে পারলেন, খুকী বিনয়েন্দ্রকে ঠিকই চিনতে পেরেছে। কোয়ার্টার্সের জাল ঘেরা বারান্দায় বসে বই

পড়ছিল সুনেত্রা। বিনয়েন্দ্র ঘোষের নতুন উপন্যাস। হঠাৎ মুখ তুলে ডান পাশের বাঁকা রাস্তার পাশে সে বিনয়েন্দ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। প্রথমে সে ভেবেছিল, তারই দেখার ভুল। এই বই পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই বিনয়েন্দ্রকে সে ভাবছিল; এখন প্রায় তারই মত অন্য কাউকে দেখে সে ভুল বুঝে থাকবে। মাকে ডেকে বলল, 'দেখ মা প্রায় বিনয়ের মত দেখতে এই যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।' সুনেত্রার মা দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'দেখেই আসি।' কাছে এসে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন; সে বিনয়েন্দ্রই বটে।

বিনয় না?

বিনয়েন্দ্র চমকে পাশে তাকাল। সাদা সরু পাড় শাড়ি পরা প্রৌঢ়া খুব আগ্রহ নিয়ে বিনয়েন্দ্রকে দেখছিলেন। চিনতে পেরেছেন তিনি। বিনয়েন্দ্রও চিনেছে। এই প্রত্যাশায় সে আজ দু'দিন থেকে প্রণবের সঙ্গে হাসপাতালে আসছে। ভদ্রমহিলা আরও একটু এগিয়ে এসে চোখের গ্লাসের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রসন্নভাবে তাকালেন। বিনয়েন্দ্রও সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে অনেক এলোমেলো সময়ের মধ্য দিয়ে ভদ্র মহিলাকে দেখল। বলল, হাঁ, আমি বিনয়, সে ভদ্রমহিলার পা স্পর্শ করল। সে অনেকদিন পর সুনেত্রার মাকে দেখল। এই দেখা তাকে বিহ্বল করে তুলল। বলল, আপনি এখানে আছেন শুনেছি, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না—

সুনেত্রার মা বললেন, আসলে তুমি একটুও খোঁজ করনি, না হলে আমাদের খুঁজে পেতে—

বিনয়েন্দ্র একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, বিশ্বাস করুন মাসীমা আমি আপনাদের খুঁজছিলাম, তবে এখনও কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি। আমার বন্ধু প্রণবের কাকার চোখ অপারেশন হয়েছে, সেইজন্যেও ঠিক—মাসীমা বললেন, খুকী বারান্দা থেকে তোমাকে দেখেছে, আমি ঠিক চিনতে পারিনি, কতদিন পরে দেখলাম, ছয় সাত বছর হবে, তাই না?

তারও বেশি হবে মনে হয়। সুনেত্রা কি শিক্ষকতা করছে?

ওর জন্যেই ত এখানে আসা। ও মাস্টারী নিয়ে চলে এল। দেখলাম আমিই বা একা একা কোলকাতায় থাকি কেন। ইতিমধ্যে এই জেলা হাসপাতাল হয়ে গেল—সুযোগও ঘটে গেল। চল, এই ত পাশেই কোয়ার্টার।

পাশে কোয়ার্টারের দিকে তিনি তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে

বিনয়েন্দ্রও দেখল, লোহার জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দায় সুনেত্রা দাঁড়িয়ে আছে। সুনেত্রাকে এখন অনেক দূরের এবং অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। প্রণব ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নামছিল। বিনয়েন্দ্র বলল, আমি পরে আসব মাসীমা, আমার বন্ধু এসে গেছে, একটা জরুরী কাজ আছে—আসলে প্রণবকে ফেলে সে একা যেতে চায় না।

প্রণব পাশে এসে দাঁড়াল। মাসীমা বললেন, রোগী কোন ওয়ার্ডে আছেন, কি নাম? আমি খোঁজ নেব—

বিনয়েন্দ্র প্রণবের কাকার নাম ও ওয়ার্ডের নাম বলল। প্রণব বলল, ভয়ানক নার্ভাস লোক—

মাসীমা বললেন, আমার ত আজ রাতে ডিউটি আছে, আমি দেখব।

প্রণব যেন একটা অবলম্বন পেল, বলল, যদি অনুগ্রহ করে—

সে কি কথা, আমার ত ডিউটিই দেখাশুনা, আর আপনি—আমাদের বিনয়ের বন্ধু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—।

আমরা চলি মাসীমা—

তুমি কিন্তু একবার এস বিনয়, কি আসবে ত? আপনিও আসবেন, এই ত কোয়ার্টার—

বিনয় বলল, আপনার সঙ্গে দেখা না করে ফিরব না—

মাসীমা বললেন, তোমার আজকাল কত নাম হয়েছে। কত বই বেরিয়েছে, খুকীর মুখে সব শুনি, খুব ভাল লাগে—

বিনয়েন্দ্র হাসল। প্রণব আপন মনে কি ভাবছিল। বিনয়েন্দ্র বলল, আপনি যান মাসীমা, পরে আসব—

তিন

সুনেত্রা কিছু বুঝতে পারছিল না, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে সে দুলছিল। শেষে মাকে একা একা ফিরতে দেখে সে বুঝতে পারল, বিনয়েন্দ্র আসবে না। সে হয়ত আসবে না, এমন একটা সন্দেহ তার ছিলই, তবুও এতদিন পর দেখা, একটা ক্ষীণ আশা ছিল বৈকি! মা এসে অনেক কথা বলছিলেন, সব কথা সে শুনছিল না, বুঝতেও পারছিল না। পুরনোদিনের কথাগুলি বিনয়েন্দ্র মনে করে রেখেছে—এই বোধ তাকে আহত করছিল।

মা দু'কাপ চা নিয়ে এসে বারান্দায় বসলেন। এই ছোট্ট বারান্দাটুকু ভাল লাগে সুনেত্রার। দুখানা বেতের চেয়ার—একখানা ছোট্ট টেবিল।

বিনয়েন্দ্র এলে এখন এখানে বসে চা খাওয়া যেত! সে এলো না। হয়ত আসবেও না। মা বললেন, দেখিস, সে আসবে, মিথ্যে কথা বলার ছেলে সে নয়—

সুনেত্রা কোন মন্তব্য করল না।

দেখলাম বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং আগের থেকে অনেক সহজ, সরলভাবে কথাবার্তা বলল। ওর বন্ধুর কাকার অসুখ ত, চোখ অপারেশন হয়েছে—

সুনেত্রা বলল, চোখ অপারেশন কি সাংঘাতিক কিছু—

মা বললেন, সে ত আমরা বুঝি, ওরা অল্পেই ব্যস্ত—

মেয়ে ও মা দু'জনেই একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন স্কুলের সেক্রেটারী তারিনীবাবু এবং তরুণ শিক্ষক সুভাষ দত্ত আসছেন। মা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। ঘরের ভেতর থেকে একখানা টুল এনে রাখলেন।

বেতের চেয়ারে বসে আরামসূচক একটা 'আঃ' শব্দ করলেন তারিনীবাবু। সুভাষ বলল, সুনেত্রা এবং বারান্দা, সামনে অঙ্গনা—সব মিলে এক রমনীয় সান্নিধ্য, মনে হয় অনেকক্ষণ বসে থাকি—

তারিনীবাবু শব্দ করে হাসলেন, তুমি কবিতা লেখ না কেন সুভাষ, এমন অদ্ভুত গুছিয়ে কথাগুলি ছাড়লে যে আমার আর কিছু বলতেই হল না। যেন কথাগুলি আমারই—

সুনেত্রাও হাসছিল। বলল, সুভাষবাবুর কবি হওয়ার একটা গুণ অবশ্যই আছে, স্বীকার করছি—

কি রকম? সুভাষ কৌতুহল নিয়ে তাকাল।

এই বানিয়ে বলার গুণ আর কি!

তারিণীবাবু হো হো শব্দে হেসে স্নিগ্ধ পরিবেশ মুখর করে তুললেন। হেরে গেলে সুভাষ। একটা কিছু বল—

সুভাষ বলল, বেশি বলা বাহুল্য, সুনেত্রা যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবে দেখেন,—বুঝতে পারবেন—

আর এক দফা হাসির ফোয়ারা। সুনেত্রাও হাসছিল। সুনেত্রার মা দু পেয়ালা চা এনে সামনে রাখলেন। তারিণীবাবু বললেন, ও মাসীমা, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব—

মাসীমা বললেন, সে কি কথা, এতে এত ধন্যবাদের কি আছে—

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে তারিণীবাবু বললেন, ধন্যবাদ দিলে সবটা

বলা হয় না ঠিক। এই ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু কলোনীতেও যে সুস্থ চেতনা নিয়ে বাঁচা যায়, সত্যি কথা বলতে কি সুনেত্রাকে দেখার আগে ভাবতেও পারতাম না। সুভাষ তুমিই বল?

সুভাষ এতক্ষণ পাশ থেকে সুনেত্রার সুডৌল গাল, স্নিগ্ধ চোখ গলা ঘাড় চুলের গোছার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিয়ে হাসল।

তারিণীবাবু বললেন, যাহোক, এবার কাজের কথায় আসা যাক—

কাজের কথা সেরে তারিণীবাবুরা উঠলেন। তাঁদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সুনেত্রা ঘরে ফিরল। প্রায় পেছনে পেছনে একটি ছাত্রীও এল। হাসপাতালের একজন কর্মচারীর মেয়ে। অত্যন্ত ক্ষীণবুদ্ধি এবং ফাজিল ধরনের। ওর বাবা মার কাতর মুখ দেখে মাঝে মাঝে আসতে বলেছে মেয়েটিকে। ইংরেজি গ্রামারের নিয়ম-কানুন বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল সুনেত্রা, ট্রানস্লেষণ করালো। এ-সব ব্যাপারে ধৈর্য সকলেরই আলোচ্য বিষয়। এমনিতে প্রাইভেট ট্যুইশান সে করে না, তবে প্রায়ই মেয়েরা এসে হাজির হয়। ছেলেরাও আসে। কো-এডুকেশন স্কুল। দাড়ি-গোঁফ কামানো ছেলেরাও আসে প্রেসি দেখাতে, প্রশ্নোত্তর সংশোধন করাতে। পড়াশুনার চাইতে গল্প করার দিকে তাদের ঝোঁকটা একটু বেশি। সুনেত্রা কৌশলে তাদের পাঠ্য বিষয়েই আটকে রাখার চেষ্টা করে।

চার

রাস্তায় নেমে প্রণব বলল, কিহে, তোমার এখানে কোন মাসীমা আছেন, জানতাম না ত—

বিনয়েন্দ্র কি যেন ভাবছিল, বলল, আমারও সন্দেহ ছিল, এখন দেখছি ওঁরা আছেন—

স্টেশনের প্লাটফরমে এসে ওরা চা খেল, সিগারেট কিনল। বিনয়েন্দ্র বলল, সুনেত্রার মা যেতে বললেন—

সুনেত্রা—কে সুনেত্রা? প্রণব ওর মেজকাকার কথা ভাবতে ভাবতে বলল।

কে সুনেত্রা! অনেক কথা বলার ব্যাপার। বলল, সুনেত্রা—মানে আমাদের সঙ্গে সে পড়ত—

এমনভাবে 'ও' বলল যেন সবটা জানা হয়ে গেছে। তারপর সিগারেট টানতে টানতে বলল, জানো, মেজকাকা আজ কাকীমার নাম বলছিলেন—

বলছিলেন! ভেরি স্যাড্—

তখন আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার ছেলেমেয়ে বৌ সংসার আছে—অথচ মেজকাকার ত কেউ নেই আমি তার বিষয়-সম্পত্তি হাতানোর ফিকিরে আছি—সুলতাও মেজকাকার জন্যে অনেক করে। তারও প্রত্যাশা মেজকাকার মৃত্যুর পর—

বিনয়েন্দ্র হাসতে হাসতেও থেমে গেল। আমারও কেউ নেই! স্টেশনের অপর দিকে একখানা স্যারো গেজের গাড়ি এসে থামল। অনেক লোক নামল। সেইদিকে তাকিয়ে প্রণব বলল, মানুষটা চোখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে, কিছুই দেখতে পায় না—

বিনয়েন্দ্র বলল, আমরা চোখ খুলেই কি সব দেখতে পাই—

প্রণব বলল, তা বটে—

অর্ধসত্য জীবন টেনে টেনে তুমি আমি সুনেত্রা মেজকাকা আমরা সকলেই এগিয়ে চলেছি—

প্রণব সিগারেট টানতে লাগল। বলল, চল ফেরা যাক—

চল না একটু ঘুরে আসি—যাবে?

আমি? আমি কোথায় যাব?

দেখ, প্রত্যাশা নিয়েই আমরা বাঁচি, ঠিক কিনা? প্রণব কোন কথা বলল না। বিনয়েন্দ্র বলল, আজ অথবা কাল অথবা পরশু একটা কিছু ঘটবে—আর বেশি দেরি নেই—এই সম্ভাবনাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়—

প্রণব বলল, দুঃখের সম্ভাবনা বল। মেজকাকাকে দেখ—

বিনয়েন্দ্র হাসপাতালের চত্বরে এসে এ-কথার উত্তর খুঁজল, দোতলায় মেজকাকা চোখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। এইসব দিনে জগৎ-সংসারের যে-সব ঘটনা ঘটে চলেছে তিনি তার কিছুই জানেন না।

তখন তাঁর পাশে বেশিক্ষণ বসতে পারেনি বলে অনুশোচনা হতে লাগল। এখন এই মুহূর্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল, মেজকাকা কি ভাবছেন—কি উত্তর দেবেন তিনি! কাকীমা কতদিন আগে চলে গেছেন! তাঁর স্মৃতি ভাবতে ভাবতে কি এই কষ্টের দিনযাপন করছেন! তাঁর চোখের বাঁধনও একসময় খোলা হবে। ক্যাটার‍্যাক্ট্ ভালো হবে। তখন তিনি আবার জগৎ-সংসারকে দেখতে পাবেন। প্রত্যাশা! আসলে মেজকাকা, আপনি

আমি, প্রণব, সুনেত্রা—আমরা সকলেই এই প্রত্যাশার আলো জেলে পথ চলছি! দুঃখের সম্ভাবনা বলে প্রণব আমাদের প্রত্যাশাকে ভারি করে দেখছে। একসময়ে কবিতা লিখত প্রণব। সেই প্রথম যৌবনে—যখন বিয়ে করেনি, সংসারে প্রবেশ করেনি। এখন তার ঘরে ছেলেমেয়েদের স্কুল-পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোন বই বা পত্র-পত্রিকা নেই। কবিতা লেখা সে ছেড়ে দিয়েছে। কেন ছাড়লে—জিজ্ঞাসা করতে প্রণব বলেছিল, দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি! দুঃখের সম্ভাবনাকে বাড়ানো! কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে! ঠিক, জয়দেব বাঁচার জন্যে কবিতা লেখা ছেড়েছে। মেজকাকা বাঁচার জন্যে চোখ অপারেশন করছেন—। মাসীমা বাঁচার জন্যে চাকরি নিয়েছেন। আমি বাঁচার জন্যে কলম ধরেছি। সুনেত্রা—। না, সুনেত্রা কিভাবে বাঁচার চেষ্টা করছে কিছুই জানে না বিনয়েন্দ্র। শিক্ষকতা নিয়ে সে চলে এসেছে আর কিছুই সঠিক জানে না সে। জানার কোন উৎসাহও ছিল না, উপায়ও ছিল না। কেননা সুনেত্রা সে সম্পর্ক রাখতে চায়নি। বিনয়েন্দ্র সুনেত্রার নির্দেশমত লিখতে পারেনি এইজন্যেই কি? বেহিসেবী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, সেইজন্যেই কি! সুনেত্রা জীবনযাপনের কথা বলত, সে চেয়েছিল মাটির উপর দিয়ে যে-সব মানুষ হাঁটে তাদের কথা লিখতে হবে। সুনেত্রার মুখে এ-সব কথা শুনবে সেদিন আশা করেনি বিনয়েন্দ্র। সাহিত্য সম্পর্কে সুনেত্রার সত্যিই কোন গভীর ধারণা আছে সে ভাবতে পারেনি। সেজন্যে তার ভালও লাগেনি সুনেত্রার কথা। মনে হয়েছে, সে অনধিকার চর্চা করছে। সুনেত্রা সেদিন অনেক দূর থেকে কথা বলেছিল। তর্কও করেছিল। রাজনীতি করা ছেলেমেয়েরা যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে, কথার মধ্যে শান দেওয়া ছুরির ডগা বসিয়ে। সুনেত্রা সেদিন বিনয়েন্দ্রকে আঘাত করেছিল, তার সাহিত্যিক-সত্তাকে অপমান করেছিল। বিনয়েন্দ্র ও তার সাহিত্যিক সত্তা এক এবং অভিন্ন, যেহেতু সাহিত্যের বিষয়ের জন্যে বিনয়েন্দ্র নিজের মনের দিকেই তাকিয়ে থাকে, যেহেতু মনোভূমিই তার সাহিত্যের পটভূমি…। এতদিন পর বিনয়েন্দ্র তার পরিবর্তিত সত্তাকে কি সুনেত্রার দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরতে পারবে!

বিনয়েন্দ্র ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল। এই যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত মনে হল। কিন্তু ততক্ষণে সুনেত্রাদের কোয়ার্টার্সের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে বিনয়েন্দ্র।

পাঁচ

স্থল কলমি ফুল ফুটেছিল গেটের পাশে। ঠিক সামনেই মরা নদী অঞ্জনা। এখান থেকে পর পর সব কোয়ার্টার্স। হাসপাতাল কর্মচারীদের গ্রেড ও পদমর্যাদা অনুযায়ী কোয়ার্টার্সের রকমারী ডিজাইন। মাঝে মাঝে ফাঁকা জমি। ফুল বাগান। কেউ কেউ কিচেন গার্ডেন করেছে। ঝিঙে, শশা, ঢ্যাড়শ, কুমড়োর গাছ। বিনয়েন্দ্র কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই গেটম্যান এগিয়ে এল এবং স্থনেত্রাদের কোয়ার্টার্সের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলল, কড়া নাড়ুন।

দরজা খুলল স্থনেত্রা নিজে। একটু স্মিত সলজ্জ হেসে সে বিনয়েন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাল, এস, ভেতরে এস, আমরা ভাবছিলাম তুমি আর এলে না।

বিনয়েন্দ্র বলল, আসব না কেন! তুমি কি প্রত্যাশা করনি?

দরজা বন্ধ করতে করতে স্থনেত্রা বলল, প্রত্যাশা করলেই কি সব পূরণ হয়, তুমি যদি না আসতে কি আর করতে পারতাম…চল ভেতরের ঘরে চল…

এ কখানাই মাত্র ঘর, সামনেটায় ঘেরা একটু চৌকোনো জায়গা, দুই পাশে রান্নাঘর বাথরুম। স্থনেত্রা ভেতরে ঢুকে বলল, মা বিনয় এসেছে…

মা ডিউটিতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। দরজা ভেজানো।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্থনেত্রা এবং বিনয়েন্দ্র অপেক্ষা করতে লাগল। সামনের দরজা বন্ধ। ওরা বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কেউই কোন কথা বলছে না। কি বলা যায়, কিভাবে শুরু করলে ভাল হয় ওরা বুঝতে পারছিল না। শেষে স্থনেত্রাই বলল, চিনে আসতে পারলে ত?

বিনয়েন্দ্র বলল, চেনা শক্ত বটে, তবে এলাম ত—

স্থনেত্রা বলল, শক্ত কি আর? আলো বাতাস মাটিত আমাদের সংস্কারেই মিশে আছে—তার মত সহজ আর সত্য কি আছে?

বিনয়েন্দ্র মৃদু হেসে বলল, অর্থাৎ বলতে চাইছ মূলটা সহজ এবং সত্য, ডালপালা পাতা ডগা ফলফুলই যত জটিল এবং মিথ্যা?

স্থনেত্রা বলল, মূল সত্য হলে তার অবয়বের সবটাই সত্য হবে, অন্তত সত্যের আশ্রয়ে থাকবে—নয় কি?

আর কোন্‌টা যথার্থ আসলবস্তু তা নিয়ে যদি তর্ক থাকে, সংশয়ে সন্দেহ থাকে—

সংশয়কে উত্তীর্ণ হতে হবে, স্থনেত্রা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল। সেই চেষ্টাইত দেখছি তোমার সাম্প্রতিক রচনাতে—

বিনয়েন্দ্র বিস্মিত মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকল সুনেত্রার মুখের দিকে। সুনেত্রার মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসির রেখা বিস্তারিত হতে হতে সমস্ত মুখখানাকেই উজ্জল করে তুলছিল। বিনয়েন্দ্র চোখ ফেরাতে পারছিল না। ধীরে ধীরে বলল, তোমার মনে আছে সুনেত্রা, মাটির উপর দাঁড়াতে বলেছিলে, আমি সেই চেষ্টাই করেছি—

দরজা খুলে গেল। মাসীমা বের হয়ে এলেন। বিনয়েন্দ্র বলল, কাল চলে যাব মাসীমা, দেখা করতে এলাম।

মাসীমা বললেন, তা হবে না বিনয়, কাল তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে, কথাবার্তা হবে, তারপর যাবে। আমি বসতে পারছি না, তোমরা কথা বল। আমার সময় হয়ে গেছে—পারি ত পরে আসব—

মাসীমা বের হয়ে গেলেন। সুনেত্রা ঘরে এসে বলল, বস, চা করি, তুমি ত আগে খুব চা খেতে—

প্রায় হাত ধরে নিষেধ করল বিনয়েন্দ্র, চা এখনও খুব খাই, কিন্তু এখন খাব না। তুমি বস, কতদিন পর দেখছি তোমাকে, চা খেয়ে সময় নষ্ট করতে চাইনে।

সুনেত্রা বলল, তুমি কথা বল আমি শুনি। সে স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। বিনয়েন্দ্র বলল, তোমার ভদ্রতা করার ধরণ দেখেই বোঝা যায়, আমার সম্পর্কে তোমার আর কোন আগ্রহই নেই।

সুনেত্রা বলল, না, না—একি কথা। তুমি এ-ভাবে বলছ কেন?

তুমিই বলাচ্ছ—

মিথ্যে ধারণা। তোমার গল্প কবিতা সবই আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ি। আমি ত ভাল বুঝি না, তবুও পড়ি। আলমারী থেকে বই পত্র পত্রিকা বের করতে করতে বলল, তুমিত দাও না, কিনেই পড়ি—

বিনয়েন্দ্র অভিভূত বোধ করছিল। সুনেত্রা কিছু কিছু বইপত্র বিনয়েন্দ্রর-র সামনে রাখল। বলল, দেখ, আমি মিথ্যে কথা বলিনি!

বিনয়েন্দ্র সুনেত্রার চোখের দিকে তাকাল। আয়ত টানা টানা সেই চোখজোড়া। আগের সেই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা কেটে গিয়ে একটা প্রশান্ত স্নিগ্ধতা এসেছে। মুখ বয়সের ভারে কিঞ্চিত কঠোর হলেও গম্ভীর উজ্জ্বল। শরীরেও আগের সেই উদ্ধত ও তীক্ষ্ণভাব নেই, উপরন্তু একটা ব্যক্তিত্ব তাকে অনন্য করে তুলেছে। সাধারণ আটপৌরে তাঁতের শাড়ি ও বেগ্নি রঙের ব্লাউজে সে একপ্রকার সহজ এবং স্বাভাবিক দ্যুতি ছড়াচ্ছিল।

বিনয়েন্দ্র বলল, একটা কথা বলব ?

বল না, সেকি, এত ঘটা করে অনুমতি চাইছ কেন ?

তুমি অনেক বদলে গেছ এবং অনেক সুন্দর—

সুনেত্রা দ্রুত উঠতে উঠতে বলল, তোমার চোখও অনেক বদলে গেছে। বস, চা নিয়ে আসি—

বই পত্তরের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বিনয়েন্দ্র সুনেত্রা সম্পর্কে তার বোধগুলিকে ভাবছিল। কখন প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারে সে সুনেত্রার ইচ্ছার মত করে নিজেকে গড়ে তুলেছে। জীবনকে যত কঠোর আর রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছে তার রচনাও হয়ে উঠেছে ইস্পাত দৃঢ় সত্যের প্রতীক। বাবার মৃত্যুর পর তার সামান্য কেরাণির চাকরির উপর গোটা সংসারের নির্ভরতা ও চাপ পড়েছে। দেশ ও সময়, সমাজ দেহের সমস্ত রক্ত এক বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা, অস্থিরতা, হতাশা এবং জীবনসংগ্রাম সব মিলে বিনয়েন্দ্রকে সেই মাটির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন সে মানুষের জীবনযাপনের অনেক কাছাকাছি এসেছে। তার এই পরিবর্তনে অনেকে কটাক্ষ করেছে আবার ভালোও লেগেছে কারো কারো। অবশ্য নিন্দা বা প্রশংসার কথায় সে আর আগের মত উত্তেজিত হয় না। এখন এই মুহূর্তে তার ভাল লাগছে এইজন্যে যে, সুনেত্রার ইচ্ছাই তার লেখার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হ'তে পেরেছে।

প্লেটে ডিম ভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকল সুনেত্রা। পরে দু'কাপ চা এনে তক্তাপোষে বসল। বলল, কেমন আছ কি করছ বললে না ত ?

বিনয়েন্দ্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, আছি ভালই, করছি কেরাণীগিরি—অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস্‌-এ।

সাহিত্যিক মানুষ হিসাব নিকাষ কি বুঝতে পারে ?

বুঝতে বাধ্য। এ-দেশে জীবনের সঙ্গে জীবিকার দুস্তর প্রভেদ সুনেত্রা। আমার কাছে একটা ছেলে কবিতার খাতা নিয়ে আসে মাঝে মাঝে, সে রেলের পোর্টার—। যাকগে, তুমি কেমন আছ, শিক্ষকতা করছ নিশ্চয়ই। কেমন লাগছে ?

সুনেত্রা বলল, শিক্ষকতা নিয়েই আছি, এবং ভালই আছি—। তুমি ত একেবারেই আস না—

আমন্ত্রণও জানাওনি—

সুনেত্রা হাসল একটু। বলল, তুমি কবে আমন্ত্রণের জন্যে অপেক্ষা করেছ ?

বিনয়েন্দ্র আমন্ত্রণের জন্তে সত্যই অপেক্ষা করেনি। এক সময় আবেগে উচ্ছ্বাসে দুর্জয় সাহসে উল্কার মত ছুটত। যখন তখন ক্লাশ থেকে বের করে নিয়ে যেত সুনেত্রাকে। বাসায় গিয়েও হাজির হত সময়ে অসময়ে। ময়দানে বসে একদিন হঠাৎ সে সুনেত্রাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। এক চাইনিজ রেস্টুরেণ্টে বসে দুম করে দু' পেগ ড্রাই জিনের অর্ডার দিয়েছিল। অনিচ্ছুক সুনেত্রাকে জড়িয়ে ধরে গ্লাস মুখে তুলে দিয়েছিল। সুনেত্রা কি সেইসব দিনের কথা মনে করেই কথাটা বলল? বিনয়েন্দ্র কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কিভাবে বলা যায় ভেবে পেল না।

কৈ কিছু বল, আগে কত কথা বলতে—

তুমিই বল। তুমিও কম কথা শোনাওনি—

সুনেত্রা বলল, রাগ করেছ?

বিনয়েন্দ্র বলল, করেছি—

তারপর দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

সুনেত্রা জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল। মা বাগান দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, বিনয় আছে ত রে?

সুনেত্রা বলল, আছে—

মা ঘুরে দরজার সামনে গেলেন। সুনেত্রা দরজা খুলতে গেল। সে বুঝতে পারল, একটা ভুল হয়ে গেল। মা কি ভাববে? দরজা খুলতেই মা বলল, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। কৈ, বিনয় কৈ?

সুনেত্রা হেসে অবস্থাটা ঘোরাতে চেষ্টা করল। বলল, সে কখন চলে গেছে—

তবে যে বললি সে আছে?

সুনেত্রা হাসতে হাসতেই বলল, বলেছি নাকি? তারপর বলল, বিনয় বলে গেছে, সে আসবে।

সন্তের

একটি বিচিত্র লোকগাথা

জুহা মৌলবীর মধ্যে সেইসব মোগল কিংবা বন সর্দারদের হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়ার বেগ ছিল। 'ভিনি ভিডি ভিসি—এলাম দেখলাম জয় করলাম।' মৌলবী এইরকম বলেন। করেনও অনেক। গ্রামে-মুসলমানরা তাঁর হাতে 'তৌবা' (ক্ষমাপ্রার্থনা) 'ফরাজী মতে দীক্ষা নিয়েছে। সঙ্গীত শুনলে চল্লিশ বছরের 'বন্দেগী' (উপাসনা) বরবাদ হয়, মেনেছে। মেয়েদের পর্দানসীন করেছে। হিন্দু জমিদারদের মাটিতে গোরু কোরবানীও অনেক জায়গায় চালু হয়েছে। ব্রিটিশ রাজা খ্রীস্টান। সদরে কালেকটার বাহাদুর, পুলিশ সায়েব প্রমুখ আমলা-ফয়লা সাদা চামড়া ও খ্রীস্টান। জুহা মৌলবী মুখে ফতোয়া দিয়েছেন ব্রিটিশরাজ জালেম (অত্যাচারী), তার বাদশাহী হারাম (নিষিদ্ধ), তার শাসনে বাস করা মুসলমানের গোনাহ্ (পাপ); কিন্তু গুরুতর সাম্প্রদায়িক গোলযোগের হাওয়া উঠলেই জোহা দরবার করেছেন কালেকটার বাহাদুরের কাছে। বলেছেন, স্যার—ইয়র প্রফেট ইজ মাই প্রফেট। দি সেইম অরিজিন স্যার। কালেকটার তাই শুনে হেসেছেন।—রাইট, রাইট মৌলানা। দেয়ার ইজ এ সেইয়িং—ইসলাম ইজ এ ড্র্যাসটিক ফর্ম অফ দি খ্রীষ্টিয়ানিটি। এবং ক্রমশ ইংরেজ ততদিনে মুসলমানদের চুপি চুপি কোলে টানতে শুরু করেছিল। এর মোদ্দা কারণ, কংগ্রেসের ব্যাপক অভ্যুত্থান আর তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদ!' ইংরেজও যেন জুহা মৌলবীর সুরে গলা মিলিয়ে বলতে চাইছিল—উই আর অফ দি সেইম অরিজিন! তোমরা এসেছ, দেখেছ, জয় করেছ—আমরাও এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। এতে জোর কাজ হচ্ছিল। ওহাবী আন্দোলনের তীব্রতা হারাল। ইংরেজ শেখাল এবং জুহা মৌলবীরা মুসলিম নেতাদলের প্রতিনিধি হয়ে গ্রামে-গঞ্জে বলতে শুরু করলেন—আমরা মুসলমান, বাদশাহের জাত! কংগ্রেস হিন্দুদের কারবার। অতএব··

নিজের মধ্যে এক বাদশাহকে নিশ্চয় দেখতে পেতেন জুহা মৌলবী। তাঁর বাদশাহী এক ইসলামী সাম্রাজ্যের। এটা বড় জোর তাঁর অবচেতন

স্বপ্নের বেশি কিছু নয়। এবং এর আভাষ পেলেই গোরাং ডাক্তার মুখোমুখি বলতেন—ইস! ঢাল নেই তরোয়াল নেই—নিধিরাম সর্দার!

গোরাং ডাক্তারকে কিন্তু শেষঅব্দি বাদশাহী দাপট সইতে হল। —'খামোকা পড়ে-পড়ে লোকটা পাগল হবে, আর জুহা তাই দেখবে চুপচাপ?' মৌলবী দাপটে এসে গোরাংবাবুকে এক প্রত্যুষে ট্রেনে তুললেন।...তিনপাহাড়ী নিয়ে যাবার লোক নেই, এ কি কাজের কথা মা স্বর্ণলতা? আমি তবে আছি কী করতে? যাবি তো সোজা সঙ্গে চলে আয়, নয়তো বাপের দায়দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ডাক্তারি কর্।'

জুহা মৌলবীর চেহারায় যখন ওই রোখ বা দাপট ঠেলে ওঠে, সবাই ভড়কে যায়। স্বর্ণ চুপচাপ রইল। এদিকে গোরাংবাবু ত্রাহি ত্রাহি চেঁচাচ্ছেন। লোক জড়ো হয়েছে গাছপালার আনাচে-কানাচে। সবাই অবশ্য মজাটাই দেখছে। মৌলবী একা বীরবিক্রমে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন। গোরাংবাবু প্রচণ্ড গালাগালিও করছিল। জাতধর্ম তুলেও বটে। জুহাসায়েব নির্বিকার। আপ ট্রেন এসে গেল। তারপর সব অদৃশ্য। খাঁ খাঁ প্লাটফর্ম। তরুণ শিরীষ পিপুল কৃষ্ণচূড়ার ডালপালায় বাতাস খেলছে। জর্জ হ্যারিসন ষ্টেশনের উঁচু বারান্দায় আপের দিকে তাকিয়ে থাকার পর নিশান হাতে ঘরে ঢুকে গেল।

ময়রাকুড়ির আখড়ায় এ নিয়ে কিছু চাপা মন্তব্যও শোনা গিয়েছিল। মৌলবীর একটা মতলব আছে মাথায়। বুড়ি বলেছিল, 'ও মোছলমান করতে নিয়ে গেল বুড়োকে। দেখো, এ যদি না হয়, আমার নামে কুকুর পুষে ছেড়ে দিও তোমরা। আর—এর পর কী হবে জানো? ওই মেয়েটা খেরেস্তানে জাত দেবে। বাপ হবে মোছলমান, মেয়ে হবে খেরেস্তান।'

তাই নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে রটেও গেল কিছুটা। জুহা মৌলবীর মোক্ষম শিকার এবার ষ্টেশনধারের গোরাং ডাক্তার! সবাই আশা করতে লাগল যে অদূর ভবিষ্যতে গোরাংবাবু ট্রেন থেকে নামবেন গোরাই মিয়া হয়ে, মাথায় থাকবে লাল ফেজ টুপি, পরণে পায়জামা, গালে দাড়ি, মুখে 'বিসমিল্লা!' তবে অন্য কোন সজ্জন ভদ্র মানুষ হলে এই নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ ও ভট্টচায্যিরা গোলপাকাতে বসতেন। কিন্তু গোরাং ডাক্তার! রাম কহো, রাম কহো!

ঠাকুর সর্দার। দাগীর রাজা। ছত্রিশজাতের এঁটো খাওয়া জাতনাশা বামুন। ম্লেচ্ছের হদ্দ। না মানে মনু, না মানে মানুষ। সমাজছাড়া সৃষ্টিছাড়া এবং হতচ্ছাড়া জীব।

তার মেয়ে ম্লেচ্ছ খেরেস্তানের গলা ধরে রাতে শুয়ে থাকে, দিনে ঢলাঢলি করে। বাপের ধন্বন্তরীবিদ্যার 'কুটুনকাটুন (একটু আধটু) পেয়েছিল, তাই রক্ষে পেটে পাপের পোকা জন্মাতে দেয় না। ঘটকঠাকুর বলে বেড়িয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে—হোমোপেথি কঠিন জিনিস! শুনেছি, এট্টুকুন ছুটো গুলি বহরমপুর ঘাটে ফেলে চৌরিগাছার ঘাটে একঘটি সরবত তুলে খেও, এমন ব্রহ্মতেজ! আর সামান্য স্ত্রীলোকের জঠর!'

পুনশ্চ সেই 'দারোগার হাসি' কর্ণসুবর্ণ পরিমণ্ডলে। আসলে সে আমলের গ্রামসমাজে 'কেলেঙ্কারী' নামক ব্যাপারটা ছিল সংস্কৃতির এক অবিভাজ্য ও চমৎকার অংশবিশেষ। এ না থাকলে গ্রামের মানুষ শূন্যতা অনুভব করত। পুজোআচ্চা মেলাপার্বণ গানবাজনা পুঁথি কথকতা মানামো—গ্রামসংস্কৃতির এইসব পুরানো স্তম্ভের সঙ্গে 'কেলেঙ্কারী' ছিল অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কেলেঙ্কারী নেই, তো এবার চৈত্রের গাজনে সঙ বাঁধবে কিসে? আড্ডায় মাঠেঘাটে বাটে কী নিয়ে কথা বলবে গ্রামীণ মানুষেরা? তাই কেলেঙ্কারী আবিষ্কারের তালে থাকতেই হত। তৈরী করে নিতে হবে বাতাসের মৃদু গন্ধ থেকে।

এবং কদাচিৎ এই কেলেঙ্কারীকে দরদী মরমী পুঁথিকার গীতিকার অথবা কোন লোককবি বা লোকসাহিত্যিক পুঁথিতে কাব্যে গীতিকায় তুলে ধরতেন—তাঁরা নমস্য। তা থেকে তাঁরা সামাজিক ঘৃণার অংশ ধুলোবালির মতো সাফ করে তুলে নিতেন যেন অবহেলিত পথের অমল-ধবল পবিত্র শিশুকে বুকের কাছে। সে এক গভীরতর সমাজদ্রোহ নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য, একদা সমাজ তা মেনেই নিত। কেলেঙ্কারী হত বিশুদ্ধ প্রেম—নিকষিত হেম। আর একদা তাই হয়েছিলও স্বর্ণলতা ও গোরাং ডাক্তারকে নিয়ে, জুহা মৌলবী, পাদ্রী সাইমন, জর্জ হ্যারিসন আর সুধাময়কে নিয়ে—হয়েছিল ইয়াকুব সাধু আর তার ছেলে ইসমাইলকে নিয়ে। এবং এই বিস্তারিত গীতিকাহিনীর কেন্দ্রে ছিল এক বাউরী ডাকাত।

পঞ্চাশ বছর পরে কর্ণসুবর্ণে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শিবিরের তরুণ অধ্যাপক এক জ্যোৎস্নারাতে টিলায় বসে শুনছিলেন লোকগীতিকার দমন শেখের মুখে—গানের সুরে, ছড়ায়। আল্লাতালা মা সরস্বতী পীরপয়গম্বর

তেত্রিশকোটি দেবতাও দশদিক বন্দনার পর মদন শেখ শুরু করেছিল :

বাউরীকুলে জন্ম লিলে রূপেতে কন্দর্প
ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো বাপের বড় গর্ব…ইত্যাদি।

সব লোককাহিনীর হালচালই এমন। মদন শেখের কল্পনা তার বাইরে যায় নি। কিন্তু যখন সে স্বর্ণলতার সঙ্গে বাউরীছেলের প্রেম লড়িয়ে দিল, তরুণ অধ্যাপক হো করে করে হেসে ফেলেছিলেন।

…ব্রাহ্মনের বিধবা তিনি নাম স্বর্ণলতা
মনে বড় অনুরাগ মুখে সরে না কথা
ধিকধিক আগুন জ্বলে জলে না নেভায়
চলো গো বাউরীর ছেলে ভিন্নস্থানে যাই…ইত্যাদি।

হাস্যকর! কিন্তু মদন শেখ হাসেনি। সে বুকে দম নিয়ে আকাশে মুখ তুলে তখন গানের জায়গায় টান দিয়েছে :

নিশিরেতে কানপাশা আর
পরব নাকো সই লো
(আমার) মনের মানুষ 'জেহেলখানায়' বাসরো পোহায়॥"…

তারপর কিনা বাউরীর ছেলের মনে সেই টান লেগেছে, সে পাগলের মতো গরাদ ভেঙে পাঁচিল টপকে পালিয়ে স্বর্ণলতার কাছে যেতে চায়, বুকে লাগল গুলি।…

তারপর দিন যায়, রাত যায়।

তারপর এল : 'জাতিতে খেস্তান তিনি, হার্সন নামে গোরা
সামোনে দেখেন কন্যা রূপেরো পশরা
আমি তো বিদেশী তুমি বিদেশিনী নারী
মনের কথা বলতে যেয়ে মুখের কথা বৈরী (অর্থাৎ ভাষা)
অ আ ক খ শেখাও কন্যা তোমার পাঠশালায়
তখন বলিব কথা প্রাণে যাহা চায়॥…ইত্যাদি।

এবার হাসেন না অধ্যাপক। দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে তাকান ধু ধু জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরের ষ্টেশনে—সেই প্রাচীন বট কালো হয়ে মাথা তুলে আছে এখনও। তিনি বলতে চান—বল তো কালের সাক্ষী পিতামহী, জর্জ হ্যারিসন একটা বাঘ মারতে পাগল হয়ে উঠেছিল কেন? কে সেই বাঘ? কী সেই বাঘ—যা ওই অষ্ট্রেলিয়ান গোঁয়ার মানুষটিকে বারবার ধূর্ততায় পরাজিত করছিল আর ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিল, হন্সে করে মারছিল? ওই বাঘটার জন্যে তার চোখে ঘুম

ছিল না। সারাক্ষণ সে দেখত, আলোছায়ার মধ্যে বিভ্রম, ডোরাকাটা এক হিংস্র চতুর শয়তান—নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ—মৃদু নড়াচড়াতেই সে ফুঁৎ করে হারিয়ে যায়। রাত দুপুরে সে বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসত—বন্দুক হাতে নিত। বিড়বিড় করে গাল দিত। রাগে বেরিয়ে ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসত হঠাৎ। খানখান হয়ে যেত রাত্রির গভীরতর নৈঃশব্দ। গ্রামের ঘরে কেউ জেগে থাকলে বলে উঠত : পাগলা সায়েব বাঘ মারতে বেরিয়েছে।

মদন শেখ গায় :

স্বর্ণলতা বলেন শোন সায়েবের ছেলে
আমাকে পাইবেন বনের রাজাকে মারিলে
বড় সাধের চৈতক আমার এমন আস্পর্ধা
কন্ধেতে বসাইল থাবা ব্যাঘ্র হারামজাদা
পায়ে ধরি সায়েব তোমার করিলাম প্রতিজ্ঞা
বাঘছাল পিন্ধাইলে তবে করব স্যাঙ্গা॥…(স্যাঙা বা দ্বিতীয় বিয়ে)

প্রতিজ্ঞা করেছিল নাকি স্বর্ণলতা? সত্যি কি তাই? রোমান্টিক অধ্যাপক তীব্রতর অনুসন্ধানে লিপ্ত হন।

…এদিকে কিনা জুহা মৌলুবী দিনের পর দিন বাবামেয়ের পিছনে লেগে রয়েছে—তোমাদের জাত সমাজ বৈরী, কেন এমন একঘরে হয়ে কাটাবে? কলমা পড়ো। আমার ইসলাম সমাজ তোমাদের মাথায় করে ঘরে ঢোকাবে। যুবতীমেয়ের বিয়ে দেবে। আর তাই শুনে সুরসিকা স্বর্ণলতা মনে মনে হেসে বলেন,

শোন শোন মৌলুবী গো মোছলমানের ছেলে
আমাকে পড়াবেন কলমা বাঘেরে মারিলে…॥

তাই শুনে নির্বোধ মৌলুবী করলে কিনা এলাকার তাবৎ মুসলমানদের জড়ো করল। তাবৎপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে আরোয়া জঙ্গলে চড়াও হল। আর তখন বাঘটা বের হল। রাজবিজলীর ছটা আর কানফাটানো মেঘের গর্জন যেন। বাঘ যায় উত্তরে, একবার করে কালো আকাশ ঝিলিক দিয়ে যেন বাজ পড়ে। বাঘ যায় দক্ষিণে, ফের বজ্রপাত হয়। বাঘ লাফ দেয় পুবে, পশ্চিমে আর :

মোমিনগণ ভাগে ডরে কাতারে কাতার
মৌলুবী ভাগেন আগে শোনেন সমাচার

কাঁটাঝোড়ে রইল লুঙ্গি জলে দিলেন ঝাঁপ
ডাঙায় বাঘ বসে ডাকে, কী হল রে বাপ
মৌলুবী চেঁচান ওরে উল্লুকের বেটা
তোকে কলমা পড়াতে এসে এত হল ল্যাঠা
বাঘ যত ডাকে, শোন ও গুণের চাচা
মৌলুবী পাড়েন গালি কাকের হারামজাদা ।...

হ্যাঁ—জুহামৌলবী সত্যি বাঘটা মারতে ফতোয়া দিয়েছিলেন বটে। তবে স্বর্ণলতা বা গোরাংবাবুকে কলমা পড়ানোর গূঢ় সংকল্প মনে ছিল না। তাছাড়া মৌলবীর এ ব্যাঘ্র অ-ব্যাঘ্র অভিযানপর্ব অনেক পরের ঘটনা। তখন গোরাং বাবু আর বেঁচে নেই। তবে বাঘ মারতে গিয়ে মৌলবীর বিলক্ষণ দুর্দশা ঘটেছিল।

মদন শেখের লোকগাথার বিবরণ আলাদা। বাস্তব কাহিনীর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তবু তরুণ অধ্যাপক শোনেন সেই গাথা, শুনতে শুনতে মনে হয়—না, ভুল করছি। লোকগাথায় যা আছে, তা যেন গভীরতর বাস্তবতা। তাই তার মধ্যে সত্য আছেই কিছু। সেই সত্য বড় সহজে ধরা দেবার নয়। লোকগাথা যখন বলে, জর্জ হ্যারিসনের বাংলা শেখার তাগিদ স্বর্ণলতাকে মনের কথা খুলে বলার উদ্দেশ্যে, তখন হয়তো সেই গভীরতর বাস্তবতাকেই ছোঁয়—যা জর্জের অবচেতনায় স্ফোটকের মতো জেগে উঠেছিল!

আর চৈতককে বাঘটা ধরেছিল, এ ঘটনাও অবশ্য সত্য।

গোরাং ডাক্তারকে তিন পাহাড়ী নিয়ে গেলেন জুহা মৌলবী। সেখানে মিশনারীদের উন্মাদ আশ্রম রয়েছে। মৌলবীরও শিষ্য আছে সে এলাকায়। তার ক'দিন পরে এক বিকেলে বাঘে ধরল চৈতককে।

বাঘটা কেন কে জানে যেন দিনে দিনে জঘন্য কাণ্ড শুরু করেছিল। দিন দুপুরে গরুবাছুর কুকুর বেড়াল সামনে যা পেত, থাবা হানত। লোকজনের উপস্থিতি গ্রাহ্য করত না। হয়তো তাড়া খেয়ে খেয়ে সেও খুব ক্ষেপে গিয়েছিল।

চৈতকের দুপা বেঁধে বরাবর যেমন দীঘিতে ছেড়ে দিয়ে আসত, তেমনি সেদিনও দিয়ে এসেছিল স্বর্ণলতা। পা বাঁধা না থাকলে চৈতক পালিয়ে আসতে পারত হয়তো। পারেনি। বেচারা পড়ে পড়ে মার খেল।

কাঠকুড়োনি মেয়েরা ইদানীং বাঘের ভয়ে জঙ্গলে ঢুকত না। তবে বিল্লি

কি না চৌকিদারের মেয়ে। তার বাবা সরকারী লোক। সে বাঘকে ভয় করবে কেন? জঙ্গলের দীঘিতে গেছে পদ্ম গাছের গোড়া তুলতে—তাকে বলে 'মুলান।' ভারি মিষ্টি স্বাদ সেই মূলের। ধবধবে সাদা রঙ, রসে ভরা কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেতে ভালো লাগে। রান্না বা সেদ্ধ করেও লোকে খায়।

বিন্নি আপন মনে 'মুলান' তুলেছে সারা দুপুর। তারপর উঠে এসেছে। এসেই ভয় পেয়েছে। সামান্য দূরে ঘোড়াটা পড়ে আছে। আর বাঘটা তার লেজের দিকটা খাচ্ছে। বিন্নিকে তাকাতে দেখেই সে গরগর করে উঠে সরে গেছে পাড়ে ঝোপের আড়ালে। আর বিন্নি পড়ি কী মরি করে মুলানগুলো ফেলে অনেক ঘুরে ফাঁকায়-ফাঁকায় ষ্টেশনে এসেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে খবর দিয়েছে স্বর্ণকে।

স্বর্ণ আবেগে অনেক সময় অনেক কিছু করে বসে বটে, এবার কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল। ধীরে সুস্থে সে জর্জকে গিয়ে জানায় দুঃসংবাদটা। তখন জর্জ সেজেগুজে বেরিয়ে আসে।

দুজনে গিয়ে চৈতককে আবিষ্কার করে ওই অবস্থায়। তারপর কিন্তু স্বর্ণ আর পারে না। হু হু করে কেঁদে ভেঙে পড়ে ঘোড়াটার ওপর। জর্জ বলে —আমি বালো ঘোরা দেব তোমাকে, ডোণ্ট ক্রাই।

কতক্ষণ পরে স্বর্ণ উঠে দাঁড়ায়। তার চোখে চোখ রেখে শান্তভাবে বলে —জর্জ, আমার চৈতককে যে মেরেছে, তাকে তুমি যদি মারতে পারো…

হঠাৎ তাকে থামকে দেখে জর্জ একটু হাসে।…তো? বোলো?

স্বর্ণর চোয়াল আঁটো হয়। তার নাকের ফুটো কাঁপে। ঠোঁট দুটোয় ভাঁজ পড়ে।

জর্জ ফের বলে—বোলো? বখশিস দেবে?

স্বর্ণ হিসহিস করে বলে—দেব। যা চাইবে, তাই দেব।

—প্রমিজ?

—প্রমিজ।

হা হা করে হাসে অষ্ট্রেলিয়ান ষ্টেশনমাস্টার। আর কাছাকাছি কোথাও গরগর করে গর্জে ওঠে বাঘটা, খাওয়ায় বাধা পড়ছে বলে ক্রুদ্ধ সে। জর্জ একটু পরে গম্ভীর হয়ে বলে—চলো তোমাকে রেখে আসি। তারপর মাচান বাঁধতে হোবে। আই থিংক, ইট ইজ্ দ্য গ্রেটেস্ট চান্স নাও! মিস করলে আমি নিজের বুকে ঘোলি মারব।

স্বর্ণ যেতে যেতে একবার তার দিকে তাকিয়ে নেয়। কিন্তু কিছু বলে না।

স্টেশনের কাছে এসে জর্জ একটু হেসে ডাকে—মিস রয়!

—উঁ?

—তুমি প্রমিজ করেছ, যা চাইব—দেবে।

—হুঁ, করেছি তো।

—তো বোলো, আমি কী চাইতে পারব তোমার কাছে! হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট? বোলো মিস রয়?

—আমি কি কিছু দিতে পারিনে, ভাবছ?

—না, নো। আই নেভার সে ছাট। বাট হোয়াট? আমি কী চাইবে তোমার নিকট, বোলো। তুমি বলে দাও!

—বা রে! সে তোমার খুশি। ছাটস আপ টু ইউ—ইওর চয়েস।

—ইফ আই ওয়ান্ট ইউ?

—পাবে।

জর্জ ক্ষেপে যায় সঙ্গে সঙ্গে।—ড্যাম ইট! আমি বুঝেসে। সব বুঝেসে।

—কী বুঝেছ তুমি?

—তুমি জানো আমি বাঘ মারতে পারব না। দা ছাটান লেট লুজ! আমি হেরে যাব, সো ইউ থিংক! দেয়ারফোর ইউ প্রমিজ ছাট! ইয়েস, আই নো চরণ চৌকিদার বলছিল, দা টাইগার ইজ এ হিন্দু গড। কেউ তাকে মারতে পারবে না। ইউ প্রমিজড অন দা বেস অফ ছাট ফেইথ।

—না।

—ইউ আর জাস্ট প্লেয়িং মিস রয়।

—না।

জর্জ কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ হন হন করে চলে যায় জঙ্গলের দিকে। তার কাঁধে একটা মস্তো দড়ির বাণ্ডিল ঝুলতে ঝুলেতে যায়। সন্ধ্যার আবছায়ায় তাকে দেখে মনে হয়, সারা গায়ে লোভী ব্যগ্র মূল বাড়িয়ে একটা কী বিদেশী অচেনা পরগাছা ঘুরছে উপযুক্ত মাটির সন্ধানে।...

ঘরে ঢুকে আর বাগ মানাতে পারে না স্বর্ণ। দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদে ফের। চৈতকের শোকে তার বুক ফেটে যায়। এই নিঃসঙ্গ জীবনে তবু তো একজন সঙ্গে ছিল, যার সঙ্গে নির্জনে কথা বলেছে, সুখ দুঃখের কথা। কত নির্জন মাঠ ও পথ মন ভরে গেছে ওই চতুষ্পদ প্রাণীটির সঙ্গে আলাপে। জ্যোৎস্নার রাতে হঠাৎ অস্পষ্ট শব্দে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে দেখেছে।

কী ভাবে আটচালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে চৈতক, উঠোনে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হয়েছে, দুঃখের দিনরাতের এক পক্ষীরাজ। এখন জ্যোৎস্নায় তার পিঠে চেপে বসলেই গজিয়ে উঠবে দুটো চমৎকার ডানা। উড়িয়ে নিয়ে যাবে কোথাও—যেখানে পৃথিবীটা অন্যরকম।

ধুলোউড়ির মাঠের বুকে চৈত্রের সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটিয়ে আসার স্মৃতি স্বর্ণকে যত বিহ্বল করল, স্বর্ণ কচি মেয়ের মতো কাঁদল তত। সেরাতে রান্নাও চাপাল না। খেল না। অনেক রাতে বাবার ঠিকানায় চিঠি লিখতে বসল। জুহা মৌলবীর চিঠি এসেছে। ভর্তি হয়েছেন বাবা, চমৎকার বন্দোবস্ত হচ্ছে। মৌলবীর ফিরতে দেরী হবে। স্বর্ণমা যেন শিগগির এসে দেখা করে যায়। স্বর্ণ চোখের জলে লিখল : বাবা, বড় দুঃসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের প্রাণের চৈতক আজ…

চিঠি লিখে স্বর্ণ শুল কিন্তু ঘুম এল না। এই বুঝি জর্জ মরা বাঘটা টানতে টানতে ফিরে এসে ডাকবে জানলায়। এই বুঝি তার রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাবে। সে কান পেতে রইল। বাইরে আজ হু-হু হাওয়া দিচ্ছে। শন্‌শন্‌ করছে গাছ-পালা। তালগাছের বাগড়া দুলছে খড় খড় সর সর। শিস দিয়ে চলে গেল রেলগাড়ি। কিছুক্ষণ বিকট অস্থির শব্দপুঞ্জ। তারপর ফের হাওয়ার শন্‌নন্‌, তালপাতার খড় খড় ধারাবাহিক।

জর্জ তাকে কী চাইতে পারে?

একথা যত ভাবল, শিউরে উঠল সে। ক্রমশ একটা অপরিচিত অস্বস্তি জেগে উঠল তার মধ্যে। শরীর ভারি লাগল। ঠোঁট কামড়ে ধরল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, না-না-না। তারপর চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজল। মনে মনে প্রার্থনা করল, বাঘটা যেন না মরে—সে দেবতার বাহন হয়ে যেন বেঁচে থাকে।

একটা আত্মপ্রকাশের লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অনেককাল পরে স্বর্ণ ঈশ্বরকে ডাকতে থাকল। মাথা কুটতে লাগল মনে মনে। এ আমার মনের পাপ। আমাকে তুমি বাঁচাও, ঠাকুর!

কখন আবছা যেন গুলির শব্দই কানে এল। লাফিয়ে বিছানায় বসল সে। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দিল। কানের ভুল? আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

একটু পরে একটা মালগাড়ির আওয়াজ এল। অনেকটা সময় লাগল সেটা পেরিয়ে যেতে। স্বর্ণ ফের শুয়ে পড়ল। এবার চোখ ভরে ঘুম এসে গেল তার। কিছুতেই জেগে থাকতে পারল না।…

না, বাঘটা মারা পড়ে নি।

সে এত ধূর্ত, এত ক্ষিপ্রগতি, গাছের ডালে দড়ির মাচায় বসে জর্জের পা ফুলে ঢোল হয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্বও টের পায় নি—অথচ ঘোড়াটার অনেক মাংস খেয়ে গেছে। জর্জকে পরে স্বর্ণ বলেছিল, তোমার মন বাঘে ছিল না —তাই।

তাও হতে পারে। অন্ধকারে জর্জ স্বর্ণকে দেখেই রাত কাটিয়েছে হয়তো। তার কথাই ভেবেছে। ভেবে তোলপাড় হয়েছে, কী চাইবে সে স্বর্ণ:ক, কী চাওয়া উচিত, এবং স্বর্ণই বা কী দিতে পারে, কী আছে স্বর্ণর·· এইসব গুরুতর চিন্তা।

এদিকে লোক কবি মদনচাঁদ শেখ বলছে অন্তকথা :

স্বর্ণলতা গেছে গহন জঙ্গলে। বাঘের কাছে মিনতি করে বলছে, হে দেবতার বাহন, আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাও।

কন্যা বলেন, শোন বাঘা, আমার মাথার কিরে
এ দ্যাশ ছাড়িয়া তুমি যাও দ্যাশান্তরে
তোমার গেলে জান বাছা আমার যাবে মান
সে বড় পাপিষ্ঠ গোরা জেতে কেরেস্তান
কুক্ষণেতে ওরে বাঘা, করেছিলাম পিতিজ্ঞা
বামুনের বিধবা হয়ে ক্যামনে করি স্যাঙ্গা।···

অধ্যাপক আবার হো হো করে হেসে উঠেন। বুড়ো লোক কবি বলে, এবার সিগারেট দিন। গলার রসকষ শুকিয়ে গেল। এরপর ধরব ইয়াকুব সাধুর পালা। হেক্কর ছেলের কী হল, তাও বলব। আর বলব পাদ্রীবাবার সঙ্গে জুহামৌলুবীর জব্বর লড়াই।··

(ক্রমশ)

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

অষ্টম আরব লেখক সম্মেলন ॥ সম্প্রতি দামাস্কাসে অষ্টম আরব লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবারের সম্মেলনে বারটি আরব রাজ্যের প্রায় দুই শতাধিক লেখক প্রতিনিধি যোগ দেন। উপস্থিত বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ছিলেন ইউসুফ এল সেবাই, সোহেল ইদ্রিস, মহম্মদ দারভিস, আবদেল আজিজ সাদেক প্রমুখ একালের আরব দেশের বিশিষ্ট লেখকরা। আরব লেখকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। তবে আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক। সাহিত্যের মৌল সমস্যা নিয়ে আলোচনা তেমন হয়নি।

সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে বলা হয়: "The Arab writers realise that the bottle of destiny lies in resisting the forces of imperialism, zionism, colonialism and racism; for establishing the basis of freedom, progress socialist reconstruction, peace and social justice and for spiritual & culural prosperity of man." অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন, প্রকাশনার সুষ্ঠু বিন্যাস, লেখকদের রয়ালটি প্রভৃতি বিষয়ও প্রাধান্য বিস্তার করে।

আরব দেশ সমূহের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুবই সামান্য। আরবের শিল্প, সাহিত্য বা সংস্কৃতির পরিচয় তো নেই বললেই চলে। সম্প্রতি কয়েকজন তরুণ লেখক অবশ্য কিছু আরবীয় গল্প কবিতার অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ করেছেন। আরব দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নিবিড় করতে হলে এদিকে আমাদের আরো দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে।

একটি কবি সম্মেলন ॥ গত ২৭ আগস্ট সন্ধ্যায় ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের উর্দু বিভাগের উদ্যোগে এক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা, হিন্দি, উর্দু এবং গুজরাটি ভাষার কয়েকজন বিশিষ্ট কবি যোগ দেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন উর্দু কবি আলকামা শিবলি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ হীরালাল চোপরা। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনলিনভাই প্যাটেল তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে, এই ধরনের কবি-সভা

জাতীয় সংহতির সহায়ক। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন বাংলার কবিতা সিংহ, আশিস সান্যাল, শুভ মুখোপাধ্যায়, উর্দুর ইব্রাহিম হোস, ওয়াহিদ আর্শি, রাজ আজিম, হিন্দির মনমোহন ঠাকুর, নাওয়াল, গুজরাটি দীনেশ মোতি প্রমুখ কবিরা। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও প্রায় তিন শতাধিক শ্রোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত এই কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান চলে।

ভারতীয় ইংরেজি কবিতা॥ স্বাধীনতার পর ভারতে যে ইংরেজি কবিতা রচিত হচ্ছে, তার মান সম্বন্ধে সাহিত্য রস পিপাসু পাঠকদের মনে কিছুটা ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। সম্প্রতি আমেরিকার চিকাগো থেকে প্রকাশিত 'মাহ্ফিল' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর রচনা প্রকাশিত। রচনাগুলো পড়লে দেখা যাবে, ভারতীয় ভাষায় রচিত কবিতা সম্বন্ধে কবিরাই কেমন যেন সন্দিহান।

প্রখ্যাত কবি নিসিম ইজিকিয়েলকে প্রশ্ন করা হয়, স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতীয় ইংরেজি কবিতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি? উত্তরে তিনি বলেন যে, স্বাধীনতার পর ভারতে এমন কোন প্রধান ইংরেজভাষী কবির আবির্ভাব ঘটেনি! তবু এই সময়ে যাঁরা উল্লেখ্য তাঁরা হলেন, এ. কে. রামানুজম, আর পার্থসারথি, গীয়েভ প্যাটেল, অরবিন্দকৃষ্ণ মালহোত্রা, কমলা দাস এবং সেলিম পীরাদিনা। পি. লালের কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, "Lal has been more successful as a translator then as a poet. Not enough of his energy and intelligence have been put to the service of his original poetry. He has done well as a publisher and as a man of letters."

প্রসঙ্গতঃ আলোচনায় আরো কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। যেমন ভারতে ইংরেজি ভাষায় যাঁরা কাব্যচর্চা করেন, তাঁদের পাঠক কারা? একথা বলতে দ্বিধা নেই, এদেশে এঁদের পাঠক সংখ্যা অতি সামান্য হলেও ভারতের বাইরে ভারতীয় কবিতার নেতৃত্ব এঁরাই করছেন। ফলে, ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে বাইরে তেমন একটা ভাল ধারণা গড়ে উঠতে পারছে না। এজন্য এখন প্রয়োজন, ভারতীয় ভাষায় রচিত কবিতার ব্যাপক সার্থক অনুবাদ। এ ব্যাপারে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের একান্ত প্রয়োজন।

সুকান্ত সন্ধ্যা॥ গত ১৮ আগস্ট কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে সুকান্ত সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সুকান্তর কবি-প্রতিভা এবং জীবনী নিয়ে অনেক বক্তাই আলোচনা করেন।

আলোচনার সূত্রপাত করে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, সুকান্ত জীবনকে কোন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে যাননি। তরুণ সান্যাল তাঁর ভাষণে বলেন: "মাত্র কয়েকটি বছর আশ্চর্য মহিমায় ভাস্বর এক কিশোর কবির নতুন যুগের চেতনা সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সুকান্তই আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলেছেন।" রাম বসুর ভাষায়—"সুকান্তর কবিতা সাধারণ মানুষের সম্পর্কে নতুন চৈতন্যের দিগন্ত উন্মোচন করেছে।" হিরণকুমার সান্যাল স্মৃতিচারণ করে বলেন—"সেদিনকার বালকের মুখে যে ভাষা ও কণ্ঠস্বর শুনেছি, তা ধার করা বা কৃত্রিম নয়, নিতান্তই স্বকীয়। নতুন স্রোতের উৎসমুখ খুলে দিল সুকান্ত। হয়ত উন্মাদনা একটু বেশি। সুকান্তর কাব্য বহ্নিমান কাব্য।" সুকান্ত অগ্রজ রাখাল ভট্টচার্য শোনালেন সুকান্ত জীবনের অনেক অকথিত কাহিনী। আক্ষেপ করে বলেন—"সুকান্ত জীবনী ও প্রসঙ্গের নামে ব্যবসায়ী স্বার্থে এখন বাজারে অনেক বাজে বইয়ের ছড়াছড়ি। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং সভাপতি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও সভায় সুকান্তর স্মৃতিচারণা করে ভাষণ দেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম জয়ন্তী॥ গত ২০ জুলাই ছিল কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মদিন। কৃষ্ণনগর সংস্কৃতি পরিষদ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করেন। সকালে ঐ দিন প্রভাত ফেরী বার করা হয় এবং কবির জন্মভিটায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মাল্যদান করে।

জামতাড়ায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন॥ কিছুদিন আগে জামতাড়ায় বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিহারের রাজ্যমন্ত্রী শিবুরঞ্জন খাঁ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিহার বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের সভাপতি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ লাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাষারও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। পণ্ডিত গোরাচাঁদ টুডু, এল. এম. খান, যোগেশরী এবং মহাজনারায়ণ সিংহ সাঁওতালী, মৈথিলী, মগধী ও হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

প্রধান অতিথি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন: "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি ভারতবর্ষকে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে কোন কুসংস্কার রাখলে চলবে না। কেবলমাত্র নিজের ভাষা নিয়ে থাকলেও চলবে না। এই বিরাট দেশের সমস্ত

ভাষারই সমান উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।" এই সম্মেলনে বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন।

ডঃ শহীদুল্লার মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত॥ "ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন পাণ্ডিত্যের প্রতি সৎ। জ্ঞানের প্রতি আন্তরিক। যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তা ব্যক্ত করেছেন অনায়াসে। বিনা দ্বিধায়।" কথাগুলি বলেন বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান। ঢাকায় বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত শহীদুল্লাহ্ স্মৃতি-সভায়। ডঃ শহীদুল্লার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি আরো বলেন—"যে সমাজের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সমাজ ছিলো পরিবর্তনের যুগে। এই পরিবর্তনে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র ভূমিকা কি ছিল, তা আজ বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার। তিনি শুধু ভাষাবিদ, গবেষক বা শিক্ষকই ছিলেন না। তিনি একজন সমাজকর্মীও ছিলেন। অর্জিত জ্ঞান, শিক্ষকতার পেশা এবং তার প্রজ্ঞালব্ধ উপলব্ধির ব্যাপারে তিনি ছিলেন সৎ।" এই স্মৃতি সভায় পৌরোহিত্য করেন একাডেমীর পরিচালক মযহারুল ইসলাম। অধ্যাপক বুলবন ওসমান "ডঃ শহীদুল্লার সংস্কৃতি চিন্তা"; জনাব গোলাম সাকলায়েন "ডঃ শহীদুল্লার ধর্মনিষ্ঠা"; অধ্যাপক বদরুল হাসান "ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী শহীদুল্লা" বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ ছাড়াও ডঃ আব্দুল আওয়াল এবং জনাব এ. এম. এম. নূরুল ইসলাম সভায় ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে ঢাকার আকাদমী ভবনে শহীদুল্লাহ্ রচিত গ্রন্থ, চিঠিপত্র ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন জনাব সৈয়দ মূর্তজা আলী।

আফ্রো-এশীয় কবিতার সংকলন॥ আফ্রিকার কবিতার অনেক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, আফ্রো-এশীয় কবিতার কোনও সংকলন আছে বলে আমার জানা নেই। সম্প্রতি সেই অভাব দূরীভূত হল "আফ্রো-এশীয় কবিতার" সংকলন প্রকাশে। এই গ্রন্থে ৫০টির বেশি আফ্রিকার কবিতা এবং ৪০টি এশীয়ার বিভিন্ন দেশের কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন আফ্রো-এশীয় লেখক সংস্থা কায়রো থেকে।

বইটি এখনও দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু বইটির যে বিস্তৃত বিজ্ঞাপন কায়রো থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বেরিয়েছে, তার থেকে মনে হয়েছে, এত স্বল্প পরিসরে আফ্রো-এশীয় কাব্যধারার কি পরিচয় এই সংকলনে ধরা পড়বে? ৪০ জন কবির কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। এই চল্লিশজন কবিই কি আফ্রো-এশীয় কবিতার প্রধান যাঁদের নাম মুদ্রিত দেখা গেল, তা থেকে নিশ্চয় করে বলা যায়, কখন নয়। তাই এই ধরনের উদ্যোগ দেখলে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি দায়িত্বহীন সম্পাদনার জন্য সমস্ত আনন্দই উবে যায়। আরো দায়িত্ব নিয়ে এবং প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের কবিতা নিয়ে এ ধরনের গ্রন্থ সম্পাদন করা প্রয়োজন। নাহলে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হবে।

সতীনাথ ভাদুড়ী স্মৃতি-বক্তৃতা

স্বর্গত প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁর অগ্রজ শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী (পি-২২৮, এ ব্লক, বাঙুর এভিনিউ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭৫০০ টাকা দান করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞতার সহিত ঐ অর্থদান গ্রহণ করেছেন। ঐ অর্থ হ'তে প্রতি বৎসর সতীনাথ ভাদুড়ী স্মৃতি বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অথবা অন্যান্য যে কোনও ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্যূন তিনটি বক্তৃতা প্রদত্ত হবে। শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী এজন্য সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে?

দীনবন্ধু মিত্রের বাংলা নাটক নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ দেশে ও বিদেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বইটিতে কোন অনুবাদকের নাম ছিল না। আখ্যা-পত্রে শুধু বলা ছিল "একজন নেটিভ কর্তৃক অনুদিত"। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মামলার সময় পাদরী লঙ নিজেকে প্রকাশক বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন যে অনুবাদটি খাঁটি একজন নেটিভকৃত। কিন্তু সে যুগে সকলেই বিশ্বাস করেছিলেন যে এই নেটিভের অন্তরালে আসলে স্বয়ং লঙ্ সাহেবই লুকিয়ে আছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন প্রমাণ না দিয়ে লিখলেন যে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেই থেকে প্রকৃত অনুবাদকের নাম নিয়ে বিতর্ক চলছে।

সম্প্রতি "চতুষ্কোণ" আষাঢ় ১৩৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে প্রখ্যাত গবেষক শ্রীসুরেশপ্রসাদ নিয়োগী জানিয়েছেন যে এই নেটিভ অনুবাদক হলেন একজন ছাত্র। তাঁর নাম রামচন্দ্র। এই ছাত্রকে দিয়ে পাদরী স্টুয়ার্ট বাংলা নীলদর্পণ নাটকটি অনুবাদ করিয়েছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং ইংরেজী সংশোধন করেন। স্টুয়ার্ট ছিলেন নীল আন্দোলনে লঙ্-এর প্রধান সহযোগী এবং কলকাতায় চার্চ মিশনারী সোসাইটির সেক্রেটারী। এই চাঞ্চল্যকর তথ্য স্টুয়ার্ট ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন ইরাণের ইস্পাহান শহরে। মহেন্দ্রবাবু তাঁর বিখ্যাত "Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra" গ্রন্থে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্য ও
সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা
৩য় বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৮০

চট্‌জলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎ-বিচিত্রা, শ্রীকান্ত ৩য়, ৪র্থ (খণ্ড) / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আরোগ্য নিকেতন / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
জাগরী, সতীনাথ-বিচিত্রা, দিগ্‌ভ্রান্ত / সতীনাথ ভাদুড়ী
কথা-চরিত মানস / বিমল মিত্র
ন্যায়দণ্ড, লৌহ কপাট (৩য় খণ্ড) / জরাসন্ধ
মন্দাক্রান্তা / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বলাকার মন, আবার আমি আসব / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বরযাত্রী, রূপ হ'ল অভি [illegible] ষণ মুখোপাধ্যায়
পুতুল নাচের ইতিকথা / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জেনানা ফাটক / রাণী চন্দ
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে / সুরেশচন্দ্র সাহা
কালজাক / যজ্ঞেশ্বর রায়
মানব কল্যাণে রসায়ন / দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
নাগচম্পা / নারায়ণ সান্যাল
রুদ্ধ দ্বারের / গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সমুদ্রের ছড়া / গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রাশিয়ার ডায়েরী / প্রবোধকুমার সান্যাল
ছাদের আকাশ / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দিগন্তের রং / গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রকাশ ভবন

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দেখুন কী ভাবে সাত বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইস্যু) এই আয় করা যায়

যদি আপনার মোট আয় হয়	15,000 টাকা	30,000 টাকা	50,000 টাকা	70,000 টাকা
করমুক্ত সুদ থেকে শতকরা পাঁচ ভাগ আয় করযোগ্য হারের হিসেবে দাঁড়ায় এই রকম	5.95%	7.18%	12.73%	25.64%

করমুক্ত জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ করুন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

(ভারত সরকার)

RUBY
DUST
স্বাদ আর আমেজে ভরে তুলুন
উৎসবের দিন আর অবসরের মুহূর্তগুলি
LIPTON
লিপটন
বলতেই
ভালো চা
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA

নিয়মাবলী

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বারো টাকা ও
ছ'মাসের জন্য ছ'টাকা অগ্রিম দেয়
রেজেষ্ট্রি ডাকে পেতে হলে পৃথক খরচ দেয়
সাধারণ ডাকে পত্রিকা নিরুদ্দিষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া চলে
গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক
রচনার নকল রেখেই লেখা পাঠাবেন
কোন গোলযোগে রচনা নষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
সঙ্গে ডাকটিকিট থাকলে
অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়
কিন্তু অমনোনীত কবিতা
কখনোই নয়
রচনা সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করা
সম্ভব নয়
পত্রোত্তরে এজেন্সীর নিয়মাবলী
জানানো হয়
পত্রিকার সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা
সবরকম যোগাযোগ ও টাকাকড়ি পাঠানোর ঠিকানা
কালি ও কলম ॥ ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এলো শরৎ।
এলো মেলামেশার মহোৎসব।
এই উৎসব
আনন্দময় হয়ে উঠুক।
সূচনা করুক
মঙ্গলময় জীবনের।
সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি ভরে তুলুক
গ্রাম গ্রামান্তর।
UNITED COMMERCIAL BANK
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
জনগনকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে
UCOC-11 BEN

অবাধ খুশির আবরণে
ছোটোদের বাড়ন্ত পা
বড়োদের চাইতে ছোটোরাই অনেক অনায়াসে ঠিক জিনিসটা বেছে নিতে পারে। তাই ওদের বাটার জুতো এত পছন্দ। বড়োরাও সায় দেন। কেননা, বাটার জুতো কচি পা'কে যেমন আরামে জড়িয়ে রাখে, তেমনি বাড়বারও স্বাধীনতা দেয়। রঙ, ডিজাইন, পরার আরাম, মজবুতি—সবদিকে চোখ রেখে বাটার জুতো তৈরি। ছোটোদের মনমতো জুতো বেছে নিতে দিন। দেখবেন ঠিকটি বেছে নেবে।
Bata
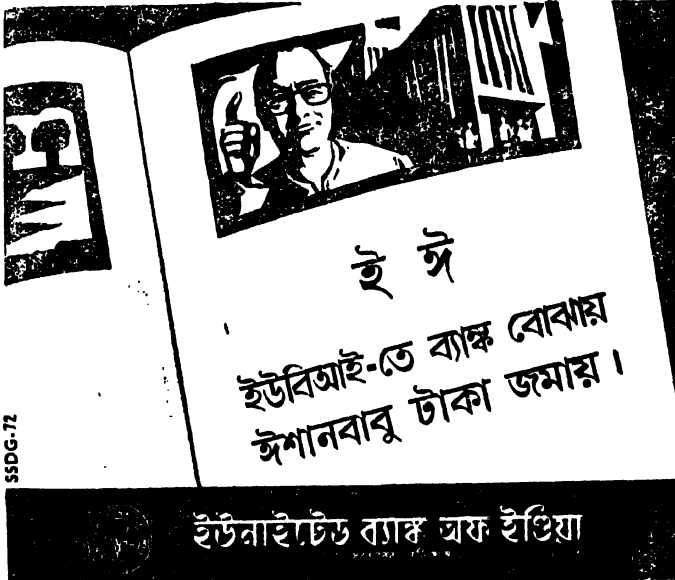
ই ঈ
ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ঈশানবাবু টাকা জমায়।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
SSDG-72

আমার রেল ভ্রমনের ছাড়পত্র

সঠিক টিকিট না নিয়ে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে রেল কর্মচারীদের হাতে পড়বার আগেই যদি কোনও যাত্রী রেলভাড়া মিটিয়ে দিতে চান, তবে খুব কমে তাঁকে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

বিনা টিকিটে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে যদি কেউ ধরা পড়েন, তাঁকে খুব কমে ১০টি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

টিকিট কেটে ট্রেনে চাপা আরও সস্তা

কালি ও কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ আশ্বিন

সূচীপত্র

আমাদের কথা ॥ ১২৩

প্রবন্ধ

জীবনানন্দের আলো-অন্ধকার ॥ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ॥ ১২৫
বিবেকানন্দের কিছু বিদ্রূপ ॥ শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ ১৪৫
পুঁথিকার অবনীন্দ্রনাথ ॥ মনোজিৎ বসু ॥ ১৭৩
নায়ক বনাম লেখক ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১৯১
প্রতীক, রূপক ও ব্যঞ্জনা ॥ ডঃ শিশিরকুমার সিংহ ॥ ২২৩
ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গ ॥ কমলকুমার মজুমদার ॥ ২২৯
রবীন্দ্র-সমালোচনার ধারা ॥ আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ॥ ২৪২
শক্তি-সাধনায় দুর্গা ও দেবী-পরিজন ॥ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২৫৪
সাম্প্রতিক কাব্যনাট্য চর্চা ॥ ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ॥ ২৬৬
আধুনিক বাংলা কবিতায় শব্দ চেতনা ॥ আশিস সান্যাল ॥ ২৭৯
নিগ্রো কবি ল্যাংস্টন হিউজ ॥ নিখিল সেন ॥ ২৯১
যীশু, বুদ্ধ ও ভারতবর্ষ ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৩০২
মলয়ালী গদ্য সাহিত্যের রূপ-লেখা ॥ শশী থারুর ॥
অনুবাদ : অমলকৃষ্ণ গুপ্ত ॥ ৩০৬
বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী মানসিকতা ॥ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ৩১২
কালাচাঁদ কেন কালাপাহাড় হলেন এবং আসল কালাপাহাড় কে ? ॥
ডঃ কালীপদ মালাকার ॥ ৩২৩
আশাবাদী কবি ॥ ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা ॥ ৩৩৬

গল্প

কবি ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৩৩
আরেক গাছের গল্প ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ১৬৩
হুথিয়ার মা ॥ ডঃ নমিতা চক্রবর্তী ॥ ১৮৩
রাঙামূলা ॥ বীরেন্দ্রমোহন আচার্য ॥ ২০৩

গল্প

প্রতিদ্বন্দ্বী ॥ সতীকান্ত গুহ ॥ ২৫১
মধু-জীবন ॥ তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ॥ ২৬৯
জনৈক ॥ আশা দেবী ॥ ২৮৯
কুরবান এবং ॥ সুরেশচন্দ্র সাহা ॥ ২৯৪
পাঁউরুটি ॥ কুমারেশ ঘোষ ॥ ৩১৯
চেনা অচেনা ॥ ঈশ্বর পেটলিকর ঃ অনুবাদ ঃ সুকৃতি রায়চৌধুরী ॥ ৩২৯
দৃশ্যান্তর ॥ সুভাষ সমাজদার ॥ ৩৪৩
জননেতা ॥ ছবি মুখোপাধ্যায় ॥ ৩৫২

নাটক

শোকসভা ॥ সুশীল রায় ॥ ২০১

কবিতা

কবিদের মতো ॥ মণীন্দ্র রায় ॥ ২৬৩
জলের প্রার্থনা ॥ হায়াৎ মামুদ ॥ ২৬৪
রামধনু ॥ প্রতিমা সেনগুপ্ত ॥ ২৬৫
কান্না ॥ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ ২৭৪
আমার গোপন কথা ॥ বার্ণিক রায় ॥ ২৭৭
বাজী ॥ অরুণকুমার চৌধুরী ॥ ২৭৮
সাহিত্যের খবর ॥ সুচরিতা সান্যাল ॥ ৩৬১

প্রচ্ছদপট—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : **শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**
সহ সম্পাদক : **শুভ মুখোপাধ্যায়**

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট কলিকাতা-৬ . হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

শারদীয় উৎসবের দিনে শুভেচ্ছা প্রকাশ করতে
একটি পংক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু এল. আই. সি'র
কাছে এর আক্ষরিক ব্যঞ্জনা খুবই অর্থবহ। আনন্দঘন
দিনগুলিতে দুঃখ ক্লেশের বাধা ডিঙিয়ে আপনার
আশা যাতে ফলবতী হয়, অমঙ্গল আর দারিদ্র্যের চির
অবসানে বিজয়ী হয় শুভচেতনা আর প্রগতি. এল.আই.সি. সে
ব্যাপারে নানা উপায়ে আপনাকে সাহায্য করতে সচেষ্ট।

॥ সপ্তম বর্ষ ॥
॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥
॥ আশ্বিন ॥ ১৩৮০

আমাদের কথা

এসেছে শারদোৎসব—বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু আকাশে লাগেনি সেই নীল রঙ্, নেই সেই সোনা রোদ্দুর'। দিনক্ষণের হিসেবে এখন উৎসবের সময়—পূজো। কিন্তু উৎসবের মেজাজ নেই কোথাও; শুধু আনন্দের ভাঙ্গা হাট।

উৎসবের ভাব আনতে প্রধানতঃ বাধ সেধেছে আবহাওয়া। চারিদিকে যেন ভরা বর্ষা। বৃষ্টি আর বৃষ্টি! থামে, কিন্তু আবার আসে। এত বৃষ্টির ফলে বন্যা: দুঃখ, দুর্গতি, হয়রানি। পীড়িত মানুষের কাছে আজ তাই কিসেরই-বা পূজো, আর কিসেরই-বা উৎসব-আনন্দ।

বিগত কয়েক বছরের মতো এবারে যদিও পশ্চিমবাংলা রাজনৈতিক দুর্যোগের শিকার হয়নি, তবুও আজ বাঙ্গালীর প্রাণ খুলে আনন্দ-যজ্ঞে মেতে ওঠার সামর্থ্য নেই। সাধারণ মানুষ আজ তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার মোকাবিলায় পর্যুদস্ত। দ্রব্যমূল্যের হার ক্রমঃবর্ধমান। দিন দিন ব্যয়-সংকোচের চেষ্টা করতে হচ্ছে। এর সঙ্গে দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। এ-অবস্থায় বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবের অংশীদার কজনই-বা হতে পারছে।

তবু এখন শরৎকাল। এসেছে দুর্গাপূজা। তাই, বাঙ্গালী শত দুর্দিন সত্ত্বেও আজ একটুখানি আনন্দ, একটুকরো হাসি, মনের গহনে পরম আদরে লালন করছে—যা তার গভীর দুঃখের, চরম সঙ্কটের মুহূর্তে বেঁচে থাকার একমাত্র মূলধন। তাই দিয়েই সে দেবীকে বরণ করবে আর কাটিয়ে দেবে এবারের পূজো।

গ্রাম বাংলায় আজ প্রকৃতি অশান্ত। সেখানের মানুষ নাজেহাল। কিন্তু ঢাকের বাদ্যি সেখানেও বাজবে—তা যতো মৃদুই হোক না কেন। শহর বাংলায়—অর্থাৎ কলকাতায় প্রকৃতি যতো না তৎপর, তার চেয়ে বেশি তৎপর কলকাতার মানুষ। এই পুতিগন্ধময় পরিবেশেও কিন্তু পূজা-মণ্ডপের কমতি হবে না, অর্থব্যয়ের ঘাটতি পড়বে না, দর্শনার্থীর ভিড় হাল্‌কা হবে না। এর সঙ্গে পূজাবার্ষিকীর রচনা সংখ্যাও নেহাৎ কম হবে না।

এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতে অন্যবারের মতো এবারেও এই পত্রিকা সৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহী মুষ্টিমেয় শিল্পীর আন্তরিক প্রচেষ্টার নিদর্শন পাঠকের হাতে তুলে দিতে আগের মতোই আগ্রহী। বাঙ্গালী সংস্কৃতির সর্বপ্রধান প্রকাশ যার মধ্যে সেই সাহিত্যই আজ বাঙ্গালীকে নতুনভাবে প্রেরণা দিতে সক্ষম। সাহিত্য অর্থে সৎ সাহিত্য, প্রকৃত শিল্প, সুস্থ জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি। নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে এই সৎ সাহিত্যই বাঙ্গালীকে সাহায্য করবে। এ-কাজে অংশগ্রহণ করতে পারায় এই পত্রিকা নিজেকে ধন্য মনে করে। প্রতিটি মানুষের দিন আজ উৎসবে পরিণত হোক, এই কামনা করি। কামনা করি বাঙ্গালীর মুখে হাসি, অন্তরে আনন্দ হৃদয়ে পবিত্রতা॥

অবিস্মরণীয় পাবলো নেরুদা

সম্প্রতি চিলির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি পাবলো নেরুদা পরলোকগমন করেছেন। রোমান্টিক ও বিদ্রোহের—প্রণয় ও প্রতিবাদের কবি নেরুদা ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কাব্য পাঠককে তাঁর এই মৃত্যু বেদনাহত করবে।

আগামী কার্তিক সংখ্যায় একটি মননশীল আলোচনা ও পাবলো নেরুদা'র আটটি সুনির্বাচিত কবিতার উল্লেখযোগ্য অনুবাদ করেছেন : তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও সাতের দশকের খ্যাত কবিরা। সংগ্রামের দুঃখকে মনে রেখে অনাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ তুলতে—নেরুদা এখন পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে অতৃপ্ত জীবনের পাশাপাশি রয়েছেন।

সম্পাদক : কালি ও কলম

হরপ্রসাদ মিত্র

জীবনানন্দের আলো-অন্ধকার

আলো আর অন্ধকার—এই দুই ধারণা জীবনানন্দের সব পর্বের কবিতাতেই দেখা দেয়। বিশেষভাবে 'সাতটি তারার তিমির'-এর [রচনাকাল ১৩৩৮-৫০] আলোচ্য। মোট কবিতা-সংখ্যা ৪০ প্রসঙ্গে এই প্রয়োগের কথা এখানে 'আকাশলীনা', 'ঘোড়া', 'সমারূঢ়', 'নিরঙ্কুশ', 'রিষ্টওয়াচ', 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য,' 'যেই সব শেয়ালেরা', 'সপ্তক', 'একটি কবিতা', 'অভিভাবিকা', 'কবিতা', 'মনোসরণি', 'নাবিক', 'রাত্রি', 'লঘু মুহূর্ত' 'হাঁস', 'উন্মেষ', 'চক্ষুস্থির', 'ক্ষেতে প্রান্তরে', 'বিভিন্ন কোরাস', 'স্বভাব', 'প্রতীতি', 'ভাষ্কিত', 'সৃষ্টির তীরে', 'জুহু', 'সোনালি সিংহের গল্প', 'অনুসূর্যের গান', 'তিমির হননের গান', 'বিস্ময়' 'সৌরকরোজ্জ্বল', 'সূর্যতামসী' রাত্রির কোরাস', 'নাবিকী', 'সময়ের কাছে', 'লোকসামান্য', 'জনান্তিকে', 'উত্তর প্রবেশ', 'দীপ্তি', 'সূর্যপ্রতিম'—এই ৪০টি কবিতার শিরোনাম থেকে আলো বা সূর্য এবং অন্ধকার বাচক একাধিক সংকেত পাওয়া গেল, যেমন—রাত্রি, অনুসূর্যের গান, তিমির হননের গান, সৌরকরোজ্জ্বল, সূর্যতামসী, রাত্রির কোরাস, সূর্যপ্রতিম। আলো আর অন্ধকার—এই দুই বিপরীত বোধের ঢেউ যেন এইসব কবিতায় বার বার কোনো-না-কোনো ভাবে দেখা দিয়ে গেছে। পরিচ্ছন্ন হেতুপরম্পরা বা সুবোধ্য অর্থসংগতি সর্বত্র ঘটেনি, কিন্তু তিমিরবোধের প্রাধান্য এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

'সূর্যতামসী' কবিতাটিতে পাখির শব্দ আর সমুদ্রের স্বর শুনে ভোর হয়েছে, এই অনুভূতি পাওয়া যায় প্রথম তিন ছত্রে—

> কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
> কোনো দিকে সমুদ্রের স্বর ;
> কোথাও ভোরের বেলা র'য়ে গেছে—তবে।

ভোর হয়েছে নয়,—'ভোরের বেলা রয়ে গেছে'। অর্থাৎ কবির মনে রাত্রির অন্ধকার বোধই প্রধান,—সেই অনুভূতি সত্ত্বেও পৃথিবীতে নৈসর্গিক ধারায় যথাবিধি রাত্রির পরে দিনের আলো যে জেগে উঠছে, এই অর্ধজাগ্রত অভিজ্ঞতাই জায়গা দাবি করছে। তার পরের দুই ছত্রে তিনি লিখেছেন—

অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে—অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মত চেয়ে আছে ;

এবং তারপর প্রশ্ন—

এ কোন্ সিন্ধুর সুর ;
মরণের—জীবনের ?
এ কি ভোর ?

তারপর—

অনন্ত রাত্রির মত মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা সয়ে—
সময় কি অবশেষে এ রকম ভোরবেলা হয়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে ক'রে জেগে ওঠে।

'সাতটি তারার তিমির' বোধ হয় কবির অনতিদূরবর্তী মৃত্যু-সমাগমের বোধে চিহ্নিত অন্ধকার-চেতনার কবিতামালা। এই কবিতাটিতে ভোরের চেতনার মধ্যেই অনন্ত রাত্রির বোধ অনুস্যূত হয়ে আছে। 'সৃজনের ভয়াবহ মানে' তাঁর চেতনাকে নাড়া দিয়েছে। তামাম দুনিয়ার দৃশ্য ভাবতে ভাবতে,—রাত্রি-করোজ্জ্বল ইউরোপের প্রসিদ্ধ কয়েকটি জায়গা উল্লেখ করবার সুযোগ ঘটেছে এবং সেই শেষ কয়েক ছত্রে 'আটলান্টিক চার্টার'-এরও উল্লেখ আছে।—

সার্থবাহ সার্থবাহ, অই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি !
বিলীন হয় না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শিন ;
অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে—যা শেখেনি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মত জ্বলে
জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে

এই মৃত্যু-ধারণার সূত্র ধরেই এই কবিতাগুলি বইয়ের সূচি অনুসারে নয়, প্রাসঙ্গিক ধারণার দৃষ্টান্ত হিসেবে পরপর কয়েকটি আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক। সেই ক্রম অনুসরণ করে অতঃপর 'অভিভাবিকা' কবিতাটির ইঙ্গিত দেখা যাক। এই কবিতার প্রথম কয়েক ছত্রে দেখা যায়—

তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়,—

মনে হবে
অনেক প্রতীক্ষা মোরা ক'রে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ ক'রে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষি-গোলকের সাথে
আঁখি-তারকার সব সমাহার এক দেখে ;
তবু লঘু হাস্যে—সন্তানের জন্ম দিয়ে—
তারা আমাদের মত হবে—সেই কথা জেনে—ভুলে গিয়ে—
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গ ফেরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব করে গেছি—ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।

'ঝরা পালকে' যে 'নীলিমা' কবিতাটি দেখা যায়, জীবনানন্দের সেই প্রথম পর্বের আকাশবোধ এই কবিতাতেও বিদ্যমান 'জীবনের সমস্ত পরিবর্তন, যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখের ঢেউ ; ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানির স্রোত থেকে ওপরে চোখ তুললেই চোখে পড়ে নীল আকাশ। সেই আকাশ শাশ্বত—তাকে প্রিয় অভিভাবিকার মত মনে হয়। 'অভিভাবিকা' শব্দটির অনুষঙ্গে 'নীলিমা' কোনো রমণীনাম বলে মনে হতে পারে,—নীলিমা কি কোনো নারী ?—এই প্রশ্ন মনে দেখা দেওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু আকাশই এখানে রমণী-রূপকের মাধ্যমে উদ্ভাসিতা ভাবতে ভাল লাগে।

তবু ঐ নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মত মনে হয় ;
হাতে তার তুলাদণ্ড ;
শান্ত—স্থির ;
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।

বৃত্তি তা faculty। শব্দটি 'বৃত্ত' হওয়া প্রত্যাশিত। হাতে তার তুলাদণ্ড। 'তুলাদণ্ড' কেন ? নীল আকাশ সুখ-দুঃখের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করছেন। সে বিচার সরব নয়। জগৎ-প্রপঞ্চের সাক্ষী চৈতন্য স্তব্ধ, শান্ত, স্থির হয়ে আছেন'—

যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্য সমুদ্রের পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া ;—
বেরিলমণির মত তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।

মৃত্যু কঠোর নয়, যন্ত্রণাসর্বস্ব নয়—শেষ লাইনে বলা হয়েছে—

স্থির—শুভ্র—নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর।

মৃত্যু-ই কি কথা বলবার অবসর? নাকি জীবন সেই অবসর? জীবনানন্দের কবিতা-পাঠক এই সংশয় বোধ করবেন। কিন্তু 'নৈসর্গিক কথা' এসব;—জীবিত মনুষ্যকণ্ঠের প্রতিদিনের ব্যবহারিক বা আন্তরিক বচনবহুলতা নয়। শুধু মানব জীবনেরই নয়,—প্রকৃতি জীবন বৈচিত্র্যের উৎস,—শান্ত নীল আকাশ যেন অভিভাবিকা;—তাঁর 'মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি (বৃত্ত?) ছাড়া কিছু নেই।' এই অনুভূতির এতদধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।'

এই কবিতার পরে 'সাতটি তারার তিমির'-এর 'মনোসরনি' কবিতাটি দেখা যেতে পারে। মনোসরণি তাঁর মনের পথ; সেই পথ নিরন্তর মৃত্যুবোধে চিহ্নিত। মানুষ যেন ঘরের দেয়ালের মাছি—

মনে হয় সমাবৃত হয়ে আছি কোন এক অন্ধকার ঘরে;—
দেয়ালের কর্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে:

নিশ্চয়তা নেই আমাদের মননে। 'নিশ্চয়তা' শব্দটি জীবনানন্দের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত। এখানেও সেই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—

এই সব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে;
পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে।

অতীত-বর্তমানে এক হয়ে যায় এইসব বোধের লগ্নে—
হয়তো চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে।
বহু উপদেশ দিয়ে চলে গেলে কনফুশিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইট সব ক'রে ফেলে ফাঁস।

বোলতা, মরুভূর তৃণগুচ্ছ, সারস-দম্পতীর চোখ, অ্যামিবা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ইতিহাসের চেঙ্গিস আর কনফুসিয়াসের সঙ্গে এই কবিতায় একযোগে উচ্চারিত। পৃথিবী আদিজননী। মানুষের জিঘাংসার প্রতীক চেঙ্গিস; শুভবোধের সংকেত কনফুসিয়াস। জিঘাংসা, শুভবুদ্ধি দুইই আছে। তবু মৃত্যু, উপেক্ষা,—মানবিক ভিত্তি গড়া এবং ভাঙ্গার কাজ চলছেই। ভুল দেখা দিচ্ছে বার বার। মৃত্তিকার অঙ্গারে প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত ও বিনষ্ট হচ্ছে। সূর্যসাগরতীরে পৃথিবীই আদিজননী আমাদের সকলের।

অতীত-বর্তমান এক হয়ে যাওয়া এই সময়বিস্তারের বোধ এই বইয়ের প্রসিদ্ধ 'ঘোড়া' কবিতাটিতেও দেখা যায়। আমরা যারা এই বিশেষ বর্তমানে জীবিত তারাও যেমন, অন্যান্য দৃশ্য-দৃশ্যান্তরও তেমনি আমাদের এই

সমকালে,—এই চিরকালে বিদ্যমান। বর্তমান চিরকালে এবং চিরকাল বর্তমানে বিদ্যমান'—

'আমরা যাইনি ম'রে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় :

এই প্রথম ছত্রের 'তবু' কথাটির তাৎপর্য সম্বন্ধে এ-কবিতার কোন্ পাঠককে না ভাবতে হয়েছে? শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা-পরিচয়' অষ্টম সংখ্যায় শ্রীআলোক সরকার লিখেছিলেন যে এটি নিঃসন্দেহে বিষয়বস্তু-অবলম্বী বা থিমেটিক কবিতা, 'কিন্তু অনেক পংক্তির বাক্যবিন্যাস, অনেক চিত্রের তাৎপর্য, অনেক বিশ্লেষণের যাথার্থ্য অথবা গোপন নির্দেশ বিষয়ে সংশয় থেকে যায়।' তিনিও লিখেছেন,—'ঘোড়া' সময়-চেতনার কবিতা। এই সময় এক অখণ্ড প্রবহমানতা, দুর্বোধ্য এবং তাৎপর্যহীন। সেই প্রবহমানতায় অতীত-বর্তমান একাকার ; জীবিত মানুষ তার বর্তমানের ক্লান্তিকর জাগরণের ভিতরেও অতীতকে উপস্থিত সত্যের মতোই বারবার অনুভব করে, অনুভব করে তার নিজের অর্থহীনতা, কেবল উদরান্নের তাগিদ আর অদ্ভুত যুক্তিহীন আবর্তিত পৃথিবী। 'ঘোড়া' অবশ্যই প্রতীকী ব্যবহার, তা সকল প্রাকৃতিক-নিয়ম রুদ্ধ প্রাণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে। আমাদের দৃশ্য বা vision-এর ভিতর যে মহীনের বাস্তব ঘোড়াগুলোর জন্ম হয়, তারা প্রস্তরযুগের সেই আদিম ঘোড়াগুলোর মতোই, তারা আমাদের সচেতন করে সেই অখণ্ড সময় বিষয়ে যা শাশ্বত, অতীত-বর্তমান যেখানে সমার্থক, যা উদ্দেশ্যহীন নিত্যবর্তমান এবং পরিবর্তনবিমুখ।' শ্রীসরকার লিখেছেন—'এই মোটামুটি সংক্ষিপ্তসারের পরেও কতকগুলি প্রাথমিক সংশয় থেকে যায়। প্রথম সংশয়, শুরুর লাইনের 'তবু' শব্দটিকে নিয়ে। 'আমরা যাইনি মরে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়' এর সহজ মানে এই দাঁড়ায় যে মৃত অবস্থাতেই দৃশ্যগুলির জন্ম সম্ভব ছিল কিংবা জীবিত অবস্থায় দৃশ্যগুলির জন্ম বস্তুত অসম্ভব। আসলে 'তবু' শব্দটির ভিতর এই কবিতার অন্যতম চাবি লুকিয়ে রয়েছে।' নিরন্তর সময় পরিব্যাপ্তির একাত্মকতাই এসব ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এই 'ঘোড়া' কবিতায় পৃথিবীর কিমকোর ডাইনামো' আর এক ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত। ডাইনামো বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যন্ত্র। পৃথিবী অফুরন্ত শক্তির উৎস। মহীন কি কোনো গূঢ়ার্থের ইঙ্গিত—অথবা শুধুই ঘোড়াদের মালিকের নাম? মালিকের নাম হিসেবেই ধরা চলে। 'আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়'—এখানে 'ভিড়' কথাটি

ভিড়ময় রাত্রি বোঝাচ্ছে বোধ হয়। 'বিষণ্ণ' খড়ের বিশেষণ—অথবা খড়ের সঙ্গে যে বিষাদের অনুভূতি জাগে কবির মনে, তারই বাচক। সব শেষ হয়ে যাওয়ার বেদনা সেটি। ইস্পাতের কল কঠিন; অবসান রূঢ়। ইস্পাতের কলে খড় টুকরো হয়ে পড়ছে—এই ঘটনাটি পূর্ণ অনুভূতির স্বাদে মণ্ডিত হয়েছে। তারপর এক অদ্ভুত চিত্রকল্প—অথবা বিশদ উপমাও বলা যেতে পারে—

চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের পাইস্ রেস্তরাঁতে;

সস্তা ভোজনাগারের স্বল্প আলোকিত দীন দরিদ্র পরিবেশ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই কটি ছত্রে। 'ঘেয়ো' বিশেষণ কুকুরটাকেও চিহ্নিত করছে, বেড়ালদের যেন নিঃসম্পর্কিত নয়। প্যারাফিন-লণ্ঠন ঘোড়ার-গাড়ির সঙ্গে জড়িত আস্তাবলে সেই ঘোড়ার-গাড়ির গোল আলো থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ এক সময় অনন্ত সময়ে লীন হয়ে গেছে অতঃপর—

প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

অরসিক সমালোচককে তিরস্কার করা যথার্থ শক্তিমান কবির পক্ষেই শোভন। জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির'-এর 'সমারূঢ় কবিতাটি সেই যোগ্য, তীব্র তিরস্কার।

জীববানন্দকে দুর্বোধ্য কবি বলা বিরল ক্ষেত্রেই সংগত। তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই তিনি সুবোধ্য ও বিশেষ ব্যক্তিত্বে ভাস্বর। ইতিহাস ভূগোলের অনেক প্রসঙ্গ তাঁর অনেক কবিতাতেই দেখা দেয়। বিস্তার দূরত্ব ইত্যাদি ভাবের সংকেত বা অভিব্যক্তি সেসব। 'বনলতা সেনে'ও যেমন, অন্যত্রও তেমনি এসব প্রসঙ্গ আছে। 'সাতটি তারার তিমির'-এবং 'নিরঙ্কুশ', 'একটি কবিতা', 'নাবিক' ইত্যাদি কবিতায় এ লক্ষণ দেখা যায়। দুর্বোধ্যতা এসব ব্যাপারে নেই। 'ভাষিত' কবিতায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রসঙ্গ,—বুদ্ধ ও কল্কির প্রসঙ্গ—এসবও দুর্বোধ্য নয়। অনুভূতির ভাষা খুঁজতে তাঁর মন স্বতই এইসব উল্লেখে এসে পৌঁছোয়। বেড়াল, শিয়াল, সিংহ, হরিণ, কুকুর ইত্যাদি জীবজন্তুর উল্লেখও অনুভূতির রূপায়ণ-তাড়িত। 'বনলতা সেন' ১৩৩২-১৩৪৬-এর মধ্যে রচিত। 'সাতটি তারার তিমির'—এর রচনাকাল আগেই উল্লেখ করা

হয়েছে। দুটি মোটামুটি একই সময়ের কবিতা সংগ্রহ। মৃত্যুর প্রসঙ্গ সর্বত্র বিদ্যমান,—তাঁর কবিতায় প্রেমও সর্বত্র অতিক্রান্ত অতীত যেন! তাঁর প্রসিদ্ধ সেই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় যেমন আমাদের রক্তের মধ্যে 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর স্বাদের উল্লেখ ছিল,—মৃত্যুতে জীবনে ক্লান্তি নিশ্চিহ্ন হয়, এই ইঙ্গিত যেমন ব্যক্ত হয়েছিল, 'সাতটি তারার তিমির' সংগ্রহেও সেসব লক্ষণ বিদ্যমান। সময় সম্পর্কে তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। 'দীপ্তি' কবিতায় লিখেছেন—

> সময় কেবলি নিজ নিয়মের মতো ;—তবু কেউ
> সময়স্রোতের পরে সাঁকো
> বেঁধে দিতে চায় ;
> ভেঙে যায় ;
> যত ভাঙে তত ভালো।

সময়-চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্কের অনুভূতি, ভৌগোলিক নামাবলী জড়িত হয়ে উচ্চারিত—

> যত স্রোত ব'য়ে যায়
> সময়ের
> সময়ের মতন নদীর
> জলসিঁড়ি, নীপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
> তুমি তত ব'য়ে যাও
> আমি তত ব'য়ে চলি,
> তবুও কেহই কারু নয়।

আমাদের এই সমান্তরাল গতি আর বিচ্ছিন্নতার বোধ একযোগে ব্যক্ত। 'অনুসূর্যের গান'-এর প্রথম ছত্রগুলিতেই আবার 'বিশুদ্ধ'-এর কথা আছে—

> কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
> আমাদের ডাকে।

আমরা—

> সর্বদাই কোনো এক সমুদ্রের দিকে
> সাগরের প্রয়াণে চলেছি।
> সে সমুদ্র—
> জীবন বা মরণের ;
> হয়তো বা আশার দহনে উদ্বেল।

তিনি প্রশ্ন করেছেন—

> আজকে সমাজ
> সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
> তিমির বিদারী অনুসূর্যের কাজ।

এই তিমিরবোধ আর সূর্যবোধ বার বার 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলিতে উচ্চারিত হয়েছে। 'সৌরকরোজ্জ্বল', 'সূর্যতামসী' 'রাত্রির

কোরাস', 'সময়ের কাছে', 'মকরসংক্রান্তির রাতে,' 'উত্তরপ্রদেশ', 'সূর্যপ্রতিম' ইত্যাদি নামগুলি এইসূত্রে একযোগে মনে দেখা দেয়।

এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

একথার মানে কি? মানেটির এক অংশ বলা গেছে এই দু'ছত্রের আগের কয়েক ছত্রে'—

কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড়ো বিষয়ের হাতে
সে-সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কী এক গভীর সুসময়।
মকরক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন:
—তবুও তা পৃথিবীর নয়।

অনন্ত সময় আর বিশেষ সময়, এই দু'য়ের চিন্তা 'সাতটি তারার তিমির'-এ এইরকম অনেক জায়গাতেই ধ্বনিত। 'মকরসংক্রাতির রাতে'—এই শিরোনামের নিচে বন্ধনীভুক্ত এই উক্তিটি লক্ষণীয়—'আবহমান ইতিহাস চেতনা একটি পাখির মতো যেন'! 'জনান্তিকে' কবিতাটিতেও পাখি আর সময়বোধ একযোগে দেখা দেয়। সেখানেও রাত্রি আর নক্ষত্র! লিখেছেন— 'তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক রাত্রি নেই। সম্পূর্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে আছে পর্বে পর্বে উচ্চারিত বিভিন্ন রূপকে উপমায় চিত্রকল্পে। জীবনানন্দের কবিতার এই অঞ্চল কতকটা তিমিরাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু উৎসাহী রসিক পাঠককে তিনি বাধা দেননি কোথাও,—পাঠক এসব কবিতার মানে বোঝবার জন্যে উৎসাহ বোধ করেন। তাঁর আস্বাদন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হলেও এবং প্রশ্নচিহ্নে বিস্ময়চিহ্নে চিহ্নিত হয়েও সার্থক বোধ করে। এবং এই দর্শন ঘটে—

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তর প্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে।

এই বোধ নেতিবাচক নয়,—এ তো সুনিশ্চিত ইতি। এ গতি অন্ধকার আর আলোর বৈপরীত্য উত্তীর্ণ হবার গতি। তিমিরবোধ যেন সূর্যচেতনায় গিয়ে মিশেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় দুশো দশটির মতো গল্প এ পর্যন্ত তাঁর বিভিন্ন গল্পসংগ্রহে ও পরে তাঁর রচনাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে। যতদূর জানা যায় এই গল্প 'কবি' এ পর্যন্ত সাময়িক পত্রের অন্তরালেই আছে। 'কবি' গল্পটি সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৫২ সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে। সেবার এই গল্পটি বান্ধব সজনীকান্ত দাসের বিশ্রাম কক্ষেই রচনা শেষ করে গ্রন্থকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসে দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির লীলাভূমির উপাসক বিভূতিভূষণ তাঁর অরণ্যপথ বিচরণকালে এই বন্যকবির সান্নিধ্যলাভ করেন, সেটি অল্প কথায় বলেছেন। এই কবির অন্তরালে আছেন কবির মানসী প্রিয়া—কবির সহধর্মিণী। আমাদের এই সময় স্মরণ করা কর্তব্য ভিন্ন পরিবেশে সৃষ্ট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি'কে। দুই স্রষ্টা সাহিত্যিকের এই দুই 'কবিই' বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সনৎকুমার গুপ্ত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি

গল্প নয়, নিজের চোখে দেখা।

তবে গল্প না বলিলে লোকে পড়িতে চায় না। তাই গল্পের আকারেই লিখিতে হইল।

সিংভূম জেলার পাহাড়-জঙ্গলময় স্থানে পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। আমি এবং সঙ্গে দুইটি বন্ধু। তবে আর একটু খুলিয়া বলি, গুছাইয়া না বলিলে আপনাদের ঠিক ছবিটি দিতে পারিব না হয়তো। দেশের লিচুতলা ক্লাবে বসিয়া একদিন ভ্রমণের গল্প করিতেছিলাম। পাহাড়-জঙ্গলের গল্প অনেক কিছু করিলাম। এখানে এ পাহাড় দেখিয়াছি, ওখানে ও

পাহাড় দেখিয়াছি, সত্য ও মিথ্যা মিলাইয়া বেশ গল্প ফাঁদিয়াছিলাম। অবশ্য সত্যই বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অভ্যাসদোষে অতিরঞ্জিত মিথ্যা কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে ঢুকিয়া গেলে আমি আর কি করিব!

ভাদ্র মাসের শেষ। শরতের চিহ্ন নীল আকাশের শুভ্র মেঘমালায় পরিস্ফুট। বাতাস রৌদ্রতপ্ত, দিন ছোট হইয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে অতর্কিতে এক পশলা বৃষ্টি কোন উড়ন্ত মেঘখণ্ড হইতে ঝরিয়া পড়ে। নদীতীরে কাশগুচ্ছ সর্বত্র দেখা যায়।

মন্মথ মোক্তার বলিলেন, এ সব কোথায় ভায়া?

সিংভূম জেলায়।

কতদূর?

তা হাওড়া থেকে দুশো মাইল।

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কখনও কিছু দেখলাম না। সাক্ষীর জেরা করতে আর তালিম দিতে দিতে জীবনটা—

আর এক উৎসাহী বন্ধু বলিলেন, যা বললেন মন্মথদা। রইলাম পড়ে এই গর্তে। কিই বা জীবনে দেখলাম। বিভূতি দেখ কত দেশ-বিদেশ দেখে দেখে—

বলিলাম, তার আর ভাবনা কি? আমি নিয়ে যেতে রাজি আছি আপনাদের। মানে আমার সন্ধানে অল্প খরচে বেশ পাহাড়-জঙ্গলের পথ দিয়ে নিয়ে যেতে আমি প্রস্তুত।

কোথায়?

একটা পথে আমি নিজে একবার হেঁটে গিয়েছিলাম। সবসুদ্ধু, ষোল মাইল রাস্তা হবে। আগাগোড়া বন আর পাহাড়। নিবিড় নির্জন বনপথ। রেখা মাইনস্ স্টেশনে নেমে দক্ষিণ দিকে বনের পথ দিয়ে আবার পুবের দিকে ঘুরতে হবে, তারপর আবার উত্তর মুখে এলে সুবর্ণরেখা পার হতে হবে, সবসুদ্ধ ষোল-আঠারো মাইল পথ। রাজি?

মন্মথদা উৎসাহের সুরে বলিলেন, হ্যাঁ, রাজি। দেখাও ভাই, বয়েস হয়েছে, কবে হয়তো—

কিন্তু তা তো হল। আপনি হাঁটতে পারবেন এই দুর্গম বনপথে এতটা?

তুমি সে পথ জান তো?

একবার গিয়েছিলুম, সুতরাং জানি। তবে সেও আজ হল পাঁচ বছর আগের কথা, ভাল মনে নেই। চলুন নিয়ে যাব।

সব স্থির হইয়া গেল। কি একটা ছুটি ছিল দিন সাত-আট পরে, সম্ভবত ঈদের ছুটি। ঠিক হইল সেই ছুটিতে এখান হইতে ঝোলা-ঝুলি কাঁধে রওনা হইতে হইবে, সত্যকার ভবঘুরে ভ্রমণকারীদের মতো।

মন্মথবাবুর বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। তাঁহাকে আবার বলিলাম, হাঁটতে পারবেন তো? গাড়ি-ঘোড়া কিছু মিলবে না কিন্তু সে রাস্তায়। ভেবে দেখুন।

তিনি আশ্বাস দিলেন, কিছু ভেবো না ভায়া। দেখো এ বুড়োর হাড়ের জোর। তোমাদের চেয়ে অনেক শক্ত আছি এখনও।

কিন্তু তিনিই বিপদে ফেলিয়াছিলেন আমাদিগকে পথের মধ্যে। সে কথা এখানে অবান্তর, আসল কথা যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহাই বলিব। আজ সাত-আট বছর হইয়া গেল, সে ঘটনা, সে ছবি আজও আমাদের তিনজনেরই মনে জ্বল-জ্বল করে, সময়ের ব্যবধান তাহা ম্লান করিয়া দিতে পারে নাই।

সেই গ্রাম্যকবি রঘুনাথ দাসের কথা।

আর একটু গোড়া হইতেই বলি।

রাত চারটার সময় ট্রেন হইতে নামিলাম মহুলিয়া স্টেশনে। ট্রেনে একটি উপর-চালাক ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, এ ট্রেন রেখা মাইন্‌সে ধরিবে কি না? নির্বোধেরা সব সময় সব বিষয়ে খুব নিশ্চিন্ত থাকে। সে বলিল, ধরিবে নিশ্চয়ই; কোন সংশয়ের অবকাশ নাকি সে সম্বন্ধে নাই। আমার কেমন সন্দেহ হইল তার কথাবার্তার ধরনে। আমি অন্য বন্ধুটিকে গার্ডের কাছে পাঠাইয়া দিলাম এ কথা জানিবার জন্য। গার্ড বলিয়া দিল, ও স্টেশনে ট্রেন ধরে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরার কথা শুনিয়া কাজ করিলে সেদিন একেবারে টাটা গিয়া গাড়ি থামিত, ফিরিবার ট্রেন সারাদিন মিলিত না, ভ্রমণটাই মাটি হইয়া যাইত। কেন লোকে না জানিয়া শুনিয়া এমন বাজে কথা বলে, তাই ভাবি!

যখন ট্রেন হইতে নামিলাম, তখনও রাত্রি আছে। তবে পথ বেশ দেখা যায়। আমরা হাঁটিয়া আসিলাম রেখা মাইনস্‌ পর্যন্ত। ঠিক সে সময় ভোর হইয়া গেল। আমরা অরুণচ্ছটারক্ত পূর্ব দিগন্তের মহিমা অবাক লইয়া দর্শন করিলাম সুবর্ণরেখা-তীরের শালবন হইতে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি অনামিকা পার্বত্য তটিনী দুই তীরের পাষাণভূমির মধ্য দিয়া কুলুকুলু

স্বরে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাষাণময় তটে বর্ষার বনকুসুম ফুটিয়া আছে, নদীর ধারে ধারে বনশেফালী বৃক্ষ, দুই-একটি শিউলি ফুলও ফুটিয়াছে।

আমি প্রস্তাব করিলাম, আসুন, স্নান করা যাক এই নদীতে।

মন্মথদা বলিলেন, এত সকালে!

এত সকালেই। "নদী দেখবে যখন, স্নান করবে তখন।" সুতরাং শাস্ত্রবাক্য মেনে নিয়ে এখুনি স্নান করা যাক। রাস্তায় এমন সুন্দর নদী আর হয়তো মিলবে না।

ভিজে কাপড় বইতে হবে সারা রাস্তা।

তার ব্যবস্থা হবে।

ব্যবস্থা যাহা হইল, তাহা ছাপার অক্ষরে না লেখাই ভাল। অতঃপর নদীর সেই জলজলিলি-সুবাসিত পাষাণতট পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। একস্থানে শৈলসানুতে একটা বড় পিয়াল গাছ, তার তলদেশে বিশাল শিলাখণ্ড একখানা, ঠিক যেন বাঁধানো বেদীর মতো। কয়েক দণ্ড সেখানে বিশ্রাম করিলাম ও সঙ্গে আনিত পাঁউরুটি, মাখন, জেলি ও সন্দেশের সদ্ব্যবহারও যে না করা গেল এমন নয়।

তারপর আবার রওনা। পথিমধ্যে এক অতি বৃদ্ধ সাহেবের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দেখা। সাহেব কুলি খাটাইয়া কি কাজ করিতেছে, বনের মধ্যে একটি তাঁবু। তাঁবুতে দুই-একখানা চেয়ার, টেবিল। সাহেবের নিজের মুখেই শুনিলাম তাহার বয়স নব্বুই বৎসর। এই বয়সে সে অর্থ উপার্জন করিয়া সে অর্থ ভোগ করিবে কবে; বাঙালীর মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ও জাতের ধর্ম অন্যরূপ, 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ' চাণক্য-শ্লোকের এই বাক্য উহারা সার্থক করিয়াছে।

আরও কিছু দূরে গিয়া একটি বনমধ্যস্থ সাঁওতালী গ্রাম, নাম কুলামাড়ো। সেখানে পথের ধারে একটি ছোট্ট কুটির, তাহার পাশে শালের খুঁটিতে ঝোলানো একটা কেরোসিনের টিনের ভগ্নাংশ। তাহাতে অতি জরুরি-বিজ্ঞপ্তি লিখিত আছে—"এই মাস হইতে দুকান খোলা হইয়াছে।"

মন্মথদা বলিলেন, এ ব্যাপারটি কি হে?

আমি বলিলাম, মনে হচ্ছে এটা দোকান।

খোঁজ করা যাক, কি বল? চা করে যদি দিতে পারে।

সন্ধান করুন।

ডাকাডাকি করার পরে একটি বন্য তরুণী বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, এটা দোকান ?

হোই।

চা করে দিতে পার ?

পারবোক না কেনে ?

দাও তবে।

চা আছে, চিনি নেই।

আমাদের আছে দেব।

ক্রমে আলাপ হইয়া গেল। তরুণীর নাম পরীবানু। এ ধরনের নাম এই বনের মধ্যে কোথা হইতে আসিল, কি জানি। তরুণীটির বেশ সুঠাম-সুগঠিত চেহারা, শান্ত মুখশ্রী। সে জল ফুটাইয়া দিব্যি চা করিয়া আনিল, তবে পেয়ালা ইত্যাদি নাই, বড় কাঁসার জামবাটিতে এক বাটি চা এবং কয়েকটি গেলাস।

চা-পান সারিয়া আবার বাহির হওয়া গেল। এবার দুর্গম বনপথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝরনা ক্ষুদ্র নদীর আকারে পথের পাশেই বহিয়া চলিয়াছে। পাষাণতট বনকুসুমে আলো করিয়া আছে।

মন্মথদা বলিলেন, বেশ জায়গা হে, এমন পাহাড় বন দেখিনি কখনও।

অপর বন্ধুটি বলিলেন, সত্যি, এমন জায়গা যে আছে, যশোর জেলার পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে তা কি করে বুঝব ? একটা জায়গা দেখালে বটে।

আমি আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিতেছিলাম, মন্মথদা আর হাঁটিতে পারিতেছেন না। তাঁহার পদবিক্ষেপের মধ্যে একটা ক্লান্তির চিহ্ন ক্রমশই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বলিলাম, ব্যাপার কি ?

আর কত মাইল বাকি ?

এখনও অনেক।

তাই তো, বড় খিদে পেয়েছে। এখানে কিছু পাওয়া যায় ?

কি পাওয়া যাবে এখানে। সঙ্গে পাঁউরুটি আছে, চলুন একটা ঝরনা দেখে বসে তাই খাওয়া যাক।

আরও ঘণ্টা দুই কাটিল।

একটি চমৎকার বনাবৃত অধিত্যকার মধ্যে ছায়াগহন সমতলভূমিতে আমরা আসিয়া বসিলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। সকাল হইতে অনবরত হাঁটিয়া সকলেই ক্লান্ত। হাতঘড়িতে তিনটা বাজিলেও

পাহাড়ের দীর্ঘ গহন ছায়া সমস্ত অধিত্যকাটি এমনভাবে ঢাকিয়াছে যেন শাল, কেঁদ ও পলাশ বনে প্রদোষকাল উপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে।

দেখা গেল, পাঁউরুটি যাহা আছে তাহা তিনটি দস্তুরমতো বুভুক্ষু ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত নয়। মন্মথদা বলিলেন, আর-একটু চা হলে এক রকম কাটাতে পারতাম।

আমরা সকলেই এ কথায় সায় দিলাম।

আমি বলিলাম, চলুন দাদা, এই পাহাড়টা টপকে ওপারে কোনও গ্রাম আছে কিনা দেখা যাক। সকলে আবার উঠি, আবার পাহাড় টপকাইয়া চলি। পাহাড়ে উঠিবার পথে দুই ধারে শিউলিফুলের বন, প্রথম শরতে শিউলিফুল ফুটিয়া সকালেই ঝরিয়া পড়িয়াছে শিলাপটে। বড় দুর্গম চড়াইয়ের রাস্তা মন্মথদা হাঁপাইতেছেন, বন ক্রমশ ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে, কেঁদগাছে ফুল ফুটিয়াছে হরেক রঙের।

মন্মথদার হাত হইতে ঝুলিটা আমি লইলাম, তিনি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে একরূপ টানিয়া পাহাড়ের সমতল শীর্ষে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলাম। একটু পরে আবার নামিতে শুরু করিতে হইল, কারণ বেলা হু-হু করিয়া পড়িতেছে। এই ভল্লুক সংকুল পর্বতারণ্যের অপরিচিত পথে রাত্রির অন্ধকার আমাদের উপর নামিয়া না আসে।

মন্মথদা বলিলেন, আহা, একটু চা যদি পেতাম।

মন্মথদা বার বার চায়ের কথা বলার দরুণই রঘুনাথ দাস কবির সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল।

পাহাড়ের ওপাশে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েক ঘর লোকের বসতি। একজন লোককে মহিষ চরাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে, চা-টা পাওয়া যাবে কোথাও ?

সে লোকটি বলিল, হোই।

কোথায় ?

ওই হোথা। তোদের মতন একজন লোক আছে রে। লেখে পড়ে, কবি হচ্ছে। টুসু পরবের গান বানায়। চলে যা সোজা। ওই বড় মহুয়া গাছের নীচে দেখবি ওর ঘর আছে।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কবি! এই জঙ্গলে-ঘেরা বন্যদেশে বর্বরদের গ্রামে।

মন্মথদা বলিলেন, চল চল হে, দেখা যাক। আশ্চর্য কথা তো। চা-ও

নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কবি মাত্রেই চা খায়। চল, কি রকম কবি দেখা যাক।

আমরা গিয়া কথিত মহুয়াগাছের তলায় পৌঁছিলাম। দেখি একজন লোক কোদাল ধরিয়া মাটি কোপাইতেছে। লোকটির রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, পরনে লেংটি, মাথায় বাবরি চুল, বয়স চল্লিশের মধ্যে, বেশ স্বাস্থ্যবান। আমরা গিয়া বলিলাম, কবি রঘুনাথ দাসের বাড়ি কোথায়?

লোকটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আগাইয়া আসিল। বলিল, আমারই নাম। আপনাদের দাসানুদাস। বাবুদের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

কলকাতা থেকে।

তবে পাটঘিটার জঙ্গলের দিক থেকে এলেন যে?

হাঁটতে হাঁটতে আসছে এই বন দেখতে দেখতে।

আসুন বাবুরা আসুন। আমার বড় ভাগ্যি। চলুন আমার ঘরে।

বনের ভিতর দিয়া পথ, গ্রাম হইতে কিছু দূরে পাহাড়ের নিভৃত উপত্যকায় একটি নিচু খড়ের ঘর। ঘরের সামনে ও চারি ধারে শাল ও মহুয়ার সারি, পাহাড়ী ঢালুতে বনকুসুম ফুটিয়া আছে, প্রধানত বন্য পিটুনিয়া ও বন্য শেফালি, উপরের দিকে দেবকাঞ্চন।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই প্রথমে চোখে পড়ল, বড় বড় অক্ষরে একখানা কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে মারা :—

সংসারের কোলাহল নাহি পশে কানে
তাই ভালো লাগে মোর আসিতে এখানে।

ঘরের একপাশে একখানা দড়ির খাটিয়া, তাহাতে একখানা মোটা সাঁওতালী চাদর পাতা, ঘরের এদিকে ওদিকে বই-খাতা অত্যন্ত অগোছালো-ভাবে ছড়ানো, একখানা রাধাকৃষ্ণের ছবি টাঙানো দেওয়ালে, ঘরের কোণে এক ঝুড়িতে কয়েকটি শশা। বাহিরে গাছপালায় পার্বত্য পক্ষীকুলের কলকাকলী, ঘনছায়া বনপাদপের পাশেই উত্তুঙ্গ তামাপাহাড় শ্রেণী, পড়ন্ত বেলার রোদ শৈলচূড়ায় বনানীশীর্ষে। অতি সুন্দর আশ্রমটি। কবির লিখিবার ও ভাবিবার উপযুক্ত স্থান বটে।

যে এরূপ স্থান নির্বাচন করিবার ক্ষমতা রাখে, সে কবি না হইয়াই যায় না।

আমরা বলিলাম, আপনার বাড়ি নয় এটা?

না বাবু, এটা আমার লিখবার জায়গা। সারাদিন এখানেই থাকি, বাড়িতে যাই খেতে। গ্রামের মধ্যে বড্ড গোলমাল, ও আমার সহ্য হয় না। আপনারা বসুন, আমি আসছি।

কবি চলিয়া গেলে আমরা তাহার বইপত্তর ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিলাম। রামায়ণ, মহাভারত, একখানা সাঁওতালী ছড়ার বই, পদ্যে-লেখা সিংভূমের ইতিহাস, একখানা লয়লামজনু বই বটতলার ছাপা, একজন সাধুর জীবনচরিত ইত্যাদি।

মন্মথদা বলিলেন, এ যে দেখছি, ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল!

আমি ও আমার বন্ধু দুইজনেই সে কথায় সায় দিলাম।

মন্মথদা বলিলেন, চা হবে, কি বল?

আমি বলিলাম, মনে তো হয় দাদা। কবি যখন, দেখা যাক।

বড় সুন্দর জায়গা এটা। ও যদি বিক্রি করে, কিনতে রাজি আছি।

কিনবেন তো, আসবেন কোথা দিয়ে? এই বনের মধ্যে দিয়ে দশ বারো মাইল হেঁটে?

তাই তো ভাবছি।

ইতিমধ্যে কবি গ্রাম হইতে ফিরিল। তাহার এক হাতে একটি ধামায় এক ধামা মুড়ি, অন্য হাতে আট-দশটা ভুট্টা পোড়া। হাসি মুখে বলিল, দেরি হয়ে গেল।

আমরা তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম, কিছু দেরি হয় নাই।

চায়ের সরঞ্জাম এখানেই ছিল, কবি আর একবার গিয়া দুধ লইয়া আসিল। মুড়ি, শসা, ভুট্টা পোড়া ও চা-পর্ব মিটিবার পরে আমরা কবিকে ধরিলাম, আমাদের কবিতা পড়িয়া শুনাইতে হইবে।

পরিবেশটি ছিল চমৎকার। তামাপাহাড়ের দীর্ঘ শ্রেণী আমাদের বামে, শালতরু সারি ছিল দুই পাশে, দেবকাঞ্চন ফুল ফুটিয়া ছিল পর্বতসানুর বনে, তাহার মধ্যে বাবরি চুলওয়ালা কৃষ্ণকায় সাঁওতালী চেহারার কবি রঘুনাথ দাস আপনার মনে স্বরচিত কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

ভ্রমণে আসিয়া এতটা ঘটিবে আমাদের ভাগ্যে, তাহা ভাবি নাই।

অনেক কবিতা। দিব্য ছন্দের কান, ভাষা সরল, গ্রাম্যকবির উপযুক্ত। সবচেয়ে আমার ভালো লাগিল কবির নিসর্গপ্রীতি। প্রকৃতিকে দেখিবার সুন্দর চোখ আছে কবির, অনেকগুলি কবিতা প্রকৃতির বর্ণনা, ঋতুর বর্ণনা, সকাল-সন্ধ্যায় পার্বত্য-ভূমির নানা রূপের বর্ণনা।

আমার এ সকল কবিতা মনে নাই। মনে থাকিলে এখানে নমুনা দিতে পারিলে ভাল হইত। কেবল একটা লাইন আমার মনে আছে একটা কবিতার—

'মত্ত ধরা রেরেং পোকার গানে'

আমরা বলিলাম, রেরেং পোকা কি ?

ওই যে ডাকে রাত্তিরে, বনে-জঙ্গলে।

ঝি ঝিঁ পোকা ?

ওই। আমরা বলি রেরেং পোকা।

মন্মথদা বলিলেন, বই ছাপান নি ?

এখানে মাঘ মাসে টুসু পরব হয়। টুসুর গান আর ছড়া ছাপিয়ে বিক্রি করি। খুব বিক্রি হয়, বছরে ওই টুসু পরবের সময় ত্রিশ টাকা আন্দাজ বই বিক্রির আয় হয়।

ওতে চলে সারা বছর ?

আমার ওতেই হয়ে যায়। খরচ তো বেশি কিছু নয় ; ধানের জমি আছে পাহাড়ের কোলে, মকাই হয় এই ভাদ্র মাসে। কুরমি হয় দশ মণ।

কুরমি কি জিনিস ?

কলাই জাতীয় ফসল। এ দেশে সেদ্ধ করে খায়। গাছে ধুঁধুল, চিচিঙ্গে, ঢেঁড়স ফলে। ওতেই খুব হয়।

আপনার ছেলেপিলে কি ?

তিনটি ছেলে, মেয়ে নেই। বুড়ো বাবা-মা বাড়িতে। স্ত্রী আছেন।

এঁদের বেশ চলে যায় ?

যেমন এ দেশে চলবার নিয়ম। দুবেলা বাঙালী বাবুদের মতো ভাত খেতে হবে, তা নয়। ভুট্টা পোড়া খেয়েই দুদিন কেটে গেল। জংলী আলু এক রকম আছে, কার্তিক মাসে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে গ্রামসুদ্ধ মেয়েরা তুলতে যায়। সকরকন্দ আলুর মতো মিষ্টি। এক-একজন এক মণ দেড় মন আলু তুলে আনলে জঙ্গল থেকে। তাই খেয়েই পনরো দিন কেটে গেল—এমনই। ভাল কথা রাতে আপনারা এখানেই থাকুন। কাল সকালে উঠে যাবেন। খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

আমাদের ভালই লাগিল এই বন্যগ্রামের কবির সাহচর্য। এ ধরনের কবি

আমরা দেখি নাই কখনও। মনও খাঁটি কবির মতই। আমরা বলি, গাঁয়ের বাইরে এই জঙ্গলের মধ্যে থাকেন, এতে কষ্ট হয় না ?

কবির কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

উত্তর দিল, কষ্ট কেন হবে বাবু ? এমন বনের মধ্যে পাহাড়ের নীচে। শালফুল যখন ফোটে, সে গন্ধে পাগল করে দেবে, সে সময় আসবেন বাবু। দেখুন না কত ফুল ফুটে আছে এ সময়। সকালে কত শিউলিফুল পড়ে থাকবে পাহাড়ের বনে। আর দিন কতক পরে আশ্বিন মাসের প্রথমে এখানে জ্যোৎস্না রাতে ঘরে বসে পড়ি বা লিখি। শিউলিফুলের সুবাস কি। এক-একদিন আর বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় না। সারা রাতই এখানে শুয়ে থাকি।

মন্মথদা রহস্য করিয়া বলিলেন, আর কবিপ্রিয়া ?

রঘুনাথের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, বলুন, বলুন, লজ্জাটা কি এর মধ্যে।

রঘুনাথ বলিল, সে লেখাপড়া জানে না। এ দেশের মেয়ে, দেখেছেন তো ওদের। স্বাস্থ্য ভাল। আপনি দেখে বুঝতে পারবেন না বয়েস কত। যে দিন রাত্রে না যাই, মাঝে মাঝে সে নিজেই আসে। ফুল বড় ভালবাসে। ওই জঙ্গল থেকে এই সন্ধ্যেবেলা দেবকাঞ্চন ফুল নিয়ে আসতে হল, খোঁপায় গুঁজবে।

আমার বন্ধুটি বলিলেন, নাঃ মশাই আপনি একজন সত্যিকারের কবি। আচ্ছা উনি যদি এখানে আসেন খাবেন কি ?

ও ভাত রেঁধে নিয়ে আসে শালপাতায় জড়িয়ে। নয় তো ভুট্টা পোড়া। কোন কোন দিন মুড়ি আর আলুসিদ্ধ। আমার তৈরি গান ওকে গাইতে বলি। এই মাঘ মাসে টুসু পরব আসছে, আর দিন কতক পরে গান বাঁধতে আরম্ভ করব। রাত্রে এখানে একদিন থেকে দেখবেন, কত ফুলের গন্ধ।

সত্যিই এই সরল বন্য কবির জীবন আমাদের কাছে লোভনীয় মনে হইল। আর এই পাহাড়ের কোলের ছোট্ট খড়ের ঘরখানা।...প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষে এমনই শৈলারণ্যে। এমনই আশ্রমে কত ভাস 'অবিমারক' 'স্বপ্নবাসবদত্তা' রচনা করিয়া গিয়াছেন, কত কালিদাস 'মেঘদূত' লিখিয়াছিলেন। কত ভবভূতি প্রস্রবণগিরির বর্ণনা করিয়াছিলেন। সুঠাম তরুণী কবিপ্রিয়া খোঁপায় শালমঞ্জরী গুঁজিয়া ময়ূরকে আহার্য প্রদান করিতেন

আশ্রমের অঙ্গনে। দিকে দিকে মুক্ত প্রকৃতির আহ্বান ··আমাদের রঘুনাথদাস তাঁহাদেরই সেই ধারা এই অরণ্যপ্রান্তে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাঁহাদেরই প্রতীক ও। সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা কবির নিকট বিদায় লইলাম।

মন্মথদার থাকিবার উপায় নাই, কোর্ট খুলিবে।

রঘুনাথ দাস আমাদিগকে সুবর্ণরেখার খেয়াঘাট পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল। খেয়া পার হইয়া আরও তিন মাইল হাঁটিয়া স্টেশনে আসিয়া রাত্রি বারোটার সময় ডাউন রাঁচি এক্সপ্রেস ধরিলাম।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিবেকানন্দের কিছু বিদ্রূপ

এতক্ষণ যে আলোচনা চলল, তার থেকে মনে হতে পারে, পৃথিবীতে হিন্দুরাই যত চোর দায়ে ধরা পড়েছে, বাকি সকলে ধোয়া তুলসী পাতা।* হিন্দুদের মধ্যে আবার বিশেষ পাপী মূর্তি-পূজকেরা, অর্থাৎ ইট কাঠ-পাথর দল। স্বামীজী মধুর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—যদি আমি সেই মূর্তিপূজক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে না বসতাম, তাহলে কোথায় যেতাম।

এবং স্বামীজী হিন্দুধর্মের চিকিৎসাভিলাষীদের (যে চিকিৎসকেরা আবার অনেকে যমদূত) চেহারাও কিছু কিছু খুলে ধরে বলেছেন—'হে বৈদ্য! আগে নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো!'

মূর্তিপূজার ব্যাপারটাই ধরা যাক। ঈশ্বর সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বহু শ্লোক লেখা হয়েছে, যার দ্বারা জানা গেছে যে তিনি আকাশের জল থেকে বাগানের ফল—সবই সৃষ্টি করেছেন—তিনি সর্বশক্তিমান বিভু—তাঁকে ইটে কাঠে পাথরে ঢোকানো—আরে ছি!

যেমন আধুনিক শিক্ষিত আলোয়ারের মহরাজা স্বামীজীকে প্রভৃত 'ছি' শুনিয়েছিলেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মডার্ণ মহারাজের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিতে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট। সূচনার সংলাপ এই প্রকার :

মহারাজা। আপনি কাজকর্ম না করে ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?

স্বামীজী। আপনি কাজকর্ম না করে সাহেবদের সঙ্গে শিকার করে বেড়ান কেন?

মহারাজ হতভম্ব। কিন্তু উত্তর একটা দিতে হয়।

মহারাজা। আমার ভাল লাগে।

স্বামীজী। আমারও ভাল লাগে।

অনেক কষ্টে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে মহারাজা নতুন আক্রমণের চেষ্টা করলেন।

মহারাজা। লোকে দেখি মূর্তিপূজা করে। আমার কিন্তু তাতে বিশ্বাস

---

*'সহাস্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থের একটি অধ্যায় বর্তমান রচনাটি পূর্ব অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ছিল—হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে স্বামীজীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

নেই। ইট কাঠ পাথরকে আমি পূজো করতে পারি না—হায়, আমার কি হবে?

এবার স্বামীজী চুপ। কোনো উত্তর দিলেন না। অন্য কথা পাড়লেন। খানিক পরে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখিয়ে দেওয়ানকে বললেন, ওটা কার ছবি? দেওয়ান বললেন, মহারাজার। স্বামীজী বললেন, ওটা নামিয়ে আনুন। দেওয়ান কথামত কাজ করলেন। ছবিটি হাতে নিয়ে স্বামীজী বললেন, দেওয়ানজী এর উপরে থুতু ফেলুন। কথা শুনে তাবৎ সকলে হতভম্ব। স্বামীজী আবার অনুরোধ করলেন। যত অনুরোধ করেন, সবাই শিউরে শিউরে ওঠে—সর্বনাশ! পাগল লোকটা বলছে কি! রাম কহো! মহারাজার ছবিতে থুতু!

সুতরাং স্বামীজী বিমল হাস্য করলেন। যা বললেন, তাতে সকলের প্রাণে স্বস্তিসঞ্চার হল।

স্বামীজী। আপনারা ও কাজ করতে পারবেন না জানি, পারা সম্ভবও নয়, কারণ ওর মধ্যে মহারাজা সশরীরে না থাকলেও তাঁর ছায়া আছে, ওটা কাঠ কাঁচ কাগজের হলেও মহারাজের প্রতীক, সুতরাং ওতে থুতু ফেলা মানে মহারাজের গায়ে থুতু ফেলা। তেমনি—

স্বামীজী মহারাজের দিকে ফিরে বিমলতর হাস্যবর্ষণ ক'রে যোগ ক'রে দিলেন—

'মহারাজ! হিন্দু যখন মূর্তিপূজা করে, তখন সে বলে না, হে পাথর! তোমাকে আমি পূজা করছি, হে ধাতু! আমার উপর সদয় হও—!'

স্বামীজীর বক্তব্য—তাহলেও মূর্তিপূজা! অবশ্যই ছি! কিন্তু মূর্তিপূজার সমালোচকেরা যখন পায়রা ঈশ্বরে, কিম্বা বাক্স ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? স্বামীজী বললেন—

"মূর্তিপূজা যদি করতেই হয়, তাহলে আমি জন্তু, বা বাড়ি আকারের মূর্তির চেয়ে মানবাকার মূর্তির পূজা করব।…খ্রীস্টানরা ভাবে, ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধরে এসেছিলেন, তাতে কোনই দোষ নেই, কিন্তু হিন্দুদের মৎস্যাবতার অত্যন্ত জঘন্য কুসংস্কার। ইহুদীরা ভাবে, যদি একটা সিন্দুকের আকারে কোনো প্রতীক তৈরী করে তার উপরে দুই দেবদূতকে বসিয়ে দেওয়া যায়, সেটা বহুত আচ্ছা, কিন্তু নর-নারীর মূর্তিতে যদি ঈশ্বরকে দেখা হয়—কি বিশ্রী! মুসলমানেরা মনে করে প্রার্থনার সময়ে যদি তারা কাবার কালো পাথরযুক্ত মসজিদের কল্পনা ক'রে নেয় এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাহলে

সেটা বেশক বেশক, কিন্তু যদি গির্জার আকারে কোনো প্রতীক কেউ ভাবে, সেটা হবে পৌত্তলিকতা।”

উপরের দৃষ্টান্তগুলি স্বামীজী একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। মুসলমান ও প্রোটেস্টাণ্টরা সবচেয়ে প্রতীক-বিরোধী, অথচ কোনো না কোনো ধরণের উপাসনা থেকে তাদের অব্যাহতি নেই। প্রোটেস্টাণ্টরা গীর্জার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বাড়ি-প্রতীক বানিয়েছে—বাইবেলের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসের দ্বারা তারা গ্রন্থ-প্রতীকে আস্থাবান। বহুশত বৎসর ধরে কাবার কৃষ্ণপ্রস্তরটি ঈশ্বরবিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ মানুষের ভক্তিব্যাকুল চুম্বনে পবিত্র—একথা স্বামীজী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—জিম্‌জিম্‌-এর কূপের জল গ্রহণ করলে পাপমোচন হবে, পুনরুত্থানের কালে নরদেহ লাভ হবে—এই বিশ্বাসের দ্বারা মুসলমানেরাও ভবন প্রতীককে মেনে নিয়েছেন।

মানবস্বভাবের বিচিত্র রূপ স্বামীজীকে সর্বদা হাসিয়েছে। ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধারণ করে—এটা খ্রীষ্টানের কাছে ইতিহাস, পুরাণ নয়—কিন্তু তিনি গরুর রূপ ধারণ করেন, সেটা ইতিহাস তো নয়ই, পুরাণ বললেও তাকে মর্যাদা দেওয়া হয়—ওটা নিছক কুসংস্কার। এমনি চলছে হাজার হাজার বছর। এক ধর্মের লোক খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আমার প্রফেট এইসব অলৌকিক কাণ্ড করেছেন, এটা সত্য ইতিহাস—কিন্তু তুমি যে বলছ তোমার প্রফেট ঐসব ব্যাপার করেছেন—ওটা স্রেফ গাঁজাখুরি।

অহিন্দুমহলে অতি ধিক্কৃত শিবলিঙ্গের কথাও স্বামীজী তুলেছেন। শিবলিঙ্গ যৌনাঙ্গের প্রতীক নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে কথাটা মানুষ ক্রমে একেবারে ভুলে গেছে—এখন তা বিশ্বস্রষ্টার রূপ। যারা শিবলিঙ্গের উপাসনা করে তাদের মনে যৌনাঙ্গের চিন্তা কখনো ওঠে না, কিন্তু ভিন্ন ধর্ম বা জাতির লোকের মনে ঐ পবিত্র চিন্তা অবিলম্বে না উঠে পারে না। উল্টোদিকে শিবলিঙ্গপূজক হিন্দু জাতি ভিন্ন অন্য ধর্মের উপাসনা বস্তুর মধ্যেও নানা বীভৎস বস্তু আবিষ্কার করে ফেলে অগোণে। যেমন, হিন্দুর কাছে খ্রীষ্টানদের স্যাক্রামেণ্টের থেকে বিকট জিনিস আর কিছু নেই। কোনো মানুষের সদ্‌গুণ পাবার জন্য তাকে মেরে তার রক্তমাংস খাওয়া (স্যাক্রামেণ্টে যার প্রতীক-অনুষ্ঠান) নরমাংসভোজীদের রীতি। বুনো নরমাংসভোজীরা অনেক সময় কোনো বীর যোদ্ধাকে মেরে তার হৃৎপিণ্ড ভোজন করত তার বীরত্বগুণ পাবার জন্য। স্যার জন লুবকের মত একনিষ্ঠ খ্রীষ্টানও স্বীকার করেন, খ্রীষ্টীয় স্যাক্রামেণ্ট অসভ্যদের এই আচরণ

থেকেই উৎপন্ন। কিন্তু ভক্ত খ্রীষ্টান ওসব কথার ধারে-কাছে নেই। তারা ব্যাপারটাকে পরম পবিত্র বলেই জানে।

মজা এইখানেই। আমরা অপরের বিষয়ে যে-কোনো মন্দ কথা বিশ্বাস করতে রাজি, এবং আমার সম্বন্ধে তার যে-কোনো সমালোচনাই মিথ্যা! 'মূর্তিপূজা মন্দ—কেন ? না, যেহেতু কয়েকশ বছর আগে ইহুদী-রক্তের কোনো ব্যক্তি তাকে মন্দ বলেছেন! তার মানে তিনি নিজের প্রতীকটি ছাড়া অন্য সব প্রতীককে নিন্দাবস্তু মনে করেছিলেন!! স্বামীজী দাবড়ে বলেছিলেন—'হাজার হাজর মূর্তির পূজা করো ক্ষতি নেই, যদি তার দ্বারা একজন রামকৃষ্ণ পরমহংস তৈরী করতে পারো।'

সেমেটিক একেশ্বরবাদের মহিমায় তার পক্ষপাতীরা বিশেষ মোহিত– তার উৎপত্তির ইতিহাসও স্বামীজী কিছু নাড়াচাড়া করবার চেষ্টা করেছেন। ব্যাবিলোন ও ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, তারা নানা গোষ্ঠী ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেকেরই এক একটি দেবতা ছিল। যখনই একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে জয় করত, তখন নিজের দেবতাটিকে অপরের উপর চাপিয়ে দিত। শেষকালে এই পন্থানুসরণে দেখা গেল, সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠীর দেবতা অপর সকল গোষ্ঠীর দেবতাকে খেয়ে একেশ্বর হয়ে বসে আছেন। ইহুদীদের মোলক বা দেবতার এই রক্তাক্ত একাধিপত্যই 'অহঙ্কৃত সেমেটিক একেশ্বরবাদ' সৃষ্টি করেছে। স্বামীজী এইসঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন, "তোমাদের অধিকাংশই জানো, এই ধর্মবিজয়ের পিছনে কি পরিমাণ রক্তপাত, উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, ও পাশবিক বর্বরতা ছিল।"

খ্রীষ্টানদের মধ্যে বেনামা মূর্তিপূজার চেহারা স্বামীজী সকৌতুকে দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রীক ও রোমের দেবদেবীরা খ্রীষ্টানধর্মে মেরী, এবং সেন্টদের মূর্তি ধরে সগৌরবে বিরাজ করছেন। এমন কি রোমক পুরোহিত বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্যক্ষের উপাধি পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস হুবহু ব্যবহৃত হচ্ছে রোমের পোপ সম্বন্ধে।

স্বামীজীর কৌতুক সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছে যখন তিনি মূর্তির সামনে হাঁটু ভাঙতে অনিচ্ছুক পাশ্চাত্ত্য দেশীয়দের এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে হাঁটুভাঙা অবস্থায় দেখেছেন :

"পাশ্চাত্ত্যদেশীয়রা বলিয়া থাকে মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ। কিন্তু তাহারা একটি স্ত্রীলোকের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলোক, তুমি আমার

নয়নের দীপ, তুমি আমার আত্মার আত্মা-অনায়াসে বলিতে পারে। তাহাদের যদি চার পা থাকিত, তবে চার পায়েই হাঁটু গাড়িয়া বসিত।"

আর স্বামীজী বিষাদ হাস্যের সঙ্গে বলেছেন—

"অপরের একটি সুন্দর ছবি পুড়লে আমরা সচরাচর দুঃখিত হই না, অথচ নিজের সুন্দর ছবিটি পুড়লে কষ্টের শেষ থাকে না। দুটোই সুন্দর ছবি।"

পুতুল-পূজক হীদেন ভারতবাসীর অসভ্য অবস্থার কথা জানাতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে হাজার হাজার বই ছাপিয়ে ইউরোপ আমেরিকায়, প্রধানতঃ আমেরিকায়, ছড়িয়েছিলেন। সেইসব সচিত্র পুস্তকগুলি মিশনারী-সভ্যতার অকাট্য নিদর্শন। শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের বিবেকানন্দ-বিষয়ক মহাভারত প্রমাণ গ্রন্থে মিশনারীদের ঐসকল মুদ্রিত ভারতপ্রেমের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তাঁরা গোড়ার দিকে কি ধরনের প্রচার করতেন, তার কিছু কিছু কাহিনী লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মিশনারী ও মাতালের মোলাকাতের উপভোগ্য ঘটনাটি অনেকেরই জানা আছে। নিজধর্মের জয়গান করার পরে উক্ত মিশনারী পরধর্মের কিছু সদর্প কুৎসা করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তাঁর মোট বক্তব্য ছিল—আমি যদি তোমার ভগবানকে গালাগালি দিই, তোমার ভগবান কি করিতে পারে? এই মিশনারীর বিশেষ রাগ ছিল হিন্দুর গাছ-ভগবান তুলসীর প্রতি। তিনি উক্ত ভগবানকে নিজের অস্থানে প্রয়োগ করেও স্বধর্মপ্রীতি দেখাতে উৎসাহিত ছিলেন। মাতাল, মিশনারীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তুলসীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মানে জলবিছুটিকে পবিত্র গঙ্গোদকে সিক্ত করে মিশনারীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, এবং তার যথাপ্রয়োগে অস্থানে জ্বলতে জ্বলতে লাফাতে লাফাতে মিশনারী স্বীকার করেছিল—হাঁ হাঁ, তোমাদের গড কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষে যে-শ্রেণীর মিশনারীরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশের চেহারাই এই রকম। রেভারেণ্ড লণ্ডরা ছিলেন ব্যতিক্রম। মিশনারীরা ভারতের দুর্গম অঞ্চলে ঢুকে গিয়ে ধর্মপ্রচারের সাহস ও শক্তি দেখিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে. যে-শক্তি, আমরা জানি, ইংরেজের টমি-গোরারা জলে স্থলে পাহাড়ে পর্বতে মরুভূমিতে লড়াইয়ের সময়ে নিয়মিত দেখাত। উভয়ক্ষেত্রেই জিগীষার তাগিদ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে এই ধরনের মিশনারী প্রচারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

পরিচিত ছিলেন। চিকাগোর ধর্মমহাসভাতে দাঁড়িয়েও তিনি ভারতে মিশনারী-প্রচারের উল্লেখ করেছিলেন—

"আমার বাল্যাবস্থায় ভারতীয় জনতার কাছে এক খ্রীষ্টান মিশনারীর প্রচারের কথা মনে পড়ছে। অন্যান্য সুমধুর জিনিসের সঙ্গে তিনি তাদের বলেছিলেন, 'যদি আমি আমার হাতের এই ছড়ির দ্বারা তোমার পুতুলকে এক ঘা কষাইয়া দিই, তিনি আমার কি করিতে পারেন?' শ্রোতাদের মধ্যে একজন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছিল, 'যদি আমি তোমার ভগবানকে গাল দিই, তিনি কি করতে পারেন?' প্রচারক বললেন, 'তুমি মরিবার পরে তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন। হিন্দুটিও প্রত্যুত্তর দিল, 'তুমি মরবার পরেও আমাদের মূর্তি তোমাকে শাস্তি দেবেন।"

ইউরোপীয়রা কিভাবে হীদেনদের উদ্ধার করেছে, স্বামীজীর আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে তার কিছু রূপ দেখিয়ে দেওয়া যাক :

"স্পেনীয়রা সিংহলে গেল ; সেখানে এক মন্দিরে পবিত্র বুদ্ধ-দন্ত রক্ষিত।

"স্পেনীয়রা ভাবল, তাদের ভগবান তো ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করতে এবং খুন করতে বলেছেন, সুতরাং—তারা বুদ্ধের দাঁতটিকে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করে ফেলল। যাই হোক, ওটা বুদ্ধের সত্যকার দাঁত নয়, পুরোহিত একটা প্রতীক তৈরী করে রেখেছিল—ফুটখানেক লম্বা! (সকলের হাসি)। স্পেনীয়রা দাঁতটাকে ভাঙবার পরে কয়েকশো বৌদ্ধকে ধর্মান্তরিত করল আর কয়েক হাজারকে করল লোকান্তরিত। এখানেই স্পেনীয়দের মিশনারী-ব্রতের ইতি।

"পর্তুগীজ-খ্রীষ্টানেরা বোম্বাইয়ের বিরাট মন্দির দেখল—ত্রিমুখের আকারে তা নির্মিত। পর্তুগীজরা তা দেখল, কিন্তু কোনো অর্থ করতে পারল না। অতএব সিদ্ধান্ত করল—ওটা শয়তানের মূর্তি। তখন তারা সৈন্যসামন্ত জুটিয়ে মন্দিরের তিনটি মাথাকে ভেঙে ফেলল। শয়তান খুবই নিরীহ প্রাণী! হায়, এত দ্রুত সে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে!!"

স্বামীজী বলেছিলেন, পরের যুগের মিশনারীদের সুবিধা অনেক বেশী ছিল। সুসভ্য খ্রীষ্টানদের রাজত্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লেগেই ছিল। মিশনারীরা নিরন্ন পিতামাতার কাছ থেকে নগদ পাঁচ শিলিং খরচ করে একটা একটা হাতে-গরম হবু-খ্রীষ্টান কিনতেন।

মিশনারী প্রচার-পুস্তিকার কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করে এক দয়াবতী আমেরিকান মহিলা স্বামীজীকে শুধোলেন, ভারতে কুমীরের মুখে শিশুদের ফেলে দেওয়া হয়—শুনেছি বিশেষভাবে বাচ্চা মেয়েদেরই ফেলে দেওয়া হয়—

এমন বৈষম্য কেন? মহিলার কথা শুনে স্বামীজীও বেদনায় মুষড়ে পড়ে বললেন, সত্যি, মেয়েদের উপরে কি অন্যায় নিষ্ঠুরতা! কিন্তু উপায়ই বা কি! কুমীরগুলো এমন পাজি যে, নরম মেয়ে মাংস ছাড়া আর কিছু খেতে চায় না।

যেমন ধরো না—স্বামীজী বলতে লাগলেন—আমাকেও কুমীরের মুখে ফেলা হয়েছিল; কিন্তু বজ্জাতগুলো আমাকে কালো আর মোটা দেখে বিরক্ত হয়ে চলে গেল। নিজের কালো মোটা চেহারা দেখে আমার যখন লজ্জা হয়, তখন আবার মনে ভাবি, মোটা বলেই তো কুমীর গিলতে পারেনি। তখন ঠাণ্ডা হই।

আমি আজো বেঁচে আছি—স্বামীজী তারপর তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক মহিমা নিয়ে খাড়া হয়ে ওঠেন—দ্বিতীয় বুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন—খ্রীষ্টান মিশনারীদের দিকে ইঙ্গিত করে সুবিশাল অহঙ্কারের সঙ্গে বলেন—

"I am the heathen they came to save!"

অহঙ্কারী নিষ্ঠুর হীদেনটি—সতীদাহের দেশের লোক—কী নির্লজ্জ!—বলে বসল—

সতীদাহ দুঃখের নিঃসন্দেহে, সত্যই বীভৎস—কিন্তু আমরা ডাইনি পোড়াই না!

ডাইনি কারা?

বিবেকানন্দের প্রতিভা নতুন আবিষ্কারে উল্লসিত হয়ে ওঠে—

তোমরা ইউরোপীয়, তোমরা নারী-পূজা কর, মানে নারীর যৌবনের পূজা কর। বার্ধক্যকে তোমরা সহ্য করতে পারো না। তোমাদের মেয়েরা 'মা' ডাক শুনলে চমকে যায়, পাছে কেউ বুড়ি ভাবে। যাদের রূপযৌবন চলে গেছে, তেমন মেয়েদের কোনো প্রয়োজন নেই তোমাদের কাছে—সেই অসহ্য আবর্জনাগুলোকে—ডাইনি নাম দিয়ে তোমরা পুড়িয়ে ফেলো—ঠিক তাই।

হীদেন ভদ্রলোক আরো জানালেন—

আমেরিকায় শিশুপাঠ্য বইয়ে ছবিতে দেখা যায়, হিন্দু মা গঙ্গায় কুমীরের মুখে নিজের সন্তানকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, মায়ের রঙ ঘোর কালো, কিন্তু শিশুটির রঙ সাদা করা হয়েছে যাতে তারা হতভাগ্য শ্বেত শিশুটির প্রতি সহবর্ণের সহানুভূতি বোধ করতে পারে। এবং সেই সহানুভূতির প্রেরণায় বাল্যকাল থেকেই মিশনারী ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে যেতে পারে।

স্বামীজী পুনশ্চ জানালেন—একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে—একটা লোক নিজের হাতে তার স্ত্রীকে আগুনে পোড়াচ্ছে, যাতে মেয়েটি পেত্নী হয়ে স্বামীর শত্রুদের জ্বালাতে পারে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সত্যবাদী মিশনারীদের বই

ও বর্ণনা থেকে জানা গেছে—কলকাতার রাস্তায় ধর্মান্ধদের বুকের উপর দিয়ে রথ চলেছে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, এবং ভারতের প্রত্যেক গ্রামে একটি করে পুকুর আছে, যা শিশুর হাড়ে বোঝাই।

যত ভয়াবহ বর্ণনা—তত টাকা—মিশনারী-পকেটে। মাঝে মাঝে একটু উল্টো উৎপত্তিও হয়। স্বামীজীর এক বন্ধুর বাড়ির চাকরানিকে পাগলা গারদে যেতে হল ঐসব বক্তৃতা শোনার ফলে। "তার পক্ষে নরকাগ্নির ডোজ একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল।"

খ্রীস্টের প্রেম অপেক্ষা নরকের আগুনকে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মিশনারীরা বেশী কাজে লাগিয়েছিল। চার্চের বাইরে চতুর্দিকে পাপের আঁস্তাকুড়। স্বামীজীর বাল্যকালে পাপের বার্তা নিয়ে জনৈক মিশনারী কিভাবে তাঁকে তাড়া করেছিলেন, তার চমৎকার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। পাদরীকে দেখলেই স্বামীজী পালাতেন। অবশেষে একদিন পাদরী তাঁকে হাতে-নাতে পাকড়ালেন। তারপর উভয়ের সংলাপ—

পাদরী—তুমি ভয়ানক পাপী।

নরেন্দ্রনাথ—রাজি, তারপর—

পাদরী—কিন্তু তোমাকে আমার উত্তম উত্তম জিনিস দিবার আছে—তুমি পাপী এবং তুমি নরকে যাইবে।

নরেন্দ্রনাথ—অতি চমৎকার। আর কিছু দেবার আছে?—আচ্ছা, আপনি নিজে কোথায় যাবেন?

পাদরী—আমি? আমি তো অবশ্য স্বর্গে যাইব।

নরেন্দ্রনাথ—তাহা হইলে আমি অবশ্যই নরকে যাইব।

এই পাপ আর নরকের পাথর গলায় ঝুলিয়ে স্বর্গের দিকে ডানা মেলে দেওয়ার মত বিচিত্র ব্যাপারে বিবেকানন্দের আস্থা কখনো ছিল না। যখন শুনতেন—'খ্রীস্টের রক্তের দ্বারা ত্রাণ,—শিউরে উঠতেন। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের দেশেও ইহুদীদের মত বলিদান আছে—তার সোজা অর্থ, মাংস খাবার সময়ে তাকে দেবতার সামনে উৎসর্গ করা হয়। ওটাও ভাল জিনিস নয়। কিন্তু কী ভয়ানক স্বার্থপরতা ঐ ইহুদী ধারণা—মানুষের পাপ ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটা ভেড়ার মধ্যে, এবং তারপর সেই ভেড়াটিকে বলি দিয়ে পাপমুক্তি ঘটল। "যদি কেউ আমার কাছে এসে বলে—'আমার রক্তের দ্বারা ত্রাণলাভ করো'—আমি তাকে বলব," ভ্রাতঃ, আপনি আসুন! আমি নরকেই যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে নিরীহের রক্তের দ্বারা নিজের স্বর্গ চাইব। আমি নরকবাসের জন্য প্রস্তুত।—"

সংগ্রামস্পৃহা পাশ্চাত্ত্যবাসীর ধর্ম-ধারণার ওতঃপ্রোত। আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক বক্তৃতার মঞ্চ থেকে বলেছিলেন, খ্রীস্টধর্ম শেখানোর জন্য ফিলিপাইনবাসীদের জয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফিলিপাইনবাসীরা ইতিমধ্যেই কিন্তু ক্যাথলিক। উক্ত প্রচারক প্রেসবিটেরিয়ান—তিনি খ্রীস্টান করা মানে প্রেসবিটেরিয়ান করা বুঝেছেন। স্বামীজীর কাছে এটা "বাঘের রক্ততৃষ্ণা, অসভ্য বন্যের নরমাংসলোভ।" তিনি হাসবেন না কাঁদবেন স্থির করতে পারেননি যখন জনৈক বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনেছিলেন, তিনি বুদ্ধজীবনীর খুবই পক্ষপাতী, কেবল বুদ্ধের মৃত্যু ঘটনাটি বাদ। হায়! বুদ্ধ কেন ক্রুশে মরলেন না! "কি বিচিত্র ধারণা! বড় হতে গেলে একটা মানুষকে খুন হতে হবে!!" স্বামীজী হতাশ হাসিতে বললেন।

খ্রীষ্টধর্ম কেন অন্য ধর্মের চেয়ে বড় তার কারণ পাশ্চাত্ত্যে বারবার শুনেছেন। শ্রেষ্টত্বের কারণ—খ্রীষ্টান রাজ্যগুলি সমৃদ্ধিশালী! স্বামীজী তার উত্তরে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন খ্রীষ্টানদের সেই শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য জোগাতে গিয়ে অন্য দেশগুলি নীরক্ত, নিঃস্ব উপবাসী।

কেবল আমেরিকায় কেন, ইংলণ্ডেও অনুরূপ বহু কথা তাঁকে শুনতে হয়েছে। বুদ্ধিমান মননশীল এক ব্যক্তি স্বামীজীর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বহুক্ষণ তর্ক করার পরে উত্ত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন—আপনাদের ধর্ম যদি এতই বড় তো আপনাদের ঋষিরা কেন ইংলণ্ডে আমাদের শিক্ষা দিতে আসেন নি?' অনিবার্য একটি উত্তরই স্বামীজী দিতে পেরেছিলেন—কারণ, আসবার মত কোনো ইংলণ্ড তখন ছিলনা। তাঁরা কি বন-বাদাড়কে শেখাতে আসতেন?'

বিখ্যাত আমেরিকান অজ্ঞেয়বাদী বক্তা স্বামীজীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—এবং তার মধ্যে আমেরিকান সভ্যতার বয়স নির্নীত হয়েছিল—

"স্বামীজী, পঞ্চাশ বছর আগে আপনি এদেশে যদি প্রচার করতে আসতেন তাহলে আপনার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিত। গ্রামাঞ্চলে আপনাকে জ্যান্ত পোড়াত বা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলত।"

স্বামীজী তা জানতেন—নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ফিরিয়েও দিয়েছেন—

"ভারতের নৃপতিশ্রেষ্ঠও কৃতার্থ হবেন যদি তিনি বানপ্রস্থী, বনবাসী, অকিঞ্চন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গ্রামবাসীদের উপর নির্ভরশীল প্রাচীন সাধুর

বংশধর নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন।…আর রোমের পোপ পর্যন্ত খুশী হবেন যদি তিনি রাইন নদীতীরবর্তী কোনো দস্যু-ব্যারণের সঙ্গে নিজ রক্তসম্পর্ক দেখাতে পারেন।"

'ধর্মীয় ক্রোধ এবং ইতর ক্রোধ,

'ধর্মীয় খুন এবং ইতর খুন', 'ধর্মীয় কুৎসা এবং সাধারণ কুৎসায়' সূক্ষ্ম পার্থক্য স্বামীজী ধরতে পারতেন না। বুঝতে পারতেন না—'ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য'—এই থিয়োরীর সুবিধাজনক আস্বাদনকে। স্বামীজী নিজের কিছু যৌবনস্মৃতি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"আমার তরুণ বয়সের কথা মনে পড়ছে। এক যুবকের পিতার মৃত্যুতে তাদের বিরাট পরিবারের বোঝা তার ঘাড়ে পড়েছিল। যুবকের পিতার বন্ধুরা কেউই কোনো সাহাযোর উৎসাহ দেখালেন না। এই সময়ে এক প্রচারকের সঙ্গে যুবকের সাক্ষাৎ হল। তিনি সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লাগলেন—'আহা সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা; তিনি যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য।'…৬ মাস পরে প্রচারকের একটি ছেলে হল; তিনি তার জন্য ভোজ দিলেন—ছোকরাটি তাতে আমন্ত্রিত হল। সমাবেশে প্রচারক প্রার্থনা করতে লাগলেন—'মঙ্গলময়ের করুণার জন্য ধন্যবাদ জানাই।' তখন ছোকরাটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'থামুন মশাই, এ সবই মন্দ।' প্রচারক শুধোলেন, 'সে কি! কেন?' ছোকরাটি বলল, 'কারণ, আপনি মশাই আমার বাবা মারা যেতে বলেছিলেন, মঙ্গলই ঘটেছে, যদিও বাইরে থেকে অমঙ্গল মনে হচ্ছে; তাহলে সেই যুক্তি অনুসারে আপনার ছেলে হওয়াটি আপাততঃ মঙ্গল মনে হলেও আসলে অমঙ্গল।"

ছোকরাটি কে? আমার খুবই সন্দেহ তিনি স্বয়ং স্বামীজী।

পুরনো কথায় ফিরি। ভারতবর্ষ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের আরো অনেক বক্তব্যই স্বামীজীর কাছে উদ্ভট ঠেকেছে। যেমন ভারতে আর্যোদয় তত্ত্ব। ইউরোপীয় পণ্ডিতজনেরা শুনিয়েছেন, ঘোড়ার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে কিংবা গরুর ল্যাজ মূলতে মূলতে একদিন আর্যরা ভারতে হাজির হয়েছিল। এই সঙ্গে আছে, দক্ষিণভারতের শূদ্রদের নিকেশ করেছিল আর্যরা সেখানে গিয়ে। এইসব তত্ত্বের পিছনে কতখানি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর কতখানি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। ইউরোপীয়দের স্বভাব, নিজেদের কুকীর্তির মাপে অপরকে মাপা। "ইউরোপীয়রা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে

বাস করেন। অতএব আর্যরাও তাই করেছে!! ওরা হা-ঘরে, 'হা-অন্ন হা-অন্ন' ক'রে কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়—আর্যরাও তাই করেছে!!… রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে! রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখছিলেন, রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বলো না?"

আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে—প্রমাণ কোথায়?—স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেছেন। "কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখেছ যে, আর্যরা বিদেশ থেকে এখানে এসেছে?" কয়েকজন আর্য ভারতের অধিকাংশ আদিবাসীকে মেরে শূদ্র করে ফেলেছিল—এই থিয়োরী শুনে স্বামীজী হেসে অস্থির হন, তা করতে গেলে, অনার্যদের সংখ্যা যা শোনা যাচ্ছে, তাতে তারা আর্যদের চাটনি করে ফেলত। দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণেরাই কেবল আর্য—এই থিয়োরীকেও স্বামীজী খুঁচিয়েছেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণেদের ভাষা তো দ্রাবিড়—কেন? তারা যদি উত্তর ভারত থেকে এসে তাদের সংস্কৃত ভাষা ভুলে যেতে পারে, তাহলে তাদের সঙ্গে যে সব অন্য বর্ণের আর্য এসেছিল, তাদের সংস্কৃত ভুলতে বাধা কোথায়?—স্বামীজী মিঃ ফিললজিস্টকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

বহির্ভারত থেকে ভারতে আর্যসমাগম সম্বন্ধে স্বামীজীর বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ আরও কিছু রচনা দেখা যাক—

"ওঁরা বলেন, ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। আমেরিকান; ইংরেজ, ডাচ, পর্তুগীজ হতভাগ্য আফ্রিকানদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস করে, যতদিন তারা বাঁচত, ততদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটাত। তাদের ছেলেদের এবং দো-আশলা ছেলেদের একইভাবে দাস করে রাখা হত। দীর্ঘদিন ঐ অবস্থা চলেছিল। নিজেদের এই অপূর্ব আচরণের দৃষ্টান্তে তাদের মন মহালম্ফ দিয়ে কয়েক হাজার বছর পেছিয়ে গিয়ে কল্পনা করতে লাগল—ভারতেও একই জিনিস ঘটেছিল। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয়েরা স্বপ্নে দেখলেন—ভারত পূর্ণ ছিল কৃষ্ণচক্ষু আদিবাসীতে, এবং সমুজ্জলকান্তি আর্যরা ভগবান-জানেন-কোথায় নামক স্থান থেকে এসে ভারতে উদিত হলেন। কারো কারো মতে, তাঁরা এসেছিলেন মধ্য-তিব্বত থেকে; অন্যরা ওটাকে মধ্য-এশিয়া করতে চনে। কিছু দেশপ্রেমিক ইংরেজ মনে করেন, আর্যরা সবাই ছিলেন

লোহিতকেশ; অন্যরা নিজেদের বোধবৃত্তি অনুযায়ী তাঁদের কৃষ্ণকেশ না ক'রে পারেন না। লেখক যদি কৃষ্ণকেশ হন তাহলে আর্যরা কৃষ্ণকেশ, যদি তিনি লোহিতকেশ হন, তাহলে আর্যরা তাই। অধুনা আর্যদের সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদতীরবাসী প্রমাণ করার চেষ্টা চলেছে। ঐ হ্রদের জলে আর্যরা যদি উক্ত থিয়োরী সুদ্ধ ডুবে মরেন, আমি একটুও দুঃখিত হব না। সর্বনাশ, আবার কেউ কেউ বলেন আর্যরা উত্তর মেরুতে বাস করতেন। ঈশ্বর আর্যদের এবং তাঁদের বাসস্থানকে আশীর্বাদ করুন!"

কিছু কিছু ইউরোপীয় ভারততাত্ত্বিক সম্বন্ধে স্বামীজীর কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত 'স্পেশিয়েলে'র কথা মনে পড়ে—

"…তারপর কিছু পণ্ডিত এলেন, যাঁরা নামমাত্র সংস্কৃত জানতেন বা একেবারেই জানতেন না। তাঁরা সংস্কৃতের কাছ থেকে কিছুই আশা করতেন না, এবং প্রাচ্যের সবকিছুকেই বিদ্রূপ করতেন। …এঁদের মহাসাহসের প্রধান সমর্থ উৎস—এঁরা এমন এক শ্রোতৃবৃন্দের সামনে বক্তৃতা শোনাতেন যাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রধান অধিকার সংস্কৃত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতায়! এই বিচক্ষণ পাণ্ডিত্য কি অপূর্ব খিচুড়িই বানিয়েছে!! অকস্মাৎ, এক শুভপ্রভাতে, উক্ত পণ্ডিতগণের শুধু প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুরা জাগরিত হয়ে দেখল, তার যা-কিছু ছিল সবই গিয়েছে; কোনো একটি অপরিচিত জাতি তার শিল্পের গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছে; অন্য একটি জাতি কেড়ে নিয়েছে তার স্থাপত্যের গৌরব; তৃতীয় জাতি হাতিয়ে নিয়েছে তার বিজ্ঞান কৃতিত্বগুলিকে; শুধু তাই—তার ধর্মও তার নয়! হাঁ, হাঁ—পহ্লব জাতীয় প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে ভারতে এসেছে!!"

আধুনিক পৃথিবীর ধর্মাচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বপ্রকার ধর্মের বিচিত্র বিকৃতির জঞ্জাল ঠেলে ধর্মের মূল সত্যের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতে হয়েছে। সেটাই তাঁর জীবনব্রত। স্বামীজীর ধর্ম খুবই সহজ একদিক থেকে—তা হল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে লাভ করা। এবং সে চেষ্টা মানুষকে নিজেই করতে হবে। ঈশ্বর-করুণা ইত্যাদিকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি, কিন্তু সর্বাগ্রে স্থাপন করেছেন আত্মশক্তিকে। তাই বিজ্ঞানকে তাঁর ভয় ছিল না, বিজ্ঞান যতক্ষণ সত্যসন্ধী। বিবেকানন্দ সত্যকে কখনো ভয় করেননি। বিবেকানন্দের তাই বিরূপতা ছিল মিরাকলের বিরুদ্ধে, কারণ তা আত্মশক্তিকে হরণ করে। বিরূপতা ছিল—পুরাণকে (হিন্দু খ্রীষ্টান বৌদ্ধ মুসলমান, সর্বপ্রকার পুরাণকে) ইতিহাস

বলে দাবি করা সম্বন্ধে, যদিও তিনি জানতেন পুরাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে ইতিহাস, এবং পুরাণের কল্পনা-সমারোহ সাধারণ মানুষকে মোহিত করে কখনো কখনো অজ্ঞাতে শিক্ষিত করেও।

মিরাকল বা সিদ্ধাই সম্বন্ধে স্বামীজীর মন খুবই কঠোর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদা একটি সকৌতুক গল্পে গোটা সিদ্ধাই ব্যাপারটিকে এমন তুচ্ছ করে দিয়েছিলেন, যার তুলনা হয় না—সে গল্পটি এবং সিদ্ধাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শিক্ষাই তাঁর স্মরণে ছিল। তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক মনোভাব শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিষয়ক শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পটি সংক্ষেপে এই—

দুই ভাইয়ের এক ভাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েন। বারো বছর পরে সেই সন্ন্যাসী জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। গৃহী ভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'দাদা, তুই এতদিনে কী পেলি?' 'কী পেলুম দেখবি'—বলে সন্ন্যাসী ঘরসংসারে হাবুডুবু খাওয়া ভাইয়ের হাত ধরে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নদীর উপর দিয়ে গট্‌গট্ করে হেঁটে অপর পারে চলে গেলেন। খানিক পরে গেরস্ত ভাই খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে সন্ন্যাসী-ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললেন—'দাদা, তুই তাহলে বারো বছরে যা পেয়েছিস, তার দাম এক পয়সা?'

স্বামীজী বলেছেন, "মিরাকলকে আমি ধর্মজীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করি।" তিনি বুদ্ধের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন : বুদ্ধের কয়েকজন শিষ্য এসে তাঁকে বলেছিলেন, এক ব্যক্তি খুবই সিদ্ধাই দেখাচ্ছেন—তিনি শূন্য থেকে পাত্র নামিয়ে আনছেন। সেই নামানো একটি পাত্রকে শিষ্যরা বুদ্ধকে দেখালেন—লাথি মেরে সেটিকে ভেঙে বলেছিলেন—কদাপি অলৌকিকের উপরে ধর্মকে দাঁড় করিও না! সত্যের সন্ধান করো, তাই হোক তোমাদের নিত্যধর্ম।

হঠযোগীরা আপাতভাবে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতে পারেন—স্বামীজী তা অস্বীকার করেননি। তাঁরা মাসের পর মাস মাটি-চাপা হয়ে বাঁচতে পারেন—মাটির উপরে থেকে দেড়শো বছর বাঁচাও তাঁদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার নয়। 'তাতে কি এসে গেল? একটা বটগাছ কখনো কখনো পাঁচ-হাজার বছর বেঁচে থাকে, কিন্তু সে বটগাছই থাকে।' সুতরাং আত্মার সন্ধান না করে যে হঠযোগী শুধু বাঁচতে চায়, সে স্বামীজীর কাছে 'স্বাস্থ্যবান জন্তু' ছাড়া কিছু নয়। অলৌকিক কাণ্ড সম্বন্ধে উৎসুক উৎসাহী পাশ্চাত্যবাসীকে স্বামীজী প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন, "তোমাদের বাইবেলে শয়তান ক্ষমতাবান—কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ—সে পবিত্র নয়।"

আমেরিকার ক্রীশ্চান সায়েন্স-পন্থীরাও শরীর নিয়ে ব্যস্ত। শরীর সারাবার জন্য তারা বিভিন্নভাবে কতকগুলি বৈদান্তিক কথা প্রয়োগ করে। "আমি শরীর নই, সুতরাং আমার মাথাধরা অবশ্যই সেরে যাবে। স্বামীজী শুধোলেন, বাপু, শরীরই যদি নও, তাহলে শরীর নিয়ে ব্যস্ত কেন? মাথাধরাটা কি শরীরের ব্যাপার নয়? সমস্ত উচ্চভাষণ সত্ত্বেও তাই ক্রীশ্চান সায়েন্স, স্বামীজীর মতে, শরীরচর্চার ধর্ম।

একই রকম অদ্ভুত ধর্মের নামে প্রেতচর্চা। ভূতপ্রেত নামানো নিয়ে স্বামীজীর কিছু কৌতুককাহিনী আগে বলে এসেছি। ঐ কাহিনীগুলি স্বামীজীর মনোভাব দেখিয়ে দেয়। 'স্পিরিট' নামানো ইত্যাদি ব্যাপারকে তিনি সাধারণভাবে ধাপ্পাবাজি মনে করতেন। তাঁর মায়ের প্রেত একবার নামিয়েছিল জনৈক মিডিয়াম, যখন তাঁর মা সশরীরে বর্তমান!

স্বামীজীর বিদ্রূপ কঠিনতর হয়েছিল এ ব্যাপারে। "মানুষ ভাবতে চায়, মৃত্যুর পরেও তার আত্মীয়েরা পূর্বের দেহেই বর্তমান থাকবে আর প্রেতবিদ্‌রা তাদের এই কুসংস্কারের সুযোগ নেয়। আমি খুবই দুঃখিত হব যদি জানতে পারি যে, আমার মৃত পিতা তাঁর নোংরা শরীরের খোলসে এখনো আছেন।"

স্বামীজী আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যখন একবার প্রেতচর্চার আসরে তাঁর সামনে যীশুখ্রীষ্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রভুকে অবশ্য তিনি ভদ্রতাবশে 'হাউ ডু ইউ ডু' করেছিলেন, যদিও প্রেতবিদ্‌রা তাঁকে প্রভুর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে দেয়নি। কিন্তু তিনি দুঃখিত না হয়ে পারেননি। অমন স্থূল দেহে মৃত্যুর পরেও যদি ও হেন সাধুব্যক্তি বর্তমান থাকেন, তাহলে আমার মত হতভাগ্যদের অবস্থা কী দাঁড়াবে!!—স্বামীজী আতঙ্কে ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন, গোটা ব্যাপারটিই মিথ্যা, এক জঘন্য ধরণের নাস্তিকতা—কিংবা অতি স্থূল জড়বাদ—যা নিজের পার্থিব কামনাকে নির্বিচারে সর্বশ্রেণীর মানুষের উপরে চাপিয়ে দেয়।

সুতরাং এই শ্রেণীর জিনিসের বিষয়ে স্বামীজীর নির্মমতার শেষ ছিল না। ইউরোপ আমেরিকায়, ভারতবর্ষেও, ভূতপ্রেত চর্চার ব্যাপারে থিয়জফিস্টদের অবদান কম নয়। সুতরাং স্বামীজীর খড়্গ বারবার তাকে আঘাত করেছে। জীবনের শেষভাগে থিয়জফিস্টদের সম্বন্ধে অতি নিষ্ঠুর কিছু বিদ্রূপ করেছেন—একেবারে খোলাখুলি আক্রমণ—ঈষৎ হাসির আবরণে।

থিয়জফিকে স্বামীজী 'পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা কুসংস্কার' মনে করতেন।

ঐসব আবোল তাবোলে বিশ্বাস করার চেয়ে পুরো নাস্তিক হওয়া ভাল। নাস্তিকদের অন্ততঃ শক্তির অভাব নেই।

স্বামীজীর উল্লিখিত রচনাটির মূলে—থিয়জফিক্যাল সোসাইটি জুবিলী উৎসব ও সেই সূত্রে ঢক্কানিনাদ।

হিন্দুরা উদারতায় বেহিসেবী নয়, একথা কেউ বলতে পারবে না, নচেৎ একদল তরুণ হিন্দুকে এই থিয়জফি নামক আমেরিকান স্পিরিচুয়ালিজমের কলম-চারাকে অভ্যর্থনা জানাতে কি করে পাওয়া গেল—যার মধ্যে টেবিলের ঠক্‌ঠকানি, সমানে পিছনে ঠোকাঠুকি এবং মহাত্মা-বটিকা ইত্যাদি পুরো সাজে বজায় রয়েছে?—স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

থিয়জফিস্টদের দাবি, তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল ঐশ্বরিক জ্ঞানের অধিকারী। এসব কথার সমালোচক যথেষ্ট। কিন্তু স্বামীজী প্রশংসায় বিগলিত "আমরা থিয়জফির মধ্যে ভাল ছাড়া আর কিছু দেখি না।" তাঁর প্রশংসার কারণ—বিভিন্ন স্বর্গের ভূগোল এবং তাদের অধিবাসীদের সমাজরহস্য থিয়জফি থেকে সাক্ষাৎ জানা যায়। সেই সঙ্গে বস্তু-পৃথিবীর টেবিল ভূমির উপরে সুচারু অঙ্গুলির নৃত্যশিল্পও দেখা যায়। আঙুলগুলি নেচে গেয়ে জীবিত থিয়জফিস্টদের সঙ্গে প্রেতগণের টেলিগ্রাফিক সম্পর্ক ঘটিয়ে দেয়।

স্বামীজী তামাশাটা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেননি। রাগে তাঁর গা রি রি করে উঠেছিল যখন দেখেছিলেন 'মৃত আমেরিকান বা রাশিয়ানদের ভূত' ভারতের ধর্মগুরু হতে উদ্যোগী। বিদেশী থিয়জফি-আন্দোলনের সুফল ভারতের পক্ষে এই তিনি দেখেছিলেন—পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সজ্জনেরা ধরে নিয়েছেন হিন্দুধর্ম মানে মুহূর্তের মধ্যে সকলের সামনে আমগাছ গজিয়ে তুলে তাতে ফল ফলিয়ে দেওয়া!!

থিয়জফিস্টদের প্রতি স্বামীজীর সর্বশেষ ধন্যবাদ—এহেন বিশ্বপ্রস্তাবে থিয়জফিস্টরা গুপ্ত রহস্য করে রেখেছেন—সকলের মধ্যে অবাধে ছড়ান নি! ছড়াবার ইচ্ছা তাঁদের নেই। আমেন।

কুসংস্কার, অন্ধতা আর গোঁয়ার্তুমিতে পৃথিবী পূর্ণ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসসহ অজস্র অন্ধ বিশ্বাস। 'ফ্যানাটিসিজম' সম্বন্ধে স্বামীজী একবার একটা উপাদেয় বক্তৃতা করেছিলেন। পৃথিবীতে ফ্যানাটিক বা অন্ধ গোঁড়ার সীমা সংখ্যা নেই—সিগারেট-গোঁড়া, মদ-গোঁড়া, সম্প্রদায়-গোঁড়া, লোকহিত-গোঁড়া আরও কত।

লোকহিত-গোঁড়ার কথাই ধরা যাক। চিকাগোর কতগুলি মহিলা 'হাল্-

হাউস' নামে একটি বাড়ি তৈরী করে সেখানে শ্রমিকদের গান শোনাবার আর ব্যায়াম করার ব্যবস্থা করেছিলেন। পৃথিবীর যত পাপের কবরখানা এই হাল্-হাউস—উক্ত মহিলাদের ধারণা হয়েছিল। 'ভারতবর্ষেও কিছু ফ্যানাটিক আছে যাদের ধারণা কোনো স্ত্রীলোক যদি পতি বিয়োগের পরে আবার বিয়ে করতে পারে তাহলেই সর্ব পাপ নাশ!'

স্বামীজী আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

একটি মহিলার চুরিতে আপত্তি নেই, সুযোগ পেলেই অপরের হাতব্যাগ বা অন্য জিনিস সরিয়ে ফেলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা ভয়ানক ধূমপান বিরোধী। তাঁর ধারণা, ধূমপান না করলেই পৃথিবী ভালো হয়ে যাবে. অবশ্য ছোটখাট হাত-সাফাই বাদ।

মদ-ফ্যানাটিক লোকটির অপরকে ঠকাতে কোন আপত্তি নেই। তার সান্নিধ্যে কোনো মহিলার সম্মান নিরাপদ নয়। কিন্তু সেই নচ্ছারের ধারণা পৃথিবীতে মদ খাওয়াই যত পাপের কারণ।

পুরুষ না হয়ে কোনো মহিলা মদ-ফ্যানাটিক হলে আরও বিপত্তি। তাঁর স্বামীর মদ খাওয়া নিয়ে তিনি পৃথিবীতে প্রলয় আনেন। ভদ্রমহিলারা এক্ষেত্রে যেমন অবুঝ, তেমনি হৃদয়হীন। এমনই এক মহিলা তাঁর স্বামীর মদ খাওয়া নিয়ে স্বামীজীর কাছে প্রচণ্ড অভিযোগ করেন। স্বামীজী উত্তরে বলে. 'মহাশয়া, আপনি থাকতে আপনার স্বামী মাতাল না হয়ে যায় কোথায়? আপনার মত দু'কোটি পত্নী যদি পৃথিবীতে থাকেন দু'কোটি স্বামীই মাতাল হয়ে পড়বে।'

স্বামীজী দেখেছেন, যারা ফ্যানাটিক তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর: তারা যদি কোনো শুদ্ধি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মানুষকে ভালবেসে তা করে না—মানুষের প্রতি ঘৃণাতেই তা করে। বিশেষতঃ স্বাধিকার আধুনিক মহিলাগণ 'ক্ষমা' নামক কথাটা একেবারে ভুলেছেন, সহ্য করার শিক্ষা তাঁদের নেই, অপরের দুঃখ যন্ত্রণা বুঝবার ধৈর্যও নেই। কারো মদ্যপানের বিরুদ্ধে তাঁরা যখন চেঁচান, ভেবে দেখেন না, ঐ পরিবেশে অন্য কেউ পড়লে হয়ত আত্মহত্যা করত। 'আমার এই বিশ্বাস হয়েছে—অধিকাংশ মদ্যপ তাদের পত্নীদের সৃষ্টি।'

আর স্বামীজীর অভিজ্ঞতার ধারণা—অধিকাংশ ফ্যানাটিকই অজীর্ণ বা অন্য রোগগ্রস্ত। 'ক্রমে ডাক্তাররা একদিন আবিষ্কার করবেন—গোঁড়ামি এক ধরনের ব্যাধি।'

এক ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে একটি বই পাঠিয়েছিলেন পড়বার জন্য। না,

স্বামীজী বইটি শুধু পড়বেন তাই নয় তাঁকে বইয়ের সব কথা বিশ্বাস করতেও হবে। বইটির মোট বক্তব্য—আত্মা বলে কিছু নেই, কিন্তু স্বর্গ আছে; সেখানে দেবদেবীরা আছেন; আর মর্ত্যের প্রতিটি মনুষ্যের মাথা থেকে একটি ক'রে আলোর রেখা বেরিয়ে স্বর্গের দিকে ছুটছে।

কিন্তু অমন সব ব্যাপার ঘটছে, ভদ্রমহিলা জানলেন কি করে?—স্বামীজীর প্রশ্ন।

ভদ্রমহিলা জানতেই পারেন, কেননা তিনি 'প্রেরণাপ্রাপ্ত।'

স্বামীজী ভদ্রমহিলার প্রেরণায় এবং প্রেরণার সৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না।

সুতরাং ভদ্রমহিলা বললেন—

'আপনি অত্যন্ত বদ লোক। আপনার কোনো ভরসা নেই।'

এই এক ফ্যানাটিসিজম্।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আরেক গাছের গল্প

এই রকম গাছের কথা আমি অনেক গল্পে লিখেছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কিছুতেই লেখা হয়ে ওঠেনি। এর কারণ, বরাবর ওই একটাই দোষ—চরিত্র বলতে খালি চেহারা স্বভাব আর পরিবেশগত কিছু খুঁটিনাটির দিক নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে ভিতরের যা কিছু, চোখ এড়িয়ে যায়।

হুঁ, একটা গাছেরও চরিত্র থাকে। আর চরিত্র তাই, যা নিজের জোরে একটা নিজস্ব পরিবেশ ও আবহমণ্ডল গড়ে তোলে। ধরা যাক্ আমার কলকাতার ঘরের কাছে নেই শিমূল গাছটার কথা—যেটা সম্প্রতি কাটা হল এবং আমিও যা নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে খবরের কাগজে লিখেছিলাম কয়েক প্যারা রিপোর্টাজ। সেই গাছটার কাঁধ বরাবর ছড়ানো মোটা একটা ডাল ছিল। মসৃণ নিটোল ওই ডালটায় যখনই ওপরের পাতার আড়াল থেকে ঝুপ করে নেমে আসত একটা বুলবুলি কিংবা, কাঠঠোকরা, গাছটা পলকে দেখতাম অতিমাত্রায় কর্মব্যস্ত শহরের বেলা দশটা হয়ে উঠত। বাদবাকি সময় সে শুধু নিছক উদ্ভিদ, বড়জোর একটা প্রাকৃতিক বিষয় কিংবা একটা নির্জন গ্রামের প্রতীক। একটা অলস কুকুর। নয়তো একটা পোড়ো বাড়ি।

অবশ্য গাছ নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নেই! আমি বা পাঠক কেউই আপাতত বোটানি নিয়ে বসিনি। আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত মানুষ। তার মানে, গাছের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে নিলেই হয়তো একটা উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কি সহজ কিছু? গাছে উঠে খেলা দেখা হয়, গাছতলায় নাপিত বা মুচি কিংবা ভিখিরীরা বসেন, রোদের মধ্যে অগত্যা একটা গাছ পেলেও অনেকসময় মাথা বাঁচে—যদিও মেঘ ডাকাডাকির সময় খবর্দার কেউ ভুলেও গাছতলায় যাবেন না!

তত্রাচ গাছে-মানুষে এই ঘনিষ্ঠতাকে আমি কিছুতেই মিলিয়ে দেওয়া বা মিলে যাওয়া বলব না। সে-মিল টের পেতে হলে আমি সেইসব গ্রামীন নির্জন গাছের কথা বলতে চাই, যাদের বর্ণনা অনেক গল্পে দিয়েছি।

বিলাঞ্চলের নিচু মাটিতেই একরকম অদ্ভুত গাছ দেখা যায়, যার পিছনে কিছু না কিছু আজগুবি কিংবদন্তী থাকবেই, থাকবে কিছু ভুতুড়ে গল্পসল্প, কিছু গ্রাম্য প্রেম ও যৌনতার লোকগাথা যেমন ধরুন, কাপাসখালির মাঠের এইরকম

অচেনা গাছের কথা—লোকে বলে, সেটা কামরূপকামাখ্যা থেকে উড়িয়ে এনেছিল কোন এলোচুল সুন্দরী ডাকিনী এবং কালক্রমে কোন চাষাপুরুষের সঙ্গে প্রেমে যৌনতায় লিপ্ত হবার ফলে ছেলেপুলের মা হয়ে একসময় নাতিপুতির কোলে মাথা রেখে মারা যায়। এদিকে গাছটা কিন্তু রয়ে গেল বছরের পর বছর। বিশাল ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তেনু সেখ এক গাঁওবুড়ো। সে ওই মাঠের নিচু জমিতে সারারাত একা বোরো-ধানের ক্ষেতে জল ছেঁচত। সে আমাকে বলেছিল—ডাকিনী তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল! বলে গেল, যাব আর আসব। গেল সে মনের মানুষের কাছে—কিন্তু আর তার ফেরা হল না। হায় রে হায়, সে যে আরেক মায়া—বিষম মায়া! জীবনের মায়া। ডাকিনী জীবনের টগবগে কড়াইয়ে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। জ্যান্ত সেদ্ধ হতে থাকল। আর তার উদ্ধার হল না। এদিকে গাছটা উসখুস করে প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে তার ক্ষুধার্ত শেকড়গুলো বিদেশী মাটির রস টানতে টানতে গভীরে চলে গেল। হায়, তাদেরও আর ফেরা হল না! গাছ এখন ওড়েন কেমন করে? নিচের টান ওপরের টান—তিনি ছট্‌ফট্‌ করেন মাঝখানটিতে। তুমি কাছে গিয়ে দেখো—ওই ছটফটানি টের পাবে। তাঁর গা-ময় চোখ, চারদিক থেকে তিনি তাকিয়ে আছেন আর তাকিয়ে আছেন যদি কোনোদিন রমণী ফিরে আসেন! যদি কোনদিন ফিরে আসেন সুন্দরী, তো কী বিপদের কথা বলো! তবে তিনিও আর ফিরতে পারেন নি, ইনিও আটকে থাকলেন। এ মহা 'সমিস্থে'!

সত্যি বলতে কী, এইসব শুনে আমার গা শিরশির করত অস্বস্তিতে। অনেক নির্জন দুপুরে মাঠে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াতাম। আরে তাই তো! এ কাকে দেখছি? এ এক অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক আদিম সত্তা—হাজার হাজার চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। পাতায় পাতায় পাখির গু, খড়কুটোর বাসা, সাপের খোলস—ডালেডালে কয়েকজাতের পাখি (তার মধ্যে বকই বেশি), কিছু শামুক খোল আর কদাচিৎ ডজনখানেক শকুন। তাদের দলের মোড়লশকুনটার মাথায় লালফেট্টি, গলায় লাল মাফলার। সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেই বুকে দম আটকে যেত।

তলায় ঘাস ঝোপঝাড়গুলো পাংশু—তবে সকালবিকেল দুবেলা তলাটা রোদ পায় বলে তারা গজাতে পেরেছিল। সেখানে একবার একটা মরা শেয়ালকে নিয়ে মহাভোজ হতে দেখেছিলাম। সেবার কালবোশেখীর মরশুমে

আচমকা এক বিকেলে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির ফলে শেয়ালটা বেঘোরে মারা পড়ে। তারপর তাকে টানতে টানতে আরও শেয়াল রাতারাতি ওখানটায় তোলে। তারপর কিছুদিন মরা চিমসে গন্ধে গাছটার ত্রিসীমানায় যাওয়া কঠিন ছিল।

গাছটার ওপর অত্যাচার অনেক হয়েছিল; তবে চরম কষ্ট দিয়েছিল একটা কুচুটে মেঘ। মাথার ওপর এসে হঠাৎ কী বেমক্কা ওপর থেকে ফুটপাতে পিক ফেলার মতো বদখেয়াল হল তার, একটুকরো বাজ ছুড়ে দিলে চড়াৎ করে! ব্যস! গাছের ডগার ছড়ানো টানা ডাল বরাবর ছাল ছাড়িয়ে নেমে গেল বাজটা। কিছু আগুন জ্বলতে দেখল দূরে গ্রামের লোকেরা। সবাই ভাবল, অভিশাপ ফলল এতদিনে ফেরারী আসামীর বরাতে। কিন্তু আশ্চর্য, গাছটার তেমন কিছু হল না।

এই গাছটার কাছে যাওয়া আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। শহরে চাকরীবাকরীর জন্যে হন্যে হয়ে গ্রামে কাটাচ্ছি তখন। কাজ নেই, দিনমান টো টো ঘুরি। ঠিক দুপুর বেলা চলে যাই গাছটার তলায়। কিছু দুর্বোধ্য ভাব মাথায় আসে, যা মানুষের ভাষা বা কোন আর্টফর্মে প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু মনে হয়, এটা গাছ নয়—অন্য কিছু। প্রকৃতির একটা অভিধান খুলে যায় সামনে, পরিচিত শব্দাবলীর অনেক মানে ও ব্যাকরণ দেওয়া আছে যাতে, কিন্তু বুঝতে পারি নে। হু হু হাওয়া বয় খোলামেলা বিলের আকাশে। গাছের পাতাগুলো সরসর করে। সরু সরু কাঠি ভেঙে পড়ে পাখিদের পায়ের চাপে। পাখিরা ডাকাডাকি করে। ক্রমাগত যেন একটা পুরনো জংধরা ভারি কপাট খুলে যাবার ব্যাপার ঘটে। আমার চোখে নিষ্পলক হতে হতে গুরুতর অন্ধকার ঘেরে দৃষ্টিপাতের সবটুকু পরিসর। কী যেন আছে ভিতরে, কে যেন আছেই, কোন মহামহিম সম্রাট—সাপের খোলসে যার জয়পাতাকা ওড়ে, মাথায় যার ঘূর্ণিহাওয়ার খড়কুটোখচিত মুকুট, প্রাকৃতিক ধ্বনিসমূহে চাপা কণ্ঠস্বরে যাঁর নিরন্তর আদেশ শোনা যায় এবং সঙ্গে স্থাবর জঙ্গমে তা পালিত হতে থাকে।...

* * * *

সেই গাছটার তলায় বসে অন্যমনস্কভাবে আমি আমার সামাজিক আইডেনটিটি কার্ড নাড়াচাড়া করতাম। কার্ডে লেখা ছিল: শিক্ষিত বেকার! কার্ডটা দুমড়ে মুচড়ে যেত অজ্ঞাতসারে। তাকে হাস্যকর করে তোলা হত চারদিক থেকে। গাছের গোড়ায় লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে ঝুরোঝুরো

মাটির স্তূপ জড়ো করে রেখেছিল—তারা পাতাল নগরী বানাতে ব্যস্ত সারাক্ষণ। সন্ধ্যার দিকে ধূর্ত মাকড়সারা তার ওপর জাল বুনে আড়ালে ওৎ পেতে বসে থাকত। লালপোকা নীলপোকাপ্রমুখ কীটজগতের সুন্দর-সুন্দরীদের পদস্খলন হত মধ্যে মধ্যে এবং চরম পরিণতিও ঘটত। কখনও ধূর্ত মাকড়সাকে পিঁপড়েদের হাতে বন্দী দেখতে পেতাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতাম, কেউ বসে নেই কোথাও—আমি বাদে। আমাকে ফেলে রেখে প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুজগত এগিয়ে চলেছে নিজের নিজের কাজের পথে। কেউ চুপ করে বসে নেই। বাতাস, মেঘ, রোদ, গাছপালা। মাটিও তৈরী হচ্ছে অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে। আমি শুধু তৈরী নই—কারণ আমি যেন প্রয়োজনহীন বিশ্ব জগতের কাছে। এবং এই তুচ্ছতা ও অসহায়তার বোধ আমাকে শূন্যতার মধ্যে চুবিয়ে নীল করে তুললে, কালক্রমে, এক নির্জন দুপুরে গাছটায় উঠে বসলাম।

হুঁ, আমি মরতে চাইলাম। এ ছাড়া আর কাজের মতো কাজ কীই বা ছিল! পরে ভাবলাম, হয়তো এটাই আমার একমাত্র কাজ এবং পৃথিবী এটাই আমাকে দিয়ে করাতে চায়। বস্তুত, কিছুই তো অকারণ নয়—নিষ্ফল কিছু ঘটেনা কোথাও। মানুষের আত্মহত্যাও এই পৃথিবীর অর্কেস্ট্রায় অবশ্য প্রয়োজনীয় সুর তো বটেই। তাই কাকেও না কাকেও আত্মহত্যা করতেই হয়। যার যা ভূমিকা। আমি একজন আত্মহত্যাকারী হয়ে যাই না কেন! অতএব ধীরেসুস্থে একটা উপযুক্ত ডাল বেছে নিয়ে বসলাম।

সেইসময় নিচে কাছাকাছি কোথাও কাদের কথাবার্তার আবছা শব্দ কানে এল। কারা কথা বলতে বলতে এই গাছটার দিকেই আসছে হয়তো। ঘনপাতার আড়ালে থাকায় তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু একটু পরেই যখন আমার ঠিক নিচে তারা এসে গেল, দেখতে পেলাম।

গ্রামের এইসব অন্ত্যজশ্রেণীর মেয়েরা মাঠ-খাল-বিল-নদী থেকে পাখি বা জীবজন্তুর মতো খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। এরা খবর রাখে, কোথায় কী সব খাদ্য পাওয়া যায়। কোন মরশুমে শেয়াকুল, বৈঁচি, কুল বা 'আঁশটে' নামক লিচুর মতো এক ধরণের ফল ধরে। কোন জলায় সেরা জাতের কাঁকড়া আছে। কোথায় শালুক ফুলের 'ভাঁটা' বা ফল তৈরী হয়ে রয়েছে। কোনখানে 'মাখনা', 'সেকা', 'পদ্মচাকার' অঢেল ভাণ্ডার।

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিল তার ছেলে দুটো। দুটোই ন্যাংটা, কালো-কালো দুটি ক্ষুদে প্রাণী, দারুণ ছটফটে, তেজী আর গোঁয়ার। কারণ তারা মায়ের শাসন না মেনে খুব লাফালাফি করছিল।

তিনটি আদিম মানুষ গাছের নিচে এসে দাঁড়াল।

তারপর মেয়েটি বসে পড়ল সামনে পা দুটো ছড়িয়ে। তার খালি ঝুড়িটা পাশে পড়ে রইল। সে অন্যমনস্কভাবে চুল থেকে উকুন বাছতে ব্যস্ত হল। আর বাচ্চা দুটো মায়ের দুপাশে ঘুরে-ঘুরে খেলা করতে লাগল। পরস্পরকে ছুঁয়ে কেবলমাত্র তারা খিলখিল করে হেসে উঠছিল। মাঝে মাঝে তাদের মা ধমক দিয়ে শান্ত হতে বলছিল। কিন্তু তারা গ্রাহ্যও করল না।

ক্রমশ বাচ্চাদুটোর খেলার গণ্ডী বাড়তে থাকল। এবার তারা মাকে ছেড়ে গাছটাকেই বুড়ি করল। লুকোচুরি খেলার মতো ঝোপঝাড় অনেক রয়েছে। মা তাদের সাবধান করে দিচ্ছিল মাঝেমাঝে—'পোকামাকড় আছে!' কখনও চেঁচিয়ে উঠছিল সে—'কাঁটা ফুটবে!' তারা কানে নিলে তো!

চৈত্রের দুপুর বেলায় তখন চারপাশের মাঠে নাতিশীতোষ্ণ রোদ, আর কোণাকুণি ছুটে যাচ্ছে খড়কুটোর মুকুটপরা ছোটছোট ঘূর্ণিবাতাস। কোথাও কয়েক পোঁচ সবুজ রঙ—তিলের জমি, কোথাও ধুধু শূন্য সাদা মাটি চষা ক্ষেত, কোনখানে বাদামী ও কালো ধানগাছের 'মুড়ো'—কেটে নেওয়া ধানের গোড়াগুলো দাবার ছকের মতো প্রসারিত। গোল দিগন্তরেখায় ধুসর গ্রামগুলোকে তখন খুব অবাস্তব দেখাচ্ছিল।

বাচ্চা দুটো একইভাবে খেলতে থাকল। এদিকে তার মা নিঃসঙ্কোচে বুকের কাপড় সরিয়ে স্তনের চারদিকে ঘামাচি গালতে মন দিল। দুখণ্ড বেঢপ মাংস থেকে কীভাবে বাচ্চাদুটোর খাদ্য যোগানো হয়েছে ভাবতে আমার তাক লেগে গেলে। সে তার একটা মাংসখণ্ড তুলে তলার দিকে স্ফোটকগুলো নখে আঁচড়াতে থাকলে আমি চোখ ঘুরিয়ে বাচ্চাদুটোর দিকে নিয়ে গেলাম ফের।

কিন্তু তাদের দেখতে পেলাম না। কোন সাড়াও পাচ্ছিলাম না। আমার বুক ছাঁৎ করে উঠল। অজানা ত্রাসে। এই বুড়ো শয়তান গাছটা তাদের গাপ করে ফেলল না তো?

হঠাৎ একটা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল তাদের একজন। তার মাথায় একটা লতাপাতার মুকুট। তারপর অন্য একটা ঝোপ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোল তার ভাই। তার হাতে একটা লালচে রঙ সরুসরু ফুলে ভরা ঝুপসি ডাল। দুটি মুখেই জোরালো হাসি। আমার অস্বস্তিটা কেটে গেল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম তৃপ্তিতে—আঃ!

অমনি মনে হল, বাইরে চারদিকে রোদ, মাঠ এবং এখানে এই কিংবদন্তীর গাছটাও আমার তৃপ্তির ও দীর্ঘশ্বাসের চাপা শব্দ বিশালভাবে বাড়িয়ে দিল। খুশিখুশি নাচানাচি চলতে থাকল পাতায়, রোদের হাত ধরাধরি ছুটোছুটি শুরু করল চৈত্রের বাতাস, সারা আকাশ মাথার ওপর থেকে নিঃশব্দে হেসে তাকিয়ে রইল নিচের এই ঘটনার দিকে।

তখন ক্ষুদে মানুষ দুটির অন্য মূর্তি। লতাপাতার মুকুট পরে একজন নাচ জুড়েছে—অন্যজন সেই ফুল ও ডালটা দুলিয়ে মুখে ঢাকের বোল বাজাচ্ছে: উর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌ ঢ্যাঙ্ ঢ্যাগ্রাঢ্যাঙ্ ড্যাডাং ঢ্যাঙ্…

মা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাদের। তারপর একটু হেসে ফের ঘামাচি গালতে লাগল। তারপর সে তার নাভির কাপড় সরিয়ে তলপেটের সাদা দাগগুলোয় পরম যত্নে আঙুল বোলাল। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম।

ছায়ায় ঘুরে-ঘুরে দুটি ছোট্ট মানুষ খুব আদিম ধরণের একটা ফূর্তির আসর জমিয়েছে সন্দেহ নেই। তারা মাতাল মানুষের টলে-পড়ার ভঙ্গীটিও নকল করছিল মাঝে মাঝে। খুব সহজে তারা ক্লান্ত হবে বলে মনে হচ্ছিল না।

হঠাৎ তাদের মা ডেকে বসল।…'আয় রে! বেলা হল, ইবারে যাব!'

অমনি বাচ্চাদুটো দৌড়ে এল কাছে। তারপর দুটি চঞ্চল ছাগলছানার মতো মায়ের দুদিকে বসে স্তন দুটো ভাগ করে নিল। দুজনেই অনেকটা কাত হয়ে রইল মাটিতে এবং খুব জোরেজোরে টান দিতে থাকল। মা কপট রাগে একজনের পিঠে থাপ্পড় কষে ধমকাল, 'আঃ! অত টানে না!' সেই বাচ্চাটা বোঁটা থেকে মুখ তুলে মায়ের দিকে হাসিমুখে দুষ্টুমির দৃষ্টি ছুঁড়ল একবার, তারপর ফের টানতে ব্যস্ত হল।

মা দুটির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে দূরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, সে কোনখানে যাবে তার মতলব ভাঁজছে। তার কুঁচকে যাওয়া ভুরু, ছোট্ট কপালের কয়েকটি রেখা আর রুক্ষ চুলগুলো মিলে একটা অনিশ্চয়তাকে ফুটিয়ে তুলছিল। তার দুটি আনমনা চোখে আশা-নিরাশার রঙ যুগপৎ ঝিলিক দিতে দেখছিলাম। তারপর সে আস্তে-আস্তে ঠোঁট ফাঁক করল।…'আজ' শব্দটা উচ্চারণ করেই সে একবার থামল। তারপর ফের শুরু করল, 'বিলের দিকে আজ যাব না রে, দেরী হবে। ডাইনীর খালেই নামি। আলুপুড়ী বলছিল, খুব গুগলি হচ্ছে উদিকে। গুগলির ঝোল রান্না করব। কেমন?'

বাচ্চাদুটো স্তন ছেড়ে স্যাঁৎ করে উঠে দাঁড়াল। দুহাত তুলে নাচতে নাচতে বলল, 'কী মজা, কী মজা!'

'ট্যাংরা মাছও পাওয়া যায় উখানে—আলুপুড়ী বলছিল।'

'কী মজা, কী মজা!'

'এ্যা বড়ো কাঁকড়া ধরেছিল আলুপুড়ী। একটা দুটো আমিও কি পাবনা?'

'কী মজা, কী মজা!'

একবার করে মন্ত্রপাঠের মতো অন্যমনস্ক আশানিরাশাসঙ্কুল উচ্চারণ আর ওই উল্লাসের ধুয়া গাছতলাটা সুখে ও দুঃখে, ভাবনা ও স্বপ্নে ভরিয়ে দিতে থাকল। তারপর মা উঠল। বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে বাছারা ইখানে খেলা করো। কেমন? রোদ্দ,রে ঝলসে যাবে, মাণিকরা! ছেঁয়াতে দুভায়ে খেলো। এসে ডেকে নোব। যাব, আর আসব!…না, না—যায় না! লুকিয়ে-লুকিয়ে খালে নামব যে! তোরা থাকলে মিনসেদের চোখ যাব। তাড়া করলে তোদের সামলাব, না পালাব? লক্ষি সোনারা আমার।'

বুঝলাম, ডাইনীর খাল ইজারা দেওয়া হয়েছে। মাছ ধরে নেবে বলে ইজারাদার কাকেও নামতে দেয় না। মেয়েটি লুকিয়ে নামবে। তাই কি এখানে এতক্ষণ ওৎ পেতে সুযোগ খুঁজছিল সে?

ডাইনীর খাল সামান্য দূরে। একটা নালা বা কাঁদর সেটা। বিল থেকে বেরিয়ে মাঠ দুভাগ করে দূরে নদীতে গিয়ে মিশিছে। সেদিকে কোথাও কোন লোক দেখতে পেলাম না।

বাচ্চা দুটি জড়োসড়ো ও মনমরা হয়ে তাদের মায়ের চলে যাওয়া দেখতে থাকল। যতক্ষণ না তার মায়ের মূর্তি অস্পষ্ট হয়ে এল, তারা ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আমি উঁচুতে থাকায় মেয়েটিকে মাঝেমাঝে মুখ ঘুরিয়ে বাচ্চাদের দিকে তাকাতে দেখছিলাম।

এবার ক্ষুদে প্রাণীদ্বয় সরে দাঁড়াল পরস্পরের কাছ থেকে। খেলতে শুরু করল আগের মতো। কিছুক্ষণের জন্য বাতাস একটু থেমেছিল। সেই সুযোগে আমার কাছাকাছি কোথায় একটা ঘুঘু ডাকতে থাকল। গুঁড়ির একটু ওপরে একটা কাঠঠোকরা বুকে হেঁটে এগিয়ে চাপা ঠকঠক ঠোকরাতে ব্যস্ত হল। খানিক পরে ডেকে উঠল টানা সুরে ঝিঁঝিঁ পোকা। ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা পেয়ে বসল আমাকে। শুধু আমাকেও নয়, এই বুড়ো গাছটাকে

এবং পরিবেশকেও। সেই ঘোর গাঢ় হলে নিচের প্রাণীদুটিও দেখি অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছে। পাশাপাশি দুটিতে জড়োসড়ো ঘুমোচ্ছিল। সেই সময় চিনতে পারলাম, ভাইদুটি যমজ।

এই বিশাল প্রকৃতিতে দুটি ছোট্ট ন্যাংটা মানুষকে ঘুমোতে দেখে আমার মনে হল, ওরা এত অসহায়! যদি এসময় ওদের মাকে ইজারাদার ধরে থানায় নিয়ে যায়, কিংবা কাঁকড়ার গর্তে হাত ভরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা পড়ে! নানারকম উদ্ভট অথবা স্বাভাবিক আশঙ্কায় আমি অস্থির হচ্ছিলাম। কারণ, প্রকৃতিতে মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য কোন বিবেক দাঁড় করানো নেই—সেখানে কোন অনুশোচনা নেই, নেই কোন সুখ-দুঃখবোধ বা ভালমন্দর সংজ্ঞা। সবই সেখানে কার্যকারণ পরম্পরা, প্রতিটি ঘটনাই পৃথক পৃথক ঘটনার জন্য একেকটি চাবি—সেই চাবি টেপা চাই-ই নয়তো অন্যগুলো ঘটবে না। এবং এভাবেই অনাদিকাল থেকে জগদ্ব্যাপার বলে একটা কিছু চলছে।

আমার আরও আশঙ্কা হল, বিষ পিঁপড়ে, পোকামাকড়, কাঁকড়া বিছে কিংবা সাপের রাজত্ব জায়গাটা। যদি এই ছোট্ট অসহায় মানুষদুটির কোন বিপদ ঘটে যায়, মানুষ হিসেবে নিজের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব?

আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে কেন ওভাবে গাছের ডালে উঠে বসেছি! আত্মহত্যার ব্যাপারটা তিনটি মানুষ এসে পড়ামাত্র কোথায় লুকিয়ে পড়েছিল। আমি 'আত্মহত্যা'কে এখন খুঁজে দেখলাম। সে কি গিরগিটির মতো ক্যামাফ্লেজ করে ওৎ পেতে আছে কোথাও? তার টিকিও খুঁজে পাওয়া গেল না।

গাছের নিচের ঘুমন্ত মানুষদুটো আমাকে টানতে থাকল। কিন্তু পাছে ওরা না চমকে বা ভয় পেয়ে না যায়, খুব সাবধানে নেমে গেলাম।

গুঁড়ির কাছাকাছি ধবধবে মাটিতে ওরা শুয়ে আছে। আমি একটু তফাতে বসে ওদের দেখছিলাম। ঠোঁটগুলো একটু ফাঁক করে ওরা ঘুমোচ্ছে। ঠোঁটগুলো মাইটানার অভ্যাসে নড়ছে তালেতালে—মাঝে মাঝে। ওরা কি স্বপ্ন দেখছে এখন? কী কী স্বপ্ন ওদের পক্ষে দেখা সম্ভব? ওরা নিশ্চয় রেলগাড়ি, মরুসেতু, কারখানার অভ্যন্তরভাগ, স্কাইক্র্যাপার বা ফোয়ারার স্বপ্ন দেখছে না—যা লক্ষাধিক টাকায় রাজধানীর কেন্দ্রে তৈরী। ওরা নিশ্চয় দেখছে না শতাব্দীর মহান স্থপতি ও কারিগরদের—দেখতে পাচ্ছে কি মহামতি আইনষ্টাইনকে, যাঁর সাদা চুলের নিচে মহাবিশ্বের স্থান-কালসমন্বিত

চতুর্মাত্রিক আয়তের বোধ, ওরা কি দেখতে পাচ্ছে লোভেল-আর্মষ্ট্রংদের চাঁদের পিঠে, কিংবা সোয়ুজ কিংবা স্কাইল্যাব ? ওরা কি শুনতে পাচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, বড়েগোলাম আলির ঠুংরি, রবিশঙ্করের সেতার ?

…ওরা দেখছে লতাপাতার মুকুট, ফুল ও এক টুকরো ডাল, একটা ধুসর ঘুঘু পাখি, একটা ঝিঁঝিঁপোকা, একটা হন্যে হওয়া ক্ষুধার্ত কাঠঠোকরা ! হয়তো দেখছে, ঘাসের বুক থেকে ডিগবাজি খাচ্ছে একটা সবুজ ঘাসফড়িং, ঘাসফুলের মাথায় উড়ন্ত একটা প্রজাপতি, নীলচুল কোন শেয়াল, কিছু সকাল-দুপুর-সন্ধেবেলা ও রাত্রি, জোনাকিজ্বলা অন্ধকার, পেঁচার ডাক, জ্যোৎস্নায় উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস। ওরা তাদের ডানার শব্দ শুনে জলপরীদের কথা ভাবছে—যাদের রূপকথা মা শুনিয়েছিল সন্ধ্যাবেলা।

হঠাৎ একটি বাচ্চা উঠে বসল হাউমাউ করে কেঁদে—সে মাকে ডাকতে ডাকতে চোখ কচলাতে থাকল। পরক্ষণে তার জুটিও কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসল। আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। তক্ষুনি এগিয়ে ওদের দুহাতে ধরে ফেললাম—'কী হল, কী হল ?'

ওরা আচমকা আমাকে দেখে ভড়কে গেল নিঃসন্দেহে ! বিকট চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল আবার। আমি দুটি প্রাণীকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাদের বাগ মানানো গেল না। আরও ভয় পেয়ে তারা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুধু করল।

তখন বেমক্কা আমি গান গেয়ে উঠলাম। এটাই শেষ চেষ্টা মনে হয়েছিল। এছাড়া আর কী করা যেতে পারে, মাথায় আসছিলও না।

দেখলাম, তাতে কাজ হল। আমি একটা পুরনো লোকসঙ্গীত গাইছিলাম। বেশ কিছু কমিকাল ব্যাপার তাতে ছিল। ভাঁড়ামির জোরালো নমুনা এটি। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষদের কাছে অবশ্য এর কোন আবেদনই নেই বলে এখানে উদ্ধৃত করতে চাইনে। তাতে এক গ্রাম্য ভাঁড় কোন এক বাজারে গিয়ে কী সব বিদঘুটে ব্যাপার দেখেছিল, তার নমুনা আছে।

ছেলেদুটি এবার বশ মানল। শুধু তাই নয়, খুব রসগ্রাহী শ্রোতার মতো হাসিমুখে সপ্রশংস তাকাল। শেষে আমি নাচও জুড়ে দিলাম। অঙ্গভঙ্গী করে জোর জমিয়ে তুললাম।

তখন আর তারা থামতে পারল না। তারাও নাচতে শুরু করল। আমরা তিনটি মানুষ এমন ভাবে এই নাচগানের আসর জমিয়ে তুললাম যে

পৃথিবীকে আমরা থোড়াই পরোয়া করি। আমি থেমে গেলে ওরা তাগিদ দিচ্ছিল। তিনটি মানুষ এক হয়ে ক্রমশ হাতধরাধরি গাছটাকে ঘিরে এক ধরণের আদিম উৎসবে মেতে গেলাম।...

তারপর ?

তারপর আর কী! ওদের মা আসার আগেই বিদায় নিয়ে চলে আসি। ওরা দুটিতে বিষন্নমনে আমার চলে যাওয়া দেখে। মা ফিরে এলে নিশ্চয় এসব ঘটনা বলে থাকবে। তখন গ্রামীন সরলচেতা স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় ভেবে থাকবে যে কোন দেবতা এসে ওর বাচ্চা দুটোর সঙ্গে স্ফূর্তি করে গেছেন। খুব অবাক হয়ে এবং পরম বিশ্বাসে যে সেই মহান দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্য ইত্যাদি প্রার্থনা নিশ্চয় করেছিল। সে নিশ্চয় তার বাচ্চাদের নামে ধনসম্পদ ও দুধে ভাতে থাকার বর চেয়ে মাথা কুটেছিল!

তার দুর্ভাগ্য, কিছুই ঘটেনি বরাতে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের বিধবা স্ত্রী হিসেবে তাকে একদা শহরের ফুটপাতে এসে জুটতে দেখলেও অবাক হব না।

আমি কিন্তু কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। কারণ, এখন আমি তো জীবনে (!) প্রতিষ্ঠিত মানুষ। সুন্দরী স্ত্রীলোক, সুরম্য ঘর ও সভ্যতার প্রচুর ব্যাপারে মোটামুটি স্বচ্ছন্দ সচ্ছল। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আর এই সাজানো সংসারের দিকে সুখী ভোগী চোখদুটি তুলে তাকাই। অমনি মনে পড়ে যায়, সেই গাছটার কথা! টের পাই, এই বেঁচে থাকার সুখ আমি পেতাম না—যদি সেই চৈত্রের দুপুরে একটা ভুল করতে গিয়ে থমকে না দাঁড়াতাম এবং থমকে দাঁড়ানোর মূলে ছিল তিনটি গ্রাম্য সামান্য মানুষ—তিনটি ক্ষুধার্ত প্রাণী মাত্র! অথচ তারা আমাকে জীবনের গোপন তাৎপর্য টের পাইয়ে দিয়েছিল।

আমি তো অনেক কিছু পেলাম। কিন্তু তারা কী পেল ?

এই প্রশ্ন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে দেখি সেই কিংবদন্তীর বিশাল গাছটা আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে। তার নখওয়ালা শেকড়গুলো কি তলায়-তলায়, গভীরে, নিঃশব্দে বাড়তে বাড়তে এগিয়ে আসছে এই নিশ্চিন্ত সুখের তলায়? তার ডালপালা কি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে ঢেকে ফেলছে চারদিকের আকাশ? আমি থরথর করে কেঁপে তার উদ্দেশ্যে নতজানু হয়ে বলি—ক্ষমা করো! হায়, প্রকৃতিতে কিন্তু ক্ষমা বলে কোন মহামন্ত্র নেই!

মনোজিৎ বসু

পুঁথিকার অবনীন্দ্রনাথ

পুঁথির ভঙ্গিতে লেখা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খানকয়েক গল্পগ্রন্থ আছে। অথচ সেগুলি নিছক পুঁথি জাতীয় রচনাও নয়। সে-রচনায় গদ্য ও পদ্যের এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে। কথকের ভূমিকায় অংশ-গ্রহণ ক'রে অবনীন্দ্রনাথ সেই সব রচনার মধ্য দিয়ে ভাষাশিল্পের যে রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। একই রচনায় তিনি বহু রকমের সুর তুলেছেন এবং তুলনাহীন কল্পনাশক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন।

এই শ্রেণীর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে পড়ে—'মারুতির পুঁথি'; 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'; 'মহাবীরের পুঁথি'; 'লম্বকর্ণ পালা'; আর 'যাত্রাগানে রামায়ণ'।

'মারুতির পুঁথি' প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৪৪-৪৫ বঙ্গাব্দের (১৯৩৭-৩৮ সালের) 'মৌচাক' পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচ-ছয় বছর পরে (১৯৫৬-৫৭ সালে)। 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'-ও গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে প্রায় একই সময়ে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের 'মৌচাক' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় 'পোড়ালঙ্কার পুঁথি' নামে যে লেখা অসমাপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়, সেটি এবং 'মহাবীরের পুঁথি'র গল্পগুলি, ১৩৪৮ থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (১৯৪১-৪৩ সালের) মধ্যে 'রংমশাল' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে, গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে (১৯৬৬ সালে); অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পনের বছর পরে।

পুঁথির ভঙ্গিতে, অর্থাৎ কথকতার স্টাইলে লেখা এই তিনখানি গ্রন্থের বিষয়বস্তু মূলতঃ রামায়ণের গল্প। চ্যাংড়াদাদা যেমন 'মারুতির পুঁথি'-র পাঠক চাঁইবুড়ো তেমনি 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' ও 'মহাবীরের পুঁথি' পাঠ করেছেন তাঁর শ্রোতাদের সামনে। এই সব পুঁথিতে যেমন আসল গল্প আছে, তেমনি আছে পুঁথি-পাঠক বা কথক চ্যাংড়দাদা বা চাঁইবুড়োর নিজস্ব গল্প। তাই, একদিকে যেমন আছে হনুমান, রাবণ, সূর্পণখা, রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান বিভীষণ, কালনেমি প্রভৃতি, অন্যদিকে তেমনি আছে, চ্যাংড়াদাদা বা চাঁইবুড়ো, বেঙাচির বাপ, চাংড়াবুড়ি, কাবুলী, দুলুলী, ঢেলারাম প্রভৃতি। 'মারুতির পুঁথি'-তে প্রাধান্য পেয়েছে হনুমানের বিষয়বস্তু, আর 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'তে, রাবণের কাণ্ড-কারখানা। আর, 'মহাবীরের পুঁথি'-তে বর্ণিত হয়েছে লঙ্কায় হনুমানের

এবং রাম-রাবণের কীর্তিকলাপ। কথকতার ভঙ্গিতে লেখা এই সব গল্পের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কৌতুক-পরিহাসের অনাবিল একটি ধারা! বর্ণনা-কোথাও সংলাপসমৃদ্ধ সরস গদ্যে, কোথাও-বা আবার কৌতুকরসাশ্রিত অতুলনীয় ছড়ায়। যেমন—

'মারুতির পুঁথি' পাঠ করবার সূচনায় চ্যাংড়াদাদার জলগণ্ডূষ ক'রে মন্ত্র আওড়ানো :

"হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদামাটিতে চিৎপটাং ॥"

তারপর চললো বর্ণনা। কথকঠাকুর চ্যাংড়াদাদার বর্ণনা ; সংলাপসমৃদ্ধ বর্ণনা :

"সম্পাতি বল্লেন—'আমি চক্ষে দেখিনি, কই যেরূপ কয়েছেন অগস্ত্য মুনি।'
অঙ্গদ শুধোলেন—'অগস্ত্য মুনিটি কে ?'
সম্পাতি বল্লেন—'পান করলেন যিনি এক গণ্ডূষ জল।'
জাম্বুবান বল্লেন—'তারপর ?'
সম্পাতি বল্লেন—'তারপর উদ্গার—তিমি তিমিঙ্গিল শুদ্ধ যেমন তেমনি লোনাজল।'... ('মারুতির পুঁথি')

তারপর, ছড়া। ছড়ার মধ্য দিয়ে কথক চ্যাংড়াদাদা বর্ণনা ক'রে চলেন কোনো বীরের আস্ফালন :

"এস করি হিড়িকিড়ি
হাঁড়ি পেট নখে চিড়ি—করি ফাঁক !
সেই পথে প্রাণপাখি বারায়ে যাক্—তিড়িবিড়ি
ঝট্ হোক কাজ সাফ্
ঢুকে যাক লাফালাফ—আড়িভাব, দন্ত কিড়িমিড়ি
আমরা এখানে পড়ে থাকি
দেশে উড়ে যাক প্রাণপাখি—যেখানে তার ইস্তিরী ব'সে চিবোচ্ছে কাচা পাকা তিন্তিড়ী !" (মারুতির পুঁথি)

ছড়ার শেষপর্যায়ে কি অসাধারণ কৌতুকরসের অবতারণা। লড়াই হচ্ছে, সেই লড়াইয়ে একজন অন্য জনের পেট ফাঁসিয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়ে প্রাণ-পাখিটাকে বের ক'রে দিতে চাইছে। তবু, সেই মুহূর্তেও সে তার 'ইস্তিরী'-র অর্থাৎ স্ত্রীর কথা বিস্মৃত হ'তে পারেনি। তাই, অন্তিমের বাসনারূপে

যেখানে তার স্ত্রী কাঁচা পাকা তেঁতুল চিবোচ্ছে, প্রাণপাখিটা যেন সেইখানে উড়ে চ'লে যায়।

'মারুতির পুঁথি' তে আবার কাব্যধর্মী গদ্য আছে, ব্যঞ্জনাময় অপূর্ব বর্ণনাও আছে। যেমন :

"আর একদিন দেখেন হনুমান—অযোধ্যার উপর রাতের আকাশে উঠেছে চাঁদ, তারা, তার নীচে ঘুরছে, ফিরছে, জ্বলছে, নিভছে—রাশি রাশি জোনাক পোকার ঝাঁক। বাতাসে লাগছে থেকে থেকে বাঁশীর সুর! দেখতে দেখতে চাঁদ অস্ত গেল। সকালে সূর্য উঠলো—কিন্তু যেন কালো একখানা লোহার তাওয়া। তার পর দশ দিন ধরে আর কিছু দেখা যায় না—কেবল ঝড় আর বৃষ্টি, আর তার মধ্যে মধ্যে বাতাসে হু হু কান্নার সুর! কি যেন একটা ঘটে গেল অযোধ্যার দিকে। দশ দিন পরে সূর্য উঠলো তেলের মত হলুদ গোলা আকাশে একটি বার—তার পরই লোহার কস্‌-ধরা কালো মেঘের রথ সূর্যের আলো অন্ধকার ক'রে দক্ষিণ মুখে চলে গেল। তার পর আকাশ পরিষ্কার—নীল, হলুদ, আর সোনালী রং-এর পতাকা যেন দেখছি। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ একখানা মেঘ যেন নাক কাটা রক্তমুখী কালো বোকুশী পালিয়ে গেল দক্ষিণ মুখে বাতাস নাকী সুরে ভর দিয়ে, রক্ত বৃষ্টি করতে করতে।"　　　　(মারুতির পুঁথি)

'চাঁইবুড়োর পুঁথি'-তেও সেই একই কথনশৈলী। অর্থাৎ, পুঁথিপাঠের স্টাইল। পুঁথিপাঠ চলছে। শ্রোতা "ভুলুনী শুধোলে—তারপর ?"

"—পরের কথা একমাস পরে হলে শুনবা।" ব'লে চাঁইবুড়ো পুঁথি তুলে প্রস্থান—'ঐ সূর্পণখা এলো' ব'লে। ব্যস্‌ আর ভুলুনী কোথা আছে? কাবুলীকে জাপটে ধ'রে কান্না আর থেমচুনী!"　　　　(চাঁইবুড়োর পুঁথি)

'চাঁইবুড়োর পুঁথি'-র পাঠক বা কথক চাঁইবুড়ো নিজে এবং বিষয়বস্তু মূলত রাবণরাজার কাণ্ডকারখানা নিয়ে। রাবণকে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য যে-সব চরিত্র এই পুঁথিতে আবির্ভূত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে রাবণের মা নিকষা, মামা কালনেমি, চিরপরিচিত বোন সূর্পণখা, অন্য বোন মহোদরী, মহোদরীর স্বামী মহোদর এবং আরও অনেকে। রামায়ণের কাহিনীকে হাস্য-পরিহাসের লৌকিক সুরের মধ্য দিয়ে এবং তার সঙ্গে খানিকটা উদ্ভট কল্পনার রং মিশিয়ে কিভাবে পরিবেশন করা যায় তার উদাহরণ 'মারুতির পুঁথি', 'চাঁইবুড়োর

পুঁথি', আর 'মহাবীরের পুঁথি।' কোথাও কাব্যধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় সরস গদ্য, কোথাও সংলাপসমৃদ্ধ কথন-রীতির গদ্য, এবং কোথাও-বা উদ্ভট সব ছড়া। সংলাপের মধ্যে চরিত্রাবলীর মেজাজ অনুসারী হিন্দী ও ইংরেজী বুক্‌নিও বাদ পড়েনি। ছড়ার মধ্যে কৌতুকরসের ফল্গুধারা যেমন প্রবাহিত হয়েছে, তেমনি শব্দের ধ্বনিগত ব্যঞ্জনাও প্রকাশিত হয়েছে সুন্দর ভাবে যেমন:

"দ্রম্ দদ্দড় ধ্রম্ ধদ্ধড়
কিপ্‌পোলো কিপ্‌পোলো
যমজয়ন্তীর তোপ্‌পোলো।
যমদণ্ড ভঙ্গ হলো
দশ খণ্ড হলো
কাল দণ্ড ফাল হলো, ফাল্লালো।"

(চাঁইবুড়োর পুঁথি)

'কি পড়লো'-কে কিপ্‌পোলো, 'তোপ পড়লো'-কে তোপ্‌পোলো এবং 'কালা ফালা হলো'-কে ফাল্লালো-তে পরিণত ক'রেও শব্দের অর্থ সঠিক বজায় রেখেছেন অবনীন্দ্রনাথ।

'মহাবীরের পুঁথি' পূর্বোক্ত দুই পুঁথির সমগোত্রীয়। চাঁইবুড়ো এক্ষেত্রেও পুঁথি-পাঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পুঁথির শ্রোতা এখানে—

"...মাম্‌চী চাম্‌চী থামচী আর খেম্‌চী, সবাই যেন বেদান্তবাগীশ, সিদ্ধান্তবাগীশ, দৃষ্টান্তবাগীশ, বৃত্তান্তবাগীশ, চূড়ান্তবাগীশ সারে সারে চুড়ো-ভাঙা জোড়াপেঁপেতলায় বসে গেল থির গম্ভীর হয়ে কথা শুনতে। পুঁথি পাঠ শুরু হল:..."

লঙ্কা-রাজ্য দর্শন ক'রে ফিরে এসেছে হনুমান। সেই সংবাদ পেয়ে দলে দলে বানর এলো হনুকে দেখতে। সবাই লঙ্কার বিবরণ শুনতে চায়:

"সংবাদ শুনিতে অঙ্গদ কুতূহলী
হাত ধরি বসায়ে করে কোলাকুলি।
জাম্বুবান বলেন, কহ সবিশেষ সমাচার
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার।"

(মহাবীরের পুঁথি)

হনুমান তখন রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কেননা, তাঁকে সীতার খবরটা দিতে হবে সবার আগে। কিন্তু জাম্বুবান যখন বল্লেন

যে, "গোঁসাই শয়নে আছেন পর্বত গুহায়/এমত কালে ডাক দিতে নাহিক জুয়ায়" এবং "নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোঁসাই"—তখন হনুমান সভাস্থলেই তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত শুরু করলেন। এই বর্ণনাত্মক গদ্যে একদিকে যেমন আছে পরিহাসপ্রিয়তার সুর, অন্যদিকে তেমনি আছে ছন্দ-ছড়ার সুর। যেমন :

"'জয় রাম লঙ্কাধাম ব'লে দিলেম এক লম্ফ, / তারপরেই দেখি মাঝ-সমুদ্রে বিরাট এক বাস স্তম্ভ !! / স্তম্ভটা চায় ঘাড়ে পড়ে বেঁকে ! / আমি নিরুপায়, রেগে / একটি মুষ্ট্যাঘাত— / বস্ স্তম্ভ দোফাঁক হয়ে, ধস জলপ্রপাত। / আগালাম নির্বিবাদে। / একটু বাদে / দেখি পর্বত মৈনাক / শুণ্ডকবৎ আকাশে তুলে নাক ! / ঢুকলেম নাকের ছেঁদায়, / বার হলেম কর্ণপথে, তলালো পাহাড় লেজের ঠেলায়। / লঙ্কার সিংহুয়ারে সিংগীমাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকছে ! সিংগীর ডাক শুনেই বুঝলেম সেটা সিংহল বন্দর। / আঙ্গুলের ঘায়ে তারা গেল তল মশক সমান ! তারপরেই দেখি সামনে লঙ্কাগড়। /   (মহাবীরের পুঁথি)

পুঁথিপাঠের এক অপূর্ব কথনশৈলী। লৌকিক ঢঙে অলৌকিক বর্ণনা। 'নাকের ছেঁদায়' ঢুকে 'কর্ণপথে' বের হওয়ার ব্যাপারটা যেমন উপভোগ্য, তেমনি উপভোগ্য 'সিংগীমাছের' প্রাবল্য দেখে জায়গাটাকে 'সিংহল' বন্দর ব'লে সুনিশ্চিত হওয়া ! বন্দর ব'লেই জল, জল ব'লেই সিংগীমাছ। নইলে, বন হ'লে বোধকরি হনুমান সেখানে সিংগীমাছের বদলে সিংহ-সিংহীদেরই দেখতে পেতেন !

গোটা 'মহাবীরের পুঁথি'তে যে সরস ভঙ্গিতে রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ব্যাপারটা লেখা হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই কথনশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শব্দের কি কারিগরি, কৌতুক রসের কি ছড়াছড়ি।

কুম্ভকর্ণের দুই ছেলে—কুম্ভ ও নিকুম্ভ। তাদের খুব ইচ্ছে বানর-মাংস খাওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশাই রাবণ আদেশ করলেন : "যাও বৎস রণক্ষেত্রে, যত পারো মেরে এসো বানর।" কুম্ভ-নিকুম্ভ তখন বীরদর্পে রণক্ষেত্রে গিয়ে বলে :

"কুম্ভ-নিকুম্ভ জমজ ভাই—
কপির আনাজ কুটে খাই।
রাবণ মোদের জ্যাঠামশাই, কুম্ভকর্ণ পিতে—
তাই তাই তাই আয় সবাই লড়াই দিতে।

হ'লে চিংড়িতে কপিতে বড় সুখ খেয়ে শীতে
নোলায় জল আসছে মনে করিতে।"

(মহাবীরের পুঁথি)

এখানে 'কপি' দ্ব্যর্থক—এক অর্থে বানর, অন্য অর্থে ফুলকপি বা বাঁধাকপি। সে-কথা মনে রেখে এই ছড়াটি পড়তে গেলেই প্রচ্ছন্ন কৌতুক রসের সন্ধান মিলবে। 'চিংড়িতে কপিতে'-ও তাই। শীতকালের তাজা 'ফুলকপির সঙ্গে চিংড়ি মাছের ডালনা'-র স্বাদ 'বানরের মাংসের সঙ্গে চিংড়ি'-র ডালনার স্বাদ কল্পনা করেছে রাবণ-ভাইপো কুম্ভ-নিকুম্ভ !

কিন্তু, কুম্ভ-নিকুম্ভের সে-সাধে বাধ সাধলেন মহাবীর হনুমান। তিনি "কুম্ভ-নিকুম্ভ দুটোকে তোবড়ানো সোনার কলসীর মতো কান ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে উপস্থিত"। তার পরের বর্ণনা :

"ভিটে লঙ্কার পোড়ো যকবাড়ির থালি কাছারীতে কালনেমি মামা, হেঁসেল ঘরটায় মহোদর মহোদরী আর পুজো-দালানটায় বেহ্মরাক্ষস বেহ্মরাক্ষসী মহোল্লাস মহোল্লাসী থাকেন।

ডাকে নাই তখন কাগ পক্ষী—
দুয়ারে ঘুমায় ডালকুত্তা দ্বাররক্ষী।

রাত অল্প মাত্র বাকি; তখন মহোল্লাসী দাওয়ায় বসে বেলের পানা ছাঁকছেন, বেহ্মরাক্ষস আসনপিঁড়ি হয়ে ব্রহ্মদেবের ফুট ধরেছেন গোটা গোটা কাটা কাটা একটানা সুরে—সি—সী—বো—তো—ল—বি—ক্—কি—রী! পে—তো—ল—কাঁ—সা,—বা—স—ন কো—স—ন! ও—জো—ন—দ—রে—না—না—ধা—তুময়—ব—স্—তু,—পু—রা—ত—ন—কা—গ—জা—দি—ব—দ—ল—দি—তে—প্র—স্—তু—ত—আ—ছি— আ—নে—ন—ক—রে—ন— পুরাতন বর্জন—নূতন অর্জন……'

এমন সময় সূর্পণখাদিদি ছাতের পর থেকে ডেকে বল্লেন—'ও মহোল্লাসী, হাঁড়ি ফেলো, হাঁড়ি ফেলো। গেরাম ঠাকুরের রামপাখির মালসাভোগ চাপাও নতুন মালসায়।'

চট বেদপাঠ বন্ধ ক'রে মহোল্লাস বল্লেন—'কি হল গো পিসি, কেউ মরেছে নাকি?'

—'মেজদাদার দুই ছেলে যুদ্ধে পড়েছে।'

—'বল কি গো পিসোয় ঠাকরুন—'

—'আরে বলছি আর কি! একেবারে জোড়া মড়া, হনুমান টেনে ফেলেছে পাঁচিল ডিঙিয়ে লঙ্কার বাজারে।"

(মহাবীরের পুঁথি)

সূর্পণখার অশৌচ পালনের এই পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব আছে বৈকি! রাক্ষসকুলে অশৌচপালন বিধির কোনো ঐতিহাসিক নজির আছে কি নেই তা নিয়ে রসস্রষ্টা পুঁথিলেখক অবনীন্দ্রনাথের কোনো মাথাব্যথা নেই। রস-সাহিত্যের খাতিরে তিনি সূর্পণখার জবানীতে মহোল্লাসীকে হাঁড়ি ফেলে নতুন মালসা 'রামপাখির মালসাভোগ' তথা 'চিকেনরোস্ট' দিয়ে হবিষ্যি করবার নির্দেশ দিয়েছেন!

'মহাবীরের পুঁথি'-র পরিসমাপ্তিটি বড়ো সুন্দর, অভিনবও বটে। পুঁথির শেষদিককার পাতাগুলি কখন যে ইঁদুরে কেটে বিনষ্ট করেছে কথক চাঁইবুড়োর সেদিকে খেলাই-ই ছিল না। যখন সেদিকে নজর পড়লো,—

"...চাঁইবুড়ো পুঁথির পাতা উল্টে দেখেন, পনেরো আনা তিন পয়সা কথা ইঁদুরে কেঁটে ছারখার করেছে, পড়বার উপায় নাই!

উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার।
মহাবীরের পুঁথির অবশিষ্ট　　কিছু রাখে নাই অবশিষ্ট
হে রাম, কী অনিষ্ট ঘটালে আমার!

এই ভাষ্য শুনিয়ে লম্ফ নিয়ে ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর হাঁচতে হাঁচতে আসর ত্যাগ ইঁদুরে কাটা পুঁথির পাতা ছড়াতে ছড়াতে।"

(মহাবীরের পুঁথি)

এ তো সুনিপুণ 'কার্টুন'-শিল্পীর ফিনিশিং টাচ্!

এই তিনটি পুঁথিতে অবনীন্দ্রনাথের নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি যেমন উপভোগ্য, তেমনি উপভোগ্য তাঁর কথা নিয়ে রকমারি খেলা। সর্বত্রই কৌতুক রসের ছড়াছড়ি। সে-কৌতুক যেমন তাঁর উপমা প্রয়োগে, তেমনি শব্দের ধ্বনিগত ছন্দ সৃষ্টিতেও। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

প্রথমেই ধরা যাক নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির কথা। যেমন—"...'ঘূর্নিৎবায়ু' নৈঋত কোণে—গম 'চূর্নিৎ' জাতা ফিরান—গুরু গুম্ 'ঘুরু' ঘুম।" (মারুতির পুঁথি) এই যে ঘূর্ণিহাওয়ার বদলে 'ঘূর্নিৎবায়ু', চূর্ণ-র বদলে 'চূর্নিৎ' (বোধকরি 'ঘূর্নিৎ-এর সঙ্গে মেলাবার জন্যই!) এবং ঘুমের দফা শেষ বোঝাবার জন্য 'ঘুরু' ঘুম—এমন শব্দ সৃষ্টিতে অবনীন্দ্রনাথের জুড়ি নেই। দরকার মতো তাঁর শব্দকে টুইস্ট বা পাঞ্চ্ করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। 'কাবুলীকে জাপ্টে ধরে কান্না আর 'খেমচুনী'!" (চাঁইবুড়োর পুঁথি)—এই 'খেমচুনী' শব্দটিও তাঁর সৃষ্টি। সম্ভবতো 'খিঁচুনি' শব্দেরই রূপান্তর। এমনতর আরও অজস্র

শব্দ আছে। তার কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাক 'মহাবীরের পুঁথি' থেকে। যেমন—'দৃষ্টান্তবাগীশ' 'বৃত্তান্তবাগীশ' 'চূড়ান্তবাগীশ'; 'খর্বুদ' (অর্বুদের সঙ্গে মিল রেখে); 'তর্বুজ' (তরমুজের বিকল্পে); 'কাষ্ঠ-বিড়াল' (কাঠবেড়ালী); 'রাম্পোলের' (রাম পোলের অর্থাৎ রামচন্দ্রের জন্য নির্মিত পোল বা পুলের); 'মাজুকর্তা' (মেজো কর্তা); 'কর্তানী' (কর্ত্রী); ভগ্নিদূতী' (স্ত্রী-ভগ্নদূত !); 'বেওরাটা' (ব্যাপারটা); 'হুঁসার' বা 'হুঁস্যার' (হুঁশিয়ার); 'গিরিস্তি' (গৃহস্থ); 'আপাতো' (আপাতত) প্রভৃতি।

কথা নিয়ে কতো খেলাই না করেছেন কথক অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এই তিনটি পুঁথিতে। যেমন 'মারুতির পুঁথি'তে :—"হনুমান কি 'কল্প" শুনিবা 'কলা'…। 'কৌতুকে' তাদের আপত্তি নেই', যৌতুকেই আপত্তি।" "অঙ্গ স্থির, 'অক্ষয়' স্বর্গলাভ 'হক্ষিয় রায়।" 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'-তে : 'যম 'দণ্ড' ভঙ্গ হলো / দশ 'খণ্ড' হ'লো / কাল 'দণ্ড' 'ফাল-হলো' / 'ফাল্লালো।' "খুঁড়ে লঙ্কার 'ভিত্তি / তুমি রাখলে কিত্তি / 'বিত্তি' লাভ করতে এসে / 'পিত্তি' পলো।" 'মহাবীরের পুঁথি'-তে : "শত কোটি 'অর্বুদে'—কত দাদা ? এক 'খর্বুদ'। লক্ষ্মণ বল্লেন—শত কোটি 'খর্বুদে' ? রাম বল্লেন—ধর এক 'তর্বুজ'।" "কাষ্ঠ-বিড়াল ঝাঁটা-ল্যাজ ফুলিয়ে বল্লেন—আগে শৃণু করেন ভাষ্য, তবে করেন হাস্য।" "নল নীল তখন গুরুর হাতে 'দাণ্ডা' দেখে 'গুরুদণ্ড' ভয়ে আধমরা হয়েছেন।…'দাণ্ডা' উঠতেই নল নীল 'দণ্ডায়মান'—নে, 'দণ্ডবৎ ক'রে পায়ের ধুলো।" "লঙ্কাদ্বার, তেজপাতদ্বার, প্যাজীদ্বার, স্কন্ধাবারদ্বার, ধুন্দুমারদ্বার, খাকছার। সদর, অন্দর, হাটের দ্বার, বাটের দ্বার সব বন্ধ ক'রে ব'সে আছেন রাবণ।" "যঃ পলায়তি—ক'রে বুড়ো, আধবুড়ো, আইবুড়ো তিনজনের পলায়ন।" লঙ্কাগাছ একটি থাকবে না লঙ্কায়, ঝালে ঝোলে দিতে।"

উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যেও যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি আছে কৌতুকরসের ভিয়েন। যেমন : (ক) 'মারুতির পুঁথি'তে "মাথার পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে, পেঁপে পাতার ছাতা যেমনি—হেলে না দোলে না।" "এলেন ময়ূরপঙ্খীতে ধুতি পরে যেন টিপু সাহেব।" সকালে সূর্য্য উঠলো—কিন্তু যেন কালো একখানা লোহার তাওয়া।" (খ) "চাঁইবুড়োর পুঁথি'-তে—চুলোচুলিতে ঝড় যেন চালের খড় উড়ে নেড়া হয়ে গেল, দুই সতীনের সিঁথি ফাঁক।" "এমন সময় মহোদর যেন লোমপোড়া ভুম্বার মতো ডাকছে।" (গ) 'মহাবীরের পুঁথি'-তে "মর্কটের দল কর্কটের প্রায় কেবলি পিছু হটে।"

"কুম্ভকর্ণের মুখবিবর ঘোর অন্ধকার, / দন্তগুলা যেন শিক বাঘের খাঁচার।" "রামের ঐশিক বাণ, তারা যেন ছুটে ; / খড়কির (খড়কের) সমান কুম্ভকর্ণে ফিরলো দাঁত খুটে।" "মন্দোদরী রানী পরি' বিবিয়ানি শাড়ি / বসেছেন হীরার মপচেনে বিদ্যুৎ সঞ্চারি।" ব্রহ্মবাণ এস্পার ওস্পার টিউবওয়েল কেটে বার হয়ে গেল।" ব্রহ্মবাণের সঙ্গে টিউবওয়েলের উপমা-কল্পনা বোধ করি একমাত্র কৌতুকরসসিন্ধু অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

পুঁথি-জাতীয় এই তিনখানি কৌতুকরসাশ্রিত গ্রন্থের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লো শব্দের ধ্বনিগত ছন্দ-সৃষ্টি, বা অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টির মাধ্যমে গদ্যভাষায় এই ছন্দ আনয়ন। যেমন : 'মারুতির পুঁথি'তে : "তাঁর নীচে ঘুরছে, ফিরছে, জ্বলছে, নিভছে—রাশি রাশি জোনাক-পোকার ঝাঁক।" "এস করি হিড়িকিড়ি হাঁড়ি পেট নখে চিড়ি—করি ফাঁক।" 'মহাবীরের পুঁথি'তে :— 'হা রাম, / রাখতে বানর জেতের মান, / সাগর ডিঙালাম / লঙ্কা জ্বালালাম, / পোড়ায়ে আলাম / রাঙা মুখ, / তারাই বলছে মুখপোড়া,—এই বড় দুখ।" "সে ঝনঝনা ছাড়িয়ে উঠলো নাসিকার ডাক—হড়্ মড়্ গড়্ গড়্ হুড়ুম দুড়ুম। যেন মেঘ ডাকে, ঝড় বয়, কামান গর্জে, দুমদুমি ফাটে—দুদুম্ দুম্!"

নমিতা চক্রবর্তী

দুখিয়ার মা

ছ'টা বেজে গিয়েছে, ক্লান্তি লাগছিলো। লাগুক, কিন্তু কাজ শেষ না ক'রে উঠছি না। কাল শনিবারটা আর মার্ডার করতে চাই না। তমালীর লাল টুকটুকে মুখের চেহারা মনে পড়লো। এক সপ্তাহ ধরেই ও রাগ করে আছে। ব্যাপারটা হলো কি মেয়েরা যতই অধরা মধুরা হোক না কেন, বিয়ের পরে ওরা একেবারে স্থিতপ্রজ্ঞা হয়ে যায়। আন ব্যালেন্সড্ হয়ে যাই আমরা ছেলেরাই। কখন কি বললাম করলাম বুঝবার আগেই ওপক্ষ গম্ভীর হয়ে ওঠে, তখন সাধ্য কি তার দন্তরুচি কৌমুদীকে বিকশিত করাই। একদিকে ফাইল অন্যদিকে বিবাহিত জীবনের দায়-দাবী, একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা। কিন্তু মজা এই যে মেয়েরা কিছুতেই হেলে টলে না। যাকগে দু'মিনিট কেটে গেলো বাজে ভাবনায়। ফিতে খুললাম পাঁচ নম্বর ফাইলটার।

—হুজুর! মুখ তুলে দেখি আমার বেয়ারা রামাবতার। এই, এই জন্যই লোকটাকে এত পছন্দ আমার। অসময়, শ্রান্তির শেষ নেই, রামাবতার আবির্ভূত হলো কফির পট হাতে নিয়ে। তখন ওকে একেবারে সাধুভাষায় স্বাগতম জানাতে ইচ্ছে করে। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আরাম পেলাম। দু পেয়ালার পর কাজ করবার ইচ্ছে ফিরে এলো। পেয়ালা-টেয়ালা সরিয়ে নিয়ে তবু দেখি কাঁচু-মাচু মুখে দাঁড়িয়ে রামাবতার।

—কি হয়েছে?

—হুজুর বহোৎ মুশকিল হো গিয়া।

কি মুশকিল জানতে চেয়ে শুনলাম ওর শালা মারা গিয়েছে, বৌ নেই অনেকদিন কিন্তু একটা ছেলে আছে সাত বছরের। দেশেও কেউ নেই যে পাঠিয়ে দেবে, এখানেই বা রাখে কোথায়।

—তাইতো! কলমের ঢাকা খুললাম আমি।

—হুজুর, হাত জোড় করলো রামাবতার।

—এক প্রার্থনা শুনিয়ে কৃপা করকে।

—কি?

—বাচ্ছাটাকো ঘরমে লে যাইয়ে। বহোৎ চালাক বাচ্ছা। ও জুতি বুরুশ করবে, পা দাবাবে, ঘর ভি সাফা করবে।

রামাবতার সেই না দেখা চালাক ছেলেটার করণীয় ঝুড়ি ঝুড়ি কাজের তালিকা গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলে গেলো। তারপর জানালো বেশী নয়, মাত্র দু'বছর রাখতে হবে। তারপর ওকে গাঁওমে ভেজে দেবো। সেখানে ও ভৈষা চড়িয়ে নিজের রোটি যোগাড় করে নেবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম ওর মুশকিলটা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। ব্যাটা অসম্ভব ত্যাঁদোড়। এক সময় দেখলাম আমার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে কখন যেন আমাকে নিমরাজী করে ফেলেছে। ওকে বললাম, —দাঁড়াও বাড়ীতে একবার জিজ্ঞেস করি।

পরদিন শনিবারের পূর্বপরিকল্পিত প্রোগ্রামটা সফল করে বাড়ী ফিরলাম রাত এগারোটায়। সিনেমা, তারপর হোটেলে খাওয়া। বুলি সন্ট,— ভাইবোনের জন্যও এনেছি ফিশ্ রোল। আমার আর তমালীর দুজনের মেজাজই অনেকদিন পরে একেবারে রঙিন হয়ে রয়েছে। বাড়ী ঢুকতেই বুলি ছুটে এসে কাছে দাঁড়ালো।

—বৌদি!

ওকে কথা বাড়াতে না দিয়ে আমি তমালীর পিছন থেকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম। বুলি অন্তর্ধান করতেই চোখে পড়লো মায়ের গম্ভীর মুখ। থমকে গেলাম। কি হয়েছে? বাবার শরীর খারাপ! কিন্তু বুলিকে দেখে তো তেমন কিছু মনে হলো না। হয়তো মায়েরই—

—মা মাথাটা বুঝি?

—না, মাথা নাড়লেন মা।

—তোর ছেলেমানুষী আর গেলো না সুমন। কোথা থেকে এনে হাজির করেছিস একটা বাচ্চা ছেলে?

—ছেলে! ও! রামাবতার এসেছিলো বুঝি?

—শুধু এসেছিল? গছিয়েও দিয়ে গিয়েছে বাচ্চাটাকে। তুই নাকি রাখতে রাজী হয়েছিস?

—আমি? কক্ষনো না! কালকেই ভাগিয়ে দেবো দেখো।

বুলি অর্ধেক খাওয়া খাবারের প্লেট নিয়ে ছুটে এলো।

—না না, দাদাভাই, ওকে ভাগিয়ো না। ভাগালেও আমার পরীক্ষার পরে। ও এখন বাবার কাজ করুক।

তমালী বললো—বাবার আবার কাজ কি! খবরের কাগজ তো আমিই পড়ে শোনাই।

—আহা! আর যেন কাজ নেই! পাকা চুল তোলা, পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া, আঙুল টানা—এগুলো করে কে মশাই? ওকে না রাখলে আমি নির্ঘাত ফেল করবো দাদাভাই, তখন কিন্তু বকতে পারবে না। বৌদি দেখনা কি মিষ্টি বাচ্চাটা, কেমন পুটলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!

বুলির কথায় চেয়ে দেখলাম বারান্দার একেবারে কোণ ঘেঁষে ঘুমিয়ে আছে একটা ছোট্ট ছেলে। মাকে বললাম—কাল যা হয় একটা ফয়সালা হবে। আজ ওটা ঘুমোক।

মা ভারী মুখে বললেন—ফয়সালা যা হবে তাতো জানি, আমার একটা জ্বালা বাড়লো।

আর কথা না বাড়িয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিলো কিন্তু দুজনের মেজাজই অতিরিক্ত রকম ভালো থাকার ফলে ঘুমোতে দেরী হলো। পরদিন সকালে ঘুম ভাংলো আটটা বাজিয়ে। চেয়ে দেখলাম তমালী তখনো পাশবালিশ জড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে। তাকে ঠেলে দিলাম—ওঠো, ওঠো, 'শিথিল কবরী আবরি' চায়ের রাজ্যে মন দাওগে।

মুখটুথ ধুয়ে চায়ের টেবিলে এলাম, তমালীও ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে এসে বসেছে। রবিবারের চা আমাদের দেরীতে হয়। বাবা দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন, বুলি সন্টু সমস্বরে বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনকে দোষারোপ করছিলো। একমত হয়েও তর্ক করে যাচ্ছিলো ওরা। হঠাৎ তর্কটা মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চকচকে চোখে বুলি হাসলো—বুঝলি ছো'দা তোর অসুবিধে হ'লেও আমার কিন্তু মজাই।

—মজাটা কি? সন্টু জানতে চাইলো।

—মজা না? খুব মজা। তোকে পরীক্ষা দিতেই হবে! আমার কিন্তু নাইনে উঠে বই-ই নেই। বই ছাপাই হবে না।

বুলির এই সুবিধায় সন্টু রেগে যাচ্ছিলো কিন্তু বাবা তাদের পড়তে যেতে বলায় চুপচাপ খেতে লাগলো। মা-কে চা দিলো তমালী। আমি একটা ছোট্ট ঢেকুর তুললাম। কালকের খাবারটা ঠিক। তমালীর দিকে চেয়ে চোখ টিপতেই সে আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা দিলো। মা বললেন—

শুধু চা খাচ্ছিস যে? বুঝেছি।

মা কথাটা বাবাকে বোঝাবার আগেই বাবার পায়ের কাছে বসা বাচ্চাটাকে দেখলাম আমি। কালো রং শীর্ণ। রামাবতার চুল কাটিয়ে

সাধ্যমত সাফ-সুতরো করে এনেছিলো, সুতরাং গন্ধে মা'র বমি আসেনি। আমি ডাকলাম—

এই! ইধার আও, নাম বাতাও।

—মেরা নাম দুখিয়া।

সন্টু, বুলি রুটিতে পুরু করে জ্যাম মাখাচ্ছিলো। বুলি বলে উঠলো—

এমা! দুখিয়া আবার কি নাম!

ছেলেটা কি বুঝলো, মাথা ঝেঁকে বললো—

—জরুর মেরা নাম দুখিয়া। জনমকো এক মাহিনা অন্দর হামকো মাকো মত্ হুয়া, বহোৎ দুখী হুয়া হাম, ইসকো ওয়াস্তে হামার নাম দুখিয়া।

দুখিয়া কি বললো তা হয়তো সে নিজেও বুঝলো না। কিন্তু আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তমালীর চোখ ছল ছল করে উঠলো। জ্যাম মাখিয়ে একটা টুকরো রুটি দুখিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

—নে, খা।

রামাবতার ঠিকই বলেছিলো। দুখিয়া খুব চালাক চটপটে ছেলে। বাবার আঙুল টানে, পাকাচুল তোলে। কাগজ এলে ছুটে আগে এনে দেয় কিন্তু বড় বেশী প্রাণবন্ত, জেদীও। তমালীকে যে ওর বেশী পছন্দ তা বোঝা যায়। বাবা তো এরি মধ্যে ওকে দুখিয়াকে মাঈ ডাকতে আরম্ভ করেছেন। একদিন তমালী এসে মুখ লাল করে দাঁড়ালো।

—দেখ, দুখিয়াকে মাইজী বলতে বারণ করে দাও। সবাই ঠাট্টা করে।

—বারণ করবো?

—হ্যাঁ করবে। তোমাকে পিতাজী বললে কেমন লাগবে?

স্বীকার করলাম ভালো লাগবে না। দুখিয়াকে ডেকে বললাম।

—এ দুখিয়া ইনকো মাইজী মৎ বোলো।

—তব কেয়া বোলেগা?

আমি একটু ভাবলাম।

—মেমসাব বলো।

—লেকিন উতো মেমসাব নেই?

—কোন্ বোলা?

—হাম আপনা আঁখোমে দেখাতো মেমসাব। উলোক একদম সাদা, আংরেজী বোলতা, গৌন পিনতা, বহুৎ বদ্‌খৎ।

আমি হাসলাম—ইনকো মাইজী মৎ বলো, ভৌজী বলো তব্।

—তব হামকো মাইজী কোন হোগী ?

মুশকিলে পড়লাম—হামারা মাইজী হোগী।

—ধেৎ, উতো বুঢ্ডি, উসকো কেশড়ি সাদা হোগয়া। হামকো একদম পছন্দ নেই হোতা। হামারা এ মাইজী ছোকরী, গোরী বহোৎ সুন্দর। ই হামারা মাইজী।

তমালী দুখিয়ার জোরালো যুক্তি শুনে হেসে ফেললো এবং দুখিয়া তার স্বপদে বহাল রয়েই গেলো। অবশ্য মাস ছয় পরে তমালী যখন সত্যি সত্যি মা হলো তখন তার আর দুখিয়ার মা ডাকে বিশেষ আপত্তি রইলো না। ফুটফুটে সাত'পাউণ্ড ওজনের ছেলে। দুখিয়া খুব খুশী।

—বহোৎ আচ্ছা বাচ্চা। মাইজীকা মাফিক গোরা, উসকো নাম হোগা সুখিয়া।

বাবা দুখিয়ার মাথায় চাটি মারলেন।

—বিচ্ছু ব্যাটার সখ কত! তমালীকে তো মা বানিয়েই ফেলেছে এখন আবার ছেলের নাম নিজের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে।

দুখিয়া বাবার কথা বুঝলো না। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললো।

—নেহি নেই, মেরা ভাইয়া দুখিয়া নেই হোগা, উতো সুখিয়া। আমরা ওর কথাটা বুঝলাম, কষ্ট হলো।

দিন তিনেক পরে একটু জ্বর হলো তমালীর। দুখিয়ার মুখ শুকিয়ে গেলো, ছুটে এলো আমার কাছে। মাইজীকে একঠো ডাগ্‌দার দেখলাও না। আমি একটু অবাক হলাম।

—বেশী জ্বর হয়েছে তোর মাইজীর ?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো দুখিয়া।

—অভিতক হুয়া নেই, লেকিন হোনেসে কেয়া হেগা ? তুমহারা পাও লাগি বাবুজী, মাইজীকো ভালা কোই ডাগ্‌দার দেখলাও। মাইজীকো কুছ হোনেসে সুখিয়া ভাইয়াভি দুখিয়া বন যায়গা।

আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। পরদিনই ডক্টর মিসেস পাত্রকে ফোন করলাম। ততক্ষণে জ্বর ছেড়ে গিয়েছে তমালীর। ডক্টর পাত্র এসে খুব ভালো করে তমালীকে পরীক্ষা করে হেসে বললেন।

—ভালো, খুব ভালো আছেন, আপনার স্ত্রী। সম্পূর্ণ সুস্থ মা।

মাইজী ভালো আছে শুনে ভারী খুশী দুখিয়া। বিজ্ঞভাবে মাকে উপদেশ দিলো।

—মহাবীর জীকো মন্দিন মে ধূপ চড়ানে হোগা।

বউদির প্রতি টানের বাড়াবাড়ি দেখে রেগে যায় বুলি।

—জানিস, আমি তোকে এ বাড়ী রেখেছি। দাদাভাইতো ভাগিয়ে দিচ্ছিলো।

একরাশ সাদা দাঁত বের করে হাসে দুখিয়া।

—তোমকো তো ভাগনেই হোগা।

—কি, আমি ভাগবো? এক চড় খাবি ভূত।

বুলির নালিশ শুনে মা দুখিয়াকে ডেকে বলেন—

কেন দিদিকে বলেছিস ভাগতে হবে?

দুখিয়া হাসে।

—উসকো তো জরুর ভাগতে হোবে। সাদিকা বাদ শ্বশুরাল যাবে না দিদি?

বাবা হো-হো করে হাসেন—ব্যাটা বিচ্ছু! তা তোর মাইজী ভালো তো এখন?

—হাঁ ভালো, লেকিন আউর থোড়া মছলি আর দুধ পিলানেসে তাগত বাড় যাগয়া উনকো।

মা ধমক দেন—যা যা, তোকে আর সদ্দারি করতে হবে না।

বাবা বললেন—তা, তমালীকে একটু বেশী ক'রে মাছ-টাছ—

এবার মা রেগে গেলেন।

—আচ্ছা মানুষ তো তুমি! ওর কথায় ভাবলে আমি বউকে খেতে দেই না!

—আরে না না, তা নয়। বলছিলাম কি—যাকগে, যাকগে। কথা না বাড়িয়ে সারেণ্ডার করলেন বাবা।

বাড়ীতে দুখিয়াকে ভালোবাসে সবাই কিন্তু আজকাল একটু অসন্তুষ্ট। ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না ওকে, সব সময় বসে থাকবে তমালীর ঘরে। হাঁ করে বসে বসে দেখবে বাব্বার চান করানো, ঘুম পাড়ানো, খাওয়ানো। এক এক সময়, বিশেষ করে ছেলেকে খাওয়াবার সময় অস্বস্তি বোধ করে তমালী। ধমকে ধমকেও ঘরের বার করা যায় না দুখিয়াকে। তখন বুলি এসে চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করে দেয়। ঘাড় গুঁজে চড়-চাপড় খায় দুখিয়া কিন্তু ঘর থেকে নড়তে চায়না সহজে।

একদিন সকাল বেলা ঘরে ঢুকে অবাক হলাম।—একটা ছোটে চামচে

হাতে নিয়ে কি বলছে দুখিয়া আর বিব্রত মুখে তমালী তাকে একটা কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে ?

লাল হয়ে তমালী উত্তর দিলো—দেখ না কি বলছে দুখিয়া।

—কি রে, কি বলছিস মাইজীকে ?

—কুছ বোলা নেই বাবুজী, থোড়া দুধ মাঙ্‌ছি। করুণ মুখ দুখিয়ার।

—দুধ !!

—হাঁ, বাবুজী।

—তা দুধ এখানে কেন ? নানীমার কাছে যা।

—ও দুধ নেহি বাবুজী। গউকা দুধ নেহি। মাকা দুধ। ভাইয়া যো দুধ পিতা, ওহি মাঙ্‌ছি থোড়া।

বিস্ময়ে আমার প্রায় বাকরোধ হবার উপক্রম। সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—

—কি করবি তুই দুধ দিয়ে ?

—পিয়েগা বাবুজী।

—খাবি ! হে ভগবান ! আমার মুখ দিয়ে আর কথা বের হলো না।

উজ্জ্বল চোখে দুখিয়া বলতে লাগলো—

মা-দুধকা সোয়াদ কভি নেই জানতা বাবুজী।

থোড়া হোনেসেই হো জায়গা। মাইজীকো বলিয়ে না কৃপা করকে থোড়া দেনে। ভাইয়া কেত্‌ না পিতা, উগার ভি দে দেতা। হামকো থোড়া দেনেসে উসকো কমতি নেই হোগা বাবুজী।

আমি বিপদে পড়লাম। একটু কেসে বললাম—

আরে কমতি হবার জন্য নয়। কিন্তু তুই ওর স্বাদ জেনে করবি কি ? কত জিনিষের স্বাদ তো জানিস নে। পোলাউ, মুরগীর মাংস আরো কত ভালো খাবারের স্বাদ জানিস নে, এটাও নয়তো না জানলি। যা যা এখান থেকে, না হলে ভীষণ রাগ করবো।

ঝক্ ঝক্ করে উঠলো দুখিয়ার চোখ।

—জান দে দেগা বাবুজী তব্‌ভি তব্‌ভি হটেগা নেহি। জরুর মাকা দুধ পিয়েগা। বড়া আদমীকো খানা নেই খানেসে কুছ নেই হোতা। লেকেন বড়া ছোটা সবকো বাচ্চা লোক মাকা দুধ পিতা, হাম কভি নেই পিয়া। ওসিকো ওয়াস্তে তো হাম দুখিয়াবন গয়া। পাও লাগি মাইজী, থোড়া দুধ পিনেছে হাম সুখিয়া ভাইয়াকো সাচ্‌সাচ্‌ ভাই বন যায়গা, হামকো মা হোগা,

হাম ভি সুখিয়া হো যায়গা, কির্‌পা করিয়ে মাইজী দুখিয়া হোনেসে হামকো বহোৎ দুখ হোতা। কেঁদে ফেললো দুখিয়া।

আমি কি করবো বুঝতে না পেরে দুখিয়াকে ঘর থেকে বের করে দিতে যাচ্ছিলাম, তমালী এগিয়ে এলো। দুখিয়ার হাত থেকে চামচে নিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

আমি দেখলাম সেই কালো নোংরা দেহাতী ছেলেটার মাথা নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়েছে তমালী, তার মুখে ঢেলে দিচ্ছে চামচে ভরা মাতৃস্তন্য। আমার আধুনিকা তমালীর চোখে জল। ও সত্যি সত্যি দুখিয়ার মা হয়ে গেল। ইমোশন চাপবার জন্য আমি জানালার বাইরে চোখ ফেরালাম।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

নায়ক বনাম লেখক

অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির মর্ম ও স্পন্দন পাঠকমনে পৌঁছে দেওয়াই একালের ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস লেখক ছিলেন অনেকটা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বগ ঈশ্বরের মতো। তিনি সকল চরিত্রের সব গুপ্ত রহস্য জানতেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর হুকুমেই তারা উঠত, বসত, ভালবাসত আবার ভালবাসা থেকে সরে যেত। ফীলডিং, স্কট, থ্যাকারে, জর্জ এলিঅট, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এই জাতীয় উপন্যাস লেখক। উপন্যাসে তাঁদের উপস্থিতি ছিল প্রকট ও প্রত্যক্ষ। পাঠকের স্বাধীনতা নেই এঁদের উপন্যাসে। চরিত্রগুলির উপর তাঁদের অভিভাবকোচিত নিয়ন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতা এক মুহূর্তের জন্যও থামে না। স্কটের 'দি হার্ট অভ্ মিডলোথিয়্যান' বা বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ঈফি, জেনী, শৈবলিনী বা প্রতাপ রায়ের উপর লেখকের নিয়ন্ত্রণ মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়নি। তারা কে কখন ভালবাসবে বা ভালবাসা প্রত্যাহার করে নেবে, তাও লেখক বলে দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী, ফরাসী, বাংলা উপন্যাসে লেখকের সর্বজ্ঞ ও সর্বগামী ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। নৈতিক উপদেশদানের ও নীতির জন্য বর্ণনার প্রবণতা, চরিত্রকে ডিঙিয়ে পাঠকের সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রয়াস; পক্ষ অবলম্বন—কে ভাল কে মন্দ চরিত্র তা বলে দেওয়া এবং কোন চরিত্রের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি প্রকাশ কর্তব্য তার নির্দেশদান; চরিত্র ব্যাখ্যানের ঝোঁক—কোন একটি বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র অবলম্বনে মানব-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের সাধারণীকরণ। গল্পকথকের প্রাথমিক দায়িত্ব ভুলে গিয়ে উপদেষ্টার ভূমিকা নিতে গত শতকের ঔপন্যাসিকরা ব্যগ্র হয়েছেন। জর্জ এলিঅট, থ্যাকারে, ট্রলোপের উপন্যাস তার পরিচয়স্থল। জর্জ এলিঅট চান হেটি সরেল ও অ্যাডাম বীন-এর প্রতি পাঠক সমবেদনা প্রকাশ করুক। থ্যাকারে চান পাঠক যেন জর্জ অসবোর্ণ-কর্তৃক উপেক্ষিত অ্যামেলিয়ার দুঃখ অবধান করে। ট্রলোপ চান পাঠক যেন রেভারেণ্ড আরাবিনের প্রতি কঠোর না হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চান দেবেন্দ্রনাথের জন্য পাঠকের করুণা, কুন্দনন্দিনীর জন্য সমবেদনা, শৈবলিনীর জন্য ক্ষমা, চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের জন্য শ্রদ্ধা।

চরিত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আর পাঠকের প্রতি নির্দেশ—উনবিংশ শতাব্দীর

উপন্যাস লেখকের এই অভিভাবকোচিত ভূমিকা শেষ হয়ে যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। বঙ্কিমচন্দ্রের আজ্ঞা অনুযায়ী শৈবলিনী আর প্রতাপ পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রত্যাহার করে নিল। এই হুকুমনামা এযুগে অচল। ইংরেজি উপন্যাসে এর চূড়ান্ত উদাহরণ ট্রলোপের উপন্যাস। লেখকের হুকুমে প্রেমের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটেছে। তিনি জানিয়েছেন ঈলীনর বোলড স্লোপকে ভালবাসে না। তিনি জানিয়েছেন আরাবিন ঈলীনরকে ভালবাসে না; আরো জানিয়েছেন আরাবিন, কালক্রমে, ঈলীনরকে ভালবাসে, কিন্তু ঈলীনর তা জানে না। আরাবিন কী করবে না করবে. কাকে ভালবাসবে না বাসবে, তা লেখক ঠিক করে দিয়েছেন; শুধু তাই নয় আরাবিনের মনকে তাঁর ইচ্ছামত চালিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন।

লেখকের এই সর্বগ্রাসী অভিভাবকত্ব থেকে চরিত্রের মুক্তি ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। চরিত্রের এই বন্ধন ও মুক্তির পরিচয় ইংরেজী ও বাংলা উপন্যাস থেকে নেওয়া যাক। উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে চরিত্ররা স্বাধীন নয়, লেখকের অধীন। চরিত্রের উপস্থাপনা নয়, চরিত্রের বিবরণ; আর যদি বা চরিত্র উপস্থাপিত হয়, তা ভিতর থেকে নয়, বাহির থেকে। পাঠকের যতটুকু জানা প্রয়োজন চরিত্রের চিন্তা, অনুভূতি, মোটিফ সম্পর্কে লেখক ততটুকুই আমাদের জানতে দেন; কিন্তু লেখক তা আমাদের অনুভবগম্য করে তোলেন না।

অ্যানটনি ট্রলোপের উপন্যাসের অন্যতম নায়ক আরাবিন-এর হৃদয়ঘটিত সমস্যা সম্পর্কে লেখকের বিবরণই শেষ কথা। লেখকই চরিত্রের অনুভূতি ব্যাখ্যার দায় গ্রহণ করেছেন।

Mr, Arabin had heard from his friend of the probability of Eleonor's marriage with Mr. Slope with amazement, but not with incredulity. It has been said that he was not in love with Eleanor, and up to this period this certainly had heen true. But as soon as he heard that she loved some one else, he began to be very fond of her himself. He did not make up his mind that he wished to have her for his wife; he had never thought of her, and did not now think of her, in connection with himself; but he experienced on inward indefinable feeling of deep regret, a gnawing

sorrow, an unconquerable depression of spirits, and also a species of self-abasement, that he—he Mr. Arabin—had not done something to prevent that other he, that vile he, whom he so thoroughly despised, from carrying off this sweet prize.

['Barchester Towers', 1857

উপন্যাস লেখকের এই সর্বগ্রাসী অভিভাবকত্ব থেকে প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাস মুক্তি পায়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল তার প্রমাণ। নায়ক নায়িকার নিজস্ব মানসিক অবস্থার সঠিক পরিচায়ক নয় তাদের উক্তি-সমূহ, তা আসলে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব চিন্তাপ্রকাশের মাধ্যম মাত্র।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের মূল বিষয় নগেন্দ্রনাথের জীবনে কুন্দের আবির্ভাব ও তার ফল। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রর প্রবল আকর্ষণ, আদর্শ স্বামী নগেন্দ্রর পতন, কুন্দ-নগেন্দ্রর বিবাহ, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, অনুতপ্ত নগেন্দ্রর গৃহত্যাগ, নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন ও কুন্দর বিষপানে আত্মহনন—এ ঘটনাধারার সূত্রপাত কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রর প্রণয়োন্মেষে। এই সূত্রপাত ও তার বিস্তার উপন্যাসের পরিণতির জন্য দায়ী। অথচ এই ব্যাপারটি পাঠকের কাছে সংবাদরূপে বিবৃত, নায়কের নিজস্ব মানসিক অবস্থার বিশ্বস্ত উদ্‌ঘাটন নয়। বন্ধু হরদেব ঘোষালের কাছে লিখিত পত্রে নগেন্দ্রনাথের দুর্বলতার প্রথম সংবাদ বিবৃত—'কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয় এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন, কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবীতে ছাড়া আরো কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্প-সৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।' (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

তারপর ছয়টি পরিচ্ছেদ পরে পাঠক জানতে পারেন নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি অতিশয় আসক্ত। অত্যাশক্তির বিকাশ ও স্তর-পরম্পরাকে নেপথ্যে রাখা হয়েছে। এই কমলমণির কাছে লেখা সূর্যমুখীর পত্রে এই বিবরণ পাওয়া গেল। আবার সেই বিবরণ এবং তা পরোক্ষ, সংবাদ মাত্র। কোনো বিশ্লেষণ নেই, কেবল নেপথ্যে ঘটিত ঘটনার পরিণতির বিবরণ সূর্যমুখীর পত্রে বিবৃত, "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী,… পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।" (একাদশ পরিচ্ছেদ)

মাঝে অতিক্রান্ত হয়েছে ছয়টি পরিচ্ছেদ ও তিনটি বৎসর। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে নেপথ্যে। নগেন্দ্র-কুন্দর প্রেমাসক্তির বিবরণ পাঠককে মেনে নিতে বাধ্য করেছেন লেখক। নায়কের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনো স্তর এখানে উদ্‌ঘটিত হয় নি। লেখকের সর্বময় কর্তৃত্ব কেবল চরিত্র না, পাঠককেও মেনে নিতে হচ্ছে। পরবর্তী (দ্বাদশ) পরিচ্ছেদে ঘটনার আরো অগ্রগতি হয়েছে, নগেন্দ্রনাথ সবকিছুর বিনিময়ে কুন্দলাভের জন্ম উন্মত্ত হয়েছে। কিন্তু তারও কোনো বিশ্লেষণ, উদ্‌ঘাটন নেই। আছে কেবল সংবাদ দুটি বাক্যে। তাও পত্রে। হরদেবের কাছে নগেন্দ্রর পত্র—'আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি এবং কমলমণির কাছে সূর্যমুখীর পত্র—'একবার এসো! কমলমণি। ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো!" অধঃপতিতের আত্মস্বীকৃতি আর বিপন্নার সাহায্য-আবেদন—এর দ্বারাই পরোক্ষে উপন্যাসের মূল ব্যাপার—নগেন্দ্রর আবেগ-তাড়িত উত্তাল জীবনে নব অধ্যায়—বিবৃত। ষোড়শ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রর মুখে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ পাই—'শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম কিন্তু আর পরিলাম না।' "এতদিনের" অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আবেগ সংকটের কেবল সংক্ষিপ্ততম সংবাদ পরিবেশন। অথচ তারই ফলে ট্রাজেডির সূচনা—সূর্যমুখী-নগেন্দ্রর বিরোধ চরমে উপনীত, কুন্দ-নগেন্দ্রর বিবাহ ও সূর্যমুখীর বিদায়।

নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্তর-বিন্যাসে ও তার বিশ্লেষণে লেখকের যেমন উপেক্ষা, তেমনি উপেক্ষা নায়কের প্রায়শ্চিত্তের বিশ্লেষণ ও উদ্‌ঘাটনে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রর প্রেমোন্মেষ যেমন নেপথ্যে সংঘটিত ও আকস্মিক সংবাদ রূপে পরিবেশিত, কুন্দের প্রতি বিকর্ষণও অনুরূপ সংক্ষিপ্ততায় বিবৃত। সূর্যমুখীর অন্তর্ধান (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ), তারপরই কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রর বিকর্ষণ, সকল আসক্তি ও মোহের অবসান (একত্রিশ-বত্রিশ পরিচ্ছেদ)। এখানেও লেখকের সর্বময় কর্তৃত্ব। বস্তুত, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে লেখকের অভিভাবকত্ব থেকে চরিত্রের মুক্তি ঘটে নি। আকর্ষণ-বিকর্ষণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আবেগতাড়না, সংকট—কোনোকিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বা বিস্তার নেই, আছে কেবল বিবৃতি ও সংবাদ-বিবরণ।

কৃষ্ণকান্তের উইলে একই ব্যাপার ঘটেছে। তবু কিছুটা বিস্তার আছে। প্রধান বিষয় রোহিনী-গোবিন্দলালের পারস্পরিক প্রেমসঞ্চার। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মনোভাবের পরিবর্তন বিস্তারিত না হলেও একেবারে

নেপথ্যের ঘটনা নয়। রোহিনীর প্রতি দয়া, সমবেদনা থেকে প্রেমে উত্তরণ—গোবিন্দলালের এই মানসিক পরিবর্তন পাঠকের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র নায়ককে ছেড়ে দেন নি, তার হস্তধৃত রজ্জু শিথিল করেন নি। গোবিন্দলালের স্বগতোক্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে লেখকের বক্তব্য। প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ, সপ্তদশ, পঞ্চবিংশ ষড়বিংশ উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের মানসিক বিপর্যয়ের স্তরগুলি বর্ণিত হয়েছে। "রোহিনীর কথা প্রথমে অতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল।" (পরিচ্ছেদ ২৫) "রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন।" পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।…গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেন না, রূপ তৃষ্ণা অনেকদিন হইতে তাঁর হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে।" (পরিচ্ছেদ ২৬) "গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।"

(পরিচ্ছেদ ২৯/প্রথম খণ্ড)

এইসব অংশে লেখকেরই কর্তৃত্ব, চরিত্র তাঁর অধীন। চরিত্রের পরিবর্তন বিবৃত, বিশ্লেষিত নয়, সংবাদরূপে পরিবেশিত, উদ্‌ঘাটিত নয়।

গোবিন্দলালের মানসিক পরিণতি তবু কিছুটা উদ্‌ঘাটিত, কিন্তু রোহিণীর পরিবর্তন আকস্মিক অতর্কিত, বিশ্লেষণ ও বিস্তার বিহীন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। প্রথম খণ্ডের অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ তার প্রমাণ। রোহিণীর মনে সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব যে লেখক-নিয়ন্ত্রিত, তা স্পষ্ট। নবম পরিচ্ছেদে রোহিণীর আকস্মিক পরিবর্তন।

"কুমতি হউক, সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্, পুরাতন কথা তুলিয়া আমার কাজ নাই। রোহিনী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।"

রোহিণীর এই আকস্মিক অতর্কিত মানসিক পরিবর্তনের কোন কারণ

নির্দেশিত হয় নি, এখানে লেখক-বিধাতা তাঁর ইচ্ছামত চরিত্র ও ঘটনাকে চালিয়েছেন।

গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি অন্যায়, একথা রোহিণী জানে জানে মাত্র। তার মৃত্যুকামনায় রোহিণীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত নয়, লেখকের সর্বময় কর্তৃত্বাভিমানই প্রকাশিত (প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ), তাঁরই নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম রোহিণীর স্বগত চিন্তা। গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি রোহিণী যত্নে মনে লুকিয়ে রেখেছিল। 'লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।' এই মৃত্যুকামনা জীবনাসক্তি তথা প্রেমশক্তির অপর দিক। এখানে জীবনে যে স্বীকৃতি তার সম্ভাবনাকে লেখক বিনষ্ট করেছেন তাঁর সর্বময় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। পরবর্তী (দ্বিতীয়) খণ্ডে তাঁর পদে পদে অযাচিত উপস্থিতি ও অভিভাবকোচিত নিয়ন্ত্রণ চরিত্রকে স্বাভাবিক বিকাশের পথে যেতে দেয় নি।

রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের বিকর্ষণ, সমস্ত মোহের অবসান—উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে—আকস্মিক, পূর্বপর বিশ্লেষণবর্জিত, ব্যাখ্যাবিহীন। পঞ্চমপরিচ্ছেদে চিত্রানদীতীরে প্রসাদপুরের পরিত্যক্ত নীলকুঠি অট্টালিকায় বাসকারী রোহিণী ও গোবিন্দলালের প্রেমে ভাঁটা পড়েছে। ইতঃমধ্যে দুটি বৎসর অতিক্রান্ত। রোহিনী-হত্যার প্রাথমিক আয়োজনের মধ্যে দ্রুততা আছে, হত্যাকাণ্ডে আছে আকস্মিকতা। নিশাকরকে দেখি রোহিণীর ব্যাকুলতা ও মৃগয়াপ্রবৃত্তির কোনো ব্যাখ্যা নেই। রোহিণী-হত্যায় গোবিন্দলালের স্থির সিদ্ধান্ত তার চরিত্রের পরিপন্থী। আসলে এ দুই ক্ষেত্রেই উপন্যাসলেখকের কর্তৃত্ব দেখা গেছে, চরিত্র তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। সুতরাং, স্বীকার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে চরিত্রের মুক্তি ঘটে নি। বিষবৃক্ষের প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথমখণ্ডে যে অব্‌জেকটিভিটি ছিল, তা পরবর্তী অংশে বর্জিত হয়েছে। উপন্যাসলেখকের কর্তৃত্ব তার জন্য দায়ী।

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এর মাঝে আছে রজনী উপন্যাস। পাত্র-পাত্রীদের মুখে কাহিনী বিবৃত, একই ঘটনাকে একাধিক চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমখণ্ডে রজনীর কথায় কেবল ঘটনাবিবৃতি নয়, চরিত্রের মানসিক অবস্থার বিচরণও আছে। পরবর্তী খণ্ড থেকে ঘটনার

বিবরণই প্রাধান্য পেয়েছে, চরিত্রগুলি নাম বিশ্লেষণ অপেক্ষা ঘটনার বিবরণদানে বেশি উৎসাহী হয়েছে। এ উপন্যাসেও কাহিনীর মধ্যে লেখকের অযাচিত উপস্থিতি ও অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেইসঙ্গে আছে অলৌকিক উপাদানের ব্যবহার, যা কৃষ্ণকান্তের উইলে নেই, কিন্তু বিষবৃক্ষে ছিল। রজনী'র মনস্তত্ত্ব আসলে লেখকের ও সন্ন্যাসীর কীর্তি।

চরিত্রের মুক্তি ঘটেনি বঙ্কিম-উপন্যাসে। ঘটেছে রবীন্দ্র-উপন্যাসে।

চোখের বালি-তে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা করলেন। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে যা সম্ভব হয় নি, তা চোখের বালি-তে হয়েছে। বিহারী বিনোদিনীর বাস্তবতার আত্ম-উদ্ঘাটন ও আত্ম-আবিষ্কারে বাংলা উপন্যাসে মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজে উঠেছে। নারীপ্রেমের নবমহিমার স্বীকৃতি, চরিত্রের আত্মোদ্ঘাটন ও বাস্তব বিশ্লেষণ চোখের বালি উপন্যাসকে দিয়েছে নবমর্যাদা। আশা ভ্রমর নয়, বিনোদিনী নয় কুন্দনন্দিনী। মহেন্দ্র হতে পারে নগেন্দ্রনাথের উত্তরসূরী, কিন্তু বিহারী সম্পূর্ণ নোতুন, বঙ্কিম উপন্যাসে তার দোসর নেই। বিনোদিনী আর বিহারীকে নিয়েই চোখের বালি উপন্যাস, মহেন্দ্র বা আশা লেখকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু নয়। মহেন্দ্র ও আশাকে বিনোদিনী যেমন খুশি ব্যবহার করেছে, তার লক্ষ্য বিহারী। প্রথমে ছলনা, তারপর ক্রমান্বয়ে প্রলোভন, চাতুরি, মুগ্ধ আত্মনিবেদন, বিবশ আত্মসমর্পণ, পূজা আরতির মধ্য দিয়ে বিনোদিনীর প্রেম শুদ্ধতা পেয়েছে। অপরদিকে, যে বিহারী ছিল মহেন্দ্রের অনুগত বন্ধু, প্রেমের আঘাতে সেই বিহারীর পুনর্জন্ম হয়েছে। সে কেবল বিনোদিনীকে দেখেনি, সেই সঙ্গে নিজেকেও আবিষ্কার করেছে। যে রাতে চুম্বনোদ্যত বিনোদিনীকে বিহারী প্রত্যাখ্যান করল, সে রাতেই বিহারীর নবজন্ম হল (পরিচ্ছেদ ৩৫)। তারপর থেকেই বিহারীর পরিবর্তন। বহির্মুখী চরিত্র হয়ে উঠল অন্তর্মুখী চরিত্র। বিহারী নিজের কাছ থেকে পালাতে চেয়েছে, পারে নি ; স্মৃতিলোকে বিনোদিনীকে ফিরাতে পারেনি (পরিচ্ছেদ ৩৭)। বিনোদিনীর প্রেম বিহারীকে আত্মস্থ করেছে, আত্ম-আবিষ্কারে প্রবৃত্ত করেছে, শেষপর্যন্ত এই প্রেমকে মেনে নিয়ে বিহারীর নবজন্ম হয়েছে। উপন্যাসের শেষাংশে বিহারী বিনোদিনী হিসাব-নিকাশে প্রবৃত্ত হয়েছে (পরিচ্ছেদ ৫২)। এই হিসাব-নিকাশ তাদেরই ব্যাপার, এখানে নেই লেখকের অযাচিত উপস্থিতি, অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ, সর্বময় কর্তৃত্ব। বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে চোখের-বালিতে, চরিত্রের মুক্তি সূচনা দেখা গেছে।

চোখের বালিতে যে চরিত্রনির্মাণপদ্ধতির সূচনা, তার পরিণতি গোরা উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রকে অস্তিত্বের সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি চরিত্রের বিশেষত্ব বলতে বুঝেছেন, কোনো পূর্ববর্ণিত প্রাক্‌নির্দিষ্ট স্বভাব নয়, চরিত্রের ব্যক্তিবিশেষত্ব (ইন্‌ডিভিজুয়ালিটি)। গোরা উপন্যাস একই সঙ্গে ভারত ভাবনার রূপায়ণ ও জীবনধর্মী কাহিনী। গোরা ভেবেছিল স্বদেশপ্রেমেই জীবনের সার্থকতা। আর স্বদেশ সাধনায় ব্যক্তি স্বভাবের বিসর্জন কাম্য। তাতে অনেক ঠেকে মানতে হয়েছে, ব্যক্তিস্বভাবের বিসর্জনে নয়, প্রতিষ্ঠায় জীবনের সার্থকতা। গোরা জেনেছে রোমাণ্টিক স্বদেশ-প্রেম ও রোমাণ্টিক ব্যক্তিপ্রেম, এ দুয়ের বিরোধ নেই। তারা পরস্পরের পরিপূরক। ললিতার প্রতি বিনয়ের প্রেমকে গোরা একদিন মানতে চায় নি (পরিচ্ছেদ ১৫), কিন্তু হেমন্তরাতে গঙ্গাতীরে (পরিচ্ছেদ ২১) বা কারাবাসান্তে ভোরে ছাদে (পরিচ্ছেদ ৬৯) গোরার চিত্ত বারবার সুচরিতার প্রতি ধাবিত হয়েছে। বিনয়ের যে উক্তিকে গোরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আজ তাকেই গোরা জেনে নিয়েছে—কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করে এক অনির্বাচনীয় অসামান্যতা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই গোরা সারাদিনের আত্মচিন্তার শেষে সিদ্ধান্ত করে—'যে আমারই তাহাকে আমি লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব' (পরিচ্ছেদ ৬৯)। এই উপলব্ধিতেই গোরার নবজন্ম।

রবীন্দ্রনাথ এখানেই ক্ষান্ত হন নি। আরো এগিয়েছেন, বাস্তবতা ও রোমাণ্টিক আদর্শবাদ পেরিয়ে দিতে চেয়েছেন অন্তঃবাস্তবতা (ইনার রিয়ালিটি)।

ঘটনা বা কাহিনী-নির্ভরতা পরিত্যাগ করে বাংলা উপন্যাস চরিত্র-প্রধান হয়ে উঠেছে এই শতাব্দীর সূচনামুহূর্তে (চোখের বালি)। সেখানে থেমে না থেকে আরো এগিয়েছে। গোরা পরবর্তী যে রবীন্দ্র-উপন্যাসে চরিত্রের যথার্থ মুক্তি ঘটেছে তার নাম 'চতুরঙ্গ'। উপন্যাসের বিবর্তনে, চরিত্রের মুক্তিসাধনে চতুরঙ্গ-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এখানেই প্রথম পাঠক জেনেছে, চরিত্রের বিবর্তন বলতে বুঝায় তার নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন, ওরফে চরিত্রের জন্মান্তর। 'চতুরঙ্গ' একটি শচীশের কাহিনী নয়, নানা শচীশের কাহিনী। শচীশের অনেক জন্ম অনেক মৃত্যু ঘটেছে। শচীশ জীবনের একটি ছক আশ্রয় করেছে। অনতিবিলম্বেই তাকে ভেঙে

ফেলে নোতুন একটি ছক আশ্রয় করেছে এবং পরমুহূর্তেই তাকে পরিত্যাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

চতুরঙ্গ উপন্যাসের প্রবক্তা শ্রীবিলাস জানিয়েছে, এ দুই চরিত্রের (শচীশ, দামিনী) অভিনয় আত্মগত। বাংলা উপন্যাসে চরিত্রে এই প্রথমবার আত্মানুসন্ধানে, আত্মসমীক্ষায় ব্যাপৃত হল। নিজের মুখোমুখি হল। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, বহির্জগৎ থেকে ভিতর-দেহলিতে প্রত্যাবর্তনের প্রথম শিল্পরূপ চতুরঙ্গ। চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ঘটেছে 'চতুরঙ্গ'এ। শচীশ নিজেকে বহির্জগৎ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সে নিজের সঙ্গেই কথা বলেছে—'ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব-চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।"

এই শচীশ সম্পূর্ণ নোতুন, সে দামিনীর নয়, শ্রীবিলাসের নয়, বাংলা উপন্যাসের পরিচিত চরিত্র নয়। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার প্রথাসিদ্ধরীতি ও শৃঙ্খলাকে ভেঙেছেন। পাঠকের উপন্যাস পাঠ সংস্কারকে আঘাত করেছেন।

চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে 'ইনার-রিয়ালিটি'র সন্ধান, আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যে চরিত্রের উত্তরণ, 'চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন, চরিত্রের ব্যক্তিবিশেষত্বের সর্বময় প্রতিষ্ঠা প্রতিদিনের নির্মিত ও নির্ণীয়মাণ চরিত্রের উপর অন্ধকার অবচেতনার প্রভাব, অ-সম্পূর্ণ অনির্ধারিত চরিত্রের নিরন্তর পূর্ণতা অন্বেষণ—সব কিছুরই উপস্থিতি আছে চতুরঙ্গে। এখানেই চরিত্রের যথার্থ মুক্তি ঘটেছে।

সুশীল রায়

শোকসভা

(একাঙ্ক নাটক)

পাত্রপাত্রী

আচার্য
একটি মেয়ে : গায়িকা
একটি ছেলে : বিনোদবন্ধু বিশ্বাস
অবিনাশ : বৃদ্ধ
কুমারী অনীতা : মৃত তেজেন্দ্রভূষণের একান্ত সচিব
বীরেশ্বর
মহাবীর
শ্যামসুন্দর
অবনী
রমেন
আর্দালী
এবং সভায় সমবেত শোকার্তবৃন্দ

[মঞ্চে দর্শকদের ডানদিকে একজন স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ পুরুষের চিত্র। সাদা চাদরে ঢাকা অল্পউঁচু টেবিলের উপরে চিত্রটি রাখা। চিত্রের ফ্রেম ঘিরে ফুলের মালা। চিত্রের দুইপাশে দুটি জলন্ত মোমবাতি। এর কাছেই সামান্য-উঁচু বেদীর ধরণের বসার জায়গা। তার পাশে একটি তানপুরা দাঁড় করানো। সাদা ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ঝাড়। ধুপদানি থেকে ধুপের ধোঁয়া উঠছে।

প্রযোজকের পছন্দ অনুসারে মঞ্চটি ফুল দিয়ে আরও পরিচ্ছন্ন করে সাজানো যেতে পারে।

মঞ্চ জুড়ে শুভ্র ফরাস। তার উপরে শোকার্তেরা ব'সে। দর্শকদের দিকে কেউ পিছন ফিরে, কেউ পাশ ফিরে আছেন। কে বেশি শোকার্ত তার পরিচয় দেবার জন্যে প্রত্যেকের মধ্যে মৌন প্রতিযোগিতা। দর্শকরা যেন এই প্রতিযোগিতা বুঝতে পারেন শোকার্তেরা তার চেষ্টা করবেন।

পর্দা উঠল। আধ মিনিট সব চুপচাপ।

আরও দু-একজন শোকার্ত এসে আসন নেবেন। মহিলাও দু-চারজন থাকতে পারেন। যাঁরা এসে পৌঁছচ্ছেন তাঁদের বসার জায়গা দেবার জন্য কেউ সরে বসবেন, কেউ ঘুরে বসবেন। স্তব্ধতা যাতে ভেঙে না যায় সেজন্যে সকলে সতর্ক। মাথা হেলিয়ে ফিসফাস কথা কিছুক্ষণ চলতে পারে। শোকের আসরের মর্যাদা রক্ষার জন্য সকলে সচেষ্ট।

বাঁ দিক থেকে আচার্যের প্রবেশ—তাঁর পরনে বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী। সমবেত সকলকে ঈষৎ অভিবাদন ক'রে বেদীতে আসন গ্রহণ। জোড়াসন হয়ে তিনি বসবেন। ধ্যানস্থ হবেন।

একটু পরে আচার্য যে পথ দিয়ে এসেছেন সেই পথ দিয়ে বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ের প্রবেশ ; তানপুরার কাছে তার আসন গ্রহণ। তানপুরা কোলে নিয়ে তার তারে আঙুলের স্পর্শ। নিস্তব্ধ মঞ্চে এই প্রথম শব্দ।

সকলে নড়ে-চড়ে বসল। কেউ-কেউ এদিক-ওদিক তাকাল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল অনেকে।

আচার্য ধ্যানস্থই আছেন। এক হাত তানপুরায় এক হাত কোলে রেখে মেয়েটি মাথা নীচু ক'রে শোকার্তদের মত ব'সে।

দু'বার গলা পরিষ্কার করে নিলেন আচার্য। সেই শব্দে অনেকেরই গলা খুশখুশ ক'রে উঠল। সমবেত কাশির শব্দ।]

আচার্য॥ যিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন, মৃত্যুও তাঁরই দেওয়া, মৃত্যুকে তাই

ভয় কি। জন্ম যেমন জীবনের নিয়ম, মৃত্যুও তাই। মৃত্যুকে আমরা ডরাই না। কবি বলেছেন—

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

আমরা তাই নির্ভীক, আমরা ভয়হীন। মৃত্যুকে আমরা বরণ করি অভয় চিত্তে। কিন্তু দুঃখ হয়। দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা মানুষ, অনুভূতি আছে আমাদের। তাই আমাদের এই দুঃখ, তাই আমাদের এই শোক। কথায় বলে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।
তোমারি দু নয়নে তোমারি শোকবারি
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।

কিন্তু, কিন্তু আমরা হাহাকার করার জন্যে এখানে মিলিত হইনি, আমরা মিলিত হয়েছি নীরব শোকবারি নিবেদন করার জন্য। এক মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। হৃদয় দিয়ে সেই বিয়োগবেদনা অনুভব করার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত। জগদীশ্বর আমাদের দিয়েছেন প্রাণ, সেই প্রাণে দিয়েছেন অনুভব করার শক্তি। আমরা তাই অনুভব করছি এক অসীম ফাঁকা : একজনের তিরোধানে জগতের কত বিশাল স্থান যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে। যিনি আর নেই, তাঁকে আমরা জানতাম কতটুকু? আজ তাঁকে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করার জন্যই আমরা এখানে সম্মিলিত—

তমীশ্বরণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাম্ পরমঞ্চ দৈবতম্
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাস দোং ভুবনে শমীড্যম্।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম-মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম-দেবতা, সকল পতির যিনি পরম-পতি, সেই প্রকাশবান স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জানার চেষ্টা করি। (একটু থেমে, মেয়েটির দিকে চেয়ে) সংগীত।

[মেয়েটি আচার্যের দিকে একটু চাইল, গলা শব্দ ক'রে তানপুরায় ঝংকার দিল]

গান

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসালো নন্দনে।

কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি নব ঘন চন্দনে ॥
কবে তোমাতে আমি হয়ে, আমাতে তুমি তারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা।
পরান শিহরিবে, আকুল হবে মন,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে ॥
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
পরান কাঁদিবে না, চরণ টলিবে না,
চরণ টলিবে না, পরান গলিবে না,
কাহার আকুল ক্রন্দনে ॥

[গান থামল। আচার্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন]

আচার্য ॥ অপূর্ব। তৃষ্ণার মরু পার হয়ে তৃষ্ণাতীতের দেশে যাত্রা করেছেন এক মহাপ্রাণ। সে দেশে ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই ঈর্ষা নেই, দ্বেষ নেই। সংগীতে যে সুধা আছে, সেই সুধা আছে সেই দেশে। মৃত্যু তাই সুধাময়। এ দেশে এসেছিলাম, এখানকার কাজ শেষ করে চলে যেতে হবে এক আনন্দময় পরিমণ্ডলে—আনন্দ-নিকেতনে। তিনি চলে গিয়েছেন, কিন্তু মুছে যান নি তিনি। যা অবিনশ্বর তার বিনাশ নেই। কিছুই ধ্বংস হয় না—বৈজ্ঞানিকদের এ যুক্তি স্বীকার করতে কোনো অসুবিধে দেখিনে, দার্শনিকদের এ তত্ত্ব অবিশ্বাস করবে কোন্ অবিশ্বাসী? যা সত্য তার কোনো প্রতিবাদ নেই—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র-সকল পরিত্যাগ ক'রে অপর নূতন বস্ত্র-সকল গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর-সকল পরিত্যাগ ক'রে অন্য নূতন শরীর-সকল প্রাপ্ত হয়। (একটু থেমে, পাশে তাকিয়ে) জীবনী।

[আচার্য চিত্রটির দিকে চোখ রাখলেন, তাই দেখে মেয়েটি চিত্রের দিকে চোখ রাখল। সকলে চিত্রের দিকে তাকাল। চিত্রের মধ্য থেকে দুটো চোখ সকলের দিকে চেয়ে রইল।]

আচার্য ॥ জীবনে যত পূজা হল না সারা! (মস্তক আন্দোলন)

[পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। রুক্ষ চুল, গিলে-করা পাঞ্জাবির হাত সামান্য গোটানো। মৃতের ছবিটা আড়াল করে দাঁড়াবে, তৎক্ষণাৎ আচার্য তাকে সরে দাঁড়াতে ইশারা করবেন। সরে দাঁড়াতে গিয়ে গাইয়ে মেয়েটির পা মাড়িয়ে দিয়ে—]

ছেলেটি ॥ (মেয়েটিকে) সর্‌রি! (সবার দিকে চেয়ে) আমার উপর এক কঠিন ভার পড়েছে। আমার উপর ভার পড়েছে তেজেন্দ্রভূষণ অধিকারীর জীবনী বলার জন্যে। আমার উপর এ ভার পড়েছে, কেননা আমি একটু লিখি-টিখি। কিন্তু এই জীবনী বলার অধিকারী আমি কিনা—একথা নিয়ে বিনয় প্রকাশ ক'রে আপনাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করার ইচ্ছে আমার নেই। (একটু থেমে) কতটুকু জানি? কতটুকু জানা সম্ভব? সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে নুড়ি কুড়োবার মতই আমাদের অবস্থা। ঐ বিরাট পুরুষকে জানবার শক্তি আমাদের কোথায়? অকপটে আমি স্বীকার করব, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই আমি জানিনে, জানা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু আমার উপর যখন এ ভার পড়ল, ভার পড়ার কারণ আপনাদের আমি বলেছি—আমি একটু লিখি-টিখি। সামান্য অভ্যাসে ভাষার উপর যেটুকু দখল আমার হয়েছে, তারই ভরসায় আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। তেজেন্দ্রভূষণ অধিকারী—এই-যে নাম, এটা একটা সামান্য নাম না। ঐ নামের ভিতরেই মানুষটি লুকিয়ে আছেন, তাঁর চরিত্র তাঁর ঐ নামের ভিতরেই। তেজেন্দ্রভূষণ অধিকারী —নামটার ভিতর যে তেজ আছে, যে ভূষণ আছে, সেই অধিকারেই তিনি অধিকারী। আমি তাঁর এই জীবনী লেখার আগে অনেক ভেবেছি, কি-কি কথা বলা দরকার সে সম্বন্ধে চিন্তা কম করিনি। যতটুকু উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার তাও খুঁজে দেখেছি। হয়তো অনেক উপকরণ পাইনি, তাতে কিছু যায়-আসে না। তা যে পাইনি সেটা আমাদেরই ত্রুটি, আমাদেরই অক্ষমতা। সুতরাং আমি তাঁকে জানতেম না ব'লে আপনাদের তাঁকে জানবার কোনো অসুবিধে হবে না। তেজেন্দ্রভূষণের জীবন একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাসের নায়কের জীবনেরই মত। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন। ভগবান তাঁকে সৃষ্টি করেছেন অবশ্যই। আপনারা দয়া ক'রে হাততালি দেবেন না, কিন্তু আমি হাততালি পাবার মতই একটা কথা বলব। কথাটা এই—ভগবান তো

সকলকেই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তেজেন্দ্রভূষণ তো হল না সকলে। (একটু উচ্চগলায়) ভগবান তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তেজেন্দ্রভূষণ নিজেকে নিজে নির্মাণ করেছিলেন।

[একটা বেশ বড় কথা বলেছে, সেজন্যে ঈষৎ স্ফীতি। কেউ-কেউ মাথা নেড়ে তারিফ জানাল]

ছেলেটি॥ হ্যাঁ। কথাটা মিথ্যে না। তিনি নিজেকে নিজে নির্মাণ করেছিলেন। এ কাজ সহজ কাজ না। আমরা সামান্য একটা বাড়ি নির্মাণ করতে পারিনে, কিন্তু তেজেন্দ্রভূষণ যা করেছেন তাকে অসাধ্য-সাধনই বলব। মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি আমাদের মায়া ত্যাগ ক'রে (আচার্যের দিকে চেয়ে) ঈশ্বরানুশাসনে মরলোক থেকে অমরলোকে প্রস্থান করলেন। সেজন্যে আমরা আক্ষেপ করব না। আমরা কেউই চিরকাল বেঁচে থাকবার জন্যে এ দেশে আসি নে। আমরা তো সকলেই রেল গাড়ির যাত্রীর মতন। নিজের স্টেশনে পৌঁছলে নেমে পড়ি। তেজেন্দ্রভূষণ তাঁর ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন বলেই নেমে পড়েছেন। সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। দুঃখ কেবল আমাদের এই যে, তিনি তাঁর আরব্ধ অনেক কাজ সমাপ্ত করে, মানে শেষ করে, যেতে পারলেন না। (একটু থেমে) আর একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করব, আপনাদের ধৈর্যের উপর আর জুলুম করার ইচ্ছে আমাদের নেই। আমার শেষ কথা এই যে, তিনি একজন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন—এটা তাঁর জীবিকা। কিন্তু তাঁর জীবন ছিল ভিন্ন সুরে বাঁধা, যাকে আমরা সাহিত্য বলি, সংগীত বলি, চিত্রকলা বলি, সেসবের প্রতি তাঁর মমতা ছিল অসীম। জীবনে সময় পেলেন না, সময় যদি পেতেন তাহলে তার পরিচয় তিনি অবশ্যই দিয়ে যেতে পারতেন। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি তাঁর লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

[ছেলেটি আসরে গিয়ে বসল]

আচার্য॥ আপনারা যাঁর জীবনকথা শুনলেন তিনি একজন পরম বিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। জীবনে যিনি ছিলেন জীবিত পুরুষ, মৃত্যুতে তিনিই হলেন অমৃতপুরুষ। যাঁর কৃপায় মানুষের এই রূপান্তর তাঁকে আমরা নমস্কার করি—

এ মম্মাজায়তে প্রাণো মনঃ সর্বোন্দ্রিয়াণিচ
খং বায়ুর্জোতিরাগঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।

ইহা থেকে প্রাণ মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। (একটু থেমে) আপনাদের মধ্যের আর-কারও যদি প্রণিপাত নিবেদন করার ইচ্ছে থাকে তাহলে করুন।

[আসরে চাপা গুঞ্জন। পরস্পরের দিকে সকলে তাকাল]

বীরেশ্বর ॥ বলো, মহাবীর বলো, তুমি কিছু বলবে মনে হচ্ছে।

মহাবীর ॥ না, না, না। আমি আর কি বলব। কিছুই বলার নেই আমার। আমি শুনতে এসেছি। কিছু শুনব, কিছু জানব।

বীরেশ্বর ॥ কিছু অন্তত বললে পারতে!

মহাবীর ॥ কিছু অন্তত কেন, বলতে হলে অনেক কথাই তো বলতে হয়। কিন্তু সেসব কথা সভায় বসে বলার কথা নয়।

বীরেশ্বর ॥ নয় কেন। আমরা সবাই এসেছি, যদি নতুন কথা কিছু শুনতে পারি, জানতে পারি, তবে সেইটেই আমাদের লাভ।

মহাবীর ॥ তার চেয়ে তুমিই কিছু বলো।

বীরেশ্বর ॥ আমি? তবেই হয়েছে। আমি একদম বলতে পারি নে।

আচার্য ॥ (বিব্রত) তা তো ঠিকই। বলতে না পারলে বলা ঠিক না।

বীরেশ্বর ॥ অবিনাশবাবু তবে কিছু বলুন।

আচার্য ॥ বলুন।

[আবিনাশবাবু কেবল এই প্রস্তাবের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর নাম শোনা মাত্র উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ মানুষ, দুঃস্থও বটেন। শীর্ণকায়। গলায় মাফলারের মতন চাদর জড়ানো।]

অবিনাশ ॥ (রাজনৈতিক বক্তার ভঙ্গিতে উচ্চগলায়) বক্তৃতা দেওয়া আমার পেশা নয়। মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, বক্তৃতা দেওয়া আমার পেশা নয়। কিন্তু কিছু বলার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে দুটিমাত্র কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি। (দৃপ্ত গলায়, হাত তুলে) জাগো, জাগো। জগজ্জননি, জাগো। তোমার সুযোগ্য সন্তান তোমার কোল আঁধার ক'রে এই-যে চলে গেল, এজন্যে শোকে অমন মুহ্যমান কেন। জাগো জগজ্জননি! বলি, হ্যাঁ, বীর বটে। তেজেন্দ্রভূষণের তেজ আছে। ঐ ছোকরা ঠিক কথাই বলে গেছে—তাঁর তেজ ছিল, ভূষণ ছিল, সেই অধিকারেই তিনি ছিলেন অধিকারী। তেজেন্দ্রভূষণ অধিকারী। চমৎকার নাম। পিতামাতার

দিব্যদৃষ্টি ছিল। তা না হলে ঐ নাম তাঁরা রাখলেন কী ক'রে? যেমন তেজ, তেমনি বিনয়; যেমন আয়, তেমনি ব্যয়। কেউ-কেউ বলত তিনি তাঁর কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করতেন, তিনি নিষ্ঠুরপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু ওটা ভুল কথা। ওটা অত্যাচার নয়, ওটা তেজ, ওটা বিক্রম। আর, অমন বিত্তশালী লোক, কিন্তু কী বিনয়। সর্বদাই বলতেন আমি ফকির। পকেট আমার সব সময়ই ফাঁকা। কোনো টাকাই আমার নয়, সবই পাঁচ জনের। ব্যয় করতেন খুব। এক-একটা পার্টি দিয়েছেন, শুনেছি পাঁচ-দশ হাজার টাকা নেমে গিয়েছে। বুদ্ধিমানও ছিলেন খুব, ওর তিনগুণ টাকা তিনি ফন্দী ক'রে তুলেও নিতেন। সে সব খুঁটিনাটি কথার দরকার এখানে নেই। দয়ার অবতার ছিলেন। আমি জানি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা উঠেছে তিনি দিয়ে দিয়েছেন ইয়েকে (গলা সাফ ক'রে) কি বলে গিয়ে—ভিখিরিকে। কিন্তু ভিখিরিকে ভিখিরি জ্ঞান তিনি কখনো করেন নি, তিনি তাদের কখনো ভিখিরি বলতেন না, বলতেন—বেগার। এমন মহত্ত্ব ছিল যাঁর চরিত্রে তাঁকে আমরা কেবল নমস্কার করব কেন। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তবু আমি তাঁকে প্রণাম করি। (আত্মতৃপ্তিতে চোখ-মুখ উদ্ভাসিত) হ্যাঁ, প্রণাম করি আমি। আমার কথা এখানেই শেষ করলাম। কই, এসো, এসো হে শ্যামসুন্দর, তুমি কিছু বলবে বলছিলে, উঠে এসো।

[অবিনাশের আসন গ্রহণ]

আচার্য ॥ সুন্দর, সুন্দর! কোথায়? আসুন শ্যামসুন্দরবাবু!

[বছর-চল্লিশ বয়স, জোয়ান শরীর। মাথার চুল পালোয়ানি ছাঁটে ছাঁটা। অমন শরীর, কিন্তু খুব লাজুক।

শ্যামসুন্দর ॥ (মিনমিনে গলায়) তেজেন্দ্রভূষণ ছিলেন এঞ্জিনিয়র। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে, বিদেশে থাকে। মেম বিয়ে করেছে। দেশে আর ফিরবে না। বাবার সঙ্গে তার নাকি বনে না। তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়া নিয়ে কত লোকে যা-তা বলেছে। নিন্দুকেরা অমন বলেই। হিংসুকরা অমন করেই। কিন্তু আজ তিনি নেই। পড়াশুনা তিনি বেশি করেন নি। এঞ্জিনিয়ারও হন নি। কিন্তু, আমার ঐ বন্ধুটি সত্যি কথাটি বলে গেছেন। নিজেকে নিজে নির্মাণ করেছিলেন

তেজেন্দ্রভূষণ। কী বিরাট কারবার। ভাবছি, এসব এখন দেখবে কে! ঐ একটা লোক কতজন মানুষকে দাপটে রাখতে পেরেছিলেন, আশ্চর্য হতে হয়। আমরা তাঁকে নমস্কার করি। টাকার জন্যে করেন নি হেন কাজ নেই। কিন্তু কী উদার ছিলেন তিনি, কী মহৎ ছিলেন! মন কত কোমল ছিল। সংগীতে সাহিত্যে রুচি ছিল। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে কেউ নেই। বৌ নেই, ছেলে নেই। এ কথা ভাবলে খুব দুঃখ হয়। শত শত লোক যাঁর কারবারে খাটছে, তাদের মধ্যের কেউ নেই তাঁর পাশে! কিন্তু তাঁর বন্ধু তাঁর সহায় তাঁর সম্বল—সবই যে আছে, তার প্রমাণ এই সভা—এই শোকসভায় আমরা সকলে এসে জুটেছি।

[আসন গ্রহণ]

আচার্য॥ সাধু সাধু সাধু! এই-যে উনি বলে গেলেন কেউ ছিল না তাঁর কাছে, কেউ ছিল না তাঁর পাশে—এতে বিশেষত্ব কোথায়। এই তো নিয়ম, এই তো বিধি—

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রণীয়তে
একোনুভুংক্তে পুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতম্।

মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ভোগ করে।

[সকলের মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্য, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত]

মহাবীর॥ সাধু সাধু সাধু! চমৎকার এই ব্যাখ্যা। একাকী স্বীয় দুষ্কৃতি ভোগ করে।

[তিরস্কারের ভঙ্গিতে মহাবীরের দিকে বীরেশ্বর তাকাল]

আচার্য॥ (ঈষৎ হাস্য, চতুর্দিকে নিরীক্ষণ) আর যদি কেউ কিছু বলেন।

[সভাস্থ সকলের পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি কিন্তু কেউ আর যেন কিছু বলতে রাজি না।]

শ্যামসুন্দর॥ আমরা তো যে যেটুকু পারি বললেম। মিস্ অনীতা, মানে কুমারী অনীতা দেবী, কিছু যদি বলেন তবে বেশ ভালো হয়। উনি তেজেন্দ্রভূষণের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন, মানে গিয়ে একান্ত সচিব—

মহাবীর॥ ঠিক, ঠিক।

বীরেশ্বর॥ অনেক প্রাইভেট কথা তবে উনি বলতে পারবেন। হ্যাঁ, উনি কিছু বললে খুব ভালো হবে।

[খুব উজ্জল সাজে সজ্জিতা হয়ে এসেছেন মিস্ অনীতা। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে।]

শ্যামসুন্দর॥ (একটু ঝুঁকে) তবে বলুন আপনি!

অবিনাশ॥ বলো-না হে, লজ্জা কি! আমরা তো কিছু না জেনে কত কথা বললাম। তোমার তো অনেক-কিছুই জানা। সেসব আমরা একটু শুনি!

মহাবীর॥ বলুন, মিস্—

বীরেশ্বর॥ প্রকাশ্য সভায় যতটুকু বলা চলে, সেইটুকুই অন্তত বলুন।

[কুমারী অনীতা উঠে দাঁড়ালেন। আসর ঝলমল ক'রে উঠল]

আচার্য॥ হ্যাঁ। বলুন আপনি।

অনীতা॥ মাননীয় আচার্য, সমবেত বন্ধুগণ। আপনাদের আদেশ আমি অমান্য করি, এমন সাধ্য আমার নেই। আমি নারী। তেজেন্দ্রভূষণ ছিলেন পুরুষ। কোন্ নারী কোন্ পুরুষকে চিনেছে? কোন্ পুরুষই-বা চিনেছে কোন্ নারীকে। চেনা বড় কঠিন কাজ। আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছি পাঁচ বছর। অনেকের ধারণা তাঁর অনেক প্রাইভেট খবর আমি রাখি। কিন্তু এটা কি সম্ভব? কোনো স্ত্রীলোকের কাছে কি কোনো পুরুষ কোনো দিনও তার প্রাইভেট কথা বলে? বলে না। গোপন কথা যাকে বলা হয় তা গোপনই থেকে যায়। কিন্তু সেটা অন্য কথা। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলি। এ সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ, অতি নিবিড়, অতি প্রগাঢ়। তিনি বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁর স্নেহও ছিল প্রবল। তেজেন্দ্রভূষণ একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু সে কথা অন্য। সব সময় তিনি আক্ষেপ করতেন, তিনি কোনো দিন কারো ভালোবাসা পাননি। শুনে কষ্ট হত, মায়া হত। অনেক সময় তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠত দেখেছি। তাঁর মন ছিল এমনি নরম। খুব কাজের লোক ছিলেন তিনি। অনেকটা বলা যায় কাজ-পাগলা। যখন-তখন ডেকে পাঠাতেন আমাকে। কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে বসা মাত্র তিনি বলতেন, কাজ আর ভালো-লাগে না। খুব খেয়ালী ছিলেন তিনি। প্রতিভাবান্ পুরুষরা যেরকম খেয়ালী হয়ে থাকেন, তিনিও ছিলেন অবিকল তাই। আজ তিনি নেই আমাদের হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা-খালি হয়ে গেল। এর বেশি তাঁর সম্বন্ধে আর-কিছু আমার বলার নেই। কোনো প্রাইভেট কথা

আপনাদের জানাতে পারলামনা বলে আমি লজ্জিত। আশাকরি আমার অক্ষমতার জন্যে আপনারা আমাকে মাপ করবেন। যে রকমের কাজ আমাকে করতে হয়েছে তা যে কতটা ঝকমারির কাজ তা সকলের না-জানাই ভালো। অনেকে ভাবে বড়-বড় মানুষের প্রাইভেট সেক্রেটারি হওয়া বুঝি খুব সুখের। কিন্তু কী সুখেই যে ছিলাম, তা মর্মে-মর্মে বুঝতে পারছি। কিন্তু তা অন্য কথা। কি কথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। ক্ষমা করবেন। তেজেন্দ্রভূষণ যে বিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, কর্মিৎকর্মা লোক ছিলেন—এ'তে কোনো ভুল নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি আমার নমস্কার জানাই।

[আসন গ্রহণ সকলে নড়ে-চড়ে বসল]

আচার্য ॥ দুষ্কৃতির কথা উঠেছিল একটু আগে। কিন্তু কেবল দুষ্কৃতি কেন, পুণ্যফল যদি থাকে তাহলে সুকৃতিও তার প্রাপ্য। এ কথা ঋষিবাক্য। তাঁরাই বলেছেন—

মৃতং শরীরং উৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমংক্ষিতৌ
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি।

বান্ধবেরা মৃতশরীর ভূমিতলে কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় নিক্ষেপ ক'রে বিমুখ হয়ে চলে যায়, কেবল অনুগমন করে ধর্ম। (একটু থেমে) সংগীত।

[মেয়েটি তানপুরা কোলে নিল, ঝংকার তুলল]

গান

সমুখে শান্তি পারাবার—
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার॥
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার॥

[গান থামল। আচার্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন]

আচার্য ॥ অপূর্ব! শত শত যুগ আগে কোন্ বিশ্বরচয়িতা রচনা করেছেন এই গান। কী মধুর গান, প্রাণ উদাস ক'রে দিল। আমরা ধন্য। এই গানের ভিতর দিয়ে কী অদ্ভুত অনুভূতি সঞ্চারিত হল আমাদের হৃদয়ে।

হৃদয় দ্রবীভূত হল। যিনিই রচনা করে থাকুন এই গান, আমরা তাঁকেও নমস্কার করি। প্রকৃত কথাই বলা হয়েছে ঐ গানে—আমাদের সম্মুখে সত্যিই আছে শান্তির পারাবার। সংসারের দুঃখ কষ্ট গ্লানি বেদনা অপবাদ অপযশ পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছুই ওইখানে—ওই শান্তির মহাসমুদ্রে। সেখানে অবগাহন ক'রে আমাদের সর্বশরীর শীতল হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। (একটু থেমে, ছবিটির দিকে চেয়ে) ঐ পুণ্যবানের আত্মার শান্তির জন্য, আসুন, এক মিনিট আমরা নীরবতা পালন করি।

[নীরব শোকার্তরা নীরব হলেন। অসতর্কতায় তানপুরার তারে আঘাত লাগল। ঝংকার। মেয়েটি অপ্রস্তুত। সকলে চমকিত]

আচার্য ॥ (বিস্মিত ভঙ্গিতে চেয়ে) সভা শেষ করা যাক এবার।

[মৌন সম্মতি জানাল সকলে! কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে আচার্য উঠলেন। যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেই পথে ধীরে-ধীরে প্রস্থান করলেন। মেয়েটিও তাঁকে অনুসরণ করল। আসরের সকলে নড়ে-চড়ে বসল, গা মোড়ামুড়ি দিল। আসরের আড়ষ্টতা ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল]

মহাবীর ॥ সব চলে গেল। একে-একে সকলকেই যেতে হবে এইভাবেই। তেজেন্দ্রভূষণ চলে গেলেন। আচার্যও চলে গেলেন। ওঁর বলার ভঙ্গিটা কিন্তু বেশ, আসরটাকে একেবারে অভিভূত করে রেখেছিলেন। তমসো মা জ্যোতির্গময়—কি-যেন কথাটা? অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে চলো। সকলে ঘুরে বসো ভাই। আলোর দিকে মুখ করো এবার। মৃত্যোর্মা—না কি যেন? মৃতের থেকে অমৃতে—কিন্তু একটা কথা শুনে একটু খটকা লাগল—উনি বললেন, শত শত যুগ আগে কোন্ বিশ্বরচয়িতা রচনা করেছেন ওই গান, ওই সমুখে শান্তিপারাবার। এই কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারলাম না।

[সকলে একটু-একটু ঘুরে দর্শকদের দিকে মুখ ক'রে বসতে লাগল।]

বীরেশ্বর ॥ কোন্ বিশ্বরচয়িতা! ক'জন বিশ্বরচয়িতা আছেন তাই ভাবছি।

শ্যামসুন্দর ॥ তোমাদের স্বভাবই ওই, লোকের খুঁত ধরা। যখন লোকে সম্মুখে থাকে তখন সব বোবা, চলে গেলেই মুখে খই ফুটতে থাকে। সকলকেই কি সব জানতে হবে?

মহাবীর ॥ মুখে খই ফুটল তো তোমার। কী সুন্দর বক্তৃতা দিলে।

শ্যামসুন্দর। অনুরোধ তো করলে ভাই তোমরাই।

মহাবীর ॥ কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছে, কি-কি বলবে সে সম্বন্ধে তো কোনো আর্জি করা হয়নি।

মহাবীর ॥ তা ঠিক। কিন্তু তেজেন্দ্রভূষণ যে এত বিপুল এবং এত বিরাট ছিলেন, আগে তার খবর রাখিনি বলে নিজেকে কেমন-যেন দরিদ্র কেমন-যেন বেকুব বলে মনে হচ্ছে।

বীরেশ্বর ॥ হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্। আমিও নিজেকে ওই একই কারণে দীনদরিদ্র মনে করছি ; এবং সেই সঙ্গে মনে করছি আমিও মহান্। ওই দারিদ্র্য এসে আমাকে ইয়ে করে দিয়ে গেল !

মহাবীর ॥ আচার্যদেবকে আমার মনে হচ্ছে উনি কেবল আচার্যদেবই না, উনি আশ্চর্যদেব। ওঁর আশ্চর্য ভাষণে আমরা সকলেই কেমন মহৎ, কেমন বিরাট,—

অবিনাশ ॥ তোমাদের কারও কথারই কোনো মানে ধরতে পারছিনে, কেন হে ! কি বলতে চাও, খুলেই বলো-না।

মহাবীর ॥ জটিল কথা কিছু নয়। বলছিলাম, আমরা যে যা নই, আমরা সকলে তাই হয়ে গেলাম। আমরা নীরব শ্রোতা হয়ে গেলাম, আপনি বিজ্ঞ বক্তা হয়ে গেলেন। মনে-মনে আমরা যা জানি, মুখে কেউই তা প্রকাশ করতে পারলাম না। এমন কি আমাদের অনীতাদেবীও বেশি কিছু ফাঁস করলেন না।

অবিনাশ ॥ মনে রেখো এটা শোকসভা। এটা শোকসভার রীতি, এটা শোকসভার অঙ্গ।

বীরেশ্বর ॥ জানি। জানি। আমরা কি সে রীতি লঙ্ঘন করেছি ? করিনি। ভদ্রতা রক্ষার জন্যে ভদ্রভাবে বসে থাকার চেষ্টা করেছি। কারও কোনো কথার প্রতিবাদ করিনি, আপত্তি তুলিনি। এমনকি আপনার বক্তৃতাও কেমন মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, অবিনাশবাবু !

অবিনাশ ॥ শুনে খুশি হলাম। বক্তৃতাটা তবে ভালোই দিয়েছি বলো !

[আসর এখন শিথিল হয়ে এসেছে। দু-একজন চলে গেলেন। অন্যেরা কেউ কেউ ঘুরে বসে এদের কথা শুনতে লাগলেন।]

অনীতা ॥ আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। একেবারে বক্তৃতার মত লেগেছে।

বীরেশ্বর॥ ঠিক। ভালোই দিয়েছেন মানে! একটা মানুষের চরিত্র অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আপনার স্পীচ সবচেয়ে জোরালো হয়েছে, যেমন গলা, তেমনি বলা!

মহাবীর॥ উনি শিল্পী। ভাষার উপর যদি দখল থাকে, হৃদয়ে যদি অনুভূতি থাকে, যাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তাঁর উপর যদি অগাধ শ্রদ্ধা থাকে তবে কথায় গভীরতা থাকবেই, গাম্ভীর্যও থাকবে। অবিনাশবাবু প্রাচীন লোক, উনি অনেক দেখেছেন, অনেক জেনেছেন। তিনি যদি না বলবেন তবে বলবে কে! বীরেশ্বরের কথা আমরা মানি, ওঁর স্পীচ সত্যিই বেশ জোরালো হয়েছে।

অবিনাশ॥ তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। মৃত্যু জিনিসটাই একটা মহৎ জিনিস। মৃত্যু এসেই মানুষের সব দৈন্য মুছে দেয়, মানুষকে মহান্ করে। মৃত্যু আর কি করে? মৃত্যু এনে দেয় ক্ষমা।

মহাবীর॥ (সহাস্যে) ক্ষমা ক্ষমা ক্ষমা।

অনীতা॥ এই একটা মস্ত কথা বলেছেন। সংগত কথা বলেছেন। ক্ষমা এনে দেয়।

বীরেশ্বর॥ শুধু ক্ষমাই নয়, ক্ষমতাও। যা বিশ্বাস করেন না সেই কথাই কত সহজে কেমন অনর্গল বলে যেতে পারলেন অবিনাশবাবু। যা বিশ্বাস করেন তা কেমন অদ্ভুতভাবে গোপন ক'রে গেলেন অনীতা দেবী!

মহাবীর॥ সত্যি, ক্ষমতাই বটে! অবিনাশবাবু তেমন একজন বলিষ্ঠ পুরুষ নন্ (শ্যামসুন্দরের দিকে চেয়ে), দেখতেও তেমন বড়-সড় নন্, অথচ কী গলা! আমাদের এই আসর একেবারে গম্‌গম্ করে উঠেছিল।

বীরেশ্বর॥ কিন্তু একটা আক্ষেপ থেকে গেল। এ আক্ষেপ হয়তো কেবল আপনাদেরই না, এ আক্ষেপ হয়তো অবিনাশবাবুরও, আর, আর—হয়তো তেজেন্দ্রভূষণেরও। যাঁর উদ্দেশে অবিনাশবাবু এত কথা এত গলা দিয়ে এত আবেগ দিয়ে এত বেগ দিয়ে বলে গেলেন, জীবিত জীবনে তিনি তা কখনো শোনেননি, আজও তাঁর শোনা হল না।

মহাবীর॥ (অবিনাশবাবুকে) সত্যি, বীরেশ্বর ঠিকই বলেছে। এটা খুব অন্যায় করলেন কিন্তু অবিনাশবাবু। কথাগুলো তাঁকে আগে শুনিয়ে রাখলে পারতেন।

অবিনাশ॥ (উত্তপ্ত) দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। বেঁচে থেকে সে কি করেছে না-করেছে তা দিয়ে দরকার কি। মানুষটা আজ নেই, তাকে

নিয়ে একটু যদি বাড়াবাড়ি করেই থাকি, তাতে এল-গেল কি!

মহাবীর ॥ তা ঠিক। কিছুই এল-গেল না কারও। কিন্তু জীবনে যে কথা কখনও কারও মুখ থেকে শুনলেন না, বরঞ্চ হয়তো বিপরীত কথাই বিস্তর শুনলেন, মরণে তিনি যে আপনার মুখ থেকে—এটা কিন্তু ভাগ্যেরই কথা! সবার ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে না।

অবিনাশ ॥ ঘটে ঘটে ঘটে। আকছার ঘটছে। কিচ্ছু জানো না, কিচ্ছু খোঁজ রাখ না, কেবল বড়-বড় কথা শিখেছ। তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা কতটুকু? কজনকে মরতে দেখেছ? ক'টা মৃত্যু সভায় গিয়েছ বলো তো!

শ্যামসুন্দর ॥ বেশ জমেছে। বেশ লাগছে এখন। ঠিক জবাব দিয়েছেন অবিনাশবাবু। শক্ত হাতে না পড়লেও এরা ঠাণ্ডা হবে না।

অবিনাশ ॥ শক্ত-নরমের কথা হচ্ছে না! একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ওদের এত বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্ত বোধ হচ্ছে। এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? জীবনে যা উনি শোনেন নি, মরণে তাই শুনলেন। এটা নতুন কিছু না। তোমরা জীবনে কতটুকু কি শুনছ? একবার মরেই দেখ-না, কতজন তোমাদের জন্যেও হাহুতাশ করবে।

অনীতা ॥ ঠিকই তো। সেদিক থেকে আপনি ঠিকই করেছেন।

মহাবীর ॥ ওটা চক্ষুলজ্জা। ওটা ভদ্রতা।

অবিনাশ ॥ তবে তবে তবে! এবার তবে পথে এসো। আমিও ঐ লজ্জায় বলতে উঠি, আর, বলতে গিয়ে মাত্রা হারিয়ে যায়, মাত্রাজ্ঞান থাকে না। সত্যি মিথ্যাজ্ঞানও না।

বীরেশ্বর ॥ চমৎকার কনফেশন। অনেক ভরসা পেয়ে গেলাম। আর কোনো ভয় নেই—

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়

আমি মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি আছি, একটা শর্ত এই, তখন যেন অবিনাশবাবুকে কিছু বলতে দেওয়া হয়। মনে হচ্ছে—

মহাবীর ॥ Man wars not with the dead.

শ্যামসুন্দর ॥ তার মানে?

মহাবীর ॥ মানে পারিষ্কার। মৃতের সঙ্গে মানুষ লড়াই করে না। যতক্ষণ সে জীবিত থাকে ততক্ষণ তার সঙ্গে যত দ্বন্দ্ব, যত দ্বেষ। সে খতম হলেই সব শেষ সব শেষ।

অবিনাশ ॥ মাথা আছে দেখছি, বুদ্ধিও আছে দেখছি। কিন্তু এতক্ষণ এমন নির্বোধের মত আচরণ করা হচ্ছিল কেন ?

মহাবীর ॥ মাঝে মাঝে বোকা সাজতে বেশ লাগে, অবিনাশবাবু। ওতে পাঁচ জনের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করা যায়।

শ্যামসুন্দর ॥ (হেসে উঠল) এ কথার ব্যাখ্যা চাই। এর মানে একটু খোলসা করে বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের। অবিনাশবাবু, এ কথার পরিষ্কার ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত আমরা কিন্তু ছাড়ব না মহাবীরকে।

অবিনাশ ॥ তোমরা জোয়ান আছ, তোমরা চেষ্টা করে দেখ। ধরো ওকে আচ্ছা ক'রে জাপটে। আমার কি সাধ্য যে আমি ওকে বাগিয়ে ধরতে পারি !

শ্যামসুন্দর ॥ কি হে মহাবীর, বুঝিয়ে বলবে নাকি মানেটা ?

বীরেশ্বর ॥ আমি বলি কি, ও কথা নিয়ে আর টানাটানির দরকার নেই। কথা আর দ্রৌপদীর শাড়ি—একই ব্যাপার, টানলেই বেড়ে যাবে।

[সমবেত সকলের হাস্য

অবিনাশ ॥ এ সভায় দ্রৌপদী আবার কেউ আছে নাকি ?

[সকলে অনীতার দিকে তাকাল]

অনীতা ॥ আবার আমাকে নিয়ে টানাটানির দরকার কি ! যা হচ্ছিল তাই বেশ হচ্ছিল।

[হন্তদন্ত হয়ে দুটি যুবকের প্রবেশ—অবনী ও রমেন। সকলে সচকিত]

মহাবীর ॥ এ কি হে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? এত দেরি কেন।

অবনী ॥ দেরি হয়ে গেল বুঝি ?

মহাবীর ॥ হল না ? আমাদের সভা হয়ে গেল।

অবনী ॥ হয়ে গেল বুঝি ? (রমেনের দিকে চেয়ে) আমাদের সভাও হয়ে গেল। সেখানেই আটকে পড়েছিলাম।

মহাবীর ॥ তোমাদের আবার কিসের সভা ?

রমেন ॥ শোকসভা। আমরা একটা চায়ের দোকানে বসে শোকসভা করছিলাম। আমরা দুজন।

বীরেশ্বর ॥ কার শোকসভা হে ! আবার কে মারা গেলেন ?

রমেন ॥ (অবনীর দিকে চেয়ে) না। আর কেউ মারা যান নি। জীবিতদের নিয়ে আমাদের সভা হ'ল এখানে আপনারা যাঁরা এসেছেন তাঁদের নিয়ে।

[সকলে বিস্মিত, স্তম্ভিত]

মহাবীর ॥ সে কি হে, সেটা আবার কি ? সেটা আবার কেমন সভা ?

রমেন ॥ শোকসভা। সেটা একেবারে নির্ভেজাল শোকসভা। বিশ্বাস করুন। কঠিন বাংলায় যাকে বলে—কি যেন বলে হে, অবনী ?

অবনী ॥ কোন্ কথাটা চাও ? খাঁটি, সাচ্চা—

রমেন ॥ ওগুলো তো কঠিন না হে ! কঠিনটা বলো।

অবনী ॥ অকৃত্রিম।

রমেন ॥ ইয়েস। ঠিক বলেছ। আমরা করে এলাম একটা অকৃত্রিম শোকসভা।

অবিনাশ। আজকালকার ছেলেরা কেমন যেন কৃত্রিম হয়ে গিয়েছে।

মহাবীর ॥ (হাসতে হাসতে) যাকে বলে—সেকি ঝুটা ফল্স্, তাই না ?

রমেন ॥ তা ঠিক। সত্যিকে মিথ্যা ক'রে, মিথ্যাকে সত্যি করে কিছু আমরা গুছিয়ে করতেই পারি নে।

মহাবীর ॥ অবিনাশবাবুর স্পীচ তো তোমরা শুনলে না ? উনি আজ বক্তৃতা করেছিলেন।

অবনী ॥ তাই বুঝি ?

রমেন ॥ খুব মিস্ করেছি বলতে হবে।

মহাবীর ॥ তা করেছ। মিস্ অনীতাকেওযেমন মিস্ করেছ, ওরটাও তেমনি, ওঁর যেমন কন্‌সেপশন, তেমনি ডেলিভারি। একটু খোলা জায়গা পেলে খুব জমে যেত।

অবিনাশ ॥ (সবিনয়ে) বক্তৃতা দেওয়ার তো তেমন অভ্যেস নেই, ভাই। কিন্তু তবু তোমাদের যখন ভালো লেগেছে তখন নিশ্চয় বলেছি ভালোই।

রমেন ॥ কি বলেছেন উনি ? ইশ, আমাদের শোনা হল না।

অবনী ॥ খুব লোকসান হয়ে গেল। তেজেন্দ্রভূষণের মৃত্যু একটা লোকসান, তার উপরে আরো একটা—

রমেন ॥ দুটো নেগেটিভে নাকি একটা পজিটিভ হয় ; দুটো ক্ষতি মিলে তবে একটা ইয়ে হবার কথা ! তাই না ?

অবনী ॥ কি জানি ভাই। অঙ্কে আবার একটু কাঁচা।

অবিনাশ ॥ কিন্তু কথাবার্তায় তো বেশ ডাঁশা দেখছি।

[বক্তা ছেলেটি কাঁচুমাচু হয়ে বসা। বীরেশ্বর তার দিকে তাকাচ্ছেন]

বীরেশ্বর ॥ আরো একটা বক্তৃতা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে মহাবীর। তিনি আমাদের পরিচিত না, এজন্তে তাঁর কথা উল্লেখ করব না—এটা কিন্তু

অন্যায়। সব সময়ই নেপোরা দই মেরে যাবে, এতটা হতে দেওয়া ঠিক না। যার থেকে ঐ ইংরেজি শব্দটা এসেছে।

মহাবীর ॥ কোন্‌টা ?

বীরেশ্বর ॥ নেপোটিজ্‌ম্‌।

[অবনী ও রমেন-সহ সকলের হাস্য]

মহাবীর ॥ বীরেশ্বর ঠিকই বলেছ। অবিনাশবাবু বৃদ্ধ মানুষ বলে তাঁর কথাটা আগে সেরে নিচ্ছিলাম। আমাদের শ্যামসুন্দরও তো খাসা বলেছে, তার কথাও কথাও তো তুলিনি। এমন কি আপনাদের অনীতাদেবীর কথাও তো তুলিনি। সে যাক, কি নাম ভাই আপনার ?

ছেলেটি ॥ আমাকে বলছেন ? (বিগলিত) আমার নাম বিনোদবন্ধু বিশ্বাস।

মহাবীর ॥ আপনাকে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারছিনে। আপনার পরিচয়টাও জানা হয় নি। আপনি কি আমাদের তেজেন্দ্রভূষণের আত্মীয় ?

ছেলেটি ॥ না। তাঁর আত্মীয় নই। তাঁর আত্মীয় হতে পারলে ধন্য হয়ে যেতাম। আমি তাঁকে চিনিও না, তাঁকে কখনও দেখিওনি।

বীরেশ্বর ॥ তাই বুঝি ? আশ্চর্য ! কিন্তু তবু বলেছেন তো অদ্ভুত !

ছেলেটি ॥ তাঁকে দেখিনি বটে, কিন্তু তাঁর খোঁজে এখানে প্রায়ই আসতাম।

বীরেশ্বর ॥ তাঁর খোঁজে কেন ?

ছেলেটি ॥ তাঁর খোঁজে ঠিক নয়, চাকরির খোঁজে। বছর-খানেক যাতায়াত করছি। নীচের ঘরে যিনি বসেন—বোধহয় ম্যানেজারবাবু—তাঁর সঙ্গে দেখা হত।

অনীতা ॥ ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনিই বুঝি ? আপনার কথা একটু-একটু যেন শুনেছি।

মহাবীর ॥ তাই বুঝি আজ এসে পড়লেন ?

ছেলেটি ॥ আসতে হল। আমি লিখি-টিখি, তা জানতেন ম্যানেজারবাবু ! তিনি অনুরোধ করলেন আজকের আসরে তেজেন্দ্রভূষণের জীবন সম্বন্ধে কিছু যেন বলি; তিনি যেটুকু উপকরণ দিলেন তাই সাজিয়ে একটু লিখে এনেছিলাম।

মহাবীর ॥ বা, অনেক তথ্য তো পেয়েছিলেন। বেশ গুছিয়ে লিখেছেন।

ছেলেটি ॥ (সলজ্জ হেসে) আমি নিজেও অবশ্য কিছু যোগ করে দিয়েছি।

বীরেশ্বর ॥ ঠিক করেছেন। এটুকু ওরিজিন্যালিটি না থাকলে আর লেখক কি ! ইয়ংম্যানেদের কাছ থেকে আমরা এরকমই প্রত্যাশা করি।

অবনী ॥ আরও দুজন ইয়ংম্যান কিন্তু হাজির।

অবিনাশ। জাহির করতে হবে না। অনেক আগেই টের পেয়েছি আমরা।

বীরেশ্বর॥ (একটু হেসে, বিনোদকে) আপনার কথাগুলো এখনো কানে বাজছে। চমৎকার লিখেছেন। চমৎকার একটা রম্য রচনার মত হয়েছে। সাহিত্যে সংগীতে ও চিত্রকলায় তেজেন্দ্রভূষণের যে অসীম মমতা ছিল, আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাও ধরা পড়েছে।

ছেলেটি॥ (খুশিতে বিগলিত) ওসব কথা কিন্তু আমি বানিয়ে বলেছি। ওকথাগুলো শুনতে বেশ ভালোও লাগে। যে-কোনো মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে ঐ কথা বলা হয় ব'লে আমিও ওটা যোগ করে দিয়েছি।

বীরেশ্বর॥ বেশ করেছেন। আপনি সফল হয়েছেন। শুনতে বেশ ভালো লেগেছে।

শ্যামসুন্দর॥ আগে থেকে আমার কৈফিয়ত জানিয়ে রাখছি ভাই—আমিও ঐ কথা বলেছি। বলার কথা পাচ্ছিলাম না, বিনোদবাবুর কথাটাও কানে লেগে ছিল, তাই বলেই ফেললাম।

[সকলের হাস্য]

মহাবীর॥ আর কি জান? ওসব কথা বলা ভালো। যিনি বলছেন তিনিও যে একজন রুচিবান মানুষ তাও ঐ সঙ্গে বলা হয়ে যায়।

রমেন॥ সামান্য একটা কথা নিয়ে এত কথা বলার দরকার কি বুঝতে পারছিনে। কী এমন গর্হিত অন্যায় করেছেন ঐ ভদ্রলোক। তাঁর যা মুখে এসেছে তিনি বলেছেন। বেশ করেছেন। আর আর যাঁরা যা বলেছেন সব যেন ন্যায্য কথা বলেছেন!

অনীতা॥ আমার তো মনে হয় ন্যায্য কথা কেউই বললেন না।

[অবিনাশবাবু কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন রমেনের দিকে]

অবনী॥ এখানে যাঁরা জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা সত্যিই শোক করতে এসেছিলেন কিনা ভাবছি। তাঁরা কি সবাই শোকার্ত? জানতে ইচ্ছে করছে। মনে তাঁদের কি ছিল তাঁরাই জানেন। অথচ কী অদ্ভুতভাবে শোকাচ্ছন্ন মুখ করে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে নিঃশব্দ হাহুতাশ—এ দৃশ্য একটা শোকাবহ ব্যাপার। যখনই কোনো শোকসভা দেখি, আমার মনে হয় কতকগুলো খেলনার মুখে রং বুলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের নিজেদের কোনো অস্তিত্ব নেই, অন্যের ইচ্ছায় তারা নড়ে-চড়ে। এই ধরণের সভায় সমবেত জনতার কৃত্রিম করুণ আচরণ দেখে আমার মন শোকে অভিভূত হয়ে ওঠে, আমার কান্না পায়। আজও আমার ঐ

অবস্থা হয়েছে। তাই, এখানে চলে না এসে আমরা আপনাদের দশা চিন্তা ক'রে আপনাদের জন্যে শোক করছিলাম। সেই সভা থেকে উঠতে দেরি হল, তাই সময়-মত এখানে এসে পৌঁছতে পারিনি। এজন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

[কিছুক্ষণ সকলে চুপ]

অবিনাশ। খুব হয়েছে। মনে ভাবছ বুঝি খুব একটা মস্ত কথা বলা হল, এতগুলো মানুষকে অপদস্ত করে খুব বাহাদুরি দেখানো হল।

অবনী॥ বাহাদুরি করব কেন। সময়মত আসতে না পারার কৈফিয়ত দিচ্ছিলাম।

অবিনাশ॥ বটেই তো। কথার বাহাদুর যে তুমি তা বুঝতে পেরেছি।

মহাবীর॥ কথার বাহাদুরি আপনিও কিন্তু দেখিয়েছেন অবিনাশবাবু। উঃ যা-সব সাংঘাতিক কথা আপনি বলেছেন!

অবিনাশ॥ বক্তৃতা হচ্ছে বক্তৃতা। ওর মানে ধরতে নেই। যা বলেছি, তা বলেছি। চুকে গেছে।

রমেন॥ অনেক মোক্ষম কথা বলেছেন নিশ্চয়?

অবনী॥ অনেক আবার কি! নিশ্চয় আগাগোড়াই।

অবিনাশ॥ হোক-না। তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে?

অবনী॥ না, লাভই হয়েছে বরঞ্চ। আমাদের তো শুনতে হয়নি।

অবিনাশ॥ লোকটা নেই। যখন সে ছিল তখন তার সম্বন্ধে যার যা বলার যথেষ্ট বলেছে। চুকে গেছে। এখন একদিন না হয় অন্যরকম কিছু কথা বলাই হল। ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে!

অবনী॥ ভদ্রতা সৌজন্য—ওসব কথা অবশ্যই সকলের জানা। কিন্তু ভদ্রতা করা মানে যদি হয় অসত্য আচরণ, অসত্য ভাষণ?

অবিনাশ॥ (ক্রুদ্ধ) তুমি তো ভীষণ ছোকরা হে!

মহাবীর॥ (হাততালি) জাগো, জাগো। জগজ্জননী, জাগো। তোমার সুযোগ্য সন্তান তাঁর পুত্রবৎ শিশুদের উপর—

অবিনাশ॥ (মহাবীরের পিঠে হাত দিয়ে) না হে, অত্যাচারের কথা নয়। ওদের একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম যে, আমরা যারা এসেছি সকলেই এসেছি—কি বলে গিয়ে ইয়ের জন্যে। এই সামান্য কথাটা ওরা বুঝবে না কেন!

রমেন॥ (অবনীকে সরিয়ে দিয়ে) আমরা বুঝেছি। আপনিও যে বুঝেছেন

এটুকু জেনে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আক্ষেপ থেকে গেল একটা, আপনার বক্তৃতাটা শোনা হল না। এখন আবার একটু শোনা যায় না?

অবিনাশ॥ হয়তো যায়। বলতে বলো তো আবার বলি। কিন্তু এখন আবার যদি বলি তবে হাস্যকর শোনাবে না তো?

মহাবীর॥ তখন যখন হাস্যকর লাগেনি, এখনই-বা লাগবে কেন।

অবনী। এটা কিন্তু ভুল কথা হল। তখন যে হাসি মানা ছিল, তখন যে ওটা ছিল শোকসভা।

রমেন॥ ঠিক। শোকসভাতে হাসি পেলে হাসতে পারা যাবে-এ নিয়ম চালু হলে সে কিন্তু এক কেলেঙ্কারির ব্যাপার হয়ে যাবে।

[সকলের সমবেত অট্টহাস্য]

ছেলেটি॥ আমি এবার আসি?

মহাবীর॥ এসো ভাই। তোমার ঠিকানাটা পরে নিয়ে নেব। আবার কারো জীবনী লেখার যদি দরকার হয়—

ছেলেটি॥ মাপ করবেন। আমি বড় লজ্জা পেয়েছি আজ।

অবিনাশ॥ লজ্জা কি হে! ওসব কথা রাখো। এত সহজেই লজ্জা পেলে জীবনে কিছুই করতে পারবে না।

ছেলেটি॥ (সলজ্জ ভঙ্গিতে) আমি তবে আসি?

[উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রস্থান]

অনীতা॥ এবার আমিও তবে যাই। (হাতঘড়ি দেখে) একটু কাজ আছে।

মহাবীর॥ না, না, তা হয় না। আপনি প্রাইভেট সেক্রেটারি—

বীরেশ্বর॥ প্রকাশ্য সভায় যা বলতে পারেন নি, তার দু-এক টুকরো এবার শুনব যে আপনার কাছে। কিছু প্রাইভেট কথা শুনতে চাই।

শ্যামসুন্দর॥ আমি চলি ভাই। তোমরা সব শোনো যা-খুশি।

বীরেশ্বর॥ কেন, যাবে কেন। এই তো আসল আসর শুরু। তেজেন্দ্রভূষণের কল্যাণে এখানে একসঙ্গে জমেছি। চট ক'রে আসর ভেঙে পালাবে? বোসো, বোসো। বক্তৃতায় যা বলা হয়ে গেছে তা তো হয়েইছে। এবার একটু জমাট হয়ে ব'সে খোলা মন নিয়ে খোলসা ক'রে একটু আলোচনা করা যাক।

মহাবীর॥ প্রস্তাব মন্দ না। বসুন-না, আপনারা সকলেই বসুন!

অবনী॥ এ প্রস্তাব সমর্থন করি।

রমেন ॥ আমিও। বিশেষ ক'রে এই জন্তে যে এতে মনের সব গ্লানি দূর হয়ে যাবে।

বীরেশ্বর ॥ তা তো হল। কিন্তু চারদিক এমন খোলা, ওদিকে লোকজন গিস্‌গিস্ করছে, এতে আড্ডা জমে না। (নেপথ্যে চেয়ে) কে আছ হে, সামনের বারান্দাটার পর্দা নামিয়ে দাও তো হে !

[উর্দিপরা একটা লোক ছুটে এল। বীরেশ্বর তাকে ইশারা করল। লোকটা চলে গেল। ধীরে ধীরে নেমে এল যবনিকা।]

শিশিরকুমার সিংহ

প্রতীক, রূপক—না ব্যঞ্জনা

সাহিত্যে প্রতীক (symbol) ও রূপকের সার্থক প্রয়োগ আধুনিককালের ঘটনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী ও ইংরেজি কবিতায় (এবং নাটকেও) "প্রতীক" ব্যবহারের বাড়াবাড়ি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অবশ্য এই কাব্য কবিতাতে প্রতীক ব্যবহারের পথ প্রদর্শক ছিলেন চার্লস্ বদ্‌লেয়ার (১৮২১—১৮৬৭), ষ্টিফেন ম্যালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮), পল ভ্যালেরি (১৮৭১—১৯৪৫) ইত্যাদি ফরাসী কবিগণ।[১] আর টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮), এজরা পাউণ্ড (১৮৮৫), ডব্লিউ. বি. য়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) প্রভৃতি ইংরেজ কবি সমালোচকগণও উপরিউক্ত ফরাসী কবিদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২]

বাংলাসাহিত্যে প্রতীক ব্যবহারের সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (এপ্রিল, ১৮৮৪) নাট্যকাব্যে।[৩] এরপর তিনি একাধিক প্রতীক (?)[৪] নাটক বা ব্যঞ্জনাপ্রধান নাটক লিখেছেন। তবে বাংলা কাব্যে প্রতীকের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় জীবনানন্দের রচনায় ('বেতের ফল', 'হেমন্তের রাত', 'পৌষের শস্যরিক্ত মাঠ', 'পেঁচা,' 'ইঁদুর' ইত্যাদি সিম্বলগুলি বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে)।

এখন "প্রতীক" বলতে কি বুঝি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে আমাদের মুখ-নির্গত প্রতিটি অর্থবহ এক একটি বিশেষ শব্দই বস্তু বা বিষয়ের প্রতীক। মানব সভ্যতার বিকাশের সংগে সংগে এই প্রতীক ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন 'চাঁদ' শব্দটি বোঝাবার জন্য এখন 'চাঁদ' এই দুই ধ্বনি উচ্চারণ করলেই আমরা চাঁদ নামক বস্তুটি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। কিন্তু যখন ধ্বনি বা অক্ষরের সৃষ্টি হয়নি তখন মানুষকে এই বস্তুটিকে বোঝানোর জন্য 'চিত্রলিপি' এবং 'ভাবলিপি'র সাহায্য নিয়ে ছবি এঁকে দেখাতে হত! সুতরাং "চাঁদ" ধ্বনিটি একটি গোলাকৃতি (?) উপগ্রহের প্রতীক।

কিন্তু সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার একটু স্বতন্ত্র ধরণের। যেমন,—আগেই "চাঁদ" শব্দটি সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, এটি একটি বিশেষ বস্তুর প্রতীক। কিন্তু এই চাঁদটিকেই যখন বলা হয় "প্রেতচাঁদ" তখন অর্থ স্পষ্ট

হয় না। কেবল বাচ্যার্থ দ্বারা প্রকৃত অর্থ উপলব্ধ হয় না,—অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয় বা জানতে হয় কবি কি অর্থে চাঁদকে "প্রেতচাঁদ" বলেছেন। এমনিভাবে 'অন্ধকারের মুখ আমি দেখিয়াছি' বলতে আমরা কি বুঝি? "অন্ধকার" "মুখ" ইত্যাদির পৃথক পৃথকভাবে অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু 'অন্ধকারের মুখ' বলতে কবি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা বুঝতে গেলে "প্রতীক" সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতীক সম্বন্ধে কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রায় অসম্ভব। "প্রতীক" (symbol) শব্দটি বলতে মনের মধ্যে এমন একটি অস্পষ্ট ধারণা জন্মে যে এটি সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বলা বেশ কঠিন। কারণ এই (symbol) শব্দটির দ্বারা কোন বিশিষ্ট অর্থ নির্দেশ করা সম্ভব নয়—"Any attempt to sammarize symbolist doctrine expose the vagueness of the pronouncement of the various symbolists and critics not to mention their frequent contradictions one might be forgiven for coming to doubt whether the term "symbolism" has any specific meaning at all, and to conclude that it is, like the term "romanticism" semply the name for a bundle of tendencies, not all of them very closely related"[৫]

ফরাসী প্রতীক আন্দোলনের নেতারাও "সিম্বলিজম"-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে বলেছেন—"sybolism" was a rather loose and vague term…।"[৬] —অর্থাৎ তাঁর অস্পষ্টতার কথা বলেছেন। ম্যালার্মেও শব্দের ব্যঞ্জনার (symbolism ?) কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—"এটি এমন একটি বস্তু যা আমাদের মনের মধ্যে সুযুপ্ত অবস্থায় থাকে,—যেটি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি,—এটিই হল সেই আদিম ভাষা,—যার সংগে আমাদের স্বপ্নের, আমাদের সংগীতের যোগ রয়েছে।"[৭]

সংজ্ঞার সাহায্যে প্রতীকের অর্থ স্পষ্ট করে তোলা প্রায় সাধ্যাতীত। তাই রবীন্দ্র-নাটকে প্রতীকের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রতীক সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটির কথাই ধরা যাক্। এই নাটকটিতে 'ডাকঘর' ও চিঠি' বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'ডাকঘর' হল সুদূরের সংগে নিকটের মিলন সাধনের মাধ্যম। আর ডাকহরকরা 'চিঠির মাধ্যমে এই মিলনে সাহায্য করে। 'চিঠি' হল সেই বস্তু যা সুদূরকে নিকটে,—চোখের সামনে এনে দেয়

এবং যা ঘরে ঘরে আনন্দের বার্তা পৌঁছে দেয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রতীক নাটক 'মুক্তধারা'র প্রতীকের কথাও আলোচনা করা যেতে পারে। 'মুক্তধারা নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বস্তুটি (যে বস্তু সব জায়গা থেকেই চোখে পড়ে,—যে বস্তুটিকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না) হল বিভূতি (যন্ত্ররাজ) নির্মিত যন্ত্রের চূড়াটি,—যেটি দেব মন্দিরের চূড়াকেও ছাড়িয়ে গেছে। এটি (যন্ত্রটি) হল মানুষের উদ্ধত স্পর্ধার প্রতীক। আর ঝর্ণার বাঁধ হল (জন্মভূমি জননীর বন্ধন), জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতার প্রতীক। এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের আরও একাধিক নাটকে প্রতীকের প্রয়োগ দেখান কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাহলে ওপরের আলোচনা থেকে প্রতীক সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রতীক হল কবিমনের উচ্চভাবকে বিশেষ উপায়ে প্রকাশের এক বিশিষ্ট মাধ্যম; —যা অস্পষ্ট হলেও অনুমান শক্তির সাহায্যে বোধগম্য। অবশ্য এইভাব প্রকাশের জন্য কবিকে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি বা বিশিষ্ট ঘটনাকে অবলম্বন করতে হয় এবং একটি রূপক কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে—তাহলে "রূপক" কি ?

"রূপক" হল এমন একটি বস্তু যা সাধারণ ঘটনা বা কাহিনীর আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। অর্থাৎ কাহিনীর অন্তর্নিহিত কাহিনী, যা ওপরের স্বাভাবিক ঘটনার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। এক্ষেত্রে নাটক বা গল্পের বাইরের সাধারণ অর্থটি প্রকাশ করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাময় গূঢ়ার্থটি প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য বা একমাত্র লক্ষ্য। Encyclopaedia of Britannica (vol-1) গ্রন্থে রূপকের (Allegory) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এইভাবে :

"Allegory is the intentional conveying, by means of symbol and image, of further, deeper meaning than the surface one. Allegory thus may be said to be extended metaphor, workedout in many relationships······The chief application of word is to literature, both theological and secular."

আগেই বলা হয়েছে সাহিত্যে রূপকের সার্থক প্রয়োগ আধুনিক কালের ঘটনা। তবে প্রাচীনকালে সাধনপন্থা সম্পর্কীয় উপদেশদানের জন্য, ধর্মীয়

শিক্ষাদানের জন্য রূপক-কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া হত। হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় (Song of solomon) ধর্মশাস্ত্রে উপদেশ দানের নিমিত্ত রূপকের আশ্রয়গ্রহণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে।[৮]

ধর্মশাস্ত্রের বাইরে সাহিত্যে রূপক ব্যবহৃত হয়েছিল প্রায় হাজার বছর আগে—বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতিগুলিতে এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিতায়।[৯] এই সময়ের ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে যে তখন ফরাসী ভাষা ছিল অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। তাই ঐ সময়ে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি যে হতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আর বাংলাভাষার আদি নিদর্শন চর্যাগীতিগুলি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এগুলি এক বিশেষ শ্রেণীর সাধকদের (বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থার সাধকদের) সাধনতত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যম। এর মধ্যে সাহিত্যরস যে রয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় না থাকলেও একথা বলা বোধহয় দোষের হবে না যে, সাধকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধন-রহস্য প্রকাশ করা,—সাহিত্য সৃষ্টি নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে উপরিউক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। চর্যাগীতির আদি চর্যাকার লুইপাদ (আঃ ১০ম শতাব্দ) সাধন-রহস্য শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"কাআ তরুবর পঞ্চবিডাল।
চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল॥" ইত্যাদি…

—আধুনিক বাংলায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায়—দেহবৃক্ষের পাঁচটি ডাল, চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে। এর রূপকার্থটি হল—সাধনার দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়কে জয় করে চিত্তকে দৃঢ় করতে পারলে সাধক মৃত্যুকে জয় করতে পারে। অর্থাৎ সাধন-গুরু শিষ্যকে অচঞ্চল চিত্তে সাধনা করবার জন্য উপদেশ দান করেছেন। আর সাধনতত্ত্বকে সাধারণের (ঐ পথের বা ঐ মার্গের যারা সাধক নয়) কাছ থেকে আড়াল রাখার জন্যই তাঁরা রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রূপকের সার্থক প্রয়োগ রবীন্দ্র নাটকে লক্ষ্য করা যায়।[১০] রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকটির কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। এই নাটকটির কাহিনী রূপকাশ্রিত। নাটকটিতে রূপকের মধ্যে দিয়ে এই সত্যটি প্রকাশ করা হয়েছে যে,—জীবন চিরনতুন,—বিশ্বচিরনবীন। তবে সৃষ্টির অনন্তগতি প্রবাহে জীবনকে,—যৌবনকে মাঝে মাঝে জরা ও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে (নবীন রূপ লাভ করবার জন্য)। এই জরা ও মৃত্যুতে

আসলে জীবন ও যৌবনের অন্তরূপ বা অপরদিক (এ 'পিঠ ও' পিঠ) তাই জরা বা মৃত্যুকে ভয় না করে তাকেও সানন্দে জড়িয়ে ধরলে দেখা যাবে সেও প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

জরাবুড়োকে ধরবার জন্য চন্দ্রহাস ও অন্যান্য ছেলেরা যখন গুহার দিকে এগিয়ে গিয়েছে তখন দেখতে পেয়েছে জরাবুড়োর পরিবর্তে মৃত্যুর অন্ধকার গুহা থেকে যে বের হয়ে এসেছে সে তাদেরই চিরকালের জীবনসর্দার, অর্থাৎ জীবনের গতি-প্রাণ।

এতক্ষণ "প্রতীক" ও "রূপক" সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল, এবারে রূপকের সঙ্গে প্রতীকের বা প্রতীকের সঙ্গে রূপকের কী সম্বন্ধ সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলি রূপক ও প্রতীক পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল! এ দু'টির যে-কোন একটিকে প্রকাশের জন্য অন্যটির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। প্রতীক ও রূপককে পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। রূপকের আশ্রয়েই প্রতীক গড়ে উঠে বা প্রতীকের ভিত্তিই হল রূপক কাহিনী—"At the Renaissance, allegory came to mean the intellectual substitution or interpretation of one symbol on image ..."[১১]

'ফাল্গুনী' নাটকের রূপক কাহিনীটিকে প্রকাশের জন্য কবিকে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন "পাকাচুল"—হল জরার প্রতীক; "গুহা"—মৃত্যুর অন্ধকার গুহা; "জীবনসর্দার"—আমাদের জীবনের গতির ও "চন্দ্রহাস"—প্রেমের প্রতীক। তাই 'ফাল্গুনী'কে কেবল রূপক নাটক বলা ঠিক নয়; এর মধ্যে প্রতীকও বর্তমান। তাই অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এই নাটকটিকে সম্পূর্ণ রূপক নাটকরূপে অভিহিত না করে বলেছেন—"ফাল্গুনী নাটক পুরাপুরি 'এলিগরি' বা রূপক নাট্য না হইলেও কোন কোন স্থলে 'এলিগরি' বা রূপকের ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে।"[১২]

টমসন সাহেব (E. J. Thompson) রবীন্দ্রনাথের যে নাটকটিকে শ্রেষ্ঠ প্রতীক নাটক বলে অভিহিত করেছেন[১৩] সেই 'মুক্তধারা'র মধ্যেও রূপক বর্তমান। এই নাটকটির রূপকটি হ'ল যন্ত্র (কেমনভাবে) মানুষকে গ্রাস করে ফেলে মানবত্বের ওপর (এবং দেবত্বের ওপরও) জয়লাভ করতে চাচ্ছে। কিন্তু যন্ত্র যে মানুষকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না তার প্রমাণ মিলছে এক মহান মুক্তপ্রাণের প্রতীক অভিজিতের যন্ত্রকে আঘাত করে বাঁধ ভেঙে জননীকে শৃঙ্খলমুক্ত করার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন জননীকে

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য এবং যন্ত্রের ওপর জয়লাভ করার জন্য মহান আত্মত্যাগের প্রয়োজন।

ওপরের আলোচনা থেকে একথাই বোঝাতে চাই যে, কেবলমাত্র "রূপক" অথবা কেবলমাত্র "প্রতীক"-এর সাহায্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের আরও একাধিক নাটক আলোচনা করেও আমার মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু তার আর খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত শ্রেণীর নাটকগুলিকে (প্রতীক, রূপক, সাঙ্কেতিক বা সমস্যামূলক নাটকগুলিকে) কোন সমালোচক "তত্ত্বনাট্য,"[১৪] আবার কোন সমালোচক "ব্যঞ্জনা প্রধান" নাটক (suggestive plays)[১৫] বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, ঐ শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে রূপক, প্রতীক বা সঙ্কেত যাই থাক না কেন ওগুলিতে "তত্ত্ব" বা "ব্যঞ্জনা" রয়েছে। আমরাও উপরিউক্ত মতে সমর্থন করে বলব—রূপক, প্রতীক বা সঙ্কেতের কোনটিই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা লেখকদের উদ্দেশ্য নয়,—ঐ সমস্তের মধ্যে দিয়ে একটি গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।*

পাদটীকা:

১। "The main line of succession of the French symbolist movement, it is generally agreed, runs from Bandalaire to Mallarme and thence to Paul Valery."—Literary Criticism, A short History; W. K- Wimsatt & C. Brooks,—P. 593.

২। "Such also were the interests of the English speaking Poets and critics who were most powerfully influenced by the French symbolist."—ibid—P. 597.

৩। "'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসীর গুহা অবশ্যই একটি প্রতীক।"—রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ: প্রমথনাথ বিশী, পৃ: ৪৪৮।

এ প্রসঙ্গে একথা বলা বোধহয় দোষের হবে না যে, অনেকে যে মনে করে থাকেন রবীন্দ্রনাথ বেলজিয়াম নাট্যকার Maurice Materlinck (১৮৬২—১৯৪৮)-এর 'L' Oisean blen' বা 'The blue bird' (109—Nobel Prize—1911)-এর অনুকরণে প্রতীক নাটক লিখেছেন,—সে কথা ঠিক নয়। কারণ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বা আরও অনেক ব্যঞ্জনাপ্রধান নাটক রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird' প্রকাশের আগেই রচনা করেছিলেন।

৪। রূপক ও প্রতীক অংশে এসম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ৫। একনম্বর পাদটীকার অনুরূপ পৃ: ৫৯৬। ৬। ঐ—পৃ: ৫৯৫। ৭। ঐ—পৃ: ৫৯৬। ৮। Ency. Britt. vol. I Allegory. ৯। Narrative and Allegorical Poetry. A short History of French Literature—Geoffery Bretoton. ১০। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যেও রূপকের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়,—'পরশপাথর' কবিতাটি এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১১। ৮নং পাদটীকার অনুরূপ। ১২। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ পৃ: ২৮৯। ১৩। দ্রষ্টব্য: Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist গ্রন্থটি। ১৪। 'তত্ত্বনাট্য'. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, পৃ: ১৪৮। ১৫। Rabindranath Tagore and his Dramatic Genius: Satyendra Nath Ghoshal, Patna University Journal Vol.—22 No 1. *উদ্ধৃত গ্রন্থগুলি ছাড়াও Allardyce Nicoll-এর 'World Drama' গ্রন্থটির সাহায্য নিয়েছি'।

কমলকুমার মজুমদার

ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গ

মাধবায়ে নমঃ জয় রামকৃষ্ণ; সম্প্রতি কোন এক স্বনামধন্য পত্রিকাতে, এখন ইস্কুলের পাঠ্যসূচী বদলের প্রাক্কাল, প্রসঙ্গত যে বিবিধ ভাবনা, ইহা বিদ্যালয়গত আর শিক্ষাক্রম লইয়া, প্রবন্ধাকারে কিছুকাল যাবৎ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, যাহার প্রতিটি প্রণিধানের, যে এবং যাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি; যাঁহারা লিখিয়াছেন, সমস্যা সকল বিবেচনায়, যে অভিনিবেশ করিতে তাঁহারা সমর্থ, যে গুণ বেত্তা এবং গভীরতা তাহাদের, তত্তুল্য কিছুই লেখকের নাই—আমি ক্রাফ্‌ট শিক্ষক, সুতরাং আলোচ্য বিষয়ক সূক্ষ্ম গতি ব্যাপারে আমার স্বত্ব বর্তাইবার নহে—একারণ কোন মন্তব্যই আমার সাজে না; এইমাত্র যে আমি তাঁহাদের নিকট উল্লেখিত তত্ত্ব সম্পর্ককে কিছু জানিতে চাহিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু সমুদয় কথাই বাঙালীকে লইয়া তাই আমার আগ্রহ থাকে; আরও, এবং এই সূত্রে যে আজ বিশ বৎসর হয় কলিকাতাস্থ অতীব সম্ভ্রান্ত, অভিজাত যথার্থই, ইংরাজী মিডিয়াম ইস্কুলের পত্তন হইতেই, এখানেতে আমি কর্মসূত্রেই নিয়োজিত আছি, আমার যোগ থাকিয়াছে।

গত ১৬ই জুন ৭৩ তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধের—'জাতীয় বিদ্যালয়'—লেখিকা লিখিয়াছেন'…এই প্রতিষ্ঠান গুলির সঙ্গে স্থানীয় সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসব-ব্যসনের প্রায় সম্পর্কই নাই। কেবলমাত্র বাৎসরিক বন্যার সময়ে গৃহহীনরা স্কুল বা কলেজ বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং মাসখানেকে সেগুলিকে অব্যবহার্য করে রেখে চলে যায়··"

এখন, যে হৃদয় যে আন্তরিকতা নিমিত্ত, কখনও গান্ধীর নামে কখনও বা রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখিয়া, বিবিধভাবে শ্রদ্ধেয়া লেখিকা আপন দেশবাসীকে সজাগ করিতে প্রবন্ধ ব্যাপিয়া চাহিলেন, যে তাহা ঐ পঙক্তি সকলেতে, ইহা বড় দুঃখের, যে অবশ্যই দুর্বল করিল। অথচ এইখানেতে আছে 'উৎসব-ব্যসনের' পদ; এবং পরিলক্ষিত হয় যে উহা হাইফেনেটেড; অথচ আমাদের ভাবনার সহিত উৎসব ব্যসন শব্দ দুইটি হিতোপদেশ হইতে একটি নিশ্চিত পদবন্ধে জড়িত হইয়া আছে; সেই ব্যসন অর্থে আমরা অবশ্য বোধিত হই যাহা তাহা অশুভ অমঙ্গল বিপদ ইত্যাদি, এবং দশবিধ কামজ দোষ আর অষ্টাদশবিধ ক্রোধজ দোষ……। এই সকল অর্থও অভিধানে দৃষ্ট হয়,

(জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেখুন) কোন অভিধা এখানে যুক্তিযুক্ত ? এবং বন্যাপীড়িতদের স্থান দেওয়া যাহা জাতীয় ধর্মের অঙ্গ বলা যায়, তবে ইহা কেন অন্যায় বিবেচিত হইবে !

ঐখানে, মানে প্রবন্ধতে, যে সকল ইস্কুলের তুলনায়ে, যথা সেবাগ্রাম শান্তিনিকেতন ইত্যাদি, আর অন্যত্রের গুলিকে অপকৃষ্ট বলিয়া নস্যাতিয়াছেন, তাহা বিচারে নিশ্চিতই দাঁড়াইবার নহে, লেখিকাকে ও অনুরোধ করিব তিনিও ভাবিয়া দেখুন, কেন না ঐ ঐ গুলি আবাসিক ইস্কুল, যে এবং উহাদের সহিত তুলনাতে ইঙ্গিতকৃত শিক্ষালয়গুলি সাধারণ ইস্কুল (day school); এই সকল প্রতিষ্ঠানে তাঁহার ভাষাতে 'দুঃসাহসিক' কিছু করিবার স্বপ্নও আসিতে পারে না ; এক আবাসিক ইস্কুল সম্পর্কে চলচিত্তচঞ্চরি'তে* আছে শ্রীখণ্ড বলিতেছেন'...যে রকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক সেটা সাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপলস্ অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি..." এরূপ দুঃসাহসিকতার, বঙ্গদেশে, অনেক ঘটনা আছে যে এবং ছোটমুখেও ইহা দর্শাইতে ইচ্ছা হয়, রবীন্দ্রনাথের তুল্য অভিমানী মানুষকেও যুগধারা মান্য করিতে হয় : ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এখানে স্মর্তব্য। গান্ধীর কথা আমার জানা নাই! ইঁহাদের ন্যায় প্রাতঃস্মরনীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত শিক্ষালয়গুলির ইদানীংকার অবস্থা সম্পর্কে লেখিকা খেদোক্তি করিয়াছেন, তখন আর অন্য ব্যক্তি ঐরূপ কল্পনা কিভাবে করিবে! আরও যে, কোন আদর্শ ই এখন বিলাসিতা হইবে—জাতীয়তা শব্দটি লইয়া অনেক মহান ভাবিয়াছেন যথা 'স্বদেশ প্রেমও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্রবৃত্তি' ইহা শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন ('ধর্মও জাতীয়তা' ১৬ পৃঃ) এবং উহার ব্যাখা ১৭ পৃঃতে এই "...জাতীয়ভাব রাজসিকভাব ; যিনি নিজের 'অহং' দেশের 'অহং'এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্বদেশ প্রেমিক, যিনি নিজের 'অহং' সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা দেশের 'অহং' বর্দ্ধিত করেন, তিনি জাতীয়ভাবাপন্ন।..." —কেন না জাতীয়তার সংজ্ঞা আমাদের নির্দেশিত আছে : দেশরক্ষা ও সমৃদ্ধি। আর এই বিধয়ে আদতে কারিগরী ও ঐ ঐ বোধ হৃদয়ঙ্গম হওয়া নির্ঘাৎ উচিত—লেখিকা এই বুদ্ধিকে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ভাবিবেন না—এখন ঐ ঐ লক্ষ্যে পেঁ ৗছানর প্রণালী লইয়া অনেকেই বিতাণ্ডা করিতেছেন ; প্রসঙ্গতঃ এখানেতে শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মহাশয়ের কথা আসে : ইনি তখন, ১৯৩৬৷৩৮, বিদেশ ভ্রমণ হইতে দেশে ফিরিয়া, ডাক্তারী পাঠরত ছাত্রদের সমক্ষে অতীব

*চলচিত্ত চঞ্চরি : সুকুমার রায় কৃত স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক।

মনোজ্ঞ এক ভাষণ দিলেন, ইহা ইংরাজীতে, যাহাতে এই ছিল যে, "...উহারা এ্যালোপাথী বা হোমিওপ্যাথী লইয়া মাথা ঘামায় না, রোগীকে বড় যত্নে অত্যধিক সহানুভূতির সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকে..." এখানে (!) যথা এলোপাথী এবং যে treat a patient with sympathy..." এখন সহানুভূতি শব্দটি আশ্চর্য্য ঘটাইতে সক্ষম হয়। যে ইহাতে আমাদের গভীর বিশ্বাস আছে; এবং বিশেষত যেহেতু আমাদের ইস্কুলগুলি বেশীর ভাগ সাধারণ ডে ইস্কুল, তাই সেই গুলির কর্তব্য, অন্য অভিনবত্ব না পরীক্ষা করিয়া কর্তৃপক্ষ স্থিরীকৃত প্রণালী যাহা তাহাতেই শিক্ষা দেওয়া এবং লেখিকাও নিশ্চয়ই একই পরামর্শ দিবেন।

যে এখন, যে বিদ্যালয়েতে আমি কর্মরত আছি ঐ নামটি প্রবন্ধতে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও—ত্রৈলেক্যবাবুতে আছে: এক চপলমতি বালক তদীয় পিতার পরিচিত কোন বয়সী ভদ্রলোকের নাম ধরিয়া ডাকিল, এবং ইহাতে মর্মাহত হওয়ত, বালকের পিতাকে তিনি নালিশ করিলেন; পিতা জানিতে চাহিলেন, বালক তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিয়াছে কি? তদুত্তরে তিনি কহিলেন, আজ্ঞে না! পিতা বলিলেন, তবে!—বিবিধভাবে ইহা স্বচ্ছ যে উহা 'সাউথ পয়েণ্ট স্কুল'; এখানে বলিবার এই যে, প্রতিষ্ঠানটি সমাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত কি পর্য্যন্ত ধীরতা অবলম্বনে আজ বঙ্গে অন্যতম শিক্ষালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা অন্তত লেখিকা উপলব্ধি করিতে অবশ্যই পরিবেন, এ কারণ যে তিনিও সাউথ পয়েণ্টেই অনেক দিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যেই আমরা গর্ব অনুভব এখনও করিয়া থাকি; এবং আশা করিতাম যে তিনিও এই নূতন ইস্কুলটির দারুণভাবে বঙ্গের মর্য্যাদা রক্ষা সঙ্কল্প বিধায়ে সাধুবাদ করিবেন।

সম্প্রতি কিছু ব্যক্তির এই শিক্ষালয় পীড়ার কারণ হইয়াছে; অথচ আমাদের এখানে কোন বিশৃঙ্খলতা নাই, ছাত্র সংখ্যা অনেক কিন্তু প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় বলিয়া—প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতিটি বালক বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন—কোন অসংযম তাহাদের মধ্যে আসে না; তাহারা এই স্কুলের ছাত্র সুবাদে গর্ব্ব অনুভব করে: যে এবং একটি নূতন ইস্কুল হিসাবে আমাদের রেকর্ড কখনই আমাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি করে নাই, কিন্তু ছাপোষা গৃহীরা যদি ইহাতে আনন্দিত হন—লেখিকার কথায় 'উদ্বাহু হয়ে অভিনন্দিত করি'—তাহাতে ধমক দিবার কি থাকিতে পারে? শুধু লেখা ও পড়াতে যে রেকর্ড মার্কস পাইয়াছে এমত নহে,

আঁকা খেলা ইত্যাদিতেও যথেষ্ট সুনাম আছে ; এবং যাঁহারা পড়ান তাঁহারা, অতীব সচেতন, যে লাইব্রেরী আছে তাহার সাহায্যে এবং আপন হাত-যশ সহকারে আপন কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করেন, ফলে স্বভাবতই মনে হয় আমাদের খুঁৎ কোথায় যে এবং এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ '৮০ বেতার বার্তায় দেবপ্রসন্ন বসু মহাশয়, ইনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বলিয়াছেন"—আমার খ্যাতি ও কর্মকুশলতাই আমার পরম শত্রু…"

স্থানীয় সমাজের আশা" আমাদের দিক দিয়া বলিব, আজ প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল, আমাদের ইস্কুল হইবার পর, পার্শ্ববর্তী একটি বস্তি নিবাসী বালক বালিকাদের প্রত্যহ লেখাপড়ায় সাহায্য এবং নৃত্যগীত আবৃত্তি ও ক্রাফট শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ; এখনও ইহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তর্গত ; আমাদের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ মহাশয়ের একটি সুষ্ঠ স্কীম আছে যাহাতে সঠিক মর্য্যাদায় ভাগ্যহত বস্তীবাসী ছেলেমেয়েরা, যাহার যেমন অভিরুচি সব কিছু শিখিতে পারিবে ; এখানে আপাতত যে ছেলেমেয়েরা আছে, পাছে তাহারা গৃহের অন্য কাজে মানে অর্থকরী, ব্যাপৃত হয় তাই তাহাদের প্রত্যেককে যথকিঞ্চিৎ হাত খরচ দেওয়াও হয়। এবং আমি নিজে উহার ঐ সান্ধ্য স্কুলের সব কিছুই করি। গত বছর যে মাসে প্রখ্যাত কবি জ্যোতি দত্ত আমাদের এই সংস্থার ছেলেমেয়েদের গীত ইত্যাদি টেপ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী মিডিয়মের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিবার উৎসাহ বোধ করি না, কেন না উহা চলিতেই থাকিবে ; শুধু এই প্রশ্নের উচ্চ শিক্ষালাভ যাহারা আশা করে এখন তাহারা কি করিবে ? তবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বিষয়ে যদি না আমরা আত্মবিস্মৃত হই, ইহা মহাসঙ্কোচেই স্বীকার করিতে হইবে, যে ইহা অন্তত বাঙালীদের প্রায় এক ঐতিহ্য হইতে চলিয়াছে : সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন ১৭৭৩-৭৪ ; এবং এই সময় হইতেই ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার সূচনা হয় —ইতিপূর্বে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব এবং নীলমনি দত্ত, ইনি প্রসিদ্ধ লেখক রমেশবাবুর পূর্বপুরুষ, দুইজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, রতন ধোপা হইতে আরম্ভ করিয়া রাম রাম মিশ্রর নিকট শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ীতে লাগিল, রামমোহনের লেখা এবং রামকমল সেনএর অভিধান প্রমাণ করে যে তাহারা পাকা ইংরাজীনবীশ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ সের Shair ইত্যাদি ইংরাজীতে কাব্যরচনা আমরা দেখি ; রামদয়াল ঘোষের বক্তৃতা, রেভ কৃষ্ণমোহন লেখা সত্যিই মনোজ্ঞ ; মধুসূদন ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিতেন এবং রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, "Fancy I was expected to

specehify in Bengali." এখানে এই 'Fancy' শব্দটি তৎসহ বিস্ময়াদির যতি চিহ্ন খুবই চমকের ; আবার ইনি প্রথম যিনি ভাষাকে ভালবাসার কথা বলিলেন,…Bengali is a very beautiful language,…such as us owing to early defective education, know little of it, and have learnt to despise, are miserably wrong." তাঁহার মত বাঙলা ভাষার সৌন্দর্য্য কে আর দেখিবে ? শুধু এখানে থামিলে লোকে মন্দ কহিবে, কেশব সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, রমেশ দত্ত, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, তরু দত্ত, বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ ইঁহাদের এবং অনেকেরই ভাল কাজ ইংরাজীতেই দেখা যায়, এবং ইদানীংকার বিংশশতাব্দীর অগনণ লেখক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। লার্ড মানে ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেনট্যরীয়ন এম এস্ ঘোষ, ভাবিলে অবাক লাগে, সম্ভবত ১৯ শতাব্দীতে বাঙালী যত ইংরাজী লিখিয়াছেন, তত বাঙলা বা সংস্কৃত লিখে নাই ; তখনকার সকলে ইংরাজীভাষাকে খুব ভালবাসিত,—প্রকাশ থাক যে বাঙালী সর্বসময় অন্য ভাষা শিখিয়াছে, যেমন সংস্কৃত যেমন ফারসী—তাই যোগেন বসু খেদ করিয়াছেন যে বাঙালী ইংরাজীনবীশ রাখিয়া চ্যসর পড়িবে মুন্সী রাখিয়া বাগ বাহার পড়িবে ; ভাল যে বাসিত তাহার কথা প্রভাতবাবুর সেই horns of a dilemmaকে কত ইংরাজী জানে এই তর্ক ! ইংরাজী শিক্ষা লইয়া ঠাট্টা তামাশা অনেকই আছে ; যেমন 'বাপকে বলে মাই ডিয়ার' ! লালবিহারী দে যিনি কোন ইংরাজ গ্রামারিয়ানের ভুল সংশোধন করিয়া দেন, হইতে ভাষা চর্চায় এম, এম, রায়চৌধুরী নাম অক্সফোর্ড কনসাইজএর তুপাতয় ইংরাজী ফাউলার স্বীকার করিয়াছেন। এবং এখানে ইহাও উল্লেখ্য প্রত্যেকই বাঙলা ভাষাও বড় অভিনিবেশ সহকারে শিখিয়াছিন, যেমন মধুসূদন…I did not wish Ram naryan to recast my sentences—most assuredly not, I only requested him to correct grammatical blunders. যেমন শ্রীঅরবিন্দ দীনেন্দ্র রায়ের নিকট বাঙলা শিক্ষা করিতেন ; এমন আছে যে তিনি 'মামার পীরিতে মামী হাঁকচ না কোচ এই পদবন্ধের হাঁকাচ নাকোচ বুঝিতে পারেন নাই ; ইহা বাঙলায় আছে। কিন্তু হেমেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনি যে শ্রীঅরবিন্দ ইহা ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন, "…আই ডোণ্ট আনডারষ্টাণ্ড ওয়াট ইজ হ্যাকোচ আনও ন্যাকোচ"। এখন বাঙালীর সেই গর্ব গিয়াছে ; সম্ভবতঃ ৫৬ বা ৫৭ সালে দেশ সাপ্তাহিকে রাজশেখর বসু একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, "তাহাতে খেদ করেন যে

ইংরাজী লেখার মান যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে," এক সময় ছিল প্রতি বাঙালীই ঐ বিষয় দারুণ সচেতন ছিলেন, কি লেখাতে কি উচ্চারণ—মেজর হবসের বইতে আছে এক বাঙালী জবরদস্ত ইংরাজীনবীশের উচ্চারণের কথা h উচ্চারণ হইত না। লর্ড সিনহা'র গল্প আমরা স্পোকন ইংলিশ ক্লাসে শুনিতাম কোন এক মোকদ্দমা সূত্রে লর্ড সিনহা (তখন ব্যারিষ্টার) রংপুর গিয়াছিলেন, মুনসেফের কাছে (?) তাঁহার কেস, আরম্ভ করিলেন, মিলাড হিজ ক্লাইয়্যানট্ ইজ ক্যাঙসার বাই কসেট! মুনসেফ উত্তর করিলেন : মিঃ সিংহ ডু ইউ মিন টু স্যা হিঝ ক্ল্যায়েন্ট ইপ এ কাঁসারী বাই কাষ্ট! এখন উচ্চারণে যাহা দি-কে সর্বত্রই দা চালিত হইয়াছে। বাঙালী অতীব কষ্ট স্বীকার ঐ রাজভাষা শিক্ষা করে এমন আছে আন্দিরাম দাসের ইস্কুলে ছেলেরা অনেক ঘণ্টা চুপচাপ (!) বসিয়া থাকিত কেন না পুস্তক হইতে দু-চারটি কথা তাহারা জানিবার সুযোগ পাইবে, মৈমনসিংহের কালীপ্রসন্ন ঘোষ, আনন্দমোহন ইহারা পালা করিয়া কয়েক মাইল দূরে যাইতেন এক ভিক্‌সেনারীর সন্ধানে; এখানে ইহা বলিতে ইচ্ছা হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন আর সকল কিছুকে কুসংস্কার বোধে পরিত্যাগ করে, তখন ইংরাজীভাষাই মানে উহার ব্যাকরণ একমাত্র আমাদের নৈতিক অবশ্য তাহা যেমন গান্ধার শিল্পে স্থানীয় প্রচেষ্টা তেমনই সময়কার ব্যাপার হইয়া থাকিবে কি?

অবশেষে, যে ৫ দফা অভিযোগ দেশবাসীর মনেতে আছে বলিয়াছেন, তদানীন্তন শিক্ষা সম্পর্কে তাহার সততা আমাদের ভাবিয়া দেখিবার; কেননা অদ্য যে স্বাধীনতা তাহা ঐ শিক্ষা হইতে কল্পিত, বঙ্কিমবাবুর লেখা হইতে আমরা জানি, দেশ বাৎসল্যে রামদয়াল ঘোষ ঈশ্বরগুপ্ত, 'they say poor Hurrish of the Patriot is dying." হিন্দুমেলা, বঙ্গভঙ্গ চেতনা, সর্বোপরি 'বন্দেমাতরম' হইতে সুভাষচন্দ্র ঐ শিক্ষা প্রাপ্ত, এই স্বাধীনতা সূত্রেই ঐ সকল মানুষদের দেশের নিরক্ষরদের সহিত যোগ ছিল, এমন কি বিবেকানন্দ যিনি ইংরাজী শিক্ষিত সন্ন্যাসী ইনিও ধর্ম (সনাতন ভাবে) হইতে দেশ সেবা লইয়া মাথা ঘামাইতে রহিলেন! (যাহা আমার ন্যায় গোঁড়ার নিকট গর্হিত ব্যাপার!) তখনকার শিক্ষিতরা Impeachment of Warren Hastings বার্ক কৃত ও সেরিডানের 'চৈতসিং' 'মুখস্থ' করিয়াই উদ্বুদ্ধ হইতেছিল। যে এবং সমাজসংস্কার, পরোপকারবোধ, বর্ণবৈষম্যে দোষ-দর্শন ও স্বাভাবিক অস্বাভাবিক বিচার—যদিও বাঙালী 'হুজুতে বাঙ্গাল' আখ্যায়িত অর্থাৎ তর্কে পটু তথাপি আবার বিচারে দড় হইল—সবই ঐখান হইতেই

আসিল। আবার যদি ভাবিয়া দেখা যায়, দেশের সংস্কৃতি, অস্বীকারের উপায় নাই, ইংরাজ হইতেই প্রাপ্ত, এমন আছে একদা বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র) গীতা পাঠ করিতেছিলেন, তৎ শ্রবণে ঠাকুর মন্তব্য করিলেন,…'কোন সাহেব বলিয়াছে বুঝি…' (লীলা প্রসঙ্গ) উইলিয়ম জোনস হইতে হ্যাভেল, ইতিমধ্যে আর বিরাট মানুষরা আছেন যাহারা দেশের একদিকের সংস্কৃতি বিষয়ে আমাদের চেতনাকে গভীর করিয়াছেন—এবং আমরা পট কাঁথাকেঘরে টানাইতেছি!

অনেক কুফল আছে ; যেমন শ্রীঅরবিন্দ, মনে করেন : " অপকৃষ্ট heredityর দোষে, আসুরিক শিক্ষার দোষ অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে।…" এরূপ কথার ব্যাখ্যা আমরা ১৯ শতাব্দীর শেষে প্রকাশিত অনেক উপন্যাসে দেখি ; শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'নয়ন তারা'তে এক ইংরাজী মন্য পরিবারের কথা আছে…'এখন এদের চালচলন এঙ্গলো ভার্নকিউলার হ'য়ে পড়েছে…' এবং বিখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী কৃত 'কাহাকে' গ্রন্থে কোর্টশিপ, টেনিস ইংরাজী গদ্যপদ্য আবৃত্তির কথা আছে। ঐ এঙ্গলো ভার্নাকিউলার ক্রমে যখন ইঙ্গ বঙ্গ সমাজ হইল তাহা আমরা জানি, যেখানে ; ঔ নো, পুটি কাড, স্যর রবীন্দ্রনাথ, ট্যাংকাও, সিলি আরও প্রচুর কথা যে এবং যাঁহারা হিন্দি নেটিভদের সহিত বলিতেন : এ্যাট হোম, টি পার্টির ছড়াছড়ি ছিল! যেমন স্যর লেডীর গায়ে লোকের গা লাগিত : যে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহাদের খুবই ঠাট্টা করিয়াছেন! এখন যে সংস্কৃতির পড়তি গলিতেও আসিয়াছে : মেমসাহেব ঝি'কে কহিলেন :' · মা যাও গিয়া দেখত কে (ভাবিয়াছিলেন স্বীয় কন্যা) কাঁদিতেছে' ঝি দেখিয়া আসিয়া খবর দিল, ও অন্য বাড়ীর খুঁকী কাঁদিতেছে আমাদের বেবি ত ঘুমাইতেছে! এখানে বলা যায়, আমাদের রকম দেখিয়া শ্রদ্ধেয় প্রথম চৌধুরী মহাশয় 'অনেক ধন্যবাদ' চলন করিলেন। এই সকলের বিরুদ্ধে 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথাতে অনেক আন্দোলন আছে, কালী সিংহ, ইহাদের যাচ্ছেতাই করিয়াছেন, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 'কেনা সাহেব' লইয়া পরিহাস আছে। প্রতিভাবান ভূদেববাবুও ইহাদের ধিক্কার দিয়েছেন ; বহু বিলাত প্রত্যাগত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে কারণ ধর্ম, বাঙালিত্ব বিসর্জন দিতে মধুসূদনের মত তাঁহারা রাজী নহেন, গৌরদাস ঠিকানায় ক্রিশ্চান মধুসূদন লেখেন তাহাতে মধুসূদন আপত্তি করিয়া লেখেন 'শুধু এম এস দত্ত বা বাবু দিয়া লিখিতে পার (মিঃ নহে) এবং ৺দুর্গা প্রতিমা যিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই—"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে" এমনই আরও কত লাইন যে আছে।

এত সত্ত্বেও দেখিব, বাঙালীর গর্ব করিবার মত অনেক কিছুই ঐ শিক্ষাবশত এখনও স্মরণে আছে, যে আরও বলা যায় ঐ শিক্ষাকে—যাহা virtue, honour, glory, character এমন নানান সূক্ষ্মতা নূতন করিয়া জাগ্রত করে—তাহা স্বাধীনতার পর দেখিব অন্তর্হিত, হইয়াছে—আমরা কাজে লাগাইতে পারি নাই ; তবে আমরা নিরাশ নহি! আমাদের ইস্কুলগত কর্তব্য, ভগবানকে ডাকি, আমরা সততার সহিত যেন পালন করিতে পারি, আমাদের ভুলত্রুটি আমাদের অতি বড় বন্ধুও না ক্ষমা করেন।

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য

রাঙ্গামুলা

—শেষে অম্বুজাক্ষবাবুরই জয় হইল।

যুদ্ধে নহে, কোন খেলাতেও নহে—সামান্য একটা প্রাইভেট টুইসানির প্রতিযোগিতায়। রিটায়ার্ড সাবজজ যদু মুখুজ্যে মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কণিকা দেবী পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিবে। তাহার জন্য একটি ভাল প্রাইভেট টিউটার চাই। সুন্দরী, প্রগতিসম্পন্না জজ-দুহিতার সঙ্গ লাভই যে একটা মস্ত বড় লোভনীয় আকর্ষণ তাহা অভিজ্ঞ জজ সাহেব ভালই জানিতেন, তাই উচ্চতম যোগ্যতার সহিত নিম্নতম পারিশ্রমিকের টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন। বেতন যৎসামান্য হইলেও প্রার্থীর সংখ্যা যৎসামান্য হয় নাই—রীতিমত প্রতিযোগিতা। অম্বুজাক্ষবাবুর তাহাতে জয় হইয়াছে। অবশ্য এসবক্ষেত্রে অম্বুজাক্ষ চিরকালই জয়ী হইয়া থাকেন। প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়াইবার প্রয়োজন হইলে আগেই খোঁজ পড়ে অম্বুজাক্ষবাবুর। তিনি না পারিলে তবে অন্য কেহ। —অথচ তিনি অবিবাহিত এবং তরুণ যুবক। যে দুটি অবস্থা ছাত্রী পড়াইবার সবচেয়ে অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা, সেদুটির মণিকাঞ্চন যোগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কি করিয়া কিশোরীকুলের অভিভাবক মণ্ডলীর এতখানি বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। তবে দুষ্টলোকে বলিত তেমন তেমন ছাত্রী পাইলে অম্বুজাক্ষ নাকি একঘণ্টার স্থলে তিন ঘণ্টা এবং তিন টাকার স্থলে এক টাকায় পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং ব্যবসা বুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ অভিভাবকই বা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে নারাজ হইবে?—ফলে, অভিভাবক কুলও অম্বুজাক্ষকে একচেটিয়া করিয়া মনে মনে নিজেদের লাভবান মনে করিতেন, অম্বুজাক্ষও তাহাতে লোকসান মনে করিত না।

কেন করিত না সেই জানে। ইহা লইয়া অম্বুজাক্ষকে আমরা কতরকমই যে ঠাট্টা ইয়ারকি করিয়াছি তাহার আর শেষ নাই। এক একদিন মাত্রা ছাড়াইয়াও যাইত, কিন্তু অম্বুজাক্ষ নীরব, নির্বিকার। মুচকি হাসিয়া একান্ত ভাবে খবরের কাগজে ডুবিয়া যাইত, মাত্রাধিক্য ঘটিলে কখনও বা উঠিয়া যাইত, তবু চটিতে দেখি নাই কোন দিন

পাঁচুবাবু বলিতেন—যাই বল তোমরা, লোকটাকে কিন্তু স্ট্রিক্ট মরালিষ্ট বলেই

মনে হয়। নন্দ ঝাঁপিয়া উঠিত—মরালিষ্ট না ছাই, বেটা সেয়ানা ঘুঘু। ডুবে ডুবে জল খায় কিনা তাই একাদশীর বাবা টের পায় না। নইলে হুঃ আমি আর না জানি কি? নন্দ কি জানিত জানি না, তবে এইটুকু জানি যে নন্দও নাকি মাঝে ঐ জাতীয় একটা ভাল টুইশানি যোগাড় করিয়াছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। বয়সের দোষেই তাহাকে ডিসকোয়ালিফায়েড হইতে হইয়াছিল। যদু মুখুজ্যের বাড়ীতেও টোপ ফেলিয়াছিল, কিন্তু মাছে টোপ গিলে নাই।

কেষ্ট বলিত—তা যা বলিস, খাসা চালিয়ে ত যাচ্ছে। কেলেঙ্কারী কোথাও কিছু হলে কি আর এতদিন তা চাপা থাকত? এই ত সেবার আমাদের আধবুড়ো গোপালদাকে পর্যন্ত নিয়ে কি ঢলাঢলি কাণ্ড। ও সব চাপা থাকবার কথা না ভাই। আসলে তোরা যা ভাবিস, লোকটা সে রকম নয় বলেই কিন্তু মনে হয়।

—নাঃ একেবারে ভীষ্মদেব। ও সব আমার ঢের দেখা আছে। দেখ না দুদিন সবুর করে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।—নন্দ বিজ্ঞের মত মন্তব্য করে।

দুদিন পরে কি হইবে বলিতে পারি না তবে এখন ত দেখিতেছি বেশ আছে অম্বুজাক্ষ। পয়সাকড়িও মন্দ জমায় নাই। মাষ্টারী করিয়াও যে পয়সা জমান যায় তাহা অম্বুজাক্ষকে না দেখিলে হয়ত আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। তাহার কাছে কেহ কোনদিন কোন হেতুতে একটা পয়সাও আদায় করিয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলে সেই অসাধ্য-সাধনকারীকে দশটাকা পুরস্কার দিব ঘোষণা করিয়াছিলাম, অদ্যাবধি তাহা দিতে হয় নাই। আমরা একবার কেবল তাহার বাড়ী গিয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরায় আমাদের প্রতি একান্ত কৃপা পরবশ হইয়া বাড়ীর গাছের আধখানা পচা কাঁঠাল 'অফার' করিয়াছিল। হয়ত ইহাই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ বদান্যতা। ওহেন অম্বুজাক্ষের দ্বারা ভবিষ্যতে কি এমন অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা ত আমরা ভাবিয়া পাই না।

কেষ্ট উগ্র হইয়া বলে—ভাইরে। কেলেঙ্কারী করতেও ক্ষমতার দরকার, রুচির দরকার। জামার ছিটে ছাতার কাপড়ের তালি আর ছাতায় জামার ছিটের তালি দিয়ে বেড়ালে প্রেমও হয় না, কেলেঙ্কারীও হয় না। বড় জোর ছাঁদনাতলায় জোর করে ধরে সাত পাক ঘোরান চলে তার বেশী আর ও সব লোকের সাহসে কুলাবে না।

—বেশ ত তাইবা সে করে না কেন?

অম্বুজাক্ষকে আমরা ধরিয়া পড়িলাম—আপনি বিয়ে করেন না কেন!

মাথাব্যথা যেন আমাদেরি। অম্বুজাক্ষ কা তব কান্তা কস্তে পুত্র। গোছের বাজে উত্তর দিয়া এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই কেষ্ট চাপিয়া ধরিল—ও সব ভাঁওতা তাহারা ঢের দেখিয়াছে। বাজে কথা ছাড়িয়া আসল কথা তাহাকে ভাঙ্গিয়া বলিতেই হইবে। অম্বুজাক্ষ একটু থামিয়া বলে—ক্ষেপেছেন মশাই। আজকালকার বাজারে একটা পেট চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। এরপর আবার আর একটা উড়ো আপদ ডেকে আনা—কি যে বলেন ?

কিন্তু আমরা যাহা বলি তাহা আজকালকার চড়া বাজারের ভাঁওতায় এড়াইয়া যাও সহজ নহে। কেষ্ট জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে আপনি কি বলতে চান একটা লোকবৃদ্ধির ভার বহন করবার ক্ষমতা আপনার নেই ? আর এর শুধু ভয়টাই দেখলেন, তাছাড়া আর কিছু নেই বুঝি ?

—কিছু না, কৈ আমি ত আর কিছু দেখতে পাইনে—আলোচনার মোড় ঘুরিয়া যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা দাদা, যদু মুখুজ্যের মেয়েটাকে আপনি পড়াচ্ছেন ত ? কেমন বুঝছেন বলুন দেখি...

—লেখাপড়ায় তেমন সুবিধে বল ত মনে হয় না।

—আরে ধেৎ, লেখাপড়ার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে ? মানে মেয়েটা একটু কি বলে গোছের নয় ? ঘর শুদ্ধ আমরা হাসিয়া উঠি।

অম্বুজ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কি বলে গোছের' মানে ?

ইঙ্গিতটা যেন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

নন্দর আর সহ্য হইল না—আহা ন্যাকা, ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানেন না যেন। নন্দ একেবারে উগ্র হইয়া অমিশ্র গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগে যে ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল তাহার অর্থবোধে কোন অসুবিধা না হইলেও পুনরুল্লেখ করা সম্ভব নহে।

অম্বুজাক্ষ ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

মাস কয়েক পরের ঘটনা। একদিন সন্ধ্যার দিকে কেষ্ট চুপি চুপি আসিয়া খবর দিল—শুনেছিস, পাঁড় ঘুঘু এবার ফাঁদে পড়েছেন—

—মানে ?

—মানে আর কি। অম্বুজাক্ষের দফা প্রায় রফা। রন্ধনপত্র বিদীর্ণ হওয়ার ভয়ে আমরা অম্বুজাক্ষের নামটা একটু বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করিতাম।

—দফা রফা আবার কিরে ? ভেঙ্গে বল সব, অসুখ বিসুখ করে নি ত ?

—অসুখ নয় হে, অতি সুখ। অন্য সব টিউসানি ছেড়ে দিয়েছে বেটা, এখন শুধু জজ সাহেবের বাড়ীটাই চলছে সকাল তুফুর সন্ধ্যে—এর মানেটা কি বলতে পারিস?

—মানে আবার কি। হয়ত জজ সাহেবের বাড়ীতে মোটা রকম কিছু পাচ্ছে, নইলে ও-ত মিছামিছি ভুয়ো খাটবার পাত্র নয়—জানত ওকে।

সন্দিগ্ধের মত ঘাড় নাড়িয়া কেষ্ট বলিল, জানি ত সব; কিন্তু যদু মুখুজ্যে যে তার মেয়ের জন্য মোটা টাকা খরচ করবে তা বলেও ত মনে হয় না। সত্যই তাই। সাব জজ যদু মুখুজ্যে ও ইস্কুল মাষ্টার অম্বুজাক্ষ কেহই কাহারো অপেক্ষা কম যায় না—একেবারে কাঠে কাঠে বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই। সুতরাং এখানে কে যে কাহার কবলিত হইল তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। —চিন্তার কথা বৈকি!

অম্বুজাক্ষের দেখা পাই না অনেকদিন। পথে এক আধদিন ছাতা আড়াল দিয়া দ্রুত ছুটিতে দেখিয়াছি— যদু মুখুজ্যের বাড়ীর দিকে! জানি না চাকরীর টানে, না ছাত্রীর টানে। ডাকিয়াও উত্তর পাই না। আমরা আশায় আশায় দিন গুনিয়া যাই অম্বুজাক্ষ ঘটিত একটা ব্যাপার কবে ঘটিবে।

আরো কিছু দিন যায়। আরো পাঁচটা হুজুগের মত ওটাও আস্তে আস্তে আমাদের মন হইতে মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে। এমনি সময়ে নন্দ একদিন ছুটিতে ছুটিতে আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় আসিয়া বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—শুনেছিস কাণ্ড, যা বলেছিলাম তা হল কি না!

—কি! কি! কি! চারিদিক হইতে সমস্বরে প্রশ্ন উঠিল।

—যদু মুখুজ্যের মেয়ের বিয়ে যে। কাল তারা সব কলকাতা চলে গেল।

উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলাম—অ্যাঁ তাই নাকি! আমাদের গম্বুজের সঙ্গে!

—নয়ত কি! রাস্কেলটা ঐ সঙ্গেই কলকাতা গেল দেখলাম সেজেগুজে।

যাক্, অম্বুজাক্ষের এহেন নীরব সাধনা তাহা হইলে সিদ্ধ হইল। হাজার হলেও জজসাহেবের জামাই। এতদিনের বিনা পয়সার টিউসানির মূল্য উশুল করিয়া তবে ছাড়িল দেখিতেছি। বলিহারি গম্বুজ……কিছুদিন বাদেই দেখি অম্বুজাক্ষ আবার সেই ছাতা আড়াল দিয়া চলিয়াছে। গায়ে সেই তালি দেওয়া হাফ-পাঞ্জাবী, পরণের কাপড় হাঁটুর কাছাকাছি উঠিয়াছে।

জজসাহেবের জামাইয়ের মত বেশভূষা নয়ত। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই বেচারা কেমন যেন থতমত খাইয়া গেল, শুনিলাম যদুবাবুর কন্যার সহিত এক

ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। সে শুধু বিবাহের খাটাখাটুনী করিতে সঙ্গে গিয়াছিল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল অম্বুজাক্ষের। আহাঃ বেচারা! সহানুভূতি জাগাইয়া কহিলাম—এবার থেকে ওসব টিউসানি ফিউসানি ছেড়েদিন দাদা। কি হবে ভূতের ব্যাগার খেটে।

—তা যা বলেছেন। মেয়েদের টিউসানি আর করছিনে, কিছু শিখবার গা নেই। মিছেমিছি শুধু পণ্ডশ্রম……।

হন হন করিয়া চলিয়া গেল অম্বুজ। অতিদুঃখেও হাসি পাইল। বেচারার সুমতি হয় এতে তাও ত ভাল।

নন্দকে সেদিন অম্বুজাক্ষের কথা বলিতেছিলাম—জানিস নন্দ, যদুমুখুজ্যের ব্যাপারে বেচারার খুব উপকার হয়েছে। বিনে পয়সায় মেয়ে পড়াবার নেশা ছুটেছে—

ভ্যাংচাইয়া উঠিল নন্দ।—আরে রেখেদে ও সব ভাঁওতা। বকের আবার একাদশী। আমার পাড়ায় রামজয় ডেপুটির মেয়েকে আবার পড়াচ্ছে কাল থেকে। আমি পঞ্চাশ টাকার কমে রাজী হই নি, ও রাস্কেল শুনি কুড়ি টাকাতেই রাজী।

অবাক হইয়া গেলাম। গল্পে বর্ণিত সামনে রাঙ্গামূলা ধরিয়া গাধাকে দৌড় করাইবার চিত্রটা মনে পড়িয়া গেল। হায়রে—জগতে রাঙ্গামূলার ক্ষেত্র যতদিন থাকিবে রাসভ কুলকে এই অযথা দৌড়ের হাত হইতে অব্যহতি দিবে কে?—বেচারা গাধা!

আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

রবীন্দ্র-সমালোচনার ধারা

পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকেরা প্রায়ই যে মন্তব্যগুলি ক'রে থাকেন তা হলো : 'ইংরেজেরা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারে নি—রবীন্দ্রনাথ যে আদৌ মিস্টিক কবি ছিলেন না, তাঁর যুক্তিবাদী মন এই বিশ্বসংসার সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করত, সেটাই তারা বুঝতে পারে নি।' আমার মনে হয় সমালোচকদের এই মন্তব্যগুলি ভাবনা-আশ্রয়ী এবং পরস্পর বিরোধী। ইংরেজেরা রবীন্দ্রনাথকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলো। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, ইংরেজের কাছ থেকেই প্রথম তাঁর প্রতিভার যথার্থ অনুমোদন এসেছিলো। বিশ্বজনীন কবি, অর্থাৎ সর্বদেশের, সর্বকালের সর্বমানবের কবি হিসেবে তাঁকে প্রথম স্বীকৃতি তারাই জানিয়েছিলো।

তবে এটাও সত্য যে, পরবর্তীকালে সেই রজ রবীন্দ্র-প্রতিভার ভিত্তিহীনতা প্রমাণে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী হয়েছিলো। এটা সম্ভব হ'লো কেমন করে? এর পিছনে কী বিশুদ্ধ সাহিত্যিক কারণ ছাড়াও আরো কোনো কারণ ছিলো? বিষয়টি পাঠকের কাছে স্পষ্ট ক'রে তোলার জন্য একটু বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা প্রয়োজন। পশ্চিমে রবীন্দ্র-খ্যাতির উত্থান ও পতন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তা থেকে অন্তত: একটা স্পষ্ট ধারণা আমরা পেয়েছি সেটা হলো : ইংলণ্ডের উদারচেতা বিদ্বৎ সমাজ বলতে যাঁদের বুঝায় তাঁরা সবাই রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠ ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্যর উইলিয়াম রদেনস্টাইন, ইয়েটস্ (পরে অবশ্য ইনি রবীন্দ্র খ্যাতির মূল্যহ্রাসে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন), ব্রাডলে মেসফিল্ড, রবার্ট ব্রিজেস, জে, এল, হামণ্ড, স্টার্জ মুর, ওয়েলস, গলসওয়ার্দি, এমন কী অসংকোচে পাউণ্ড এবং শ'র নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে হয়। স্যর উইলিয়াম রবীন্দ্রনাথকে প্রথম অবিষ্কার করেন গল্পকার হিসেবে। গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ডে পৌঁছবার বহু পূর্বেই তাঁর কিছু ছোট গল্প অনুবাদের মাধ্যমে ইংলণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছিলো। এবং উপরোক্ত বিদ্বৎ সমাজের অনেকেই তখন গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে মর্ডান রিভিয়্যুতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আরেকটি লেখা পড়ে রদেনস্টাইন এতটা অভিভূত হ'য়ে পড়েন যে

সঙ্গে সঙ্গে সুদূর লণ্ডন থেকে জোড়াসাঁকোতে চিঠি লিখে জানতে চান, 'এমন লেখা আর কোথায় পেতে পারি?' ফেরৎ ডাকেই তাঁর কাছে পৌঁছেছিলো ছোট্ট একটি বাঁধানো খাতা, তবে গল্প নয়—বোলপুর স্কুলের শিক্ষক অজিত চক্রবর্তী অনূদিত কয়েকটি কবিতা। কবিতাগুলি পড়বার পর রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডনে আসার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং ইংলণ্ডে অবস্থানরত তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে বারবার আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন তিনি। রদেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন: 'অবশেষে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন, লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন কবি। সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্র এবং দুই বন্ধু। আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন তিনি। হাতে ছোটো একটি বাঁধানো খাতা। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করায় আমার হাতে তুলে দিলেন। লণ্ডনে আসার পথে তিনি নিজেই কবিতাগুলো অনুবাদ করেছিলেন। সেই সন্ধ্যেতেই কবিতাগুলো পড়ে ফেললাম। পড়ে মনে হলো: এ-এক যুগান্তকারী কাব্যসৃষ্টি যা শুধু বিশ্বের মরমী কবিদের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রখ্যাত সেকস্‌পিয়ার সমালোচক এ, সি, ব্রাডলেও কবিতাগুলো পড়ে মন্তব্য করেন, 'মনে হচ্ছে যেন বহুকাল পরে আমরা এক মহৎ কবিকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি।' আর কবি ইয়েটস্ গীতাঞ্জলির ভূমিকায় যা' স্বীকার করলেন তা যেন ইয়েটসের পক্ষেই সম্ভব। একজন সৎ, রসোত্তীর্ণ কবি ছাড়া এমন মহান স্বীকারোক্তি আর কে করতে পারেন: 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাবলীর অনুবাদ আমার রক্তে এমন দোলা দিয়েছে যা বহুকাল অনুভব করিনি। দিনের পর দিন এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছি—রেঁস্তোরা, বাস, ও ট্রেনের কামরায় কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আমি অনেক সময় পড়া বন্ধ করেছি, যাতে আমার ভাবাবেগ সহযাত্রীদের চোখে না প'ড়ে। ...সমস্ত জীবনব্যাপী যে জগতের স্বপ্ন আমি দেখেছি, কবিতাগুলো আমাকে সে-রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছে। এ-কাব্য মহত্তম সৃষ্টি, তথাপি আমার মনে হয়, যেন ঘাস, তৃণ আর মাটির মতোই তা দেশাতীত।'

'আশ্চর্য হবার মতো ঘটনা বটে, এই ইয়েটস্‌ই কিছুদিন পরে রদেনস্টাইনকে লিখলেন: 'রবীন্দ্রনাথ বাজে—তাঁর কবিতাগুলো জঞ্জাল ও ভাবালুতায় ভর্তি। তিনি ইংরেজী জানেন না.'—ইত্যাদি বহু অশালীন উক্তি করলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। কী ক'রে ইয়েটসের পক্ষে এটা সম্ভব হলো? স্বদেশেও রবীন্দ্র-বিদ্বেষ ছিলো, এবং সে বিদ্বেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও তাঁর কবিতার রস গ্রহণের অক্ষমতাও তার একটি কারণ। কিন্তু কবি ইয়েটস্‌কে কী আমরা

সেই পর্যায়ে ফেলে বিচার করতে পারি? ১৯১২-১৩ সালে যিনি রবীন্দ্র-কাব্যের রসে ভরপুর হয়েছেন, অসামান্য প্রফুল্লতা ও বৈদগ্ধ্য দেখিয়েছেন, গীতাঞ্জলির সমালোচনায়, এবং বলতে গেলে যাঁর উৎসাহ ও সাহায্যে ইংলণ্ডে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হলো, তিনিই রবীন্দ্রকাব্য রসবোধে মূঢ়তার পরিচয় দেবেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই হতশ্রদ্ধ হবেন অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তেও আমরা যে তা ভাবতে পারিনে। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার প্রকাশ্য স্বীকৃতি যখন স্কাণ্ডানেভিয়া, ফরাসী এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলো থেকে আসছে ঠিক সেই সময় ইয়েট্‌স্ তাঁর বিচক্ষণতাকে এভাবে ছোটো করবেন, আমরা অবাক না হয়ে পারিনে।

কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি এখানেই। ইয়েটস যে পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই রবীন্দ্র-প্রতিভার অসারতা প্রমাণে এগিয়ে এসেছিলেন সেটাই আমরা বুঝতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী কবি হিসেবে আবিষ্কার করার পরেই ইয়েট্‌স তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন এ-ধারণাই আমাদের মনে সচ্ছল হয়ে উঠেছিলো। কারণ ইয়েট্‌সকে সমর্থন ক'রে পরবর্তীকালে রদেনস্টাইনও মন্তব্য করেছেন: 'আমি সর্বদা সচেষ্ট ছিলাম যাতে রবীন্দ্রনাথের ঋষিসুলভ সৌম্যদর্শন এবং আধ্যাত্মিক কবিতাবলী প্রধান হয়ে উঠে, ভাববিলাসীদের কাছে এগুলিই একমাত্র আকর্ষণ না হয়ে উঠে। য়ুরোপে ও আমেরিকার আশেপাশে এরকম অনেক অনুরাগী আছেন যাদের কাছে আদর্শের চেয়ে আদর্শবাদীর প্রভাব অনেক বেশী।' বস্তুতঃ এসব বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমে রবীন্দ্র-খ্যাতির পতনের কারণ অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু কে অস্বীকার করবে যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে ভাববাদী চিন্তাধারা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এমন কী তাঁর সাহিত্যের শেষ পর্বে যাঁরা তাঁকে শুধু অবিমিশ্র বস্তুবাদের সমর্থক হিসেবে দেখতে চান, তাঁরাও দেখতে পাবেন শেষ পর্বেও তাঁর ভাববাদী চিন্তাধারা বেশ সুস্পষ্ট। মৃত্যুর অল্পদিন আগে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১-এর কবিতায়: 'তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে / সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।' আবার ১৯৪১-এর ১১ই জানুয়ারীর কবিতায়:

'বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,

যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে
যেখানে অনন্ত দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।'

মৃত্যুর ওপারে কী ক'রে পরিপূর্ণ চৈতন্য বিরাজ করে এবং সব মিথ্যারই ওপরে অনন্তের আনন্দই বা বেঁচে থাকে কেমন ক'রে এবং এই জাতীয় বক্তব্যের মধ্যে সমালোচকেরাই বা কী ক'রে বস্তুবাদী সম্পর্কের তথ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, সত্যি কথা বলতে কী, আমরা যারা যুক্তি-তর্কের বেড়া-দেয়া জটিল জীবনের সীমানায় দাঁড়িয়ে নেই, তারা এর অর্থ উদ্ধার করতে পারি নে।

তবু, এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়তো অবান্তর হবে না। যাঁরা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচার করতে চান, তাঁরা যেন ভুলে না যান যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের অনেক অমিল। রবীন্দ্রনাথের জগৎ, পরিবেশ, অতীত বর্তমান সবই তাঁদের কাছ থেকে আলাদা। তাঁদের অতি সাম্প্রতিক পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী থেকে অনেক-অনেক দূরে। অন্নদাশংকরের ভাষায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জগতে উড়ে এসেছিলেন, তাঁর বার্তা উপনিষদের বার্তার মতোই অসহ্য আনন্দের বার্তা···।'

কিন্তু তাই বলে, পশ্চিমের কিছুসংখ্যক সমালোচকের মতো, তাঁকে আমরা শুধু ভাববাদী বা সুখপ্রদ চিন্তার স্বপ্নবিলাসী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারিনে। আমরা তাঁর স্বদেশবাসী তাঁর প্রতিভা-সূর্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেয়েছি, আমরা জানি, তাঁর কবি-সত্তা তাঁর জীবনবোধ ধাপে-ধাপে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে! এবং আশ্চর্য এই যে, এমনি এক পর্বে যখন তিনি বিশুদ্ধ ভাববাদী চেতনা থেকে ক্রমশঃ বাস্তবতার দিকে এগিয়ে চলেছেন; অর্থাৎ তাঁর কবিতার ছন্দ ও ভাষা বাস্তব সংসারের সঙ্গে নতুন রূপ ধরে উঠবার চেষ্টা করছে ঠিক তখনি পশ্চিমে তাঁকে ভাববাদী কবি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই অপবাদ তীব্র ক'রে তোলা

হয়েছে তখনি যখন তিনি স্বদেশের সংকট মোচনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন— দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার এই মন্তব্যর সত্যতা যাচাই করার জন্য পাঠককে একবার আমি স্বদেশের দিকে মুখ ফেরাতে অনুরোধ করি। ১৯০৫ সালের বাংলাদেশ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী সমাজ গঠনের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে একবার দেখতে বলি। সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতি প্রবন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উল্লেখ করেছেন, 'বঙ্গভঙ্গের পূর্বে ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীসমাজ গঠনের ব্যবস্থাকল্পে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর 'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে :—

'আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েকজন মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব। আমাদের নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্তব্য সাধন আমরা নিজে করিব। আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব। যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়দের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না।'

এই স্বদেশী সমাজের একটি ঘোষণাপত্রও রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। এর কয়েকটি অনুচ্ছেদের এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

(১) 'আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোন প্রকার সামাজিক বিধি ব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হইব না ;

(২) ইচ্ছা পূর্বক আমরা বিলাতী পরিচ্ছদ ও বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না ;

(৩) ক্রিয়া কর্মে ইংরেজিখানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্য সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ রাখিব ;

(৪) যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশী চালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পাঠাইব।'

এরূপ আরো অনেক অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ হয়েছিলো স্বদেশী সমাজের ঘোষণাপত্রে। বলতে গেলে জাতীয়তাবাদ প্রাথমিক অর্থে যে সর্বগ্রাসী বোধ অর্থাৎ যা একটি জাতিকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে প্রণোদনা দান ক'রে সেই বোধেরই বীজ উপ্ত ছিলো স্বদেশী সমাজ গঠনের ঘোষণাপত্রে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

'স্থির হলো সেদিন বাংলাদেশ জুড়ে পালন করা হবে হরতাল অরন্ধন ;

কোনো বাঙালীর বাড়ী সারাদিন উনুন জলবে না। রোগী আতুর বৃদ্ধভিন্ন কেউই সেদিন রাঁধা ভাত তরকারী খাবেন না।...অগ্নিস্পর্শ করা কোনো খাদ্য গ্রহণ করবেন না। সকালে গঙ্গাস্নান...তারপর ভাইভাই বলে ধনী দরিদ্র হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে হাতে হাতে রাখী বাঁধা এবং বিলাতী পণ্য বর্জনের পণ গ্রহণ। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অগ্রবর্তী হয়ে এসে দাঁড়ালেন। তিনি লিখলেন-রাখী বন্ধনের গান—'বাঙলার মাটি বাঙলার জল/বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল'—

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠোৎসারিত এই গান সেদিন বাংলার মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটা অখণ্ড সত্তায় জাগ্রত করে তুলেছিলো।

স্বদেশী সমাজ গঠন ও বঙ্গভঙ্গ অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ যখন এভাবে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীর মনে একটা অসন্তোষ নাড়া দিয়ে তুলছেন তখনো তাঁর কাব্য-প্রতিভা ইংলণ্ডে দীপ্তমান হ'য়ে ওঠেনি। ১৯১২-১৩ সালে অর্থাৎ গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিকভাবে তিনি ইংলণ্ডে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এবং এব্যাপারে ইয়েটসও বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর কাব্য-প্রতিভার মাহাত্ম্য-প্রচার ছাড়াও কী ভাবে তাঁকে লণ্ডন আকাদমীর সদস্যভুক্ত করা যায়, কী ভাবে অকস্‌ফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানিত হতে পারেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনিই সচেষ্ট থেকেছেন বেশী। কিন্তু এই পর্যন্তই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি আর বেশীদূর এগোতে পারেন নি। কারণ ইতিমধ্যে ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথের এন্টিসিডেণ্ট রিপোর্ট লণ্ডন কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলো। লর্ড কার্জন জানিয়েছিলেন, 'ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি আরো অনেক রয়েছেন।' সুতরাং তাঁর মতে ভারত থেকে বৃটিশের একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে অন্য কাউকে গ্রহণ করা যেতে পারে। লর্ড কার্জনের এই চিঠি পাবার পরেও ইংলণ্ডে রবীন্দ্র-প্রচার কিন্তু বন্ধ হলো না। তার কারণ ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। সুতরাং তাঁর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পরে, যে ইংরেজের বড়ো পরিচয় তার সাহিত্য সে কী ক'রে বলে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার ভালো লাগেনা। আর এটাও সত্য তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার রস তাদের যে প্রেরণা দিয়েছে তা পরম সত্যের মতো চিন্ময়, সে রস বিশুদ্ধ অন্য কোনো বস্তুর মিশ্রণ তাতে ছিলোনা। কিন্তু অমৃতসর ঘটনার পর সে-রসে রাজনীতির মিশ্রণ ঘটল। যার ফলে

রবীন্দ্রনাথ যখন নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তারা সেই সত্য থেকে শুধু দূরেই সরে গেলোনা, রবীন্দ্র-সাহিত্যকে গ্রহণ ক'রে এতদিন যে শ্রদ্ধা, বিনয় ও সত্যশীলতার পরিচয় তারা দিয়ে আসছিলো সেটাও মুছে ফেলল সেদিন। ইংরেজের এই চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'তারা যে শেলী কীটসের স্বজাতি একথা সত্যি বলতে, আমাদের পক্ষে ধারণা করাই দুরূহ।'

শুধু এটাই নয়, রবীন্দ্রনাথের নাইট পদবী প্রত্যাখানের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে তৎকালীন ইংলিশম্যান পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিলো তার প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি: 'এই বাঙালী কবি যার নাম পঞ্জাবে কেউ শোনেনি, আর যিনি লেখক হিসেবে নিশ্চয়ই কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসনের মতো জনপ্রিয় নন, তিনি নাইটই হোন বা শাদাসিদে বাবুই থেকে যান, তাতে বৃটিশ রাজত্বের সম্মান এক কানাকড়িও যেন এসে যায়।'

অথচ এ ঘটনার দু'দিন আগেও তারা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কী-না করেছে? 'তার কবিতা এশিয়া এবং য়ুরোপকে এক করবার মাঙ্গলিক গীতি যেন—এ থেকে জন্ম নেবে মানব-আত্মা।' চার্লস বডউইনের এই উক্তি কিম্বা কেইসারলিঙের মতে—'তার পরিচিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মহত্তম পুরুষ—য়ুরোপের ইতিহাসে এ-রকম বিরাট ব্যক্তিত্ব হোমারের পর দেখা যায়নি।' এসব মন্তব্য কী নিছক প্রশস্তি-বচন না এর পিছনে পশ্চিমের বৃহত্তর পাঠক-গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ার সমর্থন ছিলো?

আসলে বৃটিশ শাসক-সম্প্রদায় ততদিনে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা তাদের স্বার্থের বিরোধী। কাজেই তারা মনে করল, এতদিন যাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর কথা বলেছেন—তাঁর কবিতার রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে বিশুদ্ধ মন্তব্য করেছেন, তাঁদের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথকে বিলুপ্ত করতে হবে। কবি ইয়েটস্ এবং রদেনস্টাইনকেও আমরা সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। সুতরাং আমরা অসংকোচে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর কথা বলবার জন্য যে গভীরতা থাকা প্রয়োজন তা এঁদের দু'জনের কারো মধ্যেই ছিলোনা। এবং সে-কারণেই এঁরা সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে লোকের মতোই রবীন্দ্রনাথকে নিজের দেশে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই আমার মনে হয়, রুস লেখক ভিক্তরস ইভবুলিশ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম ব্যাখ্যা করতে 'গিয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধে এই শ্রেণীর

লিখেছে 'স্থি...জ লেখককে 'সাহিত্য ব্যাপারী' বলে আখ্যায়িত ক'রে ঠিকই করেছেন।

কিন্তু আমরা আরো আশ্চর্য হই যখন বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজ কবি-সমালোচক টি, এস, এলিয়ট পর্যন্ত সেই সব সাহিত্য-ব্যাপারীর সঙ্গে কণ্ঠ-মিলিয়ে বলেন : 'রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং কবি হিসেবে তিনি নগণ্য।' জর্জ ক্লোয়েনও টাইমস পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর অন্তঃসাশূন্যতা সম্পর্কে বহু অপভাষ প্রচার করেছিলেন কিন্তু তা-সত্ত্বেও তাঁর প্রতি আমরা ততটা বিরূপভাব পোষণ করিনে। এই কারণে যে, তিনি একজন কাগুজে লেখকমাত্র, সুতরাং তাঁর পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মনোরঞ্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা' খুশি মন্তব্য করা সহজ এবং সেটা তাঁর স্বভাবের মধ্যেও বটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সেই জর্জ ক্লোয়েন এবং এলিয়টের মধ্যে যখন কোনো প্রভেদ দেখিনে তখন সত্যিই আমরা বেদনাবোধ করি। এবং আমরা আরো বেদনাবোধ করি তখন যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী পশ্চিমে রবীন্দ্র-খ্যাতির পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই ক্লোয়েন-গোষ্ঠীর শরণাপন্ন হই এবং তাঁদের বক্তব্যকেই পুরোপুরি সমর্থন করি। আমরাও বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করি, 'রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির মূলে যে-কারণ, পতনের মূলেও তাই। অর্থাৎ তিনি মরমী কবি, তাঁর গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি পশ্চিমের পাঠকের কাছে প্যাশন সঙ্গীতের মতোই একটা ক্ষণিক অনুরণন তুলেছিলো মাত্র। ফলে সেই ক্ষণিক অনুরণন থেমে যাবার পর তাদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ অপসারিত হবেন এতে আর আশ্চর্য কী ?

কিন্তু সত্যিই কী তাই ? রবীন্দ্রনাথ কী এমনি একজন মরমী বা মিষ্টিক কবি যাঁকে সহজেই ব্যক্তিজীবন থেকে, সমাজজীবন থেকে, মানব-জীবন বা বিশ্বসংসার থেকে অপসারিত করা যায় ? আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কেন, তিনি তো মানব-ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়—তাঁর মতো রসোত্তীর্ণ মিষ্টিক কবি ইতিপূর্বে আর কেউ এনেছেন কী না সন্দেহ, তাঁর চেয়ে তুলনাহীনভাবে সাধারণ কোনো মিষ্টিক কবিকেও মানব-জীবন ও জগৎ সংসার থেকে অপসারিত করা যায় না। কারণ মিষ্টিক কবিদের চরিত্র লক্ষণই যে বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হওয়া। সেই প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, যে, পৃথিবীর সব মহৎ কবিরাই মিষ্টিক। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'অন্তর মম বিকশিত কর/অন্তরতর হে', কিম্বা বিষ্ণু দে যখন বলেন, 'হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন' তখন তাঁরা উভয়েই যেন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসানে জীবনের এক পরম সত্যে উপনীত হোন, নিজেকে অর্গলমুক্ত ক'রে দেন ক্ষুদ্র

থেকে বৃহৎ-এ, দেহ থেকে দেহাতীতে, সীমা থেকে অসীমে চলে যান তাঁরা। সম্প্রতি জনৈক কাব্য-সমালোচক জ্ঞানপীঠ প্রাপ্ত কবি বিষ্ণু দের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তা এখানে অনুধাবনযোগ্য ;

'যে আকাশে চলে প্রাজ্ঞ বটের নীল বিহার
শঙ্খ চিলের মিছিল ওড়ে যে আকাশ জুড়ে,
সূর্যমুখী যে জন্যে পেতেছে হৃদয় তার
নক্ষত্রের আবেশে পথে ধূলাও ওড়ে
বৈশাখী সেই ঝড়ের আকাশে কান পাতো আর
বিরাট শুন্যে মৈত্রীর সুরে মেলাও স্বর।'

এখানে কবি আহ্বান করেন', ব্যক্তি সত্তাকে

দেহাত্মবাদের গণ্ডি থেকে মুক্ত হতে, প্রপঞ্চ জ্ঞানের ক্ষুদ্র সীমা থেকে অসীম বিশ্বে ব্যাপ্ত হতে। এখানে কবি শুধু নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধির। কিন্তু যিনি জানেন গভীরে যেতে, যে-কবির সংযোগ হয়েছে চিন্ময় সত্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে, যিনি উপলব্ধি করেছেন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এক অনাদি, অনন্ত সত্তা নিজেকে নানাভাবে ব্যক্ত করেছে এবং মানুষের মনেও সেই প্রকাশের মহিমা বিভিন্নভাবে প্রতিভাত, সেই কবি কাব্যে যে-সব পরিবেশন করেন তা সত্যিই অলৌকিক ; যে-বোধ প্রকাশ করেন তা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত যে-অপরিমিত আলো আছে, প্রত্যেক ধূলিকনায় যে সম্ভাবনা আছে, তার প্রতি তাঁর পরম বিশ্বাস। তিনি হলেন 'মিষ্টিক' কবি।'

(উত্তরসূরি : কার্তিক-পৌষ ১৩৭০)

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সৃষ্টির পর্যবেক্ষণ ক'রে কেউ যদি তাঁকে মিষ্টিক কবি হিসেবেও আখ্যায়িত করেন তাতে কোনোক্রমেই তাঁর পশ্চিমে অবক্ষয়ের কারণ সুনিশ্চিত হবে না। তিনি মিষ্টিক হলেও তাঁর মাহাত্ম্যে আমরা এবং পশ্চিমের বৃহত্তর পাঠক-গোষ্ঠী পূর্ণ বিশ্বাসী। এবং বলা যেতে পারে, মিষ্টিক হওয়ার জন্যই তিনি সর্ববিদ ডগমা থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, অন্ধবিশ্বাস থেকে যুক্তি হতে পেরেছেন, অন্ধবিশ্বাস থেকে যুক্তিতে এবং ঈশ্বর থেকে মানুষে আস্থা স্থাপন করতে পেরেছেন তিনি। মিষ্টিক হলেও তাঁর জুড়ি মিষ্টিক কেউ নেই। ঋকবেদের শুনঃ শেপের কাহিনীর সেই বালক যাকে দেবতার যজ্ঞে নিবেদ্য হতে হয়েছিলো—পিতামাতা, ধর্ম, সমাজ, এমন কী দেশের রাজা পর্যন্ত যার জীবন রক্ষা করতে অগ্রসর হন নি সেই বালকের কাতরোক্তি : 'কস্ত্রাতা ভবিষ্যতি হবে' কে আমার পরিত্রাতা হবে, বিশ্বের অদ্বিতীয় মিষ্টিক রবীন্দ্রনাথই একমাত্র মানবতার সেই কাতরোক্তি শুনতে পেরেছিলেন। তিনি মিষ্টিক হিসেবেও তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে আমরা যদি অপরাগ হই তাতে শুধু তাঁর কবিতার রস গ্রহণের অক্ষমতাই আমাদের প্রকাশ পাবে না, সেটা হবে আমাদের দাস মনোভাবেরই নিদর্শন।

সতীকান্ত গুহ

প্রতিদ্বন্দ্বী

ললিতা আয়েঙ্গার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, "এত রাতে আজও তো মিষ্টার ঘোষ দিব্যি গেট খুলে একাই অন্ধকার বীচ্-এ চলে গেলেন!"

হোটেলের ম্যানেজার বিব্রতকণ্ঠে বললেন, "একাধিকবার তাঁকে সাবধান করেছি। বড় ক্লায়েণ্ট! এর বেশী আর কী করতে পারি?"

ললিতা আয়েঙ্গার অপ্রসন্ন মুখে চলে গেলে পর ম্যানেজার ষ্টুয়ার্ডকে বললেন, "ক'টা দিনের আলাপেই এত! গেঁথে ফেললেই তো পারে।"

কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকার। পথের দুধারে বালুরাশির বিস্তীর্ণ অস্পষ্ট পৃথিবী। অনিরুদ্ধ ঘোষের চোখ ও কান আজ বিশেষ সতর্ক। তিনি আজ নিয়ে পরপর সাতরাত বীচ্-এ আসছেন, তাঁর জীবনের এক অবিশ্বাস্য সংলাপ ও দ্বৈরথের জন্য। প্রতিরাতের মতো আজও তিনি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে টের পান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত।

"কাঁটায় কাঁটায় মাঝরাতে এসেছ। তোমার সময়জ্ঞানের প্রশংসা না করে পারি না।"

অনিরুদ্ধ চমকে ওঠেন। আজ প্রতিদ্বন্দ্বী বাক্‌সর্বস্ব নয়। শরীরী। বীচ্-এ যে বেঞ্চিটায় বসে তিনি সকাল ও সন্ধ্যা কাটান, সে সেখানেই বসে রয়েছে! অন্ধকারের একটি ভীষণ প্রতিরূপ। একটি অপ্রাকৃত অতিমানুষ। দুটি গভীর অতলস্পর্শ চোখ।

"শেষদিন সশরীরে দেখা দেব বলেছিলাম। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। আজ তুমি হার মেনে নাও। এই শেষ খেলার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে তোমাকে কলকাতা থেকে এখানে টেনে এনেছি।"

অনিরুদ্ধ এবার জবাব দিলেন। বললেন, "আমিও স্বেচ্ছায় এ খেলার শেষ দেখতে এসেছি।"

"স্বেচ্ছায় এসেছ? তোমার নিজের ইচ্ছা বলতে কিছু আছে না কি?" প্রতিদ্বন্দ্বী চাপা গলায় হাসতে লাগলো। বলল, "এক এক করে ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের ঘটনাগুলো মনে করোতো! পিঁপড়ে মাড়ালে মন খারাপ হয় সেই তুমি ছেলেবেলায় একটা ডানা ভাঙা পাখীর আর একটা ডানা

ভেঙে দিয়েছিলে। তুমি চিরকালই বেড়ালের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। তোমার মার পোষা বেড়ালটা একদিন দুপুরে তোমার তাড়া খেয়ে কুয়োয় পড়ে যায়। লোকজন এসে পড়লে রক্ষা পেত। তুমি কাউকে কিছু না জানিয়ে ভালোমানুষ সেজে ফিরে এসেছিলে। তোমার যখন আঠারো বছর বয়েস, একটি ষোলো বছরের অনাথ মেয়ে তোমাদের সংসারে আশ্রয় নিয়েছিল। তুমি—"

অনিরুদ্ধ রুদ্ধস্বরে বললেন, "ও বিষয়ের উল্লেখ কোরো না।"

প্রতিদ্বন্দ্বী হেসে বলল, "বেশ! উল্লেখ করব না। কিন্তু প্রতিবারই তোমার ইচ্ছার উপর আমার ইচ্ছা খাটিয়ে তোমাকে দিয়ে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছি।"

অনিরুদ্ধ বললেন, "এতে তোমার লাভ?"

"লাভ নয়?" প্রতিদ্বন্দ্বীর কণ্ঠে বিস্ময় ও উত্তেজনা ফেটে পড়ল। "তাহলে শোনো। আসলে ওগুলো তুচ্ছ ব্যাপার। হাতে খড়ির সামিল। ক্রমে ক্রমে তোমার ইচ্ছা ক্ষয় করে এমন করে তুলেছি তোমার নিজের ইচ্ছা বলতে এখন কিছু নেই। এখন তোমাকে দিয়ে আসল কাজ করিয়ে নিতে পারি।" একটু থেমে বলল, "নারী সৃষ্টির ও প্রেমের প্রতীক। তোমাকে দিয়ে নারীজাতির উপর আক্রমণ চালাতে চাই। নারীকে কলুষিত করতে পারলে প্রেমের ও সৃষ্টির একটা চমৎকার কদর্থ হয়।"

অনিরুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীর এ কথায় দেহে মনে যেন জমে গেলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী বলল, "ললিতা আয়েঙ্গার স্বরূপা সুভাষিণী নিষ্কলুষ। তোমার প্রতি আসক্ত। সত্য কি না?"

অনিরুদ্ধ বললেন, "সত্য"।

প্রতিদ্বন্দ্বী বলল, "ললিতা আয়েঙ্গারের উপর আক্রমণের জন্য তোমার ভিতর আমার ইচ্ছার ক্রিয়া সুরু হয়েছে। রাতে আমার ইচ্ছায় তোমার ঘুম ভেঙে যায়। তুমি তখন তাকে কামনা করো। তাকে শয্যায় পেতে চাও।"

অনিরুদ্ধ নিরুত্তর।

প্রতিদ্বন্দ্বী চাপা গলায় বলল, "ললিতা আয়েঙ্গারের আকাঙ্ক্ষায় তোমার রক্তে মন্থন সুরু হয়েছে। আজ আর তুমি পারবে না। ভালোয় ভালোয় আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো।"

অনিরুদ্ধ বললেন, "না। কিছুতেই না।"

প্রতিদ্বন্দ্বী বলল, "বেশ! তাহলে নিজেকে রক্ষা করো। ঐ যে ললিতা আয়েঙ্গার আসছে।"

টর্চের আলোয় পথ দেখে ললিতা আয়েঙ্গার আসছে। কামনারূপিণী যৌবন-সুরভিতা ললিতা আয়েঙ্গার।

অনিরুদ্ধের ভিতর এ কে গর্জন করে ওঠে? বাঘের মতো কে ললিতা আয়েঙ্গারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়? তাঁর দুহাত মুঠ হয়ে আসে। আজ তাঁর চরম সংকটে তিনি তাঁর আত্মাকে স্মরণ করেন। তাঁকে সশরীরে দেখতে চান। তাঁর হাত ধরে দাঁড়াতে চান। অনিরুদ্ধ দৃঢ়স্বরে বলেন, "আমাকে দিয়ে হার মানাতে পারবে না। আমার দিব্যাস্ত্রের কথা তুমি জানো না।"

"দিব্যাস্ত্র?" প্রতিদ্বন্দ্বী হাসতে সুরু করে।

অনিরুদ্ধ শান্তকণ্ঠে বলেন, "আমার দিব্যাস্ত্র মৃত্যু।"

প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ফুটে ওঠে। "তুমি মরে ফাঁকি দিতে চাও?"

"ফাঁকি দিতে নয়। জিততে। বারবার মরে বারবার পৃথিবীতে ফিরে এসে তোমার ইচ্ছা চূর্ণ করতে চাই।"

ললিতা আয়েঙ্গার এসে পড়েছে। আর সময় নেই। অনিরুদ্ধ পকেট থেকে রিভলভার বার করে এনে বুকে ঠেকান। ক্ষোভে রোষে প্রতিদ্বন্দ্বীর অপ্রাকৃত মুখ বিকৃত হয়। অনিরুদ্ধ একবার, দুবার ট্রিগার টেপেন।

রিভলভারের আওয়াজে হোটেল থেকে অনেকেই ছুটে এসেছিল। কোনো ব্যক্তিগত কারণে অনিরুদ্ধ আত্মহত্যা করেছেন বুঝতে কারো বাকি রইল না। কিন্তু তাঁর মুখে গভীর তৃপ্তির ও উল্লাসের অর্থ কেউ খুঁজে পেল না। ললিতা আয়েঙ্গারও না।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তি-সাধনায় দুর্গা ও দেবী-পরিজন

স্মরণাতীত কাল হইতেই মাতৃশক্তির (Mother Goddess) উপাসনা পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে শক্তিতন্ত্র বা শক্তিসাধনার ইতিহাস অতীব প্রাচীন। প্রাক্-আর্য সিন্ধুসভ্যতার যুগেও শক্তি-উপাসনার তৎকালীন একটি ধারা অধুনালব্ধ মৃন্ময় মূর্তিগুলির কয়েকটিতে অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বে আর্যেতর জাতিগুলির মধ্যে শক্তিসাধনা প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আর্য-সংস্কৃতিতে ধীরে ধীরে অনার্য শক্তিসাধনার প্রবেশ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে মধ্যযুগের ইতিহাসে শক্তিসাধনা বা তন্ত্রসাধনার ব্যাপক প্রসার ও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

শক্তিসাধনার তত্ত্বটি হইল—মূল প্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশী সর্ববস্তুর আধার এবং পরম শিবের সহিত একাত্ম। এই আদ্যা প্রকৃতি নিজের সহিত ক্রীড়াব্যপদেশে স্বয়ং প্রক্ষুব্ধা হন এবং অবশেষে আত্মস্থৈর্য ভঙ্গ করিয়া দ্বিধা বিভক্ত হন। বিভক্ত শক্তিদ্বয়ের অধিকতর চিদাত্মিকা শক্তি হইল শিব এবং অপরটি জীব। মূলপ্রকৃতির সার হইল পরম শিব এবং শক্তি হইল পরাশক্তি। আবার শক্তিবাদে শক্তিই হইল সারভূতা, শিব এই আদ্যা প্রকৃতির অক্রিয়াত্মক অবস্থা বা নামবিশেষ। আদ্যা প্রকৃতি যখন প্রকাশাত্মিকা তখন শক্তি দ্বিধা। মূল প্রকৃতি ও শিবতত্ত্ব আসলে এক অদ্বয় তত্ত্ব। যাহা শক্তি, তাহাই শিব; যাহা শিব, তাহাই শক্তি। মহাশক্তি কালিকা তাই 'শিবরূপা সনাতনী'। ভারতীয় দর্শনে শক্তি ও শক্তিমতের অভেদ সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে দয়িত কৃষ্ণ ও দয়িতা রাধার অভেদ আরোপ করা হইয়াছে। কৃষ্ণরাগাত্মিকা পরমা প্রকৃতি কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিতা হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণে পরিণত হইয়া যান। বিদ্যাপতির রাধা তাই বলিয়াছেন—'না সো রমণ, না হাম রমণী।' তন্ত্রে আবার দেখি, পরমাত্মারূপী শিব মহামাতৃকাকে জাগরিত করেন এবং এই জাগরণ আত্মতত্ত্বে অন্তলীন স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের পরিস্ফুরণের জন্যই। স্ফুরদ্রূপ প্রভাস্বর চৈতন্যের মধ্যে সর্বাবস্থায় বিরাজ করিতেছে শাশ্বত অহম্ (Iness)। ইহারই

প্রভাবে অখণ্ড চৈতন্যে ক্রিয়া উদ্বোধিত হয়। এই শক্তিতত্ত্বে প্রাচীন ভারতীয় আস্তিক দর্শনেরও ছায়া পড়িয়াছে। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বের মূল প্রকৃতি বিশ্বজগতের এক অপরিমিত কারণ, অধিকারী, নিত্য, সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ও ত্রিগুণাত্মক; কিন্তু নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির সাম্যবস্থা বিক্ষুব্ধ হইলে সৃষ্টিপ্রকরণের শুরু হয়। বেদান্তের মায়াশক্তির প্রভাবেই আদ্যাশক্তির আর এক নাম মহামায়া।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শক্তিসাধনা এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনায় দর্শন ও সাহিত্যের বিচিত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে। আবার বাংলাদেশই শক্তিপূজার প্রাণকেন্দ্র। বাঙ্গালী চরিত্রের মাধুর্য ও রুক্ষতা, সৌন্দর্য ও কাঠিন্যের কঠিন কোমল-নিটোল সমাবেশে দেবী আমাদের অন্তরের অন্তরলোকে উদ্‌ভাসিতা শক্তিরূপিনী এই দেবীর বিশেষ একটি রূপ দুর্গা। এই দুর্গাপূজা বর্তমানে বাঙালীর জাতীয় উৎসব। দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে, অথবা তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। বাঙ্গালীর সাধনা ও সংস্কৃতিতে দেবী দুর্গা ভিন্নরূপে ভিন্ন মহিমায় দীর্ঘকাল ধরিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন। দেবী কখনো নবমী গৌরী কিশোরী, আবার লীলাকমলধারিণী অনূঢ়া ষোড়শী যুবতী, এই তপশ্চারিণী নবযৌবনবতী নিখিল বিশ্বের নবকৌমুদী বালমৃগাক্ষি কন্যাই পাতিব্রত্যধর্মের আদর্শরূপিণী পার্বতী, কখনো সর্বৈশ্বর্যময়ী অন্নপূর্ণা অন্নদা, কখনো মাতৃরূপে বরাভয়দায়িনী মহিমময়ী কল্যাণী শস্যসম্পদরূপিণী, কখনো বা দ্বিপিচর্মপরিহিতা পীনোন্নতপয়োধরা নরমালা বিভূষণা অসুরনাশিনী উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা করালী বামা, কখনো বা শোণিতলোলুপা আলুলায়িতকুন্তলা দংষ্ট্রাকরালবদনা দিগম্বরী বিপরীত রতিবিহারিণী মহারৌদ্রী।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ-উপপুরাণ, প্রভৃতিতে আমরা ভিন্নরূপে ভিন্নপ্রকৃতিতে দেবী দুর্গার উল্লেখ পাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবী বৈরোচনী কাত্যায়নী কন্যাকুমারী বাজসনেয়ি সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী। ত্রিগুণাত্মিকা সাবিত্রীরূপে দুর্গার মধ্যে বৈদিক গায়ত্রী ও সরস্বতীর প্রভাব পড়িয়াছে। বৈদিক সূর্যদেবতার জ্যোতিরূপী প্রকাশমান শক্তি গায়ত্রীকে ব্রহ্মশক্তিরূপে উপাসনা করা হইয়াছে।

দুর্গার 'উমা' নামটিও অতীব প্রাচীন। 'কেন' উপনিষদে এই উমা হইলেন ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী জ্যোতির্ময়ী আদিশক্তি,—কারণ ইনিই ব্রহ্মশক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেবগণের নিকট ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করেন। তখন ইনি

'বহুশোভমানা হৈমবতী উমা'। 'হরিবংশে' দেবী দুর্গা 'নন্দগোপকুলে জাতা' বলিয়া উল্লিখিতা। মহাভারতে দেবী যশোদা-গর্ভজাতা। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী 'নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদা-গর্ভসম্ভবা' এবং নারায়ণীস্তুতিতে 'অনন্তবীর্যা শক্তি। দুর্গার প্রধান প্রধান রূপের মধ্যে মহিষাসুরমর্দিনীরূপই আমাদের বিশেষ পরিচিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দৈত্যনাশিনী দেবীর মহিষাসুরবিনাশমূর্তিতে আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী। দেবী তখন সিংহবাহনা দশপ্রহরণধারিণী দৈত্যদলনী সত্ত্বরজঃতমোগুণাত্মিকা। আশ্রিতের সকল দুর্গতি নাশ করেন বলিয়াই আমরা দেবীকে দুর্গারূপে জানি। দেবীমাহাত্ম্য দেখি যে দুর্গমাসুরকে বধের জন্যই দেবী দুর্গ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। অথবা মহাবিঘ্ন, কর্মফল, শোকদুঃখাদি বিনাশের জন্যই ইনি দুর্গা। পরবর্তীকালে ভক্তের কল্পনায় দুর্গাশব্দের প্রতিটি বর্ণ ই বিশিষ্ট অর্থের বাচক—দকারের অর্থ দৈত্যনাশ, উকার বিঘ্ননাশার্থক, রকার বা রেফ রোগবিনাশার্থক, গকার পাপনাশার্থক, আকার ভয়শত্রুঘ্নবাচক। কেহ কেহ আবার দেবীর এই অভিধাকে প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রে রাজশক্তির উৎসস্থল দুর্গের (fort) অধিষ্ঠাত্রী বা দুর্গরক্ষাকারিণীরূপে ব্যাখ্যা করিয়া নামটিকে ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেবীভাগবৎ-পুরাণে নগররক্ষার জন্য দেবীকে অনুরোধ করা হইয়াছে। দেবীপুরাণে দেবীকে দুর্গে বিচরণশীলা দুর্গেশ্বরী বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। মহিষাসুরকে মর্দিত করিয়াই দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। দেবীমাহাত্ম্যে দেখা যায় যে দেবী মহিষ-রূপধারী অসুরকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে ত্রাণ করেন। অবশ্য সায়নাচার্য ঋগ্‌দেবব্যাখ্যায় 'মহিষ'-শব্দটিকে মহান্‌ বা বৃহৎ অর্থেও গ্রহণ করিয়াছেন। আবার উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় দুর্গাতত্ত্বও আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে ভক্তের নিকট—'ভূতানি দুর্গা, ভুবনানি দুর্গা, স্ত্রিয়ো নরশ্চাপি দুর্গা, পশুশ্চ দুর্গা, যদ্‌ যদ্‌ হিং দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা।'

আদিভূতা সনাতনী বিদ্যারূপে মুক্তিদায়িনী, অবিদ্যারূপে সংসারবন্ধন-কারিণী। মহামায়া জগৎপতির বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী, বৈষ্ণবী শক্তিরূপে ইনি বিষ্ণুমায়া চণ্ডীতে যিনি অবিদ্যা বা যোগনিদ্রা, পুরাণাদিতে তিনিই মহামায়া, যোগমায়া। জীবগোস্বামীর ভাগবৎ-সন্দর্ভে কৃষ্ণ ও দুর্গা তত্ত্বতঃ অপৃথক্‌। কালিকাপুরাণ অনুযায়ী মহামায়া রজঃ ও তমোগুণাত্মিক, কিন্তু বিষ্ণুমায়া সত্ত্বস্বরূপা। সহজিয়াতন্ত্রে দুর্গা ও রাসপ্রিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীকে পার্বতীরূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে। দেবতাদের স্তবকালে জাহ্নবীর জলে স্নানরতা পার্বতীর শরীরকোষ হইতে শিবারূপিণী

কল্যাণময়ী স্ত্রীমূর্তি উদ্‌গত হয়, তাই তিনি কৌষিকী। ইহারই প্রভাবে পার্বতী হিমাচলাশ্রিতা কালিকা নামে খ্যাতা। আবার এই পার্বতীই ভিন্নরূপে অতীব সুমনোহরা অম্বিকা। হিমালয় দেবীকে সিংহবাহন দান করেন বলিয়াই দেবী সিংহবাহনা। হিমাচলবাসিনী সিংহবাহনা কখনো মন্দারবাসিনী, কখনো কৈলাসবাসিনী, কখনো বা বিন্ধ্যবাসিনী। পর্বতাধিষ্ঠাত্রী ভিন্ন ভিন্ন দেবীই হয়ত পরবর্তীকালে পার্বতীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদের হৈমবতী উমা হয়ত হিমবৎপর্বতের কন্যাই ছিলেন। এই পর্বতকন্যা পরবর্তীকালে হিমালয়-ও-মেনকা দুহিতা নবমী কিশোরী, তারপর পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় নবযৌবনমত্তা পার্বতী, আবার তপশ্চারিণী অর্পণা, কখনো লজ্জাশীলা নবোঢ়া বধূ কখনো মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের দরিদ্র গৃহিণী, কখনো বা সর্বৈশ্বর্যবিরাগী শ্মশানচারী শিবের পত্নী অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা। পার্বতীরূপে দেবী নারীর সকল মহিমায় ধন্য। চণ্ডীতে দেখা যায় জগৎপতি বিষ্ণুর প্রবোধনার্থে স্তৈমিত্যরূপ নিত্য অধিকারী সমবায়িশক্তি যোগনিদ্রার উদ্বোধন হইলে তাহা বিষ্ণুকে ক্রিয়ায় নিযুক্ত করিল ; এই পরমেশ্বরী বৈষ্ণবীই হরিনেত্রবাসিনী মহামায়া। ভাগবৎগীতায় এই শক্তিই আদি পুরুষ, যাহা হইতে সকল প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়—'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।'

বালার্কচন্দ্রাননা চতুর্ভুজা চতুর্বক্তা এই দেবীই মাহেশ্বরী, কৌমারী, বারাহী, বৈষ্ণবী ও ইন্দ্রাণী। কন্যারূপে ইনি উমা ও গৌরী। গৌরবর্ণা বলিয়াই দেবী গৌরী। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কুমারী-অর্চনায় ইনি সরস্বতী, রমা, দুর্গা ও গৌরী। কালিকাপুরাণমতে আদ্যাশক্তি মহামায়াই দক্ষসুতা সতীরূপে জাতা। এই 'সিংহস্থা কালিকা কৃষ্ণা' নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। 'নীলোৎপলদলশ্যামা' এই কন্যা তখনো কালীরূপে প্রসিদ্ধা। পার্বতী কালীর তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হইলে কৃষ্ণবর্ণা এই কন্যা সুবর্ণপ্রভা স্বর্ণগৌরী বা বিদ্যুদ্‌গৌরীতে রূপান্তরিতা হন। আরও দেখা যায়, মহাদেবের সহিত কৈলাসবিহারিণী কালী অপ্সরা সঙ্গমে 'ভিন্নাঞ্জনশ্যামা' বলিয়া সম্বোধিতা হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হন। অভিমানিনী কালী পরে আকাশপথগা মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া শারদভ্রচ্ছটা বিদ্যুদ্‌গৌরীতে পরিণতা হন।

দুর্গা কখনো চতুর্ভুজা, কখনো অষ্টভুজা, কখনো দশভুজা, কখনো দ্বাদশভুজা, কখনো বা অষ্টাদশভুজা। ইনি বালার্কণা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, চতুর্বক্তা। প্রধান দুর্গা ছাড়াও আছেন নবদুর্গা ; জয়দুর্গা কৃষ্ণবর্ণা- ত্রিনয়না,

সিংহবাহনা, সর্পমালাবিভূষণা। বৈশাখে পূজ্যা তন্ত্রোক্তা গন্ধেশ্বরী দুর্গা জটাজুটধরিণী, অর্ধচন্দ্রশোভিতা, অতসীকাঞ্চনবর্ণাভা ও ত্রিভঙ্গা। মহিষাসুরমর্দিনী ঘণ্টা-পাশ খেটক-অঙ্কুশ-চক্র-ধনু প্রভৃতি দশপ্রহরণে সুশোভিতা। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর স্থানে জয়া ও বিজয়াকেও দেখা যায়। মাহেশ্বরী শক্তিরূপে দুর্গা ত্রিশূল-মহাসর্প-বলয়-ধারিণী। দুর্গা শুধু সিংহবাহনাই নহেন, কখনো ব্যাঘ্রেশ্বরী ব্যাঘ্রবাহনা। শারদীয়া পূজাই বর্তমানে বাংলাদেশে অধিক প্রচলিত। দেবী-মাহাত্ম্যেও বলা হইয়াছে—'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী'। শারদীয়া দেবী শুধু অসুরদলনীই নহেন, স্বামিসোহাগিনী আদরিণী কন্যারূপে দুর্গা পিতৃগৃহে আগমন করিয়াছেন, সঙ্গে দুই কন্যা—ঐশ্বর্যরূপিনী লক্ষ্মী, বিদ্যা ও বিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, এবং দুই পুত্র—সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ ও মহাসেনাপতি কার্তিকেয়।*

সরস্বতী : দুর্গা-পরিজনের সকল দেবদেবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণা সরস্বতী। বৈদিক ঊষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথ্বী প্রভৃতি দেবীগণের সহিত সরস্বতীও অন্যতমা। বৈদিক সরস্বতী মূলতঃ দ্বিবিধা—বিগ্রহবতী ও নদীরূপা। আর্যদের ভারতে আগমনের পর পঞ্চনদী-অঞ্চলে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সরস্বতী নদীর অপরিসীম প্রভাবেই তৎকালীন জনজীবনে উহা দেবীরূপে খ্যাতি লাভ করে। আর্যগণ ইহাকে অম্বিতমা নদীতমা দেবীতমা সরস্বতী বলিয়া স্তবগান করিয়াছেন। নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীই পরবর্তী আর্যসাধনায় বাগ্‌দেবীর রূপ পরিগ্রহ করেন। মৈত্রায়নী সংহিতায় দেখা যায় এই মহতী নগ্নরূপা বাগদেবীকে দেবতাগণ একবার সোমের মূল্যস্বরূপ প্রদান করেন। অপর একটি উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে, দেবী একদা দেবগণের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্যে সিংহরূপ ধারণ করেন, তাই সরস্বতী কখনো সিংহবাহনা। অধুনা-লব্ধ মূর্তিসমূহে দেখা যায়, সরস্বতী কখনো হংসবাহনা, কখনো সিংহবাহনা, কখনো মেষবাহনা কখনো ময়ূরবাহনা, কখনো পদ্মারূঢ়া। বাগ্‌দেবী সরস্বতী ব্রহ্মা এবং অথবা বিষ্ণুর পরিবার রূপেও চিত্রিতা হইয়াছেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার সত্ত্বগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইল সরস্বতী মার্কণ্ডেয়-পুরাণে মহাসরস্বতী দেবতা গৌরীদেহ সমুদ্‌ভূতা। ভাগবৎপুরাণে দেবী প্রজাপতির মানসী কন্যা। প্রজাপতি এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু পুত্ররা বাধা দেওয়ায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মার কন্যা ও শক্তিরূপে সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়; আবার পুষ্টিরূপে ইনি বিষ্ণুর শক্তি।

সরস্বতী সাধারণতঃ চতুর্ভুজা, কখনো বা দ্বিভুজা, শ্বেতাম্বরা, বীণা-পুস্তক-অক্ষমালা-পুণ্ডরীক-কমণ্ডলু-প্রভৃতিতে বিভূষিতা। বাগ্দেবের দশম-মণ্ডলে মহাশক্তিরূপে যে দেবীর স্তুতি করা হইয়াছে পরবর্তীকালে তিনিই শব্দব্রহ্মসহোদরা বাগদেবী এবং সর্বশেষে সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদা সরস্বতী হইয়াছেন।

লক্ষ্মী : সৌভাগ্যসম্পদের দেবীরূপে শ্রী বা লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বৈদিকযুগে এই দেবীর আরাধনার কোনো বিশেষ ধারা ছিল না। প্রাচুর্যের দেবীরূপে সংহিতায় পুরন্ধির উল্লেখ পাই। আর একটি দেবী 'রাকা'—সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী! কিন্তু এইসব বৈদিক দেবীগণের সহিত লক্ষ্মীর যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথর্ববেদে সুভগা রমণীকে লক্ষ্মী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যের পত্নী। মহাভারতের বনপর্বে শ্রীপঞ্চমীতিথিতে স্কন্দের সহিত লক্ষ্মীর (ইন্দ্রের মাতৃষসার কন্যার) পরিণয়-কাহিনী পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের উপাখ্যানে শ্রী প্রজাপতির মানসী কন্যা। শ্রীসূক্তে এই দেবীর আবাহন করা হইয়াছে—'হিরণ্যবর্ণাং হরিণীর সুবর্ণরজতস্রজাম/চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো সমারহ।' কোথাও দেবী যক্ষেশ্বরের পত্নী। ধনপতি কুবেরের সহিত ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর সম্পর্কে খুবই স্বাভাবিক। মহাভারতের উপাখ্যানে দেখি সমুদ্রমন্থনে লব্ধা এই লক্ষ্মী বিষ্ণুর অংশরূপে নির্দিষ্টা। বৌদ্ধসাহিত্যে দুর্গার ন্যায় লক্ষ্মীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দেবী দেবকুমারিকা এবং উত্তরদক্ষিণ দিগ্বিহারিণী। লক্ষ্মী কখনো দ্বিভুজা, কখনো বহুভুজা, পদ্ম-শ্রীফল-শঙ্খ-অমৃতঘটধারিণী। দেবীর বাহন হইল পেচক; কখনো দেবীকে দুই গজের দ্বারা অভ্যর্হিতা দেখা যায়। বর্ণনানুসারে দেবী লক্ষ্মী সুতনুকা, ক্ষীণমধ্যা, নিতম্বিনী ও পীনোন্নত পয়োধরা।

কার্তিকেয় : দেব-সেনাপতিরূপে কার্তিকেয় আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। অনেক পণ্ডিতের মতে ইনি লৌকিক এবং অর্বাচীন দেবতা। মহাভারতে সনৎকুমারের সহিত কার্তিকেয় একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। কার্তিকেয় গণপতির ভ্রাতা, আবার ছাগবক্ত্ররূপে ইনি নৈগমেয়, কখনো বীরভদ্রের ন্যায় মাতৃরক্ষাকারী। বৃহৎসংহিতায় ইনি বর্হিকেতু দ্বিভুজ পাশ শক্তিহস্ত। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে কার্তিকেয় হইলেন ষড়ানন শিখণ্ডক রক্তবস্ত্র ময়ূরবাহন দেবতা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'সেনানীনামহং স্কন্দঃ।' কার্তিকেয় গজবাহন, তারকারি, ব্রহ্মশাস্তা, বালস্বামী; অগ্নিভূ, পাবকি প্রভৃতি নামেও

আমাদের নিকট পরিচিত। এই দেবতার জন্ম রহস্যমণ্ডিত। কৈলাশগুহায় দাম্পত্যসুখে সমাসীন হর নির্জনতাভঙ্গকারী অগ্নিকে দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং দেহনিষিক্ত বীর্য অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। তেজঃ ধারণে অসমর্থ অগ্নি উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন, অতঃপর তাহা কৃত্তিকাদের অধিগত হয়। কৃত্তিকারা সেই শক্তিকে শরবনে নিক্ষেপ করেন এবং সেইখানে সন্তানের জন্ম হয়। ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে আখ্যানে বলা হইয়াছে, ছয় কৃত্তিকা ছয়টি পুত্র প্রসব করেন। পরে রহস্যজনকভাবে ছয়টি শিশু একত্রিত হইলে ষড়ানন কার্তিকের সৃষ্টি হয়। আবার চৌর্যাদির দেবতারূপেও ইনি পূজিত। মৃচ্ছকটিক-নাটকে তস্কর শর্বিলক দেওয়ালে 'সিঁধ' (সন্ধি) কাটিবার সময় ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতেছে —'নমঃ বরদায় কুমার কার্তিকেয়ায়'। ইহার স্ত্রী হইলেন কৌমারী, সেনা অথবা দেবসেনা। যোদ্ধারূপে কার্তিকেয় মহাসেন, সেনাপতি অথবা সিদ্ধ সেন; যৌবনের প্রতীকরূপে ইনি কুমার, কখনো আবার রহস্যময়—তাই গুহ।

গণেশ: কার্তিকেয়ের ন্যায় গণেশও অর্বাচীন লৌকিক দেবতা। গৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতে যে ভূতপ্রেতসিদ্ধি, তুক্‌তাক্-ঝাড়্‌ফুঁক্ প্রভৃতির প্রচলন ছিল, তাহা হইতেই ক্রমে গণপতি-পূজার প্রচলন হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইনি অন্ত্যজশ্রেণীর দেবতা। বৃহৎসংহিতায় গণেশ লম্বোদর গজানন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইনি কৃষ্ণের শক্তি। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত হইয়াছে—'গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে / কবিং কবীনাম্ উপশ্রবস্তমম্' বাজসনেয়ী সংহিতায় ইহারই পুনরুক্তি—'গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে'। মহাভারতে বিনায়কগণই গণপতি গণপতি প্রাচীনতমরূপে বিঘ্নরাজ; কারণ তাহার প্রতিকূলতায় গর্ভিনীর গর্ভনাশ হয়, সন্তানবতীর সন্তান বিনষ্ট হয়, কুমারীর বর লাভ হয় না। তাই গণেশ বিঘ্নেশ, বিঘ্নকৃৎ, বিঘ্নেশ্বর, অথবা শুধুই বিঘ্ন। মহাভারতের লিপিকররূপেও একবার গণেশের সাক্ষাৎ পাই। বৃহৎসংহিতানুসারে ইনি গজমুখ, প্রমথাধিন, প্রলম্বজঠর, একবিষাণ ও কুঠারধারী। বিঘ্নরাজ গণেশই পরবর্তীকালে সর্ববিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা হইয়াছেন। গণেশ শত্রুনাশকারী —'দন্তাঘাত-বিদারিতারিরুধিরৈঃ।' বিষ্ণুর শালগ্রামশিলার অনুকরণে রক্তবং শীলায় গণেশপূজার বিধান আছে।

গণপতির জন্মও রহস্যমণ্ডিত। গণেশ কখনো শিব-পার্বতীর পুত্র, কখনো শুধু পার্বতীরই পুত্র। সর্বাপেক্ষা বিচিত্র কাহিনীটি হইল, হরপার্বতী একবার গজরূপে সঙ্গম করেন, তাহাতেই গজানন গণেশের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত

পুরাণের মতে মাতুল শনির দৃষ্টিতে শিশুর মস্তকটি অন্তর্হিত হয় এবং পরে বিষ্ণুর কৃপায় সেখানে গজমস্তক যোজনা করা হয়। স্কন্দপুরাণের কাহিনী হইল—পার্বতীর অষ্টমমাসের গর্ভে সিন্দুর নামক অসুর প্রবেশ করে এবং গর্ভস্থ সন্তানের মাথাটি কাটিয়া দেয়। জন্মের পর নারদের অনুরোধে গজাসুরের মস্তকটি গণেশ নিজস্কন্ধে যোজনা করেন। একটি ঘটনায় বলা হইয়াছে যে পার্বতী ক্রীড়াচ্ছলে আপন দেহের আবর্জনা দিয়া একটি শিশু তৈয়ারী করিয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করেন, শিশুটিই গণেশ। আখ্যানে দেখা যায়, গজাননা এক রাক্ষসী পার্বতীর শরীরের আবর্জনা ভক্ষণ করিয়া গণেশের জন্ম দেয়। গণেশ দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ, ব্যাঘ্রচর্মধারী। ইহার স্ত্রীরা হইলেন সরস্বতী, শ্রী, বিঘ্নেশ্বরী, বুদ্ধি ও কুবুদ্ধি। অতি অল্প স্থলেই তাঁহার মূষিক বাহনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মণীন্দ্র রায়

কবিদের মতো

আমাদের চলতি দিনের রাস্তাগুলো
পৌঁছতে পারে না যেখানে,
পিঠচাপড়ানি বা অবহেলা যেখানে পথ পায় না,
আমাদের যন্ত্রণা যেখানে কাঁটায় লতায় জটিল,
জঙ্গলের সেই ভয়াবহ অন্ধকারের ভেতর
জমতে থাকে মধু,
কেউ কেউ তা টের পায়।

কেউ কেউ ভালোবাসার অস্পষ্ট আদর
কিম্বা চলতি অভিধানের শব্দাবলী নিয়েই
খুশি থাকে না,
ফুটপাতের ম্যাজিকঅলার মতো
চিন্তাগুলোকে তারা অবিশ্বাস্য দোমড়ায়,
আর তাদের স্বপ্নের শয্যাসঙ্গিনী রাত্রি যখন
দুর্বোধ্য একটা ভীল রমণীর মতো
তার নীল শরীর নতুন উষার লাল শাড়িতে ঢেকে
পালিয়ে যেতে থাকে দিগন্তের ঢালুতে,
কেউ কেউ হঠাৎ যেন খেপে ওঠে,
হাতে টাঙি নিয়ে তারা নেমে পড়ে তাদের
হিংস্র যন্ত্রণার পাশবিক উপত্যকায়,
তখন, কী আশ্চর্য,
বাঘের থাবার কথা মনেও পড়ে না তাদের,
জঙ্গলের মধু তাদের জংলি করে তোলে
কবিদের মতো।

হায়াৎ মামুদ

জলের প্রার্থনা

এখানে কোথাও জলের প্রপাত নেই।

মাঝে মাঝে রুক্ষতা বড় কর্কশ হয়,
সব ঘাস মরে যায়,
নেড়া গাছে পাখিও বসে না।
অনাবৃষ্টি ফার্নেস করে তোলে দেশটাকে
চিৎপাত হাঁ করে কেবলই হাঁপায়
যেমন হাঁপানি রুগী অক্সিজেনের অভাবে।

হায়রে, কোথাও জলের প্রপাত নেই
টুং টাং সিম্ফণী অবিরল খোলকরতাল
জলের কল্‌কল্‌ কলরোল গানের
প্রাণের টুং টাং নুড়ির নিক্কন যেনো
জাইলাফোন বাজে শোনিতে শোনিতে
কিন্তু জল নেই, জলের প্রপাত নেই এদেশে

ঈশ্বর জল দাও, জলের প্রপাত দাও
আমাদের প্রাণের শিকড়ে
শূন্য গাছে কিছু কুসুম ফুটুক
এবং ডালেতে আসুক হরবোলা পাখি।
ঈশ্বর জলের প্রপাত দাও। ধ্বনি তার
শুনে শুনে সোনালি রুপোলি গাছের
গভীরে শুয়ে রবো, স্বপনেতে ভাসবে কেবল
ছবি তার যে এতোদিন শুনিয়েছে
প্রাণের জলের আর তিমিরের গান।

প্রতিমা সেনগুপ্ত

রামধনু

তোমার দিকে দুচোখে জল নিয়ে তাকালে
প্রতিফলিত হোয়ে রামধনু উঠবে কি ?
যে লিখনে জিব দিয়ে না হয় শুষে নিলে
সেই সামান্য অশ্রুটুকু
আস্বাদ করলে হৃদয়ের মেদ মজ্জা রক্তকে
নখে খুঁটে খুঁটে
অস্থির বাঁকে বাঁকে জ্বলতে থাকলো
তোমার তীব্র দাবানল
সবকটা ঘাস পুড়ে ছাই হোয়ে গেল
কিন্তু কৈ
রামধনু তো উঠলো না ?

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সাম্প্রতিক কাব্যনাট্যচর্চা

কাব্যনাটকে নাটকীয় নিরপেক্ষতা ছাড়াও চরিত্রের গভীর স্বপ্ন অপেক্ষা ও আবেগের মুক্তির জন্যেই অবধারিতভাবে চরিত্রের মুখে কাব্যিক আবেগের স্পন্দন এসে যায়। অনুভবে তার ভাবমুহূর্তকে বুঝতে হয়, প্রকাশ করতে হয়। সেই আবেগের মুখেই মানুষের বহু পূর্বস্মৃতি ও অভিজ্ঞতা উঠে আসে, সামাজিক দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ চিরকালের মানুষের হৃদয় খুলে যায়। একই সঙ্গে এই আবেগ ও নাটকীয়তা যে পরিমাণ নিরাসক্তির প্রয়োজন ঘটায় সেই প্রয়োজন অনেক সময়ই কবিরা বিশেষতঃ রোমান্টিক কবিরা মেটাতে পারেন না। আবেগের টানে ছবি ফোটাতে ফোটাতে কবি নাটকীয় প্রশ্ন-উত্তর-প্রত্যুত্তরের চমকপ্রদ গতি হারিয়ে বসেন। বহু রোম্যান্টিক কবির আতিশয্য কাব্যনাট্যের শিল্পমূল্যকে নষ্ট করলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যে এ আতিশয্য তুলনায় কম বলেই মনে করি। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কাব্যনাট্যের প্রথাকে সতীশচন্দ্র রায়ের অসম্পূর্ণ 'চণ্ডালী', সুখরঞ্জন রায়ের 'শুক্লা', কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্টিফেন ফিলিপ্‌সের কাব্যনাট্যানুবন্ধ 'আয়ুষ্মতী' এবং 'তুলির লিখনের' সলিলকে মনে হয় ব্যক্তি প্রক্ষেপে নাটকাকারে কাব্য কিংবা আবেগস্পন্দনহীন নিছক নাটক! বিশের দশকে যে প্রতিভাবান কবিরা বাঙলা কবিতার চরিত্র পাল্টালেন এবং তিরিশের দশকে যাঁদের প্রতিষ্ঠার সূচনা তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই কবিতার মতোই প্রাচীন এই কাব্যনাট্যচর্চায় উৎসাহ দেখান নি। অমিয় চক্রবর্তী কবিতার মধ্যে সংলাপ ও কথনভঙ্গির আন্তরিকতা যথেষ্ট এনেছেন কিন্তু কাব্যনাট্য লেখেন নি। জীবনানন্দ দাশ আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্ববোধে পীড়িত হয়েও কবিতার নাট্যগুণকে বাড়িয়েছেন কিন্তু কাব্যনাট্যের প্রতি পৃথক মনোযোগ দেন নি। বিষ্ণু দের মধ্যে সমাজ তার বহু 'লোক'-স্মৃতি নিয়ে উপস্থিত অথচ ইয়েট্‌স্ লরকা কিংবা ব্রেখটের মতো কাব্যনাটকে মন দেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংযম ও সংহতি কাব্যনাটকের পক্ষে যেতে পারতো, কিন্তু তিনিও লেখেন নি। একমাত্র বুদ্ধদেব বসু সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি কাব্যনাট্য লিখেছেন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুসরণ ও কাব্যরূপ প্রশংসনীয় হলেও সমকালের প্রতি মনোযোগ তেমন যেন স্পষ্ট নয়। বিশেষ ক'রে 'কালসন্ধ্যা' নাটকটির কথা মনে রেখে একথা বলছি।

চল্লিশের কবিদের অনেকেই মানুষের সামাজিক বিক্ষোভচেতনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষের গভীর ও ব্যাপক পরিচয় দিয়ে মৌল অনুভবগুলিকে যাকে মিসেস বডকিন বলেছেন orchetypal pattern তাকে ফোটাতে পারেন নি। সুকান্ত ভট্টাচার্যের দুটি কাব্যনাট্যের মধ্যে 'অভিযান' উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে চিন্তার পরিণতি না থাকলেও সমকালচেতনা, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রচলিত ছন্দে সংলাপের জোর এসেছে। এই দশকের অন্য এক কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর 'নাটকের নাম ভীষ্ম' কাব্যনাট্যে সামাজিক ও বিশেষ সময়ের ব্যক্তিত্ব পরিচয়ের আড়ালে একটি আর্কিটাইপ ব্যক্তিকল্পনা আছে যার মধ্যে মৌলিক মানবিকতার স্বর অনেকটাই শোনা যায়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'একলব্য' নাটকটিতেও ব্যক্তির এই সময়াবদ্ধ ও সময়োত্তীর্ণ চেহারা বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশিত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি সম্প্রতি 'পরবাসে খোঁজে সে স্বদেশ' নামে যে কাব্যনাট্যটি লিখেছেন তার মধ্যে গদ্য-প্রায় কাব্যের মতো, পদ্য গান ও নাটকীয়তার মিশ্রণে দ্বিখণ্ডিত বাঙলাদেশে স্বাধীনতার প্রহসনে হতাশ মানুষের স্বপ্নব্যাকুলতা সুন্দর ফুটেছে এবং কাব্যনাট্যে নানা মাধ্যমের ব্যবহার ক'রে এক কম্পোজিট effect আনতে সক্ষম হয়েছেন বলেই মনে করি। এঁদেরই প্রায় সমকালীন রাম বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, কৃষ্ণ ধর যেমন কবিতা তেমনি কাব্যনাট্যেও সামাজিক চাপে অবরুদ্ধ, আত্মহননের বেদনায় আক্রান্ত ব্যক্তিত্বের মুক্তি খুঁজেছেন। রামবসুর 'রাজকীয় পদশব্দগুলি' 'ব্রীজ' কিংবা নীলকণ্ঠ' জাতীয় কাব্যনাট্যে বর্তমান সমাজের প্রেমের বিচিত্র সমস্যা দেখানো হয়েছে এবং অন্তর্নাটকে এই সমস্যাবিদ্ধ চরিত্রগুলি বহুপূর্বের ট্রাজিক চরিত্রের ছায়াবহ হয়ে আর্কিটাইপাল প্যাটার্ণের আভাস দেয়। এগুণ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিলীপ রায় কিংবা পঞ্চাশের কবি আলোক সরকারের কাব্যনাট্যেও লক্ষণীয়। চল্লিশের কবি দিলীপ রায়ের 'একটি নায়ক' কিংবা 'সার্কাস' কাব্যনাট্যে জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রভাবেই দ্বিমাত্রিকতার আভাস এনেছে।

পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ি, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শামসুল হক, ফণিভূষণ আচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এঁদের অনেকেই কমবেশি কাব্যনাট্যচর্চা করেছেন। শঙ্খ ঘোষের কাব্যনাট্য নেই, তবে নাটকীয় একোক্তি আছে : 'আরুণি উদ্দালক' এবং 'জাবাল-সত্যকাম'। এইরকম নাটকীয়তা-দীপ্ত কবিতা অলোকরঞ্জনেরও আছে। যেমন 'এক-একজন' কিংবা 'বৈদেহী'। কিংবা

তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত অতিক্ষুদ্র কাব্যনাট্য 'যৌবন বাউলে'র অন্তর্গত 'শেষের প্রহর'। কিন্তু এই ধরণের অন্তর্নাটক-দীপ্ত কবিতা কিংবা ছোট কাব্যনাট্যাভাস তো সাম্প্রতিক কবিতাচর্চার একটা প্রবণতা। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী জটিল সমস্যা মথিত কব্যেনাট্য শঙ্খঘোষ লেখেন নি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন নি (কাব্যনাট্যের ফর্মে সুনীলের কিছু অবিশ্বাস আছে মনে হয়), তারাপদ রায়ও লেখেন নি। এঁদের মধ্যে আলোক সরকারই তুলনায় এই ফর্মে বেশি বিশ্বাসী। তাঁর 'মায়াকাননের ফুল', 'বৃষ্টি', 'অশ্বত্থ গাছ' কিংবা 'সেইঘর' কাব্যনাট্যগুলি গভীর সমস্যা জর্জরিত অথচ মেলোড্রামাটিক নয়। দিলীপ রায়ের দ্বিমাত্রিক গভীরতা তাঁর মধ্যেও বেশকিছুটা এসেছে। এসেছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা 'মনে রেখো' কাব্যনাট্যে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সাফল্যও এইক্ষেত্রে স্মরণীয় কিন্তু বার্ণিক রায়ের নাটকীয় সংহতি তাৎপর্যে এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অনেকের মতো শিল্প পরিমাণ-জ্ঞানের অভাবে শিথিল হয়ে পড়ে। ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে রত্নেশ্বর হাজরা, আশিস সান্যাল, অশোক দত্ত চৌধুরী ও পরে প্রলয় শূর এই ক্ষুরধার শিল্পপথে পা বাড়িয়েছেন। সর্বত্রই এঁরা যে কাব্যনাটকের গভীরতা, নিরাসক্তি, সংযম ও দ্বিমাত্রিক প্রসারকে আয়ত্তে এনেছেন তা বলবো না। বরং রত্নেশ্বর হাজরা কিছুটা সফল। সত্তরের দশকে স্নেহাশিস মুকুল তাঁর কয়েকটি কাব্যনাটকে রীতিমতো সংযম দেখিয়েছেন। সংঘাত ও দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকে তীব্র ও গভীর। বোধহয় মঞ্চ সফলও হবে বলে আশা করি।

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

মধু-জীবন

আপিস-পাড়াতেই মধুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। দিনে দিনে সেই পরিচয় গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। কত কথা শুনেছি মধুর মুখে। তারপর কতদিন কেটে গেছে। কত বছর কেটে গেছে। হঠাৎ আবার মধুর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারি নি।

মধু হাসিহাসি মুখে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনাদের সেই মধু। আপনাদের জুতোসেলাইওলা।

চিনতে পেরেও আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না। ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। অনেক বদলে গেছে মধু। পরণে টেরিলিনের প্যান্ট সার্ট। চকচকে ঝকঝকে।

আমার ভাবনার মাঝখানে আবার যেন মধু পুরোণো দিনের কথাগুলো মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই আমি ফিরে গেছি সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনটাতে। বছরদশেক আগের ঘটনাটা আমার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল।

মধু সেদিন আমার পা থেকে জুতোজোড়া খুলে নিয়ে বলেছিল, নিন, পা-টা রাখুন এই কাপড়টার ওপর। আপনার চরণপুজোটা সেরে নি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, চরণপুজো! সে আবার কী?

মধু বললে, আজ আপনি প্রথম এলেন জুতো সারাতে। নতুন খদ্দের এলে প্রথমে তার চরণপুজো করি। এই আমার নিয়ম।

তারপর পকেট থেকে দু'টো ফুল বের করে আমার পায়ের ওপর রেখে মধু বিড়বিড় করে কী যেন বললে। ওর মন্তরপড়া শেষ করে আমাকে একজোড়া পুরোণোচটি দিয়ে বললে, এটা পরে আপিসে বসে কাজ করুন। ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় আপনার জুতো নিয়ে যাবেন। এই দেখুন না, সকাল থেকে এত জুতো জমে গেছে। পাঁচটার মধ্যে সেরে রাখতে হবে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। মধুর দেওয়া চটিজোড়ায় পা গলিয়ে ফিরে এলুম আপিসে। সিটে বসে পাশের চেয়ারের সতীশদাকে বললাম সব কিছু। চরণপুজোর ব্যাপারটার ওপরই জোর দিলাম বেশী।

সতীশদা আমার কথা শুনে বললেন, আরে ওকে চেনো না! ও হলো আমাদের মধু। মধু রায়। ভারি চমৎকার হাতের কাজ।

তারপর সতীশদার কাছে পুরো ইতিহাসটা শুনলাম। ..

কোন এক কারখানায় নাকি কাজ করত মধু। রোজগার ভালই করত। ওর কাজ দেখে ওপরওলারা খুশি। দিনে দিনে তাই মাইনে বেড়ে উন্নতিও হচ্ছিল।

ঘরে বউ আর গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে। সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায় তাই ছিল মধুর।

কিন্তু মানুষের সুখ আসতেও যেমন, যেতেও তেমন। এই সুখ থৈথৈ করছে সংসারে, আবার পরমমুহূর্তে সেই সংসারই দুঃখের বানে কোথায় ভেসে গেছে। এই হলো জগতের নিয়ম।

তা সেই নিয়মের হাতে পড়ে একদিন পা কাটা গেল মধুর। সুস্থ মানুষ। কারখানার ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় গাড়ির তলায় চাপা পড়ল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল মানুষজন। প্রাণে বাঁচল বটে মধু কিন্তু একটা পা খোয়া গেল জীবনের মতো।

মাসদুয়েক পর যখন মধু ক্রাচে ভর করে বাড়িতে ফিরল তখন ওর করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে বউ আর ছেলেমেয়েদের কি কান্না! মধুও তাই দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ওদের জড়িয়ে ধরেই হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

সেদিন মধুর কান্না থামাতে যে এগিয়ে এসেছিল সে হলো জীবনরাম। মধুদের বস্তিতেই একটা ঘর নিয়ে থাকে। জুতোসেলাই-এর কাজ করে। জীবনরাম মধুর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, কেঁদো না মধুভাই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, আর কী ঠিক হবে জীবনদা। এই কাটা পা নিয়ে আমি কী কাজ করব। এখন এই কাটা পা দেখিয়ে লোকের কাছে ভিক্ষে করতে হবে।—বলতে বলতে চিৎকার করে কেঁদে উঠল মধু।

এবার জীবনরাম ধরল অন্যমূর্তি। কড়া এক ধমক দিয়ে বললে, ভিক্ষে করার কথা বলতে তোমার মুখে আটকালো না মধুভাই। তুমি না ভদ্রলোকের ছেলে। কাটা পা দেখিয়ে বসে বসে খেতে চাও। ছিঃ।

মধু তখনও ফোঁপাচ্ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বললে, তাহলে আমি কী

করব জীবনদা ? এ অবস্থায় কে আমাকে চাকরী দেবে। চাকরী দিলেও আমি কী কাজ করব।

জীবনরাম বললে, তুমি কিছু ভেবো না মধুভাই। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আমি তোমাকে আমার কাজ শেখাব। এখন বাড়িতে বসে বসে জুতো সেলাই করবে। পরে ভাল কাজ শিখলে রাস্তায় বসবে। এ কাজে খাওয়া পরার অভাব হবে না।

জীবনরামের কথা শুনে মধু কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবল। শেষ পর্যন্ত তাকে পরের জুতো সেলাই করতে হবে সংসারের খিদে মেটাতে। অথচ এছাড়া তো বাঁচবার আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না মধু।

উত্তর দিতে দেরী হচ্ছে দেখে জীবনরামই আবার বললে, এতে কোন লজ্জা নেই মধুভাই। ভিক্ষে করার থেকে খেটে খাওয়া অনেক সম্মানের। আমি তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দেব। নিজের হাতে কাজ শেখাব। মন দিয়ে শিখলে তুমি একদিন ভাল কারিগর হয়ে যাবে। তোমার সংসারের অভাব মিটবে। বউ ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটবে।

এরপর আর আপত্তি করে নি মধু। বললে, ঠিক আছে জীবনদা। আমি জুতোসেলাই-এর কাজই করব।

এইভাবেই শুরু হলো মধুর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। মনপ্রাণ দিয়ে শিখতে লাগল কাজটা।

জীবনরাম মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, কী মধুভাই, কেমন লাগছে কাজটা ?

মধু বলে, ভালই তো লাগছে। তাছাড়া এরই মধ্যে রোজগার তো ভালই হচ্ছে।

জীবনরাম বললে, রোজগারের কথা ছেড়ে দাও মধুভাই। এ-লাইনে কাজের অভাব হবে না। কিন্তু আসল কথা হলো কাজে মন লাগছে তো ? যে কাজ থেকে তোমার খাওয়া জুটছে সেই কাজকে ভালবাসতে হবে মধুভাই। নইলে লক্ষ্মীর কৃপা হবে কী করে তোমার ওপর।

একথার জবাবে মধু সেদিন কিছু বলতে পারে নি। শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল। জাতব্যবসা কথাটাকে তখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি মধু।

তবু বেশ মন দিয়ে কাজ করছে মধু। জীবনরাম বাড়তি কাজ ঘরে নিয়ে আসে। আর সেগুলোই মধু ঘরে বসে বসে করে। জীবনরাম বলে, চটপট হাতচালাও মধুভাই। তোমার কাজ খদ্দেরদের খুব পছন্দ।

এরই মধ্যে একদিন মধুর মন বিদ্রোহ করে উঠল। জুতোসেলাই করতে করতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, এত লোক থাকতে আমার পা-টাই তুই খেলি মা রাক্ষুসী। তা এতই যখন তোর খিদে, দিনে শ'খানেক লোকের পা চিবো না বসে বসে। সকলকে খোঁড়া করে দে আমার মতো।

জীবনরাম সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কথাটা শুনে সোজা এসে ঢুকল মধুর ঘরে। তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে ঠাস করে মধুর গালে একচড় কসিয়ে বললে, বদমাস, বেইমান। তুই মানুষের ক্ষতি চাইছিস মনে মনে? এতবড় শয়তান তুই। নিজের পা-টা তো গেছে আরও পাঁচটা লোকের পা খোঁড়া দেখতে চাইছিস! আরে বেকুফ্, বেইমান, লোকের পায়ের জুতো সেরে তোর পেট চলছে। ওদের পা গেলে তুই খাবি কী?

মধু ততক্ষণে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। গুরুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমায় ক্ষমা কর জীবনদা। আর কখনও এমন কথা বলব না। রাগে দুঃখে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কথাটা। এর প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। আমি যতদিন এই জুতোসেলাই-এর ব্যবসা করব ততদিন আমি খদ্দেরদের চরণপুজো করব।

এইভাবেই মধু ক্রমশঃ আপিসপাড়ায় সকলের পরিচিত হতে থাকল: সকলের সুখ্যাতি আদায় করতে লাগল ভাল কাজ দেখিয়ে। আর মধুর ব্যবহারের জন্যে সকলের ভালবাসার জালে জড়িয়ে পড়ল মধু।

এই ভালবাসার জাল কেটে কবে কোথায় চলে গিয়েছিল মধু, সে হিসেব আর রাখা হয় নি। তারপর এই এতদিন পর ওর সঙ্গে দেখা। মধুর বগলে ক্রাচ নেই। দিব্যি দু'পায়ে হেঁটে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

মধু এবার একগাল হেসে বললে, আমায় পা দেখে অবাক হচ্ছেন। আমার নতুন পা করিয়ে দিয়েছেন এক জার্মাণ সাহেব।

তারপরই আগাগোড়া ব্যাপারটা শোনাল মধু।

এক জার্মাণসাহেব এখানকার একটা আপিসে মাসখানেকের জন্যে কাজে এসেছিলেন। একদিন চলতে চলতে হঠাৎ মধুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। মধু তখন একটা ছেঁড়াজুতো সেলাই করছিল। কাটা জায়গাটা সেলাই করে তারই ওপর কুচোচামড়ার ফুল তৈরী করে বসাচ্ছিল মধু। সেলাই-এর দাগ মিলিয়ে দেবার জন্যে এ-কায়দাটা নিজের মাথা থেকেই বের করেছিল মধু। তাই দেখে অনেকেই খুশি হতেন, বাহবা দিতেন। কিন্তু এই জার্মাণসাহেব একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন। মধুর পিঠচাপড়ে খুশিখুশি মুখে বললেন, আরে তুমি

তো দেখছি একজন আর্টিস্ট। ছেঁড়াজুতোর ওপর শিল্পের কাজ করছ। ভারি চমৎকার টেক্‌নিক্। লক্ষলক্ষ ছেঁড়াজুতো ফেলে দেওয়া হয়। অথচ তোমার কায়দা শিখে নিলে এই ছেঁড়াজুতোগুলো কম খরচে দিব্যি চালিয়ে নেওয়া যায়। এতে দেশের দশের অনেক লাভ।

এতটা বলে সাহেব একটু দম নিলেন। তারপর বললেন, আমিও দেশে জুতোর ব্যবসাই করি। তুমি যে জিনিস আমাকে শেখালে তার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

তারপর হঠাৎ মধুর কাটাপায়ের ওপর নজর ফেলে বললেন, এ কী, তোমার একটা পা নেই! তা স্প্রিং-এর পা লাগিয়ে নাও নি কেন? ও বুঝেছি।

তারপরই সাহেব তুড়ি মেরে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে দেশে চল। সেখান থেকে তোমাকে নতুন একটা পা তৈরী করিয়ে দেব। আমার জুতোর কারখানাটাও দেখে আসবে।

সেই জার্মাণসাহেবের দৌলতে মধুর নতুন পা হয়েছে। জার্মাণী ঘুরে এসেছে, ওঁরই সাহায্যে একটা ছোট জুতোর কারখানা খুলেছে। এখন মধুর কারখানায় গাদাগাদা পুরোণো জুতো নতুন হয়ে বেরিয়ে আসছে।

সবশেষে মধু বললে, আগে জাতব্যবসা কথাটা মাথার মধ্যে কিলবিল করে বেড়িয়েছে। কোন সঠিক উত্তর পাই নি। এখন দেখছি জাতব্যবসা বলে কিছু নেই। দুটো হাত তো সকলকেই দিয়েছেন ভগবান। এই হাত দিয়ে যে যেকাজ করবে, সেটাই তার ব্যবসা।

কথাগুলো বলে মধু বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায় আমি তাকিয়ে থাকলাম ওর পায়ের দিকে। দেখতে দেখতে একটা কথাই বারবার মনে হতে লাগল। নিজের পায়ের ওপর মধু আর কতটুকু দাঁড়াতে পেরেছিল। তার থেকে নকল পায়ের ওপর ভর করে মধু অনেক বেশী দাঁড়িয়ে গেছে জীবনে।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কান্না

কান্না কান্না কান্না !
কান্নার রোল : গান্ধার কোমল।
বেদনার অসহ আকুতি !
শোকাতুরা জননী লুটায় : বুক ভাঙা হাহাকার।
বিরলে বসিয়া কাঁদে পতিহীনা বধূ.
হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে।
নির্জন কান্তারে।
বিপ্রলব্ধা কিশোরী নায়িকা—
প্রতীক্ষা-অধীরা,
পত্র শব্দে চমকিয়া ওঠে ;
প্রহর বহিয়া যায়।
ব্যর্থতার অশ্রু নামে কপোল বাহিয়া :
বুক ভাসে নিঃশব্দ নয়ন জলে।
দিকে দিকে অসহায় মানুষের আর্তনাদ,
দুর্বার বিক্ষোভ।
পথে পথে নিরন্নের আবেদন,
বিলম্বিত লয়, কাতর কান্নার !
অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠী আতুরের
পথ পরিক্রমা—করুণ বিলাপ।
ক্ষুধাতুর : কান্না বুভুক্ষার !
ঘরে কাঁদে শূন্য বিছানায়,
ক্ষুধাতুর সদ্য শিশু ককিয়ে ককিয়ে—
ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যা !
দুহাত বাড়িয়ে খোঁজে কোল,
পয়োধর সুধার আধার।
শুষ্ক স্তন : জননী নীরব।
জল ভরে ওঠে চোখে।

গভীর নিশীথে
অভুক্ত কুকুর কাঁদে গলিটার মোড়ে—
কেঁউ কেঁউ কেঁউ !
গৃহতলে সারমেয় প্রতিধ্বনি করে :
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ।

ধরিত্রী ঘুমায় ।
বাতাস কাঁদিয়া ফেরে—শাঁ শাঁ শাঁ !
জলহীন মাঠে—
উন্মুখ শিমূল শাখে শকুনি ঝিমায়,
বদ্ধশ্বাস শিশুর ক্রন্দন
গুমরিয়া ওঠে
গৃধিনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—উঞা উঞা উঞা !
ক্রন্দন-স্পন্দনে আতঙ্কে শিহরি ওঠে
বিভ্রান্ত পথিক, খুঁজে মরে পথ
রজনীর গাঢ় অন্ধকার ।

গৃহ বাতায়নে,
প্রিয়া কাঁদে বিরহ বিধুরা,
রূপসী যুবতী একাকিনী চায় পথ পানে
আকুল নয়নে ;
মোছে অশ্রুজল ।

বাতাসে ভাসিয়া আসে যক্ষের নিঃশ্বাস
অব্যক্ত বেদনা ভরা ।
দীর্ঘ বিরহ পরে মিলন উচ্ছ্বাসে,
তৃষিতা প্রেয়সী, অভিমান ভরে,
শব্দহীন যামিনীর তৃতীয় প্রহরে
দয়িতের বুকে গুঁজি মুখ,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ।

গৃহকোণে কাঁদে মোমবাতি
নির্মম নিষ্ঠুর ক্ষুধাতুর অগ্নি শিখা
আসঙ্গ উল্লাসে, কেঁপে কেঁপে ওঠে ;

ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে
প্রেয়সীর অঙ্গ বয়ে।
মোমবাতি জ্বলে,
কণ্ঠলগ্ন অগ্নিশিখা কাঁদে ;
উত্তপ্ত চুম্বনে, গলে গলে পড়ে অঙ্গ
সুতনু প্রিয়ার। সুখকাল দেহ হয় নীল।
আপনারে করি ক্ষয় নীরবে নিঃশেষে,
প্রেমের আরতি পরে।

কান্না কান্না কান্না!

এই তো জীবন-মেধ!
আত্মাহুতি প্রণয় বহ্নিতে,
প্লুত অশ্রুজলে।
প্রেম হয় গরীয়ান আত্ম নিবেদনে,
মৃত্যুঞ্জয়ী শাশ্বত সুন্দর!
বিকশিত শুভ্র শতদল অশ্রুসরোবরে।
কান্না আনন্দের, কান্না বেদনার :
অশ্রুসিক্ত কোমল গান্ধার।

কান্না কান্না কান্না!

বার্ণিক রায়

আমার গোপন কথা

কথায় কথায় রাত হয়ে যায়, আর তারপর
রাত্তিরে প্রচণ্ড ক্লান্তি, যদিও চোখের পাতা তোলা,
যে কথা বলতে চাই, বলতে শুকোয় জিব গালা,
গাছের বিশ্বাসে শুনি, অন্ধকারে মেশে তার স্বর।

নদীর জলের স্রোতে পাখির ডানায় উড়ে যায়
মাটির ভেতরে শস্যে, বীজের ধ্বনিতে মেখে মেখে
নিজের গোপন কথা দূরে বাতাসের গতিবেগে,
আমার অলক্ষ্যে রয়, বার বার অতলে হারায়।

রক্তে গাঢ় জমে থাকে, শক্তি নেই টেনে তুলে ধরি
হৃদয়ে দূষিত রক্তে হঠাৎ কখনো উছলে পড়ে,
ঝরে পড়ে শূন্য বক্ষে পালকের রঙের মতন।

নিহিত অব্যক্ত থাকে, জীবনের সব মারিমারি
মিথ্যা বলে মনে হয়, রক্তে মাথা খুঁটে মরি ঘরে
লগ্ন সৌন্দর্যের মতো বিস্মৃত অতীব পুরাতন।

অরুণকুমার চৌধুরী

বাজী

কালো ছোট্ট একটা বিন্দু
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল
তুমি বল্লে : গতি
আমি বললুম : যুদ্ধ
রেডক্রসের সাহায্য প্লেনটা
কাছে এসে দুজনকেই হারিয়ে দিল ॥

আচ্ছা দুটো মূর্তি ক্রমেই
আমাদের কাছে প্রকাশ হচ্ছিল
আমি বল্লুম : হতাশ প্রেমিক
তুমি বল্লে : বাজি সুখী দম্পতি
কাছে আসতে দুজনেই হেরে গিয়ে
চিনতে পারলুম কানা আর খোঁড়া
ভিখিরী দুটোকে ॥

সারাটা দিন দুজনে কেবলই হেরে যাচ্ছিলুম
একটাও বাজী না জিততে পারার জিদে
দুজনেই উঠছিলুম রেগে ॥

সন্ধ্যের প্রথম তারাটাকে ভাল করে দেখে
তুমি বল্লে : বাজী থর্ব্যাস্ত—ভালবাসা,
আমি বল্লুম : না সবকিছু-স্মৃতি,
তারাটা দুজনকেই জিতিয়ে
স্মৃতি আর ভালবাসা মিশিয়ে—
ভাস্বরতায় চক্‌চক্‌ করছিলো ॥

আশিস সান্যাল

আধুনিক বাংলা কবিতায় শব্দ চেতনা

কেমন করে দেবো তার রূপের বর্ণনা? শব্দে যাকে ধরতে পারিনা, অভিধায় যাকে বাঁধতে পারিনা, অথচ যে রূপের ব্যঞ্জনা বুকের গভীরে সর্বদা অনুরত। তাইতো প্রিয়ার বর্ণনা করতে গিয়ে কীটস্ প্রার্থনা করেছিলেন এমন শব্দ, যা উজ্জ্বলেরচেয়েও উজ্জ্বলতর। কাব্য রচনার সূত্রপাত থেকেই কবির সংগ্রাম এই কারণে শব্দের সুন্দরতম সত্তার আবিষ্কারে। কেননা, মনের সমস্ত প্রকার আবেগ আর অনুভূতি শেষ পর্যন্ত তো এই শব্দের কাছেই নতজানু।

শব্দইতো কবিতার মুখ্য উপাদান। শব্দ সাজিয়েইতো কবি তাঁর কবিতা রচনা করেন। আত্মসমীক্ষণের উত্তাপে ঘনীভূত তাঁর মনের অনুভূতিকে পাঠকের মনে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে শব্দইতো সেতুবন্ধ। কিন্তু কেমন করে শব্দ অর্জন করে সেই অপরিসীম শক্তি? কেবলমাত্র বাচ্যার্থের মাধ্যমে তা কখনও সম্ভব নয়। তাহলে নিশ্চয়ই তার অতিরিক্ত এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে শব্দের, ধ্বনিবাদীদের ভাষায় যার নাম ব্যঞ্জনা। শব্দের এই শক্তি আছে বলেই অনেক সময় অর্থ না বুঝেও কেবলমাত্র কানে শুনেও কবিতা থেকে আনন্দ পাওয়া যায়। এলিয়ট স্পষ্টতঃই বলেছেন: "Germine poetry can communicate before it is understood."

কিন্তু এটাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শুধু শব্দ বা ধ্বনিমাত্রই কবিতা নয়। যখন কোনও শব্দ বা ধ্বনি অন্য কয়েকটি শব্দ বা ধ্বনির সমবায়ে কবির ভাব-প্রকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে, তখনই তা হয় কাব্য। তাই শব্দের আলোচনা অনিবার্য কারণেই ভাষার আলোচনায় রূপান্তরিত হয়।

সাধারণ অর্থে ভাষা বলতে বুঝায়—মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা। কিন্তু কাব্য আলোচনায় যে ভাষার কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, সেই ভাষা কেবলমাত্র শব্দ সমবায়ে গঠিত ভাষাই নয়। সেই ভাষা দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা থেকে আলাদা। কেননা, কবি তাঁর ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে প্রচলিত ভাষার ব্যবহারে কেবলমাত্র সচল জীবনধারারই আশ্রয়ী হননা, সেই ভাষায় সচল, অচল কিংবা আভিধানিক—সমস্ত প্রকার শব্দেরই দ্বারস্থ হন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি যতখানি শব্দাশ্রয়ী হন, ততখানি ভাষাশ্রয়ী হননা। কবি

ভাষায় মৃত বা অপ্রচলিত শব্দরাজি আহরণ করে তাতে নতুন অর্থের আরোপ এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে থাকেন। শক্তিমান কবিরা তাঁদের সৃজন কর্মে অনেক সময় চলমান জীবন থেকে নির্বাসিত শব্দমালাকে ব্যবহার কৌশলে এমন প্রাণবান করে তোলেন যে, তাতে কবিতাটি একটি নতুন ব্যঞ্জনা গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তাই বলা যায়, কবিতার ভাষা যতই জীবননিষ্ঠ হউক না কেন তা শেষপর্যন্ত জীবনের প্রতিরূপ নয়, কৃত্রিম। এই কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টিতে এবং ব্যবহারে কবির ব্যক্তি-প্রতিভা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ অর্থ বিন্যাস এবং ধ্বনিবিন্যাসকে একত্র মিলিত করে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে থাকেন। এর ফলেই ভাষা সাহিত্য হয়ে ওঠে, ভাবকে রসে পরিণত করে। তখন সেই ভাষা শুধু বোঝায় না, বাজায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "মানুষের বুদ্ধি সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, দেখিয়েছে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাৎ। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই. তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলঙ্কার থাকে উপযুক্ত মত, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে। পাঠক কবিতার ভাষার এই বিশেষ দিকটি অনুধাবন করতে পারেন না বলে কবিতা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বা রহস্যময় হয়ে ওঠে। অথচ এই বেড়াজাল তিনি অতি সহজেই ভেঙে ফেলতে পারেন, যদি কাব্য ভাষার এই বিশেষ রহস্যটি সম্বন্ধে অবগত থাকেন।

কবিতার ভাষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট শিল্পী দেগা-র সনেট লেখার শখ ছিল। একদিন আর একজন শিল্পীর বাড়িতে বসে দুঃখ করে বলেছিলেন: 'সারাদিন ধরে চেষ্টা করলাম। তবু সনেটটা রূপ নিলনা। অথচ আমার মনে তো ভাবের অভাব নেই।' উত্তরে বলেছিলেন মালার্মে: 'দেখ দেগা, ভাব দিয়ে তো সনেট হয়না, সনেট হয় কথা দিয়ে।' এক্ষেত্রে মালার্মে যাকে কবিত্ব বলতে চেয়েছেন, তাহল কথার শব্দার্থময় দেহের ব্যঞ্জনা। কবির কল্পনায় হয়তো কোনও দুর্লভ মুহূর্তে একটি প্রতীক উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু কবিতার কেন্দ্রে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে চাই নিরলস অনুশীলন। কবিতায় যে ভাব রসে রূপায়িত হয় অথবা যে

প্রতীক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, তা কিন্তু 'গোষ্ঠীর' ভাষা নয়, তা এক ধরনের কৃত্রিম ভাষা, কবির স্বোপার্জিত বৈদগ্ধ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং পরিমার্জিত ভাষা। এই বৈদগ্ধ্য অর্জনের জন্য চাই একদিকে ভাষার ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সামর্থ্য সম্পর্কে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে জীবনব্যাপী অনুশীলন।

॥ এক ॥

ভাষা এবং শব্দের এই শক্তির আবিষ্কার বাংলা কবিতায় মূলতঃ মধুসূদন থেকেই সূত্রপাত। তিনিই সর্বপ্রথম নতুন নতুন শব্দচয়নের মাধ্যমে একটা ক্লাসিক সাহিত্য মানস গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও শব্দের বিচিত্র ব্যবহার করেছেন। সে প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান এখানে নেই। রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতায় শব্দ এবং ভাষা ব্যবহার কেমন বৈচিত্র্য অর্জন করেছিল, তাই বর্তমান আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্র পরবর্তীকালের কবিরা শব্দ ও ভাষা ব্যবহারে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, তা প্রধানতঃ রবীন্দ্র জগৎ থেকে মুক্তি প্রয়াসে। এই কারণেই ভাষার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা নতুন ভাবনাবাহী দেশী, বিদেশী, সংস্কৃত, প্রচলিত, অপ্রচলিত—যে কোনও শব্দের কাছে নতজানু হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ অমূর্তকে মূর্ত করতে গিয়ে নিওলিথ, টোটেম, প্রভৃতি বিদেশী শব্দের সঙ্গে হাড়হাভাত, বিয়োনো, ঘাইমৃগী প্রভৃতি কবিতায় এতকাল অন্ত্যজ শব্দের ব্যবহার করে যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, তার তুলনা বিরল। বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে অবশ্য চেনা শব্দের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। এ ব্যাপারে বোধ হয় সর্বাধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন: 'মালার্মে' প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ ই আমার অন্বিষ্ট। আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।' অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ শব্দচয়নের ব্যাপারে মালার্মের মত প্রযত্নশীল হলেও, কাব্যাদর্শের দিক দিয়ে মালার্মের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান: বিস্তর। যাই হোক, সুধীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শব্দের ধ্বনিকে প্রাধান্য দেননি, শব্দের অন্তরের অভিজ্ঞতাকেও তাৎপর্যমণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়—

"মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ অপ্সরী ;
দুরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয় ;
তোমার অবেদ্য গানে অব্যক্তির সতর্ক প্রহরী
বিমুগ্ধ নিদ্রায় লোটে, মুক্তি পায় অনির্বচনীয়।"

কবি যে শব্দ ব্যবহার করেন, তা যে কেবলমাত্র শব্দার্থের জন্য তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়, তা নয়। বরং "শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং ছন্দের শোভনতা" বাচ্যার্থক অতিক্রম করে যে ব্যঙ্গ্যার্থের সৃষ্টি করে, তার জন্যই কবিতায় যথাযথ বিশিষ্ট শব্দের এত আদর। সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। তাঁর কবিতায় অপ্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এই কারণেই পরিলক্ষিত হয়। তা ছাড়া ভাষায় একটা গুরুগম্ভীর চাল, আভিধানিক শব্দ এবং নামধাতুর ব্যবহার জনিত ক্লাসিক ভঙ্গি এবং ভাষাকে সংযত এবং পরিচ্ছন্ন করে তুলতে তিনি যে প্রয়াস করেছেন, আধুনিক কাব্যে তার তুলনা নেই বললেই চলে। ভাষাকে তিনি করেছেন ইঙ্গিতবহ। ক্রিয়াপদ উহ্য রেখে এবং সংহত ভাববাহী বিশেষণ করে কাব্যের বাক্য ব্যবহারে একটা নতুন শক্তি এনে দিয়েছেন। যেমন—

"নিস্পন্দ নিরিক্ত কুঞ্জ; পরিত্যক্ত অচ্ছোদ সরসী;
হৃতস্পর্ধা বনস্পতি পুঞ্জীভূত আতঙ্কে গম্ভীর;
সন্ত্রাস্ত বিহঙ্গবৃন্দ অপ্রতিভ, অবনতশির,
প্রহরের জপমালা আবর্তিছে স্তব্ধ শাখে বসি।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষা সংহতি পরবর্তীকালের কবিদেরও যে লেখার গঠন-রীতির ক্ষেত্রে সংযম আনতে সাহায্য করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

অমিয় চক্রবর্তীকেও বলা যায় এক অর্থে, শব্দসচেতন। চলতি শব্দ ব্যবহারে তিনি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোট ছোট বাক্যরচনা করে এবং অনেক সময় আপাতঃ অসংলগ্ন একটি দু'টি শব্দের গ্রন্থিতে ভাবের সংকেতময়তা সৃষ্টিতে তিনি আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও বিশেষ্য থেকে বিশেষণ বা বিশেষণ থেকে বিশেষ্য সৃষ্টির অহেতুক প্রবণতায় কবিতাকে কিছুটা আড়ষ্ট করে ফেলেছেন।

জীবনানন্দ দাশ শব্দের ব্যবহারে তৈরী করেছিলেন একটি নিজস্ব জগৎ। প্রতিমুহূর্তে যেমন শব্দ রচনা চলছে, তেমনি প্রতিমুহূর্তে চলছে সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রয়াস। বহু ব্যবহারে শব্দ ব্যঞ্জনা হারায়। কিন্তু সেই শব্দই নতুন বাক্যাংশে সংযুক্ত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে। এই উপলব্ধি থেকে জীবনানন্দ শব্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করেছেন। প্রয়োজনে নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন। অন্ত্যজ শব্দে দিয়েছেন নতুন ব্যঞ্জনা। যেমন—

"রূপ ঝরে যায়—
তবু করে সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন,
যে যৌবন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে !—
শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে,
ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে—অসুখে !
দেখিতে ছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
ঠোঁটে ঠোঁটে অসুবিধা—ভিতরে অসুখ।"

বুদ্ধদেব বসু চেনা শব্দের নতুন প্রয়োগের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন বেশি। যদিও 'এল দোরাদো', 'মিরাক্যাল', 'ম্যাপ্স', 'ওকভিল' জাতীয় কিছু বিদেশী শব্দ এবং 'মোকাবিলা', 'কবুল করা', 'ধানভানা' জাতীয় কিছু আটপৌরে শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন, তবু শব্দ ব্যবহারে চমক সৃষ্টি করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য থেকেই জানা যায় : "এক একটি শব্দ থেকে কত বেশি আদায় করে নেওয়া যায়, আধুনিক কবির লক্ষ্য সেই দিকে। আধুনিক কবিতায় সব শব্দের মূল্য সমান নয়, মাঝে-মাঝে কোনো কোনোটি চাবির মত কাজ করে, রহস্যের দরজা তাতে খুলে যায়, হঠাৎ তার আঘাতে চারিদিক আলো হয়ে ওঠে, চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা কবিতায়।" বুদ্ধদেবের কবিতায় এই বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট। চেনা শব্দের ব্যবহারে যে ব্যঞ্জনা কত সার্থক হতে পারে, নিচের উদ্ধৃতিটিই তার প্রমাণ।

"বাইরে বরফ রাত্রি। ডাইনি হাওয়ার কনকনে চাবুক
গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মত টুকরো ক'রে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াসার মধ্যে, উপরে আনে আকাশ, হিংসুক
হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম ; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।"

একদিক থেকে অর্থাৎ অচেনা শব্দের ব্যবহারে বিষ্ণু দে আতিশয্য দেখিয়েছেন। এবং এই আতিশয্য কবিতার মেজাজ সৃষ্টিতে কতদূর সহায়ক হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। 'টপ্পা-ঠুংরি' থেকে কয়েকটি লাইন প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাচ্ছে।—

"তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা লয়ে
পিদসিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেডিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ।'

এখানে 'পিদসিকাতো' শব্দটি পাঠককে ঘাবড়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এরকম 'অম্পূদীক্ষা', 'কল্মষবিনাশ', 'জিলহাবিলম্বিতে', 'টাইরেসিয়স' ইত্যাদি বহু অপরিচিত শব্দ বিষ্ণু দের কবিতায় বার বার এসেছে। শব্দগুলি পরিচিত হলে হয়তো কবিতার আমেজ সৃষ্টিতে অনেক বেশি সহায়ক হত। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে স্বতন্ত্র হবার বাসনাতেই কবি এইসব অপরিচিত শব্দের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় এই প্রভাব কম।

সতীকান্ত গুহ কাব্য রচনায় আবেগধর্মী শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। কবিতায় দুরূহ এবং অপরিচিত শব্দ দিয়ে তিনি কবিতাকে ভারাক্রান্ত করতে চান না। তাই তাঁর কবিতা সহজ, সরল, আবেগে পাঠক হৃদয়কে দোলায়িত করে। তাঁর কবিতা থেকে একটি আশ্চর্য সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।—

নৌকা ভাসাবো না জলে
নদীতে না লাগলে জোয়ার।
থাক স্বর্ণহার থাক রেশমে জরীর নকশা,
নক্ষত্র খচিত পাল। কাতারে কাতার
যাত্রী দল যাক ফিরে। অভিসম্পাত, ধিক্কার
দিক মূঢ় মূর্খ প্রজাপুঞ্জে। রাজ্যপাট,
জনশূন্য হয় হোক। আমি উদাসীন সম্রাট
সঙ্কল্প করেছি নৌকা ভাসাবো না জলে
নদীতে না লাগলে জোয়ার।

সমর সেন ভাবের দিক থেকে নতুনত্ব আনলেও পাঠক মনে আঘাত হানতে দিতে তেমন অপরিচিত শব্দের দ্বারস্থ হননি। প্রচলিত আটপৌরে শব্দের সাহায্যেই চেয়েছেন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে।

। দুই ।

চল্লিশের কবিরাও কাব্য রচনায় শব্দ শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েই বাংলা কবিতার জগৎ সমৃদ্ধতর করবার নিরন্তর সাধনা করে চলেছেন। তবে এই

ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছে যথেষ্ট ঋণী। কেননা, ত্রিশের কবিরাই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে শব্দ ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট ঐতিহ্য থেকে এগিয়ে চলার কঠিন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, চল্লিশের কবিদের শব্দচেনতা নিষ্প্রভ। শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামই তো কবির অন্যতম ধর্ম। চল্লিশের কবিরা যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তা তাঁদের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহজ, সরল এবং আড়ম্বরহীন শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাই তাঁর কবিতায় চলতি শব্দেরই প্রাধান্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৫ সালে এলিয়ট লিখেছিলেন, "চতুর্দিকে সত্যিকারের যেমন কথাবার্তা হয়, সেই ভাষাই কবি তাঁর বিষয় হিসেবে নেবেন।" তিনি আরো বলেছিলেন, "কবিতার সঙ্গীত হবে, তাঁর সময়ের সাধারণ কথিত ভাষার মধ্যেকার ঘুমন্ত সঙ্গীত।" সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্পষ্টতঃ কোথাও একথার উল্লেখ না করলেও কবিতায় এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তি রয়েছে।

"আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।"

বোধ হয়, এই কারণে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ইঙ্গিতময়তা তেমন উল্লেখ্য নয়। ইশারার বড় অভাব। অনেক সময় চমক লাগায়, কিন্তু নিজের গণ্ডী অতিক্রম করে বিদ্যুৎ আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।

মণীন্দ্র রায়ও কাব্যভাষাকে বাস্তবের প্রতিরূপ করার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তাঁর ভাষায়—

"কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে এতকাল
চলেছে কথার দাবার ছক থেকে ছকে
আজ বাজিমাৎ—থেমে গেছে হাত। বকে
এখনো অনেক লোক ; বকে আজে বাজে বেহুঁশ বেচাল,
এবার কথায় কিছু প্রেম দাও, আবেগ জমাও।"

কিন্তু শব্দে এই আবেগ আসবে কেমন করে? এর জন্য প্রয়োজন কবির একটা নিজস্ব জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস। আর তারজন্য কোনো জাতবিচার

নিরর্থক। জগৎবরেণ্য মহাকবিরা শব্দের জাতবিচার গণ্য না করেই সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের অমর কাব্য। যদিও অবয়বে এবং অভিধায় ভাষা সমাজের অনুগামী, তবু কাব্যভাষায় যে একটা অপার্থিব ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে, সেই শব্দচেতনা সম্বন্ধে মণীন্দ্র রায় সচেতন হলে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো পূর্ণ হতো।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শব্দ ব্যবহারে খুবই মিতব্যয়ী। একটি শব্দকে দিয়ে যতখানি সম্ভব বেশি কাজ তিনি আদায় করে নিতে চান। তাই তাঁর কাব্যে ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা ও বৈদগ্ধ্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাব্যে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। দৈনন্দিন আটপোরে ভাষাকে ইঙ্গিতময় করে তুলে তার মধ্যে সঙ্গীত স্পন্দন সৃষ্টিতে যে সার্থকতা অর্জন করেছেন, তার তুলনা আধুনিক বাংলা কাব্যে বিরল। 'কলকাতার যীশু' কবিতা থেকে প্রসঙ্গতঃ কয়েক পংক্তি তুলে ধরা যাচ্ছে।—

'স্টেট বাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছো।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই ;
দু'দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।"

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিজাত তৎসম শব্দের পাশাপাশি কাব্যে অন্ত্যজ শব্দের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াসী। এ ব্যাপারে তিনি কিছুটা পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী। কিন্তু অপ্রচলিত বা প্রচলিত বা শব্দের সমাবেশে সিম্ফনি সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। যেমন—

"দু' চোখে লাগে লবণছিটা ভীষণ পিপাসায়
হৃদয় হয় ধনুক ছিলা হাওয়ার যন্ত্রণায়
দুঃখেরে বরিও
নক্ষত্রের মতন নীল আঁধারে ঝাঁপ দিও।"

অরুণ ভট্টাচার্যও যে শব্দসচেতন তা তাঁর বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত। কিন্তু তাঁর শব্দচর্চা কোন আত্মরতি নয়। কবিতায় এমন শব্দই তিনি চান—

"কিছু কিছু শব্দ হাসতে জানে, হাসায়
কিছু কিছু শব্দ কাঁদতে জানে, কাঁদায়
কিছু কিছু শব্দ অলীক ভালোবাসায়
হঠাৎ জেগে ওঠে।"

একথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও চল্লিশের কবিরা প্রাথমিক স্তরে তাঁদের পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তবু অচিরেই তাঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন যাঁর যাঁর স্বকীয় শব্দভাণ্ডারে। সেই বাক্‌ভাণ্ডারের মহার্ঘতম সম্পদ এক অনায়াস সারল্য এবং সাবলীল স্বচ্ছতা।

॥ তিন ॥

শব্দ চেতনায় চল্লিশের যেখানে শেষ, পঞ্চাশের সূত্রপাত সেখান থেকেই। শব্দ নির্বাচনে এই সময়ের কবিদের মধ্যে এসেছে একটা ঋজুতার সমন্বয়। তাঁদেরকে আর স্বতন্ত্র হবার সাধনায় অপরিচিত শব্দের দ্বারস্থ হতে হয়নি। অলোকরঞ্জন কবিতায় শব্দ ব্যবহারে এনেছেন লজ্জাবতী বধূর 'ছায়াচ্ছন্নতা'। প্রকৃতির সঙ্গে সহৃদয় সান্নিধ্য স্থাপনের প্রয়াসের ফলে তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে লোকমুখের ভাষা এবং সামান্য শব্দের ব্যঞ্জনা। যেমন—

'হঠাৎ শব্দ থেমে গেল, একটু জ্যোৎস্না পাতার জানালার
মধ্য দিয়ে এসে পড়ল, তুমি দেখলে নগ্ন শরীর তার
শিশুর মতো পড়ে আছে, গভীর ঘুমের কারুকাজে
চোখের দু'টি নম্র নদী, ভ্রূযুগে ভৃঙ্গার।'

আলোক সরকার শব্দ নির্বাচনে একটা পরিশীলিত মনের পরিচয় দিয়েছেন। তার শব্দৈষণা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মালার্মের সেই শব্দসন্ধান এসে মিলেছে জীবনানন্দের শব্দব্যক্তিত্বে। ফুল, পাখি, বটগাছ, বাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধা নিয়ে এসেছে তাঁর কাব্যে। নীল, হলুদ বা অন্যান্য যেসব রঙের কথা তিনি বলেছেন, তার ব্যঞ্জনাও স্বতন্ত্র।

'আমিও নিবিড় এক অনুগামী হবো—সংহত আবেগী অকৌশল
সিঁড়ির বাঁকের কাছে সমর্পণে বিদ্যুতের সপ্রাণ সম্ভার
রচনা করবে। হলুদ পাখির কণ্ঠ নিঃস্ব অবিরল
বটের পাতার মৌনে সমন্বিত—প্রকৃতি নিস্পৃহ অবসাদে।'

'কৃত্তিবাস' কবিগোষ্ঠীর অন্যতম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লোকমুখের সুশ্রী ও কুশ্রী—সমস্ত প্রকার শব্দকেই কাব্যব্যঞ্জনা দিতে চাইলেন। এক ধরণের

বিষণ্নতা যেমন তাঁর কবি ব্যক্তিত্বে সম্প্রসারিত, শব্দ নির্বাচনেও তাঁর সেই একই ধরনের প্রয়াস। সুকৌশলী শব্দ প্রয়োগে, ব্রাত্য এবং, অবহেলিত শব্দের আবিষ্কারে বাংলা কবিতায় একটি নতুন দিগন্তের আভাস দিয়েছেন তিনি।

'আমার দু'চোখ তোমার অঙ্গে, লীলাময় হাত মৃদু অঙ্গুলি—
লঘু পদযুগ, ক্ষীণ কটিতটে দারুণ দোলানি দেখে উরুদেশ,
হেম দুই বুক আজ জেগে ওঠে স্তননে বর্ণে, নাচ কি শিল্প ?'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বাহারি শব্দের চমক সৃষ্টিতে। শঙ্খ ঘোষ স্নিগ্ধ শব্দের নিপুণ ব্যবহারে অর্জন করেছেন, বিরল কৃতিত্ব। কবিতা সিংহ সহজ শব্দের সুতীব্র ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অভিলাষী। তাঁর ভাষায়—

'ভাবি, যে ভাষা বুঝেছি
সে ভাষা বলে বোঝাতেম।'

তরুণ সান্যাল চান শব্দকে আইডিয়া বা বুদ্ধির নৃত্যে দোলায়িত করতে। তাই তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ ধরা দেয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বনিগত বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্রাক্ট হিসেবে।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় শব্দ নিয়ে যে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, তাই তাতে এনে দিয়েছে সমৃদ্ধি। শব্দ সাজিয়েই তো লেখা হয় কবিতা। এই সাজিয়ে বলার মধ্যেই রয়েছে কবিত্ব। 'জড় স্থানু একটা শব্দ একক, তার কোনও শক্তি নেই, জনন নেই, অপর এক শব্দের সমবায় সংঘর্ষে সে জ্বলে ওঠে। যেমন সমস্ত পাপহর অগ্নিদেবতা কবিতাও তেমন। তাই শব্দের ফাঁকা সংসারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে গীন্সবার্গ বা ভজনেসেনস্কিকেও নতজানু হতে হয় শব্দের কাছে। শব্দ সেই অপ্সরী যার রূপের টানে আবদ্ধ থাকেন কবিরা।

র‍্যাবো বলেছিলেন, প্রতিটি স্বরবর্ণেরই নাকি একটা নিজস্ব রঙ আছে। 'এ' কালো 'ই' শাদা, 'আই' লাল, 'ইউ' সবুজ এবং 'ও' নীল। হয়ত এ শব্দচিন্তায় এক ধরণের বাড়াবাড়ি। কিন্তু আধুনিক কবিরা এ ব্যাপারে খুবই সচেতন যে, ধ্বনির দিক থেকে শব্দগুলিকে হাল্কা, ভারী, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, মসৃণ ইত্যাদি ভাগ করা যায় এবং তারই সার্থক নির্বাচন ও পারম্পর্যের ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয় ব্যঞ্জনা। কাব্য রচনার এ মৌল রহস্য যাঁর জানা আছে, তিনিই তাঁর প্রিয়তমার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষার ব্যাকরণকে অস্বীকার করেন এবং 'অভিধান বহির্ভূত শব্দেরও প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না। শব্দ-অপ্সরীর আরাধনাই এই কারণে আধুনিক কবির প্রধান আরাধনা॥

আশা দেবী

জনৈক

টিনের রং চটা স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে যখন কেশব রায় ষ্টেশনে পৌঁছুলো তখন ট্রেন বাঁশী বাজিয়ে চলা সুরু করেছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই সামনে যে কামরাটা ছিল কেশব রায় পড়ি মরি করে তাতেই উঠে বসলো।

গাড়ীটা তখন বেগে প্লাটফরম ছেড়ে গেলো।

কেশব রায় এতক্ষণ কুকুরের মত ধুকছিল। তার জীর্ণ মাদুলী পরা বুকটা থেকে যেন হাঁপরের মত আওয়াজ উঠছে। কোটরে ঢোকা চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বার দুই গলা শুকিয়ে যাওয়া শুকনো কাশি কেশে কেশে কেশব রায় একটু শান্ত হয়ে বসলো।

সামনের গদি আঁটা সীটগুলো প্রথম শ্রেণীর। বাধ্য হয়েই সেখানে উঠে কেশব রায় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলো। একবার স্যুটবুটধারী সুবেশা অফিসার আর একবার হাতকাটা-গলাকাটা-চুলকাটা রং মাথা ভদ্র-মহিলার দিকে তাকিয়ে মিনতি করতে লাগলো : বাধ্য হয়েই উঠেছি। পরের ষ্টেশনেই নেমে যাব। কিন্তু তাতে তাদের ভ্রূকুটি এবং শিকেয় তোলা নাসিকা কিছুতেই স্বাভাবিক হলো না।

ভদ্রমহিলা বললেন : বাবা কী নোংরা লোকটা! এদের জন্যেই কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। যেখানেই পাবে, ঠিক বিনাটিকিটের প্যাসেঞ্জারে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে।

: একজাক্টলি রুবি, তুমি আর একটু সরে বস। নইলে দুর্গন্ধে তোমার অসুখ হতে পারে।

গলার স্বরে হঠাৎ চমকে উঠলো কেশব রায়। একবার ভদ্রলোকের দিকে আবার তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তার চোখের জলে সব দিক ঝাপসা হয়ে এলো। তার পর হঠাৎ যেন গলার স্বর একেবারে বন্ধ হয়ে এলো আর বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে লাগলো।

ভদ্রলোক এবার খুব ভালো করে চেয়ে রইলো কেশব রায়ের দিকে কিন্তু কথা বললো না। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল সে।

—কি গো, কি হলো? স্ত্রী শুধালো।

—না—কিছু না।

—শরীর-টরীর তো খারাপ লাগছে না,—স্ত্রী আবার জিজ্ঞেস করলো। আর খারাপ হবেই বা না কেন লোকটার গায়ের থেকে যা গন্ধ বেরুচ্ছে তাতে বমি আসা কিছুই বিচিত্র নয়। কখন যে পরের ষ্টেশনটা আসবে তাই ভাবছি।

কেশব রায় এবার সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে একেবারে এককোণায় এসে দাঁড়িয়ে সে তার কঙ্কালসার দেহটা গাড়ীর গায়ে যেন মিশিয়ে দিতে চাইলো। লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

তার দুটি ছেলে। ছোটটি পঙ্গু। আগে অবস্থা খুবই ভাল ছিল। কিন্তু বন্যায় আজ আর কিছুই নেই। অনেক কষ্টে নিজেকে রোজগার করে দিনগুজরাণ করতে হয়। একে অত্যন্ত খাটনি তার ওপর গত দুবছর থেকে ক্রমাগত ভুগে ভুগে সে একেবারে অস্থি চর্মসার হয়ে গেছে। জিনিষপত্রের যা দাম, সংসার চালান দায়। একে খাটনি, তাই খাওয়া নেই; কেশব রায় যেন ছ্যাকরাগাড়ীর ঘোড়ার মত মুখে লাগাম নিয়ে ছুটেছে কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

—এই যে শুনছেন?—ওদিকে একটু সরে দাঁড়ান। দেখছেন না সাহেবের কত কষ্ট হচ্ছে। আপনার গায়ে যা গন্ধ হয় তো গা গুলিয়ে এখুনি বমিই করে দেবেন। কাগজ দিয়ে মুখখানা ঢেকে সাহেব তখন বসে। স্ত্রীর কথায় সে কোনই সাড়া দিলো না।

এবার গাড়ীর গতিবেগ থেমে আসছে। স্টেশন প্রায় এসে গেল। হাতে স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে কেশব রায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নামতে যাবার সময় আত্মসম্বরণ করতে পারলো না।—ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো: তবু পনেরো বছর পর দেখা হয়ে গেলো। ভালো আছ দেখে খুশী হলাম—বলেই সে দ্রুত পায়ে নেমে গিয়ে ষ্টেশনের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

—বিরাট খোঁপার ভারে জর্জরিত। চিবিয়ে চিবিয়ে টেরা চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে: বুড়োকে তুমি চেন নাকি? একটু ইতস্তত করে স্বামী উত্তর দিলে: না, চিনি না। ও হয়তো কোন চেনা লোক বলে আমায় ভুল করে থাকবে।

নিখিল সেন

নিগ্রো কবি ল্যাংস্টন হিউজ

ওয়াশিংটনের এক হোটেলে ঝাড়া পোঁছার কাজ করত ছেলেটা। অতি সাধারণ এক 'বাস বয়'। জাতে নিগ্রো। সে কিনা এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারে? একটু হকচকিয়ে উঠলেন ভ্যাচেল লিণ্ডসে। আমেরিকার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। ওয়াশিংটনের ওয়ার্ডম্যান পার্ক হোটেলে নিত্য তাঁর আনাগোনা। হোটেলের বয়টির তা জানা ছিল। তাই একদিন সে করল কি, লিণ্ডসের খাবার টেবিলের পাশে অতি সংগোপনে গুটী তিনেক তার নিজের লেখা কবিতা চাপা দিয়ে রেখে এলো। লিণ্ডসে এসে কবিতা কটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর হোটেলের ডাইনিং রুমে বসেই উচ্চস্বরে কবিতা কটি পুনরাবৃত্তি করে গেলেন। শ্রোতার দল স্তব্ধ হতবাক।

অবশ্য এখানে বলে রাখা ভাল, বাল্যকালেই কবিতা লেখায় ল্যাংস্টন হিউজের হাতে খড়ি হয়েছিল। এবং স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর বহু কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। ম্যাক্স ইস্টম্যান, ফ্লইড ডেল, ক্লডি ম্যাককে প্রমুখ মার্কিন কবির রচনার সংগে ইতিমধ্যেই তাঁর পরিচয় হয়েছে 'লিবারেটর' পত্রিকার মারফৎ। ওয়াল্ট হুইটম্যান, পল লরেন্স, ডানবার ও কার্ল স্যাণ্ডবার্কের কবিতার তিনি অনুরাগী পাঠক। তাঁদের রচনায় তাঁকে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। ওয়াশিংটনের ওয়ার্ডম্যান পার্ক হোটেলের সেদিনকার সন্ধ্যা ল্যাংস্টন হিউজের জীবনে নবদিগন্তের উন্মেষ সূচনা করল। হোটেলের এক সাধারণ বয় রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা লাভ করল নিগ্রো কবি হিসেবে।

অথচ কিছুদিন পূর্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের খরচা চালাবার জন্য ল্যাংস্টন হিউজকে নানাবিধ কাজের ধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। অর্থাভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ বেশীদূর তাঁর অগ্রসর হতে পারে নি তখন। পড়াশোনায় ক্ষান্ত দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে পাড়ি জমাতে হয়েছে সুদূর আফ্রিকা আর হল্যাণ্ড অভিমুখে জাহাজের খালাসের কাজ নিয়ে। প্যারিসের মণ্টমাঁতে নৈশ ক্লাবে পাচকের কাজও করতে হয়েছে কিছুকাল। তারপর স্বদেশে ফিরে এসে ওয়ার্ডম্যান পার্ক হোটেলের 'বয়' রূপে।

কাব্যলক্ষ্মী এবার সুপ্রসন্না হলেন ল্যাংস্টন হিউজের প্রতি। নিগ্রো সংস্কৃতির পাদপীঠে রচিত তাঁর "Opportunity" সাহিত্য প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করলেন। এই প্রতিযোগিতার ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কার্লভন ভিসটেভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তখন ল্যাংস্টন হিউজের সব কবিতা দেখতে চাইলেন। আর সেগুলি নিয়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক আলফ্রেড এ. নফ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আলফ্রেড নফ সেগুলি প্রকাশ করেন 'The Weary Blues' শিরোনামায়।

এটি তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। এই প্রথম কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার এক সাহিত্যরসিক বিত্তশালী মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এবং এঁরই দৌলতে তিনি তাঁর অসমাপ্ত কলেজ জীবনের পাঠক্রম পুনরায় সুরু করেন। অচিরে স্নাতক হয়ে পেশাদার লেখক জীবনে হন বৃত। জীবনে তিনি তারপর বহু কবিতা, গল্প, নাটক, নভেল সিনেমার কাহিনী ইত্যাদি বহুবিধ করেছেন রচনা। মস্কো ও হলিউডেও কিছুকাল চলচ্চিত্রের কাজে রত ছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'মুলাত্তো'র নাট্যরূপ ব্রডওয়ে থিয়েটারে একনাগাড়ে দুবছরকাল বিপুল সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। শিশুদের জন্য তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গান ও কবিতা হারলেম-এর ঘরে ঘরে একদা এমন কি আজও অনুরণিত হয়।

'আমেরিকার নিগ্রো জীবন রূপায়িত করবার জন্য আমি বিশেষ করে লেখনী ধারণ করেছি', বিংশ শতকের লেখকের ("Twenty Century Authors") সম্পাদকের নিকট লিখিত সংক্ষিপ্ত আত্ম পরিচয় দিতে গিয়ে ল্যাংস্টন হিউজ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তিনি আরও লেখেন "এ ছাড়া কিউবা ও হাইতি দ্বীপের নিগ্রো লেখকদের কিছু কিছু কবিতা আমি অনুবাদ করেছি।" (তিনি আফ্রিকার নিগ্রো লেখক ও কবিদের একটি সংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত করেন)। ল্যাংস্টন হিউজের অনেক কবিতা পৃথিবীর নানা ভাষায় বিশেষ করে রুশ, জার্মান, ফরাসী, স্পেনীশ, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইডীশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'দি উইয়ারি ব্লুস' ছাড়া 'ফাইন ক্লথস টু দি জু,' 'ডিয়ার লাভলি ডেথ', ('শেকস্পীয়র ইন হারলেম' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ এবং 'নট উইদাউট লাফটার', 'মুলাত্তো' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁকে নিগ্রো সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। 'নট উইদাউট লাফটার' উপন্যাসখানির জন্য তিনি 'হারলেম পুরস্কার' লাভ করেন। এ ছাড়া 'The Big Sea' ভ্রমণ কাহিনীটিও তাঁর অপূর্ব সাহিত্য কীর্তি।

নিগ্রো 'রেসিজম' বা জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদই রিচার্ড রাইট বা অপরাপর নিগ্রো কবি ও লেখকদের মত ল্যাংস্টন হিউজের কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি বুঝি লেখনী ধারণ করেছিলেন। কবিতার কোন বিশেষ আকৃতি বা প্রকৃতির দিকে তিনি বড় একটা নজর দেন নি। আপন বক্তব্য গুণেই সৃষ্টি তাঁর অনন্য। আর এ জন্যই দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বহু মার্কিন তরুণ কবি প্রেরণা লাভ করেছে—তাঁর রচনা থেকে। এ তরুণ কবি দলের পুরোধায় রয়েছেন মার্গারেট ওয়াকার, আওয়েন ডডসন, রবার্ট হাইডেন, সিরণ ও হিগিনস মেলভিন, তলসন প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর নিগ্রো কবিরা।

ল্যাংস্টন হিউজের একটি কবিতার অনুবাদ :

॥ **আমিও** ॥

আমিও গান গাই ভাই আমেরিকার :
গান গাই তোমারই এক কৃষ্ণাঙ্গ ভাই!
নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের দল যখন এল—,
আমায় তখন ওরা বললে :
পাত পড়েছে তোমার রান্নাঘরে—
বললে অনাদর উপেক্ষায়।
আমি কিন্তু মনে মনে হাসি :
আর ঘাড় গুঁজে খাই
আর শক্তি বাড়াই।
আগামীকাল
নিমন্ত্রিত অতিথির দল
আবার যখন আসবে
আমিও তখন এগিয়ে যাব ;
বসব গিয়ে টেবিলে—
বসব সমান আসন নিয়ে।
তখন আর কেউ মুখ পাবে না বলতে :
'যাওগে, পাত পড়েছে তোমার রান্না ঘরে।'
তখন
ওরা সবাই জানবে,
আমিও কত শ্রীমন্ত—কত সুন্দর ;
আর হবে লজ্জিত
আমিও ভাই তোমাদেরই একজন আমেরিকান!

সুরেশচন্দ্র সাহা

কুরবান এবং

আহত খাসিটাকে মন দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার সামন্ত অন্যমনস্কের মত শুধালেন—'কি বলে ওকে ডাকো?' আশমা উত্তর দেবার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। খুব আগ্রহের কণ্ঠে আবেগ মিশিয়ে আশমা বলল—'কুরবান, ওকে আমরা কুরবান বলেই ডাকি।' মুকু, আম্মাজান-এরই প্রতিধ্বনি করল—যেন পঁই পঁই করে নাম ধাম বলে দিলে চিকিৎসাটা ভাল হবে। আশমারা অবশ্য জানত, ডাক্তারবাবু যত্ন করেই ওষুধ দেন খুঁটিনাটি সব খবর নেন, নাম ধাম কত কিছু জানতে চান। পশুপাখির নামও। ডাক্তারবাবু বোধ হয় ভাবেন, ওরা পর নয়, নেহাত নিরেট মূকপ্রাণী নয়, হাসপাতালে আসা মানুষদের পরিবারেরই স্নেহপুষ্ট আত্মজন। কৈ, বুনোহাঁস, পথের কুকুর, ধর্মের ষাঁড়গুলোকে ত কেউ কোলে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে না। আম্মাজান, মুকু, আশমা মনে মনে ভাবল, কুরবানের নাম য্যাখন ডাক্তারসাব পুছ করে নিয়েছে, ত্যাখন আর ভাবনা কি? ওদের দিল খুশ হবার কারণ ঘটল।

গালে মুখ ঠেকিয়ে আশমা কুরবানকে একটা চুমু দিল, ওর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে নিল। আঘাতটা মারাত্মক। আশার কথা, কুরবান সংজ্ঞা হারায় নি। চোখে কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে কুরবান আশমাকে চেয়ে দেখল, যেন চুমুর অর্থটি সে ভাল করেই বুঝেছে। আদর করতে করতে আশমা ডাকল—'কুরবান, অ কুরবান। ঘাড়ে খুব নেগেছে? খুব দরদ হতিছে?' পেট-ফাঁপা রিক্সা-চাপা-পড়া কুরবানের পিঠে আশমা হাত রাখল। সমস্ত শরীর থেকে সামান্য শক্তি সংগ্রহ করে কুরবান প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল—ম্যাঁ-এ্যাঁ।

গলাটা একেবারে ছড়ে ছড়ে গেছে কুরবানের; কাটা-কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘাড় থেকে রক্ত পড়ছে—রক্তঝরা মাংস দেখা যাচ্ছে। রিক্স্যার চাকা গলা ঘেঁষে একেবারে কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কে জানে, মাথাটাও হয়ত গুঁড়িয়ে গেছে। মহকুমা শহরের সরু পথ। মান্ধাতার কালে তৈরী—পথে পথে তার বেজায় ভিড়! কি সকাল, কি সন্ধ্যায় পথ চলার আর উপায় নেই। কোন দুর্ঘটনা দৈবাৎ যদি ঘটেই যায় দোষটা কার? কিন্তু আশমারা সে কথা জানে না—কোন দিন হয়ত ভেবেও দ্যাখে না। একরকম

হঠাৎই ত আজ ঘটে গেল। কুরবানকে কোলে নিয়ে সাবধানেই আশমা পথ চলছিল, দুহাতে আপন বুকের সঙ্গে তাকে ল্যাপটিয়ে ধরে। কুরবানের ফাঁপা পেট আশমার পেটের চাপে ঘসটে যাচ্ছিল।

কাল রাতেই কুরবাণের পেট ফেঁপে ঢাক হয়ে গিয়েছিল। আর হবে না-ই বা কেন? বড্ড বেশি খায় কুরবান; খায় আর খাই-খাই করে। রসাল ঘাস, আমের পাতা, লঙ্কাগাছ জিউলী ডাল, কাগজের ঠোঙা—কিছুই আর বাদ নেই। ওদিকে সকালিক চা-রুটিরও মানান সই ভাগ পায়। ডাকতে হয় না: নাস্তার সময় হলেই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়ে—ম্যা—য়ুঁ-য়ুঁ-য়ুঁ। কি করে যে সময়ের হিসেব রাখে খোদায় মালুম। খেয়ে খেয়েই সর্বনাশ হল—পেট ফেঁপে ঢাক হল। তারপর হাসপাতালে যাবার পথে বিপদ এসে ঘাড়ে চাপল। ইস, চাকাটা একেবারে—আশমা আর ভাবতে পারে না, নুরু এবং আম্মাজানও ভাবতে পারে না—কেউ ভাবতে চায়ও না। পেট ফাঁপা কুরবানকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে শুনে কাঁদো কাঁদো মুখ করে নুরু সঙ্গে এসেছিল। আম্মাজানও না এসে থাকতে পারে নি। কুরবান যদি না বাঁচে!

আশমার বাঁয়ে চলছিল রিক্সার সারি এবং ছেলে-কোলে বাচ্চা-পেটে একটি মেয়ে মানুষ। ডাইনে ঘণ্টি বাজিয়ে সাইকেলওয়ালারা। সামনে ছিল ময়লার গাড়ি—পেছন পানে ছাত্রমিছিল। মিছিলে-মানুষে মাল-ময়লায় একাকার। ঠিক এরই মধ্য দিয়ে রুগ্ন কুরবানকে নিয়ে তিন তিনজন লোকের কি আর এগোবার উপায় আছে? আম্মাজানের হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখাবার ইচ্ছাই ছিল না। এই ক'দিন ত পেট ফাঁপার জন্য পেটে গঙ্গামাটি লেপে দিয়ে গঙ্গাপানি খাইয়ে দিয়েছে। ছোটুলাল বলেছিল, নদী ত নয়—দেবখাল। আজও ধম্ম আছে, আজও নাকি তাই দেবখালে জোয়ার ভাঁটা খেলে। এমন লোকের ভক্তি বিশ্বাসের কথা ফেলা যায়—বিশেষ করে কুরবানের যখন ব্যায়রাম হয়েছে। কিন্তু আম্মাজান কুরবানকে শুধু দেবখালের মাটি মেখে পানি খাইয়েই ছাড়ে নি—পীরের দরগায় শিন্নীও চড়িয়েছিল। কিছুতেই কিন্তু ফায়দা হল না; ফুলে ফেঁপে পেটটি আস্তে আস্তে ঢাক হল। ব্যামারি নিয়ে ত আর বসে থাকা যায় না। সামনে ইদ।

রাস্তা কিছু ফাঁকা দেখে আশমা কুরবানকে কোল থেকে একটু নামিয়েছিল। কুরবান একটু একটু করে হাঁটছিল—যেন নতুন হাঁটতে শিখছে। ওদিকে দূর থেকে ধীরে এগিয়ে আসছিল ধান আর খড়ঠাসা গোটাকত

গো-শকট। তৈল তৃষিত চাকার ক্যাচ ক্যাচ, লেজমোড়া লাঠি-পেটা মন্থর গরুর উদ্দেশে মারমুখী গাড়োয়ানদের গালিগালাজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। ছেঁড়া গেঞ্জী গায়ে গাড়োয়ানদের পেটে ভাত ছিল না, গাড়িটানা হাড্ডি-ওঠা গরুর পেটেও ঘাস ছিল না। এদিকে কালনা মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার ড্রাম থেকে উদ্গত দুর্গন্ধে আশমাদের পেটের ভাত বেরিয়ে আসছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পায়খানার মল সংগ্রহ করে মেথররা রোজ ড্রাম ভরে নিয়ে যায়; ছোট শহরের বড় বড়দের নাকের সামনে দিবিা গন্ধ ছড়িয়ে চলে। কারও যেন কিছু করবার নেই। করবার কিছু আশমাদেরও ছিল না। তাই মলের গন্ধে আশমা নিজের মুখে কাপড় গুঁজতে লাগল, আর সেই অসাবধানের মুহূর্তে কুরবানের হল সর্বনাশ—সরু বাঁকমুখে ধানের গাড়ি ঘুরতেই একটা রিক্সা বেসামাল হয়ে পেট ফাঁপা কুরবানকে চাপা দিল।

হাসপাতালের বারান্দায় চার হাত পা ছড়িয়ে কুরবান কেবলই করুণ স্বরে চেঁচাচ্ছিল—ম্যাঁ-এ্যাঁ। দেহটি তার থরথর করে কাঁপছিল, চোখের কোণে ব্যথার জল চিকচিক করছিল, দারুণ নালিশ জ্বল জ্বল করছিল—শুধু মুখ দিয়ে কিছুই প্রকাশ করার ভাষা ছিল না। নালিশ জানাবার উপায় ছিল না। সাইকেল রিক্সা ময়লার ড্রাম, ধানের গাড়ি—কার বিরুদ্ধে নালিশ? কুরবান জানে না। আশমা, নুরু, আম্মাজানও জানে না। কোথায় পেট ফাঁপার দাওয়াই নেবে, আর কোথায় কি হয়ে গেল। কুবরানের মাথা ফাটা রক্তে কালনা শহরের সরু পথ রাঙা হল, আশমার কাপড় ভিজল, হাসপাতালের বারান্দার পাষাণ ভিজল। মাত্র মাস তিনেক আগে কুরবানকে খাসি করা হয়েছিল। তখন কুরবানের বয়স আর কতই হবে? কিন্তু অতটুকু ছাগল ছানা তার ধকল ঠিকই সামলে নিয়েছিল। আশমারা সবাই ভেবেছিল, ঈদের আগেই কুরবান গায়ে গোস্তে বেশ পুরুষ্টু হয়েই উঠবে। উঠেও ছিল। এত্তার আদরে আহ্লাদে খাওয়ায়-খাওয়ায় কুরবান বেশ খানিক বেড়ে উঠে ছিল। আম্মাজান আশমা নুরুরা ওদিকে ঈদের দিন গুনছিল। কুরবান যে ঈদস্পৃহার স্নেহসিঞ্চিত আত্মা, বহুবাঞ্ছিত কোরবাণী!

পশু হাসপাতালে তখন দারুণ ভিড়। আহত রুগ্ন পশুপাখি আর গরম ওঠা গরু মোষের ভিড়। তাদের মালিকদের ভিড়, তামাশা দেখা দর্শকদের ভিড়। ছায় আট দশ বছরের চ্যাংড়া ছোঁড়ারাও হাসপাতালে এসে ভিড় করে দ্যাখে, গরম গরুর গর্ভসঞ্চারের জন্য ডাক্তার কম্পাউণ্ডাররা কেমন করে ইনজেকশন দেয়। নিজেরা দ্যাখে, আর পাঁচজনকে ডেকে

আনে—ফিক ফিক করে হাসে। সমবয়সী মেয়েদেরও ওরা আসতে বলে, কিন্তু তারা আসে না। লজ্জা পায়।

অনেক পশুপাখির ভিড়ের মধ্যে হাসপাতালে তখন নজর পড়বার মত কিছু জীব ছিল। একটি বিকলাঙ্গ ছাগল দেখে ত আশমারা অবাক হয়ে তাকিয়েই রইল। মাটিতে পাছা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে অতি নির্ভয়ে ছাগলটি অদ্ভুত রকমে হেঁটে ফিরছিল—কিছুটা পেঙ্গুইনের মত। আশমারা ভাবছিল, লম্বাটে একটি দুধের থলিই যেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। অল্পদিন আগেই বোধ হয় ছাগলটা বাচ্চা দিয়েছে। খঞ্জ খোঁড়া হলেও মানুষের মত বাচ্চা দিতে ওদের বিরাম নেই—বাচ্চাপয়দায় ছাগল কুকুর মানুষের যেন এক রা। লেংচিয়ে চললেও ছাগলটির মনে মনে নিঃশঙ্ক একটি ভাব ছিল, একটি ডোণ্ট-কেয়ার রকমের দৃঢ়তা ছিল। হাসপাতালের মালিক যেন স্বয়ং ওর পিতৃদেব!

ওদিকে মাস ছয় সাতের এ্যালসেশিয়ানের লোম ঝরা একটা বাচ্চা মুনিবের পায়ের কাছে বসে তার দুই হাঁটুর আকঞ্চিৎকর ফাঁকে ঘাড়টি রেখে জিভ বের করে হা হা করছিল। তার লকলকে জিভের জল মুনিবের পায়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। কেমন যেন দমে-যাওয়া মনমরা মুখটি—বুঝতে যেন বাকি নেই, এটি তার মুনিব বাড়ি নয়, মুনিবগৃহের মহাপ্রতাপান্বিত পশুপতিও সে নয়—তার উচ্চকিত ঘেউ ঘেউ করা এক্তিয়ারে এখানে কেউ বাস করে না। একটি হুলো বেড়াল সগর্বে পিট ফুলিয়ে সামনে দিয়ে চলে গেল দেখেও নীরবে তাকে সহ্য করতে হল। ঠিক তখন লেংচানো ছাগলটি তার দিকে তাকিয়ে যেন একটু হাসল।

অনতিদূরে ছেঁড়া প্যাণ্ট পরা খালি-গা একটি বছর দশেকের মেয়ের কোলে বড় একটি মাদী হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছিল। ঢিল ছুঁড়ে বাঁ পাখনাটি কে যেন ভেঙে দিয়েছে। ডিম-দেওয়া হাঁস মরে গেলে অনেক ক্ষতি। বোধ হয় হাঁসের দুঃখে এবং ভাবী লোকসানের ভয়ে অ-তেলা অভুক্ত মেয়েটা নীরবে কাঁদছিল। চোখে তার খুব বেশি জল ছিল না।

রোগক্লিষ্ট কুকুর, হাঁসমুরগী এবং গবাদি পশুর ভিড়ের মধ্যে কুবরানকে এনে যখন হাসপাতালের বারান্দায় শোওয়ানো হল, তখন অনেক বেলা। রিক্সা-গরুগাড়ি-ময়লার ঠ্যালা এবং তজ্জনিত দুর্ঘটনায় হাসপাতালের কাজে কোন ভাঁটা পড়ে নি। আশমা কুরবানকে আম্মাজানের জিম্মায় রেখে আপিস ঘরে এগিয়ে গেল। ডাক্তারকে না দেখে কুরবানের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সনৎ সরকারকে বলল—'কম্পাউণ্ডারবাবু, ওকে একটু দেখুন। ঠিক যেন

বলল না, করুণ সুরে কেঁদে উঠল।. কম্পাউণ্ডার কটমট করে তাকালেন। কারণ আছে। চিরকুমারীর মা-ডাক শোনার বাসনার মত সনৎ সরকারের বড় সাধ, লোকে তাকে ডাক্তার বলুক—আড়ালে, সনৎ ডাক্তার, সামনে ডাক্তারবাবু। খোদ ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে তিনিই কি আর রোগী দেখে ওষুধ দেন না? মরন্ত রোগের মোক্ষম ওষুধ তিনি যেন জানেন; দূর দূরান্তের 'কলে' গিয়ে ক্রিমি-ক্ষ্যাপা গরু বাছুরকে দিব্যি ইনজেকশন দেন, নিজের মহিমাতে গেঁয়ো লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বলেন—'আমার তি-রি-শ বছরের অভিজ্ঞতা, ঠাট্টা কথা! যেন শুধু অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তৃতা করলেই রোগ সারবে। কিন্তু এ তল্লাটে সবাই ত প্রায় চেনা লোক। ঠাট-ঠমক, গাম্ভীর্য আর ডাক্তারীয় হালচাল মিলিয়ে ডাক্তার কাকে বলে তারা তারা তা ভাল করেই জানে। ডঃ পশুপতি সামন্তকে কেমন অক্লেশে সবাই বলে ডাক্তারবাবু। সনৎ সরকারের মনে সেজন্য গোসার অন্ত নেই। ডঃ সামন্ত সবই জানেন, সবই বোঝেন। 'কম্পাউণ্ডারবাবু' পছন্দ নয় বলে সনৎ সরকারকে তিনি বলেন সনৎবাবু।

রাম-বেঁটে হ্যাংলামত সনৎ সরকারের চোখ দুটো লাল লাল,—যেন মনে মনে খুব রাগ আছে, পৃথিবীর সবার উপর তিনি চটে আছেন। আশমা গিয়ে যখন ডাকল, সনৎ সরকারের হাতে তখন বড় একটি 'কেস' ছিল। একটি ক্ষ্যাপা গরু। গরুটার নাকি ডাক এসেছে। ওরা বলে গরম হয়েছে। সুতরাং সময়মত ইনজেকসন দিয়ে তার গর্ভসঞ্চার করতে হবে। পঞ্চাশোর্ধ্ব সনৎ সরকারের সেজন্য অবশ্য উৎসাহের অন্ত নেই। গরম গরু হাসপাতালে এলে অন্য কাজে হাত লাগাবার লোক সনৎ সরকার নয়। মাথা-সরু মোটা-সিরিঞ্জ গরুর পেট অব্দি চালিয়ে ষাঁড়ের শুক্রকীট আঙুলের চাপে সিরিঞ্জপথে ঠেলতে ঠেলতে বিপত্নীক সনৎ সরকারের অনেক কিছুই মনে পড়ে—শারীরিক কিছু প্রতিক্রিয়াও তার ঘটে! সনৎ সরকারের মহৎ দোষ, লোকের সঙ্গে ছলে ছুতায় চটাচটি করা। দিন কয়েক আগে এক কুকুরের মালিককে অত্যন্ত অনাবশ্যক রূঢ়তায় সনৎবাবু বলেছিলেন—'এ ছাগল নয় মশাই, যে দশ পয়সার টিকেটে কাজ হবে। চিকিৎসা করাতে চান ত একটাকা দিয়ে টিকেট করতে হবে।' হাসপাতালের কানুন অবশ্য তাই বটে। এবং এই এক টাকার টিকেটের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অত্যন্ত কাঠ-কাঠ ছাট-ছাট রকমে বলেছিলেন—'কুকুর পোষে ধনী লোকে। এক টাকার টিকেট করতে তাদের আবার কষ্ট কি?' ধনী কথাটার উপর সনৎবাবু অনাবশ্যক কোর

দিয়েছিলেন, যেন সমস্ত কুকুর পোষা ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার জাতক্রোধ আছে। ক্ষিপ্ত কুকুরের মালিক কণ্ঠে বিষ ঢেলে ভেংচিয়ে ভেংচিয়ে বলেছিল—'ধনীলোকে। নিধু ভিখিরির যে নেড়ী কুত্তাটি একটু ফ্যান খেয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকে, নির্ধন নিধুর রাতের প্রহর জাগে, সেই নেড়ী কুত্তার অসুখ হলে নিধু কি একটাকা দিয়ে হাসপাতালের টিকেট করবে?' একটু ভিড় জমতেই লোকটি আসর জমানো কায়দায় আরও বলতে লাগল—'আমাদের আবার কুকুর পালা? বড়লোকের মত মাংসের ভোজ ত আমরা কুকুরকে দেই না—আমরাও ওদের মত পোলাও খাই না। আমরা কেন কুকুরের জন্য হাসপাতালের প্রবেশমূল্য একটাকা দিতে যাব?'

কথাটি ডঃ সামন্তর কানে গেল। একটি অসুস্থ ঘোড়ার রোগনির্ণয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। কাজ হতেই তাড়াতাড়ি চলে এলেন। কুকুরীয় সমাজের সৌভাগ্যে বৈষম্যের কথা প্রচার কার্যের জন্য লোকটি শেষ পর্যন্ত গরিবের কুকুর নিয়ে ভুয়ো মিছিল বের করবে নাকি! চট করে তিনি বললেন—কে বলে কুকুরের টিকেট এক টাকা। দশ পয়সায় ছাগলের টিকেট করিয়ে কি আর কুকুরের চিকিৎসা আমরা সেরে দেই না? ডাক্তারবাবুর কথায় তৎক্ষণাৎ আশমার মা বলল—'আলবৎ দেন। আমরাই ত কতবার কুকুর এনে দশপয়সায় কাজ সেরে দিয়েছি।'

কুরবানের প্রাথমিক পরীক্ষার পরই ডঃ সামন্ত গম্ভীর মুখে বললেন—সনৎবাবু, এই কেশটি আগে দেখুন ত। গরুর ইনজেকশন পরে দিলেও চলবে। 'সনৎবাবু মনে মনে চটলেন, কিন্তু উপায় নেই। ডঃ সামন্তর [illegible] খানিক বরফ এনে মেঝেয় রেখে আহত খাসিটাকে দেখতে লাগলেন—যেন ম-মানুষ রোগী এমনি করেই দেখতে হয়। তারপর কুরবানের রক্তঝরা ঘাড়ে গর্দানে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে খানিক বরফ লাগিয়ে দিলেন। কুরবান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঘোর আপত্তি জানাল। ঘন ঘন করুণ সুরে ডাকতে লাগল—ম্যাঁ-এ্যাঁ।

একে ত পেটফাঁপা। তার উপর রিক্সা চাপা। খুবই খারাপ কেস। ডঃ সামন্ত কুরবানকে একটি ইনজেকশন দিলেন। কুরবানের বাঁচার আশা কম শুনে আম্মাজান কেঁদে ফেলল, আশমার চোখ দিয়ে জল ঝরল, নকুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আবহাওয়াটা হালকা করে তোলার জন্য ডাক্তারবাবু বললেন—'কিন্তু এমন সাংঘাতিক রকমে কুরবানের পেট ফাঁপল কি করে? কাল খেয়েছিল কি?'

আম্মাজান বলল—কি আর খাবে বাবা? কতদিন হল ত ওর শরীলগতর তেমন ভাল যাচ্ছে না। কাল দুকুরে ত একদম কিছুই খায় নি। রেতের বেলায় একটু লাবড়ী দিয়েছিলাম। আজ আশমার সঙ্গে চা আর রুটি খেয়ে যখন ঘাস খেতে লাগল পেটফাঁপা ত তখন ছিলই না। বলি ও ডাক্তারবাবু, ইদের দিন তক কুরবান বাঁচবে ত?

ডাক্তারবাবু সহানুভূতির সুরে বললেন—'চেষ্টা ত করছি, দাওয়াইও ত মেলাই দিচ্ছি। ডঃ সামন্তর কণ্ঠে একটু ঘরোয়া সুর বাজল; আশমাদের বাড়িতে বসে কথা বলছেন এমন ভাবে বললেন—' কাল রাতে কুরবানকে রাবড়ী খেতে দিয়েছিলে বললে না? ব্যাপারটি কি বলত?

আম্মাজান মুখে হাসির আভাস এনে বলল—'মেহমান এসেছিল কিনা। খোরাবহং লাবড়ী এনেছিলাম। সবাই খেল, তা কুরবানই বা খাবে না ক্যানে? কুরবান যে আমার ছেলের মত। অসহায় রকমে শুয়ে থাকা কুরবানের ফোলা পেটে আম্মাজান সস্নেহে হাত বুলাতে লাগল। কুরবান করুণ চোখে মিটমিট করে তাকালো—ম্যাঁ করে ডেকে ওঠার শক্তিটুকুও যেন নেই।

আশমা, রুরু, আম্মাজানের কথায় আলাপে ডঃ সামন্ত খুশি হয়েছিলেন। ওদের ব্যথিত ক্রন্দিত চিত্তের সঙ্গে আপন করুণাকর হৃদয়টি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এবার মুগ্ধ কৌতূহলে তিনি শুধালেন—ওর নাম কুরবান হল কি করে?

মমতাভরা কণ্ঠে আম্মাজান বলল—'পয়দা হবার দিন থেকেই ত ওকে আমরা আল্লার নামে রেখেছি। ইদের দিনে যে ওর কোরবানী হবে। কুরবানকে আমি পেটেই ধরি নি, কিন্তু ও আমার ছেলের চাইতে কিছু কম নয়।' আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে আম্মাজান আবার বলল—'কোরবানীর পর কুরবানকে মুঠো মুঠো করে শুভ সওগাতের মত ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেব।' নিজের ছেলেকেই যেন কোরবানী দিতে আম্মাজানের আপত্তি ছিল না, কিন্তু উপায় নেই—নরহত্যার দায় আছে! আদরে স্নেহে বাৎসল্যে ছেলের মত লালিত কুরবানকে তাই আল্লার নামে রাখা আছে। খুশির দিনে সন্তান বলির অর্থ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে করতে ডঃ সামন্তর কণ্ঠে অজ্ঞাতে গুনগুনিয়ে উঠল ছেলেবেলায় পড়া একটি কবিতার কলি—'ইব্রাহিমের মত বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া—'

ডাক্তারবাবু কুরবানের ফাঁপা পেটটি আবার দেখলেন, আঙুলে টোকা

মেরে মৃদু মৃদু চাপ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে সনৎ সরকারকে বললেন—'একটা খুব বড় সুঁচ আর বড় সিরিঞ্জ আনুন দিকিনি, ওর পেটের গ্যাস কিছু বের না করে দিলেই নয়।' সনৎ সরকার সিরিঞ্জ আনাটাকে উৎপাতকর বাহুল্য মনে করলেন। কুরবানকে আরও নিস্তেজ, আরও অসহায় মনে হল। আম্মাজান, আশমা, মুরু বড় সিরিঞ্জের নামে শিউরে উঠলেন। কুরবানের ছোট দেহে বড় ছুঁচ যে কত লাগবে!

সেই গরম হওয়া গরুটি আবার কাতরনহাম্বায় ডেকে উঠল। সে শুধুই ভাঙা গলায় কাঁপা কাঁপা হাম্বাধ্বনি নয়, কাম-ইচ্ছিত কামনাজড়িত আহ্বান। ডাক শুনে অদূরে খুঁটিবাঁধা গরুটিকে ডঃ সামন্ত একবার তাকিয়ে দেখলেন, আশ্চর্য সব প্রাকৃতিক নিয়মের কথা তাঁর মনে এলো—মনে হল, গরু কি মাদী কুকুর কি বছর একবার গরম না হয়ে মদ্দা পশু কি মানুষের মত হলে পথে-ঘাটে কত কুচিত্র রোজই না দেখা যেত। পি-এম বাগচী, গুপ্ত প্রেস ডাইরেক্টরী পশুর গর্ভাধানের জন্য কোন বিধানই দিতে পারেন নি। পশুরা চলে প্রাকৃতিক বিধানে—মাদী পশু ত বটেই। মানুষের অতশত বালাই নেই। প্রায় রোজই যাত্রানাস্তির মত গর্ভাধানের ঢালাও বিধান প্রায়শ থাকে পঞ্জিকায়। কিন্তু মানুষ ত আর পঞ্জিকা দেখে শয্যা নেয় না।

কুরবানের জন্য বড় সিরিঞ্জ আনার কথা ভুলে সনৎ সরকার কিন্তু সোজা চলে গিয়েছিলেন গরম গরুটির কাছে—যেন এমন ডাকে সাড়া দেবার ভার একমাত্র তারই উপর ন্যস্ত আছে। সনৎবাবুর কারবার দেখে ডঃ পশুপতি সামন্ত মনে মনে একটু হাসলেন, না রেগে চটাচটি না করে নিজে সিরিঞ্জ এনে কুরবানকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। পেটে ছুঁচ ফোটাবার সময় করুণ ডাক ছেড়ে কুরবান দারুণ কষ্ট জানাল, আম্মাজান চোখ ঢাকল, আশমা বলল—'ইয়া আল্লা, এত বড় ছুঁচ! ঠিক তখন সেই গরম-হওয়া গরুটি আবার ডাক ছেড়ে উঠল—হাম্বা!

ফাঁপা পেটের হাওয়া বের হলে অবচেতন কুরবান যেন প্রাণ ফিরে পেল, কিন্তু শীগগীরই ছড়ে যাওয়া ঘাড়ের বেদনাটা বোধহয় দ্বিগুণ করে মালুম হল। উঠতে গিয়ে আছাড় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল কুরবান। ভগ্নপক্ষ হাঁস নিয়ে আসা মেয়েটা বিজ্ঞের মত বলল—'খাসিটা বোধহয় বাঁচবে না গো। এখনই জবাই করলে বরঞ্চ খেতে পারবে।' হ্যাংলাপনা কালো মেয়েটার রাক্ষুসে প্রস্তাব শুনে আম্মাজানের বুকের ভিতর চিলিক দিয়ে উঠল। কি, মরন্ত কুরবানকে জবাই করব? মুখে ভাষা ফুটল না, চোখ তুলে আম্মাজান কশাইমনা মেয়েটার দিকে একবার শুধু তাকালো। সাপ দেখলে মানুষ বোধহয় লাঠি এনে এমনি করে দৃষ্টি হানে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যীশু, বুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

আমাদের ছাত্রবয়সে যীশু খৃষ্টের জীবন সম্বন্ধীয় একখানি বইয়ের ব্যাপক প্রচার ছিল। লেখকের নাম মনে নেই। বইয়ের নাম In Quest Of Jesus Christ. এই বইয়ে খৃষ্টধর্মের তাত্ত্বিক ও অনুষ্ঠানের দিকগুলির সঙ্গে হিন্দুধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ ব্যাখ্যাত হয়েছিল এবং তার আলোয় লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে যীশু কোন সময় নিশ্চয় ভারতে এসেছিলেন ও এখানকার ধর্মকর্ম ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করেছিলেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একখানি সাপ্তাহিক পত্রে সে সময় এই বইয়ের বক্তব্য বিষয় নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। বলা বাহুল্য প্রতিকূল আলোচনাই বেশী হয়েছিল।

তখন থেকেই ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে যাঁরা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে কিছু পড়া শোনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে খৃষ্টের জীবন ও দর্শনের ওপরে ভারতীয় প্রভাব সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটা ধারণা প্রচলিত হয়। যতদূর মনে পড়ছে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের লেখায় এই অস্পষ্টতা স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও পূর্ণ আলোকপাত করতে পারেননি তাঁরা। এক দিকে খৃষ্টান সমাজের প্রবল প্রতিরোধ, অন্য দিকে উপযুক্ত দলিল পত্রের অভাবই সম্ভবত তাঁদের বেশী দূর অগ্রসর হতে দেয় নি।

সম্প্রতি এই অনুমানকে প্রমাণের গণ্ডীতে নিয়ে আসার উদ্যম নূতন করে সুরু হয়েছে। নিকোলাস নটোভিচ নামে এক রুশ পণ্ডিত এবং স্পেন্সার লিউইস নামে এক ইংরেজ পণ্ডিত এই কাজে অগ্রণী হয়েছেন। প্রথমের The Unkhown Life Of Jesus Christ ও দ্বিতীয়ের The Mystical Life Of Jesus এই পথের দুটি লক্ষণীয় পদক্ষেপ হিসাবে ইতিহাসকে তা জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নটোভিচ লাদকের রাজধানী লেতে হিমিস মঠের প্রধান লামার কছে বৌদ্ধ যুগের কতকগুলো পুরাতন পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান। এই পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে জানা যায়, জেরুজালেম থেকে ভ্রাম্যমাণ বণিকদের সঙ্গে ইশা নামে এক কিশোর বালক ভারতে আসেন এবং তিনি কাশ্মীর, রাজগৃহ, জন্নাথ ও কাঞ্চী পর্যটন করে ও এখানকার হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ষোল বৎসর পরে স্বদেশে ফেরেন।

প্রধান লামা নটোভিচকে যে পাণ্ডুলিপি দেন, তা পালি থেকে তিব্বতীতে অনূদিত এবং সাল তারিখের বিচারে দেখা যাচ্ছে এগুলো খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার অল্প পরের লেখা। ভারত পর্যটন অন্তে স্বদেশে ফেরার পর সেখানকার নাস্তিক শাসকদের হাতে উক্ত ইশার প্রাণদণ্ড হয়েছে, সে বার্তা এনেছেন বণিকরা, একটি পাণ্ডুলিপিতে তারও উল্লেখ রয়েছে। এথেকেই নটোভিচ সিদ্ধান্ত করেছেন এই ইশা যীশুছাড়া কেউ নন। খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থকাররা যীশুর যে বৃত্তান্ত লিখেছেন, তাতে দেখা যায় বারো বৎসর বয়সে তিনি পিতামাতার সংস্রবচ্যুত মরুভূমিতে চলে যান তপস্যা করতে এবং সিদ্ধ হয়ে ত্রিশবৎসর বয়সে জুদিয়ায় আবির্ভূত হন ঈশ্বরপুত্র রূপে। তারপর রোমক গবর্ণর পন্টিয়াস পাইলেটের বিচারে তাঁর মৃত্যু হয়। মাঝের এই ষোল সতের বছরের কোন হিসাব মেলে না। তিব্বতী পুঁথির ইশা যদি খৃষ্ট হন, তাহলে হারান এই সময়টুকু পাওয়া যাবে এবং যীশুর জীবন ও মতবাদের আদি উৎসটার সন্ধান ও সহজ হবে।

সবাই জানেন যীশুর জীবনকালে জুদিয়া রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহুদী মহাজন ও পুরোহিত সম্প্রদায় বিদেশী প্রভুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনসাধারণকে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্যে রেখেছিলেন। এই লাঞ্ছনার স্বাদ পেয়েছিলেন যীশু জন্ম থেকেই। হয়ত এ থেকে মানুষকে মুক্ত করার চিন্তাও ব্যাকুল করেছিল তাঁকে বাল্যেই। তখনকার মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল, এ অবশ্য প্রমাণিত সত্য। সুতরাং ভারতীয় বণিকদের মুখে বুদ্ধের মৈত্রী ও মানব করুণার বার্তা শুনে তিনি ভারতে আসতে আগ্রহী হবেন, এ আর অসম্ভব কি? তাঁর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি দেখার ইচ্ছা এ দিক থেকে খুবই অর্থপূর্ণ মনে হয়। এর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, নূতন ধর্ম প্রচার ও রাজাজ্ঞায় মৃত্যুলাভও খুব স্বাভাবিকই মনে হয়।

বুদ্ধ আর্য প্রাধান্যময় ভারতবর্ষে নিগৃহীত শূদ্র ও সর্বাধিকার বঞ্চিত ভূমিদাসদের সংহত করেছিলেন, ঈশ্বরবর্জিত এক আচার বিশুদ্ধ সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করে। তিনশো বছর পরে অশোকের সময়ে তাঁর ধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়ে দিগ্বিজয়ী সাফল্য লাভ করে। খৃষ্টও একই ভাবে নিঃস্ব শ্রমজীবী, কৃষক ও ক্রীতদাসদের সংহত করেন, বিদেশী শাসক ও স্বদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর জন্যে। কায়েমি স্বার্থবানরা এতে কুপিত হয়ে তাঁকে রাজদ্বারে উপস্থিত করেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহী রূপে ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয়। রোমে

তারপর সম্রাট কনষ্টানটাইন যেদিন খৃষ্ট ধর্ম নিলেন, সেদিনই তা হল রাজধর্ম এবং পেল সারাদেশের স্বীকৃতি।

অবশ্য কর্মাদর্শে বুদ্ধ ও যীশুর মধ্যে প্রভূত ঐক্য দেখা গেলেও ধর্মাদর্শে ঐক্য অল্পই দেখা যায়। বুদ্ধ বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করে ছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কণ্ঠ সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু যীশু প্রচার করেছিলেন পরম পিতার বার্তা। বলেছিলেন জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, এই ত্রিতত্ত্বের কথা। এ সবের আদি উৎস হিসাবে বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা ভারতীয় আর্য বা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে যদি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে বোধহয় ভুল হবে না। সম্ভবত অনেকে জানেন যে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মধ্যে মালা জপ এবং বৈষ্ণবদের মত সখীভাবে ভজনের রীতি আছে। অবশ্য স্বয়ং যীশু কোনদিন এই ভাবের সাধনা বোধহয় করেন নি। মোটের ওপর বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাস, প্রব্রজ্যা বৈরাগ্য, ও সেবা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রেম, ভক্তি ও নতি, দুইয়েরই সমমাত্রিক প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে খৃষ্টধর্মে। খৃষ্টধর্মের ভিত্তি তাই ভারতবর্ষ, একথা যুক্তি সহকারেই বলা যেতে পারে।

স্পেন্সার লিউইস বলছেন, যীশু ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যদের এবং হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন, পাণ্ডুলিপিগুলি থেকেই এটা জানা যাচ্ছে, আর জানা যাচ্ছে যে হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতা অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের উদার সাম্যবাদিতা তাঁর বেশী ভাল লেগেছিল। আবার বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বর তত্ত্বময়তা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের ঈশ্বরমুখিতা তাঁর বেশী অনুরাগ আকর্ষণ করেছিল। হয়ত এ দুইয়ের সমীকরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবন, ধর্মতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীতে। হয়ত তিনি আরো অনেক দিন থাকতেন ভারতে। কিন্তু পিতা জোসেফের মৃত্যু এবং দুর্দশা পীড়িত স্বদেশবাসীর দুঃখই তাঁকে আহ্বান করে নিল জুদিয়ায়। ধর্মশাস্ত্রে এই ঘটনাই কি সাধু ব্যাপটিষ্টের আহ্বান নামে অভিহিত হয়েছে? এই উপলক্ষে মাতা মেরীকে লেখা খৃষ্টের একখানি পত্রও নাকি তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া গেছে পুঁথিগুলির মধ্যে, যাতে সংসারের অনিত্যতা ও আত্মার অবিনশ্বরতার কথা রয়েছে। রয়েছে বৈরাগ্যের প্রভাবে মোহমুক্ত দিব্যদৃষ্টি লাভের নির্দেশ। এই চিঠি বণিকদের হাতে পাঠিয়েছিলেন তিনি, বলেছেন স্পেন্সার লিউইস।

এত কথা সবই অলীক হতে পারে কি? বুদ্ধ ও বুদ্ধের ছশো বছর পরে খৃষ্ট এবং খৃষ্টের ছশো বছর পরে মোহম্মদ প্রাচ্যের প্রধান তিনটি ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। ভারত পারস্য ও চীনের সুপ্রাচীন ধর্মের পরবর্তী এই তিন ধর্ম

পরস্পরের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে তা সত্যিই আনুপূর্বিক জানা প্রয়োজন। সেই জানার পথে খৃষ্ট জীবনের এই যে একটি অনাবিষ্কৃত অধ্যায় আজ উন্মুক্ত হতে চলেছে, এর মূল্য কম নয়। একদিকে এ মতের প্রামাণিকতা যেমন খৃষ্ট জীবনের ঐতিহাসিক বনিয়াদ দৃঢ় করবে, অন্যদিকে খৃষ্টধর্মের আদি উৎসটিও সার্থকভাবে উদঘাটিত করবে।

অনেকেই জানেন আশা করি যে খৃষ্টের পরিচিতি শুধু ধর্মশাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এবং হয়েছে পরবর্তীকালের ভক্তদের দ্বারা। সমসাময়িক বিবরণ নেই কিছুই, একমাত্র নেজারাথের যশুয়া নামক এক পাগল রোগীর উল্লেখ ছাড়া, যিনি শূন্যে দুহাত তুলে পিতা পিতা করে চেঁচাতেন। কোন রোমান চিকিৎসক লিখেছেন তাঁর ডায়েরিতে এই কথা। সেই কিম্বদন্তীর ঈশ্বর পুরুষ যাতে ইতিহাসের মাটিতে ধরা পড়েন, তার জন্যে বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠান হয়েছিল তিব্বত লাদক নেপালে। তাঁরা ফিরে এসেছেন এইসব পাণ্ডুলিপি ও পুঁথিপত্রের কোন সন্ধান না পেয়েই। নটোভিচ লিউইস এণ্ড কোম্পানি কি তাহলে সব নির্মূলভাবে হাতিয়ে নিয়ে গেছেন আপন আপন দেশে?

শশী থারুর

মলয়ালী গদ্য সাহিত্যের রূপ-রেখা

এ বছরে যখন আমরা কেরলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কুমারণ আশানের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করছি তখন মলয়ালী গদ্য-রচনায় একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সাগ্রহ আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গদ্যের মতো পদ্যও ভাব-প্রকাশের অন্য একটি বাহন এবং মলয়ালী সাহিত্যে পদ্যের স্থান সম্ভবতঃ ভাব-গর্ভ অপর বাহনটির মতো ততোটা উঁচুতে নয়। "আশান সাশেয় গম্ভীরণ" একটি অমোঘ সত্য, আর এই মহাকবি সম্বন্ধেই হয়তো বা ব্লেকের "বালুকণার মধ্যে বিশ্বদর্শন" সার্থকভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া সম্ভবতঃ একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে খুব অল্প সংখ্যক গদ্য লেখকই আশানের "বীণাপুবু" অথবা অপর কোনো অমর রচনার তুল্য কিছু লিখতে পেরেছেন।

আর-ই-এশারের মতো সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌ও এই মন্তব্য করেছেন যে "সমকালীন মলয়ালী সাহিত্য জীবিত যে কোনো ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।" বিগত শতাব্দী বা প্রায় ঐরকম সময়ের মলয়ালী সাহিত্যকে যদি সমকালীন আখ্যায় ভূষিত করা না যায় তাহলে বলতে পারি এশারের মন্তব্য সেই সময়কার সাহিত্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য কারণ পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে মলয়ালী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাসের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে বিগতশতাব্দী বা প্রায় সেই সময়ের সাহিত্য-কৃতি।

হয়তো তামিল ভাষার তুলনায় মলয়ালী ভাষায় প্রাচীন ধ্রুপদী গদ্যের নিদর্শন অতি অল্প ; তবুও বেশ কিছু পূর্বের লেখা সুন্দর রচনার নিদর্শন এ ভাষায় আছে। আশ্চর্যের কথা কৌটিল্যের তীক্ষ্ণধী অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ মলয়ালীর অন্যতম প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ, যদিও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এ ভাষা যতোটা না মলয়ালী তার বেশি তামিল। পাঁচশ বছর পরে পুরাণগুলির পরিবেষণ হয়েছে মলয়ালী গদ্যে। প্রকৃত পক্ষে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই গদ্য সাহিত্যের সার্থক প্রবর্তনা, আর এ প্রবর্তনা দেশজ উৎসাহের ফলে নয়, সেই সব জেশুইট মিশনারীদের উৎসাহের ফলে যাঁরা এসেছিলেন ভাস্কো-ডা-গামার পরবর্তী পর্তুগীজ বণিকদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ১৫৬৩ সনে কোচিনের কাছে একটি ক্যাথলিক শিক্ষাকেন্দ্রে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৫৮০ সনে আরো দুটি

মুদ্রাযন্ত্র চালু হয়। যদিও ষোড়শ শতাব্দীতে মলয়ালী ভাষায় মাত্র দু'একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এবং মুদ্রাযন্ত্রের আশু প্রভাব ছিল নগণ্য, তবু একথা অনস্বীকার্য যে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলেই মলয়ালী সাহিত্যের ভিৎ গড়ে উঠল— পরমেশ্বরণ নায়ারের ভাষায় "কেরলের সাহিত্য-ইতিহাসে নূতনযুগের সূচনা হলো"।

মলয়ালীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে সহজেই নিজের ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারা গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে পারে। মলয়ালী ব্যক্তি সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য, মলয়ালী সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই। প্রথম দিকে মলয়ালী সাহিত্যের উপর প্রগাঢ় প্রভাব পড়েছিল সংস্কৃত ও তামিল ভাষার। পরবর্তীকালে মলয়ালী গদ্যের উপর ইংরেজিভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। পরমেশ্বরণ নায়ারের মতে "মলয়ালী সাহিত্যের বর্তমান গতি প্রকৃতি সর্বদা ইংরেজির কাছে ঋণী। কী উপন্যাস, ছোটগল্প, কী নাটক, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা কী জীবনী, ইতিহাস ও ভ্রমণ-কাহিনী প্রতি ক্ষেত্রেই ইংরেজি ধারার অনুবর্তন।" তাঁর ধারণা এ অনুবর্তন কোনো কোনো কাব্যের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। হয়তো আশান বা চঙ্গমপুঝা এর ব্যতিক্রম, কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে, এশারের ভাষায়, "নিঃসন্দেহে এ প্রভাব বর্তমান। আর এ প্রভাব গত একশ' বছর ধরে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিদগ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ।"

সমকালীন মলয়ালী গদ্য-উপন্যাসের সংকীর্ণ দিগন্তের দিকে চাইলে প্রথমেই নজর পড়বে ও্যারাত্তু চান্দু মেননের পথিকৃৎ ধ্রুপদী উপন্যাস "ইন্দুলেখা"র উপর "মলয়ালী ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস" এটি। সংকীর্ণ দিগন্ত বলার তাৎপর্য এই যে ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়, বিশেষ করে, বাঙলা এবং তামিল ভাষায় ইতিপূর্বে প্রচুর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। পি-কে-বালকৃষ্ণন তাঁর "চান্দু মেনন ওরু পঠনম" গ্রন্থে সম্প্রতিকালে এই উপন্যাসটির বিশদ আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সতর্ক উল্লেখই যথেষ্ট। ইন্দুলেখা একটি আবেগপূর্ণ প্রেমের কাহিনী। প্রথম দিকে ভুল বোঝাবুঝির ফলে নায়ক-নায়িকার পথ সংশয়াচ্ছন্ন ও বিলম্বিত; পরে অবশ্য মিলনের ভিতর দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সহজ ও সাধারণ। কিন্তু বাইরের এই কাঠামো ও আপাত স্বচ্ছ প্রেমের কাহিনীর অন্তস্থলে রয়েছে সামগ্রিক রীতি নীতির তীব্র ও বিশদ আলোচনা এবং মানবপ্রকৃতির স্খলন-পতনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বস্তুতঃ বেঞ্জামিন ডিসেরেলী "হেনরিয়েটা টেম্পল" নামক যে উপন্যাসকে "ইন্দুলেখা"র ভিত্তি বলা হয়, সে উপন্যাসে এ

আলোচনা ও অন্তর্দৃষ্টির একান্ত অভাব। চান্দু মেনন স্বয়ং লিখেছেন যে তিনি প্রথমে ইংরেজি উপন্যাসটি মলয়ালী ভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে স্থির করেন যে "মোটামুটিভাবে ইংরেজি উপন্যাসটি অবলম্বন করে মলয়ালী ভাষায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস লিখবেন।" যাঁরা ইংরেজি এবং মলয়ালী উভয় ভাষাতেই দক্ষ, সেই সব সমালোচকের মতে "ইন্দুলেখা" ইংরেজি উপন্যাসটির চাইতে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

ইন্দুলেখার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, আর এ বৈশিষ্ট্য পরবর্তীদের কাছে পথিকৃৎস্বরূপ এই কারণে যে লেখক সযত্নে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা পরিহার করেছেন এবং শুধুমাত্র আটপৌরে ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তিনি সেইসব সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আমরা সাধারণতঃ প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহার করি। এইটিই অবশ্য গ্রন্থটির একমাত্র বিশেষত্ব নয়। নিজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে চান্দু মেনন স্বয়ং বলেছেন, "আমি ইংরেজি-অনভিজ্ঞ মলয়ালী পাঠকদের মধ্যে ইংরেজিতে যাকে বলে উপন্যাস সেই ধরণের সাহিত্য-কৃতি পাঠের রুচি জাগাতে চেয়েছি—যাতে করে তারা প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনে বিশেষ অবস্থায় যে সব ঘটনা ঘটতে পারে সেই সব ঘটনা যে কাহিনীর উপজীব্য তা উপভোগ্য করতে পারে। তাছাড়া আমি চেয়েছি আমার মলয়ালী ভাইদের সামনে তুলে ধরতে যে প্রকৃষ্ট ইংরেজি শিক্ষা পেলে আমাদের নায়ার মেয়েরা, যারা স্বভাবদত্ত সৌন্দর্য ও বুদ্ধির জন্য প্রশংসিত, তারা সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জন করতে পারবে। আমার আর একটি উদ্দেশ্য মলয়ালী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কারণ আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি অব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে এ সাহিত্যের দ্রুত বিনাশের লক্ষণ।"

আর-ই-এশার একটি চিত্তাকর্ষক অনুচ্ছেদে দেখিয়েছেন মলয়ালী সাহিত্য কথায় চান্দু মেননের উপন্যাসের সার্থকতা কতখানি। তাঁর মতে চান্দু মেননের সাহিত্যকৃতির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে মলয়ালী ভাষার প্রকৃত উপন্যাসের জন্মদাতা হিসেবে। যদিচ তারপরে বহু শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস লিখিত হয়েছে, তবু স্বীকার করতেই হবে যে চান্দু মেননের প্রথম প্রচেষ্টা শুভ আরম্ভের সূচনা করেছিল। চিত্তাকর্ষক কাহিনীর তিনিই স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র বিপুল কিন্তু বাস্তববর্জিত নয়। চরিত্র চিত্রাঙ্কনে তিনি কড়া রঙ ব্যবহার করেন নি। তাঁর রচিত কথোপকথন বাস্তবানুগ এবং বিভিন্ন চরিত্রের কার্যধারা যুক্তি বিবর্জিত নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করেন নি।

…চান্দু মেনন উপন্যাসের ভিতর দিয়ে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর একমাত্র সম্পূর্ণ উপন্যাসে মলয়ালী সমাজের জন্য অমর উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।

চান্দু মেননের লেখার মধ্যে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর ছিল তাঁর অকাল প্রয়াণে তা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস "সারদা" তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মলয়ালী সাহিত্যে তাঁর সময়ে কিছুটা ও পরবর্তীকালে সম্পূর্ণভাবে উপন্যাসের ক্ষেত্র দখল করেছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ বিষয়ে পুরোধাদের অন্যতম হলেন "মার্তণ্ড বর্মা"র লেখক সি-ভি-রমণ পিল্লাই ও অনেক পরে সর্দার কে এম পানিক্কর মলয়ালী সাহিত্যে যাঁর দান শুধুমাত্র উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, পরন্তু কাব্য, নাটক, সমালোচনা ও আত্মজীবনীর ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত।

বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গদ্য উপন্যাস নিস্তরঙ্গ অবস্থায় ছিল। তারপর থেকে শুরু হলো পেরুন্নাম বার্কি, ভেত্তুর রমণ নায়ার, মুত্তাথু গর্কি প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকদের বর্ণাঢ্যতা। অবশ্য তাঁরা ছিলেন মূলতঃ ছোটগল্প লেখক। তবু প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা মলয়ালী সাহিত্যে একটি স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করলেন, কারণ এই সঙ্ঘের অনুশাসন ছিল যে ভবিষ্যতে বেশীর ভাগ মলয়ালী উপন্যাসে সমাজ-সচেতনতাই হবে প্রধান ও অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। এই আন্দোলনের অন্যতম ফল স্বরূপ ইন্দুলেখার মধ্যবিত্ত সমাজ ও মার্তণ্ড বর্মার ঐতিহাসিক পটভূমির বদলে সামাজিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো কেশব দেবের "ওডাইলনিন্নু"র মতো শ্রমিক শ্রেণীর কঠোর অন্তরের উপর। মলয়ালী সাহিত্যে অবশ্যই ইতিপূর্বেই রিক্সা চালকদের গৌণ ভূমিকা ছিল। এবারে সে নায়ক কিংবা প্রধান পুরুষ। আধুনিক বহু লেখকের লেখার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সম্ভবতঃ তাঁরা যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির ছবি আঁকতে চেয়েছেন ও যে ধরণের পাঠক সমাজকে সামনে রেখেছেন তাতে করে তাঁদের চূড়ান্ত বামঘেঁষা মনোভাব পরিস্ফুট। শক্তিশালী ও প্রখ্যাত লেখক এস-কে পোত্তিকা তো কিছুদিন আগেও ছিলেন সি-পি-আই সমর্থিত এম-পি।

থাকজি শিবশঙ্কর পিল্লাই সম্ভবতঃ প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ তাঁকে "চেম্মিন"-এর লেখক এই অভিধায় ভূষিত করলে অপমানই করা হয়। থাকজি স্কুলের ছাত্র হিসেবে কবিতা লিখতে শুরু করেন, কিন্তু পরবর্তী-কালে কৌনিক্কারা কুমার পিল্লাই ও তারপর সম্ভবতঃ অধ্যাপক জোসেফ মুন্দাসেরির প্রভাবে তিনি গদ্য লেখায় মনোনিবেশ করেন। এই পরিবর্তনের

ফলে তিনি ৬৫০-এরও বেশি ছোটগল্প ও কুড়িটিরও বেশি উপন্যাসের স্রষ্টা। এর মধ্যে আছে অমর উপন্যাস 'যেশ্মিন', 'ওসিফিন্দে মাক্কাল" এবং "পরমার্থমঙ্গল"। থাকজি মানব চরিত্রের দর্শকমাত্র নন, কিংবা শুধুমাত্র সমাজ-সমালোচকই নন। তাঁর প্রতিকূল সমালোচকেরা তাঁকে যে চিত্রিত করেছেন সমাজতন্ত্রের প্রচারক হিসেবে—তিনি তাও নন। বস্তুতঃ তিনি বিচিত্র শক্তিধর ঔপন্যাসিক। "পরমার্থঙ্গল"-এ তিনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর বহুমুখী রচনার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সেই সঙ্গে সমকালীন কেরল সমাজের তীব্র সমালোচনায় তিনি নির্দয়ভাবে তীক্ষ্ণ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য তাঁর উপন্যাস "তোত্তিয়ূদেমাকন"। এই উপন্যাসে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর সামনে তুলে ধরেছেন "একতাই বল" এই প্রাচীন মন্ত্র যাতে করে' তারা চিরন্তন অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে পারে। থাকজির প্রাচীন বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোনো চরিত্রকেই পুরোপুরি ভাল বা পুরোপুরি মন্দ হিসেবে চিত্রিত করেন নি। তিনি যে শ্রমিক শ্রেণীর ছবি এঁকেছেন তারা কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতির চর্চা করে না। তারা চাটুকার, অবিশ্বাসী এবং কলহপরায়ণ। যদিও শ্রেণী সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে, তবু তিনি এটি স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে দোষ শ্রেণীর নয়, দোষ সমাজ-ব্যবস্থার। এই ধরণের আর একটি যুগান্তকারী উপন্যাস "টু মেজার্স অব রাইস"। একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "চেম্মীন"এ রাজনীতির গন্ধ মাত্র নেই। লেখকের অপূর্ব মনস্তত্ত্ববোধ ও ট্রাজেডিবোধই এই উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "এনিপ্পতিকল"এও দেখতে পাই বিচিত্র জটিল উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য।

আর একজন সমকালীন প্রখ্যাত লেখক জোসেফ মুন্দাসেরি। পোত্তিকতের মতোও তিনিও তাঁর লেখায় রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেছেন। "প্রফেসর" নামক উপন্যাসটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে তিনি কেরলের প্রাইভেট শিক্ষকদের সমস্যা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

আধুনিক আর একজন যশস্বী লেখক হলেন বাইকম মুহাম্মদবশীর। সম্ভবতঃ এ প্রবন্ধে যে সব লেখকের কথা বলা হয়েছে তিনি তাদের সকলের চাইতে বড়ো শিল্পী। তিনি সমাজ-সমালোচক নন—এ রকম দাবীও তাঁর নেই; তবু মলয়ালী সাহিত্য জগতে তিনি অনন্য। যদিও মূলতঃ তিনি ছোটগল্প লেখক—তাঁর "জন্মদিনম"-এর চাইতে ভালো গল্প খুব অল্পই আছে—তবু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে "মত্রিকপুচার" মতো উপন্যাসও অসাধারণ।

এ দুয়ের মধ্যবর্তী "বাল্যকাল সখী"—"পুত্তম্মায়ুদে অতু"র উচ্ছল কৌতুকের তুলনায় একটি মন্থরগতি বিয়োগান্তক কাহিনী। এ কাহিনীতে দেখতে পাই নারীর মর্যাদা সহৃদয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। হালকা ঢঙে লেখা বশীরের আর একটি বিশিষ্ট রচনা "ক্কুপ্পাপ্পাক্কোরনেস্তরণ্ু"।

শেষ করার আগে বর্তমান পটভূমির দিকে তাকালে দেখতে পাই এম-টি বাসুদেবন নায়ারকে, যিনি সমকালীন সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অতুলনীয় যশ অর্জন করেছেন। তিনি ও সমকালীন অন্যান্য লেখকবর্গ যথা কাকে নাদন এম-মুকুন্দন, ও-ভি-বিজয়ন এবং মালয়াওর রামকৃষ্ণন, যে সাহিত্যকৃতির স্বাক্ষর রেখেছেন তাতে সহজেই এশারের সঙ্গে একমত হয়ে বলা চলে যে "সমকালীন মলয়ালী সাহিত্য ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে উচ্চস্থান অধিকার করে আছে তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

* অনুবাদক অঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত।

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী মানসিকতা

ছাব্বিশ বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষাকে জাতীয় ভাষা করার কথা চলছে। অথচ কার্যতঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আগে এ রাজ্যে বাঙ্গালীর মাতৃভাষার যে স্থান ও মর্যাদা ছিল ১৯৭৩-এর ১৫ আগস্টে সে স্থান ও মানের পরিমাণগত কিছু অগ্রসরতা ঘটলেও গুণগতভাবে উন্নতি বা অবস্থার পরিবর্তন কিছুই প্রায় হয় নি। বাংলা এ রাজ্যের মানুষের আজও সংস্কৃতির ভাষা হয়ে আছে, জীবন-জীবিকার ভাষা হয়ে ওঠে নি। প্রশাসনের ভাষা না হলে একটি ভাষা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। সাহিত্যের ভাষা কিংবা ঘর-সংসারের কাজ চালাবার ভাষা হলেই একটি ভাষার উৎকর্ষতা হয়না—আইন-বিজ্ঞান-প্রশাসনের ভাষা হতে পারলেই ভাষার সম্পূর্ণতা ঘটে। বাংলা ভাষা যে আজও এত দুর্বল ও অক্ষম, তার কারণ সে এ রাজ্যের সরকারী ভাষা নয়। সরকারী ভাষা না হলে একটি ভাষা জাতীয় ভাষা হয় না। বর্তমান দুনিয়ায় একমাত্র সরকার-ই রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে এমন কি একটি অতি দুর্বল, অপরিণত ও অসম্পূর্ণ ভাষাকেও সর্বব্যবহারোপযোগী একটি শক্তিশালী ভাষায় পরিণত করতে পারেন। ইজরায়েল হিব্রুকে, জাপান তার মাতৃভাষাকে ইংরাজির স্থলাভিষিক্ত করতে পেরেছে। ভারতেও হিন্দীভাষাকে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ইংরাজির স্থলাভিষিক্ত করে তুলেছেন। ওপার বাংলায় এমন কি পাকিস্তানী আমলেই ঢাকার সরকার বাংলাভাষাকে প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন ব্যবহারোপযোগী করে গিয়েছিলেন। কেবল এপার বাংলাতেই বাংলা ভাষা জাতীয় ও সরকারী ভাষা কাগজে-কলমে হলেও কার্যতঃ দুয়োরাণীই রয়ে গেছে। এখানে থেকে থেকে কথাটা উঠেছে; ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত মনীষীরা বাংলাকে জাতীয় ভাষা করার কথা অভিভাষণে বলেছেন এবং সরকার একটার পর একটা কমিটি তৈরী করে নিরস্ত থেকেছেন, সম্প্রতি সরকার বাংলা ভাষাকে প্রশাসনের ভাষা করার আগ্রহ দেখিয়ে আরও একটি কমিটি করেছেন।

বাংলা ভাষা যে এ রাজ্যে এত দিনেও জাতীয় ভাষা হল না, এজন্য সরকারকে দায়ী করা হয়। এ রাজ্যের যে খুব অল্প কজন মানুষ প্রকৃতই বাংলা ভাষাকে জাতীয় ও সরকারী ভাষা হিসেবে দেখতে চান তাঁদের বক্তা

ও লেখায় রাজ্যসরকারকেই টালবাহানা ও কালহরণের জন্য অপরাধী করা হয়েছে। সরকারকে দায়ী করাই রেওয়াজ—অন্য সব ব্যাপারের মত ভাষার ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বাংলা ভাষাকে উচ্চতম শিক্ষার বাহন ও রাজ্য সরকারী প্রশাসনের মাধ্যম করার জন্য গত ২৬ বছর যত প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার একটিতেও বাংলাকে এ রাজ্যে জাতীয় ভাষা করার প্রকৃত ও গভীরতম বাধা যে কোথায় তার উল্লেখ ও আলোচনা হতে দেখিনি। সকলেই বাংলা টাইপরাইটারের প্রকৃষ্ট চাবি (key), বাণীরেখা বা স্টেনোগ্রাফি, আমলাগণের অনীহা বা অনভ্যস্ততা, পরিভাষা এবং বাংলা ভাষার ধ্বনি-বর্ণমালা-প্রকাশক্ষমতার দৈন্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে বিষয়টি আদৌ আলোচিত হয় নি, তা হল বাংলা ভাষা প্রবর্তনে গণ-অনীহা। সোজা কথায় বলা যায়,—পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীরা মাতৃভাষাকে ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত দেখতে ও করতে আন্তরিকভাবেই চায় না। বুদ্ধিজীবী থেকে নিরক্ষর চাষীটি এবং পাঁচ বছরের শিশুটি থেকে অশীতিপর বৃদ্ধটির পর্যন্ত বদ্ধমূল সংস্কার হল—বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান-কারিগরি বিদ্যা—প্রশাসন ও জীবনজীবিকার কাজ চলে না—বাংলা কখনো ইংরাজির জায়গা নিতে পারবে না। হিন্দু বাঙালীর ইংরেজি-প্রীতি যে কোন প্রেমের মতোই অবুঝ ও বদ্ধমূল—যুক্তিতর্ক নিরর্থক। মজার ব্যাপার হল, যে যত কম ইংরেজী জানে, ইংরেজির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তার তত বেশি। ইংরেজি না জানা বা কম জানার জন্য আপামর বাঙ্গালী লজ্জায় মরমে মরে থাকে। একজন প্রবীন শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা হল,—ছাত্রছাত্রীর অংক-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে যত কম নম্বরই পাক তেমন একটা দুঃখ ও লজ্জা বোধ করে না যেমন করে ইংরাজীতে ফেল করলে।

একদা এই বাংলার অজ্ঞ থেকে বিজ্ঞ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ মনে করেছেন ইংরেজ চলে গেলে সর্বনাশ হবে—দেশ অচল হয়ে যাবে। ইংরেজ বর্জিত ভারতের কথা এখানকার মনীষীরাও ভাবতে গিয়ে আঁৎকে উঠেছেন। ১৯৪৭-এ ইংরেজ যখন চলেই গেল, তখনও সংশয় যায় নি। আজও এই বাংলার অধিকাংশ মানুষ মনে করে ইংরেজবর্জিত ভারত যদিও বা সয়ে গেছে, ইংরেজীবর্জিত ভারত কিছুতেই সইবে না। ইংরেজ চলে গিয়েও যে দেশটা অচল হয়ে গেল না, সম্ভবতঃ তার কারণ, ইংরেজরা সঙ্গে করে ইংরাজিটাকেও নিয়ে যায় নি।

বাংলা ভাষা প্রবর্তনে সরকারকে দোষারোপ করার আগে নিজের বুকে

হাত দিয়ে দর্পণে আমরা কোনদিনও মুখ দেখলাম না। আমাদের জীবনাচরণে বাংলা ভাষার স্থান কতটুকু? সরকার না হয় টাইপরাইটার-পরিভাষা-স্টেনোগ্রাফির ঝামেলায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ বাংলা চালু করতে পারেন নি—আমরা কি আমাদের ঘরে-পাড়ায়-ক্লাবে-বিদ্যালয়ে-বাংলা চালু করেছি? যে কাজে টাইপরাইটার লাগে না, পরিভাষা নিষ্প্রয়োজন—সেখানেও কি বাঙ্গালী মাতৃভাষা ব্যবহারের কথা ভাবে? কয়েকটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়:

(ক) স্কুল কলেজের কাজ অনেকটাই কি বাংলায় চালু করা যেত না? যেমন,—ক্লাসে ছুটির বিজ্ঞপ্তি, অন্যান্য নোটিশ, অভিভাবকদের সঙ্গে চিঠিপত্রের লেনদেন, আভ্যন্তরীণ ফাইল, চিঠিপত্র ও হিসাব, সভার মিনিটস, চাকরীর আবেদন ও নিয়োগপত্র বাংলায় করাটা কি দুঃসাধ্য? অথচ কটা স্কুলে ও কলেজে প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষমশাই বাংলায় বিদ্যালয়-প্রশাসন প্রবর্তন করেছেন?

(খ) ক্লাব-লাইব্রেরী-সংঘসমিতিগুলি তাদের কাজকর্মে বাংলা ব্যবহার করেন না। রাবার স্ট্যাম্প, সাইনবোর্ড, শীলমোহর, লেটারহেড সব ইংরাজিতে তৈরী। এক ক্লাব অন্য ক্লাবকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ করছে—সে চিঠিটাও ইংরাজিতে। এমন কি ক্লাবগুলি জলসা-চ্যারিটিশো ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানের যে আমন্ত্রণলিপি ছাপায় তা পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজিতে। রসিদপত্র খুব কম ক্লাবই বাংলায় মুদ্রিত করে।

(গ) রাজনৈতিক দল এবং তাদের গণসংগঠনগুলি পোস্টার-প্রচারপত্র ছাড়া নিজস্ব সাংগঠনিক কাগজপত্র সবই ইংরাজীতে ছাপেন ও লেখেন। আমার হাতের কাছে কয়েকটি সংগঠনের সভার বিজ্ঞপ্তি-চাঁদার রসিদ-চিঠি রয়েছে যার সবটাই ইংরেজিতে।

(ঘ) শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ আত্মীয় স্বজন ছাড়া চিঠিপত্র বাংলায় প্রায়ই লেখেন না। অভিভাবক ছাত্রের প্রাইভেট টিউটরকে দু'একটা কথা জানাচ্ছেন—ইংরেজিতে; প্রতিবেশী একটা কিছু আর্জি পাঠাচ্ছেন—ইংরেজিতে; ধন্যবাদ জানাচ্ছেন—ইংরেজিতে। একমাত্র বিবাহ-শ্রাদ্ধ-উপনয়ন-পূজাপার্বনের কার্ড বাংলায় মুদ্রণ করা হয়—বাকী সব কাজই হয় ইংরাজিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারী জীবনে বাংলা ভাষায় ব্যবহার সামান্যই হয়। স্কুল-কলেজ, ক্লাব-লাইব্রেরী-রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য গণসংগঠনগুলি যাদের পরিভাষা—স্টেনোগ্রাফি টাইপরাইটারের সমস্যা নেই বা থাকলেও

প্রবল নয়, যখন মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় ঘরোয়া প্রশাসনিক কাজটুকু পর্যন্ত করছে না, তখন তার একটাই তাৎপর্য দাঁড়ায়—বাঙ্গালী বাংলা চায় না, বাংলা ভাষার প্রতি হিন্দু বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও আস্থা নেই, বাংলা ভাষা প্রবর্তনের জন্য কিছুমাত্র কষ্ট ও চেষ্টা করতে সে নারাজ, কেননা সে বাংলাকে ইংরাজির স্থলাভিষিক্ত করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। ইংরেজবর্জিত স্বদেশ যদিও সে চেয়ে থাকে, ইংরেজিবর্জিত স্বদেশের কথা সে ভাবতে চায় না।

কোন একটি জিনিস তখনই 'জাতীয়' হয় যখন (১) নেহাৎ সবাই না হলেও প্রায় সকলেরই কাছে তা হয় গ্রহণযোগ্য, কাম্য ও শ্রদ্ধেয় এবং (২) ত্রুটি, অপূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যা জাতির দেশাত্মবোধ, ঐতিহ্য ও অনুরাগে রঞ্জিত থাকে।

বাংলা ভাষা হিন্দুবাঙ্গালীর 'জাতীয়' ভাষা নয়, কারণ এ ভাষা তাদের কাছে ইংরাজির সমকক্ষ নয় বলেই কাম্য, গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় নয়। যে কালে বাঙ্গালী কবি 'আ মরি বাংলা ভাষা' বলেছিলেন কিংবা 'বিনে স্বদেশীভাষা মিটে কি আশা' গেয়েছিলেন সেকালকে একালের 'আন্তর্জাতিক' বাঙ্গালী ব্যঙ্গ করেন।

কেন বাঙ্গালী তার মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদায় বসাতে চায় না তার কারণ মনস্তাত্ত্বিক। ইংরেজের সব থেকে বড় সাফল্য তারা হিন্দু-বাঙ্গালীকে মানসিক সংগম করে সাংস্কৃতিকভাবে 'চ্যাস'-জাতিতে পরিণত করে গেছেন। মধুসূদন দত্ত-ই হিন্দুবাঙ্গালী জাতির প্রতীক। মাইকেলী-চরিত্রই বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতীক। মাইকেলীচরিত্রই বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র। মাইকেলের মতই এ-জাতি মাতৃভাষায় কাব্যসাহিত্য চর্চা করেন কিন্তু সে-সাহিত্যের আলোচনায় গৌরদাস বসাকদের সংগে ইংরাজি ভাষায় পত্রালাপ চালান।

বাংলাদেশেই জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের উদ্ভব হয়েছিল বলে বাঙ্গালী গর্ব করতে ভালবাসে। অথচ ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীই সব থেকে কম জাতীয়তাবাদী। হিন্দু বাঙ্গালী নিজেকে আন্তর্জাতিক ভাবতে ভালবাসে এবং তাঁর ইংরেজিয়ানা ঐ আন্তর্জাতিকপনারই অংশ। আবার আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারতের মধ্যে বাঙ্গালী-ই সব থেকে বেশি 'ভারতীয়'। যে তামিলীরা তথাকথিতভাবে এত বেশি ইংরেজি-অনুরাগী তারা কিন্তু নিজেদের জাতীয়তা 'ভারতীয়' না ভেবে 'দ্রাবিড়ী' ধরে বসে আছে। ওদের ইংরেজি-প্রীতিটা নেহাৎই রাজনৈতিক কৌশল ও সুবিধাবাদ—ওটা ওদের মনের কথা

নয়। তাই যে তামিল যুবক ও ছাত্ররা হিন্দীকে ঠেকাবার জন্য সর্বভারতীয় চাকরীগুলি বাগাবার বিষয়বুদ্ধি থেকে "ইংরেজি, ইংরেজি" করে তারা কিন্তু নিজেদের রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে তামিল ভাষাকে প্রচলিত করেছে।

বাঙ্গালীর 'আন্তর্জাতিকতা' ও 'ভারতীয়ত্বে'র অহঙ্কার-ই পশ্চিমবাংলায় বঙ্গসন্তানদের বর্তমান সর্বাত্মক সঙ্কটের একটি মুখ্য কারণ। প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক না হয়েও এবং 'ভারতীয়' ও 'আন্তর্জাতিক' থেকেও যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ছাড়া যে পশ্চিমবঙ্গের বাঁচা সম্ভব নয়,—এ সত্য যতদিন বাঙ্গালী হৃদয়ঙ্গম না করবে ততদিন তার দুর্গতি ঘুচবে না। বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ওপার বাংলায় যে এত বড় বিপ্লব হয়ে গেল একুশে ফেব্রুয়ারীর বাংলা ভাষা আন্দোলনই তো ছিল তার উপলক্ষ্য! মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষা করার দাবীই না ওপার বাংলার স্বাধীনতার দাবী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে? মুসলমান বাঙ্গালীরা হিন্দু বাঙ্গালীর মত ইংরেজির মহিমায় গোলাম বনে যায়নি বলেই ১৯৪৭-এর পর ওপার বাংলায় 'অশিক্ষিত' মুসলমান বাঙ্গালীর মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী রেনেশাঁসের জাগরণ এসেছিল ভাগ্যক্রমে তার 'প্রেরণা' ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজ সংস্কৃতি ছিল না। উনিশ শতকের বাংলায় যে রেনেশাঁ হয়েছিল তাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ না বলে এ্যাংলো-বেঙ্গলী জাতীয়তাবাদ বলাই সঙ্গত। আজকের হিন্দু বাঙ্গালীর ইংরেজিআনা এবং মাতৃভাষার প্রতি হীনম্মণ্যতা ঐ উনিশ শতকীয় বিজাতীয় শুক্রসঞ্চারেরই উত্তরাধিকার।

এপার বাংলার বাঙ্গালীর মাতৃভাষার প্রতি মনোভাবের কিছু প্রতীকী নজির রাখছি। (১) একটি দশবার বছরের ছেলে তার ক্লাবের হয়ে একটি রাবার স্ট্যাম্প তৈরী করতে দোকানে এসেছে। আমাকে সে ইংরেজিতে তার ক্লাবের নাম ঠিকানা এক টুকরো কাগজে লিখে দিতে বলল। সে রাবার স্ট্যাম্পটা বাংলায় করছে না কেন জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি হেসে বলল—'ধেৎ, তা আবার হয় না কি! (২) সরস্বতী পূজার রসিদ ছাপাতে এসেছে কটি কিশোর। ইংরেজিতে রসিদের ম্যাটার দেখে বললাম 'বাংলায় ছাপছ না কেন?' উত্তর পেলাম—আমাদের পাড়ায় অনেক মাদ্রাজী থাকেন, তারাও তো চাঁদা দেবেন।' অর্থাৎ এই বঙ্গ কিশোরগুলিও 'ভারতীয়' চেতনায় উদ্বুদ্ধ! (৩) অনুরূপভাবে দুর্গাপূজার রসিদ ও স্মরণী এই যুক্তিতে ক্লাবগুলি ইংরেজিতে ছাপছে যে অফিস থেকেও চাঁদা ওঠে এবং অফিসে সাহেবরাও

চাঁদা দেন! (৪) রবীন্দ্রসদনে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়ে প্রথমেই Ladies & gentelmen' দিয়ে ঘোষকের সম্বোধন শুরু হল এবং তারপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মশাই ইংরেজিতে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। স্মরণীটি বলাই বাহুল্য ইংরেজিতে মুদ্রিত ছিল। দর্শকদের ৯৫% জন বঙ্গ সন্তান হলেও ৫% জন অবাঙ্গালীর সুবিধার জন্য 'আমরি বাংলা ভাষা' শ্লোগানমণ্ডিত রবীন্দ্রসদনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘোষণা থেকে ভাষণ পর্যন্ত সবটাই হল ইংরেজিতে: (৫) ৯৮% বঙ্গসন্তান হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক সমিতি, শিক্ষকসংস্থা এবং অন্যান্য এ্যাসোসিয়েসনের বার্ষিক সম্মেলনের বিবৃতি, বক্তৃতা, হিসাবপত্র সবই ইংরেজিতে মুদ্রিত ও বিতরিত হয়; (৬) অজস্র ভুলে ভরা কিংবা কারো থেকে মক্স করা ইংরেজিতে যাবতীয় আর্জিও আবেদনপত্র পেশ করা হয়। একটি বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে জনৈক চাকরীর আবেদনকারিনীকে ভুল ইংরেজিতে না লিখে বাংলায় দরখাস্ত করতে বলায় সে আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি কি হাস্যকর কথাই না বলেছি। অবশেষে সে বলল, 'বাংলায় এ্যাপলিকেশন করলে নেওয়া হয়?' (৭) ছেলের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির কারণ জানিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে একজন অভিভাবক একটি চিঠি দেবেন। আমার কাছে তিনি এলেন চিঠিটা দেখাতে। বললাম, আপনি বাংলায় তো লিখতে পারেন—তাতেই লিখুন না। অভিভাবকটি স্পষ্টতঃ অপমানিত বোধ করলেন, ভাবলেন তাঁর ইংরেজি না জানার প্রতিই আমি কটাক্ষ করেছি। পরে তিনি বললেন —বাংলায় আর্জি কি ইস্কুলে নেয়?

এই হল মাতৃভাষা সম্পর্কে এপার বাংলার বাঙ্গালীর যথার্থ মানসিকতা। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষদের দোষ নেই—বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত বাবুশ্রেণীর বাঙ্গালীরাই অশিক্ষিত—অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে নিজেদের লেখা-কথা-আচরণের দ্বারা ইংরাজির প্রতি মোহ এবং মাতৃভাষার প্রতি তুচ্ছতাবোধের সঞ্চার করেছে। এই বোধ দেড়শতবৎসরে জাতীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে। একে উচ্ছেদ করা সহজ নয়; উচ্ছেদ করার চেষ্টাও হয় নি। বরং স্বাধীনতার পর উল্টোটাই হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই বেশি বেশি করে ইংরেজি গেড়ে বসছে। ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল ও 'অন্টি'র কাছে কিণ্ডারগার্টেনে পড়াবার ঝোঁক প্রতিদিনই বাড়ছে। ইংরেজি ছড়া যে শিশু বলতে পারে তার মা-বাবার কি গভীর পরিতৃপ্তি! মা-বাবার কাছে ইংরেজি বলতে পারায় তারিফ পেয়ে শিশুটি কি মানসিকতা নিয়ে বড় হচ্ছে সহজেই অনুমান করা যায়।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য মরিয়া হয়ে ইংরেজিকে আঁকড়ে ধরছে ; ভাবখানা যেন, ইংরেজি বলতে কইতে পারলেই সারা ভারত, এমন কি বিশ্বের যত্রতত্র তারা একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে পারবে।

ইংরেজি জানার সঙ্গে চাকরী পাওয়ার সম্পর্ক যদি ছেদ না করা যায় তাহলে ইংরেজিমোহ কাটিয়ে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি এবং ওপার বাংলার অধিবাসীরা বিলম্বে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলেই ইংরেজির বদলে মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে জীবনে প্রতিষ্ঠা চেয়েছে এবং পেয়েওছে। পশ্চিমবাংলায় আজ নতুন করে বাংলাভাষার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ গড়া যাবে না। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং বাংলা ভাষা প্রবর্তনের কোন কর্মসূচী বা নীতি কোন রাজনৈতিক দলেরই নেই। বামপন্থী দলগুলি আচার আচরণে এবং নীতিগত-ভাবেও বাংলাভাষা সম্পর্কে উদাসীন। রাজনৈতিক কারণে যে দলগুলি নেপালী ভাষাকে অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করতে আন্দোলন করছে তারাই কিন্তু বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার প্রশ্নে আন্তরিকতাহীন, এমন কি ভণ্ড। ছাত্রফ্রন্টে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা চালু করা এবং মিশনারী শিক্ষা বাতিল করার আওয়াজ যে দলগুলি দিচ্ছে তারাই আবার 'কসমপলিটন' সেজে ইংরেজিতে যাবতীয় কাজ করছে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা সব দলই বলছে, অথচ ইংরেজি ভাষার বর্তমান মর্যাদা, অপরিহার্যতা ও চর্চা যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিরোধী তা মানছে না। যে দেশে এখনও ৭১% জন সাক্ষরতাহীন, সেদেশে কি আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া গণসংযোগ ও গণতন্ত্র সফল হতে পারে? ইংরেজি যে আভিজাততন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির আশ্রয় তা কি তথাকথিত বিপ্লবী বামপন্থীরাই তাদের আচরণে বোঝার লক্ষণ দেখাচ্ছে?

এই যখন বাস্তব অবস্থা তখন বাংলা ভাষা প্রবর্তনে টালবাহানা ও ব্যর্থতার জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করার নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত বাবুশ্রেণী, রাজনৈতিক দল এমন কি এদের দেখাদেখি নিরক্ষররাও বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধা করেনা। জনগণের আত্মিক অনীহাই বাংলা ভাষা প্রবর্তনের মূল বাধা—সরকার নিমিত্ত মাত্র।

কুমারেশ ঘোষ

পাঁউরুটি

দোতলা বাড়ীটার সামনে ছোট মনোহারী দোকান।

মাঝখানে সরু গলি। পাড়ার গলি। পাড়ার অনেকেই ঐ মনোহারী দোকানের খদ্দের। দোতলা বাড়ির ভদ্রলোকও।

দোকানটায় নিত্য দরকারী প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়। সেণ্ট, সাবান, খাতা, পেন্সিল, ফিতে কাঁটা, লজেন্স বিস্কুট টফি চকোলেট, পাঁউরুটী কী নেই? দোকানে বাকি-খদ্দের আছে; তারা ফাঁকিও দিয়েচে। তবে নগদ খদ্দেরের কৃপায় দোকানটা টিকে আছে। দোতলা বাড়ীর ভদ্রলোক কিন্তু দোকানের নগদ খদ্দের।

তা, ভদ্রলোক নগদ খদ্দেরই বা হবেন না কেন? অভাব তো কিছু নেই,—মানে টাকা পয়সার অভাব। অবশ্য আসল অভাব আছে—লোকের। সারা বাড়ীটায় মাত্র তিনি আর তাঁর চাকর, পুরোন চাকর। ভদ্রলোক ছোটবেলায় তাঁর মাকে হারিয়েচেন, বড় হয়ে বাবাকে। আর বোন দুটিকে বাবাই পার করেচেন পরের বাড়ীতে।

কাজেই সারা বাড়ীতে ঐ দুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই।

পরিচিত অনেকেই বলেন, রমেশবাবু, এবার একটা বিয়ে করুন।

অফিসের বন্ধুরা বলে, রমেশ আর কেন, এবার দুগগা বলে ঝুলে পড়ো।

গুরুজনরা বলেন, রমু, বাড়ী যে খাঁ-খাঁ করচে। ঘরে গিন্নী না থাকলে মানায়?

রমেশ শোনে আর হাসে। বলে যতদিন নন্দ আছে, ততদিন কিছু ভাববার নেই, বেশ আনন্দেই আছি। নন্দ আমাদের দ্রৌপদী।

নন্দ পুরোন চাকরের নাম। দাদাবাবুর কথা শুনে বুক তার ফুলে ওঠে। রমেশ নন্দকে নিয়ে আনন্দেই দিন কাটায়।

ভগবান আবার কারোর আনন্দ-উচ্ছ্বাস বেশিদিন সহ্য করতে পারেন না। আচমকা নন্দকে তিনি নিজের কাছে টেনে নিলেন। তাঁর নিশ্চয়ই রান্নার লোকের দরকার ছিল না। চল্লিশ বসন্তের নন্দ, বসন্তকালে বসন্তরোগে মারা গেল।

অতএব রমেশ বাধ্য হয়েই পরম উৎসাহে নিজেই রান্না করলো দু'চার দিন। কিন্তু দেখা গেল, ক'দিনই ভাত পুড়লো, ডাল পুড়লো, হাতও পুড়লো।

পোড়া পেটের নিকুচি করেচে। রমেশের রান্নার উৎসহ গেল নিভে। নেভা উনুন আর জ্বালানো গেল না।

ঠিক করলো পাঁউরুটী খাবে। মাখন দিয়ে, জ্যাম দিয়ে জেলি দিয়ে। তোফা হবে।

অতএব সামনের মনোহারী দোকান থেকে নগদা পয়সার কিনে আনলো মাখন, জ্যাম, জেলি, আর প্রতিদিন একখানা করে পাঁউরুটী।

রমেশ দোকানের পবিত্র পাঁউরুটীর বিশুদ্ধ খদ্দের বনে গেল।

পরিচিত দোকানদার বললো একদিন, এভাবে পাঁউরুটী খেয়ে আর কতদিন চালাবেন?

রমেশ হেসে বললো, যতদিন চলে!

গুরুজনরা বললেন, এইবার রমু একটা বিয়ে কর।

বন্ধুরা বললো, বাংলাদেশে একটা শাঁসালো সৎ পাত্র বৃথাই যাবে? অসম্ভব, আমরা উঠে পড়ে লাগবো।

পাঁউরুটী খেয়ে খেয়ে রমেশের বোধহয় পেটে চড়া পড়ে গেছলো; বললো দেখো চেষ্টা করে।

চেষ্টার অসাধ্যি কোন কাজ নেই।

তবে এক্ষেত্রে চেষ্টা করবার কোন দরকার ছিল না। সংসারে শশুর নেই, শাশুড়ি নেই, কুমারী বা বিধবা ননদ নেই, পড়ুয়া দেওর নেই—অথচ কলকাতায় বাড়ী আছে, সরকারী চাকরী আছে, এমন একটি পাত্রের জন্যে পাত্রীর খোঁজ করা মানেই, "খৈ-ভাজার" মতোই বাজে কাজ করা।

যাক, অনায়াসেই জুটে গেল পাত্রী। যায়-যায় যৌবনে রমেশ একদিন এলো-এলো যৌবনা একটি মেয়ের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে নিয়ে এলো তার দোতলা খালি বাড়িতে। অবশ্য মেয়েটি খালি হাতে এলো না, হাতে সোনার রুলি, সোনার চুড়ি, গলায় ফুলের মালায় তলায় জড়োয়া নেকলেস: এবং প্রকাণ্ড লরীতে বোঝাই হয়ে এলো খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারী, থালা, ঘটি বাটি, গাড়ু ইত্যাদি।

সেইদিন থেকে সামনের দোকান থেকে নিয়মিত রুটী কেনাও বন্ধ হয়ে গেল।

রমেশের ঘরের লক্ষ্মী, দোকানীর ঘরের অলক্ষ্মী হয়ে উঠলো নাকি ?

না, বরং দোকানে বিক্রী বাড়লোই।

সুগন্ধী তেল, সাবান, সেণ্ট, স্নো পাউডার, ভেসলিন, ইত্যাদি কিনতে লাগলো রমেশ। দোকানী বুঝলো রমেশবাবুর পেটের ভাবনা ঘুচে গেচে। এখন পটের বিবির ভাবনায় ব্যস্ত। দোকানী আরো বুঝলো গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীরাই বাণিজ্যের আসল লক্ষ্মী।

কিন্তু একদিন চমকে উঠলো দোকানী।

রমেশ একদিন এসে বললো, দুখানা রুটী দাও তো ?

দুখানা ?

গম্ভীর হয়ে বললো, হ্যাঁ দুখানা !

পরদিন রমেশ এসে বললো, এবার থেকে দুখানা করে রুটী আমার জন্যে রেখো। পচার মা এসে নিয়ে যাবে রোজ।

পচার মা রমেশের বাড়ীর ঠিকে ঝি, রমেশের বিবাহোত্তর কালের আমদানী।

আমাদের বাড়ীর ঠিকে ঝিও ঐ পুত্র-নামধন্যা পচার মা। অতএব রমেশের বাড়ীর হাঁড়ির খবর আমাদের অজানা নয়, এবং আমাদের হাঁড়ির খবর বোধহয় শুধু রমেশ কেন, পচার মার অন্যান্য ঠিকে-মনিবরাও জানেন। সুতরাং পরের খবরের কাগজ বাগমতী পচার মা একদিন রেগে আগুন হয়ে আমার স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করলো রমেশের পাঁউরুটি রহস্য।

পাশের ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। কানে এলো পচার মায়ের খবর। আমার গিন্নীর কাছে তার অভিযোগ।

ঐ অমেশবাবুর বাড়ি আমি আর কাজ করবো নি। ভাল মুখে কথা বলতে পারে না মা। সোয়ামীটকে পর্যন্ত গালাগালি করে, বলে, তোমার বাড়ি আহ্লাদীগিরি করতে এইচি। পারবো নি আর ভাত আঁধতে। বড়নোকের মেয়ে কিনা, তাই দশটার আগে বিছানা ছাড়ে না। বাবু তাই পাঁউরুটী খেয়ে আফিস যায়, গিন্নীও আন্নার ভয়ে পাঁউরুটী চিবোয়। আত্তিরেও ঐ পাঁউরুটী ! অথচ সাজগোজের খুব ঘটাঘটি। পেরায় টকি দেখতে যাওয়া চাই। আজ হাত থেকে পড়ে একটা কাচের গেলাস ভেঙেচে বলে যাচ্চে তাই করে গালাগাল মন্দ করলো। আর কাজে যাবোনি ও বাড়িতে।

আচ্ছা, যা এখন। গিন্নী থামিয়ে দিলেন পচার মা-কে। ঘরে এসে বললেন, শুনলে তো, পচার মার কথা। আচ্ছা বৌ তো। আর রমেশ বাবুরও ভাগ্যে সেই পাঁউরুটিই।

হেসে বললাম, গিন্নী, এক একটা পুরুষ অমন পাঁউরুটী-ভাগ্য নিয়েই জন্মায়। বিশেষ করে বুড়ো বয়সে বিয়ে করে যারা। বৌয়ের কাছে ঐ পাঁউরুটীর মত নরম হয়ে থাকতে হয় আর বৌয়ের কষ্টে চিবোতে হয় পাঁউরুটী।

ডঃ কালীপদ মালাকার

কালাচাঁদ কেন কালাপাহাড় হলেন এবং আসল কালাপাহাড় কে ?

দুর্গাচরণ সান্যাল মশায় তারিখ-ই খাজেহান, তারিখ-ই শের শাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী অবলম্বনে কালাপাহাড়ের যে জীবন চরিত লিখেছেন তা হতে জানা যায়—কালাপাহাড়ের আসল নাম ছিল কালাচাঁদ রায়। তাঁর বাল্যকালে সকলে তাঁকে রাজু বলে ডাকত। কালাচাঁদ রায়েরও বাড়ী ছিল রাজসাহীর অন্তর্গত মান্দা থানার অধীনে বীর জাওন গ্রামে। তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশজাত (জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুঙর—কৃত্তিবাস) এবং এঁর উপাধি ছিল ভাদুড়ী। কালাচাঁদের পিতার নাম ছিল নয়ান চাঁদ রায়। তিনি গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চপদে কাজ করতেন। তাঁর উপাধি ছিল ভুঁইয়া। কালাচাঁদের অল্প বয়সে তাঁর পিতা পরলোক গমন করায় তিনি মাতামহের অভিভাবকত্বে মানুষ হতে থাকেন। তাঁর মাতৃকুল ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী। ফলে কালাচাঁদ অল্প বয়স থেকেই হরিভক্ত হয়েছিলেন। শ্রীপুর গ্রামের রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

কালাচাঁদ ছিলেন বলিষ্ঠ, উজ্জ্বলবর্ণ ও সুদর্শন। মোটের ওপর তিনি দেখতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন, একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশের রীতি অনুসারে কালাচাঁদ রায় বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এবং অশ্বচালনায় ও বীরোচিত গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। সেই সময় গৌড়াধিপ ছিলেন নাসের সাহের পুত্র বরাবক শাহ। গৌড়েশ্বর কালাচাঁদের নানারূপ সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁকে দরবারের উঁচু পদে চাকরি দিলেন, কালাচাঁদ রায় বাদসাহের প্রাসাদের অতি নিকটেই অপরাপর উচ্চ হিন্দু আমলাদের সঙ্গে একটি গৃহে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন অতি ভোরবেলায় মহানন্দা নদীতে স্নান করতে যেতেন।

সুলতান বরাবক সাহের সপ্তদশবর্ষীয় এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন ; সেই নবাব কন্যার নাম ছিল দুলারী বিবি। কালাচাঁদের বলিষ্ঠ দেহ ও সৌম্যকান্তি দুলারী বিবির দৃষ্টি এড়ালো না। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটল। নবাব কুমারী রাজ প্রাসাদে তার শয়ন কক্ষ থেকে প্রত্যহ প্রাতে ওই রূপবান সুদর্শন যুবক

কালাচাঁদকে স্নান করে ঘরে ফিরে যেতে দেখতেন। ফলে ঐ সুদর্শন যুবককে তার ভাল লেগে গেল। শুধু তাই নয় তিনি মনে মনে ঐ যুবককে ভালবেসেও ফেললেন। এবং একদিন তাঁর সহচরীদের বললেন—ঐ যুবক ছাড়া তিনি আর কাউকেই বিয়ে করবেন না। সহচরীরা তখন বলল—অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি এরূপ অনুরাগ প্রদর্শন মোটেই উচিত নয়। উত্তরে নবাবকুমারী বললেন—ওঁর গলায় পৈতে। অতএব, উনি যে ব্রাহ্মণ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, এছাড়া পেছনে ছাতা বরদার এবং হাতে সোনার কোষা দেখে মনে হয় যুবকটি নিঃসন্দেহে ধনী পরিবারের সন্তান। যুবক সুকণ্ঠে যেরূপভাবে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে যান তাতে মনে হয় উনি মূর্খ নন। তাঁরপর এঁর মনমাতানো অপরূপ রূপের সাক্ষী হলো, তাঁর নিজের দুটি চোখ, যাকে নবাবকুমারী কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারেন না। কাজেই ঐ যুবকের আর অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেন। নবাব জাদীর এরূপ যুক্তির পরে সহচরীদের আর বলার কিছুই থাকল না। কিন্তু এসবই ঘটে চলল সুলতান বরাবক সাহের অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে।

ঘটনা কখনও চাপা থাকেনা। ফলে সুলতান বরাবক সাহ ও তাঁর বেগম উভয়েই তাঁদের কন্যার মনোভাবের কথা জানতে পারলেন। এছাড়া সুলতান তখন অনুসন্ধান করে জানলেন কালাচাঁদ একটাকিয়া ভাতুড়ী বংশজাত, যে বংশের অনেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান সুলতানদের কন্যার বিবাহ হয়েছে। কাজেই বাদশাহের ওই বিবাহে অসম্মতির কারণ রইল না। তিনি কালাচাঁদকে ডেকে তাঁকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণপূর্বক নবাব কন্যাকে বিয়ে করার কথা বললেন। শুধু বললেনই না, তিনি যুবকটির প্রতি কন্যার অনুরাগের কথা শুনে এরূপ বিয়ে দেওয়ার জন্য জেদ ধরে বসলেন। এদিকে কালাচাঁদ অতিশয় তেজের সঙ্গে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। এতে সুলতান অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে কালাচাঁদকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করার আদেশ দিলেন। যখন শূলে দেওয়ার সকল প্রকার আয়োজন শেষ হয়েছে তখন বিরহে কাতরা দুলারী বিবি বিদ্যুৎগতিতে রাজপ্রাসাদ হতে অবতরণ করে বধ্যভূমিতে এসে কঠোরভাবে আদেশ করলেন—"আগে আমায় হত্যা করে তারপর এর অঙ্গস্পর্শ কর।" তখন নবাবকন্যার অসামান্য রূপ এবং তাঁর প্রতি অপূর্ব অনুরাগে মুগ্ধ হয়ে কালাচাঁদ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সকল প্রকার গোঁড়ামি জলাঞ্জলি দিয়ে নবাবকুমারীকে বিয়ে করার সম্মতি প্রকাশ করলেন। এ যেন ফুলশরের আঘাতে ধর্মবেদী বিদীর্ণ হলো। অবশ্য কালাচাঁদ দুলারী বিবিকে বিয়ে করলেন

কিন্তু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেন না। ফলে হিন্দু সমাজের চোখে তিনি অপরাপর শত সহস্রের মতই হলেন অপাঙক্তেয় এবং জাতিচ্যুত। তারপর তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করেও তদানীন্তন গোঁড়া হিন্দু সামাজিক অত্যাচার ও নিপীড়ণ হতে রেহাই পেলেন না। জাতে উঠবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্তব্য তার প্রত্যাদেশের জন্য তিনি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে সাতদিন অনাহারে অনিদ্রায় ধন্না দিয়ে রইলেন। কিন্তু কোন আদেশ পেলেন না। অপরদিকে মন্দিরের পাণ্ডারা তাঁকে অত্যন্ত অপমান করে শ্রীমন্দির হতে বিতাড়িত করলেন। ফলে তাঁর মন গেল ভীষণভাবে বিষিয়ে—বিশেষ করে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতি। তিনি লজ্জায় ও ক্ষোভে মন্দির থেকে চলে এলেন। এবার এলো এই অপমান, গ্লানি ও হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। সে যে কি ভয়ানক প্রতিশোধ তা সমগ্র পূর্ব ভারত যেমন ওড়িশা, বাংলাদেশ ও আসামের কিয়দংশ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

যাহোক, অবশেষে বাধ্য হয়ে কালাচাঁদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নাম হল মহম্মদ ফর্মুলি। কিন্তু তিনি এবার থেকে সকলের কাছে হিন্দুধর্মের প্রতি তার ভয়ানক অত্যাচারের জন্য কালাপাহাড় নামে পরিচিত হলেন। এই নাম অবশ্য তাকে হিন্দুরাই দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ কালাচাঁদ নাম হতেই তার এই নামের উদ্ভব হয়েছে। ঐ নাম হিন্দুদের দেবতা ভগ্নকারীদের পক্ষে যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পর কালাপাহাড় বাদশাহের সৈন্যের সাহায্যে হিন্দুধর্মকে জগৎ থেকে একেবারে বিলোপ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

ওড়িশার পাণ্ডাদের কথা কালাপাহাড় ভুলতে পারলেন না। তাই এবার শুরু হলো প্রতিশোধের পালা। বাদশাহের সৈন্য নিয়ে কালাপাহাড় প্রথমেই উৎকল অভিযান করে উৎকল-পতিকে যুদ্ধে নিহত করলেন। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরিতে লিখেছেন—"কালাপাহাড় তাঁহার লোকদের পুরীর জগন্নাথের চন্দনকাঠ-নির্মিত মূর্তিটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর লোকেরা বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি দিয়ে এক মস্ত বড় শ্মশান তৈরী করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে জগন্নাথের মূর্তিটি ওতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—ঐ বিরাট কাঠের খণ্ডগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু জগন্নাথের কাঠের মূর্তি পুড়ে যাওয়া তো দূরের কথা তাতে একটু আঁচড়ও লাগল না। সকলে এতে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কালাপাহাড়ের ক্রোধ

কমল না। তিনি তখন মূর্তিটিতে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করার হুকুম দিলেন। উপস্থিত অনেকেই চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মূর্তিটিকে জলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করলেন। এরা আগুনে নিক্ষেপ করার আগেও বুক চাপড়িয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন এবং মূর্তিটিকে দগ্ধ না করার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কোন বারই কালাপাহাড় তাদের কথায় কর্ণপাত না করে বরং তাদের প্রতি ভীষণভাবে উপহাস করলেন। যাহোক মূর্তিটি উত্তাল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেও তা পুনরায় অতি আশ্চর্যজনকভাবে ঘাটে ফিরে এলো। কালাপাহাড় তখন ব্যর্থ হয়ে জগন্নাথের মুর্তি ধ্বংস করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলেন এবং শ্রীক্ষেত্রে এক রোমহর্ষণ অত্যাচার চালালেন। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে গৌড়ে ফেরার পথে তিনি শত শত হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করে দেবমূর্তিগুলিকে অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করলেন। এবং বহু হিন্দুর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। ভারতীয় চিত্রশিলাগুলিতে রক্ষিত চুর্ণবিচুর্ণ মন্দির স্তম্ভ এবং ক্ষতবিক্ষত দেবমূর্তিগুলি আজও কালাপাহাড়ের হিন্দু-বিদ্বেষের জলন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গৌড়ের পরে কালাপাহাড় ভাতুড়িয়া ও পুর্ববঙ্গে কয়েকটি জায়গায় অত্যাচারি অভিযানে উদ্যত হন। কিন্তু ভাতুড়িয়ার রাজা কালাপাহাড়ের দুই পত্নীকে তাঁর প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন—একথা শুনে কালাপাহাড় তার অভিযানের মুখ আসামের দিকে ফেরালেন। এরপর তিনি রংপুর দিনাজপুর কোচবিহার ও আসামের কামরূপে ভীষণ অত্যাচার চালালেন। শোনা যায়—হিন্দুদের উপর কালাপাহাড়ের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা দেখে মুসলমানগণ ব্যথিত হয়ে প্রাণভয়ে পলায়ণপর বহু হিন্দুকে প্রাণরক্ষার জন্য নিজেদের গৃহে গোপনে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

কথিত আছে—বহ্‌লোল লোদির সেনাপতি হয়ে কালাপাহাড় জোয়ান পুরাধিপকে পরাস্ত ও নিহত করে সেখান হতে ফেরার পথে বহু দেবমন্দির ভঙ্গ করেছিলেন। কাশীধামের এক কেদারেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতীত একটিও দেবমূর্তি তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়নি। পাণ্ডারা কালাপাহাড়ের ভীষণ অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে নানা দিকে পালিয়েছিলেন। অবশ্য কেদারেশ্বরের লিঙ্গ রক্ষা পাওয়ার পেছনে একটি ঘটনা আছে। তা হলো—কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীতে বাস করতেন। কালাপাহাড়ের দুরাচার সৈন্যেরা তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার করল। তখন ওই মহিলা বিষপান করে প্রাণত্যাগ করলেন। এতে কালাপাহাড় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

এবং সেইদিন থেকে হিন্দুদের উপর সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করলেন। ফলে কেদারেশ্বরের লিঙ্গটিও রক্ষা পেল। আরও কথিত আছে—সেই দিনে কালাপাহাড় একটি সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করলেন এবং পরের দিন থেকে তাঁকে আর দেখা গেল না।

কালাপাহাড়ের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেউ বলেন—কালাপাহাড় মনে ভীষণ অনুতাপে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন—তিনি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন। কারও মতে নিদ্রিত অবস্থায় কালাপাহাড়কে কাশীর পাণ্ডারা হরণ করে হত্যার পর মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। কারও মতে তিনি বিনাশরূপী রুদ্রের অংশে জন্মেছিলেন বলে সেই বিশ্বেশ্বরেই লীন হয়েছিলেন। আবার কেউ বলেন—তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে বহ্‌লোল লোদি তাঁকে গুপ্তচর দিয়ে গোপনে হত্যা করিয়েছিলেন। যাহোক কাশীর অত্যাচারের তৃতীয় দিন থেকেই কালাপাহাড় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন এবং এগার বছর হিন্দুধর্ম বিনাশে ব্রতী হয়েছিলেন। বরাবক শাহের কন্যা দুলারী বিবির গর্ভে তাঁর যে কন্যা হয়েছিল ওর নাম রাখা হয়েছিল 'ফতেমা' তবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেক মতানৈক্য আছে।

আসল কালাপাহাড় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। অনেকের মতে কালাপাহাড় দুজন ছিলেন। কিন্তু ডঃ দীনেশ সেন মশায় তা স্বীকার করেননি। কিন্তু ডঃ রমেশ মজুমদারের লেখা বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) হতে দুজন কালাপাহাড়ের পরিচয় পাওয়া যায়—একজন ছিলেন সুলেমান কররাণীর সেনাপতি, যিনি হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বহু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। ইনিই প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' বদাওনীর' মন্তখুব-উৎ-তওয়ারিখ এবং নিয়ামতুল্লাজর মখজান-ই-আফগানী হতে জানতে পারা যায় কালাপাহাড় জন্ম-মুসলমান এবং আফগান ছিলেন। তিনি ছিলেন সিকন্দর সুরের ভাই। এঁর অন্য নাম ছিল 'রাজু' যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। রাজু নামের জন্যেই অনেকে তাঁকে হিন্দু বলে মনে করেন। এই কালাপাহাড়ই ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। এবং মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাসুম কাবুলীর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। এছাড়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে

বহ্‌লোল লোদি ও সিকন্দর লোদির সময়ে একজন কালাপাহাড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে একজন কালাপাহাড়ের উল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন-এর মতে কালাপাহাড় ছিলেন বাবরের অন্যতম আমীর এবং আকবরের সেনাপতি হিসেবে ওড়িশা জয় করেছিলেন। এই কালাপাহাড় ও দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে লিখিত কালাপাহাড়ের কাহিনীও ডঃ রমেশ মজুমদার মশায় ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মশায় লিখেছেন—সোলেমান খাঁ ও দাউদ খাঁর রাজত্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সামরিক অভিযান হয়েছিল। সোলেমান খাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৫৬৪ হতে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তখন কালাপাহাড় ওড়িশার রাজা মুকুন্দ দেব ও তাঁর সামন্তরাজ রঘুভঞ্জ ছোটরায়কে পরাস্ত করে নিহত করেন। মনোমোহন চক্রবর্তী লিখেছেন—ঐ ঘটনা ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল (রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ, ১৩২৪ বাং ৩৬৭ পৃঃ) তখন সোলেমান কররাণী বঙ্গের বাদশাহ ছিলেন। কালাপাহাড় কোচবিহারের রাজভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ চিনা রায়কে ১৫৬৮ খ্রীঃ-এ পরাস্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে বহলোল লোদি সিংহাসনে ১৪৫১ খ্রীঃ—১৪৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বরাবক শাহ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেছিলেন ১৪৫৯—১৪৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত। অথচ এদিকে সান্যাল মশায় লিখেছেন—৩৪ বছর বয়সে কালাপাহাড় যখন উধাও হন তখন দুলারী বিবির গর্ভে তাঁর একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল। এ উক্তিও প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষের কাহিনী হতে জানা যায়—বাদশাহ জালালের কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করেছিলেন। এ ঘটনা ঠিক হলে অনেক গোলমালের অবসান হয়। কারণ জালালের রাজত্বকাল ছিল ১৫৬০-১৫৬৩ খ্রীঃ আর কালাপাহাড়ের কর্মজীবন ছিল ১৫৬৮-১৫৭৫ খ্রীঃ এবং তাঁর বিবাহ হয়েছিল ১৫৬০-৬৩ এই সময়ের মধ্যে। কালাপাহাড় ১৫৭৫ খ্রীঃ-এর মধ্যেই তাঁর ধ্বংসলীলা সমাধান করেন এবং অনুমান ৩৪ বছর বয়সে নিরুদ্দেশ হন। ১৫৬২ খ্রীঃ-এ যদি তাঁর বিবাহ হয়ে থাকে এবং ১৫৭৫ খ্রীঃ-এ যদি তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকেন তবে তাঁর বয়স তখন ৩০ হতে ৪০ বছরের মধ্যে হয়। তবে বহলোল লোদির নামও জনশ্রুতির বিকৃত ফল বলে অনেকে মনে করেন।

ঈশ্বর পেটলিকর

চেনা অচেনা

বাঙ্কের উপর যখন আমার ঘুম ভাঙ্গল, এখন ভোরের আলো ফুটে উঠছে। এক সময় বিরাট একটা ঝাঁকুনী দিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। যাত্রীদের কলকোলাহলে প্ল্যাটফরমটা মুখরিত হয়ে উঠল। আমার মুখ দিয়ে 'কুলি' এই শব্দটা বার হওয়ামাত্র ছুটো লোক ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল আমার কাছে। ওদের মধ্যে যে একটু পিছিয়ে পড়েছিল, সে আর এগুল না। কুলিদের মধ্যে এরকম একটা সমঝোতা হয়ত আছে। সামনের লোকটিকে বললাম, 'ভেতরে একটা ঘিয়ের টিন আছে।'

কুলি সেটা নিয়ে এসে বলল, 'আর কিছু আছে, সাব' ?

'না'—আমি বললাম।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের বাইরে চলে আসতে সে জিগেস করল 'আপনি তো টাঙ্গা করবেন ?' ওর কথা শেষ হবার আগেই আমাকে তিনচারজন টাঙ্গাওলা ঘিরে ধরেছে। ভাড়া যেখানে দশ আনা কিম্বা বারো আনা এরা দেড়টাকা চেয়ে বসে—তারপর শুরু হয় ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতা। ওদের আমি বেশ ভাল করেই চিনি। কুলিকে বললাম একটা টাঙ্গার ওপর আমার ঘিয়ের টিনটা রাখতে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা বার করতে গিয়ে দেখি মাত্র দু'আনা রয়েছে।

আমি প্রতিমাসেই দেশে যাই। আর ফেরার পথে একটিন ঘি নিয়ে আসি। কুলিদের সঙ্গে দরদস্তুর বড় একটা করতে হয় না। তিন আনা পয়সাতে ওদের বিদায় করি। ওরাও মুখ বুজে সেটা নিয়ে নেয়। তাই এখন দু আনা পয়সা দিলে ও নেবে কিনা, বা হৈচৈ করবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। নোট বার করলে হয়তো বেশী কেটে নেবে। রেলের নিয়ম অনুযায়ী মাল পিছু ওদের প্রাপ্য দু আনা সেটাই হ'ল রেট। তাই ভাবলাম, ওকে দু'আনাই দেব—দেখা যাক।

'এই নাও পয়সা'—বলে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিই।

—'ব্যস খালি এই'—সে প্রতিবাদ করল।

—'কেন তোমাদের রেট অনুযায়ী পয়সা দিচ্ছি।'

—'কি বলছেন সার? কতখানি পথ বয়ে এনেছি—অন্তত আট আনা দিতে হবে।'

ওর কথা শুনে আমারও কেমন জেদ চেপে গেল। বললাম, 'এটা কি লুটের মাল পেয়েছে—আট আনা চাচ্ছ যে বড়?' সে কিন্তু সহজভাবেই বলল, 'লুটের মাল—আমি কি বলেছি। ঘিয়ের টিন—কত ভারী আপনি বুঝুন—আট আনা কি খুব বেশী চেয়েছি?'

বললাম, 'ঘি হোক, কেরাসিন হোক, সোনা হোক, লোহা, হোক, যা বাঁধা রেট্ আমি তার এক পয়সা বেশি দোব না।'

সে বলল, 'ও সব রেট হচ্ছে বেডিং, সুটকেশ-এসবের জন্য। আমি বয়ে নিয়ে এলাম ঘিয়ের টিন আর……

ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'দু আনার বেশি দেব না, নেবে কিনা বলো।'

টাঙ্গাওলা এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। সে আমার পক্ষ নিয়ে বলল, 'আরে ভাই কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ?'

কুলি সদম্ভে বলল, 'আমি চাই না। ওটা আপনি দান করে দিন কাউকে।'

—'খুব যে বড় বড় কথা বলছো?'

—'আমি তো ছিনতাই করছি না। আমি শুধু আমার পাওনা পয়সা চাই।'

ওর এই কথা শুনে আমি দু আনা পয়সা পকেটে রেখে টাঙ্গাওলাকে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিলাম। কুলি যদি পয়সা না নেয় আমি কি করব? টাঙ্গা চলতে সুরু করল আর কুলিটিও মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

প্রথমদিকে আমি আমার জেদ বজায় রাখতে পেরে একটু খুশিই হয়েছিলাম—কিন্তু বাড়ি পৌঁছুনোর পর আমার দৃঢ়তা আর রইল না। মনটা খচ খচ করতে লাগল। কুলির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সবল বলিষ্ঠ পৌরুষভরা চেহারা। হয়ত রোজগারের আশায় সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। পুরোনো কুলি হলে হকের পয়সা মোটেই ছেড়ে দিত না। গরীব গৃহস্থ যখন শহরে আসে, শহরের মানুষের বিলাসিতা আর প্রাচুর্য দেখে ভাবে, যাদের হাতে মুঠো মুঠো টাকা, তারা বিলিয়ে দিতেও বোধহয় কার্পণ্য করে না। আমার ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, সেকেণ্ড ক্লাস থেকে অবতরণ আর ঘিয়ের টিন দেখে, অন্তত আট আনা পয়সা পাবার আশা করাটা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সে তো ঘিয়ের টিনটা মাথা থেকে না নামিয়েই আট আনার জন্য

জেদ করতে পারতো। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। ওকে দু আনার চেয়ে আরো কিছু বেশি দেওয়াই আমার উচিৎ ছিল। অথচ তার এতই আত্মসম্মান যে মুখের ওপর দুআনা পয়সা ফেরৎ দিতে দ্বিধা হল না। শীতের সকালে হয়ত আমিই প্রথম যাত্রী—যার মোট সে বয়েছে। ও কি ভাবছে, শহরের মানুষ কি নির্মম—হৃদয়হীন!

ভাবতে ভাবতে আমি নিশ্চিত হলাম দোষটা আমারই। কেমন যেন একটা অপরাধবোধ আমাকে ঘিরে রইল। বেশি দিই বা না দিই, দু আনাই যদি আমি নায্য মনে করে থাকি আমি তো ঐ পয়সাও সেখানে রেখে আসতে পারতাম। তারপর আমি চলে গেলে দরিদ্র কুলি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটা কুড়িয়ে নিত। আর সে যদি নাও বা নিত, আমার কাজ আমি করেছি, এইটাই আমার সন্তোষ বা সান্ত্বনার কারণ হোত। দুনিয়াটাই এই। যাদের হাতে পয়সা আছে তারা মুখে হতভাগা বঞ্চিতদের জন্য লোক দেখিয়ে চোখের জল ফেলে আর কাজের বেলায় আমারই মত উদাসীন ও নির্মম হয়। গরীবের আত্মসম্মানের কোন মূল্য দেয় না। যত ভাবছি ততই আমার অস্থিরতা বেড়ে চলেছে। সামান্য একটা কুলি অথচ তার কথা ভেবেই আমার মন চঞ্চল।

স্নান করে সকালের জল খাবার খেয়ে নিলাম। অফিস যেতে তখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি। আমার মন বলছে—যাও, খুঁজে বার করো সেই হতভাগ্যকে, তার নায্য প্রাপ্য তুলে দাও তার হাতে। আমি মনস্থ করলাম, স্টেশনেই যাব। নয়ত আমার চঞ্চলতা প্রশমিত হবে না।

আমাকে পোষাক পরতে দেখে রমা জিগেস করল, 'এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছ?'

'একটু বেরুচ্ছি, বেশি দেরী হবে না।' বলে বেরিয়ে পড়লাম। ফিরে এসে রমাকে আদ্যোপান্ত সব জানাব।

স্টেশনে পৌঁছে ইনডিকেটর বোর্ড-এর নীচে দাঁড়ালাম। বরোদা লোকাল আসতে দেরী নেই। প্ল্যাটফরমে সকলের মধ্যে ব্যস্ত ব্যস্তভাব। ভিড়ের মধ্যে আমার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটা মানুষকে, পৌরুষদীপ্ত সবল চেহারার যে মানুষটি আমায় নানাভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। না তার দেখা মিলল না। ট্রেন এসে পড়লে ভিড়ে হারিয়ে যাব। প্ল্যাটফরম থেকে বেরুতে যাব এমন সময় শুনলাম কে যেন আমাকেই ডাকছে—'সাব্'।

ফিরে তাকিয়ে দেখি—একটা কিশোর। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভিক্ষে

করা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। তাকে হয়ত উপেক্ষাই করতাম। কিন্তু আমার ভেতরের আমি বলে উঠল, তুমি এসেছ ঋণ পরিশোধ করতে। এই ছেলেটির হাত দিয়েও ঋণ শোধ করা চলে। ঈশ্বরের কাছে তাহলে যোগ্য বিচার পাবে। অনুশোচনায় ভরা মন আমার। তাই জীবনে বোধ করি এই প্রথম অপরিচিত এক কিশোরের কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'কি চাই ?'

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নতুন এসেছে এ লাইনে—ভিক্ষে করাটা রপ্ত করেনি। হয়ত সে কিছু বলত কিন্তু আমি কাঁধে হাত রাখতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমার মত সম্ভ্রান্ত একজন লোক অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলবে—এ যেন তার কল্পনারও অতীত। অপরের প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা যদি মানুষের মনে ঘৃণা জাগায় সহানুভূতি নিশ্চিত মানুষের কোমল বৃত্তিকে পুষ্ট করে—নমনীয় করে।

ট্রেণটা আসার সময় হয়েছে। দূরে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ছেলেটার হাত ধরে বাইরে নিয়ে চললাম। চলতে চলতে তার কাছে শুনলাম গত চরদিন ধরে সে কাজের ধান্ধায় ঘুরছে। স্টেশনের কুলিরা তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। আমি তাকে জানালাম এইভাবে বাইরের লোকের মোট বইবার কাজ পাওয়া মুস্কিল। ওর সঙ্গে টিকিট ছিল না। আমার সঙ্গেই বেরিয়ে এল। ভাগ্যক্রমে টিকিট চেকার টিকিট চাইল না। আমি ওকে কিছু দিতে চাইছিলাম। অন্য সময় হলে ওর কথাতে আমি কর্ণপাতই করতাম না—কিন্তু আমার কৃতকর্মের অনুশোচনা থেকে মুক্তি পেতে আমি আগ্রহী। পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে তাকে দিতে চাইলাম। ছেলেটা অবাক হয়ে যাবে আমার বদান্যতায়—তা হোক।

'এইটা তোমার জন্যে···' নোটটা এগিয়ে দিলাম। কি আশ্চর্য! ছেলেটা বলল, 'ভিক্ষে নেব না। আমি ভিখিরি নই।' তার উজ্জ্বল চোখে একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আমি মুগ্ধ হলাম। বললাম, 'তাহ'লে আমাকে ডাকলে কেন ?'

—'আমার মুখ দিয়ে 'সাব্' কথাটা বেরিয়ে গেছে। আমি গত চারদিন ধরে কাজের ধান্ধায় ঘুরছি। কিন্তু সকলেই বলছে কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে বা সার্টিফিকেট না থাকলে কাজ পাওয়া যাবে না। আপনাকে দেখে মনে হ'ল···'

—'কি কাজ তুমি চাও ?'

—'যে কোন কাজ। দেশে চাষবাস করতাম। সে সব গেছে।'

—তোমার বাবা নেই ?'

ছেলেটা আবার কাঁদতে স্থরু করল। হয়ত সে বলতে চায় না। নাকি ঈশ্বর আমায় পরীক্ষা করছেন। আমিও প্রস্তুত, যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। পাঁচ টাকা কেন—আরও কিছু করব। বললাম, 'চল, আমার সঙ্গে।'

তাকে বাড়ির দোরগোড়ায় বসিয়ে রেখে ভেতরে এলাম। রমা রান্নাঘরে ছিল। বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে ?'

এ কথার উত্তরে তাকে সব জানালাম। সমস্ত শুনে রমা বলল, 'তুনিয়ায় দুঃস্থ লোকের অভাব নেই। তোমার আর কতটুকু সাধ্য। তাছাড়া আমাদের তো চাকর রয়েছে। ওকে কি কাজ দেবে তুমি ?'

বললাম, 'আমরা না রাখলেও, আমরা স্থপারিশ করলে অন্য কোথাও একটা কাজ পেতে পারে।'

রমা বলল, 'কিন্তু একেবারে অজানা অচেনা লোককে বিশ্বাস কি ?'

—'তাইতো বলছি, এখানে যদি কিছুদিন কাজ করে, তখনই বোঝা যাবে কি ধরণের ছেলে। যদি আস্থা থাকে, কারোও বাড়িতে না হয় ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

—'আর যদি মাঝখানে চুরি করে পালিয়ে যায় তখন ?'

—'দেখে তা মনে হয় না। ও বাড়ি থেকে পালিয়েছে নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছিল বলে।'

যাই হোক ছেলেটি কাজে বহাল হ'ল। ওর নাম শঙ্কর। পনের দিনের মধ্যেই ও রমার মন জয় করে নিল। এর আগে ও গৃহভৃত্যের কাজ কোনদিন করেনি। অথচ কেমন নিষ্ঠায় ও সব হুকুম তামিল করে চলে। তাছাড়া নতুন কাজ দিলে সেটা শিখে নেবার আগ্রহ ওর কম নয়। কাজে ফাঁকি তো দেয় না, বরং ওকে আমরা রেখেছি বলে ওর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

রমাকে জিগ্‌গেস করলাম। 'কি করবে ?'

রমা হেসে বলল, 'আমাদের কাজের জন্য ওকেই রাখব ভাবছি।'

—'কিন্তু দুজন চাকর আমাদের কি হবে ?'

—'নাথুকে বরং অন্য কোথায় লাগিয়ে দাও। আমার বন্ধু স্থধা বলছিল, ওদের একজন চাকর চাই।'

আরো কিছুদিন যাবার পর, অর্থাৎ ঘরের সব কাজ যখন শঙ্কর একাই

করে, ওকে ডেকে ওর হাতে মাইনের টাকা দিতে গেলাম। শঙ্কর তার বাড়ির সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। আমিও জানতে চাইনি। বিশ্বাসী চাকর, মন দিয়ে কাজ করে, তার জন্যে তার ঘরের কথা জানতে ইচ্ছাও হয়নি। ওকে বললাম, 'এই টাকা থেকে গ্রামে কিছু পাঠাতে চাও তো বল—আমি মনি অর্ডার লিখে দেব।'

শঙ্করের চোখে জল এল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সাব্, ঘরে লোক থাকতেও আপনি আমাকে কাজ দিয়েছেন—আপনি খেতে শুতে দিয়েছেন—আবার টাকা দিচ্ছেন কেন?'

—'তোমার কিছু হাত খরচ তো চাই।'

—'কি হবে? আগে বিড়ি খেতাম। কিন্তু এ বাড়িতে আসার পর তাও ছেড়েছি। জামাকাপড় দিয়েছেন,……'

—'সিনেমা টিনেমা যদি দেখতে চাও—'

—'আমি সিনেমা দেখি না। তবে একান্তই যদি দিতে চান, আমায় প্রতিমাসে তিনটাকা করে দেবেন। বাবাকে পাঠাব। দুটাকা বাবার আফিঙের দাম আর একটা টাকা লাগে আফিঙ কিনতে যেতে আসতে।'

—'তোমার বাবা কি করেন?'

—'আফিঙখোর মানুষ আবার কি করে? বাজারের চৌকিদারী করে। আর ক্ষেত আছে—চাষের কাজ করে।'

—'তোমার মা আছে?'

কান্নাভেজা গলায় শঙ্কর বলল, 'আমার মা যদি বেঁচে থাকত, তবে কি আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসতাম। মা গতরে খেটে আমাকে মানুষ করেছে। গেল বছরে মা মারা গেল আর…'

—'তাহ'লে তুমি বাবাকে ছেড়ে চলে এলে কেন? তারও তো বয়স হচ্ছে।'

—'সাহেব, আমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন। আমার সৎমার আগের পক্ষের দু' ছেলেও এসেছে। আমাকে তারা দু চক্ষে দেখতে পারে না। বাবা কিছু বলে না। খুবই দুঃখে তাই আমেদাবাদে চলে এসেছি। চারদিন ভাল খাওয়া জোটেনি, ফুটপাথে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। একবার মনে হয়েছে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু সৎমার কথা ভেবে যাইনি। ঈশ্বরের কৃপায় আপনার সাক্ষাৎ পেলাম। কিন্তু বাবার কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ আমি কী করব?'—আবার সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু শুধু তিনটাকা পাঠিয়ে কি হবে? বাবাকে আরো বেশি কিছু পাঠাতে দোষ কি?'

শঙ্কর বলল, 'তাহলে সৎমা নিশ্চয়ই কেড়ে নেবে।'

এতদিনে মনের কথা প্রকাশ করতে পেরে শঙ্কর বোধহয় কিছু স্বস্তি পেল। আমি আর এ নিয়ে কিছু বলিনি। পনেরটি টাকা তার বাবাকে মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছিলাম ইচ্ছে করলে ছেলেকে দেখতে সে এখানে আসতে পারে।

পরের সপ্তাহে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি শঙ্করের বাবা এসে গেছে। আর তার সঙ্গে এসেছে সেই কুলিটা যাকে খুঁজতে গিয়ে আমি শঙ্করকে পেয়েছিলাম। তার দিকে চোখ রেখে তাকাতেও যেন সাহস হচ্ছিল না। তাকে আমি চিনেও শঙ্করের বাবার সামনে না চেনার ভান করে রইলাম।

আমাকে প্রণাম করে শঙ্করের বাবা বলল, 'আপনার মত সদাশয় মানুষ খুব বেশি নেই।' তারপর কুলিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে লখা। এর আগে ও একবার কাজের ধান্ধায় শহরে এসেছিল। কিন্তু শহরের মানুষের পরিচয় পেয়ে বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় সে আবার গ্রামে ফিরে গেছিল। ওর মতে শহরের লোকমাত্রই খারাপ, তারা লোককে ঠকায়, কাজের মর্যাদা দেয় না। অথচ আমি শঙ্করের কাছে কেবলই প্রশংসা শুনছি আপনার। এসে অবধি শঙ্কর শুধু সেকথাই বলছে। শুনে ভাবলাম—শহরের সব লোক খারাপ হতে যাবে কেন—আপনার মত মহানুভব লোকও তো আছেন।'

ঈশ্বর পেটলিকার (১৯১৬) গুজরাটের প্রথিতযশা সাহিত্যিক। অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর রচনায় প্রধানত মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার বিকাশের রূপটি চোখে পড়ে। সমাজ সচেতন এই মানুষটি অনেক পুরস্কার অর্জন করেছেন। 'সংসার' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক। এঁর এই গল্পটি অনুবাদ করেছেন সুকৃতি রায়চৌধুরী।

শ্রীমন্তকুমার জানা

আশাবাদী কবি

উপনিষদে বলা হয়েছে 'আনন্দমৃতমরূপম্ যদ্বিভাত'।এই বিশ্বজগতে যা কিছু প্রকাশিত হচ্ছে সবই আনন্দময় রূপময়। ঔপনিষদিক এই আনন্দবাদের মধ্যে আশাবাদের কথাও একই সঙ্গে ধ্বনিত। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আনন্দময় চেতনা থেকেই মানুষ গভীর আশা-ভরসায় উদ্দীপ্ত হয়ে জীবন সাধনায় ব্যাপৃত থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন—'জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের আত্মিক সত্তার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের নামই পথ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই পথ চলারই ইতিহাস।

সৃষ্টির বিবর্তনের ধারায় যেদিন মানুষের জন্ম হল—সেদিন তার অবস্থা ছিল 'স্থূল কলাকৌশল বর্জিত'। তারপর উত্তরোত্তর জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায়, নিত্য নূতন আবিষ্কারে ও বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তিকে পরাভূত করে কাল থেকে কালান্তরে ঘোষণা করল বিজয়ী প্রাণের বার্তা—সুন্দর করে তুলল জীবনের বাসভূমিকে। তার যাত্রাপথে দুর্যোগ সংকট ঘনীভূত হয়ে এসেছে,—গ্লানিভারে নত হয়েছে তার মন—প্রবল প্রচণ্ড বিরুদ্ধশক্তি কত মানুষের প্রাণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তবুও মানুষ থামে নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড়বৃষ্টি—সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে···। আরোর দিকে প্রকাশের এই কূল খোয়ানো অভিসার যাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটা পথে পদে পদে রক্তের পদচিহ্ন এঁকে।"

কবির মতে মানুষের জীবনের ধর্মই হচ্ছে—ceaseless adventure into endless further." এটা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত একটা প্রেরণাশক্তি—একটা বলিষ্ঠ আদর্শ। শুধুমাত্র ব্যবহারিক সুযোগ-সুবিধা ও দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যলাভই হিউম্যানিজম বা মানবিকতার আদর্শ নয়। তা যদি হত, তবে পৃথিবীর বহু জ্ঞানী, সাধক ও দেশপ্রেমিকদের স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করে নেওয়ার পিছনে আমরা কোন কারণ খুঁজে পেতাম না।

মানুষের অন্তর্নিহিত Surplusman বা 'বড় আমি'র প্রকাশের মধ্যে

মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনা। পশুর সঙ্গে এখানেই মানুষের বিস্তর প্রভেদ। পশুরা খায়দায়, বংশবৃদ্ধি করে। এই জৈবজীবনের উর্ধ্বে তার আর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে মননশক্তি—তাই জগৎজুড়ে চলেছে তার সাধনা—তার জীবনের আনন্দ যজ্ঞ।

কবি হিসেবে জগতে আনন্দযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ। তিনি আশাবাদী আনন্দবাদী কবি ও বিশ্বানুভূতি প্রকাশের কবি। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—"Rabindranath worked for supreme cause, the union of all sections of humanity in sympathy and understanding. The eternal personality of man can spring into being only from the harmony of all people."

এই উপলব্ধি কবির সমস্ত অন্তর জুড়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। নৈরাশ্যবোধ কণ্টকিত অন্ধকার গুহাগর্ভ থেকে যথার্থই এখানে কবি আত্মার নিক্রমণ ঘটল দিগন্ত প্রসারিত মানবজীবনের রাজপথে। মানবজীবনের সম্পর্কিত দুটি বিশিষ্ট আদর্শ এই কবিতার লক্ষিতব্য বিষয়—'আমি ভাঙিব পাষণ কারা', 'আমি ঢালিব করুণাধারা'। কবির কাজ শুধুমাত্র নির্বিকল্প রসসাধনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি নয়। জীবনের সর্বপ্রকার তামসিকতা দূর করে মানুষের কল্যাণসাধনের অভিপ্রায়কে শিল্প সৌকর্যমণ্ডিত করে তোলাই বড় কবির কাজ। এই অর্থে কবি ক্রান্তদর্শী—যিনি মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে এক অচ্ছেদ্য ভাবসূত্রে গ্রথিত করে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলেন। দ্বিতীয়তটি হলো—অখণ্ড পরম মানবতার আদর্শ—'মহাসাগরের গান'। দেশে দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিতে আচারে ব্যবহারে, ধর্মকর্মে পোষাকে পরিচ্ছদে আহারে বিহারে কতই না পার্থক্য। কিন্তু অন্তরের বৃহৎ মানবতার দিক থেকে সকলে এক—সকলে এক বৃহৎ মানব পরিবারের সন্তান। বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সবাই এক।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবি এক বিপুল সর্বব্যাপী আশায় উৎফুল্ল—

'এত কথা আছে এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

এবং 'আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল-পারা।'

এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি জীবনের ভূমিকা নামে অভিহিত করেছেন। বস্তুতঃ তাই। এখানে তিনি অন্তরের অনুভূতিতে যে বস্তুকে

লাভ করলেন তা উত্তরোত্তর জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে বিচিত্র কর্মে ও ভাবনায়।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় আনন্দানুভূতি, আশাবাদ ও বিশ্ববোধ নিয়ে জীবন সম্পর্কে বৃহৎঅস্তিত্ব চেতনার যে অভিব্যক্তি তা কবি হৃদয়ের স্বয়ম্প্রকাশ, নিগূঢ় সত্যোপলব্ধি—'অয়মহং ভো'। পরবর্তী কালে উপনিষদ দর্শন, বাউল সংগীত ও মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের চিন্তাধারা এক পাশ্চাত্ত্য মনীষার সঙ্গে পরিচিতি লাভের ফলে তা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথিক'—অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের এই কবি-পরিচিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের পথ মানবমৈত্রীর পথ। মানব-ভাগ্যের এই মহত্ত্বের প্রতি কবি চিরদিন গভীর বিশ্বাসী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন পরাধীন ভারতবর্ষে—যখন বৃহৎমানব সমাজ ছিল চিন্তার ক্ষেত্রে পঙ্গু, দুর্বল ও আত্মঘাতী। আর সাধারণ মনুষ্যসম্প্রদায় ছিল উৎপীড়িত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য কবির চিন্তার শেষ ছিল না। মানুষের সীমাহীন দৈন্যের মধ্যে বার বার তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ভগ্ন ক্লিষ্টাকীর্ণ আমাদের জাতীয় জীবনে তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।' হতবীর্য গতসুষমা প্রাণ সমগ্র জাতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পুনর্জীবন লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের আশাবাদের মূলভিত্তি 'ঔপনিষদিক দর্শন'। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে—বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও মনীষার সঙ্গে কবির পরিচয় লাভের ফলে কবির মানব ভাগ্য সম্পর্কিত আশাবাদ বলিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল। দেশে দেশে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার যে বিজয়ভেরী মন্দ্রিত হচ্ছে—কবির সাহিত্যসাধনায় তা একাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি—আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।'—এ কথা নিছক ভাববিলাস নয়।

বারোবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বিশ্ববাসীকে তিনি পরমাত্মীয় করে নিয়েছিলেন। অখণ্ড বিশ্বছিল তাঁর বাসভূমি—তাঁর বিশ্বরূপের খেলাঘর। বিশ্বমানব প্রীতি, মৈত্রী ও কল্যাণের দ্বারা বিশ্বমানবের হৃদয় জয় করাই ছিল কবির জীবন সাধনার চরম আদর্শ। তার ধর্ম ছিল মানুষের ধর্ম—'The religon of man,' মানুষের নারায়ণ বা নরদেবতাই ছিল তাঁর আরাধ্যদেবতা। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা দিয়ে যারা আবির্ভূত

হয়েছিলেন অস্ত্র নিয়ে, বাণী নিয়ে ;— যাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ, তাঁরাই দেবতা। এখানে কোনো দেশকালের ভেদ নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কবিকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় ইংরেজী গীতাঞ্জলির জন্য। য়ুরোপে যন্ত্র সভ্যতার প্রসার ঘটছে এবং মূলতঃ তারই চাপে মানবতার মূল্য অস্বীকৃত। মানুষের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য নেই। রাষ্ট্রে সমাজে, শ্রমিকে ধনিকে, স্বামীস্ত্রীতে পারস্পরিক অবিশ্বাস সন্দেহ সংঘর্ষ প্রকট হয়ে উঠেছে। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি শোনালেন মানবমহত্ত্বের আদর্শ—জীবনের অপরিসীম মূল্যবোধ। বোধ করি, এই জন্যই মানবতা নিপীড়িত য়ুরোপে গীতাঞ্জলির এত জয় জয় কার। শুধু এই নয়, পূর্বপশ্চিমের মিলনের কথাও কবি সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করলেন—'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার / সেথা হতে সবে আনে উপহার / দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে / যাবে না ফিরে / আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'।

অল্প সময়ের মধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল ভিন্ন পথে। শুরু হল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ। মানুষের তৃপ্তিহীন রাষ্ট্রস্বার্থগত প্রচণ্ড লোভ আপন পশুপ্রকৃতিকে রক্তাপ্লুত করে নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ ঘটাল। কত মানুষের প্রাণ গেল—কত গ্রাম শহর পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার হিসেব নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর দাউ দাউ করে শ্মশান জ্বলল। য়ুরোপের এই 'ছিন্নমস্তা' ভয়াল রূপ দেখে শুধু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নয়—রাষ্ট্রপতিদের কেউ কেউ শিউরে উঠলেন। আর যুদ্ধ নয়, আমরা স্থায়ী শান্তি চাই। যদি কোনো রাষ্ট্র পুনরায় যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়—তাকে বাধা দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তৈরী হল লীগ অফ নেশন'। কিন্তু প্রথম থেকেই এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের তেমন আস্থা ছিল না। কারণ ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ বাইরের থেকে জোড়াতালি দেওয়ার মতো। এটা ছিল একটা যান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। ভিতরের মানুষের চিত্ত জেগে না উঠলে—মানুষের আত্মার উদবোধন না ঘটলে সবই অচিরে পণ্ড হয়ে যায়। লীগ অফ নেশনও তাই বেশিদিন টিকল না। এরই ছত্রছায়ায় অবস্থান করে গোপনে গোপনে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি পরবর্তী যুদ্ধের জন্য যোগাড়যন্ত্র করতে থাকল।

এ সব সত্ত্বেও, জীবনের সমস্ত অপচয় থেকে মানুষ একদিন মুক্ত হবে—মনুষের সঙ্গে মানুষের যথার্থ মিলন সংস্থাপিত হবে—এই ছিল কবির চিরায়ত বিশ্বাস। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বাইরে যতই পার্থক্য থাকুক—অন্তরের 'এক মানবধর্ম' বা উদার মনুষ্যত্ববোধের দিক্ থেকে কোনো পার্থক্য, কোনো

বিরোধ নেই। সংস্কৃতিচর্চা ও আদর্শ সমন্বয়ের দ্বারাই মানুষের আত্মিকসত্তার উদ্‌বোধন ঘটতে বেশী সময় লাগে না এবং সেখানে মিলনটাও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। কিপলিং সদম্ভ উক্তি করেছিলেন—'The East is East and the West is west and the twin shall never meet.' শুধু চিন্তায় ও ভাবসাধনায় নয়, বাস্তবকর্মে রবীন্দ্রনাথ কিপলিং-এর উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করে। প্রাচ্য প্রাচ্যই, পাশ্চাত্ত্য পাশ্চাত্ত্যই ঠিক—তবুও দুয়ের যে আত্মিক মিলন যে বাস্তব সত্য হতে পারে তার জাজ্বল্য প্রমাণ 'বিশ্বভারতী'।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা আশাবাদী রবীন্দ্রনাথের এক মহত্তম কীর্তি। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় মনীষী অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়েছেন কিন্তু বিশ্বভারতী অদ্বিতীয় ও তুলনা রহিত। মহামানবের ছোট্ট সাগরতীর বলা যেতে পারে একে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু মনীষী এখানে মিলিত হয়েছেন মানবমিলনের মহাযজ্ঞে। সংস্কৃতিচর্চায় যথার্থ এক বিশ্ব রচিত হতে পারে—যত্র বিশ্বভবত্যেকম্ নীড়ম্, তার প্রমাণ বিশ্বভারতী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের মিলনের কথা বার বার ঘোষণা করে আসছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি একান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পশ্চিম বিজ্ঞানের জোরে বাস্তব জগৎকে জয় করেছে এবং প্রভূতবিত্তশালী হয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে। কিন্তু সর্বতোভাবে পশ্চিমের অন্তরে আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটেনি। তাই ওখানে মানুষে মানুষে এত বৈষম্য, এত স্বার্থসংঘাত। আর প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারত আধ্যাত্মিক আদর্শে উন্নত—যুগে যুগে ভারত সকল মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেছে—তার অন্তরদুয়ার চিরকালই উন্মুক্ত। পরকে আপন করে নেওয়ার সহজাতপ্রবৃত্তি ভারবর্ষের। কিন্তু আধুনিক ভারতের বড় ত্রুটি—তারা বস্তু জগতের সাধনা করেনি। তাই রোগে শোকে আর্থিক অনটনে ও বহুবিধ দুর্দশায় এরা পর্যুদস্ত। কবি জীবনের এই দুঃসহগ্লানি দূর করার অবিচলিত নির্দেশ দিলেন—'আমাদের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে।' কিন্তু তখন দেশে এই আদর্শের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই কবি আপন হাতে গড়ে তুললেন বিশ্বভারতী। কবির আশা বাস্তবে রূপায়িত হলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর রক্তস্নাত রূপ দেখেও

পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়কদের লোভ দূরীভূত হয়নি। নিতান্ত দায়ে পড়ে তারা 'লীগ অফ নেশনের' বিধানকে মেনে নিয়ে ছিলেন। তাই শীঘ্র তাসের ঘরের মত এই শান্তিপ্রচেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পৃথিবী জুড়ে সুরু হল মানবতার উপর মহামারীর প্রকোপ। মানুষ শুভবুদ্ধির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের অনেকে বর্বরতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাবার সাহস পেলেন না। সভ্যতার সংকটকে সভ্যতা বলেই শ্লেষের আবরণে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রেখে গেলেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকেও আমরা দারুণ বিচলিত হতে দেখি। মানুষ সম্পর্কে কবির যে শুভ আস্থা ছিল—চারদিক থেকে তার উপর পড়ল প্রচণ্ড আঘাত। তাই আমরা দেখি কবিচিত্ত জীবনের শেষ দশকে দারুণ যন্ত্রণাবিদ্ধ। তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'পূরবী' থেকে শেষের দিকের সমস্ত রচনাবলীতে। তবুও কবি হাল ছাড়েন নি। ঝটিকাসংক্ষুব্ধ তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে ব্যাতাতাড়িত তরণীকে যেমন দক্ষ কর্ণধার স্থির লক্ষ্যে পরিচালিত করে—আমাদের মহাকবিও তেমনি শতবিপর্যয়ের মধ্যে মনুষ্যত্বের আদর্শে অচল-প্রতিষ্ঠ।

এর প্রমাণ মিলে 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়ে কবি সভ্যতার সংঘর্ষের মধ্যেও সভ্যতার নবজন্মের কথা ঘোষণা করে গেছেন। টমসন সাহেব যথার্থই মন্তব্য করেছে—রবীন্দ্রনাথ আর্তমানবতার অতন্দ্র প্রহরী—Occasionally the earth relapses into Barborism and to save her sentinels of time appear. Rabindranath is the greatest of them.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জীবনের অন্তিম প্রান্তে এসে কবি মানব-ভাগ্য সম্পর্কে গভীর আশা ভরসার বাণী শুনিয়ে গেলেন যে বিশ্বব্যাপী যতই প্রলয় দুর্যোগ ঘনিয়ে আসুক না কেন এরই মধ্যে পরিত্রাণ কর্তার জন্ম আসন্ন হয়ে আসছে। কবি ব্রাউনিং-এর মতো রবীন্দ্রনাথেরও চিরায়ত বিশ্বাস—

"And what is our faliure here, but a triumph's defence
For the fullness of the day."

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের পরিত্রাণ কর্তার অপর নাম কবির সুদীর্ঘকাল পূজিত মহামানবিক আদর্শ—ইতিহাসের মধ্যে যে আদর্শের মূর্তরূপ দেখেছেন বুদ্ধ, খৃষ্ট, ও আরো অনেক মহামানবের জীবনে। সামগ্রিকভাবে মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটলেই মহামানবের জন্ম ঘটবে। পৃথিবীর সব মানুষ বর্বর নয়, পশু নয়। কবির মতে—'...জগৎটাতে

ভালোটারই প্রাধান্য, মন্দ যদি তিন চল্লিশ ভালোর সংখ্যা সাতান্ন'। কবির সমস্ত সাহিত্যে রয়েছে মনুষ্যত্বের পুনর্জন্মের কথা—"জাগো নির্মল, জাগো সুন্দর, জাগো জড়ত্ব-জয়ী।" রক্ত ক্লেদপিচ্ছিল অন্ধকার যোনি গর্ভ থেকে বারে বারে বিজয়ী প্রাণের শঙ্খধ্বনিতে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে—'জয় হোক চিরজীবিতের'। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—ভারতে যখন অধর্মের অত্যাচার শুরু হবে—তখন তিনি সুকৃতের রক্ষা এবং দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হবেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রচিত সভ্যতার সংকট প্রবন্ধটি বিশ্বমানবের উদ্দেশে রচিত অভিনব গীতা। সমস্ত বিশ্বাকাশ জুড়ে নরখাদক শকুনির দল পাখা বিস্তার করে আসুক—তার পিছনেই আসছে মহাপারিত্রাণকর্তা—কাজেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই—কেবল মরণ-বাঁচন তুচ্ছ করে বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,—'হবে জয়, রে নির্ভয়।' গীতাঞ্জলির একটি গানে কবি বলেছিলেন—'জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব, এ মোর নিবেদন।' কবি জয়ধ্বনি শুনিয়ে গেলেন—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে···নরলোকে বাজে জয়ডঙ্কা।"

সুভাষ সমাজদার

দৃশ্যান্তর

অন্ধকার আকাশ।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। তালপুকুরে শব্দ উঠছে—গুপ্ গুপ্ গুপ্—শাঁশাঁ বাতাসে তালগাছের পাতায় পাতায় থর থর শব্দ উঠছে। সেই দুর্যোগ মাথায় করে তারক এসে দাঁড়াল তালপুকুরের পাড়ে ঝাপড়া বটগাছটার নীচে। হাতের স্যুটকেশটা ভিজে বেশ ভারি ভারি ঠেকছে। মাথায় কোঁকড়ানো ঘন চুলের গোছা বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরছে। কড়া ইস্ত্রীর টুইলের শার্টটা ভিজে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। কিন্তু সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তারকের। তার মাথার ভেতরটা জ্বলছে। সারা শরীরের রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুন ছিটিয়ে দিয়েছে! তার মনে হল হঠাৎ স্যুটকেশ থেকে বইগুলো বের করে একটা একটা করে তালপুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেমন হয়! কিন্তু একটা দমকা হাওয়া এল। আর বটগাছের পাতা থেকে টপটপ করে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টির মত জল ঝরে পড়ল মাথায়। বেশ বিরক্ত হয়ে সে বহুকালের প্রাচীন অশ্বত্থগাছটার দিকে তাকালো। এই সেই বটগাছ যেখানে গাঁয়ের মেয়েরা এসে ষষ্ঠীপূজা করে। তার ঠাকুমা তার মঙ্গলকামনা ক'রে এই গাছেরই গুঁড়িকে বেড় দিয়ে গুলিসুতো পেঁচিয়ে দেয়। কেউ কেউ আবার সন্তানের একশো বছর পরমায়ু প্রার্থনা ক'রে একশো পাক দেয়। নারায়ণ ঠাকুর গ্রামের পুরোহিত। সে এই গাছের গায়ে থপ থপ করে পাকা আমের চক লাগায়। তার ভেতরে মিষ্টি দই ঢেলে দেয়। মা ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। ফুলিশ-ফুলিস। রট্—সব রট্! সব বুজরুক। ভগবান ঈশ্বর দেবদেবীর নামে কতগুলো অনাথ আর অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে যুগযুগান্তর ধরে। আরে মা ষষ্ঠীর কাছে সন্তানের শুভ কামনা করছিস, আরো বেশি করে ছেলেপুলে চাচ্ছিস, আর যেগুলো তোদের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রোগে শোকে জীর্ণ, বিকৃত মনুষ্যত্বের এক একটা ভগ্নাংশের মত, তাদের জন্যে তোরা কি করছিস—কতটুকু করছিস—কতটুকু করতে পারিস? বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে সেই ঘন অন্ধকারে অন্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

বৃষ্টি পড়ছে। জমাট অন্ধকারের ঘন কালো পর্দা যেন ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছে বাতাসে ক্ষ্যাপা দৈত্যের মত তালগাছগুলো, প্রবলভাবে এ ওর গায়ে মাথা কুটছে। মড় মড় শব্দ করে বহুকালের পুরানো জামগাছটা ভেঙ্গে পড়ল। যাক-থাক—সব ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে যাক।

কড়—কড়—কড়াৎ—দূরে কোথায় বাজ পড়ল। বিদ্যুতের উগ্র সাদা আলোয় ঝলসে উঠল চারিদিক। মুহূর্তের জন্য তাদের চক মিলানো বাড়ির চকচকে টিনের চালটা একবার ঝিলিক দিয়ে উঠেই আবার গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেল। বাজটা ওই বাড়িটার ওপর পড়ল না কেন। পাপের আড্ডা—শয়তানের কারখানা—ওখানকার বাতাসেও বিষ আছে!

না। অভাব নেই সেখানে কোন কিছুরই। নাটমন্দির আছে, চণ্ডীমণ্ডপ আছে, বৈঠকখানা আছে, আছে অতিথিশালা। কিন্তু এখন নাটমন্দিরে চামচিকার আস্তানা; ভেঙ্গে পড়েছে চণ্ডীমণ্ডপ; বৈঠকখানার এখানে সেখানে ছাগলের নাদি আর অতিথিশালার সেই লম্বা চালাঘরে ঠাসা থাকে ভাঙ্গা অকেজো আসবাবপত্র! কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ সেখানে! হঠাৎ দেখলে মনে হয়,—মনে হয় একটা অবলুপ্ত কীর্তির মহাশ্মশান! তারক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নেমে এল তালপুকুরের উঁচু পাড় থেকে। বৃষ্টি ধরে এসেছে। কিন্তু আকাশটা ওলটানো কালো ড্রামের মত! চারিদিকে কালি ঢালা অন্ধকার। আর সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে মৃত্যুজীর্ণ গ্রামটা যেন জবুথবু হয়ে ঘুমিয়ে আছে! সে একটা প্রেতের মত ধীর পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। স্যুটকেশটা অকারণ একটা বোঝার মত মনে হল! ঠাসা বই ওর ভেতরে। কি হবে—কী লাভ ওগুলো বয়ে নিয়ে যেয়ে। আর কি কখনো খুলতে পারবে! এই প্রেতপুরীর অভিশপ্ত অন্ধকারে তাকে নির্বাসিত হয়ে থাকতে হবে—

নো, দি ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া—কানের কাছের ঝন ঝন করে বেজে উঠল একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—তোমার জগৎ তুমি সৃষ্টি করবে—সৃষ্টি করবে তিলে তিলে তোমার স্বপ্ন—তোমার আদর্শ দিয়ে।

একমাথা ঝাঁকড়া চুল। গোল গোল কাঁচের মার্বেলের মত লাল লাল দুটো চোখ। দৈত্যের মত বিশাল চেহারা। সঙ্গে একটা কালো গ্রেহাউণ্ড জাতের কুকুর। বাঘের মত চেহারা। তার নাম আত্মা। অদ্ভুত মানুষটা বলল, শোনো হে ছোকরা, ওয়াটারলু যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে বিপ্লবের। আজন্ম বিদ্রোহী, সান অফ রিভলিউশান সেই নেপোলিয়ান দূর

সমুদ্রপারের নির্জন দ্বীপে মৃত্যুর দিন গুনছে! জমিদার জোতদাররা সুযোগ বুঝে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই দারুণ ডিপ্রেশানের যুগে, যখন 'উইল' অর্থাৎ প্রত্যয়ের সমাধি হয়েছে সেই দুর্দিনে আমি লিখেছিলাম আমার বইখানা, দি ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া। দারুণ দুঃখের ভেতরেও আমি প্রত্যয়ের জয়গান করেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাসতে বলেছি বুঝলে—

দৈববাণীর মত কথাগুলোতে তারক বেশ জোর পেল। বইয়ের বাক্সটাকে আর ভারী মনে হল না। বাক্সভর্তি দর্শনের বই। শোপেন হাউয়ের কান্ট হেগেল, স্পিনোজা বার্গস কার নেই? তার মনে হল স্যুটকেশের ওই অন্ধকার অপরিসর জায়গায় বন্দী হয়ে শোপেন হাউয়েরের মত ওরা সবাই নিঃশব্দে চিৎকার করে তাকে প্রেরণা দিচ্ছে। বলছে এগিয়ে যেতে। বলছে মৃত্যুপুরীর ওই বাড়ীটার মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে।

ঝপ্—তালপুকুরের জলে ভারি একটা জিনিস পড়ার শব্দ হলো! চমকে উঠল তারক। লক্ষ্য করে দেখল, একটা তাল পড়ল! জলে তখনও আলোড়ন হচ্ছে। আর সেই প্রচণ্ড শব্দ হওয়ার পরই দেখা গেল তালপুকুরের উঁচু পাড়ে কালো কালো কতগুলো ছায়াদেহ ছুটোছুটি করছে! এই নিশি রাত। জঙ্গল সাপ-খোপের ভয়কে তুচ্ছ করে গাঁয়ের গরীবদুঃখী মানুষ তাল কুড়াতে এসেছে! জীবনচক্র ঠিক একইভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে। শত শত বছর আগেও এমনি ঝড় দুর্যোগের রাতে কুড়ানোর ধুম পড়ে যেত। সব ঠিক আছে। শুধু নেই সেই সুদৃশ্য ময়ূরপঙ্খী নৌকোখানা—আর নেই তালপুকুরের জলে জোতদার শিবেশ্বরের প্রমোদভ্রমণ।

শোনো,—আমার হাতটা ধরো। পড়ে যাবে ঘাটটা খুব পিছল, এঁটেল মাটি

কি যে জামাইবাবু আপনি করেন, রোজ রোজ কুসুমের কাজলপরা চোখে কপট রাগ ঝিকমিক করে।

শিবেশ্বর কথা বলে না। মেঘে ঢাকা চাঁদের মেটে মেটে আলোয়, তন্বী সুঠাম তনু কুসুমের আশ্চর্য সুন্দর মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে মধু খাওয়া মৌমাছির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক—অনেক দূর থেকে যেন নিজের মনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে কেন যে তোমার কাছে ছুটে ছুটে আসি।

আমার ভয় করে জামাইবাবু—ভয়! উঁচু গলায় হেসে ওঠে শিবেশ্বর। তবু অট্টহাসির শব্দ চারিদিকের অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে বয়ে যায় লহরে লহরে। ঝটকা দিয়ে টেনে তুলে নৌকো ছেড়ে দেয় শিবেশ্বর।

চাঁদের আলো আর রাশি রাশি তারার ছায়া বুকে নিয়ে দুলতে থাকে তালপুকুরের জল। আর সেই কাজলকালো জলে এক টুকরো অন্ধকার ছায়ার মত মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হেলেদুলে চলে জোতদার শিবেশ্বরের ময়ূরপঙ্খী!

তার চওড়া বুকে মাথা দিয়ে কুসুম বলে, ভাবছি এর পরিণাম কী।

কিসের কি? হোয়াইট লেবেল্ কেরুস্ ব্র্যাণ্ডির বোতলটা ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিয়ে শিবেশ্বর তার যৌবনপুষ্ট ভরাট দেহটার দিকে তাকায়। তার চোখে তীব্র লালসা দগদগে ঘায়ের মত জ্বলতে থাকে। ওমা, এই যে মাঝরাতে আমি তোমার কাছে। ঘরে আমার স্বামী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। অপরাধীর স্বীকারোক্তির মত আস্তে আস্তে বলে, তোমার ঘরে তোমার বৌ মানে আমার দিদি।

ধ্যাৎ তেরি—মেজাজটা মাটি করে দিও না মাইরী কুসুম, বলেই নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল তাকে। আর বাইরে চাঁদের আলোয় ভরা রাত্রিটা একটা মধুর সুখের অনুভবে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেল।

এসব কতদিন আগেকার কথা। ত্রিশ-চল্লিশ বছর হবে কি তারও আগের। কিন্তু এখনও—এখনও তালপুকুরের জলের কলরোলে কান পাতলে যেন শুনতে পাওয়া যাবে দুটো মুগ্ধ নরনারীর কূজন। অনেক ছন্দোসুরভিত মুহূর্ত—অনেক উচ্ছৃঙ্খল আর প্রমত্ত রাত্রির অনুরনণ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে তালপুকুরের জলে। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারক। এ সবই সে বড় হয়ে শুনেছে গ্রামের লোকের কাছে।

হাওয়া এল। হু হু করা ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে হাওয়া। হাওয়াটা যেন তারই নিস্ফল, উষর জীবন ভূমির ওপর থেকে বয়ে এল। টলতে টলতে বাড়ির বড় দেউড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। শালকাঠের মজবুত দরজা। কিন্তু নীচে ওপরে উই ধরেছে।

ক্যাঁ—চ্—ঠেলতেই আর্তনাদ করে উঠল সেই দরজার কবাট। নাটমন্দিরের সামনে উঠোনে পা দিতেই তার কানে এল আলকাপ বন্দনার গানের সুর—

হর হে এই কি
তোমার ব্যবহারো?
ঘোড়া ছেড়ে
ষাঁড়ে চড়ো॥

হর হে এই কি
তোমার ব্যবহারো ?
চন্দন ছেড়ে।
ভস্ম মাখো ॥
ভাঙ্ ধতরোতে
মত্ত থাকো।

মূল গায়েন প্রথা অনুযায়ী শিবের বন্দনা করে আলকাপ গান সুর করতেই কোমরে শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে মারমূর্তি হয়ে আসরে ঢুকল একটি স্ত্রীলোক। তারস্বরে চিৎকার করে বলল।

ওহে বুড়ো হবো হে
কিসের গৌরব করো হে
হামঘরে প্যাট ত নাই ভাত
গোলাত নাই ধান
কী দিয়া বাঁচামু ও হরো
চ্যাংড়া প্যাংড়ার জান।

এঙ্কোর—এঙ্কোর—বাহবা—বাহবা, স্ত্রীলোক বেশী অভিনেতাকে উৎসাহ, দিয়ে দর্শকরা বলে, হাঁ রে ক্যাকারু. তাক করে দিলু বাপ—আবার কয়েক এই গান—"তীব্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত আর অভিভূত দর্শকদের ভীড় ঠেলে আসরে এল জোতদার শিবেশ্বর।

গায়ে অ্যাণ্ডির চাদর। হাতে পানিংশোর কৌটো। সুগন্ধী আতর মাখানো দুষ্ট কালো গোঁফটা দুদিকে ঝুলে পড়েছে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত। চিৎকার করে বলল, ভাইসব শোন—ক্যাকারুর গান শুনে মুই খুবে খুশী হইছুঁ—অক মুই একশোটাকা আর একটা ম্যাডেল—

তুমুল হর্ষধ্বনি আর হাততালির প্রচণ্ড শব্দে ডুবে গেল শিবেশ্বরের গলার স্বর।

এই ওদিকে যায়েন নারে বাপু—আর একটা তিল ধারণের জায়গা নাই. নাটমন্দিরের দুই গেটে দুই লাঠিধারী বরকন্দাজকে ঠেলে ফেলে বেনোজলের মত হুড়হুড় করে ভিনগাঁয়ের একদল লোক আসরে ঢুকে পড়ল। শিবেশ্বরের দুটো চোখ দুখণ্ড আগুনের মত ঝকমক করে উঠল। চিৎকার করে বলল, মোর বরকন্দাজের কথা অমান্যি ক্যান তোমরা আজরোত ঢুকেছিল—গান শুনবা হাউস হইছে বাবু—তাদের একজন হাতজোড় করে করুণ গলায় বলল।

কিন্তু তাদের চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তীরগতিতে বাড়ির ভেতরে গেল শিবেশ্বর। ফির এল হাতে একটা ডবল ব্যারেলের বন্দুক নিয়ে। বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমরা যাবেন কিনা বলেন—

যাচ্ছি—বাবু—যাচ্ছি—হামঘরে পাণে (প্রাণে) মারবেন না বাবু—লোক-গুলো উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল। তারপরে আর আলকাপ গানের আসর জমল না।

এ সেই নাটমন্দির! এখন এখানে অভিশপ্ত শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে। কড়িকাঠে হাজার বাতির ঝাড় লণ্ঠনটা ঝুলছে। ঝুলে কালিতে আর সেটাকে চেনা যায় না। বৈঠকখানা ঘরে দেওয়ালে টাঙানো স্নানরতা নগ্ন নারীমূর্তির ছবিটার কাঁচ ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে—এখন শুধু ছবিটা বাতাসে উড়ছে। বাতাসে কেমন সোঁদা সোঁদা একটা দুর্গন্ধ। কতদিন ঝাঁট পড়ে না। সেই নিশিরাতে নির্জন নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে, পুরানো স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল তারক। আর তালপুকুরের বুকে ময়ূরপঙ্খীতে নৈশ বিহার, আলকাপগানের আসর থেকে বন্দুক দেখিয়ে লোক তাড়িয়ে দেওয়া আরও কত সাবেকদিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরল তাকে। তার মাথার ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যেতে লাগল। ওই বৈঠকখানায় ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে বসতো মদের আসর। ওই মদের আড্ডার বেলাল্লা ফূর্তি তালপুকুরের জলে গোপন অভিসারের জন্যেই তাকে ইউনিভারসিটির পড়া ইস্তফা দিয়ে চলে আসতে হয়। ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। কাণ্ট-হেগেল-শোপেনহাউয়ের স্পিনেজার বই। ফিরে আসতে হয় এই শ্মশানপুরীতে। এখান থেকে চিঠি যায় সংক্ষিপ্ত চিঠি,—আর খরচ চালাতে পারছি না—

হবে—তাই হয়—এই নিয়ম—ডায়লেকটিক মেটিরিয়েলিজম বোঝো তো? থিসীস—অ্যান্টিথিসীস—সিনথিসীস চক্রবৎ পরিবর্তন্তে বুঝলে, সুখের পরই দুঃখ আসে, আলোর বহুদূর থেকে হেগেলের গলার স্বর শুনতে পেল।

কে ওখানে দাঁড়িয়ে? দূরে উঠোনের এককোণে জমে থাকা অন্ধকারটাই যেন চীৎকার করে উঠল। তারক স্যুটকেশটা সশব্দে নামিয়ে রেখে সামনে এগিয়ে গেল।

কি? বাবা তারক এসেছিস! চিঁ চিঁ করে বলল সে। তারকের মনে হল, ভগ্ন আর বিধ্বস্ত কোন মন্দিরের ভেতর থেকে এই বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। মুখ তুলে তাকালো সে! তার চোখের অন্ধকার দুটো কোটর থেকে যেন দুটো লকলকে অগ্নিশিখা তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কুকুরের কান্নার মত

অদ্ভুত শব্দ করে হাসল সে। ঘেন্সিয়ে ঘেন্সিয়ে বলল, খোকা তুই এসে পড়েছিস বাবা। ভালো হয়েছে। আমি আর তোর পড়ার খরচ—

পড়াশুনা ডকে তুলে দিয়ে এই গণ্ডগ্রামে বসে কি করবো শুনি, গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে বলতে চেয়েছিল সে। ফিকে অন্ধকারে তার কঠোর মুখ রাগ রাগ চোখদুটো ঠাহর করতে পেরেই বোধহয় নিভু নিভু গলায় আবার সে বলল, গাঁয়ের চাষাভুসোরা সব পার্টিতে নাম লিখিয়েছে খোকা—ডুগডুগি বাজিয়ে জমি দখল করে নিচ্ছে বাবা—

একটা কথাও বলল না তারক। লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে গেল সেই নৈশ প্রমোদবিহারের আর বহু উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির নায়ক স্বয়ং শিবেশ্বর। তারকের গলা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এল তার মা সাবিত্রী। কিরে খোকা তোর বাবা চিঠি দিল অমনি সুবোধ ছেলের মত চলে এলি।—তুমি কেমন আছো মা? নরম চোখে মা-র মুখের দিকে তাকালো তারক। যেন অনেক—অনেকদিন পর মায়ের মুখের দিকে তাকালো সে। মুখখানা যেন একখণ্ড পোড়া পাথর। বহু যুগ যুগান্তরের ঝড় দুর্যোগ বয়ে গিয়েছে তার ওপর দিয়ে। জোতদার শিবেশ্বরের উচ্ছৃঙ্খলতার আর এক বলি তার মা। গভীর সহানুভূতিতে ভিজে উঠল তার মন। তুই একটা চাকরি-বাকরি কিছু কর তারপর আমি এবার তোর বিয়ে দেব বাবা, আর একা একা পারছি না।—বিয়ে! চমকে উঠল তারক। খাপ খোলা তলোয়ারের মত ঝকঝকে একটা মেয়ের ছবি ভেসে উঠল মনের ভেতরে। সুতপা! তার সঙ্গে এম. এ. পড়ে ফিলজফিতে। পার্টি করে। তার মুখে ডায়লেকটিক মেটিরিয়েলিজমের কথা। কার্ল মার্কসের ম্যাক্সিমাম গুড ফর দি ম্যাক্সিমাম পিপলের কথা! আরও সুদূরপ্রসারী কত চিন্তাশীল কথাবার্তা বলে সে। এই কবরের মত সংকীর্ণ আর অন্ধকার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আর এক অজানা পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে সে তার কাছে।

কিরে চুপ করে আছিস যে?

কি বলবো মা, জমিজিরেত বলতে তো নামেই তালপুকুর, ঘটিও ডোবে না তাতে। একটু থেমে বলল, হাল নেই। বলদ নেই। জমিগুলো আগাছার জঙ্গলে ভরা—এসব নিয়ে আমি কি করবো বলতে পারো মা—

ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্—দূরে বহুদূরে ফাঁকা মাঠের দিক থেকে ডুগডুগির শব্দ ভেসে এল। আতঙ্কের ছায়া ফুটল সাবিত্রীর চোখে। আস্তে আস্তে বলল, জানিস কিষানরা ডুগডুগি বাজিয়ে জমি দখল করে নিচ্ছে—

বীরপায়ে বাইরে এল তারক। দূরে ভূতকুঁড়ির পাথারের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরছে জনকয়েক মানুষ। থেকে থেকে ডুগডুগি বাজাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, ভাইসব, শুনে রাখেন আজ থি এই জমিন হাম ঘরে হবি —ই—ই ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্—

ওই তো দেখা যাচ্ছে পূর্ণ, গোবরা, অধীর, জটিল, যারা তাদের জমি চাষ করতো, যারা ছিল আধিয়ার তারাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—তাদেরই জমি জোর দখল করছে। থিসীস-অ্যান্টিথিসীস—সিনথিসীস—হবে-হবে তাই হয়-তাই হবে,—এ অনিবার্য!

দিন শেষ হয়ে রাত নামল।

সারাদিন শিবেশ্বরকে বাড়ির কোথাও দেখা গেল না। তারক একটু অবাক হলো, মা-র মুখে দুশ্চিন্তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই! কিন্তু তার বড় প্রয়োজন বাবাকে এখুনি। পরিষ্কার বলে রাখবে—

প্রহরে প্রহরে রাত বেড়েই চলল, তবুও শিবেশ্বর এল না। কি রে, বাবা না এলে তুই খাবি না খোকা—

না।

শুবিও না—

না বাবার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে মা—কালিপড়া লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল তারক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকালো। কিছু বুঝতে চেষ্টা করল। তার মনে হল, একটা ঝড় আসছে! আসুক, সব ভেঙ্গেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিক। বহুদিন বহুকাল সে এই পাপপুরীর অন্ধকার কারাগারের দেওয়ালে নিষ্ফল মাথা কুটেছে—এইবার—এইবার একটা হেস্তনেস্ত কিছু হয়ে থাক—

কি কথা আমাকে বলবি না বাবা?

তুমি দুঃখ পাবে মা, একটু থামল। অন্ধকারে দেখতে পেল না, সাবিত্রীর ম্লান মুখে হাসি ঝিকমিক করছে। তুই নিশ্চয়ই কলকাতা ফিরে যাবি—না রে? কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই হঠাৎ তীব্র আক্রোশে জ্বলে উঠল সাবিত্রী। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, পালিয়ে যাবিই তো—আমাকে এই শ্মশানপুরীতে রেখে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়তে একটুও লজ্জা করছে না তোর? বলতে বলতে চাপা কান্নায় আড়ষ্ট হয়ে গেল তার গলার স্বর। কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, যে আমাকে সারাটা জীবন ভাজা-ভাজা করে

দিয়েছে, যা-র জন্য তোকে পড়া ইস্তফা দিতে হয়, তাকে তো কিছু বলতে পারবি না—অঝোর কান্নায় তার বাদবাকী কথাগুলো তলিয়ে গেল।

তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো মা—করবো—সেজন্যেই তো দেখা করতে চাচ্ছি—

খুট্—হঠাৎ বাইরে একটা সন্দেহজনক শব্দ হলো, তারক ছুটে বাইরে এল। কে—কে—ওখানে? তার চিৎকারটা দূরদূরান্তরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। কোথাও কাউকে দেখা গেল না।

ঘুম নেই তারকের চোখে। জ্বালা করছে চোখদুটো। না, সে পারবে না এই দারিদ্র্যজীর্ণ সংসারটাকে টেনে তুলতে! সে পালাবে। ভাগ্য অন্বেষণ করবে মহানগরীতে।

পরদিন ভোর হতে না হতে তারকের দরজায় কড়া নেড়ে সাবিত্রী বলল, খোকা উঠে যা দেখ—মানুষটা সারারাত এল না—কোথাও হয়তো মদ গিলে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে—

ভেতর থেকে সাড়া নেই। দুরু দুরু কেঁপে উঠল সাবিত্রীর বুক, কি হলো খোকার! একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। আর ছ্যাঁৎ করে উঠল সাবিত্রীর ভেতরটা। তারক নেই!

নেই তার বইভর্তি সেই স্যুটকেশটাও। সিল্কের ওড়নার মত নরম হলদে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তবিসারী প্রান্তরে! ধানকাটা ফাঁকা মাঠ খাঁ খাঁ করছে। হাতে স্যুটকেশ নিয়ে হন হন করে চলেছে তারক। এখান থেকে ছয়মাইল দূরের শহর বালুরঘাটে গেলে কলকাতার বাস পাওয়া যাবে—মানুষটা পাগল হইছে, বাঁহে হাম ঘরে ডাকে ডাকে জমিন দান করি দ্যাছে—জনকয়েক কিষান নিজেদের ভেতরে কথা বলতে যাচ্ছে।

ও কী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারক। দাঁড়াতে হলো! দূরে বোয়ালদাড়ের দিকে তাদের জমিতে অনেক লোকের ভীড় কেন! সেখানে যেতেই থমকে দাঁড়ালো তার হৃদস্পন্দন—শোন, জটিল, তুই পাবু দুকাঠা পাঁচ ছটাক—আর কাঁদনা—তোর তো খানেআলা কম। তুই বাপু পাবু এক কাটা—জোতদার শিবেশ্বর কাগজে লিখে লিখে গাঁয়ের কিষাণদের জমি দান করে দিচ্ছে। সেই শিবেশ্বর যে বন্দুক দেখিয়ে আলকাপ গানের আসর থেকে লোক তাড়াতো যার অজস্র দুষ্কৃতির পরিণাম তার চরম দারিদ্র্যজীর্ণ সংসার—তারই হাড় বের করা এবড়ো খেবড়ো মুখখানা কিসের আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তারকের মনে হল। বহুকালের পুরানো অন্ধকার কবর থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে নতুন মানুষ! ভীড়ের ভেতরে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল—তেমনি চলে গেল তারক।

ছবি মুখোপাধ্যায়

জননেতা

রজত সেন আজ তাঁর রাজ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাঁর মত জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বুঝি সেখানে সত্যিই কেউ হননি এতদিন। যেমন ছিলেন উপযুক্ত প্রশাসক তিনি, তেমনি ছিলেন সত্যিকারের মানবদরদী মানুষ রজত সেন। সে রাজ্যের রাজনৈতিক আবর্তে রাজ্যপাটের ভাঙা নৌকোর হালখানা যেমন করে তিনি শক্ত হাতে ধরেছিলেন, তেমটি আর কেউ কখনো পারেননি বুঝি এতদিন। আর তাই তিনি একাধারে যেমন সেখানকার শাসন চালিয়েছিলেন, তেমনি সেখানকার মানুষের ভালোবাসা আদায় করতে পেরেছিলেন নিজের ভালোবাসা দিয়ে তখন।

এসব অর্জন করতে অবশ্য রজত সেনকে অনেক ত্যাগ অনেক দুঃখ স্বীকার করতে হয়েছে সমস্ত জীবন ধরেই। নানা সংগ্রাম, নানা কঠিন পথ অতিক্রম করে তবে তিনি সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বিদেশী শাসকের হাতে যে তাঁকে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল, তা আজও সেখানকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এছাড়া সে রাজ্যের সব সমস্যার বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি সেখানকার কর্ণধার হয়েছিলেন বলেই আরও জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন তখন।

এর ওপরে তিনি ছিলেন নিঃস্ব এক মানুষ রজত সেন। নিজের বলতে সামান্য কিছুও ছিলনা তাঁর। অকৃদার ছিলেন তিনি। টাকা কড়ি বাড়ীঘর সঞ্চয় বলতে, সবের ঘরেই শূন্য জমা ছিল তাঁর। অবশ্য এতে নজর ফেলার সুযোগই ঘটেনি, সারাজীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকার ফলে। এই তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি নিজের দেহটাকেও দিয়ে রেখেছেন তাঁর মৃত্যুর পরে যাতে জনহিতকর কাজে লাগে সেটা। অর্থাৎ উইল করে রেখে গিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর দেহটা যেন স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজে দিয়ে দেওয়া হয় সেখানকার মড়া কাটার কাজের জন্য। চক্ষু দুটিও যেন দিয়ে দেওয়া তাঁর মৃত্যুর পরেই চক্ষু ব্যাঙ্কে। যাইহোক এ হেন মানুষেরও জীবনের একদিন ছন্দঃপতন ঘটে গেল। আর তাতেই তিনি ধুলুণ্ঠিত হয়ে গেলেন একেবারে। সেই সঙ্গে তাঁর সেই মহান্ বিরাট সংগ্রামী ভাব মূর্তিখানা হারিয়ে ফুরিয়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিন তাঁরই মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের পাশের ঘরে। এখানে তখন তিনি একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করতেন। একরকম এটাকে তাঁর আম দরবারখানা বলা হোতো তখন। কারণ, সে সময় তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা সোজাসুজি নিজের কানে শুনতেন। এই সময় একদল ছেলে নিয়ে এসেছিল তাঁর একান্ত অনুগত পুরোনো সহকর্মি অজিত সামন্ত। এসেই সে বলেছিল, রজতদা এরা আপনাকে একটা সম্বর্ধনা জানাতে চায়, আর তারই অনুমতি নিতে এ হসেছে আপনার কাছ থেকে।

রজত সেন সেকথা শুনে বলেছিলেন, কেন সম্বর্ধনা আবার কেন ?

তার উত্তরে অজিত সামন্ত বলেছিল, আপনার বাহাত্তরতম বছর এটা। তাই জন সাধারণ তথা যুব সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আপনার মত বরেণ্য দেশ সেবক—

—আচ্ছা তা নাহয় হোলো, বলে থামিয়েছিলেন তাকে। তারপর দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন তিনি, আহা তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো।

—নানা অত ব্যস্ত হবেন না আপনি, অজিতের সঙ্গে সঙ্গে ওই ছেলের দলের ভিড়ও বলে উঠলো তা।

এই সময়ে রজত সেনের চোখ গিয়ে পড়লো পেছন সারির একটা দিকে। আর তাতেই তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন একটু তখন, তারপর তিনি বললেন অজিতকে, হ্যাঁহে অজিত, এরা সব কোথাকার ছেলেরা, কোন অরগানাইজেশন থেকে আসছে সব ?

—আজ্ঞে এরা সব আমাদের তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা !

—ও। থাকে সব এরা কাছাকাছি, না বাইরেরও আছে এদের মধ্যে কেউ ? বলতে বলতে তিনি নিজের মনের মধ্যে কি যেন একটা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। আর তাতেই তিনি বেশ অন্যমনস্ক হয়ে উঠছিলেন তখন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাইরেরও আছে কেউ কেউ।

—আচ্ছা ঠিক আছে, এদের একটু ওয়েটিং হলে বসিয়ে তুমি এসো আমার কাছে, তারপর সব বলছি।

—আচ্ছা ঠিক আছে। বলে অজিত ছেলেদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল তক্ষুনি।

এই বেরিয়ে যাবার পর তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে ডেকে বলে ছিলেন তখন, আজ আর অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় হবে না। যারা ওয়েট করছে, বলে দেবেন অন্যদিন আসতে। বলতে বলতে তিনি যেন বেশ একটু তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

এরপর তাঁর সেক্রেটারী চলে যাবার পর ঢুকলো অজিত। ঢুকতেই তাঁর এক কেমন যেন উত্তেজনা প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন। কিন্তু তা নিজে নিজেই চেপে রেখে, অজিতকে তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বলে তারপর বলে উঠলেন, আচ্ছা অজিত, ওই যে পেছন দিকের সারিতে চেয়ারের ওপর হাতখানা রেখে দোহারা চেহারার ময়লা মতন লম্বা ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল, ও কে?

—আপনি দাদা সুমিতের কথা বলছেন?

—তা জানিনা, তবে ওই যে নীল রঙের সার্ট পরা লম্বা ছেলেটির কথা বলছি আমি।

—হ্যাঁ, ওই হোলো সুমিত।

—তা হোক, ওকি এখানেই থাকে না বাইরে ওর বাড়ী?

—কাছাকাছিই থাকে। কেন দাদা ওকে আপনি চেনেন নাকি?

—না, ঠিক তা না। তবে একবার ডেকে আনোতো ওকে।

—আচ্ছা নিয়ে আসছি এক্ষুণি, বলে সে তখুনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অজিতের এই বেরিয়ে যাবার পর তাঁর ওই চাপা উত্তেজনাটা যেন বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হোলো। তিনি বুঝি কিসের এক অভাবনীয়তার মুখোমুখি হতে চলেছেন তখন। যদিও একে কখনো কোনোদিন দেখেননি তিনি, তবুও এ যেন কত চেনা তাঁর। মনের মধ্যেটায় যেন তাঁর তখন তোলপাড় হতে শুরু হয়ে গেল দারুণ ভাবে।

এরপরই অজিত ঢুকলো ওই সুমিতকে নিয়ে।

ঢুকতেই তিনি সোজা হয়ে তাকালেন তার দিকে। তারপর অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে ওর দিকে। যেন এই আগন্তুক ছেলেটির মত কত ছবিই না দেখেছেন কতবার তিনি! যেন এ খুব চেনা তাঁর। কিন্তু তবুও তিনি মনে করতে পারছেন না কোথায় দেখেছেন একে, বা কার সঙ্গে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য ঘটে গেছে এর। বাস্তবিক তাঁর যেন সব খেই হারিয়ে যাচ্ছিলো তখন।

তাঁর এই রকম অদ্ভুত অন্যমনস্কতা দেখে, অজিত জিজ্ঞেস করেছিল তাঁকে, কি হোলো দাদা, কিছু ভাবছেন নাকি?

—না ও কিছু না, বলে তিনি তারপর সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। এরপর বসতে বলেন ওদেরকে একেবারে সামনের চেয়ার দুটোতে, তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন অজিতকে, কি বললে যেন এর নাম ?

—আঁজ্ঞে এ হোলো সুমিত দাদা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সুমিতই বলেছিলে তুমি এর নাম। তা বাবা তুমি থাকো কোথায় ? ছেলেটি বলেছিল, আজ্ঞে আমি এখানেই থাকি।

—কোথায় ?

—এখানকার কলেজ হোস্টেলে।

—কোন কলেজ হোস্টেল ?

—আজ্ঞে ডিষ্ট্রিক কলেজে।

—কিন্তু তোমার বাড়ী কোথায় ?

—আজ্ঞে রামনগর আমাদের বাড়ী।

—রামনগর, কোন রামনগর ? অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে একনিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন সেকথা।

—আজ্ঞে রামনগর রাজ জেলা।

—বাবার নাম কি ? বুঝি তাঁর উত্তেজনটা এবার একেবারে চরমে উঠে গিয়েছিল।

—আজ্ঞে ঈশ্বর রতন হালদার।

এইবার রজত সেনের চোখে এসে পড়লো সেই কতগুলো ছবি। সুজিত সেনের ছবি, রঞ্জিত সেনের ছবি, অভিজিৎ সেনের ছবি। সবাই এঁরা ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা। এঁদেরই মুখের ছায়া প্রতিফলিত হতে দেখলেন তিনি যেন এই সুমিতের মুখে এখন। এটাই এতক্ষণ ধরে তাঁর মনেতে তোলপাড় শুরু করেছিল ভীষণভাবে। আর তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে হাঁতড়ে বেড়াচ্ছিলেন সেটাকে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে আর একবার সুসংযত করে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন সুমিতকে আবার, বাবা কতদিন মারা গেছেন ?

—আজ্ঞে শুনেছি আমার জন্মের আগেই তিনি মারা গেছেন।

—আর তোমার মা ?

—তিনি বেঁচে আছেন, যদিও না বাঁচার মতই একরকম।

—কি রকম, কোথায় থাকেন তিনি ?

—আজ্ঞে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। আমার মামার সংসারেই তিনি এখন সকলের একরকম বোঝা হয়েই বেঁচে রয়েছেন।

এরপর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না রজত সেন। যেন তাঁর শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা উষ্ণ রক্ত প্রবাহ ত্বরিতে বিদ্যুতের মত বহে গেল। তারপর যেন চোখে নেমে এলো অন্ধকারের এক বিরাট যবনিকা। আর তক্ষুনি তিনি ধপাস্ করে পড়ে গেলেন তাঁর চেয়ারখানা থেকে।

এরপর শুরু হয়ে গেল সেখানে এক দারুণ হৈ-চৈ, পাসের ঘর থেকে তাঁর সেক্রেটারী ছুটে এলেন তক্ষুনি। অন্যান্য লোকজনেরাও এসে ভীড় করে দাঁড়ালো সেখানে। মুখ্যমন্ত্রীর দেহরক্ষিরাও ঘরের মধ্যে এসে পড়লো সঙ্গে সঙ্গেই। এরপর সবাই মিলে তাঁর জ্ঞানহারা দেহটাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে, তারপর শুইয়ে দিল পাশের ঘরে রাখা তাঁর একটা ডিভান গোছের আরাম কৌচেতে।

এরপর সেখান থেকে একেবারে সরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হোলো তাঁকে।

সেদিন হাসপাতালে আনার পর যখন জ্ঞান হোলো তাঁর, তখন জিজ্ঞেস করলেন তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে, অজিত কোথায় গেল আর তার সঙ্গের সেই ছেলেটিই বা কোথায় গেল ?

সেক্রেটারী তাতে বলেছিলেন, স্যার ডাক্তারের কথা মত ওদের সকলকে চলে যেতে বলা হয়েছে এখান থেকে।

—আঃ করেছেন কি ! যেমন করে পারুন ওদেরকে এনে দিন আমার কাছে। বলে তিনি উঠে বসতে গিয়েছিলেন। উপস্থিত থাকল নার্সের বারণ তখন একটুও শোনেননি তিনি।

সেক্রেটারী তাতে বলেছিলেন, ঠিক আছে স্যার এক্ষুনি তার, খোঁজ করছি।

—না না, খোঁজ করলেই চলবে না শুধু,তাদের যেমন করে হোক আমার কাছে এখুনি এনে দিন। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর যেন তখন ভেঙে পড়ছিল ব্যাকুলতায় একেবারে।

এতে সেক্রেটারী বলেছিলেন, আপনি এমন করে কেন বলছেন স্যার, আমি তো আপনার হুকুম তামিল করার জন্যেই এখানে আছি।

—না না আর ওকথা বলবেন না. সব মিথ্যে, সমস্ত আমার কাছে ধোঁয়া ঠেকছে সেক্রেটারী। ক্ষমতা কর্তৃত্বের মোহ আমার ঘুচলো বোধহয় এবার।

ফাঁকির ওপরেই যে আমার এই প্রতিষ্ঠা—একথা আজ আমি ভালো করে বুঝতে পেরেছি সেক্রেটারী। বলতে বলতে তিনি যেন এক দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

—বাস্তবিক আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি স্যার যে কেন আজ আপনি এমন করছেন, কি যে আপনার হয়েছে—যদি জানতে পারি, তাহলে—

—তাহলেও আজ আর কিছু করার নেই আমার। ব্যথায় হেসেই বললেন তা তিনি।

—সত্যিই ভাবতে পারছি না স্যার।

—হ্যাঁ সেক্রেটারী, ভাবনার অনেক বাইরে চলে গেছি আজ আমি। যান যান তাড়াতাড়ি যান, ওদেরকে নিয়ে আসুন আমার কাছে। খুবই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

এই সময় নার্স এসে বাধা দিয়ে বলে উঠলো তাঁকে, আপনি যদি স্যার একটু স্থির হয়ে না থাকেন, তা হলে এক্সাইটমেণ্টে আপনার—

—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি সিস্টার, সেরিব্রাল এট্যাক আমার, আর তার পরিণতিটাও কি তাও জানি আমি। তারপর হেসে একটু তিনি আবার বলেছিলেন সেক্রেটারীকে, আজ যা খুঁজে পেয়েছি আমি, তা যদি প্রকাশ করতে না পারি; তাহলে আমার জীবনের পূর্ণতাআসবে না। আমি অপূর্ণই থেকে যাব আজ নিজের কাছে, সকলের কাছেও। তারপর আবার তিনি বলে উঠেছিলেন, যাক নিয়ে আসুন তাদেরকে—সময় হয়ত আর পাওয়া যাবে না সেক্রেটারী।

—যাচ্ছি স্যার, এক্ষুনি নিয়ে আসছি ওদেরকে। বলে তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

এরপর সেক্রেটারী শুধু অজিত সামন্তকেই নিয়ে আসতে পেরেছিলেন রঞ্জত সেনের শয্যার পাশে। সুমিতের সন্ধান অনেক চেষ্টা করেও পাননি তিনি। সে সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের আদেশে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস ঘরখানা থেকে তার দলের ছেলেদের সঙ্গে, তারপর আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। অজিতও বলতে পারেনি সে তখন কোথায়!

এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর অসুখের খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সান্ধ্য দৈনিকের খবরের কাগজে ও সরকারী মেডিকেল বুলেটিনে সে খবর আরও বেশী করে প্রচারিত হয়ে চলেছিল তখন। তারপর আরও প্রচারিত হয়েছিল যে, তিনি নাকি ক্রমশঃই অধিকতর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

এইসময় অজিত সামন্ত এসে পড়ায় রজত সেন বলেছিলেন তাঁকে, অজিত তোমার জন্যেই ভাই আমি অপেক্ষা করে রয়েছি। কথাগুলো বলতে তাঁর তখন বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। তারপর ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন আবার, কই সুমিত কোথায় ?

—আজ্ঞে দাদা, লোক পাঠানো হয়েছে, এক্ষুনি এসে পড়বে।

—তুমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারলে না তাকে ?

—না দাদা, সে সেই যে বেরিয়ে গেছে আপনার শরীর খারাপ হওয়ার পর, তারপর আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে !

—ও। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন রজত সেন। এরপর ঘর থেকে আর সকলকে চলে যেতে বললেন তিনি একটু তফাতে। চলে গেলে আবার বললেন তিনি, অজিত জানিনা আর সময় হবে কিনা, তবে একটা জিনিসের ভার দেব তোমায়। সেটা কিন্তু তোমায় করতে হবে ভাই। বলতে বলতে তিনি যেন তখন খুবই হাঁপাচ্ছিলেন।

—এ আর এমন কি কথা ? আপনার নির্দেশ তো চিরদিনই মাথায় বহে নিয়েছি দাদা।

—না না, এ সে রকম কাজের নির্দেশ বা রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর কথা নয় অজিত, এ হোলো তার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ একটা। বলে তিনি একটা দম্ নিলেন তারপর।

—বেশতো বলুন না, নিশ্চই করবো আমি।

—তাহলে শোনো, আমার বাসার পড়ার ঘরখানায় যে ছোট্ট কাঁচের আলমারীটা আছে, তাতে রাখা আছে আমার বহু পুরোনো একখানা ছোট্ট চামড়ার সুটকেশ। সে সুটকেশটা আমার হাতে আগে তুমি অনেকবারই দেখেছো। দেখলেই তুমি সেটা বেশ চিনতে পারবে। একথা বলে একটু থামলেন তিনি। যেন বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকলেন তিনি আবার।

—বেশতো, তারপর ?

—তারপর, আবার একটু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলতে শুরু করে দিলেন আবার তিনি। বললেন, সুটকেশটার ভেতরে রাখা দেখবে একটা পিস্তল ও একটা কাগজের খাম। ওই খামের মধ্যে রয়েছে পুরোনো ডাইরীর এক গোছা ছেঁড়া পাতা। তাতে যা লেখা আছে তা প্রকাশ করার ভার আমি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি অজিত। দেখো এর যেন

অন্যথা কিছুতেই না হয়। বলতে বলতে এবার আবার অনেকক্ষণ থেমে তারপর বলেছিলেন তিনি ওই ছেঁড়া পাতাই হোলো বিশেষ একটা ছেঁড়া অংশ আমার। ওটা বাদ দিয়ে সত্যিই আমি অসম্পূর্ণ এ জগতে, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি আজ।

এরপর তিনি তাঁর চোখদুটো বন্ধ করে ফেলেছিলেন শারীরিক যন্ত্রণায়। সংগহীন হয়ে পড়েছিলেন আবার। আর তাই দেখে অজিত তখন চেঁচিয়ে উঠেছিল—কি হোলো বলে! আর তারপরেই বাইরে অপেক্ষা করা লোকজন সকলেই ঢুকে পড়েছিল চিৎকার শুনে।

যাইহোক এরপর অজিত রজত সেনের ওই ডাইরীর পাতা থেকে যে জীবন কথার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছিল সেদিন, তা হোলো এই :

একদা যৌবনে রজত সেন যখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিলেন বেহারের সব নির্জন পল্লীতে, তখনকার ঘটনা এটা। আর ওই ঘটনার ফল যে পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছেছিল তখন, তা তিনি এতদিন অন্তরালের অন্তরে সরিয়ে রেখেছিলেন একেবারে। মনে করেছিলেন ওই ঘটনাটা ছিল বুঝি তাঁর জীবনে দুঃস্বপ্ন একটা। অসতর্ক মুহূর্তে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মত মনে হয়েছিল তাঁর সেটাকে। তাই তিনি সেটাকে একেবারে ভুলে গিয়ে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। দুর্বলতার বশীভূত হয়েই তিনি তা করতে গিয়েছিলেন তখন।

যাইহোক এক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনি সেদিন লিপ্ত ছিলেন বলে, তাঁর নামে হুলিয়া ঘুরছিল। আর তাই তিনি নানান রূপ ধরে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তখন। এক জায়গায় তিনি এক মহিলার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত অভিনয় করে আত্মগোপন করেছিলেন সে সময়।

সে সময় যে মহিলাটির সঙ্গে তিনি ওইভাবে থেকেছিলেন, তার নাম ছিল জ্যোৎস্না। বারবণিতাদের ঘরেই জোৎস্নার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আর তাঁকে অনেকদিন লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল সেখানে তখন। কারণ পুলিশের তৎপরতা তখন দারুণভাবেই চলছিল। আর এতেই সেদিন তিনি শেষকালে নিজেকে হারিয়ে কেমন এক মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়ে নিজের ওই গৌরবজ্জল সত্বাটা বিসর্জন দিয়ে ফেলেছিলেন। সত্যি সত্যিই তিনি সেদিন সামান্য ক্ষণের জন্যেও নিজের পূত বিপ্লবী মনোভাবকে ভুলে গিয়েছিলেন একেবারে। আর তাই ওই জোৎস্নার যৌবন জোয়ারে ভেসে

গিয়েছিলেন তিনি। ফলে এক অবৈধ সন্তানের জন্ম ঘটে। শেষকালে যখন এই অবৈধ সন্তানের দায় নিজের ঘাড়ে এসে পড়েছিল তাঁর, তখন তিনি নিজের পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা করা তাঁর সম্ভব হয়নি তখন তাঁর এক অনুগত সহকর্মির জন্যেই। এই সহকর্মিটি তারপর কৌশলে ওই জোৎস্নার অন্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে—ওই অবৈধ সন্তানের দায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। সেই সহকর্মিটি সেদিন, এটা করেছিল যাতে তাদের অবিসংবাদিত নেতা রজত সেনের নামে কলঙ্কলেপন না করা হয়।

যাইহোক এরপর রজত সেন নিজের কর্মক্ষমতার জোরে রাজনৈতিক এক একটা সোপান উত্তীর্ণ করে জনপ্রিয়তার একেবারে শীর্ষে উঠে পড়েছিলেন। সারাজীবন ধরে শুধু তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থেকে তাঁর সেই দুর্বল অতীতটাকে সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেন একেবারে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই বিচ্ছিন্ন হওয়া, সেই হারিয়ে যাওয়া, নিক্ষিপ্ত অতীতটা তাঁরজীবনের শেষ বেলার সেদিন এসে পড়ে তাঁকে যেন প্রশান্তির পরিস্ফুরণে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছিল। আর তাই আবার যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছিল ওই হাসপাতালে তখন তিনি চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে অজিতকে বলেছিলেন সুমিত আমারই আত্মজ, ওকে খুঁজে এনে ভাই ওর একটা ব্যবস্থা করে দিও তুমি। বলতে বলতে তিনি সেদিন উত্তেজনার শেষ পর্যায়ের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলেন একেবারে।

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

গুজরাটি সাহিত্য মণ্ডলের অনুষ্ঠান—'কুমার' গুজরাটি ভাষার একটি জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা। গত ৫০ বছর যাবৎ পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি কলকাতায় গুজরাটি সাহিত্য মণ্ডল পত্রিকাটির পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঐ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবাচ্চুভাই রাওয়াতকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানান হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅশোককুমার সরকার। শ্রীসরকার ঐতিহ্যপূর্ণ এই পত্রিকাটির আরো শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে বলেন, একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে এত বছর টিকে থাকাটাই একটা বিরাট ঘটনা। তিনি পত্রিকাটির পঁচাত্তর বয়স্ক সম্পাদক শ্রীরাওয়াতের শতায়ু কামনা করে বাংলা এবং গুজরাটের সুদীর্ঘ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'গুজরাট থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিনিকেতনে পড়তে আসত। তখন থেকেই বাংলার সঙ্গে গুজরাটের হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বড়ভাই গুজরাটেই শেষ জীবন কাটান। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিও গুজরাটে বসেই রচিত। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর এই সম্পর্কে আরো দৃঢ়তর হয়। গান্ধীজির আদর্শকে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। শ্রীসরকার কলকাতার গুজরাটি সমাজকে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানান।

সভার প্রধান বক্তা শ্রীআশিস সান্যাল 'কুমার'-এর সম্পাদক শ্রীরাওয়াতকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলা এবং গুজরাট—ভারতের দুই প্রান্তের দুই রাজ্য। অথচ সুদীর্ঘদিন ধরে এই দুই রাজ্যের মধ্যে ভাব বিনিময় চলে আসছে। কলকাতা গুজরাটি সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্র। এখান থেকেই প্রথম গুজরাটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি পূর্বাঞ্চলীয় লেখক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রীঅশোককুমার সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এক লিপি ব্যবহারের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার অকুণ্ঠ সমর্থন জানান।

জয়ন্তীলাল মেহতা, ডঃ কল্যাণমল লোড়া, শ্রীমতী জ্যোতিবেন ভালারিয়াও সভায় বক্তৃতা করেন। ওয়াহিদ আর্শি উর্দুতে একটি কবিতা পাঠ করেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীরাওয়াত বলেন, "আমাকে বরণ করার অর্থ, আমার পত্রিকাকে বরণ করা। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই পত্রিকা গুজরাটি সাহিত্যের সেবা করে আসছে। যতকাল বেঁচে থাকবো, সাহিত্যের সেবা করে যাবো।' সভায় একটি গুজরাটি নাটিকা অভিনীত হয়।

সাজ্জাদ জাহীর আর নেই—প্রখ্যাত উর্দু লেখক এবং প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা সাজ্জাদ জাহীর আর নেই। গত ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি কাজাখাস্তানের রাজধানী আলমা আতায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকে গমন করেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন আফ্রো এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগাদানের জন্য।

জনাব জাহীর প্রথম যৌবনেই প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেন। তাঁর নয়াদিল্লির বাড়িতে বসে একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস বসেছিলুম, এই প্রসঙ্গে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'তখন আমি লণ্ডনে। ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করছি সেই সময় রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন ভাষণ দিতে। তাঁর ভাষণ শুনে হঠাৎ তাঁকে কতকগুলি প্রশ্ন করে বসি। হীরেন মুখার্জী তখন সেখানে ছিলেন। বলতে গেলে সেই আমার প্রথম সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ। আরো অনেক কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। এর মধ্যে শ্রীমতী রিজিয়া সাজ্জাদ জাহীর এবং দুই কন্যাও এসে যোগ দিয়েছিলেন আলোচনায়।

জনাব শাহীর উর্দু কাব্যে প্রগতিশীল ভাবধারা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উর্দুলিপি সংস্কারের জন্য তিনি যে বৈপ্লবিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার জন্য কট্টর উর্দুপ্রেমিকদের দ্বারা সমালোচিতও হয়েছিলেন খুব। তাঁর মৃত্যুতে প্রগতিশীল কাব্য আন্দোলনের যে বিশেষ ক্ষতি হল, তাতে সন্দেহ নেই।

মেলার পুরস্কৃত—প্রখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক নরম্যান মেলার—এ বছরের 'এডওয়ার্ড ম্যাকডোয়েল' পুরস্কার লাভ করেছেন। এ কালের অন্যতম জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিকের নতুন সম্মান লাভে সকলেই আনন্দিত হবেন বলে আশা করি। মেলারের আগে যাঁরা এই সম্মান লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন অবনটন উলডার, অ্যারণ ফ্যাপল্যাণ্ড প্রমুখ।

সরোজ সাহিত্য বাসর—সরোজকুমার রায়চৌধুরীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আর্যভবন হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। তিনি সরোজকুমার রায়চৌধুরীর সাহিত্যিক প্রতিভার

বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জানকীজীবন ঘোষ। ডঃ সুশীল রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, অজিতকৃষ্ণ বসু, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিভূতি স্মরণ-সভা—সম্প্রতি 'আরণ্যক' ভবনে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের আশিতম জন্মদিবস পালন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী বাণী রায়। মন্মথনাথ ঘোষ, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শরৎ জয়ন্তী—মহান্ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ৯৮-তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে অনেক সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎ সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার সরকার। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'শরৎচন্দ্রের বই পড়ে যে আনন্দ আমি পেয়ে থাকি, তা আর কারো রচনা থেকে পাইনা। তাঁর সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের উপর থেকে কখনও যাবেনা। তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ এখনও মনকে দোলায়িত করে। তাঁর প্রভাব বাঙ্গালী পাঠকের ওপর চিরন্তন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শরৎ সমিতির সম্পাদক শ্রীশৈলেন গুহরায় জানান শরৎচন্দ্রের আসন্ন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর রচনার সুলভ সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা পাওয়া যাবে। শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সর্বভারতীয় কমিটি গঠন করার চেষ্টা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়ের নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাবিত হয়।

শিল্পী সংস্থার পক্ষ থেকে রবীন্দ্র সদনে দুই দিন ব্যাপী শরৎ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ। মনোজ বসু, অধ্যাপক অসিতকুমার ঘোষ ও অধ্যাপক হরিপদ ভারতী শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনের শেষে শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা'-র যাত্রাভিনয় হয়। শেষদিনে

তিনজন কৃতি সাহিত্যিক—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং সন্তোষকুমার ঘোষকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে সন্তোষকুমার ঘোষ বলেন, 'এ যে পুরস্কারকে পুরস্কৃত করার আয়োজন।'

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলাদেশের আবদুস শোভন চৌধুরী, রাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুপদ খান প্রমুখও সভায় শরৎচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করে ভাষণ দেন।

একটি কাব্য-সংকলন : বর্ষার পদাবলী—'বাঙালী চিত্ত চিরদিনই সরল ও বিরহ কাতর। সে করণেই বোধহয় বাঙালী বর্ষা ঋতুর সঙ্গে গভীর একাগ্রতা অনুভব করে—চিরকালের সঙ্গীর মতো, বিরহীর মতো, কবিতার ভাবনার মতো, ভালোবাসে বর্ষাকে।…দোলায়িত চিত্তের ইতস্ততঃ ছড়ানো অনুভূতিগুলিকে একত্র করার প্রয়াস নিয়েছি আমরা "বর্ষার পদাবলী"তে।'—বাংলাদেশের কবিসভা, রংপুর থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'বর্ষার পদাবলী'র মুখবন্ধে এই টুকরো কথাগুলি বলেছেন সম্পাদক মহফিল হক।

উপরোক্ত উল্লেখ স্মরণে রাখলে সংকলনটিকে অভিনব প্রয়াস মনে করা যেতে পারে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতায় বৃষ্টি বিষয়ক টুকরো চিন্তা করেছেন : বিষ্ণু দে, দিনেশ দাশ, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, আশিস সান্যাল, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, শুভ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, কায়সুল হক ও আরো অনেকে। বিজয়ী সৈন্যের মতো দেশে দেশে মেঘ ফিরছে, সালঙ্করা যুবতী মেঘ শরীর নিচ্ছে বৃষ্টিতে—এমন নিরুপম আমেজ ছড়িয়ে রয়েছে এ সমস্ত কবিতায়। সংকলনটি পাঠককে এক মেদুর যাত্রায় দীক্ষিত করবে,—ঘন স্মৃতিময় বর্ষার পদাবলী সঙ্গীতের সঙ্গোপণে আনতে।

। বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা

কার্তিক ১৩৮০

এপার বাংলা ওপার বাংলা / শংকর
এর নাম সংসার / বিমল মিত্র
নুতন তুলির টান / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আলোকপর্ণা / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ব্যাপার বহুতর / ওঙ্কার গুপ্ত
জগদ্দল / সমরেশ বসু
ধর্ম বিজ্ঞান ও শ্রী অরবিন্দ / দিলীপকুমার রায়
আর্ষিকলাল / বনফুল
আবগারী দারোগার ডায়েরী / সুভাষ সমাজদার
এক বর অনেক কনে / কুমারেশ ঘোষ
অভ্রাস / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
তিন তরঙ্গ, শুধু কথা // চাণক্য সেন
পাড়ি / জরাসন্ধ
ক্বচিৎ কখনও / প্রেমেন্দ্র মিত্র
নিশিপদ্ম / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য
প্রাইভেট লিমিটেড।
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ॥

নিয়মাবলী

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বারো টাকা ও
ছ'মাসের জন্য ছ'টাকা অগ্রিম দেয়
রেজেষ্ট্রি ডাকে পেতে হলে পৃথক খরচ দেয়
সাধারণ ডাকে পত্রিকা নিরুদ্দিষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া চলে
গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক
রচনার নকল রেখেই লেখা পাঠাবেন
কোন গোলযোগে রচনা নষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
সঙ্গে ডাকটিকিট থাকলে
অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়
কিন্তু অমনোনীত কবিতা
কখনোই নয়
রচনা সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করা
সম্ভব নয়
পত্রোত্তরে এজেন্সীর নিয়মাবলী
জানানো হয়
পত্রিকার সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা
সবরকম যোগাযোগ ও টাকাকড়ি পাঠানোর ঠিকানা
কালি ও কলম ॥ ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কালি ও কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ কার্তিক ১৩[illegible]

সূচীপত্র

আমাদের কথা ॥ ৩৬৫

প্রবন্ধ

ইংরেজী ইতিহাসে ভারতীয় রাজনীতি ও জীবন দর্শন ॥ দিলীপ চক্রবর্তী ॥ ৩৬৭

বাংলা কুল-কারিকায় ইতিহাস, কাব্য ও কবিপ্রসঙ্গ ॥ অর্ণব মজুমদার ॥ ৩৮১

রবীন্দ্র সহচর সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের বন্ধুত্ব কাহিনী ॥ অমিতাভ বাগচী ॥ ৪১৭

অবিচ্ছিন্ন জীবন, অবিস্মরণীয় সময়কাল : পাবলো নেরুদা ॥ সুতানুকা মুখোপাধ্যায় ॥ ৪৩৭

সঙ্গীত তরঙ্গ ॥ শচীন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৪৭১

গল্প

ধূলায় ॥ নির্মলেন্দু গৌতম ॥ ৩৭৫

নেপালের দিন রাত্রি ॥ অশোক হালদার ॥ ৪০৯

ভ্রমণ-কাহিনী

মস্কো থেকে দেখা ॥ কৃষ্ণ ধর ॥ ৩৮৯

কবিতা

ছেলে ধোওয়ানো ॥ পাব্‌লো নেরুদা : অনুবাদ : মণীশ ঘটক ॥ ৪৪১

চিলির সমুদ্র ॥ পাব্‌লো নেরুদা : অনুবাদ : বিষ্ণু দে ॥ ৪৪৩

পরিক্রমা ॥ পাব্‌লো নেরুদা : অনুবাদ : সতীকান্ত গুহ ॥ ৪৪৫

তার সঙ্গে ॥ পাব্‌লো নেরুদা : অনুবাদ : মণীন্দ্র রায় ॥ ৪৪৮

ব্রাসেল্‌স্ ॥ পাব্‌লো নেরুদা : অনুবাদ : শুভ মুখোপাধ্যায় ॥ ৪৪৯

আমার তিনজন বন্ধু ॥ রঞ্জিৎ সিংহ ॥ ৪৫১

ধারাবাহিক উপন্যাস

উত্তর জাহ্নবী ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ৪২৩

সাহিত্যের খবর ॥ সুচরিতা সান্যাল ॥ ৪৮১

প্রচ্ছদপট—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : শুভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

। সপ্তম বর্ষ ।
। তৃতীয় সংখ্যা ।
। কার্তিক ১৩৮০ ।

আমাদের কথা

"কালি ও কলমের" পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সকল শুভানুধ্যায়ীকে ৺ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। শুভ দীপাবলী ও পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যেও আমাদের হার্দিক শুভকামনা ও মোবারকবাদ। আশা করি আগামী দিনগুলি তাঁদের দুশ্চিন্তামুক্ত ও আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

আশ্বিনের গোড়াতে যে উৎসবের লগ্ন শুরু হয়েছিল, কার্তিকের শেষেও তার জের চলছে। মহালয়া, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রীপূজা; কার্তিকের শেষে আছে কার্তিকপূজা। এরই সঙ্গে এবারে ছিল পবিত্র ঈদ। সমস্ত মিলিয়ে এবারে উৎসবের ঘনঘটা। আনন্দের ব্যাপারই বটে।

কিন্তু, এত দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ সকল সময়ে সহ্য করে ওঠা মুশকিল। শারদলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুর মন নেচে উঠতো সেকালে। তাই তার যতো উৎসব তার বেশির ভাগই উদযাপিত হতো এই সময়ে। আজ, বহিঃপ্রকৃতি হয়তো তেমনিই হেসে ওঠে; কিন্তু মানুষের অন্তর সে হাসিতে উদভাসিত হয় না। দুঃখ, দারিদ্র্য, অশান্তি আর বিক্ষোভের জগদ্দল পাথরে জনজীবন আজ এতোই পিষ্ট যে, প্রাণ খুলে তার পক্ষে উৎসবের আনন্দে সামিল হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তদুপরি সে উৎসব যদি চক্রাকারে আবর্তিতই হতে থাকে, তাহলে তা যেন প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু উৎসবের আধিক্যই যে প্রাণান্তকর হবার হেতু, তা নয়। উৎসবের বর্তমানরূপই মানুষকে কালক্রমে উৎসব-বিমুখ করে তুলতে বাধ্য করছে। কলকাতা শহর তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গে বারোয়ারী বা তথাকথিত সর্বজনীন পূজা আজ এক বীভৎস আকার ধারণ করেছে। যত্রতত্র এই বারো-ইয়ারি পূজা; সবরকমের পূজাই আজ বারো-ইয়ারি। প্রতিবছর সর্বপ্রকারের পূজার সংখ্যাই ক্রমঃবর্ধমান। আর এইসব পূজা উপলক্ষ্যে নিরীহ গৃহস্থের উপরে যে জুলুমবাজি চালানো হয় তা শুধু নিন্দনীয় নয়, তা প্রাণঘাতীও—শুধু অর্থার্থে নয়, শব্দার্থেও।

স্বাধীনতার পর থেকেই চাঁদার নামে জুলুমবাজি জ্যামিতিক হারে প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। আর তারই সঙ্গে প্রায় সমানহারে বেড়ে চলেছে বারোয়ারী পূজার নামে উৎকট আলোকসজ্জা, কর্ণভেদী চিৎকার, উন্মত্ত উল্লাস। এবং পূজো যদি হয় এক, দুই অথবা তিন দিনের, বিসর্জনের পালা চলে এক, দুই, তিন সপ্তাহ ধরে। এই কুৎসিত বীভৎসতা থেকে ইতর ভদ্র কারো রেহাই নেই, সুস্থ-অসুস্থের রেহাই নেই! চতুর্দিকের জঞ্জাল, আবর্জনা, মালিন্য, দুঃখ দারিদ্র্য এবং অবক্ষয়ের মধ্যে পূজোর নামে যে জাঁকজমক, যে সজ্জা—তা দেখে লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সর্বোপরি, পূজোর যা প্রধান অঙ্গ—শুচিশুভ্র পরিবেশ এবং মানসিক একাত্মতা—তা তো চিরতরে বিদায় নিয়েছে এ হতভাগ্য ভূখণ্ড থেকে।

অথচ, অন্যত্র ব্যাপারটি কিন্তু এরকম নয়। নয়াদিল্লী থেকে এক স্নেহাস্পদা জানিয়েছেন সেখানে যতোগুলি পূজো হয় তার বেশিরভাগ প্যাণ্ডালে গেলে মন আনন্দে ভরে ওঠে, নিজেকে দশ জনের একজন মনে হয়, আদর-আপ্যায়ণ প্রসাদ-ভক্ষণ, রুচিশীল পরিবেশ, ভব্যতা ও সৌজন্যবোধ সবকিছু মিলিয়ে উৎসবকে সার্থক করে তোলে। নিজবাসভূমে বঙ্গসন্তানের এ-অধঃপতন কেন তবে!

এর উত্তর অবশ্য একটাই। নীতিহীন, চরিত্রহীন, সর্বনাশা রাজনীতি এ-রাজ্যের মানুষকে অধঃপতনের শেষ সীমায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে ডক্টর জনসন রাজনীতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, আজকের পশ্চিমবঙ্গে তার সার্থক প্রতিফলন ॥

দিলীপ চক্রবর্তী

ইংরেজী উপন্যাসে ভারতীয় রাজনীতি ও জীবন দর্শন

ভারতীয় পটভূমিতে ইংরেজী ভাষায় রচিত উপন্যাসের কথা আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক এল ব্র্যাণ্ডারের একটি মন্তব্যের কথা আমাদের মনে পড়ে। জর্জ অরওয়েল সম্বন্ধে একটি আলোচনায় তিনি মন্তব্য করেছেন: "Few novels about India have been good. Astonishingly, little English writing of any excellence has come out of India. There is some thoroughly enjoyable writing about the mountaineering in the Himalayas, there is a 'Hindu Holiday' and among novels there are really only 'Kim' and 'A Passage to India'. George Orwell's Burmese Days' is not nearly so good as either of these two novels, but it is not easy to suggest another which could compete for the third place."[১]

সমালোচক ব্র্যাণ্ডারের এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে। পরবর্তী দুই দশকে আরো অনেক ইংরেজী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু উপর্যুক্ত তিনটি উপন্যাসের মত কালজয়ী উপন্যাস একটিও প্রকাশিত হয়নি একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

তাই আমাদের মনে এ প্রশ্ন উঠতে পারে—এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে এমন কি বস্তু আছে যা এগুলিকে অন্যান্য উপন্যাসের থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে এবং মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে? অবশ্যই এ প্রশ্নের এক সহজ উত্তর আছে। আলোচ্য উপন্যাস ত্রয়ের রচয়িতারা অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেক বেশী প্রতিভাশালী ছিলেন তাই সহজবোধ্য কারণেই তাঁদের উপন্যাসের শিল্পকলা, প্রকাশভংগী ও রচনা পদ্ধতি অনেক উন্নততর। কিন্তু কেবলমাত্র এরকম মন্তব্য করেই এ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। ভারতীয় পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসগুলির পাঠকেরা ভাল করেই জানেন যে এই উপন্যাসগুলিতে ঘটনা পরম্পরার উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই উপন্যাসে শিল্পচাতুর্যের অপেক্ষা ঘটনাবলীর উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই সংগত কারণেই আমাদের মনে হয় যে এই

তিনটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলীর উপস্থাপনে নিশ্চয়ই এমন কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি এই তিনটি উপন্যাসকে এক বিশিষ্ট মহিমামণ্ডিত আসন দিয়েছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, যদিও এই উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজীতে অনেক আলোচনা হয়েছে তা সত্বেও এই তিনটি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসগুলি এই তিনটি উপন্যাসের পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে। আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের ঔপন্যাসিকেরা ভারতের পটভূমির সংগে অংগাগীভাবে জড়িত দুটি বাস্তব সত্যের প্রতি মনোযোগী হননি। এই দুটির মধ্যে একটি হল ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেড় শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনেকের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না হতেও পারে। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের জনজীবনে যে এই সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় পটভূমিকায় রচিত নিম্নমানের ইংরেজী উপন্যাসগুলিতে এই সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে কোন আলোচনা চোখে পড়ে না। সম্ভবত এই উপন্যাসগুলির লেখকেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শাশ্বত ও সনাতন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। এতে শুধু যে তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাবই সূচিত হয়েছিল তা নয়, এক বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার জন্য তাঁদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু শ্রীহীন এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য এর থেকেও মারাত্মক ভুল তাঁরা করেছিলেন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি তাঁদের তীব্র অনীহা প্রকাশ করে। ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রতি তাঁদের মনে লেশমাত্র আগ্রহ বা অনুরাগ ছিল না। বরঞ্চ তার পরিবর্তে ছিল তীব্র বিদ্বেষের মনোভাব। তাঁদের এই ঈর্ষাপ্রসূত মনোভাবের জন্যই সম্ভবত তাঁদের রচিত উপন্যাসগুলি কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে একেবারে মেকী বলে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এই আলোচনার প্রারম্ভে উল্লিখিত তিনটি ঔপন্যাসিকের যথোচিত সচেতনতা দেখতে পাই আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সুপ্রাচীন জীবনদর্শনের প্রতি এক বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার মনোভাব লক্ষ্য করি। তাই সংগত কারণেই আমাদের একথা মনে হতে পারে যে, উল্লিখিত তিনটি উপন্যাসের বিশিষ্ট মর্যাদার আসন লাভের পিছনে,

বিষয়বস্তুর দিক থেকে অন্তত, এ দুটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের কথা মনে রেখে এই বিষয়টি নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই রুডিয়ার্ড কিপলিং রচিত 'কীম' উপন্যাসটির কথা। সন্দেহ নেই যে কিপলিং ছিলেন এমন একজন লেখক যাঁর মনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গভীর আস্থা ছিল। তাই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী বলেও অভিহিত করা যায়। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে আস্থাশীল অন্যান্য ব্যক্তিদের মত তাঁর মনে শাসিত জাতির প্রতি ঘৃণা অথবা বিদ্বেষের মনোভাব ছিল না, আলোচ্য উপন্যাসটির পাঠকের কাছে এই তথ্যটি অজানা থাকার কথা নয়। এই উপন্যাসে কয়েকজন বৃটিশ সেনাধ্যক্ষের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করতে তিনি মোটেই দ্বিধাবোধ করেননি। একজন প্রখ্যাত সমালোচক বোনামী ডোবরী তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়: "It is not to be denied that one has to look at his Imperialism. But it was not chauvinistic, as most people used to think and some still do—since he always upbraided the Jingo. Actually his conception of the Empire was in the tradition of the great myth of beneficent world government, which stirred Shakespeare when he wrote the final speach of Cranmer in Henry VIII, which comes out in D' Avenant, and still more grandly in Dryden's 'Annus Mirabilis' and Pope's "Windsor Forest." It was a poetic idea.[২]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর উদার এবং প্রশংসনীয় দৃষ্টিভংগী ছিল। এটি আমাদের কাছে বিস্ময়জনক বলে মনে হয় কারণ সে সময় হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব সব সময়েই প্রত্যক্ষ করা যেত। এরিক ষ্টোক্স্ এ প্রসংগে লিখেছেন: "On June 22, 1913, Wilberforce, in a speech delivered in the British Parliament, proclaimed that the Hindu Gods were absolute monsters of lust, injustice, wickedness and cruelty and India's religious system was one grand abomination."[৩]

পক্ষান্তরে কিপলিং রচিত একটি কবিতার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর উদার মনোভাব সম্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

"O ye who tread the Narrow way
By trophet fare to Judgement day
Be gentle when 'the heathen' pray
To Buddha at Kamkura.

শুধু তাই নয়। পরবর্তীকালের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফষ্টারের মতই তিনিও খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ প্রসংগে বোনামী ভোবরী মন্তব্য করেছেন : "He has small opinion of Christianity because it has not eliminated the fear of the end so that the western world clings to the dread of death more closely than the hope of life."*

এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি 'কীম' উপন্যাসের বহুলাংশে বৌদ্ধধর্মের প্রতি লেখকের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সুস্পষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

ই এম ফষ্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাসের মূল সুর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। পরদেশে পরজাতির উপর উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে শাসন করার মধ্যে যে হীন মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়, ফষ্টার তাঁর উপন্যাসে সেই মনোবৃত্তিকে আক্রমণ করেছেন।

তিনি তাঁর উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন যে মানবতার খাতিরেও অন্তত বৃটিশ জাতির ভারত ছেড়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য ইংরেজ ঔপন্যাসিকেরা ইংরেজ চরিত্রের গৌরব ব্যাখ্যান করে চরিতার্থ বোধ করেছেন কিন্তু ফষ্টার তাঁর পক্ষপাতহীন দৃষ্টি নিয়ে তাঁদের বিচার করেছেন এবং সেযুগে ভারতবর্ষে নানা ধরণের কাজে ব্যাপৃত অনেকের চরিত্রে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরাগের মনোভাব ছিল, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার নিন্দা করেছেন।

অবশ্য সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জর্জ অরওয়েল ই এম ফষ্টারকেও অতিক্রম করেছিলেন। বস্তুত তাঁর উপন্যাস 'বার্মিজ ডে'জ' এবং অন্যান্য রচনাগুলি পড়লে মনে হয় যেন তিনি ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এক আত্মজীবনীমূলক রচনায় তিনি লিখেছিলেন: "For five years I had been part of an oppressive system,

and it had left me with a bad conscience. Innumerable remembered faces—faces of prisoners in the dark, of men waiting in the condemned cells, of subordinates bullied and aged peasants I had snubbed—haunted me intolerably. I felt that I had got to escape not merely from imperialism but from every form of man's dominion over man."[৫]

প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যুবাবস্থায় জর্জ অরওয়েল পাঁচ বছর ব্রহ্মদেশে পুলিশ অফিসারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অভিজ্ঞতাকে তিনি উপন্যাস রচনার কাজে লাগিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের মূল সুর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে তিনি খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকদের ক্রূরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব এই উপন্যাসে তিনি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এছাড়াও এই উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট সুর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের খলনায়ক একজন বার্মিজ। তার নাম যু পো কীন। তার স্ত্রী সরলমতি, শুভবুদ্ধি সম্পন্না। উপন্যাসের একটি অংশে সে তার স্বামীকে বলেছে: "Ko Po Kyin, you have grown rich and powerful and what good has it ever done you? We were happier when we were poor. Happiness is not money. What can you want with more money?"[৬]

এই নারী চরিত্রটি আমাদের সমারসেট মমের একটি উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: "Goodness is the only value that seems in this world of appearances to have any to be an end in itself.[৭]

জর্জ অরওয়েলের উপন্যাসে অবশ্য ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ চোখে পড়েনা। কিন্তু ই-এম ফর্ষ্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাসটিতে এ বিষয়ের সুষ্ঠু এবং সুচারু আলোচনা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তীকালে অবশ্য এ বিষয় নিয়ে অনেক উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নিয়ে বোঝার চেষ্টা যে সব ইংরেজ সাহিত্যিক

করেছেন, ই এম ফষ্টারকে সহজেই তাঁদের পথিকৃৎ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

বিস্ময়ের কথা যে, যে সময় ফষ্টার তাঁর উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনায় হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্যক আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন, সেযুগে কিন্তু ইংলণ্ডের প্রায় সর্বত্রই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিরোধী মনোভাবই বিশেষ করে লক্ষ্য করা যেত। ফষ্টারের উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। সেযুগে ইংরেজ মনোভাব সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ স্যার জন উডরাফ লিখেছেন: "On Nov. 7th, 1919, 'The Daily Telegraph (London) wrote: 'There is no civilization known to the world except that of Christianity.' All then who are are not Christians are uncivilized. Cardinal Bourne, speaking about this time at Watford said, 'when you come to nations where Christianity has not penetrated, there is no civilization in our sense of the word except fragments which they had picked up from the civilized Chritian nations."[৮]

এই উপন্যাসে বর্ণিত ভারতীয় জীবনদর্শন সম্বন্ধে পরিসরের কথা ভেবে আলোচনা থেকে বিরত থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই উপন্যাসের পাঠক সহজেই একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, সম্পূর্ণ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এটিই। তিনটি বিভাগে বিভক্ত এই উপন্যাসে লেখক সমকালীন বিস্রস্ত সমাজবাণী মানবদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রদর্শিত সার্বজনীন প্রেমই বিশ্বের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে তাঁর মনে হয়েছে। তাই গোকুলাষ্টমীর বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: Infinite love took upon the form of SHRI KRISHNA, and saved the world. All sorrow was annihilated, not only for Indians, but for foreigners, birds, caves, railways, and the stars; all became joy, all laughter; there had never been disease, nor doubt, misunderstanding, cruelty, fear."[৯]

এ প্রসংগে একজন সুবিখ্যাত সমালোচক, জনষ্টনের একটি উক্তি স্মর্তব্য: "The large divisions of the structure of 'A Passage

to India', 'Mosque', 'Caves', 'Temple' accord with the spiritual development of the novel, which moves from the peaceful seclusion of therism which is found to be unreal, .to the undeniable reality of evil, and finally, to the synthesis which Hindu pantheism achieves. In the cave love is denied and life declared to be sterile ; in the temple love is born and life confirmed.[১০]

এই তিনটি উপন্যাসের মনোযোগী পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন যে ভারতীয় পটভূমিতে রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলির সংগে এই তিনটি অসাধারণ উপন্যাসের পার্থক্য যে কেবলমাত্র গুণগত বা শিল্প নৈপুণ্যগত তা নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব আছে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে সমালোচক ব্র্যাণ্ডার কেবলমাত্র এই তিনটি উপন্যাসকেই সম্মানের আসন দিয়েছেন। কিন্তু এ তিনটি উপন্যাস ছাড়াও অন্তত আরো দুটি উপন্যাস আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এ দুটি উপন্যাসের নাম সমারসেট মম্ রচিত 'দ্য রেজর্স এজ' এবং এল এইচ মায়ার্স রচিত 'দ্য নিয়র এ্যাণ্ড দ্য ফার।' বারান্তরে এ দুটি উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. L. Brander : George Orwell, P. 78
Longman's Green & Co. Ltd. 1954
২. Bonamy Dobree : The Lamp and the Lute. P. 55. London, 1962
৩. Eric Stokes : The English utilitarians and India. P. 39.
Oxford 1959.
৪. Bonamy : The Lamp and the Lute. P. 54, London, 1962
৫. George Orwell : The Road to Wigan Pier. pp. 149-50. London, 1954
৬. George Orwell : Burmese Days. P. 15. London, 1950
৭. W. S. Maugham. The Summing up. P. 202. London, 1948
৮. Sir John Woodruff : Is India Civilized ? Preface. Madras 1922
৯. E. M. Foster : A Passage to India. P. 251. London, 1924
১০. J. K. Johnstone : The Bloomsbury group. pp. 263-64. London, 1954

নির্মলেন্দু গৌতম

ধুলায়

গ্রামের কয়েকজন প্রবল উৎসাহে নিখিলেশবাবু আর তার সঙ্গের ছেলেদের নিয়ে এলো একটা কাঠের দোতলা বাড়ির সামনে। বাইরের দিকের সেই বড়ো ঘরখানা দেখিয়ে দিলো তারপর।

নিখিলেশবাবু ঘরখানা দেখলেন। লম্বা বারান্দা সামনে। বারান্দার একটা দিক গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে আছে। কিছু পাখীর ডাক আরো মনোরম ক'রে তুলেছে চারদিক। সারাদিন কাজ করবার পক্ষে এমন একটা বাড়ি পাওয়া রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার। নিখিলেশবাবু ভাবলেন।

গ্রামের লোকেদের বললেন, 'বাড়ির লোকজন কোথায়? তাদের না ব'লে ঘরে ঢুকে পড়া কি ঠিক হবে?

নিখিলেশবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে কিছু না ব'লে জনা তিন চার লোক নিয়ে লম্বা চেহারার লোকটি বারান্দায় উঠে পড়লো। দরজাটা বাইরের দিক থেকে বন্ধ ছিলো। সুতরাং বাড়ির লোক ডাকতে হলো না তাদের।

নিখিলেশবাবু বুঝতে পারলেন, এ ঘরখানার ওপর গ্রামের সবারই একটা অধিকার আছে। নাহলে বাড়ির কাউকে কিছু না ব'লে এমনিভাবে তারা তাকে নিয়ে আসবে কেন? যাক্‌গে, ঢুকে পড়া যাক্ তো! বারান্দায় উঠে এলেন নিখিলেশবাবু।

একজন হঠাৎ বললো, 'বাইরের লোক এ গ্রামে এলে এ ঘরটাই খুলে দেয় অঘোরদা। কাজেই আমরাও খুলে দিলাম।'

'অঘোরদা কে?' নিখিলেশবাবু শুধালেন।

পাশ থেকে একজন বললো, 'এ বাড়ির মালিক।'

'ও।' একটুখানি শব্দ করলেন নিখিলেশবাবু।

লম্বা চেহারার লোকটি ভেতর থেকে নিখিলেশবাবুকে ডাকলো এবার। জিনিসপত্রগুলো গ্রামের লোকেরাই বইছে গ্রামে ঢুকবার পর থেকে। সেজন্যেই সেদিকে না তাকিয়ে সোজা সেই ঘরের মধ্যে চলে এলেন নিখিলেশবাবু।

ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উঠে এলো। ওদের রীতিমতো খুশী খুশী দেখাচ্ছে। নিখিলেশবাবু একটুখানি হাসলেন ওদের দিকে তাকিয়ে। তারপর ঘরখানা দেখতে থাকলেন! চেয়ার টেবিল দিয়ে ঘরখানা সাজানো।

দেয়ালে কয়েকটা ছবি আর একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। নিখিলেশবাবু বুঝতে পারলেন, বাইরের লোকজন এখানে আসে বলেই এমনি ক'রে রাখা হয়েছে ঘরখানা।

একটা চেয়ারে বসলেন নিখিলেশবাবু। বাস রাস্তা থেকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে তাদের। সেজন্যে একটু যেন ক্লান্ত লাগছে। তাঁর মতো বয়স্ক লোকের পক্ষে একটু ক্লান্তি অবশ্য অপরাধের নয়।

বসে বসেই ছেলেদের কাজকর্ম দেখতে থাকলেন নিখিলেশবাবু।

বিকেলের আগে নিশ্চয়ই এখান থেকে ওঠা যাবে না। ওরা সেভাবে তৈরী হয়েই এসেছে। কাজেই ছেলেরা তেমন ব্যস্ত নয় মনে হলো নিখিলেশবাবুর।

এখানে আসবার কথা হয়েছিলো দিন তিনেক আগে। গ্রামের গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য কিছু পুরনো জামা কাপড় এসেছিলো স্কুল কমিটির কাছে। অন্যান্যবারের মতোই স্কুল কমিটি মিটিং ক'রে নিখিলেশবাবুর ওপর সমস্ত ভার তুলে দিয়েছিলো। তারা জানে, নিখিলেশবাবু ছাড়া এসব কাজ হয় না।

এসব কাজের ভার পেলে নিখিলেশবাবুও আপত্তি করতে পারেন না। আপত্তি করবেন কি করে? মনের ভেতর কোথায় যেন একটা সুখ খুঁজে পান। রাজার মতো মনে হয় নিজেকে। বিপন্ন মানুষগুলো নিখিলেশবাবুকে একটু যেন অহংকারীও ক'রে তোলে। সে অহংকারটুকু বুকের মধ্যে আশ্চর্যভাবে লালন করেন নিখিলেশবাবু।

বড়ো ক'রে একটা হাই তুলে নিখিলেশবাবু সিগারেট ধরালেন। লম্বা লোকটি ছেলেদের সঙ্গে কাজে লেগেছে।

নিখিলেশবাবু তাকে ডাকলেন। বললেন, 'তোমার নামটা কি ভাই?'

'সাধন।'

'তুমি একটা কাজ করবে, সবাইকে খবর দেবে, যা এনেছি, তা আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না। সব দিয়েই যাবো।'

'যাচ্ছি।'

ব'লেই মুহূর্তে ব্যস্ত সমস্তভাবে বেরিয়ে গেলো সাধন।

নিখিলেশবাবু সাধনকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন লোকটা খুব কাজের হবে। জিনিসপত্র দেবার সময় এমনি একটা কাজের লোক থাকা দরকার। সব দিক সামলাতে পারবে।

ওর জন্য দু'একটা ভালো জিনিস রাখতে হবে। একটি ছেলেকে ডেকে ব'লে সাধনের ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন নিখিলেশবাবু।

যেমনি ব্যস্ত সমস্তভাবে গিয়েছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যে তেমনিভাবেই ফিরে এলো সাধন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভীড় জমে উঠলো দরজার সামনে।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন নিখিলেশবাবু। ছেলেদের বললেন, 'আর দেরী ক'রে লাভ কি। দাও দেখি, শুরু করি।'

সাধন একেকজনকে ডাকতে শুরু করলো এবার। নিখিলেশবাবু ছেলেদের হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে দিতে থাকলেন। পুরোনো জিনিস, অথচ তাই নিয়েই কি অসাধারণ খুশী হয়ে উঠছে লোকগুলি। যেন অসম্ভব মূল্যবান কিছু পেয়ে গেছে হঠাৎ। নিখিলেশবাবুর দিকে তাকিয়ে সকৃতজ্ঞভাবে হেসে যাচ্ছে যাবার সময়।

খানিকটা অহংকারী সুখ নিখিলেশবাবুকে রোমাঞ্চিত করলো।

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ একটা রুক্ষ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন নিখিলেশবাবু। সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে চোখ রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চাইলেন। দেখলেন দরজার মুখের ভীড় মুহূর্তে সরে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো অসম্ভব রুক্ষ চেহারার একটি লোক। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিলেশবাবুর মনে হলো তাদের অনধিকার প্রবেশে অসম্ভব বিরক্ত সে। কিছু একটা বলবার জন্য যেন তৈরী হয়ে নিচ্ছে মনে মনে।

সাধনের দিকে তাকালেন নিখিলেশবাবু।

সাধন থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে। তার মুখে যেন খানিকটা বিস্ময়।

আরো খানিকটা এগিয়ে এসে রুক্ষ গলায় লোকটি বললো, 'এখানে কি হচ্ছে এসব?'

নিখিলেশবাবু মৃদুস্বরে বললেন, 'কিছু পুরোনো জামা কাপড় এদের দিচ্ছিলাম।'

'কেন?' পুরোনো কথাটা শুনে আরো রুক্ষ হয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বর।

'কেন'-র উত্তরটা কি হবে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন নিখিলেশবাবু। তারপর বললেন, এতে অন্ততঃ কিছুটা উপকার হবে এদের। এই জন্যেই আর কি—'

নিখিলেশবাবুর কথা শেষ হবার আগেই সাধন বললো, 'পুরোনো বলেই

একেবারে খারাপ না অঘোরদা। বেশ দামী জিনিসগুলো। যারা দিয়েছে তারা বেশ ধনী লোক।'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফেটে পড়লো অঘোর। প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো, 'ওসব কথা আমায় বলবি না! সাধন। যা হোক একটা কিছু পেলেই তোরা ধন্য হয়ে যাস। তোর মুখ দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।'

বলেই নিখিলেশবাবুর দিকে ফিরে বললো, 'শুনুন, এসব দাতাগিরি চলবে না এখানে। নিয়ে চলে যান। আমি এখানে থাকলে এসব হতেই দিতাম না।'

নিখিলেশবাবু কিছু বলবার চেষ্টা করলেন না। অঘোর তার মনের ভেতরের চেহারাটাকে ঠিক ধ'রে ফেলেছে। অঘোরের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন, অসম্ভব কুৎসিত সে চেহারা। স্কুল কমিটি তার চোখের সামনে একটা মায়া-আয়না টাঙিয়ে রেখেছিলো এতো দিন। সেই মায়া আয়নায় তার কুৎসিত চেহারার প্রতিফলন হতো না। নিখিলেশবাবু নির্বোধ বলেই তা ধরতে পারেন নি।

হঠাৎ যেন ভীষণ ভয় পেলেন নিখিলেশবাবু। কিছুতেই অঘোরের মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না আর।

অসহায়ভাবে দরজার দিকে তাকালেন নিখিলেশবাবু। কৌতূহলী কয়েকটি লোক এখনও দাঁড়িয়ে। বোধহয় মজা দেখছে ওরা। নিখিলেশবাবুর সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠলো।

অঘোর সাধনের দিকে ফিরে বললো, 'সব বেঁধে ফ্যালো এখুনি।'

নিখিলেশবাবু ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন' 'তোমরা সব বেঁধে নাও। এখুনি ফিরবো আমরা।'

ছেলেরা কিংবা সাধন কিছু বললো না। নিঃশব্দে সব গুছিয়ে বেঁধে ফেলতে থাকলো।

অঘোর একটু সময় দেখলো সেসব। তারপর নিখিলেশবাবুর দিকে প্রবল বিরক্তিতে তাকিয়ে পায়ের জুতোর শব্দ তুলে চলে গেলো।

অঘোর চলে যেতে দরজা জুড়ে ভীড় জমলো। ওরা কেউ ঘরে ঢুকলো না। কেবল সমস্ত ব্যাপারটাকে অদ্ভুত চোখে দেখতে থাকলো। সাধন রাগে, দুঃখে, অপমানে বললো, 'অঘোরদা এমনি করবে ভাবিনি কিন্তু।'

'ঠিকই করেছে।' নিখিলেশবাবু মৃদুস্বরে বললেন।

সাধন কি ভাবলো। কিছু বললো না।

ছেলেরা নিজেদের মধ্যে নীচুস্বরে কিছু ব'লে নিঃশব্দে কাজ ক'রে যেতে থাকলো।

অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিখিলেশবাবু।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সব গুছিয়ে ফেললো ওরা। তারপর নিখিলেশবাবুর দিকে ফিরলো।

'নাও, চলো এবার।' ব'লে নিখিলেশবাবু একটা বড়ো সড়ো কাপড়ের বোঝা তুলতে গেলেন।

তার আগেই সাধন এগিয়ে এসে বোঝাটা তুলে নিলো।

'না না, সে কেন হবে। তুমি নেবে কেন এটা।' বাধা দিলেন নিখিলেশবাবু।

কোনো কথা শুনলো না সাধন, বললোও না। কেবল বিনীতভাবে হাসলো খানিকটা।

ওটা নেবেই সাধন। বাধা দিয়ে লাভ নেই। বুঝতে পারলেন নিখিলেশবাবু। কাজেই নিরুপায়ের মতো বললেন, 'যাক্‌গে, তুমি যখন নেবেই, তখন আর কি বলবো!' ছেলেদের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আর কি, চলো।'

ব'লে বাইরে এলেন।

যারা দাঁড়িয়েছিলো, তারা নির্বোধের মতো দেখছে সব কিছু। দারুণতম অস্বস্তিতে নিখিলেশবাবু চোখ ফিরিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। চোখের সামনে ভেসে চলেছে অঘোরের মুখ। সেই মুখ থেকে মুক্তির জন্য অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

সাধন এবং ছেলেরা কেউ কিন্তু কোনো কথা বলছে না। নিখিলেশবাবু বুঝতে পারছেন, ঘটনাটা আঘাত দিয়েছে ওদের। কিন্তু ওরা তো জানে না, নিখিলেশবাবু অঘোরের চোখে নিজের ভেতরের চেহারাটা দেখেছেন বলেই নিঃশব্দে মাথা নামিয়ে ফিরে চলেছেন।

হাঁটতে হাঁটতে নিখিলেশবাবু গ্রাম ছাড়িয়ে এলেন একসময়। আরো মাইল তিনেক হাঁটবার পর বাস রাস্তা। প্রায় সব সময়ই বাস চলে। সুতরাং বাসের জন্য খুব একটা অপেক্ষা করতে হবে না।

কাপড়ের বোঝাটা নিয়ে সাধন আগে আগে যাচ্ছে।

নিখিলেশবাবু বললেন, 'তুমি কি বাস রাস্তা পর্যন্ত যাবে নাকি সাধন?'

'হুঁ।'

'না গেলেও চলতো কিন্তু। আমি ঠিক নিয়ে যেতাম।'

সবিনয়ে হেসে ফের নির্ভাবনায় হাঁটতে থাকলো সাধন।

কী জন্য সাধন বোঝাটা বয়ে চলেছে? নিখিলেশবাবু বুঝতে চেষ্টা করলেন। এমনি বোঝা বয়ে তিনি এসেছিলেন-সুখের অহংকারটুকু তাতিয়ে তুলবার জন্য। যার কাছে নিখিলেশবাবু নিজেও আড়াল হয়ে ছিলেন। যেন কাঙালের মতো অহংকারের কাছে মাথা নামিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলেন। বোঝাটা কী অসাধারণ ভার ছিলো তখন!

অথচ সাধন কি স্বচ্ছন্দ পায়ে চলেছে। যেন বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। কারো কাছে সে নুয়ে পড়েনি কাঙালের মতো। তার পায়ে যে ধুলো উড়ছে সে ধুলোয় আনন্দ, সে ধুলোয় রামধনুর বর্ণচ্ছটা। নিখিলেশবাবুর সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠলো।

মাঠ, বন, এঁকে বেঁকে যাওয়া পথ, রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ এসবের দিকে একে একে তাকিয়ে নিখিলেশবাবু প্রাণপণ শক্তিতে অঘোরের মুখ ভুলতে চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন একটি দুর্লভ সংবাদ মন্ত্রোচ্চারণের মতো উচ্চারণ করলো তার অস্তিত্বের গভীরে। তিনি অঘোরের মুখের আয়নায় তার প্রতিবিম্বিত মুখকে দীর্ঘ পথের ওপর রাখলেন। তারপর সবিস্ময়ে দেখলেন, সাধনের পায়ে তার সেই মুখ ধুলোর মতো হয়ে রামধনুর বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

নিখিলেশবাবু এবার অপার্থিব মুখে সাধনের মতো বাতাসে ভেসে চলতে থাকলেন।

অর্ণব মজুমদার

বাংলা কুল কারিকায় ইতিহাস—কাব্য ও কবিপ্রসঙ্গ

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলার কুলগ্রন্থ "কারিকা" "ডাক" "ঢাকুরী" ও "কক্ষানির্ণয়" প্রভৃতি এবং তার রচয়িতা (ঘটক ও কুলাচার্যগণ) কবি (!) গণ কেহই বিস্তীর্ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় একবিন্দু ঠাঁই পায় নাই।

একমাত্র কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তির জন্ম মৃত্যুর সাল তারিখ নির্ণয় নিমিত্ত কুলপঞ্জীর উল্লেখ থাকলে ও উপজীব্য হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে কুলকারিকা ও তার রচয়িতাগণের যথাক্রমে কাব্য ও কবি হিসাবে আক্ষরিক সংসাত্ত স্বীকৃতির সাক্ষ্য নেই।

কারণ যাই হোক। তবু একথা স্বীকার করে নিতে লজ্জা নাই যে জাতির এক সুবিকাশ গণ ইতিহাসের প্রতি আমাদের নিরুচ্চার অন্যমনস্কতা নিঃসন্দেহে আত্মহননের সামিল।

কি প্রাচীনত্বের দিক থেকে কি কাব্য ভাবনার দিক থেকে, কি ঐতিহাসিকত্বের দিক থেকে এই সুবিশাল গ্রন্থরাজী আজো গবেষকদের কাছে এক আকর দলিল হিসাবে যে স্বীকৃতির দাবী রাখে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই।

চতুর্দশ শতকের হরি মিশ্র প্রণীত সংস্কৃত কুল কারিকা থেকে অষ্টাদশ শতকের শুকদেবের বাংলা কুল কারিকা পর্যন্ত দীর্ঘ কালের অসংখ্য পুঁথিপত্র যা সুদীর্ঘ পরিশ্রমে মহামহোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উদ্ধার করে উত্তরসূরীগণের জন্য সঞ্চিত রেখে গেছেন—তা মহার্ঘই শুধু নয়—বিরল দৃষ্টান্তও। বাংলার এই অমূল্য পারিবারিক ইতিহাস—(রাজা মহারাজা থেকে দীনতম দরিদ্র পর্যন্ত)—যা' তৎকালিক রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের প্রকট আক্ষরিক অভিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত,—তাকে যদি আজো বাংলা সাহিত্যের পঙক্তিতে সাদরে ঠাঁই না দেওয়া হয় তা'হলে পূর্বসূরীগণের প্রতি চরম অবিচার করা হবে কিনা সে বিষয়ে বিদগ্ধ গবেষকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বক্ষ্যমান নিবন্ধে—সমগ্র কারিকাগুলির ঐতিহাসিকতা এবং সামাজিক বিন্যাস প্রসঙ্গ ও কাব্যমূল প্রভৃতি নানা বিস্তৃত তথ্য ও তত্ত্বমূলক চর্চা থেকে বিরত থেকে—শুধুমাত্র মুখবন্ধ হিসাবে কয়েকজন রচনাকার ও কয়েকটি কারিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করবো।

মনে করা যেতে পারে দীর্ঘকালের অবহেলিত এই সমস্ত কাব্যগুলি (এ পর্যন্ত কাব্য বলে কোথাও উল্লিখিত হয়নি) রচনার দিক থেকে কাব্য গুণবর্জিত স্থূল এবং ঐতিহাসিকত্বের ক্ষেত্রে হয়তো অসারত্ব সমধিক। কিন্তু তা' যে মোটেই নয় তা' কারিকা কাব্যগুলির প্রাথমিক পাঠেই প্রমাণ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক নিরীক্ষার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দীর্ঘ ব্যবধানে রচিত ১০।১২টি কারিকায় একই 'নামধাম গাঞ গোত্র সহ পরিচিতি' নিজ নিজ ভঙ্গিতে অঙ্কিত। তা'ছাড়া উৎকীর্ণ প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রলিপির সঙ্গেও বহু লিখিত ইতিহাসের পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে। কাজেই মনে করা যেতে পারে ভ্রান্তির অবকাশ এখানে সামান্যই। এই সমস্ত বিস্তৃত বিষয় (কারিকাগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা) নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বর্তমান মুখবন্ধ নিবন্ধে শুধুমাত্র কি ভাবে কারিকার কবিতায় ঘটনাকে ঐতিহাসিক ভঙ্গিতে ধরে রাখা হতো তার নিদর্শন স্বরূপ দু'টি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। খৃষ্টীয় নবম শতকের শূর বংশের ধরণীশূর (অবনীশূরের পুত্র) সমগ্র উত্তর রাঢ় বাহুবলে অধিকারপূর্বক আদিশূর নাম গ্রহণ করে (২য়) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নিজে হিন্দু ছিলেন বলে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত উত্তর রাঢ়ে পুনরায় হিন্দুভাবের সংস্থাপন জন্য নানাবিধ ক্রিয়া কাণ্ড, অনুষ্ঠান ইত্যাদি উৎযাপন করেন। সে জন্য বেদজ্ঞ ঋত্বিক ইত্যাদি কাশী অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হতে দূত দ্বারা আমন্ত্রণ করে আনান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন ঐ সময়েই হয়। পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসেন। তাঁদের একজনের নাম "রানা অনাদিবর সিংহ। যজ্ঞান্তে আদিশূর রানা অনাদিবরকে সিংহপুর নামক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বহুগ্রাম উপঢৌকন দিয়ে সামন্ত নৃপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন (২০৩ বঙ্গাব্দে)। ঘটনাটি কারিকার মধ্যে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

"দুইশত তিন বতি সালের অগ্রহায়ণে।
রানা অনাদিবর সিংহ সামন্ত রাজনে॥
গঙ্গার পশ্চিম তটে নাম সিংহপুর।
সামন্ত রাজ কৈলা আদিত্য ভুশূর॥"

বহুকাল পরে (একাদশ শতক) বল্লাল সেন সামাজিক গণ কর্তৃক নিন্দিত হলে (ঘটনা অনত্র উল্লেখিত) ক্রোধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্যদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। প্রায় অনেকেই প্রাণ ভয়ে মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ ঐ অন্যায়

খেয়াল বরদাস্ত করেন নি। ফলে কুলাচার্যকে বল্লাল সেন হত্যা করেন। রাজা ৯৯৫ শকে বোধহয় এই বাধ্যতামূলক প্রথা চালু করেন।

এ বিষয়ে যদুনন্দন বলেন—

যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চুরানব্বই শকে না ছিল একদা॥

কুলাচার্য্য (বল্লাল সেনের মন্ত্রী) ব্যাসসিংহের ঘটনাটি এ যুগেও এক নির্ভীকতার অপার বিস্ময় (তবকৃত কুলবদ্ধ মান্য না করিব)।

তৎপর যে না মানে হুকুম আমার।
ক্রোধে পরিপূর্ণ দেহ হইল রাজার॥
করাতি ডাকাইয়া সভামধ্যস্থলে।
ব্যাস সিংহের মস্তক চিরহ এই স্থলে॥
তখনি মন্ত্রীর মাথে করাত ক্ষেপন।
করিয়া টানয়ে তারা আজ্ঞার পালন॥

এমনি কত ঐতিহাসিক ঘটনা—কুল কারিকার প্রতিটি পত্রাঙ্কে সযত্নে সজ্জিত রয়েছে। যা' মুল্যবান গণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলির সাহায্য অপরিহার্য।

প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহিত্যেও প্রায় প্রতিটি শাখার ভনিতা ব্যবহার করার প্রথাগত রীতি ছিল। তাতে কেউ কেউ নিজেকে দীনহীন বললেও নিজের নামের পূর্বে "কবি" আখ্যাটি সগর্বে উল্লেখ করতেন। কিন্তু কুলকাব্যের—সদাশিব ঘটক—যদুনন্দন, শ্যামাদাস, কাশীদাস, অভিরাম—ঘনশ্যাম মিত্র ও শুকদেব কেউই স্ব স্ব কাব্যের অন্ত চরণের ভনিতায় নিজের নামের আগে বা পরে "কবি" শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তাঁদের কৃত ভনিতাগুলি সরল এবং বাহুল্যবর্জিত ও আধিদৈবিক আশীর্বাদে ভারাক্রান্ত নয়। যথা—

কৃষ্ণের তনয় শ্যাম করি পরিহার।
গ্রামগত লিখি ভাব করিয়া বিচার॥

(শ্যামানন্দ)

ঘনশ্যাম মিত্রের বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ার নিকট গোমতী (গুমতা) নামক গ্রামে। ভনিতায় তার উল্লেখ করে লিখেছেন—

মিত্রকুলে জন্ম আমার গোমতীতে বাস।
ঘনশ্যাম নাম মুই শ্রীকরণের দাস॥

আত্মপ্রসাদে ক্ষ্যান্ত, আত্মপ্রচারে বিরত—সুখ্যাতির জয়মাল্য বঞ্চিত এই সব নির্ভীক—নিরলস—সনিষ্ঠ সাহিত্য সাধকগণের সৃষ্ট কাব্যকৃতির মধ্যে তাই আমরা দেখতে পাই—অনাড়ম্বর এক বিশিষ্ট অনুধ্যান। যা' ইতিহাসকে অবলম্বন করেই মূলত উৎসারিত। ৲

তথাপি তাঁদের রচিত কাব্যগুলির মধ্যে যে মহার্ঘ কাব্যমূল্য নীরবে পুঁথিপৃষ্ট হয়ে অনুচ্চারিত—তাকে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

"শুনে কহি দাস বংশ অবনীতল সুপ্রশংস
রাঢ়ে বঙ্গে বারেন্দ্রে বিখ্যাত।
অত্রিগোত্র সুপবিত্র শুদ্ধমূল কুল সূত্র
পশ্চিমে পূর্বেতে পরিচিত॥"

"গঙ্গাতীরে পূর্ব বাস রাঢা ধন্ত সুপ্রকাশ
মহত্তম পদে অধিষ্ঠান।
নন্দীসেন গুহসনে ছিল সবে সানন্দ মনে
স্বজাতি সমাজে বহুমান॥"

(কাশীদাস কৃত কারিকা)

একথা স্বীকার্য যে সাধারণ কাহিনী কাব্যের চেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা ভিত্তিক কবিতা রচনা করা বহুতরো কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে কুলগ্রন্থে সাল তারিখ নাম ধাম ও গোত্র পরিচিতির নৈষ্ঠিক প্রাধান্যই বেশী।

তথাপি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও—এইসব কবিতাগুলিতে কাব্যগুন পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত।

কহিব নন্দীর কুল আদি হইতে শুদ্ধমূল
কাশ্যপ গোপের বংশ সার
সর্বনামে করে পূজা করেন্থ অমিত তেজা
মহামান্ত বদান্ত প্রচার॥
তমসার তীর বন্দী আছিল মানিক্য নন্দী
তার পুত্র শিব নন্দী মানি।
অশেষ পুণ্যের ফলে পুজিত রাজার কুলে
পুত্র তার শঙ্কর ভবানী॥ (কাশী দাস)

বিখ্যাত সন্ধ্যাকর নন্দীর এই বংশ পরিচিতি কাব্যের সঙ্গে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের কবিতা বিশেষের সামিলতা লক্ষ্যনীয়।

"একদেব" নামে দেববংশীয় সজ্জন ব্যক্তি পাল রাজসভায় সম্মানিত হয়েছিলেন। সে সময় ১ম মহীপাল বারেন্দ্র চোলকে বিতাড়িত করে উত্তর রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণে অবস্থান করছিলেন। ঐ একদেবের বংশ বর্ণনায় কাশীদাস এক রসোত্তীর্ণ কবিতা নির্মাণ করেছেন, এবং লক্ষ্য করার বিষয় শুধুমাত্র প্রশস্তিই কারিকা কাব্যের উপজীব্য ছিল না। কৃপণ শ্রীধরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটিও যথার্থই উপভোগ্য। অনুপ্রাস ও উপমা গুলিও কাব্য ভাবনাসিক্ত।

"পূর্ব বাস ছাড়ি অঙ্গে   একদেব আইলা বঙ্গে
তাহার বংশে যোগদেব নাম॥
বিদ্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি   মহামন্ত্রী মহামতি
রাজ বশ সর্বত্র সুনাম।
তাহার নন্দন চারি   সবে অস্ত্র শাস্ত্রধারী
বোধি, জ্ঞান, মধু, শ্রীধর।
বোধিদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র   সেই হইল মহাপাত্র
পিতৃ নাম করিল উজ্জ্বল॥
জ্ঞানের সুজ্ঞান কথা   আছে রাষ্ট্র যথা তথা
মধুকর দেব কুলহর।
শ্রীধর স্বভাবে খাটো   কুলেশীলে বড়আঁটো
ধনদৌলত করিল বিস্তর॥"

রাজাদের দ্বারা নিযুক্ত ঐতিহাসিকগণের মত পক্ষপাত দোষদুষ্ট ইতিহাসের ন্যায়—কুলাচার্যগণ কেহই কুল ইতিহাস রচনা করতেন না। তাঁরা ছিলেন স্বাধীন ও অকুতোভয়। তাই তাঁরা নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি বিষয় প্রকাশ করতে সমর্থ হতেন। তাঁদের এই ঐতিহাসিক সততার কথা চিন্তা করে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অবাক হতে হয়। বিজয় সেনের পুত্র স্বনামখ্যাত বল্লাল সেন পরিণত প্রৌঢ় বয়সে শিকার করতে গিয়ে এক ডোম বা চণ্ডাল কন্যার রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে রাজধানীতে নিয়ে এসে রক্ষিতা হিসাবে রাখেন। কবিতায় ঘটনাটি সামগ্রিক ভাবে একটি অপূর্ব আখ্যায়িকা কাব্যের রূপ নিয়ে প্রকাশিত। স্থানাভাবেই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে
বহুদূর গেল বনে সৈন্য করি সাথে।

দেখে একস্থানে বনে মনুষ্যের বাস।
নীরের কারণে রাজা করয়ে তল্লাস ॥
এক অতি অপূর্ব সুন্দরী আছে বসি।
অপরূপ রূপ তার বয়সে ষোড়শী ॥
... ...
রূপ হেরি নারীর অধৈর্য হৈল মন।
এ নারী সামান্যা নহে করে অনুমান ॥

তারপর রাজা তাকে যত্ন সহকারে—রাজধানীতে নিয়ে এলেন। এবং মেয়েটির পিতাকে বনের সামন্ত রাজ করে বিদায় করলেন।

আনিল দোলাসহ বাহক বারোজন।
আনাইল যুবতীরে করিয়া যতন ॥
সঙ্গে করি লইয়া চলিলা রাজনে।
স্বতন্ত্র বাটীতে তারে রাখেন যতনে ॥
তাহার পিতারে করি সেই বনেশ্বর।
বহু অর্থ দিল তারে বল্লাল নরবর ॥
ক্রমে ক্রমে সেই কথা হইল প্রকাশ।
রাজ্য ভরি নৃপতির হইল অপযশ ॥

এমন কি পুত্র লক্ষ্মণ সেন পর্যন্ত লজ্জায় রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কুমার থাকিতে নারে কলঙ্কের ভয়।
গৃহত্যাগ করি কুমার নবদ্বীপ যায় ॥
তথায় রহিল পুত্র পিতা থাকেন স্ববাসে।
রাজার চরিত্রে সর্ব জনগণ হাসে ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "জনগণের" এই বিশেষ মূল্যায়ন আর কোথাও উৎকীর্ণ আছে কিনা জানি না। তবে সমস্ত দিক থেকে উপরোক্ত কবিতাটি চর্চার বিশেষ অপেক্ষা রাখে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে মধ্যযুগীয় পর্যায়ের সাহিত্যকৃতির মধ্যে অনুপ্রাসের প্রাধান্য মাত্রারিক্ত ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কুল কারিকা গুলিও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তা'ছাড়া তার সঙ্গে ঘটেছে প্রাচীন ছড়া—ডাক আর প্রহেলিকার মিশ্রন। তথাপি লক্ষ্য করার বিষয় দুরূহ উপজীব্যকে প্রহেলিকার সমবায়ে কি সুন্দর সহজ সরল অনুপ্রাসের মালা দ্বারা কাব্যের শরীরে গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন।

"ভরত কুলে ধারাযুগল চরণ পরে রাম।
রামের পালটি বংশী, বংশে—বংশহীন নাম॥
চরণধারা যুগলতারা উভয়পক্ষ দেখি।
বরকুণ্ডা মধুর পরে বহুরানে সিখি॥"　　(ঘনশ্যাম মিত্র)

এই ধরনের কবিতা নির্মাণে ঘটক সদাসিব আরো চমৎকার। তাঁর বর্ণনা—প্রহেলিকা ও অনুপ্রাসগুলি কাব্যময় ও শ্রুতিমধুর। বিশেষ করে—"রাজার কোলে" ও "কমল মাঝে" পঙক্তিগুলি এক কথায় অপূর্ব !

(রুদ্র সিংহ ও পৌত্র বল্লাল সিংহ বাদশাহের নিকট বহু অর্থ উপঢৌকন পান। বল্লাল সিংহ বাদশাহের একান্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন)

রাজার কোলে রুদ্র দোলে উভয়পক্ষ তাতে।
জ্যেষ্ঠ উদ্ধাবন সিদ্ধিদাতা গণেশ সিংহ যাথে॥
…　　…　　…
কমল মাঝে চাঁদ বিরাজে রাজবল্লভ শেষে।
চাঁদের গ্রহণ দামপলসায় অবধান কেশে॥
…　　…　　…
দানে তুঙ্গ সাধু সঙ্গ সদাই উল্লাস।
দেখ মণ্ডল বল্লাল কুলে কমল প্রকাশ॥

অতি স্বল্প কথায় কত সুন্দর তথ্যময় কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে সদাশিবের এই দু'টি পঙক্তিই তার জাজল্য প্রমাণ। ছোট্ট সামন্ত রাজের এক অপূর্ব ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর কবিতায়।

ধন্য রাজা শুকদেব ধন্য নীলকণ্ঠ।
কুলেশীলে দানে ডাকে প্রতাপে প্রচণ্ড॥

পূর্বেই বলা হয়েছে কারিকার কবিতা শুধুমাত্র প্রশস্তি বাচক নয়। তাঁরা সত্য কথা অকপটে বলতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু তাও লিখতেন নিজের মনের কাব্যময় রঙে নিষিক্ত করে।

(কড়ার বামদেব বংশে দৈবকীনন্দন সিংহ অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিলেন। তিনি ১,৬৬৮ খৃঃ ঔরঙ্গজেবের নিকট হতে কানুনগো ফার্মান পান। ফলে প্রচুর বাদশাহী ফৌজ তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল।)

"বঙ্গ মাঝে চণ্ড সাজে দৈবকীনন্দন।
শুদ্ধ মেলে তুঙ্গ কুলে শোভিত চন্দন॥"

(সদাশিব ঘটক)

ফুল কারিকার এই সমস্ত কবিতাগুলি সম্পর্কে কিছু চর্চা বা বিশ্লেষণ করার আগে নান্দীপাঠক সূত্রধারের মত শ্রদ্ধার সঙ্গে পূর্বসূরীদের স্মরণ করে যে কথাটি বলতে চাই, তা' হচ্ছে—বাংলার প্রচীন কবি গোষ্ঠীর বিরাট পরিবারে এঁরাও গোত্রভুক্ত সমান শরিক।

কৃষ্ণ ধর

মস্কো থেকে দেখা

(৬)

মস্কোভা নদীর জল অবিরল বহমান। রাত্রির মস্কো আশ্চর্য। দূরে ক্রেমলিনের চূড়ায় জ্বল জ্বল লাল তারা।

পথযাত্রীরা চলেছেন। ট্যাক্সি ছুটছে যাত্রীদের নিয়ে তার গন্তব্যে।

হোটেল রোসিয়ার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমার কেমন জানি নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। বার বার মনে পড়তে লাগল কলকাতার কথা। কত দূর মস্কো থেকে কলকাতা। অথচ মনের দিক থেকে কত সান্নিধ্য।

তরুণ বয়সে, সে কবেকার কথা, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির ছেচল্লিশ ধর্মতলার সেই তেতলার ঘরটিতে আলোচনার আসর বসত। সোভিয়েট সাহিত্য নিয়ে হত আলোচনা; আমাদের লেখকদের লেখাও পড়া হত।

তখন ইয়োরোপে যুদ্ধ চলছে। নাৎসীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। আমরা রুশ রণাঙ্গণের যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছি অদম্য আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে।

তারি সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করছি সোভিয়েট লেখকদের রচনা। নতুন সমাজের নতুন জীবনের সংকেত।

শলোকোভ শোনাচ্ছেন ডন নদীর কাহিনী। এ যেন আমাদের পুণ্যতোয়া ভাগিরথী। সে এক আশ্চর্য রূপকথা। সোভিয়েট সমাজের সত্য রক্তমাংসের মানুষের কাহিনীর মাধ্যমে দূরান্তরের পাঠক আমাদের কাছে তিনি পৌঁছে দিলেন।

আমার অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন সে যুগে আলেকসি টলস্টয়। মহান টলস্টয়েরই বংশধর। তাঁর 'দি অর্ডিয়েল' 'রোড টু ক্যালভারি' অসামান্য লাগত।

আশ্চর্য এক কবিতা পড়েছিলাম 'ওয়েট ফর মি', কনস্টানটাইন সিমোনোভের লেখা। গত যুদ্ধের সময় এ কবিতা রণাঙ্গণে লালফৌজকে দিয়েছিল প্রেরণা। সিমোনোভ এই একটি কবিতার জন্য স্মরণীয়। সোভিয়েট লেখক সংঘের অন্যতম প্রধান এখন এই বর্ষীয়ান লেখক।

সিমোনোভের একটি প্রেস কনফারেন্স ছিল গতকাল। সোভিয়েট সাহিত্য বিষয়ে পশ্চিমী সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি।

নায়ার টেলিফোন করলে উন্নিকৃষ্ণনকে। মালয়ালী ভাষায় কী বলল একবর্ণ বুঝতে পারলুম না। মালয়ালী ভাষার মাধুর্যও হৃদয়ঙ্গম হল না। ভাষা শুধু কানের কাছেই আবেদন নিঃশেষ করে না; হৃদয়কে নাড়া দিলেই সে আবেদন সার্থক ও শ্রুতিমধুর।

বললুম, কী বললে নায়ার?

'উন্নিকে আসতে বললাম।'

'তুমি ওকে চেনো?'

'পরিচয় নেই। নামে জানি তা ছাড়া দুজনেই তো এক পালকের পাখি। উন্নি কেরালার লোক এখানে আছে প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার সংবাদদাতা রূপে।

উন্নিকৃষ্ণনের ডেসপ্যাচ আমি পড়েছি উন্নি তখন দিল্লির পেট্রিয়টে লিখতেন।

আমিও মস্কো এসেই ফোন করেছিলাম ননী ভৌমিককে। আমাদের পরিচিত বন্ধু। এক সময়ে পরিচয়ের সম্পাদনা করতেন। উত্তর বাংলার কৃষক জীবন নিয়ে আশ্চর্য গল্প লিখেছেন এক সময়ে। একটি উপন্যাসও লিখেছেন 'ধুলোমাটি'। এখন মস্কোপ্রবাসী।

ফোন করতেই রুশ ভাষায় মহিলার কণ্ঠস্বর: কাকে চাই?

আমি বললুম, ননী ভৌমিককে চাই।

'চিনতে পারছেন?' পরিচয় দিলাম নিজের।

ফোনেতে লাফিয়ে উঠলেন ননী ভৌমিক। বললেন, ক'দিন আছেন?

বললুম, মস্কোতে ক'দিন আছি বলতে পারছি না। আমাদের ভ্রমণসূচী সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হাতে।

'আসুন একবেলা।' ননী ভৌমিকের অনুরোধ, আগে থেকে জানালে আমিও যেতে পারি। কলকাতার খবর কী? আপনার কবিতা পড়ি এই দূর দেশে থেকেও। সম্পাদকীয় স্তম্ভের আড়ালে কবিতা যেন চাপা না পড়ে।'

বললুম, ফেরার পথে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। কলকাতার বন্ধুরা বলে দিয়েছিলেন, মস্কোতে অগতির গতি ননী ভৌমিক।

দুঃখ থেকে গেল শেষ পর্যন্ত ননী ভৌমিকের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি। ফেরার পথে হাতে বাড়তি সময় ছিল না।

সকালবেলার কফির আসর খুব জমে উঠল। এলেন উন্নিকৃষ্ণণ, নায়ারের আমন্ত্রণে; এলেন সুন্দরম্ শর্মাজীর ফোন পেয়ে। সুন্দরম্ এখানে ফরেন ল্যাংগুয়েজ পাবলিশিং-এ আছেন। কিউতে দাঁড়িয়ে খাবার আনলেন উন্নিকৃষ্ণণ ও সুন্দরম্। আমরা দাম দিতে গেলুম, কিছুতেই দিতে দিলেন না।

'তোমরা অতিথি। আমরা মস্কোভাইট। অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ দেওয়া উচিত খাঁটি ভারতীয় ট্রাডিশনে।' বললেন দুই ভারতীয় প্রবাসী বন্ধু। বিস্তর খাদ্য; রুশ ইয়োগর্ড, গ্লাসভর্তি, আমরা যাকে দই বলি। সেদ্ধ ডিম, হ্যামবার্গার, আঙুর, ব্রাউন রুটি, মাখন ও দুধ-ছাড়া চা। দু বোতল দুধও নেওয়া হল শর্মাজী ও মূর্তির জন্যে। ওরা নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত।

দুচার দিনে একটা শহরকে চেনা যায় না। তার মানুষকে জানতে হলে অপেক্ষা করতে হয়।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল কোনো রুশী পরিবারের সঙ্গে থাকবার।

আমাদের দোভাষী কালুগিন খুব সিরিয়স ধরণের লোক। ফরেন সার্ভিস ফেরতা; ওর স্ত্রী একটি স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। একটি মেয়ে। নাম নাতাশা। স্কুলে পড়ে। সময় হলনা ওর বাড়ি যাবার। কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাংলাদেশের হাতের কাজের নিদর্শন। যখন যাকে পাই তাকে উপহার দিই। আশ্চর্য খুশি হয়। নাতাশার জন্য খেলনা দিলুম। কালুগিন কোনো কিছুতেই খুব বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। তবে বোঝা গেল, সে খুশি হয়েছে।

অনেক গল্প শুনি।

নায়ার একটু খুঁত খুঁত করছিল। যখন তখন চা পাওয়া যায় না। সদ্য আমেরিকা ভ্রমণের স্মৃতি তার। আমেরিকানরা এসব বিষয়ে অনেক বেশি পাকা-পোক্ত। অতিথিদের খুশিমত কেনাকাটা, চা-কফি খাবার জন্য ডেইলি এলাওয়েন্স দেয়। আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝুলি ছিল সামান্য।

সুন্দরম বলে, জানো ওরাও খুব করতে চায় অতিথিদের জন্য। টাকা পয়সার কথা ওরা চিন্তাই করে না। তবে এই তো সবে বিদেশীদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ মেলামেশা হচ্ছে। একটু আধটু ত্রুটি থাকবেই।

আমি নিজে ওদিকে নজর দিইনি। বিছানার চাদর রোজ পাল্টানো হয় কিনা, আমার কাছে তা অবান্তর। হলে ভাল, না হলে ক্ষতি নেই।

একটা গল্প শুনলুম চায়ের টেবিলে। হয়তো গল্পই। একবার চলপতি রাও এসেছিলেন মস্কোয়। চলপতি আমাদের সাংবাদিক কূল চূড়ামণি। ন্যাশনাল

হেরাল্ডের সম্পাদক। এমন জোরালো কলম এখানে খুব একটা দেখা যায় না। নেহরুজীও তাঁকে মান্য করতেন। তাঁর লেখা পড়তেন আগ্রহ করে। প্রবীন সংবাদিক এসেছেন কোনো একটা ডেলিগেশনে। উঠেছেন মস্কোর একটা হোটেলে।

হয়তো জায়গার অভাব, কিংবা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি। চলপতিকে দেওয়া হল একটা ডবল-সিটেড রুম। অসুবিধা হবারই কথা। কিছু বললেন না তিনি।

এক ভোজসভায় চলপতির সম্বর্ধনার আয়োজন। সোভিয়েট-ভারত মৈত্রী নিয়ে অনেক কথা বলা হল।

চলপতি তাঁর নিপুণ ভঙ্গিতে হোটেলে থাকবার ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কথা উল্লেখ করে হাসতে হাসতে বললেন, ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশে, ইভন য়ু ক্যানট মেক মি অ্যান্টি-সোভিয়েট।

কালুগিন মাথা চুলকে বললে, নিশ্চয়ই সে অনেক বছর আগেকার কথা। এখন তা হবে না!

গল্প গুজবে সকাল বেলার আসর জমে উঠত এক একদিন।

উন্নিকৃষ্ণন বললেন, এরা খুব সহজ সরল। বুর্জোয়া দেশের কায়দাকানুন এখানে পাবেনা। কিন্তু সরল আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি নেই। অসুবিধা হলে মুখ ফুটে বলবে। আমার মনে পড়ল দিল্লিতে মিঃ কুলান্দাও তাই বলেছিলেন, অতিথির মতো ব্যবহার করো না! নিজের বাড়ির মতো যখন যা দরকার বলবে।

কথা উঠল রাশিয়ায় ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয়তা নিয়ে। রাজকাপুরের আওয়ারা প্রথম রুশীদের হৃদয় জয় করে।

আমি বললুম, ভাবতে খুবই অবাক লাগে সোভিয়েট দেশে আমাদের হিন্দী ফিল্ম এত আদর পায়।

সুন্দরম বললে, অবাক হই আমরাও। সিনেমা হলে গেছি। কোনো হিন্দী বই দেখানো হচ্ছে। আজগুবি রোম্যান্টিক কাহিনী। আমাদেরই অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু লক্ষ করি আমার পাশে-বসা রুশী মহিলারা রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। রীতিমত আবেগ রুদ্ধ।

'কেন এমন হয়?'

'খুবই স্বাভাবিক। রুশী ছবি হল পারপাশফুল; ওরা সাধারণ গল্প খুব

বেশি পায় না। তাই ভারতীয় ছবির সহজ সরল গল্প দেখে এত আপ্লুত হয়ে পড়ে।'

রাজকাপুরের বই অবশ্য অন্যান্য বাজার চলতি হিন্দী বইয়ের মতো নয়। তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য প্রথম শ্রেণীর। আওয়ারা পঞ্চাশের দশকে আমাদের দেশে খুব আলোড়ন তুলেছিল। গল্পটির বক্তব্যও সার্থক। রুশীদের ভাল লাগবার কারণ আছে।

চলচ্চিত্র শিল্পে রাশিয়ার দান অসামান্য। আইজেনস্টাইন পুডভকিন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিচালক। পুডভকিন এসেছিলেন কলকাতায়, পঞ্চাশের দশকে, একটি সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে। আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন' সম্ভবত ১৯২৫ সালে তোলা; আজও তা তুলনাবিহীন। নায়ার ফিলম ইনষ্টিটুটের সঙ্গে যুক্ত। ওর খুব ইচ্ছা ছিল মসফিলমের ষ্টুডিয়ো দেখা।

যা হয়, আমাদের আমন্ত্রণকারীরা শেষ পর্যন্ত তার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। এত ডেলিগেশন ছিল ওদের হাতে, সবার সব অনুরোধ রাখা বোধ হয় ওদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা।

নায়ার ক্ষুণ্ণ হলো। বললে, কেরালায় ফিরে গেলে আমার সিনেমা জগতের বন্ধুরা জানতে চাইবে কি নতুন টেকনিক দেখে এলে ওদের সিনেমা ষ্টুডিয়োতে। বরাত খারাপ, কিছু বলতে পারব না।

আমি বললুম, পরের বার এলে দেখবে।

নায়ারের ক্ষোভ যায় না। বলে, আমি অনেক আগেই ওদের জানিয়ে দিয়েছিলুম কী কী দেখতে চাই। ওরা পারবেন না ও কথা তো বলেননি। আমাদের দেশে হলে কিন্তু সোভিয়েট প্রতিনিধিরা যা দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন আমরা দেখাবার চেষ্টা করতুম।

'তা ঠিক। এ সব বিষয়ে ওদের কর্মকর্তারা আর যাই হোক করিৎকর্মা নয়।'

শাসা চুপ করে থাকে। কূটনৈতিক বিভাগে কাজ করেছিল বলেই বোধ হয় শাসা কখনো আমাদের হতাশ করতনা কথায়। বলত, আমি চেষ্টা করে দেখব। শেষ পর্যন্ত বলত, সময়ের অভাবে ব্যবস্থা করা গেল না, দুঃখিত। সব সময়েই হাসিমুখ। আমাদের শত শত কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর জোগাত সাধ্যমত। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত থেকে সুরু করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরের দ্বন্দ্ব, সব প্রশ্নেরই বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণ করে দিত আমাদের। সাহিত্যে

ওর বুৎপত্তির তারিফ করতুম আমরা। অনেক কবিতা ওর মুখস্থ; সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ দক্ষতার অনুবাদ করে দিত আমাদের।

ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেসেস কনসার্ট। সাতটায় শো। বিকেলের চা পর্ব শেষ করে আমরা চললুম।

শাসা বললে, একটু পা চালিয়ে হাঁটো। সময় মাত্র পনেরো মিনিট বাকী। আমাদের হোটেলের কাছেই। ট্যাক্সি না করে হেঁটে চললুম আমরা।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে সেদিন মস্কোতে। জ্যাকেটের ওপর কোট চাপিয়ে রাজিন স্ট্রিট দিয়ে চলতে সুরু করি।

সাতটা প্রায় বাজে। মস্কোর আকাশে তখনও আলো। এখানে আটটা কি তারও পরে সন্ধ্যে হয়। প্রচুর নারী পুরুষ চলেছে। সবারই গন্তব্য মনে হল যেন প্যালেস অব কংগ্রেসেস।

আশ্চর্য এদের সংস্কৃতিপ্রিয়তা। পাড়ায় পাড়ায় আমাদের কলকাতার মতো বিচিত্রানুষ্ঠান হয় না। অজস্র থিয়েটার হলে প্রতিদিনই হয় নাম-করা শিল্পীদের অনুষ্ঠান। তার জন্য অনেক আগে থেকেই টিকিট বুক করা থাকে। বলশয় থিয়েটারে যেতে হলে দুমাস আগে টিকিট কাটতে হয়। সাতটার এক মিনিট পরে গেলে হলের দরজা বন্ধ। তাই সবাইকে দেখলুম যেন ছুটছে। তরুণ তরুণী, বয়স্ক, প্রবীণা সবাই। ওরা নিয়ম মেনে চলে। সবারই জন্য এক নিয়ম। ভি, আই, পি বলে কেউ নেই। সবাই সমান মর্যাদার। সকলের কাছেই এদের সমাজ সমান নিয়মনিষ্ঠা দাবি করে।

ক্রেমলিন প্যালেস্ অব কংগ্রেসেস্ নতুন তৈরি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কাচের বিরাট দরজা। হলের ওপর মৈত্রীর পতাকা উড়ছে হেমন্তের হিমেল হাওয়ায়। এত পরিচ্ছন্ন যে সূচ পড়লে দেখা যায়। দরজার সামনে সবাই আমরা ভীড় করে আছি। অথচ কোনো জটলার ভাব নেই। তাড়াহুড়া নেই। একের পর এক ঢুকছেন সবাই। সুশৃংখলভাবে। বিরাট অডিটোরিয়াম। তেমনি সুদৃশ্য তার লাউঞ্জ। এখানে বড় বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়; সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন হয় এখানে। শুনলুম প্রায় দশ হাজার লোকের বসবার জায়গা আছে। ওপরে-নীচে। লাল গদী মোড়া আসন। প্রত্যেক আসনের সঙ্গে হাত রাখবার ও কাগজপত্র রাখবার জায়গা। প্রত্যেক সারির মাঝখানে প্রশস্ত চলাফেরার জায়গা যাতে ঢুকতে বা বেরোতে কারু অসুবিধা না হয়।

স্টেজ এত বড় কোনোদিন দেখিনি। মনে হল দুশো লোক একসঙ্গে অভিনয় করতে পারে বা কনসার্ট বাজাতে পারে।

সোভিয়েট ব্যালের খ্যাতি প্রশ্চিমী দেশগুলোতেও আকাশ-ছোঁয়া। দিন দিন তার উৎকর্ষ বাড়ছে। সংস্কৃতির মহান ট্রাডিশন সোভিয়েট সমাজ ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। তফাৎ এই, আগে এই উচ্চাঙ্গের নৃত্যশিল্প বা সঙ্গীতের দর্শক বা শ্রোতা ছিল বুর্জোয়া বাবুরা। এখন একজন সাধারণ শ্রমজীবীও তার আসন পায় বলশয় থিয়েটারে। সেও এই সুকুমার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে। জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নয়নের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। আর সম্ভব হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ অবসর উপভোগের দুশ্চিন্তাহীন সুযোগ পেয়েছে বলে।

তাকে ভাবতে হচ্ছে না, কাল রুটির জোগাড় কীভাবে হবে; ভাবতে হচ্ছে না কোন মহাজনের কথা যাকে সুদের টাকা গুণে দিতে হবে মাসকাবারে। সে আজ স্বাধীন স্ব-নিষ্ঠ। সংস্কৃতি চর্চার মহত্তম সুযোগ তার করায়ত্ত। কারখানার স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকও আজ জানে রাশিয়ার মহান সাহিত্যের খবর, তার মহান শিল্পচর্চার সংবাদ। সমাজতন্ত্রই তা সম্ভব করেছে। সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের উন্নয়নই এই রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য। তথাকথিত সংস্কৃতি-প্রেমী বা মেকী বুদ্ধিজীবীদের হাতে সাহিত্য বা সংস্কৃতি চর্চার দায়িত্ব দিয়ে এ সমাজ ঘুমিয়ে নেই।

তাজিকিস্তানের চাষী কিংবা ইউক্রাইনের শ্রমিক আজ মস্কো শহরে এসে অথবা তাদের নিজের শহরেই সাংস্কৃতিক চর্চার অংশভাগী হতে পারে। এ শুধু শহুরে কালচার নয়। রাশিয়ায় লোকসঙ্গীত, শিল্প এবং নৃত্যকলার সংরক্ষণ ও বিকাশ দেখলে মুগ্ধ হতে হয়।

যন্ত্রসভ্যতার প্রসার লোকশিল্পের কণ্ঠরোধ করেছে অনেক দেশে। আমেরিকায় কি পশ্চিম ইয়োরোপে এর পরিচয় পাওয়া যায়। রুশ দেশের মানুষ আশ্চর্যরকম দেশজ ঐতিহ্যের অনুরাগী। জনগণের সঙ্গীত বা নৃত্যকলাকে তারা নষ্ট হতে দেয়নি। এ শুধু আমার কথা নয়। এ বিষয়ে যারা চিন্তা করেন, চর্চা করেন তাঁদের কথাও। আমি মস্কো থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই কলকাতায় এসেছিলেন একটি রুশ লোকসঙ্গীত-শিল্পীর দল। মোলডেভিয়া প্রজাতন্ত্রের বিখ্যাত 'ফ্লুয়েরাশ'; তাদের অনুষ্ঠান দেখে শ্রীমতী অমলাশংকর বলেছিলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরেছি: শিল্প-জগতের খবর আমার জানা। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে কারু তুলনা হয় না।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে এদের শিল্প ও সুকুমারকলার উন্নয়ন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পীর যথার্থ সম্মান দিতে জানে এরাই। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য বা লোকশিল্পের কোনো ধারাকেই নষ্ট হতে দেয়নি সোভিয়েট সমাজ।

জনতার নিজস্ব সৃজনধর্মে গড়ে উঠেছে যে শিল্প-কলা তার প্রতি আশ্চর্য মমতা সোভিয়েটের নতুন মানুষের। পশ্চিম ইয়োরোপের অভিজাত বাবুশ্রেণীর মানুষ এক সময়ে রাশিয়াকে ভাবত গেঁয়ো বলে। জার-শাসিত রাশিয়ার মানুষ ছিল অবজ্ঞাত, অবহেলিত। প্যারিস ছিল ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী। অনেক রুশ বুদ্ধিজীবী তখন যেতেন প্যারিসে না হয় ভিয়েনায়। জারের রাশিয়ার শ্বাসরোধকারী পরিবেশে জ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল বিরল।

পিটার দি গ্রেটের আমলেই রাশিয়া পুরোপুরি ইয়োরোপের সমান পংক্তিতে বসবার সুযোগ পায়। তিনিই রাশিয়ার ইয়োরোপীয় পোষাক পরা চালু করেন। বাল্টিক সাগরের যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি ইয়োরোপের দরজা খুলে দেন রাশিয়ার কাছে। আজকের লেনিনগ্রাদ সেদিন নাম বহন করত তাঁরই, পিটার্সবার্গ।

দেবতারা দেশ গড়েন না। মানুষেরই হাতে গড়ে ওঠে দেশ। স্বর্গরাজ্য দেখব আসা করে রাশিয়ায় আসিনি। মানুষ তার শ্রমে ও সংকল্পে একটি দেশকে কীভাবে নতুন করে গড়েছে তার পরিচয় পাব বলেই এখানে আসা।

মনে মনে মিলিয়ে দেখি, যাচাই করি। এই সমাজ তো একটা নতুন পরীক্ষা। লেনিনের সামনে কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না সমাজতান্ত্রিক সমাজের। ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তা এবং তাঁর নিজস্ব ভাবনা। তিনি কাদামাটি দিয়ে গড়লেন এক আশ্চর্য প্রতিমা; তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন অসামান্য নিষ্ঠায়।

বিপ্লবী তিনি সব অর্থেই; মহান শিক্ষক তিনি নিজের গুণেই। ভাবকদের স্তোকবাক্যে তিনি ভোলেন নি; অতি বিপ্লবীয়ানায় ফাঁদে পা দেন নি তিনি। একদিকে বৈষয়িক উন্নয়ন, অন্যদিকে মানসিক আহার্য জুগিয়েছেন তিনি এই নতুন সমাজের মানুষদের। শিল্পসাহিত্য বিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল স্পষ্ট, বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং ঐতিহ্যসচেতন। এ বিষয়ে গোর্কির সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ স্মরণীয়।

তিনি শিল্পীদের বুঝতেন। রাজনীতিবিদের অসহিষ্ণুতা দিয়ে তিনি কোনোদিন সৃজনধর্মী শিল্পী মানসকে বিচার করতেন না।

তাঁর কাছে পুশকিন ছিল প্রিয়; বিপ্লবী মায়াকভস্কির সপ্রাণ কবিতাও তাঁকে আকৃষ্ট করত। টলস্টয় বিপ্লব-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর মহান শিল্পকর্ম লেনিনকে দিয়েছে জার-শাসিত রাশিয়াকে জানবার অভ্রান্ত সুযোগ। শোষিত মানুষের চিত্র এমন সহৃদয়তার সঙ্গে কে তুলে ধরেছিলেন টলস্টয়ের মতো?

লেনিনের এই শিক্ষা রুশ সংস্কৃতিজীবীরা ভোলেননি। প্যালেস অব কংগ্রেসেসে সেদিনের সন্ধ্যায় অনেক রকম অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ হয়েছিল। রুশ ব্যালে নাচ কলকাতাতেও দেখেছিলুম পঞ্চাশের দশকে। বলশয়ের অনিন্দ্য নৃত্যপটিয়সী মায়া প্লিসেৎস্কায়া এসেছিলেন কলকাতায়। মস্কোতে বসে রুশ শিল্পীদের নাচ দেখে মনে হল, কত নিষ্ঠায় এই অপরূপ শিল্পকর্মকে ওরা সার্থকতর পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কসাকদের যৌথ নৃত্যও দেখলুম। আমার বার বার মনে পড়ছিল পাঞ্জাবী ভাংরা নাচের কথা। তেমনি সবল, সপ্রাণ এবং সুদক্ষ।

আমাদের দেশে লোকনৃত্য যথেষ্ট আকর্ষনীয়, জনজীবনের স্পর্শে তা সতেজ এবং নির্ভেজাল শিল্পের অন্তর্ভূ্ত। আমরা তাদের কতটুকু সুযোগ দিতে পারছি, এই আশ্চর্য শিল্পকলা অনুশীলনের। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এই মহৎ সুযোগ দিতে পারছে বলেই রুশ লোকনৃত্য, গণ সঙ্গীত আর শিল্পকর্ম এত তারুণ্যদীপ্ত।

একজন শিল্পী গাইলেন কতগুলো গান। বিখ্যাত কবিদের রচনায় সুরারোপ করে শিল্পী পরিবেশন করলেন আশ্চর্য পৌরুষদীপ্ত গলায় রুশী গান। ভলগার মাঝিদের গানও শুনলুম। আমার মনে পড়ে গেল ভাটিয়ালি গানের কথা। আব্বাসউদ্দীন এবং শচীন দেববর্মার কণ্ঠের ভাটিয়ালি শুনলে এরা বুঝতে পারত, লোকসঙ্গীতের উৎস এক, তার সুরে কত সাযুজ্য।

শ্রোতারা করতালি দিয়ে এক একজন শিল্পীকে সম্বর্দ্ধিত করছেন। বৃষ্টিধ্বনির মতো অবিরল করতালি। থামতে চায় না। যতক্ষণ করতালি শেষ না হবে ততক্ষণ শিল্পী পর পর পর্দার আড়ালে থেকে সনম্র ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে নতশিরে গ্রহণ করবেন জনতার অভিনন্দন। তিনবার কার্টেন-কলের পরও যদি করতালি না থামে তাহলে বুঝতে হবে শ্রোতারা এই শিল্পীর কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে চান। স্টেজ-কণ্ডাক্টর তখন

তাঁকে অনুরোধ করেন, শ্রোতাদের অভিলাষ পূরণের জন্য। তিনি আবার গাইবেন। করতালি ছাড়া অন্য কোনোরকম শব্দ করা বা চেঁচিয়ে কিছু বলা সৌজন্যবিরুদ্ধ। কেউ তা করে না।

সমলোচনা শুনতুম, রুশীরা খুব গুরুগম্ভীর জাত। সহজ সরল পরিহাসপ্রিয়তা তাদের অজানা। রাষ্ট্র এত কঠোর যে তাকে নিয়ে কৌতুক করা চলেনা। কথাটা যে কত ভ্রান্ত তার পরিচয় পেয়েছি রুশী সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করে। এই অনুষ্ঠানেও তার পরিচয় পেলুম।

মালি থিয়েটারের বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী পপোভ এসেছিলেন তাঁর অনিন্দ্য কৌতুক নক্সা পরিবেষণের জন্য। পপোভ স্টেজে এসে দাঁড়াতেই করতালিতে হল মুখর হয়ে উঠল।

ছোট ছোট কাহিনী দিয়ে অসাধারণ দক্ষতায় তিনি কৌতুকে, ব্যঙ্গে, শ্লেষে সন্ধ্যেটা মাতিয়ে তুললেন। স্ত্রৈণ স্বামীর গল্প, আমলাতন্ত্রের নির্বুদ্ধিতার কাহিনী যেমন ছিল, বেতার অনুষ্ঠানের একঘেঁয়েমি বা বৈচিত্র্যহীনতা কোনোটাই এই ব্যঙ্গশিল্পীর হাত থেকে রেহাই পায়নি।

আমলাতন্ত্রের সমালোচনা চলেনা, এ ধারণা ভুল। শিল্পীরা তো করেনই, ওদেশের সরকার বা পার্টি চালিত সংবাদপত্রেও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সদাসতর্ক সংগ্রাম।

আড়াই ঘণ্টার প্রোগ্রাম। মাঝখানে বিরতি। লাউঞ্জে এসে সিগারেট ধরাই। কেউ কেউ আইসক্রিম খান। পনেরো কোপেকে বেশ ভাল আইসক্রিম। এই শীতের দেশেও খুব জনপ্রিয় বিশেষ করে মেয়েদের কাছে। প্যালেস অব কংগ্রেসের এসকেলেটরগুলো দেখবার মতো।

শাসা বললে, চড়বে নাকি।

দেখলুম সবাই চড়ছে। ওঠানামা করছে। আমরাও ওদের সঙ্গে মিশে যাই। দশটায় শো ভাঙল। ভিতরে তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বুঝতে পারিনি কেমন ঠাণ্ডা আজ মস্কোয়। বাইরে পা দিতেই উত্তুরে হাওয়া নখ বসিয়ে দিতে লাগল।

না, এবার হেঁটে যাব না। হাত তুলতেই মস্ত বড় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

রেড স্কোয়ার দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলল আমাদের গাড়ি। শাসা আমাদের পৌঁছে দিয়ে মেট্রো স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। ওকে যেতে হবে দশ কিলোমিটার দূরে নিজের বাড়িতে। ওর খাওয়া হয়নি। বাড়িতে ওর স্ত্রী অপেক্ষা করছেন বলে আমাদের সঙ্গে খেল না।

মস্কোভা নদী থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বার বার এসে হানা দিচ্ছিল আমাদের হোটেলে। দরজা ভেজিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিই। টেলিভিশনে মিউনিখের অলিম্পিক খেলা দেখাচ্ছিল। আশ্চর্য উৎসাহ মস্কোবাসীদের। অলিম্পিকে রাশিয়া সোনার পদকে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছে।

(৭)

এটা হল প্রাভদা ষ্ট্রিট। মস্কোর বুকের ভেতর জ্বল জ্বল একটি রাস্তা।

প্রাভদার নাম কে না জানে? মস্কোর দুটি বস্তুর নাম অকমিউনিস্ট দুনিয়ার মানুষের জানা।

একটি ক্রেমলিন, অপরটি হল প্রাভদা।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সংবাদপত্র প্রাভদা যার অর্থ হল সত্য। লেনিন এই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

সোভিয়েট বিপ্লবের জন্মলগ্নেই প্রাভদার জন্ম।

রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা প্রচার ও তার আদর্শ রক্ষার জন্য এই সংবাদপত্র গত পঞ্চাশ বছর ধরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ ও সপ্রাণ। আমরা খবরের কাগজের লোক, সাংবাদিকতা আমাদের পেশা। দুনিয়ার তাবৎ বিখ্যাত সংবাদপত্র আমরা পড়ি। লণ্ডন টাইমস্, নিউইয়র্ক টাইমস্ কিংবা গার্ডিয়ান নিয়মিত পড়ি। প্রাভদা পড়বার সুযোগ হয় না। কারণ রুশভাষায় এটি প্রকাশিত।

কিন্তু প্রাভদার মন্তব্য বা খবর ছড়িয়ে যায় সর্বত্র। রয়টার বা এপি সেই সংবাদ তর্জমা করে পাঠায় সারা দুনিয়ায়।

রাশিয়া কী ভাবছে, কোন বিষয়ে কী বলছে তা জানতে হলে প্রাভদাই শরণ। প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার নিজস্ব সংবাদদাতা আছেন মস্কোয়। ভারতের অন্যান্য কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকারও নিজস্ব সংবাদ সংগ্রাহক বা স্পেশাল করেসপণ্ডেণ্ট রয়েছেন এই মহানগরীতে।

নভোস্তির ভ্লাদিমির মাখোটিন অমৃতবাজারের জন্য নিয়মিত মস্কোর চিঠি পাঠান।

মাখোটিন আমার পূর্ব পরিচিত। কলকাতায় রুশ কনস্যুলেটে প্রধান ইনফরমেশন অফিসার ছিলেন। মাখোটিনের সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব হয়। খোলা মনের মানুষ। অতিথি আপ্যায়নে সহৃদয়।

মস্কো হল এখন দুনিয়ার অন্যতম প্রধান সংবাদ-কেন্দ্র। ওয়াশিংটন, পিকিং-এর মতোই মস্কোর দিকে সবার নজর। এককালে লণ্ডন ছিল সংবাদের প্রধান উৎস। সাম্রাজ্য বিদায়ের পর লণ্ডন এখন অস্তগত মহিমা। টোরি-লেবারের খুনসুটি নিয়ে বাইরের কেউ আর মাথা ঘামায় না।

কী বলছে ওয়াশিংটন, মস্কোর প্রতিক্রিয়া কী কিংবা পিকিং-এর মতিগতি কোন দিকে সেই জানা অনেক বেশি জরুরি।

মস্কোর খবর জানতে হলে প্রাভদার পাতায় চোখ বুলোতে হবে।

আমরা প্রাভদার আপিসে হাজির হলুম সকাল এগারোটায়।

২৪ প্রাভদা স্ট্রিটে একটি বড় বাড়ি। চারতলা। বাড়ির সামনে বড় বড় হরফে লেখা প্রাভদা।

বাড়িটা পুরনো। সম্ভবত প্রাভদারই বয়সী হবে। কিন্তু মজবুত, পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত। বাইরে থেকে মনেই হবে না এখানে এমন বিরাট একটি সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রকাশিত হয়ে লক্ষ লক্ষ পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল মেটায়।

আড়ম্বরহীনতা রুশী সমাজের বৈশিষ্ট্য। তার নিজস্ব শক্তি অটুট এবং লক্ষ্য নির্ভুল বলেই এই আত্মবিশ্বাস। চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য বা আড়ম্বরে অথবা দম্ভ দেখাবার কুৎসিৎ প্রতিযোগিতা এখানে নেই।

এই সরলতা বার বার আমাকে মুগ্ধ করেছে।

রুশীদের চাল-চলন, কথাবার্তা বলবার ধরণ সবই খুব ঘরোয়া। ইংরেজদের মতো ফর্মাল নয়। স্নবারি বস্তুটা ওদের নেই। এসব মেকী জিনিস আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কোথা থেকে উপার্জন করলেন জানি না। মনকে পীড়া দেয়

আমাদের সহযাত্রী হলেন কালুগিন যাকে শাসা বলে পরিচয় দিচ্ছি এই লেখায়। লিফট না নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলুম তেতলায়। পুরনো আমলের চওড়া সিঁড়ি তাতে কার্পেট পাতা।

আমরা গেলুম এশিয়া ও আফ্রিকা দপ্তরের সম্পাদকের ঘরে।

প্রাভদার সম্পাদকীয় দপ্তরের সদস্য তিনি। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুপুরুষ মিঃ ওভচিন্নিকোভ। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স।

সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করে সবাই বসলুম।

প্রশস্ত টেবিল। তার ওপর দু তিনটে টেলিফোন। ইণ্টারকোমের

ব্যবস্থা আছে। ঘরটি পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো। কাঁচের আলমারিতে সাজানো বই। সবই এশিয়া ও আফ্রিকা বিষয়ে। দেখলুম জওহরলালের আত্মজীবনী, ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া রয়েছে; শরৎচন্দ্র দাসের লেখা 'তিব্বত'-এর একটি পুরনো সংস্করণও আছে সযত্নে। জাপান সম্পর্কে মেলা বই, সবই নতুন। এ সমস্ত বইই ইংরেজিতে।

রুশ ভাষায় লেখা বিশেষজ্ঞদের বইও আছে। রয়েছে কয়েকটি শিল্পকর্মের নিদর্শন। হয়তো কোনো প্রতিনিধিদল উপহার দিয়ে গেছেন।

এশিয়া দপ্তরের আরও কয়েকজন সাংবাদিক ও লেখক এলেন আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেবার জন্য।

সাশা বললে, ইনি মিঃ সুরিগিন। ভারতে ছিলেন প্রাভদার সংবাদদাতা রূপে।

এ ধরণের সাক্ষাৎকারে আমাদের সহযাত্রী হায়দরাবাদের কৃষ্ণমূর্তির উৎসাহ এবং কৌতূহলই দেখছি সবার চেয়ে বেশি।

সঙ্গে তাঁর নোট বই। প্রত্যেক প্রশ্ন ও তার জবাব সঙ্গে সঙ্গে তাতে লিখে নেন।

আলোচনার সময় পকেট থেকে নোটবই বের করা আমার ধাতে সয় না। যা থাকবে স্মৃতিতে। দরকার হলে হোটেলে গিয়ে লিখব।

নায়ারেরও তাই।

নায়ার বলেছিল, আমেরিকার ওপর বই লিখেছি। আমার ডায়েরিতে মাত্র পাঁচ পাতা নোট করা ছিল। আর সবই স্মৃতি এবং উপলব্ধি।

কৃষ্ণমূর্তিকে এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছি। মূর্তিজী অকুতোভয়। ওতে দমবার পাত্র নন। তিনটে নোটবই শেষ করে তিনি এখন চতুর্থটি খুলেছেন।

ওভচিন্নিকোভ খুব ব্যস্ত মানুষ। সমানে টেলিফোন আসছে। তিনি একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছেন। শান্ত কণ্ঠস্বর। কোনো ব্যস্ততার ভাব নেই চোখে মুখে। হাসিমুখে প্রত্যেকটি কথার জবাব দেন।

প্রাভদা সম্পর্কে জানতে চাইলুম।

ওভচিন্নিকোভ বললেন, প্রাভদা চার পাতার কাগজ। মাঝে মাঝে ছ' পাতা বেরোয়। চার পাতার কাগজের দাম ২ কোপেক; ছ' পাতার দাম ৪ কোপেক।

একই সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের ৪০টি জায়গা থেকে প্রাভদা বের হয়।

প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্থানীয় চরিত্র। সম্পাদকীয় ও কয়েকটি বিশেষ সংবাদ বা প্রবন্ধ থাকে অপরিবর্তিত।

পশ্চিমী সংবাদপত্র কিংবা আমাদের দেশের সংবাদপত্রের আয়তন বা চেহারা-ছবির পাশে প্রাভদাকে মনে হবে নিতান্তই নিরলংকার। বিজ্ঞাপনের বালাই নেই। পাতা কম বলে ছবিও ছাপা হয় কম। ছবির চেয়ে সংবাদ বা প্রবন্ধের গুরুত্ব বেশি। তবে এখন প্রত্যেক সংখ্যাতেই বেশ কয়েকটি ছবি দেওয়া হচ্ছে।

ওভচিন্নিকোভ বললেন, প্রাভদা হল কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ। সরকারের কাগজ হল 'ইজভেস্তিয়া', তা তো তোমরা জানোই। তবে মুস্কিল এই, যে কারণেই হক ইজভেস্তিয়ার চেয়ে প্রাভদার গুরুত্ব বেশি। সোভিয়েটের বাইরের লোক প্রাভদাকেই 'কোট' করে। তাই সরকারী বিবৃতির বয়ান ইজভেস্তিয়াতে বের হলেও প্রাভদায় তা ছাপা না হলে বাইরের সোভিয়েট 'বিশেষজ্ঞরা' গবেষণা করতে বসেন, তাই তো প্রাভদায় তা ছাপা হল না কেন! নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে। তার ফলে সরকারী বিবৃতির জন্যও আমাদের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়।

শর্মাজী প্রশ্ন করেন, সরকারের বিরুদ্ধে কি আপনারা লিখতে পারেন?

জবাব দিলেন সুরিগিন।

'ছাখো আমাদের সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিভূ। তাদের স্বার্থে এবং সোভিয়েট সমাজের স্বার্থে সরকার পরিচালিত। এই সহজ সত্য মেনে না নিলেই সরকারের বিরোধিতার প্রশ্ন আসে।'

শর্মা বলেন, তা নয়। সরকারী কাজের ভুল ত্রুটি তো হতে পারে। "দের গাফিলতি আছে, লোকের অভিযোগ আছে। তার প্রকাশের বা ।চনার স্থান কোথায়?

সুরিগিন বললেন, তার জন্য প্রাভদার পাতা খোলা। রোজ শত শত চিঠি পাই আমরা পাঠকদের কাছ থেকে। জনসাধারণের প্রতিটি বক্তব্য আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ি। তা ছাপা হয়। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট দফতরে। তার প্রতিকার হল কি না তার খোঁজ নিই আমরা। পাঠকদের চিঠিই আমাদের সব সময় সজাগ রাখে।

'তোমরা নিজেরা কিছু করোনা।'

ওভচিন্নিকোভ সেদিনকার প্রাভদা আমাদের সামনে মেলে ধরলেন।

বললেন, ওই ছাখো একটি সংবাদ। কৃষিফলন কেন কম হয়েছে তার বিষয়ে একটি আলোচনা।

'কারা এসব লেখেন'? 'তোমাদের স্টাফ রিপোর্টার?'

'ওরাও লেখেন। তবে বিশেষজ্ঞদের দিয়েই আমরা লেখাই। বিজ্ঞানী, একাডেমিশিয়ান, প্রযুক্তিবিদ সবাই তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। সরকারকে ঠিকভাবে চালাবার জন্যে, তাদের কাজে সহায়তা করবার জন্যে আমরা নানা তথ্য তুলে ধরি, বিশেষজ্ঞদের মত প্রকাশ করি, সাধারণ কর্মীদের অভিজ্ঞতাও ছাপাই।'

'বিদেশে কত সংবাদদাতা আছে তোমাদের?'

ওভচিন্নিকোভ বললেন, একশো জন সংবাদদাতা আমাদের আছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। হয়তো এটা একটু বিলাসিতাই আমাদের পক্ষে। তবু প্রাভদাকে নিজের লোক রাখতে হয়েছে সঠিক সংবাদ এবং সংবাদের পটভূমি জানবার জন্য।

এবার মূর্তি প্রশ্ন করেন, সরকারের সমালোচনা করে তোমরা সম্পাদকীয় লিখতে পারো কি?

সুরিগিন পাল্টা প্রশ্ন করেন, সমালোচনা বলতে কী বোঝো? সরকারের প্রতিটি কাজের ওপর আমাদের জনগণের পার্টির তীক্ষ্ণ নজর।

পার্টিই জনগণের পক্ষে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করে। এখানে তো বুর্জোয়া দেশের মতো শ্রেণী স্বার্থের সংঘাত নেই। সুতরাং শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে সমালোচনার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে হ্যাঁ, পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ না হলে কিংবা সময়মত কাজ না হলে তার সমালোচনা সব সময়েই করা হয়।

'ধরো যদি কোনো সম্পাদক সোভিয়েট অর্থনীতির কোনো বিশেষ দিক বা পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে একমত না হয়ে সম্পাদকীয় লেখেন?'

সুরিগিন জবাব দেন, প্রথমত এটা ভাবাই যায় না। সোভিয়েট সমাজ ও তার সরকার অভিন্ন। গোটা সমাজের স্বার্থেই তার বৈষয়িক নীতি বা পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত। ওর বিরুদ্ধে কোন্ সম্পাদক লিখবেন? যদি তিনি লেখেন তাহলে পরদিনই হাজার হাজার চিঠি আসবে পাঠকদের কাছ থেকে, এ সম্পাদক অযোগ্য। কারণ সমাজের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত নিয়েই সরকার পরিচালিত। তার বিরোধিতা করার অর্থ সোভিয়েট সমাজের বনিয়াদকেই অস্বীকার করা।

সুরিগিন ভারতবর্ষে ছিলেন! তারও আগে ছিলেন জার্কতায়।

বললেন, এতো আর গোয়েঙ্কার কাগজ নয় যে সরকারের কোনো

সামাজিক উন্নয়নের নীতি পছন্দ হল না। সম্পাদককে ডেকে বললেন খুব কড়া একটা এডিটোরিয়াল লিখে দাও।

শ্রেণী স্বার্থ বিলুপ্ত বলেই শ্রেণী সংঘাতের কোনো কারণ ঘটেনা। শ্রেণী বিলুপ্ত হলেও শ্রেণী চেতনা কি সব মানুষ এত সহজে বিস্মৃত হয়েছে? হয়তো না। কিন্তু তা শ্রেণী স্বার্থের রূপ পেতে পারে না। সমাজের শিক্ষা প্রতিটি নাগরিককে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে। ফ্রম ইচ একর্ডিং টু হিজ ক্যাপাসিটি টু ইচ একর্ডিং টু হিজ নিড। প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজের জন্য কাজ করবে, সমাজ দেবে প্রত্যেককে তার প্রয়োজনীয় দেহের ও মনের খাদ্য।

প্রাভদার আপিসে বসে অনেকক্ষণ আলোচনা করলুম আমরা।

প্রত্যেকেই খোলামনে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। আমরাও সব রকম প্রশ্ন করছিলাম। অনেক কিছু আমরা জানতে চাই। সোভিয়েট সম্পর্কে পশ্চিমীদের প্রচার শুনতে শুনতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ও সমাজে সবই বুঝি ছাঁচে-ঢালা। মানুষকে বুঝি রাবোটে পরিণত করেছে।

এই মিথ্যা প্রচার করছে তারাই যারা সোভিয়েটের বিরাট অগ্রগতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সোভিয়েট ইউনিয়নকে স্বর্গরাজ্য মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু একটি পশ্চাপদ দেশকে পঞ্চাশ বছরে জগতের মহাশক্তিতে পরিণত করেছে যে নেতৃত্ব, যে আদর্শ এবং যে-সংকল্প তাকে কা'র সঙ্গে তুলনা দেব? স্বর্গ তো মানুষের কল্পনা। সোভিয়েট দেশ মানুষের হাতে তৈরি এমন একটি সমাজ যা কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

প্রাভদার প্রেস দেখাতে নিয়ে গেলেন ওঁরা। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। লাইনো মেসিন দেখলুম পঁচাত্তরটা। মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে কাজ করছেন। একেবারে নতুন ধরণের ব্লক তৈরির যন্ত্র। জাপানী ও জার্মানীর মেশিনও রয়েছে কয়েকটা।

কাগজ ছাপা হয়ে প্যাকেট বন্দী অবস্থায় কনভেয়র বেল্টে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা এ শেয়ারে বাইরে লরীতে নিয়ে পড়ছেঃ সেখান থেকে সোজা চলে যাবে বিমানবন্দরে বা রেল স্টেশন বা অন্যত্র তার গন্তব্য জায়গায়।

কৃষ্ণমূর্তি প্রাভদার একটা ডামি-শীট চেয়ে নিল। হায়দরাবাদে ওর কাগজের কর্মীদের দেখাতে।

মাত্র চার পাতার কাগজ। তার বিজ্ঞাপনের জৌলুষ নেই; খুন হত্যা রাহাজানির লোমহর্ষক খবর থাকে না। নারীদেহের ছবি ব্যবহার করা হয় না। তার জায়গায় থাকে বিশাল সোভিয়েটের কর্মকাণ্ডের খবর; কোনো শ্রম-বীর বা বীরাঙ্গনার সংবাদ, সুস্থ সমাজচেতনার সংবাদ-চিত্র, বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিবরণ। তাতেই প্রাভদা সংবাদ জগতের শিরোনাম দখল করে আছে।

রোজ এককোটি কপি ছড়িয়ে পড়ে মস্কো থেকে ভ্লাদিভোস্টক।

সোভিয়েট সমাজের অন্যতম শক্তি এই সংবাদপত্র।

লেনিনের নিজের হাতে তৈরি।

প্রাভদার অর্থ ট্রুথ।

সত্য চিরকালই নিরলংকার।

সোভিয়েটের মানুষ সত্য খবরই জানতে চায়। স্পেকুলেশান বা গুজব এ সমাজে নিষিদ্ধ।

তার দরকারও নেই। কাগজের কাটতির জন্য গালগল্প ছড়ানোর প্রয়োজন হয় না। সংবাদপত্র এখানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চলেনা, চলে জনশিক্ষার বাহন হিসেবে।

আমরা যে ধরণের সংবাদপত্রে অভ্যস্ত তার সঙ্গে মিল নেই। কিন্তু সোভিয়েট সমাজের সামগ্রিক আবহাওয়ার সঙ্গে তার সংবাদপত্র মিশে আছে জলবায়ুর মতো।

একশো-দেড়শো পাতার সাপ্তাহিক কাগজ যে সব দেশে মুদ্রণযন্ত্রের কবল থেকে কালিমা চিহ্নিত হয়ে বেরোয় তার সব পাতা পড়ে কোন পাঠক? তার সময় কোথায়, ধৈর্যও বা কোথায়? যে যার আগ্রহের বিষয়টুকু পড়ে নিয়ে রাস্তায়, ট্রামে বা টিউবে ফেলে দিয়ে যায়।

'আপনারা ক্রাইম রিপোর্ট করেন?'

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাভদার সম্পাদকমণ্ডলীর বক্তব্য খুব পরিষ্কার।

'ক্রাইম বা অপরাধকে রসালো খবরে পরিণত করিনা আমরা। অপরাধ কেন করে তার কারণ খুঁজি আমরা। তার কারণ বিশ্লেষণ করে সমাজ থেকে অপরাধ দূর করবার জন্য আমরা লিখি। মানসিক বিকৃতি, সমাজ-বিরোধী মনোভাব বা পরগাছাবৃত্তি থেকে অপরাধের উদ্ভব। আমাদের সমাজে অপরাধের হার খুব কম। যেটুকু আছে তার বিরুদ্ধে সমাজ সক্রিয়। সংবাদপত্রও তার ভূমিকা পালন করে অপরাধ উচ্ছেদের জন্য।'

নানা প্রসঙ্গ ওঠে আলোচনায়।

কমিউনিস্ট শিবিরে দ্বন্দ্বের কথা উঠল।

'চীনের সঙ্গে বিরোধ কি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দুর্বল করছে না?'

'আদর্শের সংঘাতে আন্দোলন দুর্বল হয় না। তার লক্ষ্য হয় নিশ্চিত। চীনের মহান জনগণের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ তার ভ্রান্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আমরা মনে করি চীনের জনগণ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একদিন সঠিক নেতৃত্ব ফিরে পাবে।'

চীনা নেতারাও তো একই কথা বলেন?

ইতিহাসের গতিই ঠিক করবে কাদের বক্তব্য নির্ভুল। আসলে চীনা নেতারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে দুর্বল করতে চায়। সোভিয়েট সমাজ তা হতে দিতে পারে না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সঠিক লক্ষ্যে স্থির থেকে চীনা নেতাদের ভ্রান্ত প্রচার নিশ্চয়ই ব্যর্থ করবে।'

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, সোভিয়েট সমাজে কোনো উগ্রতা নেই। এমন কি চীনাদের সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো বৈরিতা লক্ষ করিনি। আমেরিকানদের সম্পর্কেও না।

আমেরিকানদের বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে তারা সজাগ। তারা জানে মার্কিন অর্থনীতিতে যে সংকট আছে সোভিয়েট অর্থনীতি তা থেকে মুক্ত। কিন্তু আমেরিকানদের অর্থ, বিত্ত ও প্রতাপ সম্পর্কে তাদের কোনো ভুল ধারণা নেই। এই শক্তির সম্মুখীন হবার জন্য সোভিয়েট সমাজ প্রস্তুত। আমি যখন মস্কোতে তার কিছুদিন আগেই প্রেসিডেন্ট নিক্সন এসেছিলেন সোভিয়েট সফরে। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ হেনরি কিসিঞ্জার। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার ছিল তাঁর। সামনেই ছিল নির্বাচন।

'ভিয়েতনামে আমেরিকানরা তখন অত্যাচার চালাচ্ছে। তোমরা তাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছো?'

'সোভিয়েট ইউনিয়ন সব সময়েই আলোচনা করতে প্রস্তুত। আলোচনার অর্থ আত্মসমর্পণ নয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন সবই জানেন। তাঁর গরজ বড় বেশি। তাই মস্কোতে তাঁকে ছুটে আসতে হয়েছিল। ভিয়েতনাম থেকে তাঁকে চলে যেতে হবেই। ভিয়েতনামের পাশে রয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক সমস্ত দেশ এবং গোটা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ। আজ আমেরিকার গণতান্ত্রিক মানুষও ভিয়েতনামের পক্ষে।'

অজস্র অস্ত্র সরবরাহ করছে রাশিয়া ভিয়েতনামে। ভিয়েতনামী মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং নিতে আসেন রাশিয়ায়। অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে আসা হয় মস্কোতে চিকিৎসার জন্য। প্রত্যেকটি সোভিয়েট মানুষ জানে ভিয়েতনাম লড়াই করছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে: এ যুদ্ধে সে একা নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে রক্ষা করবে ভিয়েতনামকে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচিত হচ্ছে ভিয়েতনামের মাটিতে।'

কিছুদিন আগেই মস্কোতে ভিয়েতনামী জনগণের পক্ষে সোভিয়েট নাগরিকরা এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বার করেছিল মার্কিন দূতাবাসের সামনে।

অনেককেই প্রশ্ন করেছি, ভিয়েতনাম সম্পর্কে তাদের কী চিন্তা।

সোভিয়েটের মানুষ বলেছে, মার্কিন নিষ্ঠুরতা তুলনাহীন।

তাদের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে ঘৃণা আর প্রতিবাদ। ভিয়েতনামের জয় সম্পর্কে তারা সুনিশ্চিত। গভীর শ্রদ্ধা তাদের ভিয়েতনামী জনগণের প্রতি।

যুদ্ধ কি তা সোভিয়েট ইউনিয়ন জানে। হিটলারের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেছে। তার ক্ষত চিহ্ন এখনো বুঝি মেলায় নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের পত্রিকায়, টেলিভিশনে, বেতারে ভিয়েতনামের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিবরণ রোজই সোভিয়েট নাগরিকদের কাছে পরিবেশণ করা হয়। তাদের সজাগ রাখে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে।

প্রাভদার প্রথম পৃষ্ঠায় সেদিন ছাপা হয়েছে হাইফং বন্দর রক্ষাকারী বিমান-ধ্বংসী কামানের ছবি। এই কামান সোভিয়েট ইউনিয়ন দিয়েছে ভিয়েতনামীদের। বহু ভিয়েতনামী যোদ্ধা সর্বাধুনিক সোভিয়েট অস্ত্রে শিক্ষা নিয়ে গেছে রাশিয়া থেকে।

প্রাভদা আপিসটি শান্ত। মনেই হয়না এখানে এত লোক কাজ করছে। কাজের সময় কথা বলার নিয়ম নেই। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা সমাজের প্রতি দায়িত্বহীনতার লক্ষণ। সোভিয়েট নাগরিকরা তা জানেন বলেই এখানে কোথাও অলস আড্ডা বা গালগল্প লক্ষ করিনি কোথাও।

আমাদের আপ্যায়নও ছিল খুব সাধাসিধে এবং আন্তরিক।

টেবিলে রাখা ছিল মিনারেল ওয়াটার: এটা খুব প্রিয় পানীয় সোভিয়েট

দেশে। সঙ্গে ছিল চা, দুধবিহীন। স্বাদু এবং তৃপ্তিকর। এখানে দুধ মিশিয়ে চা খাবার রীতি নেই। চাও আমাদের মতো যখন তখন খায় না।

'সাংবাদিরা কী রকম মাইনে পান?'

'অন্য সব কর্মীদের মতোই। ন্যূনতম বেতন ২০০ রুবল। তার সঙ্গে আছে বোনাস। আলাদা লেখার জন্য পারিশ্রমিক।'

'সর্বোচ্চ বেতন? আপনাদের সম্পাদক কত পান?'

'৫০০ রুবল এবং আনুসঙ্গিক বোনাস।'

প্রত্যেকের জন্যই সরকার থেকে দেওয়া বাসস্থান: ছেলেমেয়ের লেখাপড়া অবৈতনিক, চিকিৎসা বিনামূল্যে। স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়া এবং থাকা খাওয়া নামমাত্র মূল্যে।

যার যেমন প্রয়োজন সে রকম এপার্টমেন্ট দেওয়া হয়।

একজন প্রেসের কর্মীকে জিগ্যেস করলুম, আপনি কতো পান?

'বেসিক ২০০ রুবল। তার ওপর বোনাস।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'মস্কোতে, দুকক্ষের একটি এপার্টমেণ্টে।'

'কত ভাড়া দেন?'

'সাত রুবল মাসে।'

এরা ওপর ও নিচের ব্যবধান কত কমিয়ে এনেছে। আমাদের দেশে তা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রুবল খুব শক্তিশালী মুদ্রা। টাকার সঙ্গে বিনিময় হার প্রায় দশ টাকায় এক রুবল। জিনিসপত্রের দাম সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত বলে অনেক রুবল তাদের বাঁচে। অথচ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি সোভিয়েট রাষ্ট্র তাদের দিয়েছে।

ইচ্ছা করলেই তো জমি কিনে পেল্লায় প্রাসাদ তৈরি করা যায় না। প্রয়োজন হতে পারে একটি মোটর গাড়ির। সঞ্চিত অর্থে যে কোনো শ্রমিক বা কর্মী তা কিনতে পারে। পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে একটির জায়গায় দুটি। কিন্তু তার বেশি কেন?

জাঁকজমক বা বিত্ত দেখাবার কুশ্রীতা এরা বর্জন করেছে।

সোভিয়েটের মানুষের এই সরল জীবনযাত্রা পশ্চিমীদের কাছে মনে হয় কৃচ্ছ্রতা।

আমার মনে হয়েছে, মানুষের মন থেকে অর্থলোলুপতা ও সম্পত্তির আগ্রহ লোপ করতে পেরেছে বলেই সোভিয়েটের মানুষ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন।

প্রাভদা আপিস থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলুম হোটেলে।

বিকেলে কী প্রোগ্রাম আছে, খেতে খেতে, শাসাকে জিজ্ঞেস করা যাবে।

[ক্রমশ

অশোক হালদার

নেপালের দিন রাত্রি

সারারাত আধ-বোজা চোখে কেরোসিন-কুপির ভুতুড়ে আলোর নাচ দেখেছে নেপাল। জংধরা টিনের দেয়ালে রোশনি যেন শিউরে শিউরে উঠেছে। সওয়া ফুট বাই এক ফুট জানলার ওপারে আলকাতরা রাত। বস্তির অলিতে-গলিতে আলো জ্বালার পাট চুকে গেছে বহুদিন। কেরোসিন-কুপির ভুসো উড়ুক্কু সাপের মত লাফিয়ে-লাফিয়ে জানলার বাইরে হারিয়ে যাচ্ছে। ঘরময় পোড়া কেরোসিনের বিদঘুটে আঘ্রাণ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিন রাতের বেলায় ঘর আন্ধারই থাকে। আজ মেয়েটার জ্বর যেন ফুঁসে উঠেছে। সন্ধ্যে থেকে জলপটি দিয়ে বাতাস ক'রেছে মলিনা। তবু তা'তে জ্বরের রোষ পড়েনি একটুও।

ওধারে মলিনা চোখ বুজিয়ে শুয়ে। বাঁ হাতটা কপালের ওপর, মুখের আধখানা ঢাকা। ঘুমুচ্ছে কিনা বোঝার উপায় নেই। তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ কানে আসছে না নেপালের। চিৎ-শরীরের কাপড়-চোপড় অগোছালো। চোপসানো বুকের ওঠা-নামা ঘুমন্ত মানুষের মত। মলিনা ঘুমুচ্ছে ভেবে নেপালের মনটা যেন জুড়িয়ে যায়। নিজের জেগে থাকার যন্ত্রণায় যেন স্বস্তির ঠাণ্ডা পলি পড়ে। সারারাত ধরে বুকের দাপাদাপি থেকে যে অগুন্তি দীর্ঘনিঃশ্বাস বুড়বুড়ি কেটে উঠেছে সেগুলোকে দম বন্ধ করে ঢোক গিলে গিলে নেপাল অন্দরে ফেরৎ পাঠিয়েছে। দীর্ঘনিঃশ্বাসের হিস্‌হিসানিতে মলিনার ঘুমটুকু লুঠে নিয়ে তাকে সর্বহারা ক'রবে, নেপাল সত্যি তো একটা শয়তান নয়। সারাদিন···সারাদিন কেন সারা-টা জীবন জলেপুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে মলিনা। তবু নেপালের যন্ত্রণার রাত্তিরে যদি ঘুম এসে ও-র চোখের পাতায় বসে তো দু'দণ্ডের নিশ্চিন্তি তবু। এ-নিশ্চিন্তিটুকু মলিনার বরাতে জুটেছে ভেবে নেপালের হঠাৎ মলিনাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে সাধ হয়।

দু'জনের মাঝে বেঘোরে পড়ে আছে মেয়েটা। সারারাত নেপাল আলতো-ছোঁয়ায় ওর কপালে বাঁ হাতের কবজি রেখে শুয়েছিল। পনেরো দিন হ'লো মেয়েটা ভুগছে। পাশের খুপড়ির মুকুন্দর হোমোপ্যাথীর শিশি বসানো একটা কাঠের বাক্স আছে। সেই বাক্স হাতড়ে হাতড়ে

মুকুন্দ ক'দিন ধরে সাবুদানা মোড়ক দিয়েছে। তার ভাঁড়ারের ওযুধে যখন আর কুলোয়নি তখন নাম লিখে দিয়েছে ওষুধের। তিন মাইল পথ শালদায় গিয়ে বড় দোকান থেকে ওষুধ কিনে এনে খাইয়েছে নেপাল। কিন্তু কিছুই হয়নি। সকালের দিকে মেয়েটা চোখ মেলে চায়। লাল-লাল ফোলা-ফোলা চোখ। বলে—বাবা, বড় কষ্ট। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে নেপাল বলে—এই পুরিয়াটা খেয়ে নে মা। ও-বেলা দেখবি জ্বর কম পড়বে।

বাপের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে চেয়ে হাঁ করে মেয়েটা। নেপালের বুক ফেটে যায়। ও জানে এ-ওষুধে ও-জ্বর যাবার নয়। মুকুন্দও বলেছে—যা না একবার নীরেন ডাক্তারের কাছে। অ্যালোপ্যাথী ওষুধ পেটে না পড়লে ও-জ্বর যাবেনা রে ন্যাপলা।

—তুমি তো সবই জানো মুকুন্দদা। ডাক্তারবাবু এখনও গোটা পনেরো টাকা পায়। কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াই।

মুকুন্দ ভাবে, তারই বা আর কি সাধ্যি আছে। এখানে সবাইয়ের তো ফুটো নৌকো নিয়ে সাগর পাড়ি। কখন তাপ্পি খুলে ভরাডুবী হতে হয় কে জানে!

—তবু একবার গিয়ে দাঁড়া। খেয়ে তো ফেলবে না রে।

তা' নেপাল গিয়েছিল নীরেন ডাক্তারের কাছে দিন দু'ই আগে। সব শুনে প্রথমটায় মুখ হাঁড়ি করেছিল নীরেন ডাক্তার তার পরে একগাল হেসে ব'লেছিল—নেপাল, তোকে আমি ছোট ভায়ের মত দেখি। কী বল, দেখি না?

হাত কচ্‌লে নেপাল বলেছিল—সে-কথা আর বলতে ডাক্তারবাবু!

—তোর এ'তো টানাটানি, নীরেন ডাক্তার ডিস্‌পেনসারী ফাঁকা হ'তে বলেছিল—ফিসের টাকা নয় দু'একবার ছাড় দিলুম, কিন্তু ওষুধের দাম?

নেপাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আলমারী—তাকে কত রকমের ওষুধ। মেয়েটার জ্বর জুড়িয়ে যায়, উঠে বসে দু'টো পথ্যি করে এমন ওষুধ নিশ্চয় আছে ওই ওষুধের ভিড়ে।

—তবুতো তোর কাছে গোটা পনেরো টাকা এখনও পাই। মাথা নামিয়ে কাগজে খস্‌খস্‌ ক'রে কী যেন লিখতে লিখতে বলেছিল।—তার জন্যে তাগাদা ক'রেছি, বল?

—ও-টাকা আমি মেরে দোব না ডাক্তারবাবু। নেপাল কাঁপা-কাঁপা গলায়

ব'লেছিল—এখন যদি একবার দেখতেন ডাক্তারবাবু, একটু ওষুধ দিতেন, মেয়েটা…

ডিস্‌পেনসারীর ভেতরে যেতে যেতে নীরেন ডাক্তার ব'লেছিল—তুই এক কাজ কর নেপাল। হাসপাতালে দে।

হাসপাতালের নাম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল মলিনা।

—তুমি বাপ হয়ে ব'লতে পারলে; মুখে আনতে পারলে হাসপাতালের নাম! আমাদের মত গরীব মনিষ্যিদের কী চিকিচ্ছে হয় হাসপাতালে তুমি জানোনা ?

নেপাল বুঝতে পারে মলিনার কথা।

এইতো ক'মাস আগের ব্যাপার। বিন্দির জ্যাঠাইকে তিনদিন ধরে ফেলে রেখেছিল উঠোনে। ডাক্তার বদ্যি ধার মাড়ায় নি, ওষুধ-পত্তর তো দূরের কথা। পেচ্ছাব-পায়খানা করে একশা হ'য়ে শুয়ে ছিল তিনদিন-তিনরাত। শেষকালে অনেক বলতে-কইতে এবং জমাদারকে কিছু ধরে দিতে সব সাফ-সুফ করে, কিন্তু বিন্দির জ্যাঠাইতো আর ফেরেনি।

নেপাল ভেবেছিল কথাটা একবার প্যাড়া গণশাদের বলে। কিন্তু ওদের বললে যে কী হবে নেপাল স্পষ্ট বুঝতে পারে। হৈ-হল্লা লাগিয়ে দেবে, জুলুম-বাজি ক'রে হয়ত ধরেই আনবে নীরেন ডাক্তারকে। তখন ডাক্তারবাবুকে কী করে মুখ দেখাবে নেপাল!

তা'ই বলি-বলি ক'রে কথাটা বলেনি ওদের। তা'র চেয়ে যেমন ক'রে হোক কিছু ধার-কর্জ-র চেষ্টা দেখবে।

দুপুরে দোকান বন্ধ ক'রে খেতে এসে ক'দিন ধরে নেপাল দেখছে জ্বরটা তেড়ে আসে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আজও দেখলো কপালটা যেন ঝলসে যাচ্ছে তাতে। রগের শিরা ঠেলে উঠে দপ দপ ক'রে কাঁপছে। কাৎরাচ্ছে মেয়েটা।

—কাল একবার নীরেন ডাক্তারকেই আনবো। ব'লে ফেললো। পোড়া কপাল। মলিনা ঠিক ঝাঁঝিয়ে উঠলো না। কেমন ক্লান্ত, নির্জীব হা-হুতাশের গলা।—মেয়েটা পনেরো দিনে কালিয়ে গেল!

—আহা, দেখিস দেখিস কাল সকালে ঠিক আনি কিনা নীরেন ডাক্তারকে। মলিনাকে আশ্বস্ত করে নেপাল কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল দোকান খুলতে।

বেরুবার মুখে সোয়ামীকে চায়ের বাটি ধরে দিতে দিতে মলিনা ব'ললো—

কাল যদি না ডাক্তার আনো আমি মাথা খুঁড়ে রক্ত গঙ্গা হবো, ব'লে রাখছি।

চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে আর্দ্র স্বরে নেপাল ব'ললো—আমিও তো বাপরে। বড় ডাক্তার দেখাতে কি আমারও সাধ হয়না?

—বাপ না ছাই! চোখ তুলে দেখেছো বারো বছরের মেয়ে একাজ্বরি হ'য়ে পড়ে থেকে থেকে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে—ছ'বছরের মেয়ের মত এতোটুকুন হ'য়ে গেছে!

মলিনার চোখ থেকে জলের ফোয়ারা তোবড়ানো চিবুক বেয়ে ছাল-ওঠা ওষ্ঠাধর রসালো ক'রে টপ্‌টপ ঝরতে থাকলো—মুখের কিনারে ধরে রাখা কলাই-গেলাসের ধোঁয়া-চোঁয়ানো চা তোলপাড় ক'রতে থাকলো ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ।

বেঘোরে পড়ে থাকা মেয়ের দিকে তেরছা চোখ ফেলে নেপাল সরে এলো মলিনার পাশে। পিঠে আলতো হাত রাখলো। বুকের কাপড় টেনে চোখের, গালের, চিবুকের জল মুছিয়ে দিয়ে গাঢ় গলায় ব'ললো—আমাদের পেরাণটা কী আর পেরাণ রে? ঠাকুরকে ডাক্।

নেপাল বেরিয়ে যেতে উঠে দাঁড়ালো মলিনা। না, চুপ ক'রে বসে বসে ঠাকুরকে ডাকা নয়। কিছু একটা ক'রতে হবে। কিন্তু কী বা ক'রতে পারে মেয়েমানুষ! যেটুকু সোনার খুদ-কুঁড়ো সঙ্গে ছিল, তা' তো বহুকাল ঘুচে গেছে। বস্তির এই একখানা ঘর। টালির ছাদের ফোকর দিয়ে চাঁদ আসে রাত্তিরে, বর্ষার রাতে বিছানা-মাদুর সরিয়ে সরিয়ে বসে বসে রা'ত কাটাতে হয়। তা'ও সেই ঘরের ভাড়া বাকি পড়েছে ছ'মাসের। বাড়ি-অলার লোক আসে রোববার-রোববার। নেপাল থাকে দোকানে। ঝক্কিঝঞ্ঝাট সামলাতে হয় মলিনাকেই।

বলে—বড়বাবু, আর ক'টা দিন সময় দ্যান। দোকানে ধার-বাকি পড়ে গেছে। আদায়-পত্তর নেই।

'কথা শোনো' ব'লে বাড়ি-অলার লোক এ-পাশের ও-পাশের মানুষজনকে সালিশী মানে। কথা শোনো, আদায়-পত্তর নেই কী রকম! দোকানে তো রাতদিন খদ্দের ছেঁকে আছে, দেখতে পাই।

এ-কথা আরও কেউ কেউ বলে। নেপালকে তাই একদিন মলিনা ব'লেছিল—কী গো, ছ'মাস তো ওপুড়-হাত করোনা। এদিকে সবাই বলে দোকানে খদ্দের লেগে আছে!

—তুই আমাকে সন্দ ক'রছিস। নেপাল ব'লেছিল—ওরা খদ্দের নয়, যমদূত। আমাকে খাবে তবে ছাড়বে।

সোয়ামীর মুখে হাঁ ক'রে তাকিয়েছিল মলিনা। নেপাল সরে এসে ওর কানে-কানে কী যেন ফিসফিসিয়েছিল।

বড় বড় চোখে বুক টান ক'রে মলিনা ব'লেছিল—তুমি না পারো, আমি যাবো ভবেশ বাঁড়ুজ্জের কাছে। গিয়ে ব'লবো···

আঁৎকে উঠে এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসেছিল নেপাল। দৌড়ে এসে মলিনার হাঁ-য়ে থাবা বসিয়ে ব'লেছিল—খবরদার।

এক ঝটকায় সোয়ামীকে ঠেলে ফুঁসে উঠেছিল মলিনা।

—মানে? বিনি-পয়সায় রাবণের গুষ্ঠিকে বাণ্ডিল-বাণ্ডিল বিড়ি প্যাকেট-প্যাকেট সিগ্রেট খাওয়াতে হবে, আর এ-ধারে বিনি-চিকিচ্ছের শুকিয়ে পোড়া কাঠ হ'য়ে যাবে মেয়েটা?

কাঁদো-কাঁদো গলায়-নেপাল ব'লেছিল—ওদের ন্যাজে পা দিস্‌নি, বৌ। তারপর কিছুটা সামলে-সুমলে মলিনার কাঁধে সোহাগের হাত রেখে ব'লেছিল—ওদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে তো চা পান বেচা তুলে দিয়েছি। তা'তে কত গোঁসা! বলে, নেপালদা, তুমি মাইরি আমাদের দিকটা একদম দেখছো না। ধারে খাই ব'লে চা পানের পাট তুলে দিলে।

—তা' দেবেনাতো কী? নিজে নিজেই গজরেছিল মলিনা। —ভূতদের খাওয়াবার জন্যে তো দান-ছত্তর খুলে বসিনি। ক্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর।

আজ তাই সাহসে বুক বেঁধেছে মলিনা। এ'র একটা বিহিত না ক'রতে পারলে মেয়েটাকে তোলা যাবে না। নিজেরাও উপোসী থেকে থেকে ম'রবে।

দুপুরে জ্বরটা যেমন ভেড়ে আসে, আজও তেমনি। মেয়ের কপালে হাত রেখে তাত নিলো মলিনা। কপালে যেন গন্‌গনে উনুন। রোজ রোজ জ্বরটা এমনি দাপিয়ে এসে ওকে বেঁধে রাখে ঘরে। কপালে জলপটি দিয়ে বাতাস ক'রে ক'রে আঁচ নামাতে নামাতে সন্ধ্যে উৎরে যায়। কিছুতেই আর যাওয়া হ'য়ে ওঠে না ভবেশ বাঁড়ুজ্জের কাছে।

আজ কিছুতেই জ্বরের চোখ-রাঙানি সইবে না মলিনা। আটকা থাকবে না ঘরে। পুরুষ মানুষ যদি না পারে তো মেয়ে মানুষ হ'য়েও তাকেই পারতে হবে। ভবেশ বাঁড়ুজ্জেকে জিগেস ক'রবে গরীব মেরে এ কেমন ধারা দেশের কাজ?

দিকটাও ছোট ক'রে দেখতে পারলো না নেপাল। তাদের সঙ্গে শম্ভুর কোথায় যেন একটা মিল দেখছিল নেপাল। আর, যেহেতু এই মুহূর্তে শম্ভুই তা'র সবচেয়ে বড় বন্ধু, তাই ওই ভেজাল-কারবারীও তার শত্রুর পক্ষের লোক নয়, বলে নেপালের বিশ্বাস জন্মালো।

এলোপাথারি ভাবতে ভাবতে নেপাল ফল সাবু কিনলো। দোকানের দিকে গেল না। সাবু ফলের ঠোঙা বুকে চেপে জোর কদমে চললো ঘরের দিকে। আজ রাতে সাবু পড়বে মেয়েটার পেটে, দু'কুচি ফলও চিবুতে পারবে। মলিনার কালি-ঢালা চোখের ঘোলাটে তারায় হারানো দিনের রোশনাই দেখবে। ঠোঙাটা নাকের কাছে এনে আঘ্রাণ নিলো নেপাল। অচেনা-অচেনা গন্ধে ওর বুকটা ভরে উঠলো।

খুশিতে ডগমগ হ'য়ে গলি থেকেই হাঁক পাড়লো—নে, এটা ধর বৌ। আর শোন, সব ব্যবস্থা ক'রে এলুম। বলেছিলুম না কাল সকালে ডাক্তার আনবো! দেখিস···

অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল নেপাল। অনেকটা সময়ও ক্ষয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

ঘরে তখন সন্ধ্যের আবছা আঁধার। বিছানায় একটা শরীরের ওপর আর একটা শরীর।

মুকুন্দ দৌড়ে এলো পাশের খুপড়ি থেকে।

—নেপাল, ভেঙে পড়িস নি। এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়।

হতবাক্ নেপাল দেখলো দোর গোড়ায় পাতলা ভিড়। তা'র মধ্যে ন্যাড়া, গণশা, বাদলি এবং আরো অনেকে।

ওরা ব'ললো—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, নেপালদা। আমরা সব ব্যবস্থা করছি।

নেপাল কাঠ।

—শোন্ ননী, তুই যা নীরেন ডাক্তার আর মণিময় রায়ের কাছে। আর শান্তকে পাঠাচ্ছি মেডি-ক্লিনিকের চৌধুরীর কাছে। পঁচিশ টাকা ক'রে স্লিপ দিয়েছে ভবেশদা। এতে হবে না রে?

—যাই করো বাবা, কালীমার্কা অন্তত তিনটে আনিও।

ফল সাবুর ঠোঙাটা খসে পড়লো নেপালের হাত থেকে। স্যাঁৎসেতে মেটে মেঝেতে পড়ে বলের মত গতিশীল হ'য়ে উঠলো ফলগুলো। একটাতো একেবারে গড়িয়ে চলে গেল নেপালের মেয়ের নাগালের মধ্যে।

আর তখনই ডুকরে কেঁদে উঠলো নেপাল। মেঝের বিছানায় কেউ কিন্তু নড়ে উঠলো না সে কান্না শুনে।

অমিতাভ বাগচী

রবীন্দ্র সহচর সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের বন্ধুত্ব কাহিনী

অতীতের ঘটনা পরম্পরা পর্যালোচনা করলে মানসপটে যে চিত্রের উদয় হয় তার মূল্য অসীম। আমি সৌভাগ্য বলে সেই জাতীয় মূল্যবান বস্তু পেতে সক্ষম হয়েছিলাম দুই প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের ঐতিহাসিক সংযুক্ত বন্ধুত্বের ঘটনাবলী সংগ্রহ করে। সহজলভ্যভাবে সে ইতিহাস জানতে পাই রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে। গত ১৯৫২ সালে যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি তখন তিনি ছিলেন বিশ্বভারতী প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। এখানে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে স্বভাবত ব্যক্তিগত পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দৃঢ়ভিত্তিক হয়। এইভাবে একটা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চাকুরীর মেয়াদ শেষ হলে পর অবসর জীবন এখানেই অতিবাহিত করেন। ইদানীং বার্ধক্যে কাবু হওয়ায় বেশীর ভাগ সময়ই ঘরে থাকতেন। আমি প্রায় তাঁর কাছে যেতাম। তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রকমারী গল্প বলে যেতেন, আর আমি শয্যাপার্শ্বে বসে শুনতাম। এইরকম বহু পুরাণো কাহিনী আমি জানতে পাই। তন্মধ্যে এই স্মৃতিচিত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যা আমি ব্যক্ত করছি। মৃত্যুর ছ'মাস আগে আমাকে বলেছিলেন নজরুলের সঙ্গে তাঁর কিরকম বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য কথা ওঠার কারণ, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ব্যাপক অনুষ্ঠান হয়েছিল নজরুলের ৭০তম বর্ষ পূর্তি জন্মোৎসবের। সেই সুযোগে যা সংগ্রহ করেছিলাম সেই ইতিবৃত্ত আমি গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করলাম।

সুধাকান্তবাবু ও কাজী নজরুলের মধ্যে প্রথম বন্ধুত্ব সূত্রগ্রথিত হয় কলেজ ষ্ট্রীটে। এই আলাপের মূল উৎস হচ্ছে ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটের দোতলার মেস বাড়ীতে যেখানে থাকতেন নজরুল। আর পাশের ১৪নং বাড়ীতে সুধাকান্তবাবু ছিলেন। পাশাপাশি থাকার জন্য চেনা জানার মাধ্যমে স্বাভাবিক হৃদ্যতা ঘটে। তার থেকে বিশেষত্ব ধারণ করল, আড্ডা। নজরুলের ঘরে নিয়মিত আড্ডা জমত। সুধাকান্তবাবু ছিলেন সেরা আড্ডাধারী। কাজেই তিনি নজরুলের ঘরে দৈনিক এসে কথাবার্তায় অবসর বিনোদন করতেন। ফলে দুজনে হয়ে গেলেন সকল সময়ের বন্ধু। সেই মেসেই আবার থাকতেন

স্বনামধন্য কম্যুনিষ্ট নেতা মজঃফর আহ্‌মেদ সাহেব। সেই সময় আড্ডার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী বিপ্লবী মাননীয় ভূপতি মজুমদার যখন তখন আসতেন। তাঁর সঙ্গে জুটতেন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রখ্যাত কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার আসতেন নজরুল কবিতা আবৃত্তি করতে এবং সেইসঙ্গে সাহিত্যপ্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করতেন। তাঁদের এমন একত্র সমাবেশে বেশ একটা গল্প মজলিসের বৈঠক চলত। এ সমস্ত ঘটনা নজরুলকে কেন্দ্র করে। তাতে সুধাকান্তবাবু নজরুলকে বন্ধুভাবে পেয়ে গেলেন। বন্ধুত্ব সূত্রে সুধাকান্তবাবু নজরুলকে কয়েকজন কবির বাড়ী নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন, তাঁরা হচ্ছেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ, কালিদাস রায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনিই সর্বপ্রথম তৎকালীন 'মুশলিম ভারত' সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন থেকে সুধাকান্তবাবু এবং নজরুল একই সঙ্গে কবিতা লিখতে থাকেন। বন্ধুত্বের হাত মিলিয়ে নজরুলকে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে আনেন। তখন নজরুল রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও স্বরচিত সঙ্গীত গেয়ে শোনান। শুনে মুগ্ধ হন রবীন্দ্রনাথ ও আরও দু'জন আশ্রমসেবী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রায় সাহেব জগদানন্দ রায়।

তাঁরা ছিলেন একসত্তাবলম্বী আর জোড়ের পায়রা—সবসময় একসঙ্গেই বেড়াতেন। বন্ধুত্ব গভীরতর হওয়ার এটাও একটা কারণ। তাঁদের একটা অভ্যাস রীতি ছিল যখন তখন মেস থেকে বেরিয়ে রেঁস্তোরায় গিয়ে ঢুকতেন। সেখানে জলযোগ হত আর মজলিসও বসত। পাঁচজনের আনাগোনা হাবভাবের চালচলনের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখতে পেতেন। সেজন্য দৈনিক রেস্তোঁরায় খাওয়া হত। একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটে। ওঁরা চা খাবার খাচ্ছিলেন, এমন সময়ে পাশের কেবিনে তুমুল হট্টগোল। দেখেন একজন মাতাল ভদ্রলোককে কয়জন বয় মারধোরের উপক্রম করেছে। জানা গেল, সে চপ কাটলেট ওমলেট একধার দিয়ে খেয়ে নিয়েছে। তারপর দাম দেবার সময় কাঁটা চামচ ছুরি পকেটস্থ করেছে। দাম চাইলে বলে, পয়সা নেই। বডি সার্চ করতে পার। আমি রেডি টু বি ল্যাংটা কিন্তু কিছু পাবে না।" এই বলায় ওরা পকেট হ্যাৎড়িয়ে পায় ওদের নিজস্ব জিনিষ-গুলো। ফলে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে মারমুখী। ব্যাপার দেখে ওঁরা দুজনে বাধা দিয়ে বললেন, ভাই ওকে তোমরা ছেড়ে দাও। কাঁটা চামচ ছুরি তোমাদের যা পাবার পেয়েছ, এইবার বল যা ও খেয়েছে তার দাম কত।

"রেষ্টুরেণ্টের মালিক বলে, 'ওকি কম খেয়েছে। দেড় টাকার খেয়ে এখন বলছে পয়সা নেই।" নজরুল তখন সুধাকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাদা এস আমরা দুজনে চাঁদা করে ঐ দামটা চুকিয়ে দিই।" অবস্থা বেগতিক দেখে অগত্যা সুধাকান্তবাবু মত দিলেন। মাতাল নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। চুকিয়ে দিয়ে রাস্তার ফুটপাতে অট্টহাস্য করে নজরুল বললেন, "ভাগ্যে আমরা ছিলাম তাই মাতাল ভদ্রলোকটা রেহাই পেলে। একে লোকটা ভুড়িওয়ালা মোটা ব্যাংটা তার উপর বলে কিনা রেডি আছি হতে ল্যাংটা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমরা বাধা না দিলে কি কেলেঙ্কারী ঘটে যেত।" একটু থেমে আবার বললেন, "এমন কি দোষ করেছে। ক্ষিদে পেয়েছিল পেটপুরে খেয়ে নিয়েছে। মাতালেরা ত এরকম করেই থাকে।" তারপরে আর একবার অট্টহাসি। এই ঘটনা নজরুলের মানবদরদী হৃদয়ের ও নির্মল মনের পরিচয় দেয়। এমনি আরও অনেক উদারতার ভাব দেখিয়েছেন তাঁর সহজ সরল জীবনে।

নজরুল বিপ্লবী কবি হলেও শেষের দিকে গান্ধীবাদী হয়েছিলেন। সুধাকান্তবাবু ছিলেন গান্ধীভক্তদের একজন। কাজেই ঐ ক্ষেত্রে মনের মিল ছিল। "মুসলিম ভারত" পত্রিকায় গান্ধী ভাবাপন্ন কবিতা প্রকাশ হত। নজরুলের একটি কবিতার নিদর্শন আছে, এখানে শুধু প্রথম লাইন উদ্ধৃত করা গেল :

"হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন"—

সুধাকান্তবাবু সেই সঙ্গে গান্ধীর উদ্দেশ্যে একটা দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন যার আলোচ্য অংশ এই :

"বন্দী তোমায় মানবগুরু সত্যভাবের রত্ন গো
মিথ্যাচারের ভাঙতে গরব নিত্য তোমার যত্ন গো
মুক্তামানিক ঝিলিক তোমার গম্য পথের বিঘ্ন না
উক্তি তোমার অসির অধিক তবু রক্ত লোলুপ তীক্ষ্ণ না।"

এরপর নজরুল সম্পাদিত সাহিত্যপত্র "ধূমকেতুর"র আবির্ভাব। এই পত্রিকাতে নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা সাহিত্য রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাব ও ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে। এবং এমন উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল যে তারপর 'প্রবাসী' পত্রে সাদরে গৃহীত হয়। কবিতার মনের ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য যে রকম ছন্দ প্রয়োজন সমস্তটাই সংযোগ করেছেন। বিভিন্ন ভাষা থেকে বিভিন্ন শব্দ চয়ন করে কবিতা বা গান লেখায় নজরুল নিজের

অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছেন। এই শব্দ চয়ন ব্যাপারে উর্দু ফারসী আরবী বাংলা কোনটাকেই বাদ দেন নি। সুধাকান্তবাবু কাব্যাদর্শের দিক দিয়ে নজরুলের সমর্থক হিসাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে কাব্যরসিকতায় সমান অংশীদার হয়ে গেলেন। এই কাব্যের খাতিরে বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয়। সুধাকান্তবাবু কাব্যরসে একেবারে অনুরাগী হয়ে পড়লেন। আমোদের কথাবার্তা পরস্পরের মধ্যে চলত কবিতাকারে। তাতে বন্ধুত্বের ঠাট্টা তামসা। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একদিন সকালে উঠে হঠাৎ দেখা গেল সুধাকান্ত বাবুর চোখ লাল, সম্ভবত আগের রাতে ঠাণ্ডা লাগার দরুণ। নজরুল দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন:

'কেন রে চোখ লাল করম চা?'

অমনি সুধাকান্তবাবুর উত্তর: 'দেখছিস্ না খাচ্ছি আমি গরম গরম চা'।

আর একদিনের ঘটনা। খুব বৃষ্টি। ঘরে বসে মন টেকে না। উনি গেলেন সোজা নজরুলের ঘরে। মেসের কয়জন লোক তখন বসে। ঢুকেই বললেন:

'আজকে বৃষ্টির দিনে ভাল হ'ত কাজী
আনতিস্ যদি চা ও গরম পেঁয়াজী।'

বলা মাত্র নজরুল কখন কেট্‌লি হাতে ছুট। এদিকে সবাই মজলিসে মাতোয়ারা হয়ে কারুর খেয়াল নেই। খানিক পরে অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় চা খাবার নিয়ে নজরুলের হাজিরা দেখে বিস্ময়ে সুধাকান্ত বাবু বললেন:

'ওরে তুই বলার সঙ্গে হলি রাজী'

নজরুল বলেন হেসে: 'তার কারণ আমি হচ্ছি মহাপাজী।'

এইরকম সম্প্রীতিভাব পুরোমাত্রায় বজায় ছিল কলেজ ষ্ট্রীটে বাসের শেষ দিন পর্যন্ত। উভয়ে কালের গতিতে স্থানত্যাগ করে এখানে সেখানে বিভক্ত হলেন। কর্মস্থান ও সেবাদর্শের তাগিদে সুধাকান্ত বাবু উপস্থিত হলেন শান্তিনিকেতনে। আর নজরুলের অবস্থান কলকাতায়;—তবে দেশ-প্রেমিকতা ও সাধনার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন দেশ দেশান্তরে ঘুরে ফিরে এবং কারাবরণ করে। সেই কলেজ ষ্ট্রীটে কেউ নেই, তবু এমন ভগবৎতুল্য অন্তরঙ্গতা চিরস্মরণীয় এক ঐতিহাসিক স্বাক্ষর বহন করবে।

শেষের দিকে দুজনের আরও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল বার্ধক্য বয়সের শারীরিক অক্ষমতা হেতু। দূরে থাকলেও পত্র আদান প্রদানে যোগাযোগ রাখা যেত, কিন্তু সুধাকান্তবাবুর সে সুযোগও রইল না। কারণ, নজরুল

মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত গ্রস্থ হওয়ায় একযুগ যাবৎ নির্বাক্ চেতনাহীন। এতে বন্ধুত্ব ইহ জগতেই দূরত্বে পড়ে গেল। অসাক্ষাতে থাকলেও সুধাকান্তবাবু মনের যোগসেতু রেখেছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মুখে আমি নজরুলের প্রতিভার সুখ্যাতি শুনেছি। গুণমাহাত্ম্যে তিনি নজরুলকে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দরদী বন্ধুর পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ এক জায়গায় বলেছেন: 'নজরুল একদিকে বয়ঃ কনিষ্ঠ হিসাবে আমার স্নেহাস্পদ। কিন্তু জ্ঞানে গরিমায় আমার চেয়ে বহুগুণে বড়, সে বিচারে সে প্রণম্য। তবে এ কথাটা অস্বীকার করব না নজরুল সুস্থ থাকাকালীন বন্ধুভাব রক্ষার সঙ্গেও আমাকে অগ্রজ তুল্য শ্রদ্ধা দিয়েছে।'

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, সুধাকান্তবাবু একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম জন সমাজে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে নজরুল বাংলাতে প্রখ্যাত কবি বলে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। উক্তিটি বেদবাক্য হিসাবে কাজে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এ সত্যতা মজঃফর আহ্মেদ প্রকাশ করেছেন তাঁর লিখিত 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থে।

তাঁদের এই বন্ধুত্বের ইতিহাস উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

আঠারো

॥ বিদ্রোহের মুহূর্ত ॥

জুহা মৌলবী তিনপাহাড়ী থেকে ফিরে এসে অনেকগুলো খবর দিলেন। খবরের মতো খবর। সুধাময়বাবু চুলদাড়ি কেটে বিয়ে করেছেন এবং গোরাংবাবুর ব্যাপারে খুব উৎসাহী। মিশনারী হাসপাতালে দুবেলা খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনপাহাড়ীর মতো স্বাস্থ্যকর ষ্টেশনে সুধাবাবুর চেহারা খুব খোলতাই হয়েছে। প্রথমে তো জুহাসায়েব চিনতেই পারেন নি যে চিরোটি স্টেশনের সেই খ্যাংরাকাঠি লোকটি ইনি। তবে মৌলুবীর মতে, সুধাবাবুটিও সেই উন্মাদাশ্রমে থাকার যোগ্য মানুষ। পাগল, পাগল, মাথাখারাপ!...বলে মৌলুবী প্রচুর হাসলেন। কেন পাগল বলা হচ্ছে, তা অবশ্য বিশদ জানতে চায় নি স্বর্ণ।

এরপর ইয়াকুব সাধুর কথা।

হঠাৎ ওখানে ব্যাটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে জুহা মৌলবীর। তাজ্জব কাণ্ড! মুসলমান বাউলফকিরদের একটা আখড়া আছে তিনপাহাড়ীতে। আখড়া না বলে পাড়া বলাই ভালো। পাড়ার শেষদিকে একটা বিশাল দীঘি আছে। তার দক্ষিণপশ্চিম কোণায় আছে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। তার তলায় ইয়াকুব সাধু এখন ইয়াকুব ফকির হয়ে বসে গিয়েছে। পয়সাকড়ি কামানোর ভাল ফন্দিফিকির এঁটেছে ব্যাটা বহুরূপী। হ্যাঁ, এখনও তার ভর ওঠে, মাথা দুলিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে সে। কিন্তু 'কালী-কালী' বলে না ভুলেও। তার বদলে 'আলি-আলি' বলে। সে চ্যাঁচানি শুনে দুর্বল লোকের মারা পড়ার কথা। গাঁজাখোর লোকের বুকে এত দম থাকে, ভাবা যায় না!

আর, সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড—হেরুর ছেলে, সেই ডেভিড কিংবা ইসমাইল এখন তার কাছে।

কীভাবে এই মিলন ঘটল, তাও শুনে এসেছেন মৌলবী। আগের বর্ষায় ইয়াকুব যখন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাটোয়া স্টেশনে হেরুর ছেলেকে হঠাৎ দেখতে পায়। ইয়াকুব বলেছে, খুব বৃষ্টি পড়ছিল রাত্রিবেলা। স্টেশনের পিছনে রেলের মস্তো আটচালায় আরও সব ভবঘুরে ও ভিখিরীদের

সঙ্গে সে রাত কাটাচ্ছিল। এমন সময় পাশেই আবিষ্কার করে ছোঁড়াটাকে।' পাতলুন-জামাপরা ক্ষুদে প্রাণীটা কুঁকড়ে শুয়ে ছিল। গাঁজা খাবার জন্তে দেশলাই জ্বালতেই তার মুখে আলো পড়ল। মুহূর্তে চিনেছিল ইয়াকুব। প্রথমবার সন্দেহ হলে আবার আলো ফেলেছিল।...

তবে আসল কথাটা হচ্ছে—ইয়াকুব বলেছে মৌলবীকে—সে ওই ছেলেটার জন্তেই চুপিচুপি চিরোটির দিকে এগোচ্ছিল। শেষরাতের রেল গাড়িতে চেপে সে ওখানে যেত—প্রথমে স্বর্ণমায়ের কাছে, তারপর মৌলবীর কাছে। কারণ ছেলেটার জন্তে সে একটুও সুখ পাচ্ছিল না। 'সাধনভজনে' মন বসছিল না। তা—এই তো হচ্ছে চরম প্রমাণ যে ইয়াকুবের ঈশ্বর ইয়াকুবকে পরিত্যাগ করেন নি।

ছেলেটা স্বল্পভাষী বরাবর। যেটুকু ইয়াকুব জেনেছে, তা হল: গোবরহাটির মতিবায়েনের বাড়ি থেকে সে সোজা মাঠবিলজঙ্গল পেরিয়ে চলতে থাকে। তার কিছু ভাল লাগছিল না। সে পাদ্রীবাবার কাছেই (কী নেমকহারাম ছেলে!) ফিরতে চেয়েছিল। পথ ভুলে সোজা গিয়ে ওঠে রেললাইনে, তারপর লাইন ধরে চলতে চলতে পৌঁছয় বাজারসাহু স্টেশানে। চিরোটির ডাউনে একটা স্টেশনের পরেরটায়। তখন রাত দুপুর হয়ে গেছে। অতটুকু ছেলে বনবাদাড় ভেঙে হেঁটেছে! সাপে কাটেনি। ভয় পায়নি! তারপর সকালবেলা একটা গাড়ি আসতেই চেপে বসেছে। কথা বলতে চায় না তো! তাই কাকেও জিগ্যেস করেনি, গাড়িটা কোথায় যাবে।

গাড়িটা ভাগ্যিস ছিল কাটোয়া লোকাল। ওখানেই শেষ। তাই ছেলেটা শেষ অব্দি কাটোয়ায় ঘুরেছে সারাটা দিন। সুন্দর টুকটুকে ছেলে দেখে অনেকে ভেবেছে ভদ্রলোকের ছেলে—পালিয়ে এসেছে কিংবা পথ হারিয়েছে। তাই কেউ কেউ খোঁজখবর করতে চেয়েছে। কিন্তু সে কারো কাছে ধরা দেয় নি।

শুধু এক ময়রার স্নেহকে সে প্রত্যাখ্যান করে নি। ময়রাটা তাকে পেটপুরে লুচিমিষ্টি খাইয়েছিল। ময়রাবউ বলেছিল, আমাদের ঘরে থাকো, বাবা। কিন্তু সে এক ফাঁকে ফুড়ুৎ করে উড়েছে। তারপর সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি এলে তখন আটচালায় গিয়ে জুটেছে।

ইয়াকুব বলেছে, আমাকে চিনল সঙ্গে সঙ্গে। বাপ বলে কেঁদে উঠল। তবে কথা কী, মানুষের মধ্যে আত্মা আছে। সেই কেঁদেছিল। ও তো

দুধের বাচ্চা। অত কিছু বোঝে না। ওর আত্মার কাছে সবই তো পরিষ্কার। যেমন এই দীঘির পানি—আপনি তার তলাঅব্দি দেখতে পাবেন মৌলবীসায়েব।

জুহা মৌলবী কীভাবে ইয়াকুবকে আবিষ্কার করলেন ?

সেও কম চমকপ্রদ নয়। তিনপাহাড়ীতে অধিকাংশ মানুষই বঙ্গভাষী—যদিও জায়গাটা বিহারপ্রদেশ। সেখানে মুসলমানরা আগের বছর জুহা মৌলবীর কাছে 'তৌবা' করে ফরাজীমতে দীক্ষা নিয়েছিল। পবিত্রভাবে জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু করলে কী হবে ? ফকির বাউল পাড়াটা কাছাকাছি থাকায় খুব শিগগির ঝাড়ফুঁক মন্তরতন্তর কিংবা অনৈসলামিক সংস্কার চলে যাওয়া সহজ নয়। এবার গোরাংবাবুকে নিয়ে যাবার পর মৌলবী সব টের পেলেন। মোড়লরা জানাল, 'জমাত' (সমাজ) বশে আসছে না। লুকিয়ে বিবিসায়েবারা পীরের সিন্নি খায়। মানত করে। কামাল ফকিরের কাছে মাদুলী নেয়। মুসকিল আসানের চিরাগ থেকে পিদীম জ্বালে লুকিয়ে। তার ওপর ইদানীং উৎপাত কে এক প্রচণ্ড ফকির ইয়াকুব বাবাসাহেবের আবির্ভাব। আর ঠেকানো গেল না শরীয়ত। শুধু তিনপাহাড়ীতে নয়, ঐ এলাকায় হিড়িক পড়ে গেছে। হিন্দু মুসলমান সবাই এসে ভিড় করছে তার আস্তানায়। একটা ঘরও করে দিয়েছে ফকিরবাবাকে।

সুতরাং, অন্যান্য ক্ষেত্রে যা করেন, এখানেও সেই কৌশল অবলম্বন করলেন জুহা মৌলবী। দলবল নিয়ে চড়াও হয়ে ভড়কে দেবার চেষ্টা করলেন। ইয়াকুবের সাগরেদও জুটেছিল দুচারজন। বাইরের ভিড়ও ছিল। সবে ভর ওঠার আয়োজন চলেছে। তিন পাহাড়ীর আণ্ডাবাচ্চা তাবৎ মুসলমান শিষ্যসহ জুহা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই চকিতে ব্যাপারটা টের পেয়ে ভিড় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। তারপর সাগরেদরা দীঘির জলে প্রায় ঝাঁপ দিল বলা যায়। (মৌলবী খুব হাসতে হাসতে এই বর্ণনাটা দিলেন) তখনও ব্যাটা ইয়াকুব চোখ বুজে ভান করছে। এদিকে হেরুর ছেলেটা ঘরের দরজায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ওকে না দেখলে মৌলবী টেরই পেতেন না যে এ ব্যাটা সেই কালীসাধক ইয়াকুব !

জুহা তক্ষুনি চিনতে পারলেন ইয়াকুবকে। ব্যাটার চেহারায় জেল্লা খেলছিল। রোজগার ভালই হচ্ছিল কি না। জুহা চেঁচিয়ে ডাকলেন, এ্যাই ইয়াকুব !

ইয়াকুব চোখ খুলল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল—আসসালামু আলাইকুম মৌলানাসায়েব !

ব্যাটা অসম্ভব ধূর্ত।

তাহলেও শরীয়তের পবিত্রতারক্ষার জন্য জুহা কোনরকম অজুহাত বরদাস্ত করতেন না। তিনি ভালই জানেন, এসব ক্ষেত্রে ইয়াকুবের জন্যে থানার দারোগাবাবুরা কিছুই করবে না। কারণ, মোড়লরা মৌলবীর পক্ষে।

অথচ হঠাৎ কী ঘটে গেল মৌলবীর মনে।

ঠিক কী ঘটল, তিনি এখনও স্পষ্ট বলতে পারবেন না। বড়জোর বলতে পারেন, বিকেলের লালচে রোদ পশ্চিমের খোলা মাঠ পেরিয়ে এসে ছুটো মুখে পড়েছিল, আর পিছনে বটগাছের ছায়া দীঘির পাড় বেয়ে উঠে গিয়েছিল, একটা গভীর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল হঠাৎ সেই পরিবেশে—কী জানি কেন, মৌলবীর মনে হল—এখানে সবকিছু বড় নিস্ফল আর অকারণ যেন। নাকি ছুটো মুখেই কী ছিল—কোণঠাসা আক্রান্ত প্রাণীর ভয়, কিংবা উল্টোটা—তীব্র পরিহাস, জুহাসায়েব ইয়াকুবের সঙ্গে অন্যরকম কথাবার্তাই বললেন। খুব ঠাণ্ডা মেজাজে ওকে কিছু সদুপদেশ দিলেন। ছেলেটার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ রসিকতা করলেন। এতে কার মাহাত্ম্য বাড়ল, সেটা এখন বলা কঠিন—ইয়াকুবের কিংবা মৌলবীর। তবে যে-কটা দিন ছিলেন, ইয়াকুব তাঁর কাছে গেছে—পায়ের কাছে বসে ধর্মোপদেশ শুনেছে আর ফাঁকে ফাঁকে চিরোটি এলাকার খবরাখবর জিগ্যেস করেছে। গোরাংবাবুর কথা শুনেছে, কেঁদে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়েছে। বলেছে আমি যখন কাছেই আছি—স্বর্ণমাকে বলবেন, কোনরকম অসুবিধে হবে না ডাক্তারবাবুর।

ছেলেটা—নেমকহারাম ছেলেটা মৌলবীকে একটি কথাও বলেনি!

এতসব বলার পর জুহা আচমকা বলে উঠলেন—তবে আল্লার কসম, পাদ্রীকে আমি এলাকা থেকে তাড়াব। রাঙামাটির ঝিলে গরীবগুরবো লোকেরা এটাওটা কুড়িয়েবাড়িয়ে এ্যাদ্দিন খেয়ে বেঁচেছে। শুনলুম, চৌকিদার দফাদার আর লেঠেল বসিয়েছে সেখানে। মাছ বেচে মিশনের খরচ তুলবে।

তারপর স্বভাবমতো তিনি ফের অন্যপ্রসঙ্গে গেলেন। বাঘের হাতে চৈতকের মৃত্যুতে খুব দুঃখপ্রকাশ করলেন। জর্জের ব্যাপারে বললেন—লোকটা ভালো। তবে সেও এক পাগল। ওকেও না তিনপাহাড়ী নিয়ে যেতে হয়।

শেষে বললেন, বাঘটা আমিই মারব। লোকে মাঠে নামতে পারছে না। তার ওপর আমার বন্ধুর ঘোড়াটা খেল। শয়তানের শাস্তি না দিলে নয়।

স্বর্ণ হাসতে পারত কথাটা শুনে। কিন্তু হাসির দিন তার নেই।

এরপরই জুহামৌলবীর বাঘমারার অভিযানটা ঘটে। সে বড় হাস্যকর ব্যাপার। স্বর্ণ স্বচক্ষে কিছু দেখেনি। বাঘটা কোণঠাসা হয়ে পড়ায় বেশ কয়েকজনকে জখম করেছিল। এমন কি মৌলবীকে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল।

বাঘটার ব্যাপারে জুহা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন এবার। কালেকটার বাহাদুরের কাছে এলাকার লোকের সই সংগ্রহ করে দরখাস্ত গেল। সরকার আশ্বস্ত করলেন—সবুর, ব্রিটিশ প্রজাবর্গের অশান্তির কারণটিকে শীঘ্রই দূর করা হবে।

বাঘ মারতে একদল শিকারী এল। দুটো হাতি এল। ষ্টেশনের পিছনের মাঠে তাঁবু পড়ল। সে এক হইচই ব্যাপার। শোনা গেল স্বয়ং কালেকটার বাহাদুরও আসবেন বন্দুক নিয়ে।

জর্জ হ্যারিসন ভেতরে-ভেতরে রেগে লাল। ইদানীং কেন কে জানে,—হয়তো নিজের ব্যর্থতার জন্যেই, স্বর্ণকে এড়িয়ে থাকে। স্বর্ণ কিন্তু মুখোমুখি হলেই খোঁচা দিতে ছাড়ে না—কী জর্জ? তোমার খবর কী?

—কী খোবোর?

—বাঘ?

জর্জের চোখ দুটো মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। মনে হয়, জানোয়ারের মতো ঝাঁপ দিয়ে স্বর্ণকে ধরাশায়ী করতে পারলে তার পৃথিবী আর আকাশের মুক্তি ঘটে। আর স্বর্ণ ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে ধীর ছন্দে চলে যায় গাঁওয়ালে। তার গলায় স্টেথিসকোপ, একহাতে ব্যাগ। সে এখন পায়ে হেঁটেই রোগী দেখতে যায়। ফিরতে রাত হবে বলে আগের মতো বিকেলে বেরোয় না—দুপুরেই রওনা হয়।

তিনপাহাড়ী যেতে মন টানছিল তার। যতটা না বাবার জন্যে, হেরুর ছেলেটার জন্যেই। ছোঁড়াটাকে এত যে দেখতে ইচ্ছে করে। কত বড় হয়েছে, কেমন হয়েছে এখন! পৃথিবীতে চোখ খোলার পর থেকে যাকে দেখেছে সামনে, সেই তো হবে তার প্রকৃত আত্মজ। তার নাম ইয়াকুব সাধু। তার কাছে গিয়ে তাই নিশ্চয় ছেলেটা শান্তি পেয়েছে। কিন্তু কী হবে ওর ভবিষ্যত? ওইরকম ভবঘুরে সাধুসন্ন্যেসী হয়ে জীবন কাটাবে সে?

এটা সঙ্গত মনে হয় না। তার চেয়ে পাদ্রী সাইমনের কাছে থাকলে আর কিছু না হোক, সভ্যভদ্র একটা জীবনের আশা ছিল। লেখাপড়া শিখতে

পারত। এখন মনে হয়, স্বর্ণ নিজেই বড্ড ভুল করেছে। কেন ছেলেটাকে লুকিয়ে রাখল সে? কেন ওকে ফিরিয়ে দিয়ে এল না পাদ্রীর কাছে?

এখন আফশোস লাগে। বিক্ষোভটা মাঝে মাঝে এত তীব্র হয় যে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে! কী ভুল, কী ভুল! হেরুর আত্মা কি সব দেখতে পাচ্ছে? সে নিশ্চয় এর জন্যে দায়ী করছে স্বর্ণ আর ডাক্তারবাবুকে। হেরু ছিল তাদেরই আশ্রিত মানুষ। তার ছেলের আখের এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত হয়নি।

এমনি চিত্তপ্রক্ষোভের মধ্যে দিনেরাতে স্বর্ণ অবচেতনায় প্রস্তুত হচ্ছিল। এ ব্যাপারে একটা কিছু করা তার দরকার। কিছুতেই নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারছিল না সে। আগের মতো হঠকারী কোন আবেগের ফলাফল নয়—একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছিল সে।

ইতিমধ্যে জুহা মৌলবীর সঙ্গে পাদ্রী সাইমনের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল।

মোড়ল মাতব্বর লোকেরা অবশ্য এ ঝামেলা চায় না। পাদ্রীর সঙ্গে তাদের কিসের বিরোধ? তারা কেউ ঝিলে নামে না শামুকগুগলি তুলতে! তারা পাদ্রীর কাছে অসুখবিসুখে বিনাপয়সায় বা নামমাত্র দক্ষিণায় ওষুধ পায়। মুসলমান মোড়লরা মৌলবীরা ফতোয়া ফাঁকি দিয়ে গোপনে ওষুধ নিয়ে আসে। তারা অনেক ওজর-আপত্তি দেখাচ্ছিল।

তখন জুহা তাঁর ফতোয়ায় রণকৌশল বদলালেন। বললেন, সাদা চামড়ার খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বাদশাহী কেড়েছে, অতএব তারা মুসলমানের দুষমণ। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্যপালনীয় কাজ।

মৌলবীর এ কণ্ঠস্বর অবশ্য নতুন নয়। বরাবর বলেছেন এমন কথা—কিন্তু জেহাদের ডাকটাই যা দেন নি।

এখন জেহাদের ডাক দিতে গিয়ে টের পেলেন, কোন সাড়া নেই। এই এলাকার মাটির মালিক আসলে জমিদাররা। সব প্রজাই জমিদারের অনুগত। জমিদাররা ইংরেজ শাসনের একেকটি মজবুত স্তম্ভ।

প্রথম ধমক এল সেখান থেকে। দ্বিতীয় ধমক খোদ কালেকটারের। মৌলবীর বাড়ির দরজায় চৌকিদার টাঙিয়ে দিয়ে গেল ইস্তাহার।...এতদ্বারা মৌলুবী মহম্মদ শামসুজ্জোহা পিতা মৃত মৌলবী মহম্মদ শাহাবুদ্দিন হালসাকিন ডাবকই ডাকঘর গোবিন্দপুর থানা সদর জেলা মুর্শিদাবাদ, তোমাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাটির বাহির হইতে পারিবে না এবং সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাকিম ডাবকই বাদে কোথাও

যাইতে হইলে পূর্বাহ্নে নিকটবর্তী কোন পুলিশ ফাঁড়িতে অনুমতি করাইয়া লইতে হইবে।...ইত্যাদি।

জুহা মৌলবী হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এ যে তাকে সপরিবারে ভাতে-মারার সামিল!

তিনি দেখলেন, খোদাতালার এই বিশাল দুনিয়ায় হঠাৎ এত একা হয়ে পড়েছেন। তাঁর আশেপাশে কেউ নেই।

শিষ্যরা অবশ্য খুব আশ্বাস দিল—আমরা আপনার পরিবারের সম্বৎসরের খরচ চালাব, আপনি ভাববেন না। কিন্তু এতদিনে মৌলবী টের পেয়ে গেছেন যে চাটরার পৈতৃক ভিটে থেকে এখানে আসার সময় যে উৎসাহ ছিল এদের, ক্রমে তা উবে গেছে। ভক্তিতেও ভাঁটা পড়ছে ক্রমশ।

তবু জুহার রক্তে কিছু ছিল। আগেই যাকে বর্ণনা করা হয়েছে মোগল কিংবা হুন সর্দারদের তেজস্বী আবেগ বলে।

স্ত্রী গোবেচারা মানুষ। পৃথিবীর কোন খবরই তাঁর জানা নেই। কিন্তু তিনিও টের পেরেছিলেন, কী ঘটতে চলেছে। স্বামীকে অনেক বোঝালেন বেচারা। কিন্তু জুহা তখন সেই আবেগে ভাসছেন।

সেই সময় একদিন স্বর্ণ এল। মৌলবীর নজরবন্দী হওয়ার কথা চারদিকে সঙ্গে সঙ্গে রটে গিয়েছিল। রাতে বারবার রাঙামাটির নতুন পুলিশচৌকি থেকে সেপাইরা আর চরণ চৌকিদার তাঁকে ঘুম থেকে ওঠায়। চরণ সবিনয়ে বলে, অপরাধ নেবেন না মৌলুবীবাবা, রাজার হুকুম। ঘরে আছেন কি নেই, এবং বিশেষ করে চরণের মুখে বিস্তারিত জেনেই স্বর্ণ এল।

জুহা ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে ঘৃণার ছাপ। স্বর্ণ সব শুনে শুধু বলল, আচ্ছা—আসি মৌলবীচাচা।

মৌলবী কি কিছু আশা করেছিলেন তার কাছে? স্বর্ণ যতক্ষণ না চলে গেল, তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বিদায় দিতে আসা তাঁর অভ্যাসে ছিল—এলেন না। বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে দেখলেন স্বর্ণ উঁচু রেললাইনের ধারে-ধারে চলেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্ত্রীলোক মাত্র! কীই বা করতে পারে সে?

একদিন রাত বারোটায় চরণ চৌকিদার ও সেপাইরা এসে দেখল, জুহা মৌলবীর জ্বর হয়েছে। রীতিমতো কম্পজ্বর। ঠকঠক করে কাঁপছেন। ওরা গ্রামের মাঝখানে বটতলার মাচায় বসে গাঁজা খেল। তারপর টলতে টলতে

চৌকির দিকে এগোল। তখন রাত দেড়টার কিউল প্যাসেঞ্জার শিস দিতে দিতে হাউলির সাঁকো পেরোচ্ছে।

জুহা মৌলবী বেরিয়ে পড়লেন চুপিচুপি।

অন্ধকার রাত। হেমন্ত ঋতু। শীত সবে পড়তে শুরু করেছে। শিশির আর কুয়াসায় সব নিঃঝুম স্যাঁতসেতে। শেয়াল ডাকছিল হাউলির ধারে। জুহা গ্রামের পূবে বাঁজা ডাঙায় দাঁড়িয়ে দূরে ষ্টেশনের দিকে তাকালেন। শিকারীদের তাঁবুতে আলো জ্বলছে। বাঘটার কথা মনে পড়ল এতক্ষণে। একটু হাসলেন মৌলবী।

প্রথমে ঢুকলেন রাঙামাটির বাউরি পাড়ায়। সরা বাউরি যোয়ান ছেলে। তাকে কদিন আগে ঝিলে নামার অপরাধে পাদ্রীর লোকেরা খুব মার দিয়েছিল। সরার নাম ধরে চাপা গলায় ডাকতে থাকলেন মৌলবী।

এই শেষ চেষ্টা। গরীব-গুরবো লোকগুলোকে নিয়ে যদি কিছু করা যায়!

সরা একা উঠল না। তার দুই ভাই মরা আর লখাও বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। তারপর হতভম্ব!

ততক্ষণে চকমকি ঠুকে পিদীম জেলেছে সরা। জুহা বললেন, 'খবর্দার! আলো হটাও। বসো চুপচাপ। শোনো যা বলছি।...'

সরা হেসে বলে, নতুন কী বলবেন মৌলুবীসায়েব—আমরা কাল বিলে নামব! আমাদের সব ঠিক হয়ে আছে। যদুপুর মধুপুর আঁরোয়া গোবিন্দপুর আঙামাটি তাবৎ গাঁয়ের ছোটনোক-টোটনোক সব তৈরী।'

উত্তেজিত মৌলবী রুদ্ধশ্বাসে বললেন, সে কী! কবে-কবে এসব ঠিক হল তোমাদের?

সরা বয়সে প্রৌঢ়। চাপা গলায় রহস্যময় হেসে বলল, 'হয়েছে বইকি! কাল সকালে দেখবেন, কে সবার আগু-আগু যাচ্ছে।'

'বল কী! কে সে?'

সরা জবাব দেয়—'আবার কে? ডাক্তোরদিদি।'

'এঁ্যা! স্বর্ণ! স্বর্ণলতা! গোরাংবাবুর মেয়ে?'

'হুঁ গো। তিনিই তো কদিন থেকে মিটিং কল্লেন গাঁয়েগাঁয়ে। উদিকে রতনপুরের সেই ওমর শেখ—শেখদাদাও মেয়েকে দেখতে এসে সব শুনেছিল। ওমরদাদাকে তো জানেন—সব সময় তিরিকি মেজাজ। সেও খুব ক্ষেপেছে। সৈদাবাদের জমিদারের কাছে গিয়ে খুব লম্ফঝম্প করে এসেছে। এ কাজটা

উচিত হয় নি। ওনাদেরই তো সম্পত্তি ছিল মিলটা। তদ্বির করলে দখল পেতেন। তা না করেই তো সরকারী খাস তালুকে চলে গিয়েছিল। এখন সুযোগ পেয়ে পাদরী ডেকে নিয়েছে নিলামে। যাই হোক, ওমরদাদাও এর মধ্যে আছে।'

লখা বলে, 'অবিচারটা দেখুন। ভগমানের জলা। আমরা সেখানটায় চরে খেয়ে চিরকাল বেঁচে থাকি। আজ এসে পাদ্রী বলে, খাজনা দিতে হবে। সেলামী দিতে হবে মাথাপিছু এক আনা পয়সা। একটা সিকির মুখ দেখিনি—তো একটা আনা! শালা যা আছে, কপালে! নয়তো জেলেই পচে মরব। হেরুর মতন! না কী রে দাদা?'

মরা জ্যেষ্ঠের গাম্ভীর্যে জবাব দেয়—'তা বইকি।'

জুহা যখন মাঠে নামলেন, তখন মনে হল তিনি এক দিগ্বিজয়ী ঘোড়া। শিশিরে পাজামা ভিজে ঢোল হল। ধানের শীষ আলের ওপর উপচে এসে এসে পড়েছে। সেই শীষ দলে হাঁটতে থাকলেন।

ফার্স্ট সিগনালের কাছে লাইন পেরিয়ে বটতলা ঘুরে স্বর্ণর বাড়ি পৌঁছলেন। কের চাপা গলায় ডাকতে থাকলেন—'স্বর্ণ, ও স্বর্ণ, মা স্বর্ণলতা!'···

উনিশ

ওমর শেখের কীর্তি

আকাশে তখন 'ঝুঝকি' তারার উদয়, হিন্দু মতে ব্রাহ্মমুহূর্ত, আর মুসলিম মতে 'সোবেহ্ সাদেক'—জুহা মৌলবী নমাজের জন্যে তৈরী হয়েছেন, সেই সময় বাইরে কোথাও ঢোল বেজে উঠল ডিম্ ডিম্ ডিমা ডিম!

জুহা কান পাতলেন। ঢেড়রা দেওয়া হচ্ছে এই অসময়ে—কিসের? মানুষের জেগে ওঠার সময় হয়নি, সবে কিছু কাক বাঁশবনের ডগায় বসে চাপা কণ্ঠস্বরে ও সংশয়ে একটি দিনের কথা ঘোষণা করছে, হালকা কালো একটা রঙ খোদাতালার দু'নিয়া জুড়ে রহস্যের শেষ খেলা খেলে চলেছে। আর, এসময় কি চরণ চৌকিদারের মাথা খারাপ হল হঠাৎ? জুহা মনে মনে হেসে বললেন, ব্যাটা উল্লুক নেশাখোর শয়তান! নেশার ঘোরে সময় ভুল করেছে নির্ঘাৎ।

তারপরই যথারীতি শোনা গেল চরণের গলা: এই হেঁদুমোছলমান ছোটবড় তাবৎ পোজা সব্বসাধারণকে কহা যায় কী···

হঠাৎ চরণের গলা ডুবিয়ে অতিশয় হেঁড়ে বিকট ধরণের একটি কণ্ঠস্বর জাগল, যে আওয়াজ শুনে সারা গাঁয়ের ঘুম মুহূর্তে ভেঙে গেল নির্ঘাৎ।

কার গলা চিনতে পারলেন না জুহা।···'আজ থেকে সমুদায় লোক যত

খুসি রাঙামাটি ঝিলে নামিবা, যাহা প্রাণ যায় করিবা, শাকশামুক তুলিবা, গুগলি ও মৎস্য ধরিবা, ফাদার সাইমন সাহেবের তাহাতে আপত্তি নাই—তিনি তাবৎ প্রজাসাধারণের জন্ম ঝিল ছাড় দিয়াছেন—নন্—ন্—ন্!'

পাঁচিল থেকে মুণ্ডু বাড়িয়ে দিলেন জুহা। খুব ঢ্যাঙা একটা লোক, একটু কুঁজোও বটে, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পরণে থানের লুঙি, চুল ছোট করে ছাঁটা, পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারি পাম্পসু জুতো, কাঁধে ঝোলা আর হাতে একটি ছোট্ট মোটা লাঠি। সে আকাশে মুখ তুলে কথাগুলো ছড়াচ্ছে।

তার চিনতে ভুল হল না। সেই ওমর শেখ! সেই গীতা বাইবেল-কোরাণ-পুরাণওয়ালা কিম্ভূত প্রাণীটি—যাকে আসন্ন বিদ্রোহের নায়ক ভেবে সারারাত ধরে খুশি ও বিস্ময় অনুভব করেছেন জুহা, যার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আজ সকালে ঝিলে গিয়ে যার সঙ্গে পাশাপাশি পুলিশের ও পাদ্রীর লাঠিয়ালদের ঘায়ে শহীদ হবার সংকল্প করেছেন, সেই ওমর!

নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না জুহা। রি রি করে সারা শরীর জ্বলে উঠল।

ওমর শেখ মৌলবীর মুণ্ডটি দেখামাত্র ঘোষণা থামিয়ে বলে উঠল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম মওলানা সাহেব!'

জুহা মুণ্ডু সরিয়ে আনলেন। উঠোন থেকে বেগমসায়েবা রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'কী? কী হয়েছে?

মৌলবী গর্জে বললেন, 'চোপরাও!' তারপর গটগট করে বেরিয়ে গেলেন মসজিদের দিকে। এখন রাত শেষ—সুতরাং বাড়ির বাইরে যেতে সরকার আটকাবেন না। ঘোষকদের পিছনে ততক্ষণে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। হনহনিয়ে ভিড়কে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন জুহা। ওমর শেখ ফের দ্বিগুণ জোরে ঘোষণাটা করতে করতে গাঁয়ের শেষদিকে এগোল।

মসজিদের ভিতর আবছা অন্ধকারে সেরাজুল হাজি বসে রয়েছে একা। বাইরে জনা তিন মুরুব্বীগোছের লোক বদনায় জল ঢেলে 'অজু' (প্রার্থনার আগে প্রক্ষালন) করছে। জুহা নিঃশব্দে 'অজু' করে ভিতরে ঢুকলে হাজি সায়েব বলল, 'পাদরি ঝিল ছেড়ে দিয়েছে। কাল রাতে আমাদের সব ডেকেছিল। ওমরও ছিল।...'

বাধা দিয়ে জুহা গম্ভীর মুখে বললেন, 'খোদার ঘরে কাফেরদের কথা বলা হারাম হাজিসাহেব!'

সেরাজুল হাজি নিশ্চয় মুচকি হাসল, স্পষ্ট দেখা গেল না।...

ওখানে স্বর্ণও ধুড়মুড় করে উঠে বসেছিল। তখন বেশ ফরসা হয়েছে। ঢেড়রার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। একটা নতুন ধরনের দিন তার সামনে—তাই নিয়ে সারারাত অস্থির থেকেছে সে। শেষরাতে ঘুম এসে গিয়েছিল, তখন স্বপ্নেও নিজেকে দেখেছে রাঙামাটির ঝিলে সাঁতার কাটছে, আর কী সব ঘটনাও ঘটছিল—হঠাৎ এই আওয়াজ।

স্বর্ণ বেরিয়ে এসে সব শুনে ভীষণ অবাক হল।

ওমর শেখ তাকে দেখে এগিয়ে এসে নমস্কার করল প্রথমে। তারপর চরণ ও ঘগা বায়েনের উদ্দেশ্যে বলল, 'বাবাসকল! এবার আমাকে ছুটি দাও। তিনখানা গাঁ ঘুরলাম সেই ঝুঝকি ভোরবেলা থেকে—এখন ওই দ্যাখ, মামা লাল হয়ে উঠছে। এবার মামার গুণের ভাগ্নে হয়ে বাকি তিনখানা তোমরাই সারো।' বলে সে আঙুলের গিঁট গুণে গ্রামগুলোর নামও বলে দিল—'এক গোবিন্দপুর, দুই মধুপুর, তিন যদুপুর। তাপরে গিয়ে কাদার সাইমনকে বলবা কী, শেখদাদা ভেনার সঙ্গে দুপুরবেলা সাক্ষাত করবে। কেমন?'

চরণ একগাল হেসে বলে, 'নিশ্চয়।'

ঘগা মাথা নুইয়ে বলে, 'তবে যেতে আজ্ঞে হয় শেখদাদা?'

'হু—তোমরা এগোও।'

নকীবদ্বয় হনহন করে রেল লাইন ধরে উত্তরে আপের দিকে এগিয়ে চলে। এবং শূন্য ষ্টেশনের সামনে কেন কে জানে ঘগা ঢোলে বার দুই আওয়াজ তুলে যায়—'চাকুম্ চাকুম!' আওয়াজটা দেওয়ালে জোরে প্রতিধ্বনিত হয়।

স্বর্ণ ওমরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ওমর বারান্দায় উঠে বলে—'সে অনেক কথা মা স্বর্ণময়ী। আপনি ধীরে সুস্থে বসে শুনুন। আমি যদি দোষ করে থাকি, আপনার পায়ের লাথি মারুন ছেলের মাথায়—আর যথার্থ কাজ করে থাকলে এক পেয়ালা চা খাওয়ান।'

স্বর্ণ শুনতে চায়। সে নিঃশব্দে ডাক্তারখানায় ঢোকে। ওমর তার পিছনে পিছনে ঢোকে। তারপর ওমর তার শাস্ত্রভরতি ভারি ঝোলাটা সসম্ভ্রমে টেবিলে রেখে একটা চেয়ারে বসে।

স্বর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

ওমর একটু কেসে তার চীনা ছাঁদের মুখ ও মাকুন্দে চিবুকে হাতে বুলিয়ে বলে, 'আপনার সঙ্গে সেই তো কাল সন্ধেবেলা কথা হল—তারপর এক কাণ্ড। মতি বায়েনকে তো ভালই চেনেন। মিটিং তো আপনিও ভিতরে-ভিতরে খুব

করলেন কদিন, আমিও করলাম—কিন্তু মতির সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সব ব্যানাবনে মুক্তো ছড়ানো হয়েছে।

স্বর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

'মানে খুব সহজ। আপনাকে এলাকার ছোটবড় সবাই মুখে মান্য করে বটে, ভিতরে অন্যরকম। স্বার্থটা নিজেদের—তাই খুব আগ্রহ দেখাল, হ্যাঁ—সবাই মিলে কথামতো ঝিলে নামব, দেখি কী করতে পারে ওনারা, এদিকে ভেতর-ভেতরে কেউ কেউ বলে, ডাক্তারবাবুর মেয়ের কথায় হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়া কি ভালো হবে? এই রকম আকথা-কুকথা সব উঠল ওদের মধ্যে। সেসব শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন মনে। শালারা কি মানুষ মা? যদি মানুষই হবে, তাহলে চিরকাল পড়ে পড়ে মার খায়? মতি আমাকে সব খুলে বললে। বললে যে কাল সকালবেলা কজন কথামতো যায় দেখো শেখদাদা! হুঁ—যেত, যদি অন্য কেউ এসে সামনে দাঁড়াত। ডাক্তোরবাবুর মেয়েকে আমরা বিশ্বাসই করি না।...মা স্বর্ণময়ী, রাগ করবেন না আমার ওপর। ছোটলোকের ছোট মুখ—সামনে এক বলে, পিছনে বলে অন্যরকম। তাই গতিক বুঝে আমি করলাম কী, সোজা ফাদারের কাছে গেলাম। ব্যাটা আমাকে খুব খাতির করে। বাইবেল নিয়ে কথাবার্তা বলি কি না—খুব ভাব আমার সঙ্গে। তা, ফাদার সাহেবও দেখলাম ব্যাপারটা আগেই জানতে পেরেছে। একথা ও কথার পর আমাকে বললে, দেখ ব্রাদার ওমর, আমি চাই না সবাই আমাকে মন্দ ভাবুক।...'

স্বর্ণ বাধা দিয়ে বলে, 'থাক। বসুন, চা খাবেন।'

ওমর হেসে উঠল। অমন প্রচণ্ড হাসি সচরাচর শোনা যায় না।

একটু পরে চা খেতে খেতে হঠাৎ সে বলল, 'স্বদেশীবাবুদের সঙ্গে আমার ইদানীং চেনাজানা হয়েছে। চারদিক দেখে শুনে আমার মনটা ক্রমে ক্রমে ওদিকেই ঢলে পড়ছে, বুঝলেন মা?' আমি ভাবছি কথাটা—কিছুদিন থেকেই ভাবছি—আমি স্বদেশী করব। চরকাও কিনে রেখেছি একখানা। দেখি, কী হয়।'

স্বর্ণ কোন মন্তব্য করল না।

'হ্যাঁ মা। ওই আমার রাস্তা। ধর্ম ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে তো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। কিছুই পেলাম না। এখন একটা কাজের মতো কাজ তো করতে হবে। জীবনটা আবাদ করতেই হবে। মহাত্মাজী নন-কো-অপারেশনের ডাক দিয়েছেন। বেলডাঙায় খুব গোলমাল হয়েছে শুনলাম। বেলডাঙায়

আমার সহপাঠি বন্ধু আছে—সত্যবাবু। তার জেল হয়েছে।' ··চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ওমর ফের বলে, 'আপনি কিছু বলছেন না মা!'

স্বর্ণ অস্ফুট বলে, 'কী বলব?'

ওমর তার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর বলে, 'আজ তাহলে যাই, স্বর্ণময়ী।'

স্বর্ণ মাথা নাড়ে।

ওমর শেখ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে যাবার মুখে ঘুরে সে একবার বলে, 'বাবার খবর ভাল তো? চিকিৎসা কেমন চলছে?'

'ভাল।'

ওমর বারান্দা থেকে নেমে ষ্টেশনের দিকে যায়। সূর্য উঠেছে। হেমন্তের শিশির আর কুয়াসা এখনও স্পষ্ট। সামনের মাঠে শিকারীদের তাঁবু, সেদিকে এগিয়ে যায় সে। হয়তো বাঘের খবরটা জানতে চায়।···

স্বর্ণ চুপচাপ ভাবছিল। এ কী জীবন তাকে ঈশ্বর দিয়েছেন! কোন কাজে লাগে না, লাগানো যায় না। একটার পর একটা পতনের শব্দ। পরাজিত হয়ে পিছু হটা। এ জীবন কাম্য নয় বলেই একদিন ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছে মরতে গিয়েছিল। হয়তো সেদিন আজকের মতো এত স্পষ্ট করে কিছু বুঝত না—কিন্তু একটু অন্তত জেনেছিল যে এই বিরাট পৃথিবীতে তার অস্তিত্বটা বড় গোঁজামিল।

তবে কি ওমর শেখের মতো স্বদেশী করতে ছুটে যাবে? ক্রমশ চারদিক থেকে যে উত্তাল ঝড়ের শব্দ তার কানে ভেসে আসছে. সেই ঝড়ের গতিতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে?

এলাকায় শিক্ষিত লোক নেই বললেই চলে। তাই এখনও এখানে ঝাপটা এসে লাগেনি। তাছাড়া স্বর্ণের পক্ষে ওখানে কিছু করাও কঠিন—একটা প্রমাণ তো সদ্য পেল। তার কথায় কেউ আসলে সত্যিকার মূল্য দেয় না। সবাই তাকে জানে, চরিত্রহীনা—একটা নচ্ছার প্রকৃতির মেয়ে। কমপয়সায় ওষুধ পায় বলেই যেটুকু ভক্তি। এ কোন সৃষ্টিছাড়া জায়গায় বাবা এসে ঘর বেঁধেছিলেন।

অথচ এখান থেকে চলে যেতেও ইচ্ছে করে না কোথাও। এত ভালো লাগে ওই ষ্টেশন, 'ধুলিউড়ির' মাঠ, সুন্দর নদী ভাগীরথী, রাঙামাটির পথগুলো, স্বপ্নভরা ওই সব ঐতিহাসিক টিলা! চৈতক তাকে কী একটা দিয়ে গেছে—কত ক্ষন ও মুহূর্তের ভালো লাগার স্মৃতি। কত সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নার রাতে

ওই মাঠটাতে ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলার সময় আবছা কী অনুভূতি তার চেতনায় ধরা দিত—যেন কী ঘটবে, এখানেই—অন্য কোথাও নয়।

স্বর্ণ আনমনে বসে থাকে।

এদিকে তিন পাহাড়ী যাওয়া দরকার, পা ওঠে না। সুধাময়ের কথা ভাবতেই ঘৃণায় তার মনে জ্বালা ধরে যায়। হেকুর ছেলেটারও একটা সদ্গতি করা খুবই দরকার ছিল। ইয়াকুব ওকে নষ্ট করে ফেলছে দিনে দিনে।…

কয়েকদিন পরেই স্বর্ণ ঠিক করল, তিন পাহাড়ী যাবে।

যাবার সময় একটা বড় খবর পেল—ওমর শেখকে স্বদেশী করার অপরাধে জেলে ঢোকানো হয়েছে।

জুহা মৌলবীর কাছে গিয়েই খবরটা পায় স্বর্ণ। সে গিয়েছিল, কীভাবে যেতে হবে তিনপাহাড়ী, উন্মাদাশ্রমটা কোথায়—এইসব ঠিক ঠিকানা জানতে।

সব জানিয়ে জুহা বলেছেন, ওমর ঠিক রাস্তাই ধরেছে। এই জাহেল (মূর্খ) ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ছাড়া আমারও বাঁচার রাস্তা নেই। [ক্রমশঃ]

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়

অবিচ্ছিন্ন জীবন, অবিস্মরণীয় সময় কাল : পাব্‌লো নেরুদা

'পিতৃভূমি আমার : আমি চাই আমার ছায়া পাল্‌টাতে।
পিতৃভূমি আমার : আমি চাই আমার গোলাপের রূপান্তর।'
—সেই প্রতীক্ষমান জীবন্ময় মানুষটি, নাক্ষত্রিক ছিল যাঁর নয়ন পল্লব,

সম্প্রতি পরলোকগত সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি পাব্‌লো নেরুদা, চিলির দুর্দশা বোধ হয় আরও কিছু বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। চিলিতে মার্কসবাদী দলের দুজন অন্যতম নেতার একজন হয়ে যে নেরুদা জীবনের অনেকটা সময়ই কিষাণ শ্রমিক ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, কঠিন কঠোর ভাষায় কবিতায় সংগ্রাম করেছেন, তিনি চোখ বুজলেন এমন এক সময়, যখন তাঁর মাতৃভূমির অত্যন্ত দুর্দিন। জীবনের শেষ প্রান্তে, ৬৯ বছর বয়সে ক্যানসার রোগাক্রান্ত অবস্থায় যখন তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, তখন তাঁর এত সাধের চিলির ওপর এই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে তা কে জানত। নতুন করে সোচ্চার হবার আগেই এসে গেল সেই দিনটি। গুজব উঠেছিল তিনি আততায়ীর হাতে নিহত, তবু ভাল সেই গভীরতর দুঃখ আমাদের পেতে হয়নি।

নেরুদার জন্ম ১৯০৪ সালে। বালক বয়সেই তাঁর মা মারা যান যক্ষ্মায়। শ্রমিক পিতাও লোকান্তরিত হন পুত্রের কৈশোরেই। নেরুদার বৃত্তিগত শিক্ষাকাল কাটে সান্টিয়াগোতে। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চিত্রিত শিরস্ত্রাণ পালটাতে পালটাতে তিনি শহর ছাড়িয়ে গ্রাম, গ্রাম ফেলে দূরান্তরে দৃষ্টি ফেরান। পরে বিভিন্ন দূতাবাসে সম্মানজনক চাকরি নিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ মিলে যায় তাঁর।

প্রতিবাদের কবি নেরুদার নামেও যেন প্রতিবাদ অনুরণিত। তাঁর পূর্বনাম রিকার্দো নেফতাতে রেয়েস বাসোয়ালতো। তাঁর পিতা চাননি শ্রমিকের ঘরে কবিতার বিলাসিতা থাকুক, তাই তারই প্রতিবাদে শিল্পের অনুষঙ্গে আসতে নেরুদা নিজের নাম পালটে খোলস ছেড়ে বাইরে এলেন।

নেরুদা এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক শক্তি, যা কালের প্রতিটি মুহূর্তে স্পন্দিত। এবং সেই স্পন্দন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। তাই নেরুদার অনুভূতি শুধুমাত্র স্পেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমস্ত বিক্ষত মানুষের পাশে থেকে

তিনি লিখেছেন, ইমারৎ তুলেছেন নতুন নিশানের বাহারে—ফুটিয়েছেন মুক্তির লয়েল। তিনি নিজের ক্ষত বহন করেছেন নিজে, সেই নিজস্ব অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়েছেন দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের মধ্যে, যারা মায়ের জন্ম অশ্রুময়। ভারত তার থেকে বাদ যায়নি। কন্‌সাল হিসেবে যখন তিনি ভারতে এসেছিলেন, তখন এখানকার মানুষের দুর্দশা তাঁকে গভীরভাবে বেজেছিল। তাঁর 'হৃদয়ে স্পেন' গ্রন্থে তাই শুধু স্পেন নয় ভারতও স্থান করে নিয়েছে।

কিন্তু নেরুদা শুধুমাত্র প্রতিবাদের কবিই ছিলেন না। ছিলেন প্রেমের কবিও। সংগ্রাম এবং প্রণয়, বিপ্লব এবং প্রেম, এই দুয়ের মিশ্রণে তাঁর কাব্য সম্ভার অলঙ্কৃত। প্রতিবাদের কবি নেরুদা, প্রেমকে কখনও অস্বীকার করেননি। জীবনের ক্ষেত্রেও না, কাব্যেও না। প্রথম জীবনে যে নারীকে তিনি ভালো বেসেছিলেন তার কাছ থেকে পেয়েছেন বঞ্চনা, সে আঘাত তিনি সহ্য করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতাও লিখেছেন। তিনবার বিয়ে করেছিলেন তিনি, এবং শেষবার বিয়ের আগে কিছু প্রেমের কবিতা লিখে ছাপিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য নামে। বিপ্লবের পাশাপাশি প্রেম সহাবস্থান করেছে তাঁর কাব্যে। বিষণ্নতা দুঃখ বেদনার প্রভাবকে তিনি এড়াতে পারেননি, এড়াতে চানও নি। জীবন যেমন তাকে তেমনই গ্রহণ করেছেন, তার প্রতিটি অনু পরমাণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে।

"জীবনকে আমি গ্রহণ করেছি।
দাঁড়িয়েছি জীবনের মুখোমুখি, তাকে চুম্বন করেছি, জয় করেছি।
তারপর এগিয়ে গেছি খনি গহ্বরে
দেখেছি তারা কেমন করে অতিবাহিত করে জীবন।
যখন গহ্বর থেকে উঠে এসেছি, দুহাতে আমার ময়লা আর বিষণ্নতা।"

ওয়াল্ট হুইটম্যান ও মায়াকভস্কি নেরুদার দুই প্রিয় কবি। নেরুদা যে নিজস্ব কাব্যরীতিতে লিখতেন কোনও কোনও জায়গায় এবং কারও কারও মতে তা কর্কশ, কিছুটা শ্লোগানধর্মী, কিন্তু তবুও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে একটা বলিষ্ঠতা খুঁজে পাওয়া যায় যা দীক্ষিত পাঠককে অনুপ্রেরিত করে। মতান্তরে দাবী করা যেতে পারে নেরুদার কবিতা প্রধাণতঃ গীতিময়তায় সুললিত এবং তার মধ্যে মিশে আছে মহাকাব্যীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এদিক থেকে মায়াকভস্কির সঙ্গে তাঁর অনুরূপতা লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন বক্তব্যের কঠোরতা, তেমনি আরেকদিকে মিষ্টি মধুর ভাবপ্রবণতার আড়ম্বর পাশাপাশি দেখা যায়।

তবু সমালোচনার আসরে অভিযোগ বোধহয় কিছু থেকেই যায়। তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহান্বিত। অনেকেরই ধারণা নমনীয়তায় ও তৎপরতায় তিনি তেমনি চক্ষুষ্মান নন। নেরুদার কবিতায় এই অনমনীয়তা, উদ্ভাবনক্ষমতার অভাব কিন্তু তার কাব্যের নিবিড় ও গাঢ় স্বরকে নষ্ট করতে পারেনি। সুরের গভীরতা ও সুগম্ভীর আমেজ তাঁর কবিতাকে যে ভাবে উর্বর করে তুলেছে তা দরদী পাঠক মনকে বার বার ছুঁয়ে যায়।

মাত্র পনেরো বছর বয়সেই নেরুদা স্থানীয় পত্রিকায় কবিতা লিখে পাঠান এবং উনিশ থেকে তেইশ বছর বয়সের মধ্যে রচনা করেন পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ। এর মধ্যে অধিকাংশই প্রণয় এবং বিদ্রোহের কবিতা। 'পৃথিবীতে অধিবাস' তাঁর একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী সুবৃহৎ কাব্য। মেক্সিকোতে যখন তিনি কন্‌সাল হিসেবে কাজ করছেন তখন লোরকা এবং অন্যান্য স্প্যানিশ কবিদের সঙ্গে মিলিত হন এবং কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'টোয়েনটি লাভ পয়েম্‌স্‌ এণ্ড আ ডেসপারেট সং' এবং 'ক্যানটো জেনারেল' তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার, ১৯৫১ খৃঃ লেনিন পুরস্কার এবং ১৯৭১এ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

নেরুদা এক সময় বলেছিলেন : তিনি ভালোবাসেন অশান্ত, অতৃপ্ত জীবন, শিল্পী কিংবা অপরাধীর মত।

> "চেখেছিলুম মাটির তিক্ত স্বাদ,
> সব কিছুই আমার কাছে ছিল রাত্রি কিংবা বিদ্যুৎ :
> অদৃশ্য মোম আমার মাথায় জমাট
> আর ছড়ানো ছাই আমার পায়ের ছাপে ছাপে।"

['নতুন নিশানে পুনর্মিলন' ; অনুবাদ : বিষ্ণু দে কাব্যগ্রন্থ : 'হে বিদেশীফুল'] এরকম আরও কিছু কিছু কবিতায় তাঁর এই মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে।

নেরুদার কবিতা এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাতেও এর চর্চা চলেছে অনেকদিন। বিভিন্ন কবি নেরুদার নানা কবিতার অনুবাদ করে পাঠক সমাজকে উপকৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে; সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে।

পাবলো নেরুদার অতিপ্রিয়, স্বপ্নের চিলি যখন আজ বারুদগন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত, প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় বিষাদ ভারাক্রান্ত. তখন কবরের মাটিতে নেরুদা নিশ্চয়ই চোখের জলে বিদ্রোহের কবিতা লিখছেন, উচ্চারিত হচ্ছে : আমি জাগি একশো বছরে একবার, যখন জনসাধারণ জাগে'—আর প্রতীক্ষা করে আছেন কোন যোগ্য উত্তরসূরীর জন্য।

পাবলো নেরুদার কবিতা

অনুবাদঃ মণীশ ঘটক

ছেলে ধোওয়ানো

একমাত্র আদিম প্রেম, উৎস থেকে উৎসারিত
মমতাই পারে এই পৃথিবীতে শিশুদের
ধোওয়াতে পাখলাতে, হাঁটু, পা, দলাই
মলাই করে সিজিল করে রাখতে।
টবে জল বাড়ে, হাতের সাবান পিছলে যায়
নিষ্পাপ দেহের ছোট্ট মাথাগুলো জল থেকে
উঁচুতে রেখে সাবানের সাথে মায়ের
তপ্ত কোলের সুঘ্রাণ নেয় শিশুরা।

মায়ের চোখ কি সজাগ,
সে কি মন ভুলোনো আদর
ঠাণ্ডা গরম জলে ছেলেকে নিয়ে
আপোষে সে কি ধ্বস্তা ধস্তি।

এখন দেখ
আবার চুলে পাকিয়েছে জট
মুখে গালে কাঠ কয়লার দাগ
করাত গুঁড়ো, তেল, ঝুল ছেঁড়া তার,
কাঁকড়ার দাঁড়া।

আবার সেই মাতৃপ্রেম,
ধোওয়ানো, মোছানো, সুগন্ধ লাগানো,
ছাপছন্দ ছিমছাম করে দেওয়া।
তারপর ?
অমিত বিক্রমে ফের ছিটকে বেরিয়ে পড়ে
শিশু ভোলানাথ মায়ের কোল থেকে
ঘূর্ণী ঝড়ের বেগে, ছুটে চলে রাজ্যের
কাদা মাটি আবর্জনার দিকে—
এমনি করে সদ্যস্নাত সুপরিস্কৃত মানব শিশু
প্রাণ চাঞ্চল্যে অধীর হয়ে জীবনের পঙ্ককুণ্ডের
দিকে ছুটে চলে—
চলুক। পরে বড় হয়ে ওরা
ছাপছন্দ থাকা রপ্ত করে নেবে ঠিকই,
কিন্তু বাঁধ না মানা সতেজ শৈশব আর
কখনো ফিরে পাবে না।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

চিলির সমুদ্র

দূর দেশে দেশে
তোমার উর্মিল চরণ, তোমার ব্যাপ্ত তটরেখা
আমি ঘুরে ফিরেছি উন্মত্ত আর নির্বাসিত অশ্রুতে অশ্রুতে।
আজ এসেছি তোমার উৎসমুখে, আজ তোমার ললাট প্রান্তে এসেছি
রক্তচক্ষু প্রবাল বা জ্ব'লে-যাওয়া তারা
বা দীপ্যমান পরাজিত জলধারা কাউকে আমি জানাইনি
শ্রদ্ধেয় গোপন কথাটি এমন কি একটি অক্ষর।
আমি ধ'রে রেখেছি তোমার প্রচণ্ড কণ্ঠ, পাপড়ি একটি
ধাত্রী বালুকা রাশির,
আস্‌বাব পত্র আর পুরানো কাপড় চোপড়ের মধ্যে।
কাঁসর ঘণ্টার ধুলা একটা, একটা ভিজা গোলাপ।
এবং বার বার সেই আরাউকোরই
জল, কঠিন ক্ষারজল :
কিন্তু আমি জীইয়েছি আমার মগ্ন পাথরটি
আর তার মধ্যে তোমার ছায়ার থরো থরো শব্দ।
হে চিলির সমুদ্র, হে জল রাশি
উত্তুঙ্গ এবং পিনদ্ধ যেন একটা প্রখর উৎসবাগ্নি
ইন্দ্রনীলের চাপ আর বজ্রমন্দ্র আর নখাভাস,
হে লবণের আর সিংহের ভূমিকম্প!
এই গ্রহের তুমি সানুদেশ, আরম্ভ, সৈকত,
তোমার আঁখি পল্লব মেলেছ তুমি
স্থলভাগের দক্ষিণে
নক্ষত্র লোকের নীলকে আক্রান্ত ক'রে!
লবণ আর গতি তোমার থেকে ঝ'রে ঝ'রে
মহাসমুদ্র-কে বেঁটে দেয় মানুষের গুহায় গুহায়
যতক্ষণ না দ্বীপপুঞ্জের ওপারে তোমার দেহ-ভার হয় ক্ষীণ
সামগ্রিক সব বস্তু স্তবকে স্তবকে ছড়িয়ে দিয়ে।

মরু উত্তরের সমুদ্র তামায় তামায় তুমি আঘাত
করো আর তুলে ধরো লবণ রাশি
নির্জন দেহাতী বাসিন্দার হাতে,
কেবলই সারস আর হিম সূর্যময় সারবন্ত শিলারাশি,
হে বেলাভূমি অমানুষিক উষায় তুমি দগ্ধ।
ভাল্‌পারাইসোর সমুদ্র, তরঙ্গমালা
নিঃসঙ্গ আলোক রশ্মির এবং নিশাচর
মহাসাগরের বাতায়ন তুমি
যেখান থেকে আমার স্বদেশের মূর্তি
চেয়ে থাকে এখনও অন্ধ দুই চোখে,
দক্ষিণের সমুদ্র, মহাসামুদ্রিক সাগর,
হে সমুদ্র, দুর্জ্ঞেয় চাঁদিনী—
ইমপেরিয়ালে ওক গাছে গাছে ভয়ানক,
কিলোয়ে দ্বীপে রক্তে রক্তে গাঁথা,
এবং মাজেলান্ থেকে স্থলের শেষ অবধি
লবণাম্বুর অখণ্ড চিৎকার, একটা গোটা উন্মাদ চাঁদ,
এবং নক্ষত্র ভুক্ বরফের পলাতক একটা ঘোড়া॥

অনুবাদ : সতীকান্ত গুহ

পরিক্রমা

কথা এই
মানুষের ভূমিকায় আমি ক্লান্ত।
আমি বিশুষ্ক, নিরন্ধ্র, অগম্য।
অস্তিত্বের সুরু ও শেষের প্রবাহে
সোনার হাঁসের মতো টলোমলো।
তবু দর্জির দোকানে ঢুকি।
আর সিনেমায়।

নাপিতের দোকানের গন্ধে
চোখে জল আসে, বুকে হাহাকার ওঠে।
আমি শুধু একবার ছুটি চাই
পাথর ও উলের জগৎ থেকে।
অট্টালিকা, উদ্যান, জিনিষের জাঙ্গাল,
চোখ ধাঁধাঁনো সাজানো কাণ্ড
ও বিদ্যুতে ওঠে নামে যে লিফট্—
এদের দিক থেকে একবার চোখ ফেরাতে চাই।

আমার পা, পায়ের নখ্,
মাথার চুল, আমার ছায়া,
এরা পর্যন্ত আমার ক্লান্তি আনে।
কথা এই, মানুষের ভূমিকায় আমি ক্লান্ত।

অস্বীকার করতে পারিনা তাহলেও
একটা লিলি দুখণ্ড করে
গণ্যমান্য নোটারীকে ভয় খাওয়াতে কিংবা
একটা নানকে কানে ঘুঁষি মেরে মেরে ফেলতে
পারলে চমৎকার লাগবে।

রাস্তা দিয়ে ঝকঝকে একটা সবুজ ছোরা নিয়ে
যদি চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে পারি
জীবনের একটা মধুর অভিজ্ঞতা হয়।
অবশ্য যতক্ষণ আমি ঠাণ্ডায় অক্কা না পাই।

যে অন্ধকারে আলোর রেশ নেই সেখানে
একটি শিকর হয়ে টিকে থাকতে, চোখে এক যুগের ঘুম নিয়ে
পৃথিবীর স্যাঁতসেঁতে এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়ালে মুখ রেখে
চিন্তার প্রতিটি কণা পরিপাক করে
প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য ক্ষুধার অন্ন খেতে
মন আমার চায় না।

আমার জীবনে এসব দুর্ঘটনা কাম্য নয়।
মন হতে চায়না একটা শিকর কি কবর, একটা নিঃসঙ্গ সুড়ঙ্গ,
একটা শবের কুঠুরী, যেখানে ঠাণ্ডায় জমে যেতে হয়।
তাই গারদের কয়েদীর মতো আমার মুখ দেখে
সপ্তাহের প্রথম দিনটা পেট্রোলের মতো
জলে ওঠে,
যেতে যেতে একটা জখম চাকার মতো কঁকাতে কঁকাতে
রক্তাক্ত পায়ে রাতের অন্তঃপুরে ঢে কে।

এবং কতগুলো স্যাঁতসেঁতে বাড়ির কয়েকটা কোণে
আমাকে প্রতি মুহূর্তে ঠেলে দেয়—হাসপাতালে,
যেখানে জানলা দিয়ে হাড়ের টুকরে বাইরে ছিটকে পড়ে।
ভিনিগারের গন্ধে ওতপ্রোত মুচির দোকান, খাদের মত ভয়ঙ্কর
শহরের রাস্তায়।
আমার চক্ষের বিষ এই বাড়িগুলোর কপাটে কপাটে
ঝোলে নিশাচর প্রাণী, গন্ধকের মত এদের
গায়ের রং, ত্যক্ত রজনক এদের অস্ত্র।
কফির পট এ বিস্তৃত ক্ষত
আর আশিগুলি দেখে সন্দেহ থাকে না

ভয়ে ও লজ্জায় এরা চোখের জল ফেলছে।
যেখানে তাকাও ছাতার জঞ্জাল, বিষের ছড়াছড়ি
ও উলঙ্গ নাভি।

জুতো পায়ে দুচোখ মেলে, রোষে জর্জর হয়ে
বিস্মৃতির নেশায় আমি শান্ত পদক্ষেপে
পথ চলি। আমি যাই, অফিস ও হাড়ের চিকিৎসার
উপকরণে সাজানো দোকান পার হ'য়ে,
পার হয়ে বাড়ির উঠোন
যেখানে তারে কাপড় শুকোয়,
জাঙ্গিয়া থেকে শুরু করে তোয়ালে শার্ট,
তারাও চোখের জল ফেলে
তবে নোংরা জল এবং ধীরে ধীরে।

অনুবাদ : মণীন্দ্র রায়

তারসঙ্গে

সময়টা বড়ই কঠিন। অপেক্ষা করো আমার জন্যে।
আমরা কাটিয়ে দেব সময়টা আগাগোড়া,
তোমার ছোটো হাতখানা হাতে দাও আমার।
আমরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াব, আর কষ্ট
ভোগ করব,
আমরা অনুভব করব, আমরা আনন্দ করব।

আবার আমরা এখন সেই দম্পতি
যারা দিন কাটিয়েছে নানা কণ্টকিত জায়গায়,
এলোমেলো ডেরায় পাহাড়ের খাঁজে।
সময়টা বড়ই কঠিন। অপেক্ষা করো আমার জন্যে
হাতে নিয়ে একটা ঝুড়ি আর একটা গাঁইতি,
তোমার জুতোজোড়া নিয়ে, জামাকাপড় নিয়ে।

এখন আমাদের বড্ড দরকার পরস্পরকে,
কেবল কার্নেশান ফুলের জন্যে নয়,
কেবল মধু খোঁজার জন্যে নয়—
আমাদের দরকার এখন আমাদের হাত
ধোয়ামোছার জন্যে, আগুন তৈরির জন্যে।
আমাদের এই কঠিন সময় তাহলে
অনন্ত কালের মুখোমুখী সোজা হয়ে দাঁড়াবে
দুজোড়া হাত আর 'দুজোড়া চোখ নিয়ে॥

অনুবাদ : শুভ মুখোপাধ্যায়

ব্রাসেল্‌স্

আমার যা কিছু করা হয়েছে
যা কিছু হারিয়েছি আমি
যা কিছুই জিতে গেছি অভাবিত
তিক্ত লোহায়, আর পাতার শরীরে
তার এতটুকুও দিতে পারি না কাউকে।

ক্রুদ্ধ ঈগলের পাখনায় ঢেকে দেওয়া
এক নদী
আর ফুলের পাপড়ির গন্ধকোষ প্রতিনিবৃত্তিতে
রয়েছে এক ভয়ার্ত আস্বাদন।
ক্ষার নয়
অবিরত জীবিকা নয়
সামুদ্রিক বৃষ্টিতে ধ্বসে যাওয়া
সেই ছোট্ট গীর্জা নয়
না সেই কয়লা, গোপন ফেনায় যাকে দংশন করেছে
কেউই আমাকে ক্ষমা করতে পারে না।

আমি ছিলাম অন্বেষণে
এবং দেখেছি,
মাটির নীচে গুরুভাবে
কেউ
ভয়ানক শরীরে, বিবর্ণ কাঠের দাঁতের মতো
আসছে—ছেড়ে যাচ্ছে তারপর
এক তীব্রতার মধ্যে,
প্রাকৃতিক কোন দুঃসহ যন্ত্রণায়
চাঁদ এবং ছোরার মধ্যে মারা যাচ্ছে রাত্রির মতো।

এখন, উপেক্ষিত নির্বাহে
সেলাইবিহীন দেয়ালগুলোর পাশে
চতুঃসীমায় ছিঁড়ে দেওয়া গভীরতায়
আমি তাই এখানেই একা
যা হারায় নক্ষত্র,
সবুজ উদ্ভিদ।

রঞ্জিত সিংহ

আমার তিনজন বন্ধু

১. (মণীন্দ্র গুপ্তকে)

কাঠকয়লার মৃদু আঁচে তেতে-যাওয়া ঝলসানো পোড়া মানুষটি
লালচোখে কথা বলে ওঠে! শকুনের বিষ্ঠার হল্‌কায় পুড়ে গেছে তার
হৃদ্‌বলয়ের পদ্ম। এই বড় অলক্ষুণে ঋতু! ফাল্গুনের মাঝবেলা সবে।
তবু গাছের পাতারা ঝরে যায়। মস্ত দুটো হাত তার শূন্য খাঁ খাঁ করে
এখন করবে কী সে! কী কী বাকি আছে তার! শূন্যে থাবা মেলে
মাটির প্রলেপে তৈরি পেশীময় দুটো হাত আরো শূন্যে খাঁ খাঁ করে।

নিচে মহানন্দা। ঘড়ির কাঁটার চেয়ে হু-হু করে জল বাড়ে। ভাসে
পুরানো সাবেক মালদহ, এক লক্ষ্মীর পেল্লায় মাঠ,
দুই ফারলং রেললাইনের রাস্তা…

২. (অশোক রঞ্জন সিংহকে)

সেও এখন ঘুমোয়।
বিছানায় চাদরে তোষকে কাদামাথা শীর্ণ দুপায়ের ছাপ,
তামাকের দাগ, কলমের থেকে শুষে-নেওয়া কালি,
বালিশের তুলো, শেষ-ব্যবহৃত একজোড়া চটি!
ওটি কার?
মাকড়সার জাল ভেদ করে চেয়ে দেখ।
ওরি গায়ে মাথা রেখে
ও বড় আরামে ঘুমোচ্ছে দেখেছো!
সঙ্গে আধো-জাগা কোনো মুখের অস্পষ্ট পার্শ্বরেখা।
ওটি কার মুখ? যে ঘুমোয় তার? হতে পারে।
চায়ের কাপের তলানিতে মোড়া সিগ্রেটের অবশেষ।
মুখের ফোকর দিয়ে নিচে চলে গেছে
নীল ঝকঝকে সিঁড়ি…মৃদু আলো…এক একরত্তি খোকা
রাম সেজে পাটকাঠির সহস্র তীরে
বাবাকেই কল্পিত রাবণ করে ক্রমাগত বিঁধিয়ে চলেছে…

৩. (অশোক সেনকে)

বাড়িতে আছেন নাকি ?
এই চলে এলাম। উপেন্দ্রকিশোরের বই থেকে একদিন
বেরিয়ে পড়েছি। হালকা চুল। স্ট্রাইপ কমলারঙ শার্ট।
হাসতে হাসতে সমস্ত শরীর তার তুলোর পাঁজার মত
খুলে যেতে থাকে। কেন হাসি ? হাসব না কেন ?
তর্ক চলে প্রচ্ছদের আড়ালে আড়ালে।
ব্রাউন স্ট্যুর মধ্যে আধ-ডোবা মাংসের টুকরো, মাখনের মত
নরম হয়েছে নৈনিতালের বিশাল আলু, সবুজ কড়াইশুঁটি
ফর্কের ধাক্কায় ভেসে বেড়ায় দিক্‌বিদিকে। সঙ্গে একজোড়া
চোখের মমতা। ধোঁয়া উড়ছে। মুখের ওপরে ভাপ দেয়
মুখের আঘ্রাণ। জন ওয়েনের উপন্যাস
পড়ে দেখুন। ভীষণ ভালো লাগবে। মানুষের নিহিত চেহারা
বদলানো যায় কি ? আমি বিপদে পড়েছি। বাড়িতে আছেন নাকি ?
বলেন ত চলে আসি। জড়ো হই,—ভালবাসতে যারা যারা ভালবাসি।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

অপুর পাঁচালী

এগারো

"চম্পক জাগো জাগো"

…"কল্যাণী ছোট মেয়ে অবিশ্যি। কিন্তু সে এরই মধ্যে মেয়েদের স্বাভাবিক সেবাপ্রবৃত্তি আয়ত্ত করে' নিয়েছে। ক'দিন বড় যত্ন করলে। বাইরের ঘরটাতে টেবিল পেতে, পরিপাটি ক'রে পান সেজে, বিছানা ক'রে কেমন ক'রে রাখত! কাছে বসে গল্প শুনতে চাইত। একদিন হঠাৎ 'চম্পক জাগো জাগো', গানটার একটা কলি গাইতেই আমার শিলং-এর কথা মনে পড়ল। সেই ঈস্টারের ছুটি, শিলং, কলেজের হস্টেলে আমায় নিমন্ত্রণ করেছে—সুপ্রভার অসুখ, তবুও সে উঠে এল, আমি আমার রেডিওর নাটকটা পড়ব—জর্জিনা ঘন ঘন ঘরে ঢুকচে, বার হচ্চে—এমন সময় ওরা গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপালে, আমার মনের মধ্যে সত্যি কি যেন হয়ে গিয়েছিল গানের প্রথম কলিটা শুনেই—'চম্পক জাগো জাগো'। কল্যাণীকে বল্লুম—গানটা শোনাও না। গান সে গাইলে। আমি বসে বহু দূরের কোন পাইন বনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।…' স্বপ্ন! পিছনে ফেলে আসা বহুকাল আগের জীবনের স্মৃতি যদি এক সময়ে স্বপ্নে পরিণত হয় তাহলে এটা স্বপ্নই। তবে অবাস্তব কল্পনার সঙ্গে এই দিবাস্বপ্নের মৌলিক পার্থক্য—স্মৃতি, ওতো সত্যেরই ভিত্তি। প্রথম যৌবনে ফুলশয্যার রাতে চাঁপাফুলের গন্ধে সুরভিত রাতখানি ওই কল্যাণীর গাওয়া গানের কলির মায়াসরণী দিয়ে অন্তরলোকে অপূর্ব সুরমাধুরী বিস্তার করে হৃদয়ে আসন পেয়ে গেল! এই ছেলেমানুষ কল্যাণীকে অবিশ্লেষ্য ভাবে সুপ্রভা আর গৌরীর কাছাকাছি ঠাঁই দিয়ে ফেললেন তিনি। গানই নয় পরিণয়ের স্মৃতিও আছে। মুরলীধর বসুর মুখে শোনা কথাগুলি মনে পড়ছে। গৌরীর স্মৃতিসুখটুকু সজীব রাখার নেশায় বিভূতিভূষণ কলকাতায় থাকলে প্রায় সন্ধ্যাতেই চাঁপা ফুল কিনতেন—পরিমল গোস্বামীও তা দেখেছেন।

জীবন ত এই রকমই। কোন্ ছোট্ট ঘটনা, কিছু বা কথার টুকরো অথবা চোখ মুখের রেখার স্ফুরণ বা আকুঞ্চনে কার মনে কী প্রচণ্ড নাটকীয়

প্রতিক্রিয়া সাধন করতে পারে তা কি অনুমান করা যায়?—অনেক ক্ষেত্রে এই অঘটন-ঘটনের উৎস ব্যক্তিটি টেরও পায় না কি কাণ্ড তার দ্বারা সম্ভব হ'ল।

বোন জাহ্নবীর মৃত্যুর পর ভাগ্নে শান্ত আর ভাগ্নী উমাকে ছোট ভাই নুটুর কাছে ঘাটশীলায় রেখে বিভূতি বনগাঁয়ের বাসা তুলে দিয়েছেন। তাই স্থানীয় মুন্সেফের বিদায়কালে বিশেষ অনুরোধেই বিভূতিভূষণ যখন বনগাঁয়ে উপস্থিত হন তখন ষোড়শীকান্তের পরিবারের সকলের আন্তরিক আগ্রহেই তাঁদের আতিথ্য নিয়েছেন। এই সময়ের কথা দিনলিপিতে লিখতে গিয়ে আরও বলছেন: "কল্যাণী ছেলেমানুষ কিনা, বলচে—'আপনি চলে গেলে বাইরের ঘর থেকে বিছানা উঠিয়ে ফেলব। মন কেমন করে, আপনার জায়গায় সে-বার ছোটমামাকেও শুতে দিই নি—বলি ছোটমামা ওঠ, অন্য জায়গায় গিয়ে শোও—এসব আমি তুলব।' ...এই সময় গৌরীকে এনেছিলুম বারাকপুরে ১৯১৮ সাল। কত কাল আগে।"

একলা চলার পথে দিনান্তের শ্রান্তি নেমেছে। ১৯৪০ সালের জুলাই মাস, বয়স তাঁর মধ্য চল্লিশ চলছে, বেলা যেন বিকেল হয়ে গেছে। এবার আশ্রয় চাই। সেই আশ্রয়ের ইশারা কল্যাণীর মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন।...'কল্যাণীর সেবাযত্ন আমার বড় ভালো লেগেছে, সুপ্রভা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের মধ্যে এধরণের সেবা করার প্রবৃত্তি দেখি নি আমি।' কয়েকদিন পরের কথা।... "এবারও কল্যাণী বড় আনন্দ দিয়েছে। দেখ, অদৃষ্টে কি অদ্ভুত যোগাযোগ, এ স্নেহশীলা মেয়েটি আবার কোথা থেকে এসে জুটল বল তো।...আমি কলকাতায় আসি-না আসি তাতে কল্যাণীর কি? অথচ সে আমায় আসতে দেবে না।...বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই—মন্মথদা কিম্বা মুন্সেফের বাড়ি গিয়ে যে একটু গল্প করব, তাতে ঘোর আপত্তি ওঠাবে।—'গা ছুঁয়ে বলে যান ঠিক সাতটার সময় আসবেন! যদি না আসেন তবে আমি কিন্তু মরে যাব! তাতেই বা কি, আমি মরে গেলে, জগতের কার কি ক্ষতি!'"

বছর খানেক পিছিয়ে গেলে এই মানুষটির মানসলোকের একটি ছবি মেলে।..."ভালবাসা জিনিসটা কখনো কখনো গায়ে পড়ে করার মত ভুল আর কিছু নেই। কারণ যাকে তুমি ভালোবাসচো অত করে, সে তোমার এই ভালবাসাকে 'ভালবাসা' বলে গ্রহণ যদি না করতে পারে, তবে তোমার ভালবাসার ফল কি? ভালবাসা Pity নয়, করুণা নয়, charity নয়, সহানুভূতি নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়—ভালবাসা ভালবাসা। এখন সেই

জিনিসের সূক্ষ্ম মহিমা ও রসটুকু না বুঝে যে নষ্ট ক'রে ফ্যালে অযাচিত ভাবে দিয়ে, অপাত্রে দিয়ে—তার চেয়ে মূর্খ আর কে ?"

…"শ্রীধর কথকের সেই গান বাবা গাইতেন—'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে' ইত্যাদি—এসব কথার কোনো মানে হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই, না পেলে দেওয়া যায় না, বা না দিলে পাওয়া যায় না! এখানে এই কথার গভীর অর্থ আছে। ভালবাসা না পেয়ে যে ভালবাসা দেওয়া—যে পেল তার কাছে তা আর ভালবাসা রইল না, সে তার উপযুক্ত মূল্য দেবে না—সে গভীর, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অপরূপ আনন্দ পাবে না ভালবাসা থেকে, পাবে একটা সাময়িক উত্তেজনা বা egoistic satisfaction, তাতে ভালবাসার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'ল। আর না দিলে নেওয়াও যাবে না—আমি যাকে ভালবাসিনে, তার কাছে যদি আমি ভালবাসা পাই তাকে আমি ঘাড়ে-পড়া বালাই বলে ভাবি। তার উপযুক্ত মূল্য ও সম্মান আমি দিতে কখনোই পারব না। সে যত গভীর ভাবে আমায় ভালবাসবে, আমার দিকে attention দেবে—ততই আমি ভাবব আমার দিকে ঝুকচে, বিরক্ত হয়ে উঠব। সে প্রাণপণে ভালবাসচে, অথচ যাকে ভালবাসচে, সে এ থেকে কিছুই আনন্দ পাচ্চে না—এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কি আছে? ভালবাসা পাওয়ার যে সত্যিকারের অপূর্ব অনুভূতি তা এধরনের পাওয়ার মধ্যে থাকে না—সুতরাং এরকম ভালবাসা এক্ষেত্রে না দেখানোই ভালো।…

"…ওপরের কথা যে বলা হ'ল এটা কিন্তু ভালবাসার অবস্থার প্রথম দিকের কথা নয়—অত্যন্ত প্রাইমারি স্টেজে আলাদা কথা। সেখানে অনেক সময় ভালবাসা দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুকে পাবার চেষ্টা করতে হয়—সে অন্য কথা। যখন কেউ কাউকে ভাল জানে না, তখন কেউ কাউকে খুব খারাপ বা গায়ে-পড়াও ভাবে না—তখন দু'জনেই দু'জনের কাছে খানিকটা রহস্য-মণ্ডিত থাকে কি না—কেউ কাউকে খুব খারাপ ভাবতে পারে না। কিন্তু খানিকটা ভালবাসার পরে যখন দেখবে যে সে তোমার ভালবাসা নিতে পারচে না, নানারকম চেষ্টা করেও যখন তার মধ্যে ভালবাসার প্রেরণা দিতে পারবে না, তখন তার ঘাড়ে পড়ে ভালবাসা দিতে যেও না—তাতে সে বিরক্ত হয়ে উঠবে, তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার ভালবাসার মূল্য সে দিতে পারবে না, বরং উল্টোই হবে—তখন তাকে ছেড়ে দিও। [এই ডায়েরীটা লিখলাম কেন? কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে। কিন্তু আজ আর সেটা লিখলুম না।]"

'উৎকর্ণ' নামে প্রকাশিত দিনলিপির খাতাখানির প্রথম দিনেই মনের

সব কথা খুলে বলার সংকল্প বাক্য ছিল এবং ঠিক উপরের অংশগুলি সেই গ্রন্থেই লিখেছেন। কল্যাণীর সঙ্গে পরিচয়ের আগের কথা। তবু প্রসঙ্গটা টেনে আনার কারণ—ভালবাসা সম্পর্কে মানুষটির মানসিক অবস্থান নিরূপণে পাঠককে সূত্রপথের ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র।

গাঁয়ের ইছামতী আর তার তীর তেমনি আছে, মনেও তার প্রতি অনুরাগের স্রোতে ভাটা পড়েনি কিন্তু জীবনের যাত্রাপথে যাদের নিবিড় সঙ্গকে আশ্রয় ক'রে বাকীটুকু কাটানোর আশাতরু ছিন্ন-ভিন্ন হ'ল, সেই সময়ে যেমন একটি সমর্পিত প্রাণ, সহানুভূতি ও সংবেদনশীল মনের সান্নিধ্য প্রয়োজন ছিল, কল্যাণী হলেন সেই প্রার্থিত সাধিকা। বিভূতিভূষণের মনের একটি দিক মৃণালিনীর সেই খোকাই রয়ে গিয়েছিল—ব্যক্তিগত কোনও অভাবই স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে পূরণের চেষ্টা তাঁর চরিত্রে বয়সের সঙ্গে বৃদ্ধি পায় নি। অপর কেউ অভাবটুকু আন্দাজে ধরে' ফেলে সেটা পূরণ করতে চাইলে তাকে তিনি অন্তরে স্থান দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। কাজেই কল্যাণীর সেবাসুন্দর হাত আর স্মৃতির দুয়ার খুলে দেওয়া গান সুতহিবুকযোগের সূচনা না ক'রে পারে না। তাই এই অনাত্মীয়া মেয়েটির জন্মদিনে তাঁকে বনগাঁয়ে আসতেই হবে এবং নিজের প্রিয় 'বিউটি স্পট' গুলি সঙ্গে থেকে দেখাতেই হবে। আর একই মানস স্তোভনা থেকে কলকাতায় তাদের আসার আশাপথ চেয়ে মেসের সঞ্চয়ে দামী চকোলেট কিনে রাখা, কোথাও বেরুলে সেই সময়ে অতিথি এসে পাছে ফিরে যায় তাই দারোওয়ানের কাছে চাবী রেখে বসতে ব'লে যাওয়া—এই ভাবে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করা। এবং অবশেষে ঈপ্সিত ব্যক্তির জন্য প্রতীক্ষা যখন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাগ করে চকোলেটগুলি' খেয়ে ফেলে সে খবর 'ছেলেমানুষ' মেয়েটিকে চিঠি লিখে জানানোর মত সরলতা একমাত্র বিভূতিভূষণেই সম্ভব। এমনি ক'রেই অল্পদিনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তাঁকে জীবনসঙ্গিনী করার কল্পনা অঙ্কুরিত হ'য়ে ত্বরিতে শাখাপল্লব বিস্তার সম্ভব হ'ল। এই প্রসঙ্গে আমারও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে চাকুরিয়ার বাড়িতে তিনি যখন আমাদের কাছে মাঝে মাঝে কাটাতেন সেই সময়ের একটি রাতের কথা মনে পড়ছে। ছাদের উপর চাঁদের আলোয় অনেক রাত অবধি গল্পগুজব চলতো। সম্পূর্ণ পারিবারিক আসর। সুরূপা আমি আর বড়দা। কথায় কথায় একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—'বৌদির দিদি, মানে, 'মায়াদি ত দেখতে বৌদির চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর, লেখা-

পড়াও বেশি করেছেন, তবে কেন আপনি—!' তার উত্তরে হাসিমুখে হালকা সুরে জবাব দিয়েছিলেন,—'আরে এটা বোঝো না, একটা বিদুষী রূপসী মডার্ণ মেয়ে কোন্ দুঃখে আমার ওই অজ পাড়াগাঁয়ে হাঁড়ি হেঁসেল ঠেলতে যাবে! বিয়ে ত করলেই হ'ল না, সংসারের সুখ শান্তি যাতে বজায় থাকে সেটাও দেখতে হবে। এদিক দিয়ে তোমার বৌদির অনেক গুণ আছে। মনটাই ত আসল—শুদ্ধের লেখাপড়া কি রূপ দিয়ে আমার কি দরকার, যদি শান্তিই না পেলাম ত এই বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে মরব! মায়াদিও মেয়ে খুব ভালো তবে হস্টেলে থাকে তার অ্যাম্বিশন আছে। সবচেয়ে বড় কথা কল্যাণীর মতো সেবা ক'টা মেয়ে করতে পারে! ওরকম মেয়ে হয় না, বুঝলে—'

বিয়ের আগে কল্যাণীকে লেখা অনেক চিঠিতেই এই মনচিত্র সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, দু-একটি নমুনা থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়: ···'অনেক দিন নিঃসঙ্গ কাটিয়েচি তাই বোধহয় বিধাতার দানের মতোই তুমি এলে আমার কাছে। আমি জানি তুমি আসচো ভালবেসেই শুধু, জীবনে এর মূল্য যে কত বড় তাও আমি বুঝি। তোমাকে আমি কত শ্রদ্ধা করি এ জন্যে তা বুঝি জানো না।' (৩.৮.১৩৪৭)। পরলোক বিশ্বাসী এই মানুষটির ৮।৮।১৩৪৭-এর চিঠিতে এই মনোভাব আরও সোচ্চার '···কল্যাণী, তুমি আমার অনেকদিনের পরিচিতা, এবার এত দেরীতে দেখা হল কেন জানি না। আরও কিছুকাল আগে দেখা হলে ভাল হত।···আমি এটা বিশ্বাস করি যে মানুষের আয়ু দ্বারা মানুষের সত্যিকার বৃহত্তর জীবনকে মাপা যায় না—এ একটা বৃহৎ বৃত্ত, হাজার হাজার বছর এর পরিধি, তুমি নেই, আমি নেই, আছে তোমার আত্মা, আমার আত্মা—লক্ষ বছর তাদের স্থিতিকাল। সেই বিরাট vision দিয়ে জীবনকে যে দেখেচে, জীবনকে সত্যিকার সে-ই চিনেচে।···তুমি ভালবেসে আমার ঘরে আসতে চাইচ, তোমার কত ভাল ভাল পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারতো—কিন্তু তা যখন তুমি ফেলে আসতে চাইচ—তখন তোমার ভালবাসার মান আমায় রাখতে হবে বই কি। তোমাকে ভালবাসি এবং স্নেহ করি বলেই বিবাহে মত দিয়েছিলুম, নইলে কেউ কি আবার বন্ধনের মধ্যে ঢোকাতে পারতো? আশীর্বাদ করি তুমি ভালবেসে তৃপ্তি পাও। সুখী হও জীবনে। আমাকে তোমার ভক্তি করা লাগবে না (পূর্ববঙ্গের টান এসে পড়েচে ইতিমধ্যে—ছ্যাখো কাণ্ড!) ভাল বেসো তাহলেই আমার আনন্দ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সব দেবতাদের প্রাপ্য, মানুষ কি

পায়? মানুষের কত ত্রুটি-বিচ্যুতি, কত ভুলচুক,—তারা কি ভক্তির পাত্র? আমার মধ্যে কত হীনতা দেখবে, কত খারাপ দেখবে তখন কি ভক্তি হয়? তা হয় না। হাঁ, তবে ভালবাসা অন্য জিনিষ। যে যাকে ভালবাসে, তার শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভালবাসা কমে না, বরং বাড়ে। ভালবাসাকে বড় বলেচে এইজন্যে—Love is God—মানুষের যে-হৃদয়ে বন্ধুত্ব, ক্ষমা, করুণা ও স্নেহের সিংহাসন পাতা—ভগবানের সিংহাসনও সেখানে। সুতরাং তুমি নিঃসন্দেহ থাকতে পারো, ভালোবাসবো চিরকালই তোমায়। তোমার ওপর নিষ্ঠুর হতে বুঝি পারবো কোনোদিন? খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার জীবনে কারো সঙ্গে কোনোদিন করি নি, যতদূর আমার মনে হয়। তোমার মধ্যে যে গুণ আছে, সেগুলো ফুটিয়ে তোলা আমার একটা কাজ হবে,—সব দিক থেকে। কল্যাণী, আমি জানি তুমি ক্লিওপেট্রা বা নূরজাহান নও, কিন্তু বাইরের রূপ ক'দিনের? অন্তরের যে রূপ চিরদিনের, তোমায় মধ্যে আমি তা প্রত্যক্ষ যদি না করতুম, তবে কি আমি তোমার সঙ্গে অত মিশতাম?...'

বিয়ের প্রস্তাব থেকে দিনস্থির পর্যন্ত যখন চুকে গেছে তখন ত আর ভাবা শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া চলে না, তাই তিনি কল্যাণীকে হামেশা চিঠি লিখছেন তখন। বলা বাহুল্য যে, পত্র একতরফা ছিল না—কল্যাণীও আবেগ উচ্ছ্বাস এবং স্বপ্ন রঙীন ছবিতে লেখা লিপি মির্জাপুরের মেসে প্রেরণে কম তৎপর ছিলেন না।

যতো না নিজের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী রমার জন্য তিনি ব্যস্ত ও বিব্রত। বিয়ের কৌলিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়মকর্মে ত্রুটি রাখা চলবে না। তাহলে বিয়ে-বিয়ে ভাবের গুরুত্ব কমে যেতে পারে। তিনি নয় বয়স পেরিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের পানিগ্রহণ করছেন, ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা রমা (কল্যাণী)-র অল্পবয়সী মনে বিবাহকে ঘিরে কতো কতো কল্পনার জাল বোনা হয়েছে—তার মর্যাদা দিতে হবে বই কি। আচার অনুষ্ঠানের পুরনো ঝাপ্‌সা হয়ে যাওয়া মোটামুটি কতকগুলি স্মৃতি থাকলেও তিনি একা এবং পুরুষ মানুষ—এসবের কিছুই তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। ছোটভাই-এর স্ত্রী যমুনাও ছেলে মানুষ অনভিজ্ঞা। তা ছাড়া ঘাটশিলা থেকে তাঁদের টেনে বনগাঁয়ে বা নিজের গাঁয়ে এনে যে রাখবেন সে বন্দোবস্তই বা কে করে? সমূহ সমস্যা। অতএব দুই দিক বজায় রাখা যায় এমন ব্যবস্থা-ই বেছে নিলেন তিনি। কৈশোর-যৌবনের 'মিতে' বনগ্রামের বাসিন্দা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হ'লেন। বিয়ের দু-সপ্তাহ আগে নিজের এই

সংকটাপন্ন অবস্থার কথা অকপটেই কল্যাণীকে লিখছেন—…'আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যত বিয়ে এগিয়ে আসচে। আমি রইলুম কলকাতায় বসে, খুটু বসে রইল ঘাটশিলায়। কাজকর্মের কিছুই ঠিক হ'ল না এখনো। অনেক কিছু অনুষ্ঠান আছে বিয়ের। পিঁড়িচিত্র করা, শ্রীগড়া ডালা সাজানো, এসব কে করবে বুঝতে পারচি নে।…' কল্যাণীর ছোটমামা (কানু) নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মারফতেই মিত্রের কাছে উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ ক'রে পাঠান। মিত্রে'র বাড়ি থেকেই ১৩৪৭-এর ১৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহ হয়।

বিবাহ বাসরের অন্তরঙ্গ বিবরণের জন্য কল্যাণীর ছোট বোন বেলার লেখা একটি নিবন্ধ থেকে (মেজদা' বিভূতিভূষণ॥ কথাসাহিত্যর ১৩৭৯ ভাদ্র সংখ্যা) কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

'…সমগ্র বাড়িটি উৎসবের সাজে সেজেছে, আমাদের প্রাণেও খুশীর হাওয়া বইছে, এই আমাদের জীবনে নিজেদের বাড়িতে প্রথম বিবাহ-উৎসব। কতদিন আগে থেকে এর জন্য জল্পনা-কল্পনা করেছি। আজ সেই বহু-প্রতীক্ষিত দিনটি সত্যিই কাছে এসেছে। চন্দ্রমল্লিকা ও গোলাপের স্তবকের পাশে বেনারসী পরা মেজদি রমা নতমুখে বসে। কনেচন্দনে আঁকা মুখে তৃপ্তির মৃদু হাসি ফুটে রয়েছে। আজ তার সেই পরম প্রতীক্ষিত দিনটি সমাগত। আমরা সব ভাই বোন ও বন্ধুবান্ধবরা তাকে ঘিরে রয়েছি, বহু বছর পরে এখনও আমার মানসপটে সেই দৃশ্যটি উজ্জ্বলভাবে দেখতে পাই। বিবাহ-মণ্ডপে বরকনে বসেছে, সম্প্রদান করছেন আমার বাবা, আমি কনেকে ধরে রয়েছি। বরযাত্রীর ভেতরে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রয়েছেন। কলকাতা থেকে বরযাত্রী হিসেবে বিভূতিভূষণের সঙ্গে এসেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র বিখ্যাত সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও সাঁতারু শান্তি পাল, 'দৈনিক বসুমতী'র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নিয়োগী, কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ও 'সুশান্ত সা'র লেখক নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রভৃতি অনেক গুণীজ্ঞানীজন।

"বাড়ির পাশের উঁচু দেয়াল ঘেরা জমির ওপরে গালিচা বিছিয়ে সভামণ্ডপ তৈরী হয়েছে, মাথার উপরে শামিয়ানা, বরযাত্রীরাও মণ্ডপের একপাশে বসেছেন। ওঁদেরই ভেতর থেকে কে একজন আমাকে কনেকে ধরে বসে থাকতে দেখে ঠাট্টা করে বললেন—বিভূতিবাবুর কপাল ভাল, একসঙ্গে দুজনকে পাচ্ছেন। কনেকে ধরে বসলে দান হয়ে যায় জানতাম না। আর

তখন আমার বোঝবার বয়সই বা কত? মেজদিরই তখন বয়স ষোল কি সতের, আমার তো তার চেয়ে কম, ভয়ে ভয়ে সরে এলাম দূরে। বরযাত্রীদের ভেতর হাসির তুমুল রোল উঠল। আমি খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

"সম্প্রদানশেষে বর-কনে যখন ঘরে ঢুকছে তখন দর্শকদের ভেতর থেকে কার যেন মন্তব্য কানে এল, বাঃ, বেশ দুজনকে মানিয়েছে রে। বাসরঘরে বড়জনেরা জমিয়ে তুললেন, আমরা তখন ঠাট্টার কিই বা জানতাম, আর আমাদের বয়সী মেয়েদের চেয়ে সব বিষয়ে আমরা একটু বেশিই কাঁচা ছিলাম তখন। কারণ বাবা মা এবং কেবলমাত্র ভাইবোনদের নিয়ে ছিল আমাদের সংসার।"

ষোড়শীকান্তের সাহিত্যানুরাগ বিশেষ ক'রে তাঁর সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়েছিল, বেলা দেবীর নিবন্ধে সে খবরও আছে।

"বাবার সাহিত্যে দখল ছিল। দশের পূজা, অঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি প্রণেতা ছিলেন। তিনি পরলোক ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্যই বিভূতিভূষণকে জামাতা করার আগ্রহ তাঁর হয়েছিল। আমাদের লেখাপড়া ও গল্প লেখায় তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁর উৎসাহে ছোটবেলায় আমরা গল্প ইত্যাদি লিখতে চেষ্টা করতাম। সবুজপত্র নামক একটি হাতে লেখা মাসিকপত্র আমরা বের করেছিলাম। তার ভেতরে লেখা আমার একটি গল্প বৈদ্যবাটী মহামায়া সাহিত্য মন্দির থেকে প্রথম পুরস্কার পায়। মেজদির অর্থাৎ রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু' একটি গল্প কাগজে ছাপা হয়। একটি গল্পের নাম আমার মনে আছে "নীলোৎপল"। তখনকার সময়ে 'মাতৃভূমিতে' ছাপা হয়।"

কল্যাণীর মধ্যে যে গুণাবলীকে ফুটিয়ে তোলার সংকল্প ভাবী স্বামীর পত্রে প্রতিফলিত তার মধ্যে এই সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত মুখ্য সে প্রমাণ আমরা অনেকই পেয়েছি। বড়দা প্রায়ই বৌদির লেখা কোনও গল্প এনে মিত্র ও ঘোষের দপ্তরে দিয়ে বলতেন—'আমার গল্পটা নিতে এলে পত্রিকার লোককে এটাও দিয়ো, পড়ে ত্মাখেন যেন।' সে প্রসঙ্গ আপাততঃ থাক। বিয়ের কথায় ফিরি।

বেলা গোস্বামী বলছেন: "ইছামতী নদীর অপর পারে এক উকিলবাবুর বাড়িতে বৌভাত হবে ঠিক হল। বোধ হয় এখানকার বন্ধুবান্ধবরা এখানেই বৌভাতের জন্য ধরেছিল। বিবাহে ঘাটশিলা থেকে ভাই নুটবিহারী যোগদান করতে এসেছিলেন বনগাঁয়ে, মেজদার বিবাহের পূর্বেই ছোট ভাইয়ের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। বাসীবিয়ের দিন

বিকালে বর-কনে বিদায় নিয়ে যাওয়ার খানিক পরে আমাদের বাড়ি থেকে কয়েকজনে মিলে ঠিক করলাম "সাতভেয়ে তলা"র বেড়াতে যাব—বড়রা অনেকে ছিলেন সেই দলে। নৌকোয় করে সেখানে যেতে হয়। বনগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত পীঠস্থান। নৌকোয় উঠছি—দেখি মেজদাও এসে পৌঁছে গেছেন। এখন থেকে বিভূতিভূষণকে আমরা 'মেজদা'ই বলব। আমরা খুব অবাক হয়ে গেলাম, তিনি বললেন, 'কল্যাণীকে বাড়ি পৌঁছে তোমাদের ওখানে যাচ্ছিলাম বেড়াতে, ভালই হল পথে দেখা হল, চল, আমিও সঙ্গে যাব।' তাঁকে নিয়েই আমরা সব গেলাম 'সাতভেয়ে তলা"য় নৌকো করে।

"পরদিন বৌভাতের নিমন্ত্রণে আমাদের বাসার কয়েকজনের সঙ্গে গেলাম তাঁর বন্ধুর বাসায়। দেখলাম ফুলশয্যায় আমাদের ওখানকার দেওয়া নতুন শাড়িটি পরে একটি আসনে নতমুখে মেজদি বসে, কপালে চন্দন দিয়ে কে লিখে দিয়েছে "বিভূতির রমা"। বধূ সাজে নতুন লাগল মেজদিকে। কয়েকদিন পূর্বের সেই হাস্যচঞ্চল মেয়েটি এক রাত্রেই যেন কোন্ যাদুদণ্ডে বদলে লাজনম্র বধূতে পরিণত করেছে। কোন্ সেই অদৃশ্য যাদুকর, তাঁকে প্রণাম করি।

বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

"বৌভাতের পর মেজদি আবার আমাদের এখানেই ফিরে এল। তার আঙুলে বৌভাতের মাছের কাঁটা ফুটে পেকে উঠেছে। ডাক্তার অপারেশন করবে ঠিক করলেন, মেজদি ঐ হাত দিয়ে কি করে চিঠি লেখে? আমিই তাঁর হয়ে খবরটা জানালাম মেজদাকে, চিঠি পেয়েই আমাদের মেজদা এসে পড়লেন। মেজদির হাত অপারেশন হয়ে ভাল হয়ে যাবার পরও প্রায় বছরখানেক সে আমাদের কাছেই ছিল। মেজদা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেখা করতে আসতেন। মাঝে মাঝে মেজদিকে নানা জায়গায় বেড়াতেও নিয়ে যেতেন দিন কয়েকের জন্য। এই সময়ই সে দার্জিলিং, আসানসোল, পাটনা ইত্যাদি জায়গায় ঘুরেছিল। তবে সে বেশীর ভাগ সময়ই বনগাঁয়ে আমাদের কাছেই থাকত। পরে প্রায় বছর ঘুরে এলে প্রথম স্বামীর ঘর করতে ঘাটশিলায় যায়।"

বস্তুতঃ যুগান্তর পারের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অপটু অপুর মতো বিভূতিকে বিবাহে সহজে প্রলুব্ধ করলেও একা-একা সংসারের বোঝা ঘাড়ে নেওয়াতে পারে নি। তাছাড়া শ্বশুর বাড়িকে কতটা নিজের পরিবার

মনে করে নিয়েছিলেন তিনি, শালাশালীর ওপর কর্তৃত্বের চরিত্রেই তা স্পষ্ট। বেলা লিখছেন :

"ঘেঁটুফুলের ওপর তাঁর অসাধারণ ভালবাসা মনে পড়ে। মেজদির বিয়ের পরে একদিন তিনি বললেন—'জানিস, এক জায়গায় কি অজস্র, ঘেঁটুফুল দেখে এসেছি, যাবি দেখতে ?' আমি ও মেজদি খুব ধরলাম তাঁকে দেখাবার জন্য। এই ঘেঁটুফুল দেখতে গিয়েই তাঁর অদ্ভুত একটি স্বভাবের পরিচয় পাই। সেই ঘটনাটিই বলছি।

"ঘেঁটুফুল ফুটেছিল বনগাঁ ও বারাকপুরের মধ্যবর্তী গ্রাম চালকীর কাছে এক মাঠে। আমরা সকালে বেরিয়েছি, খানিকক্ষণ পথ চলার পরেই আমার ও মেজদির জলপান করার ইচ্ছে হল, মেজদাকে সেকথা বলতেই তিনি খানিক্ দূরে রাস্তা থেকে একটি চাষী গেরস্তর ঘর দেখিয়ে বললেন ওখান থেকে খেয়ে আয়। বেশ পরিচ্ছন্ন কুটিরটি, গোবর দিয়ে নিকনো উঠোনে ধান রৌদ্রে শুকোচ্ছে, একটি বৌ কাছেই ছিল, তার কাছে জল চাইতেই সে সম্ভ্রমের সঙ্গে একটি পরিষ্কার চকচকে মাজা ঘটিতে জল এনে দিল আমাদের। আমরা জল পান করে যখন ফিরে আসছি ওই বাড়ির সামনেই একটি কুলগাছের তলাতে কুল পড়ে রয়েছে দেখলাম, সবে দু-একটি কুড়িয়ে মুখে দিতে যাচ্ছি, অদূরে দণ্ডায়মান মেজদা ধমকে উঠলেন, 'এখানে কুল খেতে এসেছ না ঘেঁটুফুল দেখতে এসেছ ? পরের গাছের কুল চুরি করে খাচ্ছ কি বলে ?' ধমক খেয়ে আবার আমরা দুজনে নীরবে রাস্তা চলতে লাগলাম। খানিক পরেই সেই জায়গায় পৌঁছে গেলাম। গিয়ে সত্যই চোখ জুড়িয়ে গেল। অনেকটা জায়গা জুড়ে সেখানে শুভ্র ঘেঁটুফুলের সমারোহ। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, আমরা ফুলের গায়ে হাত বুলালাম, নিচু হয়ে ফুলের ঘ্রাণ নিলাম। পরে বাড়ি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা ফুল ছিঁড়তেই আবার ধমক খেলাম, "হ্যাঁ রে, ও কি হচ্ছে ? তোমাদের ফুল ছিঁড়তে বলেছে কে ? তোমাদের দেখবার জন্য আনা হয়েছে, ছেঁড়বার জন্যে নয়।'

"ঘেঁটুফুল দেখে ফেরার পথে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ রে, তোরা চালকী যাবি ? ওই যে, বেশী দূর নয়।' চালকী তাঁর বোন জাহ্নবী দেবীর শ্বশুরের দেশ। সেজন্যে খুবই আগ্রহ হল দেখবার, অনেকবার নাম শুনেছি, এখন কাছে যখন আসা হয়েছে তখন যাওয়া যাক্। আমরা সম্মতি জানাতেই উনি চালকীর দিকে আমাদের নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

"চালকী এসে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় একটা হবে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘেমে নেয়ে গেছি। তার উপরে সকালের খাওয়া জলখাবার কখন হজম হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

"সে সময় তাঁর বোন জাহ্নবী দেবী মারা গেছেন। ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ... শিলায়। তবে তাদের জ্যাঠাইমা ও অন্য জেঠতুতো ভাই-বোনেরা সেখানে আছেন। মেজদা তাঁদের বাড়ির কাছে এসে বললেন, 'চল জাহ্নবীর জাকে তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি।' তার পরেই মোক্ষম কথাটি বললেন আমাদের —'তোমরা যাবে কিন্তু খাবার কথা বলতে পারবে না। কুটুম্ব মানুষ, এই দুপুরে তাঁদের বাড়ি যাচ্ছ, নিশ্চয়ই তাঁরা খেতে সাধবেন, কেউ খেতে রাজি হয়ো না কিন্তু।"

"প্রচণ্ড ক্ষিদেয় তখন নাড়ী জ্বলছিলো, তবুও রাজী হলাম তাঁর কথায়। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই জাহ্নবী দেবীর জা সাদর অভ্যর্থনা করে আমাদের বসালেন। তিনি তখন রান্না করছিলেন, পাড়াগাঁ গেরস্তঘরে খাওয়া-দাওয়া একটু দেরিতে হয়। আমরা একটু বসবার পরেই যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। জাহ্নবী দেবীর জা আমাদের উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন, "ওমা সে কী, গেরস্তঘরে দুপুরে এলে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতে আছে! না, সে হবে না, তোমরা খেয়ে যাবে।".

"মেজদা প্রবল আপত্তি জানাতে লাগলেন, আর তিনিও খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ক্ষিদেয় পেট জ্বললেও আমরা দু বোন নীরব হয়ে রইলাম। অবশেষে অনেক বলার পর মেজদা সম্মতি দিলেন। খেয়েদেয়ে আমরা যখন ফিরলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে।"

কল্যাণী যে স্বতন্ত্র চরিত্রের মানুষ তার পরিচয়ও দাম্পত্য জীবনের শুরুতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর স্বামী যে সাধারণ ধরণের মানুষ নন্ সেটা মর্ম দিয়েই বুঝেছিলেন, তাই বিয়ের পর প্রথম ধাপেই পায়ের বেড়ী হয়ে মুক্ত ছন্দের জীবনে বাধা রচনা করেন নি। স্বামী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধামিশ্রিত গভীর অনুরাগ 'কাছে থেকে দেখা' স্মৃতিচিত্রে আমরা পেতে পারি। ['সাপ্তাহিক বিচার' ১৩৭৭-এর শারদীয়া সংখ্যা]

রমা দেবী বলছেন : "তাঁর স্বপ্নমাখা শিল্পী-চরিত্রের বিভিন্ন দিক আমি বহু ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জীবনের কোনো কিছুর মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকা ওঁর ছিল স্বভাবের একেবারে বিপরীত। মুক্ত খোলামেলা বন্ধনহীন জীবন ছিল ওঁর প্রিয়। সংসারের বোঝা ওঁর কাঁধে দৃঢ়ভাবে চেপে

বসবে ভাবলে উনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তবে স্ব-ইচ্ছায় উনি যা করতেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতাম।"

এই উক্তি থেকে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় রমা সত্যিই শিল্পীর শতকরা একশ ভাগ সহধর্মিণী। সেই একই মানদণ্ড দিয়ে বিভূতিভূষণ জীবন দেবতাকে 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু'-রূপে কল্পনা ক'রে, ভুবনময় তাঁর লীলা বিলাসের বিচিত্র রহস্য নির্ণয়ের সাধনায় বন বনান্তরে নগরে পল্লীতে পর্বতে সমুদ্রে ব্যক্তি মানুষটিকে নিরন্তর ব্যস্ত রেখেছেন। সবাই সবাইকে বোঝে না বা মানসিক বোঝাপড়াও সর্বত্র বয়সের অপেক্ষাও রাখে না। নইলে রমার মতো সংসারানভিজ্ঞ ষোড়শীর পক্ষে চল্লিশোত্তর এই অসাধারণ চরিত্রের মানুষের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো কি ক'রে সম্ভব! রমা বলছেন 'আমরা।' অর্থাৎ তিনি নিজেকে অন্যের থেকে পৃথক ক'রে ভাবতে শেখেন নি বা ওই ভাবটা তাঁর প্রকৃতিতেই অনুপস্থিত। তাই স্বামীর মুক্ত চরিত্রের ওপর দখলদারী কায়েম করতে যান নি। যখন সুযোগ মিলেছে তখন বনজঙ্গলে বিভূতির সঙ্গিনী হয়েছেন তিনি। দু'জনেরই মন সেই সঙ্গীতের সুর শুনেছে :

"ওরে বন তোর বিজনে সঙ্গোপনে কোন উদাসী থাকে ?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডাকে সে আজ ডাকে !

নিজে সে নীরব হয়ে রয়,
শোনে সে ফুল যে কথা কয়,
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়,
শোনে সে লতার অনুনয়।
পাখীদের প্রগলভতা দেয় কি ব্যথা তাকে ?"

মেসের পাট চুকিয়ে কলকাতায় বাসা ভাড়া ক'রে থাকার কথা বিভূতির মনের কোণে কোনদিন ঠাঁই পায় নি। পরন্তু ইছামতীর সন্তান সুবর্ণরেখার কূলে পাকাপাকি ভাবে আস্তানা করবেন এও কল্পনা করেন নি। বিনা আয়াসে যদিও ঘাটশিলায় বাড়ি একখানা হয়েছে। কোনো এক বন্ধু তাঁর কাছে কয়েকশ' টাকা ধার নিয়ে আর শোধ করতে পারেন নি। সে ভদ্রলোক শিক্ষাব্রতী ছিলেন। গালুডি ঘাটশিলা অঞ্চলের পাহাড় অরণ্য শ্রীর প্রতি বিভূতির আকর্ষণ লক্ষ ক'রেই বন্ধুটি জোর ক'রেই নিজের ঘাটশিলার বাড়িটি বিভূতিকে গছিয়ে আর্থিক ঋণ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। ঘাটশিলা ভালো

লাগে খুবই কিন্তু বনগাঁ চাল্‌কী-বারাকপুরের অভাব তা দিয়ে ত মিটতে পারে না। সেই বকুল গাছ, সেই বিলবিলে, বাঁওড়, কুঠীর মাঠ, নদীর ঘাট আর আইনদ্দী, হাজু, ইন্দু রায়, ন' দি বুধের মা আর পাঁচ জন পড়শীর সঙ্গে যে আত্মার যোগ রয়েছে, যেখানে পৈতৃক ভিটের কোণে মায়ের স্মৃতি বাতাসে মিশে রয়েছে সেইখানে রমাকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করতে হবে তাঁকে এই কল্পনা গ্রাস করল।

তখন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত জুড়ে বিরাট যুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়েছে আকাশে-ভূমিতে-সমুদ্রে লড়াইএর দাপাদাপি। আর ভারতে? বিভূতির বিয়ের সময়ে প্রেসিডেন্সী জেলে সুভাষচন্দ্র বসু সহ পনের জন দেশব্রতী অনশন করছেন। ইংরেজের আমলারা জোর ক'রে একজনের মুখে আহার গুঁজে দিয়ে ব্রত ভঙ্গ করার বীভৎস সন্তোষ লাভ করছে। ভারতের স্বাধীনতাকামীদের দমনের সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে। কংগ্রেস সভপতি আবুলকালাম আজাদকে ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে কলকাতা থেকে দিল্লীর পথে এলাহাবাদে ট্রেনেই গ্রেপ্তার ক'রে ১৮ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল ভারতরক্ষা আইনের জোরে। জিন্না সাহেব পাকিস্তানের দাবী আর যৌক্তিকতা নিয়ে আবহাওয়া উত্তপ্ত করার ফলে ঢাকা এবং সিন্ধু প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথা চাড়া দিয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের র‍্যাডিক্যাল পার্টির প্রগতি পন্থাকে মদত্ দেওয়ার জন্য ডাকছেন, আবার জামশেদপুরে ১২ই জানুয়ারী ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের জিগিরও তিনি দিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমাজ কল্যাণের জন্য বাংলার পল্লী অঞ্চলের দিকে বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় মুখর।… ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতার সংকল্প দিবস উদ্‌যাপিত হওয়ার পর দিবস ২৭শে জানুয়ারী অসুস্থ সুভাষ চন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধান ঘটল তাঁর এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। বৃটিশ সিংহের মুখোশে টান পড়ে' আসল নেকড়ে চরিত্রটি বেরিয়ে আসছে, বণিকের বাটখারার কারচুপি যেন ধরা পড়ে যায়-যায়।

এই পরিবেশেই খেলাৎচন্দ্র ইনষ্টিটিউশনের মাষ্টারী আর সাহিত্য সাধনার সঙ্গে বিবাহিত জীবনে দ্বিতীয়বার দীক্ষিত হয়েছিলেন বিভূতি। চলমান ঘটনার স্রোত জীবনকে যেমন ভাবেই আবর্তিত করুক না কেন একগুঁয়ে নাবিকের মতোই বাহ্যতঃ ঢিলেঢালা স্বভাবের বিভূতিভূষণ স্থির লক্ষে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তরীটি। বারাকপুরের বাড়িতে কল্যাণীকে থিতু করার জন্য এই

বছরেই এপ্রিলের শেষে তিনি দিন কয়েক থাকেন। বিভূতির অপ্রকাশিত দিনলিপির একটি পৃষ্ঠায় [সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য পৃঃ ১৫২-৫৩] কল্যাণীর হস্তাক্ষর পড়েছে "কাল বিকেলে বারাকপুরে এসেচি। ৯ মাস পরে বারাকপুরে এসে এত ভালো লাগচে যে বলবার নয়। বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম বার বার। মনে গর্ব হ'ল এর সমস্ত জিনিস আমার হাতে গোছানো। লোকে জানে এ বাড়ির কর্ত্রী আমি। নিজের ওপর শ্রদ্ধা হয়। নতুন জিনিস এটা—এই অনুভূতি। বুকের ওপাশে বিলবিলের দিকে যে ঠেস চেয়ার ওখানে বসে উনি রাত্তের খাবার খান, ঘি-মাখানো রুটী, আলু চচ্চড়ি, দুধ গুড়। এত ভালো লাগচে যে বলবার নয়। লিখবার নয়। সমস্ত দিন বড্ড খাটতে হয়েচে। সমস্ত নোংরা হয়ে ছিল, বাবার পুঁথি ও মায়ের কড়া ঝেড়ে মুছে সাজাই। প্রণাম করি। কি আশ্চর্য, আমার শিউলি গাছে আজো ফুল ফোটে। উনি এনে দিয়েছেন। আমি বাবার পুঁথির ওপর ফুল দিই। বেশ রাত হয়েচে। উনিও ডাইরী লিখচেন আমার পাশে বসে।" তারিখ দেওয়া আছে ২৪।৪।১৯৪১ কিন্তু কল্যাণীর হিসেবে ন-মাস কি ক'রে বারাকপুরে অনুপস্থিতি হ'ল বোঝা যাচ্ছে না। বিয়ের পরও একাধিকবার তিনি স্বামীর সঙ্গে বারাকপুরে এসেছেন। অবশ্য সন তারিখের হেরফের বাদ দিলেও মূল চিত্রের অন্তরঙ্গ আমেজটি আমরা ঠিকই পাই—সেটুকুই আসল কথা।

অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০ নভেম্বর), অভিযাত্রিক (১৯৪১ মার্চ), বেণীগির ফুলবাড়ি (১৯৪১ এপ্রিল) প্রকাশিত হয়।

কলকাতায় আর মন টেকে না। তার উপর বন্ধুদের পরামর্শ দোলাচল-চিত্তে এমনই হাওয়া লাগাল যে, স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যেই ষোল আনা আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ক'রে বসলেন তিনি। এই সময়ে কল্যাণীকে লেখা একখানি চিঠিতে সেই মানসিক সংবাদ সোচ্চার:

"...ভাল ক'রে বিবেচনা করে দেখলাম চাকুরি ছাড়াই আমার পক্ষে সঙ্গত। কাল এ সম্বন্ধে প্রবোধ সান্যাল ও গজেন মিত্রের সঙ্গে কথা হ'ল।... ওরা বললে বারাকপুর সস্তার জায়গা এবং কলকাতার নিকটে। ওখানে বসে লিখলে এবং কলকাতার বইএর দোকানে দিলে আমার যা আয় হবে তা বর্তমান আয় অপেক্ষা কম নয়।...আমি হিসেব ক'রে দেখলাম রোজ যদি ৩ পাতা ক'রে লিখি তবে ৩৬০ দিনে (এক বছরে) আমি লিখবে ৩×৩৬০

=১০৮০ পাতা। ৪ খানা বড় উপন্যাস। সেই জায়গায় বাদ দিয়েও লিখবো তিনখানা উপন্যাস—ধরো যদি সবদিন ৩ পাতা লিখতে নাও পারি। তাতে ২০০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা বছরে আয় দাঁড়ায়। তার ওপর যদি আমি কিছু ধানের জমি করি তবে ঘরের ভাত ঘর থেকেই হ'ল। রোজ সকালে উঠে বেলা ৯—৯॥ টার মধ্যে দুপাতা এবং রাত্রে এক ঘণ্টার মধ্যে এক পাতা লেখা আমার পক্ষে খুব সহজ কাজ। এই লিখেই উক্ত আয় হতে পারে। ২০০০ টাকাও যদি বছরে আয় হয়, তবে বারাকপুরের মাসিক খরচা মাসে মাত্র ২৫ টাকা কি ৩০ টাকা হিসাবে ৩৬০ টাকা। নুটুকে ৪০ টাকা ধরেও ৪৮০ টাকা। মোট ব্যয় ৩৬০+৪৮০=৮৪০ টাকা'? এরপর ধানের জমির আয় তো পড়েই রইল।' এইভাবে তিনি হিসেব করে ফেলে ছড়িয়ে এক বছরে গড়ে হাজার টাকা স্বচ্ছন্দে সঞ্চয় করা যাবে। দশ বছরে দশ হাজার টাকা জমানো যাবে এই হিসেব কলকাতার বইএর দোকানের মজলিসেই হয়েছিল। গজেনদা' আর প্রবোধদা' বারাকপুরে জমি নেবেন এবং থাকবেন এরকম ইচ্ছা তাঁকে আরও উৎসাহ দিয়েছিল। শুধু তাই নয় প্রবোধদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত ধ্বনিতে এও বলেছিলেন—"...'আপনি এখনই ছেড়ে দিন চাকরি। আপনার মত অবস্থা আমার হলে সামান্য ৪০ টাকা মাইনের চাকরি কোন্ কালে ছেড়ে দিতাম।' কাল গজেনের দোকানে বসে সব হিসেব খতিয়ে দেখে মনে হ'ল অনর্থক পরের দাসত্ব করচি। ওতে আমার টাকার দিক থেকে কোন সুবিধে নেই। অবশ্য তিন পাতা ক'রে লেখা কিছু কঠিন নয় আমার পক্ষে। তোমাকে সেই সময়টা দিতে হবে। এক মনে যাতে লিখতে পারি ঐ সময়টা।...কি বোকামিই করিচি বছর দুই আগে চাকুরি ছেড়ে না দিয়ে। হাতে আরও কত টাকা জমত।..."

কল্পনার রশি একবার ছেড়ে দিলে ঘুঁড়ির মতো সে ত দৌড়বেই। এ চিঠিতেও তেমনি বিভূতি ভীষণ ভাবে বাস্তবসচেতন হয়ে পড়েছেন। বলছেন 'Time is money with me now.' সাহিত্য সৃষ্টিকে পণ্য হিসেবে গণ্য করতেও বাধছে না, বলছেন '...তবে কলকাতার কাছে থাকাই সঙ্গত। কারণ এ ব্যবসা চলবে না কলকাতার কাছে না থাকলে।...' ভাগলপুর, মধুপুর, ঘাটশিলা এমন কি দার্জিলিং-ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল 'ভালো' জায়গা তাঁর মতে, তবে বারাকপুর—! 'মাত্র ১।০ আনা যাতায়াত ভাড়া। সকলের চেয়ে এইজন্যে সুবিধে বারাকপুর। তা ছাড়া ধানের জমি ও বাগান

অন্ত কোথাও থাকলে পাবো না।...' এর পরও বলছেন—'...শনিবার গিয়ে আমি যেন তোমার মুখ থেকে সৎপরামর্শ পাই। দুজনে একথা সেদিন রাত্রে আলোচনা করবো।...' চিঠি শেষ করার আগে মিত্র ও ঘোষের মাসিক পঞ্চাশ টাকা জুগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করতে ভোলেন নি অর্থাৎ সৎপরামর্শ বলতে কি তিনি চান এটুকু কল্যাণীকে জানাতে আর বাকী রইল না। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় মশাইএর গ্রন্থে আমরা চিঠির তারিখ ১৬।৭ (?) ৪১। পাচ্ছি। ঘটনাবলীর বিবরণ থেকে আমার মনে হচ্ছে ১৬।৯।৪১ হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

একথা বলার সঙ্গত কারণ আছে। ওই গ্রন্থে আমার সঙ্গে বড়দার প্রথম পরিচয়ের সময় জানুয়ারী ১৯৪১ নির্ণীত হয়েছে। সেটা ঠিক নয়। ১৯৪১-এ জানুয়ারী মাসে আমি অসুস্থ। একথা স্পষ্টই মনে পড়ে প্লুরিসি-টাইফয়েডে শয্যাশায়ী অবস্থাতেই রেডিও-তে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সংবাদ পাই। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর শেষ জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে ১লা বৈশাখ হ'ল উচ্চারিত 'সভ্যতার সংকট'। তিনি ইংরাজের Law and order -কে দরোয়ানী বলে চিহ্নিত করলেন, বললেন 'পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে! সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি।' এই দিনের ভবিষ্যদ্দর্শনের ঋষি দৃষ্টিতে গোচর হয়েছিল 'একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে।.. জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পর্ক এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা ক'রে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।.. আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয় যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।...' আনন্দবাজার পত্রিকাতে সেই বাণী যখন দেখি তখন আমি মধুপুরে চেঞ্জে কাটাচ্ছি মায়ের সঙ্গে নির্জনে। তারপর কলকাতায়

ফিরে শুরু হয় ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রাম, সেই সময়েই গজেনদা এক 'ব্লাক আউটের' রাত্রে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের গলিতে বড়দাকে আমার কথা বলেন, সেটা ১৯৪১-এর শেষ দিকেই হবে, কেন না ১৯৪২-এ তিনি কলকাতার বাস তুলে দিয়েছেন। তার পূর্বে মির্জাপুরের মেসে গিয়েছি সেকথা আগেই বলেছি।

ব্যক্তিগত পরিচয়ের সময় নির্ণয়ের প্রসঙ্গে একটু স্মৃতিচারণ করা গেল মাত্র। আমার মুখ্য বক্তব্য কিন্তু ভিন্ন। বিভূতির বারাকপুরে পুনর্বসতির সিদ্ধান্তের পিছনে রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে' উক্তি হয়ত নগরজীবনবিমুখ শিল্পসত্তাকে ওই পল্লীর দিকেই ফেরার তাগিদ দিয়ে গিয়েছিল। হয়ত বাইশে শ্রাবণ সেনেটের সামনে রবীন্দ্রনাথের শবাধার থেকে সংগৃহীত করা শ্বেতপদ্মটি নিয়ে সেইদিনই বনগাঁয়ে গিয়ে কল্যাণীর হাতে সমর্পণের কালেই নিজের অগোচরে বিভূতি পল্লীর পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

আর 'ব্যবসা' তিনি সারাজীবন ধরে বহুবারই করেছেন তবে সে-সবই কল্পনালোকে। কখনো বা মাছের কারবার, কখনো কাঠের কারবার আবার কখনো অন্য কিছুর—এসবই মুখে মুখে পরিকল্পনা কিম্বা খাতায় কলমে। কার্যক্ষেত্রে কখনো তা রূপ পায় নি। কেন বলছি! আমার ক্ষেত্রেই দেখা যেতে পারে। 'অনুবর্তন' প্রথম সংস্করণের জন্যে অগ্রিম টাকা দিতে চাইলে 'হাঁ-হাঁ' ক'রে বাতিল করতে চেয়েছেন সে প্রস্তাব। দুটি ওজুহাত—প্রথম, লেখা শেষ করার আগে লেনদেনের কথা কইলে নাকি লেখা খারাপ হয়ে যায়! দ্বিতীয়টা, যখন খানিকটা পাণ্ডুলিপি হাতে পাচ্ছি তখন—'তুমি ছেলেমানুষ, নতুন ব্যবসাতে নামছো, আগে দাঁড়াও সেটা আগে দেখতে হবে ত!' মুখে অনেক সময়ে দেখাতে চাইতেন যে তিনি পাকা ব্যবসায়ী কিন্তু ধোপে সেটা কখনোই টিকতে দেখি নি। সেসব কথা পরে হবে। এটাই আসল কথা যে, কল্যাণীকে বিয়ে করার পর যখন বুঝলেন যে, অল্প বয়স্কা এই মানুষটি নিজের রূপ গুণের ঘাটতি নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছেন তখনই এবং আর পাঁচটা আনুষঙ্গিক অবস্থা তাঁকে বারাকপুরে নিজের পৈতৃক ভিটার সংস্কার ক'রে বসবাসে ব্রতী করল। সাহিত্য আর জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে গেঁথে দিল।

[ক্রমশঃ]

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

সঙ্গীত তরঙ্গ

[রাধামোহন সেন কৃত]

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভূমিকার ১১ সংখ্যক সূত্রে গ্রন্থকার বলেছেন "পায়্যা রাগ-বাদ্য-রূপ পবনের সঙ্গ। সঙ্গীত নামেতে তায় উঠিল তরঙ্গ।" সাধারণভাবে মনে হবে, "নাদ" "ঈথার"-এর সাহায্যে কী ভাবে সঙ্গীত দিকে দিকে তরঙ্গায়িত হয়েছিল গ্রন্থকার এখানে সেই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব কথাটিই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখছি, গ্রন্থকার এখানে নাদ সংজ্ঞাটির পরিবর্তে "পবন" কথাটি ব্যবহার করেছেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় "রাগ-বাদ্য রূপ" উক্তিটি। আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার এখানে সঙ্গীতের মূল ভিত্তি যে স্বর, সেই স্বরোৎপত্তির সুপ্রাচীন তথ্যটিই জানাতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আজকের দিনের সঙ্গীতে আমরা যে ১২ টি স্বর ব্যবহার করে থাকি (শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং বিকৃত স্বর পাঁচ্‌টি) সেই ১২টি স্বরের ভিত্তিভূমি হচ্ছে ২২টি শ্রুতি। বীণা-যন্ত্রের সাহায্যে এই ২২ শ্রুতিকে কী ভাবে পাওয়া যেতে পারে এবং উক্ত ২২ শ্রুতির মাধ্যমে কেমন করে ১২টি স্বরকে চেনা যেতে পারে সে সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত পারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু আরও প্রাচীনযুগে—নাট্য-শাস্ত্র রচিত হবার আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বের সঙ্গীতবিদ্‌দের নিকট ২২-টি শ্রুতির ভিত্তিতে উৎপন্ন ১২-টি স্বরের সংবাদ, মনে হয়, অজানা ছিল। কারণ, সেদিনকার সঙ্গীত কলাবিদ্যা পরবর্তীকালের মতো উন্নত ছিলনা। আমরা যে যুগের কথা বলছি তখন "রাগ" সংখ্যাটির উৎপত্তি হয়নি। রাগ অর্থে তখন "জাতি" কথাটি ব্যবহৃত হতো। কালক্রমে স্বরের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, জাতির সংখ্যাও বেড়েছে সেই অনুপাতে। দেখা যায়, কোন এক সময়, এই জাতিগুলিকে পরিবেশন করা হতো ৯-টি স্বরের সাহায্যে। অর্থাৎ, সাতটি শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে "কাকলী" ও "অন্তর"—এই দুটিমাত্র বিকৃত স্বরের ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেই যুগের সঙ্গীতবিজ্ঞানীগণ এই ৯-টি স্বরের অস্তিত্বকে কিসের সাহায্যে আবিষ্কার করেছিলেন? বীণা যন্ত্রের সাহায্যে নয়—বেণুর সাহায্যে। অবশ্য, সে যুগেও অসংখ্য রকমের তন্ত্রীবাদ্য তথা বীণাযন্ত্র প্রচলিত ছিল; কিন্তু

আলোচ্য ৯টি স্বরকে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন বাঁশীর সাহায্যে। এ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পূর্ববর্তী ঋষি বেণ্ বলে গেছেন—

দ্বিশ্রুতিস্ত্রিশ্রুতিশ্চৈব চতুঃশ্রুতিক এব চ।
স্বরপ্রয়োগঃ কর্ত্তব্যো বংশছিদ্রগতো বুধৈঃ॥

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বাঁশীর ছিদ্রগত স্বরসমূহ দ্বিশ্রুতি, ত্রিশ্রুতি ও চতুঃশ্রুতিরূপ নয়টি শ্রুতির দ্বারাই প্রয়োগ করে থাকেন।

ভরতও বলে গেছেন—

দ্বিক্ ত্রিক্ চতুষ্কাস্তু জ্ঞেয়া বংশগতাঃ স্বরাঃ।
কম্পমানার্ধ মুক্তাশ্চ ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলি স্বরাঃ।
ইতি তাবন্ময়া প্রোক্তাঃ সমীচ্যঃ শ্রুতয়ো নব॥

অর্থাৎ, কম্পমান, অর্দ্ধমুক্তাঙ্গুলি ও ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলি ভেদে বংশীধ্বনি দুই তিন ও চার শ্রুতিবিশিষ্ট (২+৩+৪=৯) সুতরাং শ্রুতির সংখ্যা নয়। এখানে শ্রুতি স্বর একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন কাব্যের উৎপত্তি হয়েছিল আগে এবং সেই কাব্যকে ভাল করে বুঝতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাকরণের পরে; তেমনি, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সর্বাগ্রে পাওয়া গিয়েছিল ভাষাহীন জীবের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ বা চীৎকারকে। সেই সব শব্দ বা চীৎকারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়েই পাওয়া গিয়েছিল স্বরকে; তারপরে, সেইসব স্বরকে অনুশীলন করতে গিয়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল শ্রুতি—অর্থাৎ যা শুনতে পাওয়া যায় এবং শুনে বুঝতে পারা যায়। সুপ্রাচীন যুগের সঙ্গীতবিদ্‌গণ এই শ্রুতিকেই স্বর হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ স্বর ও শ্রুতি আদিতে ছিল অভিন্ন, পরে আবিষ্কৃত হয় এই শ্রুতির সংখ্যা ২২। বর্তমানের ফিজিসিস্টরাও এই ২২ শ্রুতির চিরন্তন অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে, সাঙ্গীতিক বিবর্তনের কল্যাণে ২২ শ্রুতির মধ্যে স্বরের স্থানগুলি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। বলা-বাহুল্য, নামের দিক্ দিয়ে পার্থক্য বজায় রাখলেও, শ্রুতি ও স্বর মূলতঃ একাত্ম। গান-বাজনার প্রয়োজনে যে শ্রুতিটির ওপর আমরা ক্ষণকালের জন্যও স্থির হয়ে থাকতে পারি, সেই শ্রুতিটিই স্বর নাম গ্রহণ করে থাকে; বাকি শ্রুতিগুলি উক্তস্বরের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরগুলিকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভূমিকার মধ্যে গ্রন্থকার কয়েকজন সঙ্গীতশাস্ত্রকার ও কয়েকটি সঙ্গীত গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন। যথা:—

সোমেশ্বর—ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্র (২০০-১০০ খৃঃ পূঃ?) বিরচিত হবার পর, যে সকল সঙ্গীত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশের মধ্যেই সোমেশ্বরের উদ্ধৃতি দেখা যায়। মনে হয়, ১ম খৃষ্টাব্দ থেকে ১২-শ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে চারজন সোমেশ্বরপ্রখ্যাত হয়েছিলেন সঙ্গীততত্ত্ববিদ সঙ্গীতাচার্য-রূপে। একজন চতুর্থ সোমরাজও সোমেশ্বর নামে উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু সোমেশ্বর বিরচিত কোন সঙ্গীত গ্রন্থের পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি।

হনুমান। ঋষি হনুমন্তই কালক্রমে হনুমান্-এ পরিণত হয়েছিলেন। বিভিন্ন সঙ্গীত গ্রন্থে "আঞ্জনেয়" কথাটিও উল্লিখিত হয়েছে ঋষি হনুমন্তের অপর নাম হিসাবে। ইনি অবশ্যই একজন প্রণম্য সঙ্গীতবিদ্ সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। না হলে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে এদেশের সঙ্গীতবিদগণ তাঁকে স্মরণ করতেন না। মনে হয় ইনি ভরতের (২০০—১০০ খৃঃ পূঃ? সমসাময়িক-কালে কিংবা অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আইন্-ই-আকবরীতেও আবুল ফজল 'হনুমান মতের' উল্লেখ করেছেন; কিন্তু কী ছিল সেই হনুমন্ত-মত্ জানা যায় না শুধু সেইটুকু; কারণ এঁর বিরচিত কোন সঙ্গীত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না।

নাদ-পুরাণ—প্রধান সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই, আজও "নাদ-পুরাণ-মত" "হনুমান-মত" "ইন্দ্রপ্রস্থ-মত" "সোমেশ্বর-মত" "নারদ-মত" "ভরত-মত" "শিব-মত" প্রভৃতি অনেক রকমের "মত-এর" কথা উল্লেখ করে নিজেদের ঘরাণার শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হ'লে কিছুই বলতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, সুদূর অতীতে সম্ভবত, নাদ-পুরাণ নামক একটি গ্রন্থপ্রচলিত ছিল—যার সম্বন্ধে আমরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারি নি।

সঙ্গীত দর্পণ—১৬২৫-৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লক্ষ্মীধর ভট্টের পুত্র দামোদর ভট্ট সঙ্গীত দর্পণ রচনা করেন। সঙ্গীত ছাড়াও ভরত-নাট্যম্ নৃত্য সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য সঙ্গীত দর্পণে পাওয়া যায়। সঙ্গীত দর্পণ গ্রন্থখানি সঙ্গীত-বিদ্দের নিকট একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থরূপে গ্রাহ্য হয়ে থাকে এবং চেষ্টা করলে আজও চাক্ষুস করা যেতে পারে।

দামোদর—সঙ্গীত দামোদর নামক গ্রন্থখানি কোন শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শুভঙ্কর নামক সঙ্গীতজ্ঞানী দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—সঙ্গীত দামোদর ও হস্তমুক্তাবলী। সঙ্গীত দামোদরের মধ্যে এমন কিছু বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে যা পাঠ করে মনে হয়

গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন এবং বাঙলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তনগান সম্বন্ধে বিশেষভাবেই অবহিত ছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দামোদর সেন নামক আর একজন বাঙালী গ্রন্থকারও সঙ্গীত দামোদর নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন (বরোদা লাইব্রেরীর ৬১ সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে উদ্ধৃত) ১৫২০ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং দামোদর সেন-কৃত কিছু সাঙ্গীতিক বিষয়বস্তু শুভঙ্কর-কৃত সঙ্গীত দামোদরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। যাই হোক শুভঙ্কর-কৃত সঙ্গীত দামোদর নামক গ্রন্থখানি বর্তমানে সুলভ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের রিসার্চ সিরিজের ১১শ সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে।

রত্নাকর—শাঙ্গদেব-কৃত সঙ্গীত রত্নাকর সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার অবকাশ নেই। ১২১০ থেকে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এই বিরাট গ্রন্থটিকে পরবর্তীকালের সকল সঙ্গীতজ্ঞানীই মাথার মণি করে রাখেন—ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে শাঙ্গদের-কৃত সঙ্গীত রত্নাকরের টিকা-ভাষ্য করেছেন একাধিক সঙ্গীতবিদ্; তাঁদের মধ্যে রাজা সিংহ ভূপাল (১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ) ও চতুর পণ্ডিত কল্লিনাথ (১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) আজও প্রণম্য হয়ে আছেন।

মকরন্দ—সঙ্গীত মকরন্দ নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন নারদ। ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পাঠ করলে জানা যায়, একাধিক নারদ সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছিলেন। যেমন, শিক্ষাকার নারদ, মকরন্দকার নারদ, সংহিতাকার নারদ, পঞ্চমসারসংহিতাকার নারদ, চত্বারিংশচ্ছত—রাগনিরূপনম্-কার নারদ প্রমুখ। সঙ্গীত মকরন্দকার নারদকে অনেকে দ্বিতীয় নারদরূপে অভিহিত করেছেন—প্রথম নারদ ছিলেন ভরতেরও পূর্ববর্তী শিক্ষাকার নারদ। দ্বিতীয় নারদ ছিলেন ৭ম-৮ম শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রকার। আজকের দিনেও আমরা যে রাগ-রাগিনী পরিবার; স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব প্রভৃতি রাগ; রাগ-রাগিনী গাইবার সময় প্রভৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকি, সেইসব বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট উল্লেখ ও উদাহরণ সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয় সঙ্গীত মকরন্দ গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২য় নারদের সমসাময়িক কালেই সঙ্গীতাচার্য বোধি সেন কয়েকজন শিষ্য সেবক নিয়ে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে গমন করেন এবং জাপানীদের সঙ্গীতকে সাধ্যমত একটি বিজ্ঞানসম্মতরূপ প্রদান করেন। বোধি সেন ছিলেন একজন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সঙ্গীতবিদ্। জাপানে অবস্থান করেছিলেন তিনি ৭৬০ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত। যাইহোক সঙ্গীত মকরন্দ নামক গ্রন্থটি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে, বরোদা রাজ-লাইব্রেরী থেকে শ্রদ্ধেয় মংগেশ রামকৃষ্ণ তেলাঙ-এর সম্পাদনায় সঙ্গীত মকরন্দ প্রকাশিত হয়েছিল। এঁর পরে আর কেউ সঙ্গীত মকরন্দ প্রকাশ করেছেন কিনা জানতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, "সঙ্গীত মকরন্দ" নামক আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত দক্ষিণী সঙ্গীতাচার্য "বেদ" ১৭শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে। বেদ ছিলেন সঙ্গীত দর্পণ রচয়িতা দামোদর ভট্টের পুত্র অনন্ত ভট্টের শিষ্য।

মান-কুতুহল—ধ্রুপদ গীতি পদ্ধতির জনক, গোয়ালিয়রের রাজা মান তোমার (১৪৮৬-১৫১৬ খৃঃ) ও তাঁর পত্নী রানী মৃগনয়নীর উদ্দেশে ভারতবর্ষের সঙ্গীত প্রেমীগণ আজও প্রণাম জানিয়ে থাকেন। রাজা মান-কুতুহল গ্রন্থটি ঠিক কবে বিলুপ্ত হয়েছিল বলা মুস্কিল। মান কুতুহলে আলোচিত কিছু কিছু বিষয়বস্তু ফকীরুল্লা (১৬৬৬—?) বিরচিত রাগ-দর্পণ গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায় এবং এই রাগ দর্পণের বিষয় বস্তুকে পাওয়া যায় স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র বিরচিত মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা গ্রন্থটির মধ্যে। গ্রন্থকার স্বর্গত রাধামোহন সেন মান-কুতুলের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ফকীরুল্লা বা তাঁর রাগ দর্পণের উল্লেখ করেন নি—এটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

সভা-বিনোদ—সঙ্গীত বিনোদ নামক একটি গ্রন্থের কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু সভা-বিনোদ নামে কেউ কিছু লিখে গিয়েছিলেন কি না জানি না।

পারিজাতক—সঙ্গীত পারিজাতক গ্রন্থটির রচয়িতা কৃষ্ণ পণ্ডিতের পুত্র অহোবল। পারিজাতের মধ্যে এইটুকু ছাড়া গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অহোবল কোন শতাব্দীর গ্রন্থকার ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্বর্গত ভাতখণ্ডেজী প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলে গেছেন অহোবল সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু অহোবল তাঁর গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছু বিষয়বস্তুর আলোচনা করে গিয়েছেন যা যথাযথভাবে অনুধাবন করলে সন্দেহ জাগে—অহোবল পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ সঙ্গীত পারিজাতই সর্বপ্রথম গ্রন্থ যার মধ্যে বীণাতন্ত্রীর সাহায্যে ২২টি শ্রুতিকে চেনবার উপায় নির্দেশ করা হয়েছে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুশীলনকারীদের পক্ষে সঙ্গীত পারিজাত একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটি বর্ত্তমানে দুর্লভ নয়। বাঙলাটিকা ভাষ্যসহ মৎ-কৃত সঙ্গীত পারিজাত এখন সুলভ।

দুর্গা—দুর্গাশক্তি ছিলেন সুপ্রাচীন যুগের একজন সঙ্গীতজ্ঞানী। এঁর রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় আমরা অবশ্য পাইনা; কিন্তু সঙ্গীত রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃতি আছে।

সরস্বতী—সঙ্গীত সাহিত্য প্রভৃতি কলা-বিদ্যা-বিজ্ঞানের আরাধ্যা দেবী। এঁকে কোন গ্রন্থকর্ত্রীরূপে কল্পনা করলে ভুল করা হবে।

নারদ—সঙ্গীত মকরন্দ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নারদ ছিলেন একাধিক। গ্রন্থকার এখানে কোন নারদের কথা বলেছেন, বোঝা যাচ্ছে না।

ভরত—নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। ভরত তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সঙ্গীতের আলোচনা করেছিলেন প্রাসঙ্গিক বিষয়-বস্তু হিসাবেই—যদি না করতেন, তাহলে সঙ্গীত রত্নাকরের মতো গ্রন্থ পরবর্তী যুগে আদৌ রচিত হতো কিনা সন্দেহ। নাট্যশাস্ত্র ছাড়াও নাট্যসূত্র নামক আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ভরত এবং সেই গ্রন্থটি যে সঙ্গীত রত্নাকরের (১২১০-৪৭ খৃঃ) আমলেই লুপ্ত হয়ে যায় নি, তার প্রমাণ গ্রন্থকার সার্ঙ্গদেব রেখে গেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভরতের শিষ্য-সেবক বৃন্দের মধ্যে অনেকেই নিজের নামের সঙ্গে ভরত কথাটি জুড়ে দিয়েছিলেন, যেমন, নন্দীকেশ্বর-ভরত, তণ্ডু-ভরত', প্রমুখ। জানা যায়, ভরতাচার্য নামক একজন সঙ্গীতবিদ্ 'আদি ভরতম্,' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কশ্যপ, কলানাথ, তম্বরু, অশোষ, দেসা, হো হো, কোহল, হা হা, হুহু, রাবণ, অর্জ্জুন প্রমুখ যে সকল সঙ্গীতজ্ঞের নামোল্লেখ করেছেন গ্রন্থকার রাধা-মোহন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র "কলানাথ" ছাড়া আর সকলেই ছিলেন সুপ্রাচীনযুগের সঙ্গীত-জ্ঞানী। পরবর্তীযুগের সঙ্গীত গ্রন্থাদির মধ্যে এঁদের সাঙ্গীতিক অভিমতের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে মাত্র; কিন্তু গ্রন্থাদির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কলানাথ নামক জনৈক গন্ধর্বর উল্লেখ আমরা দেখেছি; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানতে পারি নি। আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার রাধামোহন এখানে কলানাথের উল্লেখ করেছেন, সঙ্গীত রত্নাকরের অন্যতম টিকাকার চতুর পণ্ডিত কল্লিনাথকে (১৪৫৬-১৪৭৭ খৃঃ) লক্ষ্য করেই। অর্জ্জুন বিরচিত "অর্জ্জুন ভরতম্" নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় বরোদা রাজ-লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত (১৯২০ খৃঃ) নারদ বিরচিত সঙ্গীত মকরন্দ গ্রন্থের অতিরিক্ত গ্রন্থসূচীর মধ্যে ৪-র্থ সংখ্যক গ্রন্থরূপে।

গানের প্রামাণ্য

সৃষ্টি প্রক্রিয়া

যে রূপে গানের সৃষ্টি　　　জ্ঞান-চক্ষে কর দৃষ্টি,
যোগ-সাধনার ন্যায় গান।
অসাধ্য সাধন নয়,　　　অনায়াসে সিদ্ধি হয়,
নাদ শব্দ ইহার প্রমাণ ॥ ১

সেই নাদ হৈতে বেদ,　　　শুন তার পরিচ্ছেদ,
মহাশূন্যে হৈল এক শব্দ।
সে শব্দপ্রণবময়,　　　তারে নাদ-বিন্দু কয়,
শুনি দেবগন হৈলা স্তব্ধ ॥ ২

প্রণব শব্দ বিধান,　　　দ্বিজের প্রতি নিধান,
অন্য পক্ষে অনুচ্চার্য্যমান।
তথাপি তাহার ভাবে,　　　অতি কৌশল প্রভাবে,
বুঝাইব রচনা-প্রমাণ ॥ ৩

কেন বুঝাইতে চাই,　　　তাহার কারণ জানাই,
মনোযোগ সকলে করহ।
সর্ব্ব জীবেরো অন্তরে,　　　প্রণব গগন-ভরে ;
বিরাজ করেন বায়ু সহ ॥ ৪

বরফ এখনি তবে,　　　পরীক্ষিয়া দেখ সবে,
শুহ্ম কথা হইবে প্রচার।
করে আচ্ছাদি শ্রবণ,　　　করি মুদ্রিত নয়ন,
মনন করহ একবার ॥ ৫

যথার্থ প্রণব-ধ্বনি,　　　শুনিতে পাবে এখনি,
অবিরোধে হবে হৃদিবোধ।
সবার হৃদয়ে যাহা,　　　রচিতে কি দোষ তাহা
বিতর্কের নাহিক বিরোধ ॥ ৬

অকার উকার নাদ,　　　ম-কার শব্দ সম্বাদ,
এ চারি প্রণব-জন্মদাতা।
বিষ্ণু সে অ-কার-স্বর,　　　উ-কারেতে মহেশ্বর,
নাদ শক্তি ম-কার বিধাতা ॥ ৭

অ-কার পরে উ-কার,　　　সন্ধি পায়্যা গুণ তার,
দুয়ে মিশি হইল ও কার।

শিরে নাদ অর্দ্ধ ইন্দু, তাহাতে ম-কার বিন্দু,
এইরূপ প্রণব আকার ॥ ৮

বর্ণরূপী দেবগন, পাবে তার বিবরণ,
একাক্ষর-কোষ-অভিধানে।

অ-কেশব উ-শঙ্কর, ম-ব্রহ্মা তাহার পর,
নাদ শক্তি তন্ত্রের প্রমাণে ॥ ৯

সেই নাগে পঞ্চভূত, সর্ব্ব জীবে আবির্ভূত,
বিশেষ করিয়া বলি তায়।

পরমাত্মা মহাশূন্য, মহাশূন্য হৈতে শূন্য,
শূন্য হৈতে বায়ুর সঞ্চার ॥ ১০

বায়ু হৈতে তেজবিতি, তেজে জল—জলে ক্ষিতি
এই পঞ্চ পঞ্চগুণে বদ্ধ।

বিবরিয়া কহি পুনঃ, এ পাঁচ ভূতের গুণ,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ॥ ১১

শব্দ গুণ গগনের, স্পর্শ গুণ পবণের,
রূপ গুণ তেজের ভূষণ।

রস গুণ জল ধরে, গন্ধ গুণ ক্ষিতি পরে,
পরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ॥ ১২

শ্রবণেতে শব্দবোধ, ত্বচে স্পর্শ অনুরোধ,
চক্ষে রূপ—এরূপ সম্বন্ধ।

রসনায় রসজ্ঞান, আঘ্রাণের গুন ধ্যান,
নাসিকায় বোধ হয় গন্ধ ॥ ১৩

এই পঞ্চ ভূতময়, চরাচর সৃষ্টি হয়,
নাদ-বিন্দু জীবেতে সঞ্চার।

নাদ-বিন্দু জান্যো এই, জীব-আত্মা যেই-সেই,
প্রতিবিম্ব পরম আত্মার ॥ ১৪

নাদের দুই প্রকৃতি, অকৃতি আর সুকৃতি,
পুনঃ তারা দুই নাম ধরে।

অকৃতি সে ধ্বন্যাত্মক, সুকৃতি সে বর্ণাত্মক,
বিবরণ পাইবেন পরে ॥ ১৫

ধ্বন্যাত্মক ধ্বনি তারা,　　　নার্থ সার্থ দুই ধারা,
　　নার্থ সেই—অর্থ নাহি যায়।
এই তার নিদর্শন,　　　কি আঘাত কি পতন,
　　যেমন এমন অভিপ্রায় ॥১৬
আঘাতে সে শব্দ হয়,　　　সে শব্দ অর্থীয় নয়,
　　শব্দবোধ মাত্র সে কেবল।
পতনে যে শব্দ পাই,　　　সে শব্দেরো অর্থ নাই,
　　এই মত বুঝিবে সকল ॥১৭
সার্থ বলি তারে কয়,　　　যে শব্দের অর্থ হয়,
　　বাদ্যাদির বর্ণন যেমন।
সুমৃদঙ্গ জয় ঢাক,　　　তাধিধুন্না কিটিতাক্,
　　ঝমক ঝমক ঝাঁ ঝাঁ ঝন ॥১৮
বর্ণাত্মক শব্দ যারা,　　　নিরাকার হয় তারা,
　　প্রতিমূর্ত্তি পঞ্চাশ প্রকার।
অ-ক আদি বর্ণগণ,　　　স্বরে হলে বিশেষণ,
　　সকল শাস্ত্রের মূলাধার ॥১৯
শ্রুতি স্মৃতি দরশন,　　　অভিধান ব্যাকরণ,
　　পিঙ্গলাদি যাহাতে প্রকাশ।
আগম-তন্ত্র-পুরাণ,　　　কাব্য জ্যোতিষ নিদান,
　　বিরচিত কবি সেনদাস ॥২০

(ক্রমশঃ)

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

পাকিস্তানের কবি ফৈয়জ আহম্মদ ফৈয়জের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার। বর্তমান পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফৈয়জ আহম্মদ ফৈয়জ সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন। এসেছিলেন অবশ্য রাশিয়ার আলমা-আতা থেকে সাজ্জাদ জাহীরের মৃতদেহের সঙ্গে। সাজ্জাদ ছিলেন তাঁর সুদীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহকর্মী। রাওয়ালপিণ্ডি কন্‌স্পিরেসি কেসে তিনি এবং সাজ্জাদ একই সঙ্গে কারা জীবন যাপন করেন। ফৈয়জ আহম্মদ ফৈয়জের আরো একটি পরিচয় আছে। তিনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত আছেন। তাঁর স্বল্পকালীন দিল্লি অবস্থানের সময়ে এই সাক্ষাৎকায় গৃহীত হয়।

প্রশ্ন: আপনিতো এর আগেও কয়েকবার ভারতে এসেছেন। কিন্তু এবার এসেছেন শোকার্ত মন নিয়ে। আপনি যখন এখানে এসেছেন, তখন পাক-ভারত বন্দী বিনিময় নিয়ে কথাবার্তা চলছে যাতে এই উপমহাদেশে একটা শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। আচ্ছা, পাকিস্তানের লেখক সমাজ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য কেমন আগ্রহী?

উত্তর: নাম করে বলা যাবেনা। কিন্তু আমার দেশের লেখকরা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য খুবই আগ্রহী। তাঁরা চান, আরো উন্নত জীবন যাপন। এবং তা সম্ভব একমাত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই।

প্রশ্ন: মাত্র কিছুকাল আগেও ভৌগোলিক ম্যাপে এই উপ মহাদেশের অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম। কিন্তু দেশ এখন বিভক্ত। তবু একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভারত ও পাকিস্তান—এই দুই রাষ্ট্র প্রতিপালিত। অথচ এই রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগের পথ নেই। এ ব্যাপারে পাকিস্তানী লেখকদের মনোভাব কেমন?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বাস্তবতাকেই প্রথম মেনে নিতে হবে। এই বিরাট উপ-মহাদেশের সাংস্কৃতিক ধারা খুবই বিচিত্র। এমনকি, পাকিস্তানেও বহু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বর্তমান। আজকের

পাকিস্তানী সংস্কৃতির উদ্ভব মূলতঃ সিন্ধু সভ্যতা থেকে। এর মধ্যে প্রভাব পড়েছে অনেকের। পাকিস্তানী লেখকরা এভাবেই বিষয়টাকে ভাবেন বলে আমার ধারণা।

প্রশ্ন : 'দন্তে সাদা' বইতে আপনি লিখেছেন যে প্রতিটি ভাল লোকই কমিটেড হবেন। এ সম্বন্ধে আপনার বর্তমান অভিমত কি?

উত্তর : প্রতিটি লেখকই কোনও না কোনও ভাবে কমিটেড। তবে হ্যাঁ, কারও বিশেষ কমিটমেণ্ট অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। নিজের বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করা যায়, এই পর্যন্ত। আমরা যখন লিখতে আরম্ভ করি অর্থাৎ আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে তখন সমগ্র উপমহাদেশটিই ছিল সাম্রাজ্যবাদের অধিকারে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বহু দেশই ছিল পরাধীন। কিন্তু আজ আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের অতি সামান্য অংশ ছাড়া কোথাও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়। চাই The basic rights enumerated in the human charter are freedom from hunger, freedom from fear, freedom from want and the freedom from forcible occupation of your bodies and minds. অবশ্য পৃথিবীর কোথাও কোথাও ওই ধরণের স্বাধীনতা এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত প্রকার শোষণের অবসান না হলে এই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : এবার অন্য প্রসঙ্গে যাই। আপনিতো সবেমাত্র আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন থেকে এলেন। এই সম্মেলন সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন ঠিক অন্যান্য লেখক সম্মেলনের মত নয়। The purpose of this conference is to give a Tongue to the writers of Afro-Asian countries. The main purpose of this gathering is to find out in what language the writer in Mozambieque or kenya finds expression-এর দ্বারা কিছু প্রতিপন্ন হয় না যে, এই সংস্থা ইউরোপীয় বা আমেরিকান লেখকদের বিরোধী সংস্থা।

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনার কাব্য সাধনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করি। আপনার কাব্য ভাবনায় কোন কোন বিদেশী কবি প্রভাব বিস্তার করেছেন ?

উত্তর : হাফিজ এবং গালিবের একটা বিরাট প্রভাব আমার উপর আছে। পাশ্চাত্যের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন আমার রচনায় রবার্ট ব্রাউনিং। আমিও আঙ্গিক রচনায় অনেকটা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিকের মধ্যে লুই ম্যাকশিস আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাঁকে মনে হয়, The greatest technicians of words. From him I learnt not tricks but skill. এরপর নাম করতে হয় তুর্কী কবি নাজিম হিকমতের। আমরণ তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমায় বলেছিলেন, 'After all what you need is rhythm; and everyday language has its own rhythm. আমিও এ মতে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন : কোথাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে বলে আমার জানা নেই। পাকিস্তানের অবস্থাও একই রকম। তবে কখনও কখনও ব্যবস্থা একটু শিথিল হয়। When I was running the Pakistan Times, I can say it was comparatively free because the establishment was more secure. এরপর একটা দীর্ঘ সময় গেছে, যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। সোজা কথায়, ধনতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—এবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট লেখক প্যাটরিক হোয়াইট। গত কয়েক বছর ধরেই তাঁর নাম শোনা যাচ্ছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সম্মানিত করে সুইডিস আকাদমি একালের একজন বিশিষ্ট লেখককেই সম্মানিত করলেন, বলা যেতে পারে।

প্যাটরিক হোয়াইটের বর্তমান বয়স ৬১ বৎসর। তাঁর পুরস্কৃত গ্রন্থের নাম আয়রণিক। প্যাটরিক কাব্য, নাটক, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর প্রধান পরিচয়, তিনি একজন ঔপন্যাসিক। তাঁর জন্ম হয় লণ্ডনে। শিক্ষাজীবনও কাটে লণ্ডনেই। তাঁর

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে। তাঁকেও যোগ দিতে হয় বৃটিশ বিমান বিভাগে গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে। যুদ্ধের পরই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে যান অস্ট্রেলিয়ায়।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে দি লিভিং এণ্ড দি ডেড, দি আণ্টস স্টোরি', 'দি ট্রি অব ম্যান প্রভৃতি উল্লেখ্য। পরবর্তী কোন সংখ্যায় তাঁর সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছে রইল। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

ভারতীয় কবিতার মালয়ালম সংকলন —কেরালার অন্যতম প্রখ্যাত পত্রিকা অক্ষরম্ এর বর্তমান সংখ্যাটি স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতীয় কবিতার সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এমন সুন্দর পত্রিকা কদাচিৎ দেখা যয়ে। বাংলা থেকে যাঁদের কবিতা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁরা হলেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, সতীকান্ত গুহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য ও আশিস সান্যাল। পত্রিকাটির আরম্ভ হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলা কবিতা শীর্ষক একটি বিরাট প্রবন্ধের অনুবাদ দিয়ে। অন্যান্য ভাষার যাঁরা এই সংকলনে অনূদিত হয়েছেন তাঁরা হলেন—হিন্দির দিনকর অজ্ঞেয়, ধর্মবীর ভারতী, ভারতভূষণ অগ্রবাল, শ্রীকান্ত ভার্মা, গুজরাটির উমাশঙ্কর যোশি, সুরেশ যোশি, রঘুবীর চৌধুরী, পাঞ্জাবীর অমৃত প্রিতম, প্রাভজত কাউর, মোহন সিং, ওড়িষ্যার রমাকান্ত রথ, সীতাকান্ত মহাপাত্র, সৌভাগ্য মিশ্র এবং অন্যান্য ভাষার বিশিষ্ট কবিরা। প্রখ্যাত কয়েকজন হলেন নবকান্ত বরুয়া, বেন্দ্রে, দিলীপ চিত্রে, এম গোবিন্দ, কা-না সুব্রহ্মনিয়ম। বাংলা বিভাগটি অনুবাদ করেছেন এম. রামাদেবম্।

পরলোকে ডঃ তারাচাঁদ—বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদ সম্প্রতি এলাহাবাদে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। তিনি এক সময়ে ইরানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

কলকাতায় চেক লেখক—চেকোস্লোভাকিয়ার বিশিষ্ট লেখক হারম্যান ক্যালক সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। গত ১৯ অক্টোবর হিন্দুস্থান রোডে সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় তিনি কলকাতার বিশিষ্ট কবি লেখকদের সঙ্গে মিলিত হন। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। তিনি উপস্থিত লেখকদের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন।

শ্রীক্যালক কর্মসূত্রে প্রকাশন ও মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। তিনি তাঁর দেশের লেখক সঙ্ঘেরও একজন সক্রিয় সদস্য। লেখক হিসেবে তাঁর প্রধান অবদান শিশু সাহিত্যে। সেদিনের আলোচনায় চেক ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীকান্ত গুহ, মণীন্দ্র রায়, দিলীপকুমার সেনগুপ্ত, সুধী-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শুভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরো অনেকে।

সুধীন্দ্রনাথের জন্মদিনে—গত ৩০ অক্টোবর কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্মদিনে পুরোগামী'র উদ্যোগে কলকাতার রেণেসাঁ ক্লাবে একটি সাহিত্য সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীআশিস সান্যাল।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন হালদার কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, একালের তরুণ কবি লেখকরা সুধীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত কাব্যাদর্শকে তেমন মূল্য দেন না।' তিনি সুধীন্দ্রনাথের জীবন ও মননশীলতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীসান্যাল বলেন, সুধীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে একালের তরুণ কবি লেখকদের অনেক শেখবার আছে।' শ্রীদীপক গুহরায় বিস্তৃতভাবে সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা করেন। মণি দাশগুপ্ত, নলিনী সেন, রুণু চৌধুরীও সভায় ভাষণ দেন। সভার আর একটি আকর্ষণ ছিল সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ! এতে অংশ গ্রহণ করেন শুভ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ কাওসর জামাল প্রমুখ।

বিহার হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত—বিহার হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের নতুন সভাপতি শ্রীগঙ্গাশরণ সিং গত ২১ অক্টোবর পাটনায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বলেন, হিন্দিভাষী জনসাধারণের সঙ্গে বিশেষতঃ লেখকদের সঙ্গে অ-হিন্দিভাষী লেখকদের একটা যোগসূত্র স্থাপন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অ-হিন্দিভাষী লেখকদেরকে হিন্দিভাষী অঞ্চলে আমন্ত্রণ জানান হবে। এ বছর আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরল থেকে তিনজন লেখক আমন্ত্রিত হয়েছেন।

সর্ব-ভারতীয় মারাঠি লেখক সম্মেলন—গত ২১ ও ২২ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের মোতমলে সর্ব-ভারতীয় মারাঠি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট মারাঠি লেখক জি. ডি. মুদগালকর। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যবন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন, 'সমাজ যে-সব সমস্যার সম্মুখীন, লেখকদের উচিত তা নিষ্ঠাসহকারে তুলে ধরা।' তিনি আরো বলেন যে, মারাঠি লেখক সংস্থা যেন অন্যান্য ভাষার

যে সাহিত্য আন্দোলন চলছে তার সঙ্গে পরিচিত হন। ভারতের সংহতির পক্ষে এ নিতান্ত জরুরী।

সভায় প্রায় শতাধিক সাহিত্যিক যোগ দেন।

লোটাস পুরস্কার—আফ্রো-এশীয় লেখক সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছরই এশিয়া এবং আফ্রিকার তিনজন বিশিষ্ট লেখককে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৭১-৭২ সালে যাঁদেরকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁদের মধ্যে আছেন মিশরের প্রখ্যাত লেখক ডঃ তাহা হোসেন, সেনেগালের কবি এম. ওসমার সেখবেনে, মঙ্গোলিয়ার লেখিকা সোনোয়াম উদভাল, জাপানের কবি হিরোশি হুমা প্রমুখ।

কোন কোন পত্রিকায় এই মর্মে ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়। যাই হোক, পুরস্কৃত লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলেন মিশরের ডঃ তাহা হোসেন। তাঁকে বলা হয়, আধুনিক আরবী সাহিত্যের জনক। জন্ম ১৮৮৯ খৃঃ। শৈশবেই দৃষ্টিশক্তি হারান। কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে আরবী ও প্রাচীন সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। 'আছ ছিয়াচুত' পত্রিকায় এই বিষয়ে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর 'অল্ আদার অল্ জাহিলি' অর্থাৎ প্রাক্ ইসলামী বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সূত্রপাত হয়। ১৯৩২ সালে মিশরে যে রয়েল ফিললজিক্যাল একাডেমি গঠিত হয়, তিনি ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁর আর একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ হল, 'মুস্তাকবাল অল-তাকাকা কি মিশর অর্থাৎ মিশরের ভবিষ্যৎ।

মঙ্গোলিয়ার লেখিকা সোনোয়াথ উদভাল আন্তর্জাতিক নারী প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। লেখিকা হিসেবে এর আগে তিনি লিয়েন হুয়া পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গল্প সংকলন—'আমরা আবার মিলিত হব' তাঁর দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেনেগালের লেখক ওসমার সেখবেনের কোন বিস্তৃত পরিচয় আমার জানা নেই। জাপানী কবি হিরোশী সুমার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সুযোগ আমার ঘটেছিল। আধুনিক জাপানী প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিনি অন্যতম পুরোধা।

মিশরে বাঙালী লেখকের প্রবন্ধ—মিশরের বুদ্ধিজীবীদের উপর লেখা আশিস সান্যালের একটি প্রবন্ধ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে একটি বিশিষ্ট দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কায়রো থেকে প্রকাশিত লোটাস পত্রিকায়। মূল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল কালি ও কলম-এ বেশ কয়েকমাস আগে।

বাক্‌-সাহিত্য
প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

চৌরঙ্গী * মানচিত্র / শংকর
হসন্তী / * শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
* মসিরেখা / জরাসন্ধ
গল্প সম্ভার / বিমল মিত্র
প্রণয় পাশা / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
* অহল্যা রাত্রি / নমিতা চক্রবর্তী
কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী / সত্যেন্দ্র
নাথ দত্ত * অপ্রকাশিত রচনাবলী /
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * ভবঘুরে ও
অন্যান্য / সৈয়দ মুজতবা আলী
বিশ্ববিবেক / অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত
* আমার জীবন / মধু বসু
রবীন্দ্রায়ন ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড /
পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
নাটক •
দাবী • শর্মিলা • সীমা / দেবনারায়ণ গুপ্ত
লেবেডেফ / ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
একক দশক শতক • সাহেব বিবি গোলাম /
বিমল মিত্র • শরৎনাট্যসংগ্রহ ১ম • ২য় • ৩য়
খণ্ড / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্রাট / রতনকুমার ঘোষ

Regd. C 208 Rs. 1·00. For Bangladesh & outside India Rs. 1·50
OCTOBER, 1973 * Kartick 1380 B.S.

সাহিত্য ও
সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা

এপার বাংলা ওপার বাংলা // শংকর
এর নাম সংসার // বিমল মিত্র
নূতন তুলির টান // আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আলোকপর্ণা // নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ব্যাপার বহুতর // ওঙ্কার গুপ্ত
জগদ্দল // সমরেশ বসু
ধর্ম বিজ্ঞান ও শ্রী অরবিন্দ // দিলীপকুমার রায়
বনফুল
আবগারী দারোগার ডায়েরী // সুভাষ সমাজদার
এক বর অনেক কনে // কুমারেশ ঘোষ
তাঞ্জাম // বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
তিন তরঙ্গ, শুধু কথা // চানক্য সেন
পাড়ি // জরাসন্ধ
কচিৎ কখনও // প্রেমেন্দ্র মিত্র
নিশিপদ্ম // তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
প্রাইভেট লিমিটেড।
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯॥

নিয়মাবলী

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বারো টাকা ও
ছ'মাসের জন্য ছ'টাকা অগ্রিম দেয়
রেজেষ্ট্রি ডাকে পেতে হলে পৃথক খরচ দেয়
সাধারণ ডাকে পত্রিকা নিরুদ্দিষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া চলে
গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক
রচনার নকল রেখেই লেখা পাঠাবেন
কোন গোলযোগে রচনা নষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
সঙ্গে ডাকটিকিট থাকলে
অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়
কিন্তু অমনোনীত কবিতা
কখনোই নয়
রচনা সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করা
সম্ভব নয়
পত্রোত্তরে এজেন্সীর নিয়মাবলী
জানানো হয়
পত্রিকার সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা
সবরকম যোগাযোগ ও টাকাকড়ি পাঠানোর ঠিকানা
কালি ও কলম ॥ ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কালি ও কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ সপ্তম সংখ্যা ॥
ফাল্গুন : ১৩৮০ ॥ সূচীপত্র

আমাদের কথা ॥ ৬৯১

প্রবন্ধ

কবিতায় দেহবাদ : মোহিতলাল মজুমদার ॥ চিত্তরঞ্জন পাল ॥ ৬৯৩
সঙ্গীত তরঙ্গ ॥ শচীন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৭৪৩

গল্প

মুখচেনা ॥ বিনয় রায় ॥ ৬৯৯
কুসুমশর ॥ অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ ৭০৭

কবিতা

অপু ॥ সীতাকান্ত মহাপাত্র ॥ ৭৫৩
হে কবি দাম্ভিক হও ॥ আশিস সান্যাল ॥ ৭৫৫
তোমার জন্য ॥ রাণা চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭৫৬

ভ্রমণ কাহিনী

মস্কো থেকে দেখা ॥ কৃষ্ণ ধর ॥ ৭১৯

জীবনী উপন্যাস

অপুর পাঁচালী ॥ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ॥ ৭৫৭
সাহিত্যের খবর ॥ সুচরিতা সান্যাল ॥ ৭৭১

প্রচ্ছদপট—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সহ সম্পাদক : শুভ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রিট কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

। সপ্তম বর্ষ ।
। সপ্তম সংখ্যা ॥
। ফাল্গুন ১৩৮০ ।

আমাদের কথা

হা মোর দুর্ভাগা দেশ!

পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, মাথার উপরে আশ্রয়ের অভাব, নিষ্প্রদীপ গৃহ, লেখাপড়ার কাগজ নাই, হাসপাতালে ডাক্তার নাই, রাস্তাঘাটে যানবাহন নাই। শুধু নাই, নাই, নাই। সবই যখন নেতিবাচক তখন জীবন শুকিয়ে যেতে বাধ্য। আর শুষ্ক জীবনে মনের ফসল কোথা থেকে ফলবে!

কেন এমন হলো? অবস্থা যে ক্রমাগতই ভীষণতর হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চিরকালই ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তন কেন আজও সম্ভব হচ্ছে না। আজও গ্রাম-বাংলায় চণ্ডীমঙ্গলের যুগ: আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান!

সম্প্রতি আমাদের পল্লী অঞ্চল ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল। কী দেখলাম সেখানে? চালের দাম আকাশচুম্বী, অন্যান্য বস্তু তথৈবচ, জংলা সজনের ডাঁটা তাও তিন টাকা কিলো! চাষীর ঘরে পাট পচছে, দাম নেই। ডিজেলের অভাবে জলসেচ বন্ধ, গমের ক্ষেত জ্বলে গেল। তেমনি অন্য রবিশস্য, কুয়াশায় আমের মুকুল নষ্ট হয়ে গেছে। অধিকাংশ লোক অর্ধাহারে, এর মধ্যে তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়ও আছেন। কেরোসিনের অভাবে প্রায় সকল গৃহ নিষ্প্রদীপ, বিজলীবাতি যেখানে আছে তা-ও অর্ধেক সময় জ্বলে না। 'শহর বাজারের অবস্থা অনেক ভালো', বললেন জনৈক শিক্ষক।

মফস্বল শহরেও ঘুরলাম আমরা। 'কী করি বলুন তো?' অনুযোগ করলেন জনৈক মধ্যবিত্ত আধা সরকারি কর্মচারী। কোথায় পাঁউরুটি, কোথায় মাখন, কোথায় কেরোসিন—সারাদিন এই নিয়ে দৌড়োদৌড়ি। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো প্রায় বন্ধ, কাগজ দুর্মূল্য। যুদ্ধ বা মন্বন্তরের সময়েও এমনটি হয় নি। কলকাতায় আপনারা আনেক সুখে আছেন।'

কলকাতায় আমরা অনেক সুখে আছি!

সপ্তাহে তিনদিন নয় কেবল, এখন তো প্রায় রোজই লোড-শেডিং। অফিসে কাজ করা অসম্ভব, বাড়িতে টেঁকা দায়। পাঁচ সাত তলা পায়ে হেঁটে ওঠা অনেকের ক্ষেত্রেই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। গ্যাস নেই, অভাবে কেরোসিন

কোথায় পাওয়া যায় বেশির ভাগ লোকই জানেন না। কয়লা সব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না, এবং কয়লার দামও যথেষ্ট। যানবাহন অর্ধেক দিন বন্ধ : ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, পেলেও তার ভাড়া নাগালের বাইরে। রেশনের চাল-গম অখাদ্য ; খোলা বাজারে তাদের দাম অসম্ভব বেশি। সরষের তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ? যতো কম বলা যায় ততোই ভালো। একটি ছোটো পরিবারের জন্যেও আজ নিত্যকার বাজার খরচ দশ, বারো টাকা। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মাসিক আয় কতো টাকা ?

সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তাঁদের কর্মক্ষমতা এবং সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে তাঁরা কতোটুকু প্রয়াসী, গোটা পরিস্থিতির বিচার করলেই তার উত্তর পাওয়া যাবে। একদিকে পর্বতপ্রমাণ সমস্যা, অন্যদিকে পর্বতপ্রমাণ সরকারি নথিপত্র, এবং সর্বোপরি নিজেদের ও অধস্তন কর্মচারীদের অকর্মণ্যতার বোঝা কিন্তু তাঁরা বেশ সহজেই বহন করে চলেছেন। আর সাধারণ মানুষ নিজেদের সমস্যার বোঝা কষ্টে-স্লিষ্টে বহন করছেন সরকারি ফাঁকা আশ্বাসে নিজেকে ভুলিয়ে, অথবা প্রকাশ্যে হাত কামড়ে।

ঘনায়মান এই অন্ধকারের মধ্যে নেই কোনো রূপোলি রেখার ঝিলিক। অতএব আজকে যদি মনের কোণে অকালমৃত সেই তরুণ কবির বহুশ্রুত লাইন ঝিলিক মারে :

কবিতা তোমায় আজকে দিলেম ছুটি।
ক্ষুধার পৃথিবী কেবলি গদ্যময়·· ···ইত্যাদি,

তাহলে কি আমরা—সৎ-সাহিত্যের দোহারেরা-দলীয় রাজনীতির তিলক দ্বারা চিহ্নিত হবো ?

চিত্তরঞ্জন পাল

কবিতায় দেহ-বাদ : মোহিতলাল মজুমদার

\ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্যে কি গদ্যে কি পদ্যে আমার স্থান কি তাহা আমি জানি এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও জানিবে ; কিন্তু আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছি—কাহারও মনোরঞ্জন করি নাই বলিয়া আমার জীবদ্দশায় আমাকে কেহ আমার প্রাপ্য দিলে না—যাহা দেয় তাহা বাধ্য হইয়া ; কিন্তু আমার তাহাতে দুঃখ নাই। আমি ভগবৎ-নির্দিষ্ট কাজ করিতে জন্মিয়াছিলাম, আমার সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় আমার নয়, তাঁহার—এই বিশ্বাসে সকল দুঃখ সহ্য করিয়াছি।

—(মোহিতলালের পত্র—৩০-৮-১৯৪২)

মোহিতলাল মজুমদার প্রখ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক—তাঁকে অবহেলা বা অস্বীকার করার সুযোগ অথবা ক্ষমতা কারো নেই বর্তমানে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে মোহিতলালের সাড়া-জাগানো প্রথম আবির্ভাব কবি-পরিচয়ে। রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল সেই গৌরবময় যুগে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত। বস্তুধর্মী মননশীলতা তাঁর কবিতার বিশেষ লক্ষণ। যে অতি বলিষ্ঠ জীবনবাদে মোহিতলাল পরম বিশ্বাসী তা মানুষের দেহ নিয়তিকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। 'জগৎ-নাট্যলীলার নায়ক' মানুষকেই তিনি দিলেন সম্মানের সিংহাসন। বাংলা-কবিতার সংস্কার-মুক্তির সাধনায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন রবীন্দ্র-ভাব-কল্পনার বিরুদ্ধে—রচনা করলেন মানুষের দেহ সম্বন্ধ আত্মার মহাভাষ্য।

সুস্থ সবল দেহধর্ম ও প্রাণধর্মের বীর্যবান ঐতিহ্য বাংলা-কাব্যে বিরল নয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতায় দেহকেন্দ্রিক প্রেমের কথাই বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি দীক্ষায় এই প্রেম প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল অতীন্দ্রিয়তা ও বৈরাগ্য সাধনের গৈরিক বসনের অন্তরালে। মধ্যযুগের অবসানে দেহের দেউলে প্রেমের প্রদীপ জ্বাললেন না হেম-মধু-নবীন। বিহারীলালের বিহার ক্ষেত্র হোল দেহারতির জগতের বহুদূরের সৌন্দর্যলোকে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্র প্রতিভার প্রখর প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নেও শোনা গেল 'নিষ্ফল কামনা'র সুর!

দেহকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে করে তুললেন স্পর্শাতীত—"দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন, রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস।' প্রেমের অনেক আশ্চর্য-সুন্দর কবিতা রচনা করলেন তিনি ; কিন্তু প্রেমের বিগ্রহকে করে রাখলেন অশরীরী—'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।' বিস্ময়কর মনে হলেও দেহের মন্দিরে প্রেয়সীকে একবারও আহ্বান জানালেন না কবি। এবং এরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রকাশিত হোল 'কল্লোল' পত্রিকা এবং পত্রিকার বিদ্রোহী কবিগণের দ্রোণগুরুরূপে আসরে অবতীর্ণ হোলন মোহিত-লাল। নিষ্ঠাবান তান্ত্রিকের মতো দেহাত্মবাদী জীবন দর্শনকেই তিনি গ্রহণ করলেন কাব্যের প্রধান বিষয়রূপে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে জীবন মন্দিরে দেহ-দেবতার বন্দনা-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন কবি। অহংবোধের তীব্র প্রকাশে, বীর্যবান ভোগাসক্তির প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণে এবং জীবনের প্রতি সহজিয়া প্রীতির উদ্বোধনে তিনি উন্মোচিত করলেন বাংলা কবিতার নবদিগন্ত। তাঁর বলিষ্ঠতায়, সত্যভাষিতায় ও সংস্কার-রাহিত্যে বিমুগ্ধ হয়ে, আধুনিক নবতর জীবনবোধের পথনির্দেশ লাভ করে, তাঁকে সাদরে গুরুপদে বরণ করে নিলেন কল্লোলের বিদ্রোহী কবিরা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকৃত্রিম পৌরুষের প্রশংসা করে 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে লিখলেন—"এই খ্যাতির কারণ তাঁর অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তারা মারা পালোয়ানি নেই, যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জাবোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে : সাহস আছে, বাহাদুরী নেই।" মোহিতলাল তার কাব্য সাধনাকে বলেছেন—"রুদ্রের সাথে রতির সাধনা।" এই পৌরুষ-বীর্যের দিকটি পরিহার করে রতি সাধনার নামে রিরংসার ক্লেদরতির বাড়াবাড়ি দাপাদাপিকে কোনদিন প্রশ্রয় দেননি তিনি ; বারবার শোণিত আক্রমণের সুতীব্র চাবুক মেরেছেন আদিরস বিকৃতির অপপ্রয়াসকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর প্রশংসা-কীর্তনে অতিশয়োক্তি করেন নি তিলমাত্র—"রবীন্দ্রনাথের জীবন-কালেই তাঁর অমোঘ প্রভাব—এড়িয়ে গিয়ে নয়—আত্মসাৎ করে, বাংলাকাব্যে প্রথম সতন্ত্র নতুন স্বাদ যদি কেউ এনে থাকেন, তাহলে তিনি কবি মোহিতলাল।"

মোহিতলাল জীবনপ্রেমিক রূপতান্ত্রিক কবি। রূপের আধারেই তাঁর অরূপের আরাধনা। শুধু চর্মচক্ষেই নয়, মর্মদৃষ্টিতে তিনি পৃথিবীর রূপরস-বর্ণগন্ধের পূজারী। এই দৃষ্টি প্রেমের দৃষ্টি, য়ুরোপীয় ভাবাদর্শে রোমান্টিক কবিদৃষ্টি। বাস্তবের সঙ্গে বাস্তবাতীতের প্রত্যয়গ্রাহ্য সার্থক মিলনেই এহেন

দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা। কারণ সৃষ্টির সকল সৌন্দর্যের মূলেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রেমের দেবতার অনিবার্য অবস্থান। মনুষ্যত্বের মর্মমূলেও এই প্রেমেরই জাগ্রত চেতনা। The soul is not where it lives, but where it loves. এই প্রেমেরই শক্তিতে মানুষ অতুল বলশালী হয় এবং দেবত্বের মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করে। মোহিতলাল এই অপরাজেয় মানবশক্তির পূজারী। তাঁর বিখ্যাত 'কালাপাহাড়' কবিতাটি মানুষের অসামান্য পৌরুষের উদাত্ত জয়গান—আধুনিক বাংলাকাব্যের শ্রেষ্ঠ মানব-বন্দনা। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রেমহীন জীবন কখনও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না কারণ প্রেমই জীবন-সাহারার একমাত্র মরুদ্যান ও পিপাসা-বারি। তাঁর এই প্রেম-সাধনা তান্ত্রিকের শব-সাধনার মতো; বসুন্ধরা বীরভোগ্যা এবং প্রেমের প্রসাদ কাপুরুষের জন্য নয়। যে কণ্ঠ বিষের জ্বালা ভোগ করেনি, সে অমৃত-পানের অধিকার পায় না; জীবনকে মন্থন করে অমৃত লাভ করতে হলে বিষের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার নাম কাপুরুষতা। সেই কাপুরুষ বিষের জ্বালায় মূর্চ্ছিত হয় এবং শক্তিমান অমৃতপাত্র হাতে উঠে আসে। দেহকে প্রেমের হোমানলে না পোড়ালে দেহধর্মকে ফাঁকি দিয়ে এড়ানো যায় না। সংসার-নাটকের মূল অভিনেতা যে দুঃখ তাকে এড়িয়ে অমৃতলোকের যাত্রী হওয়া যায় না কোনো দিনও।

> জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি অশান্তি—সুখ লাগি
> ভাবের স্বর্গ চাহে না মানুষ—অভাবের অনুরাগী।

কবি খুব ভালভাবে জানেন—'মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান।' মাটির পৃথিবীতে মানুষের 'আনন্দের ঋণ-অধিকার।' তাই, 'প্রাণের খেলায় দুঃখেরে ডরেনা কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার।' মৃত্যুহীন প্রেমের স্পর্শে মরণও সহজ হয়—সুন্দর হয়ে ওঠে। মৃত্যুর অনন্ত লীলায় পৃথিবীতে মানব-আত্মার 'গতাগতি পুনঃ পুনঃ'—বার বার আসা-যাওয়া; শ্মশানের পাশেই জীব-জাহ্নবীর নিত্যস্রোত।

> জীবনের সুখদুঃখ বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
> অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো
> যাতনার হাহা রবে গান গাই তৃষার্ত রসনা
> বলে—'বন্ধু, উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো।'

মোহিতলাল জীবনের আঘাত-যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে গিয়ে পরিত্রাণ কামনা করেন না। বিচ্ছেদ-বেদনা-মৃত্যু-কণ্টকিত জীবনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম

মমতা সীমাহীন। তাই তাঁর 'ব্যথার আরতি' saddest thought হয়েও sweetest song—বিষণ্ণতম চেতনাই যেন জীবনের মধুরতম সংগীত। তিনি এই মানুষের পৃথিবীতে বার বার ফিরে আসতে চান—আকণ্ঠ ভোগ করতে চান তার বিষামৃতমধুর আনন্দ। এই জন্যই 'পান্থ' কবিতায় শোপেনহাওয়ারের জীবন-দর্শনকে সুতীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি। জীবন-সমুদ্রের তীরে বসে যে পুরুষ মনিমুক্তা আহরণ না করে লবণাক্ত বারিধারা পান করে, কবি সেই জীবন-বিবাগীর জন্য করুণা ও সহানুভূতি বোধ করেন। কারণ মোহিতলাল এই জীবনদর্শনে বিশ্বাস করেন না—তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অধিবাসী—

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণপিপাসা—
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন
যমদ্বারে বৈতরনী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ।
এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি জোগায় ফুল, নারী-গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত নয়ন। [পান্থ]

এহেন প্রেমের বসতি কোনো বিদেহ কল্পলোকে নয়—মানুষের বলিষ্ঠ দেহ-সংস্কার-জাত কামনালোকে। যৌবনের মাহেন্দ্রলগ্নে প্রেমারতির প্রকাশ দেহকেই কেন্দ্র করে। অর্থাৎ দেহ-সম্পৃক্ত প্রেমের শ্রেষ্ঠ মহিমা অল্লায়ু যৌবনে—শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে দেহই সত্য তাহার উপরে নাই। তান্ত্রিক মন্ত্রও বলেছে—ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠতি কলেবরে। সুতরাং মোহিতলালের দেহবাদ হীন নীচ ভোগসর্বস্ব ইন্দ্রিয় লালসা নয়—দেহকেন্দ্রিক জীবনচর্যা—"দেহের সহিত আত্মার পূর্ণ মিলনেই উহার জন্ম হইয়াছে। সেই মিলন-মোহানায় দেহের আর্ত কলস্বর আত্মার অকূল সাগরে স্তব্ধ হইয়া যায়, আবার, দেহের আলিঙ্গন-পাশে আত্মাও আত্মহারা হইয়া পড়ে। বিষ এমনি করিয়া অমৃতে পরিণত হয়। এই দেহ-আত্মার মিলনভূমির নাম—হৃদয়, সেই হৃদয়ের বিস্ফারণকেই প্রাণশক্তি বলে, তাহারই নাম প্রেম। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে উহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সামঞ্জস্য—উহাতেই সকল বিরোধের অবসান হয়।" (বঙ্কিম-বরণ পৃঃ ২১০)। এই গৌরবের জন্য তিনি নরদেহকে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উপরে স্থান দিয়েছেন। মর্ত্যের মাটিতে গঠিত ও লালিতপালিত মানবদেহই তাঁর চোখে পরম বন্দনীয়—"দেহের দেউলে দেবতা নিবসে, তার অপমান দুর্বিসহ।"

মোহিতলাল জানেন এবং বিশ্বাস করেন—প্রেমের সমস্ত আকর্ষণ মূলতঃ দেহকেন্দ্রিক বা ইন্দ্রিয়-আসক্তি-জাত—যাকে ইংরাজীতে বলে Physical। এই যৌন-কামনা দেহজ বলেই প্রেমের সমস্ত বিকারও দেহের আধারেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রেমের মহত্তর বা সুন্দরতর প্রকাশ দেহের নয়—প্রাণের। প্রেমের ঊর্ধায়ন বা সমুন্নতি (sublimation) metaphysical। দেহজ কাম আত্মার সংস্পর্শে চৈতন্য-শিখায় প্রদীপ্ত কাম বা grand passion সাধনার আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এবং এই চৈতন্যের বীজও দেহের আধারে নিহিত। এ বিষয়ে ডি, এইচ, লরেন্সের সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য—"My great religion is a belief in the blood, in the flesh, as being wiser than the intellect. We can go wrong in our minds, but what our blood feels and believes and says is always true…I conceive a man's body as a kind of flame, like a candle flame forever upright and yet flowing, and the intellect is just the light that is shed on things around." সুতরাং প্রেম মূলতঃ দেহকেন্দ্রিক হলেও কতকটা আধ্যাত্মিক, ভগবত-প্রেমের পর্যায়ভুক্ত। দেহের বৃন্তে প্রেমের পদ্মটি ফোটে বলে বৃন্তটিকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরতে হয়। দেহের জবানীতেই উচ্চারণ করতে হয় দেহাতীতের কথা। মোহিতলালের দুরন্ত জীবন-পিপাসা 'মোহমুদ্গর' কবিতায় অবিমিশ্র ভোগবাসনার প্রবলতার বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত—

দেহ্ ভরি করি পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি খুঁড়ি লও কামনার কাচমনিহীরা।
অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙালের মত
ধরণীর স্তনযুগ করি দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দংশন আঘাতে করিব জর্জর—
আমরা বর্বর।

আবার, বৈষ্ণবরা বলেন, এই দেহই দেবতার মন্দির। প্রেমের সর্বোত্তম লীলা নরলীলা। মানবদেহেই পরমসুন্দর লীলাময়ের অধিষ্ঠান। দেহ না থাকলে, কামনা-বাসনা না থাকলে, প্রেমের বেদনা, প্রেমের অমৃত, প্রেমের অতৃপ্ত জ্বালা—একই কালে বিষ ও অমৃত অনুভব করা যায় না—

আমার পীরিতি দেহরীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত
ভস্মভূষণ কামের কুহকে দেখা দিল স্মরজিৎ।

ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ লাখ যুগে আঁখি জুড়াল না।
দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন সংগীত। [স্মরগরল]

দেহের পিপাসা থেকে রূপের পিপাসা জাগে, কাম থেকে প্রেমের। এই প্রেমের আসন হৃদয় মানুষের দেহাধারেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ভোগের দ্বারা দেহের সমস্ত মলিনতা-দুর্বলতাকে ভস্মসাৎ করে মানুষের আত্মা প্রেমের পরম-সুন্দর দেবতার আশীর্বাদ লাভ করে। "ঐরূপ সাধনায় দেহও আছে—হৃদয়ও আছে, জ্বালা ব্যথা সবই আছে—কেবল, সে সকলই এক অপূর্ব উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।"

সেই রূপ সেই প্রেম, সেই নীল লাবণ্যবিলাসে
মূর্চ্ছি' আছে চরাচর, ভাল নহে শুধু ভালবাসা।
সে-সুধাসাগর-বারি উছলিছে যাহার কলসে
ধরণীর এই ঘাটে তার বুঝি নাই যাওয়া-আসা।

কবি মোহিতলালের নারী-কল্পনা এই দৃঢ়, সুস্থ, প্রৌঢ় চেতনায় পরিশুদ্ধ। নারীর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বিশ্বমায়াবিনীকে—'সমষ্টিরূপ নিখিল নারীজাতি জন্মমৃত্যুকল্লোলিত বিশ্বসত্তারই প্রাণোল্লাস।' কবির ভাবদৃষ্টিতে তাই কুলবধূ যশোধরা এবং বারাঙ্গনা বসন্তসেনা তুল্যমূল্য; কারণ উভয়ের নারীসত্তায় বিশ্বের মূলপ্রকৃতি সেই আদ্যশক্তিরই প্রকাশ—একদিকে যোগস্থ পুরুষ, অন্যদিকে লীলাচঞ্চলা নারী—উভয়ের মিলনে সৃষ্টির সার্থকতা—

তুমি নারী, নরবধূ; তুমি তার দেহ-সহচরী—
কল্পনার কামস্বর্গে তাই তুমি মোহিনী অপসরা;
তুমি দেবী, সুধা-সিন্ধু-মন্থ-শেষ কল্যাণ-ঈশ্বরী
ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেব তুমি, বিষ্ণু স্বয়ম্বরা। [নারীস্তোত্র]

সুতরাং একথা অসংকোচে বলা যায়, মোহিতলালের দেহবাদ নিছক ভোগবাদ নয়—'আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ।'—সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাষায়—"যৌনতা এখানে কামাচারে আবদ্ধ নয়, মহিমায় ঊর্ধ্বগ।" কবি মোহিতলাল কখনই রিরংসাবাদী নন—একান্তভাবেই জীবন-প্রেমিক। "ঐকান্তিক জীবনপ্রেমে মোহিতলাল দেহকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বব্যাপী একটি সমগ্রতার সৌন্দর্যের মধ্যে, রূপরস বর্ণগন্ধের সহস্রদল পৃথিবী-পদ্মের সৌরভরূপে কামনাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনলেই দেহ তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হারায়। বৃন্তচ্ছিন্ন ফুল যেমন অসময়েই শুকিয়ে আসে, সেই রকম পরিবেশ-হীন দেহসম্ভোগ ক্লিন্নতার পঙ্কে বীভৎস হয়ে ওঠে। এই সহজ সত্যটি মনে না রাখলে মোহিতলালকে ভুল বোঝবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। হেমন্ত-গোধূলি'র 'নাগার্জুন' যখন বলছে, 'কামের পূজারী আমি, হে মহেশ, দেহযন্ত্রে করিয়াছি নাড়ীচক্রভেদ' তখন এই পরিবেশের কথা ভুলে গেলেই বিপর্যয় বাধবে।' [নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়]

বিনয় রায়

মুখচেনা

আও জী দয়ালু নারায়ণ, বয়ঠো!

অনেক শহরে ছোটমাঝারি আবাসনিবাসে তিথি যাপন করেছি, এমন মধু সম্ভাষণ কোথাও শুনি নি। দেহ উপচে পড়ছে চেয়ার থেকে, দুধে আলতা রঙ, মিঠে আওয়াজ।

এ মুণ্ডু, বাবুজীকা সামান লগা দে গিয়ারহ নম্বর মে!

মালিক, সাত নম্বর ভি খালি হ্যয়!

প্রভু ভৃত্যের দৃষ্টি বিনিময়।

আপই পসন্দ কর লেও।

দুটো ঘরই ভালো, উনিশবিশ নজরে এলো না। বেয়ারার কানকথা—

গিয়ারহ নম্বর মৎ লেনা!

কেঁও, ক্যা বাত হ্যয়?

বাদমে বতায়েংগে।

স্টেশনের সুমুখে মধ্যবিত্ত হোটেল, নাম রয়েল হলেও দাম শুনে মনে হলো থাকা চলবে কয়েকদিন। উচিত ছিল আরও সস্তা জায়গা খোঁজা কিন্তু সেদিনের দিল্লী পর্বের পর সাহস হল না।

তুমুল বৃষ্টি, রাত দশটা, ট্রেন থেকে নেমে থাবার জায়গা নেই।

বাবুজী সস্তা হোটেল চলেংগে?

ছাতা হাতে ক্ষগনো বুড়ো।

বেহারে বেঘোরে চড়িনু এক্কা।

অলিগলি ঘুরে অন্ধ মহল্লা। দেশলাই জেলে দোতলায় আরোহণ। খুপচি ঘর, বাতি নেই।

লনটেম লাতা হুঁ—কাশতে কাশতে বুড়ো চলে গেল।

সুমুখে সরু বারান্দা। দূরে রাস্তার টিলে আলো, হাওয়ায় নড়ছে জলছে নিবছে। জাহান্নমটা আঁচ করার জন্তে দুপা এগুতেই নয়নাভিরাম নিতম্ব, মহিলা সবে হিসি সেরে উঠেছে পাজামাটি এখনো পুরো টেনে তুলতে পারে নি। বারান্দার কোণে দুইটি ইট একটি গর্ত, ছোটথাটো কাজ এখানেই। নড়বড়ে চারপাই ভাঙা টেবিলের ওপর নোংরা লোটা,

দেয়ালে পানের পিচ, মেজেতে বিড়ির অবশিষ্ট। কানা লণ্ঠনের আলোতে যা চোখে পড়লো তা থেকে মনে হলো এখানে ক্ষুধিত পাষাণের আশা নেই, ঠগী কাহিনীর সমূহ আশংকা।

ঝাড়ু এনে বুড়ো সাফাই শুরু করলো। ধূলোর ঝড়ে আরো কাশি—বস্ রহনে দো—শুনলো না।

অওর কুছ ?

খানা !

ইস বখৎ ? প্যয়সা দিজিয়ে কোশিস করতা হুঁ।

ঘরে কাঠের পার্টিশনের ওপাশ থেকে মহিলার কণ্ঠ—

সমঝকে লে আনা, অওর দাওয়াই।

জবাব না দিয়ে বুড়ো বেরিয়ে গেল।

এবারে ছিটেফোঁটা মেঘের গর্জন, হাওয়ার ঝাপটায় জানালার খটপটাং। কোনো মানুষের সাড়াশব্দ নেই। তস্য গলির পচাগলা বাড়িতে একটি ঘর, সেটাও সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যে বৃষ্টি বুড়ো নিজেকে জোর গলায় গালাগালি দিয়ে মন হালকা করবো। হোটেলটি কোথায় তাই টের পেলাম না। বেকায়দা থেকে বিপদটা কতদূর কতক্ষণ পরে ?

ধানদূর্বা রূপো রুইমাছ দেখিয়ে পিতামহী যাত্রা করিয়েছিলো। ধোপা সকালে আসে নি। মাকুন্দ ঢোপা পাচকটির সংগেও সাক্ষাৎ হয় নি। বৈঠকখানায় খাবার এনে দিয়েছিল রাধাপিসি। বাইরের দরজায় কপালে চুমু, কড়ে আঙুলে কামড়টাও বাদ যায় নি। নদীর পথে সবৎসা গাভী, পূর্ণকুণ্ড, গর্ভিনী যুবতী, কোনো অনাচার অশুভ মনে পড়ে না। দিল্লী পৌঁছেই সব পুণ্যি শেষ ?

আরে কই খাইবা মাউরাগ ছাশে ? ঘরের ডাইল ভাত পরের খাসীর থেইকা ভাল। ঘুইরা দেইখ্যা ফিরা আইয়ো।

ব্যক্তিগত জীবনের মামুলী নাটকে নায়িকার ভূমিকা যে নেবে বলে কথা দিয়েছিল তার নাম কেউ নিল না। স্বস্তি পেলাম। রাধাপিসি নিজের কথার জবাব নিজেই দিল—ওর খুব খারাপ লাগবে, তাই না রে ?

নাও-ঘাটে বিরাট অশত্থ, গাঁয়ের মানুষের আসা-যাওয়ার সাক্ষী, কতো কালবৈশাখীর ঝাপটা খেয়ে মাথা উঁচু করে আছে কেউ জানে না। এর ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্বজন জানালো বাংলার অনুপম বিদায় আশীর্বাদ—এসো ! অশত্থশিকড়ে বাঁধা রশি খুলতেই জোয়ার চঞ্চল নদী নাও টেনে নিল।

কানে এলো দুর্গা, দুর্গা! এটা যে অগস্ত্য যাত্রা এ কথাটা মনের পাশে কেটেও যায় নি।

আধঘণ্টা পরে বুড়ো এলো। আটটি মস্ত রোটি এক সানকি কিনা, লংকায় অগ্নিকাণ্ড। খেনো-মদের অনুপান, একটি খেয়েই ব্যস্।

অওর নহি লেংগে?

বহৎ হো গিয়া।

বাকি খাবার সযত্নে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

প্যয়সা লেলিয়া?

শায়েদ কল ভি রহেংগে।

রোটি কি বাত কর রহীহুঁ।

হাঁ হাঁ, খানা খাকে সো যাও!

বুড়োর গলায় ঝাঁঝ।

বিছানাটা বাঁধা রইলো। কাক জাগার আগে পালাবো। সকালে বুড়ো আসতেই টঙা বোলাইয়ে। রাত্রিবাসের তিন টাকা। কিছু বাংলা কটুকথার তরজমা করে রেখেছিলাম, যাবার সময় শোনাবো।

বাবুজী, তকলিফ মাফ করনা!

দরজায় মেয়েটি। কাল রাত্রে পাছার ভূগোল দেখে যাকে মহিলা ভেবেছিলাম। শুকনো মুখ, চোখের নীচে অনেক রাতজাগার কালো। ভেতর থেকে শিশুর গোঙানি, নমস্তে জানিয়ে চলে গেল।

বেরিয়ে টের পেলাম বাড়িটা বেশ্যাপল্লীতে।

সাঁঝের রূপসী সকালে সাদামাটা মেয়েরা বারান্দায় জামাকাপড় শুকুচ্ছে, চুল আঁচড়াচ্ছে, দাঁত মাজছে, ক্লান্তলয় রাতের অপেক্ষায় অলস দিনের ঢিমে তেতালা। টঙার দুটো চাকা বরাবর নয়, খিষ্টে খিষ্টে চলছে। আমারও তাড়া নেই, সন্ধ্যায় গাড়ি। টঙাওয়ালা একটু অবাক হয়েই আমায় দেখলো দুয়েকবার। সাধারণত বাক্স-বিছানা নিয়ে এ পাড়ায় কেউ আসে না। হবে কোনো সুন্দরীর পোষা মানুষ।

মন্দ কি?

মহেশদা'কে সবাই ভালোবাসে। ম্যাট্রিক অবধি কোনমতে পৌঁছে গাঁয়ের ইস্কুলে এবিসিডি পড়ায়। বারো টাকা মাইনে, থাওয়া-থাকা বন্ধুর বাড়ি। গাঁয়ের মানুষ তখনো ভাত বেচতে শুরু করে নি। ভারি সুপুরুষ,

বয়স পঁচিশের কাছে। অনেক মা মেয়ের বিয়ের কথা বলতে এসে হতাশ হয়েছে বারো টাকায় খাবে-খাওয়াবে কি?

মহেশদা নির্বিকার—আমার দৌড় এবিসিডি অবধি, পাঠশালায় যা জীবনেও তাই!

দুর্গাপুজোয় বেশ্যার দুয়ারের মাটি চাই। মহেশদা' সকালে শহরে গিয়ে দুপুরে ফিরে এলো। বামুনঘরে তামাকের আড্ডা।

বলো না কি দেখলে?

আরে সাতসকালে আবার দেখাদেখি কি? নাওয়া ধোওয়া কচ্ছে ঘর গোছাচ্ছে। আঙিনায় ঢুকতেই এক বুড়ি জিজ্ঞেস করলো কি চাই। পুলিশ-দপ্তর থেকে এসেছো?

পুজোর জন্যে একটু মাটি।

ও তাই বলো! পুজোর জিনিষ খাঁটি হওয়াই ভালো। ঐ সরোজিনীর দোরগোড়া থেকে নিয়ে যাও, ওর্ কাছে অনেক মানুষ আসে।

একটু তুলে নিয়েছি, সরোজিনী এসে ঢিপ করে প্রণাম! আমারি বয়সী, এই বড়ো চোখ।

একটু প্রসাদী ফুলবেলপাতা দিয়ে যেও ঠাকুর। আমাদের কাত্তিকপুজোটা করে দেবে? ভালো প্রণামী দেবো!

শনি, সত্যনারায়ণ চালিয়ে নিতে পারি, বড়ো পুজো জানি না।

তুমি যা করবে তাতেই হয়ে যাবে, তুমি নিজেই যে কাত্তিকঠাকুর গো!

পালিয়ে বাঁচি!

পরের পুজোতে দেশে ফিরে গিয়ে মহেশদা'র দেখা পেলাম না। পাশার আড্ডায় বামুনঠাকুর বললো—শহরে একটা ছোট রেস্তোরঁা খুলেছে, ভালো চলছে।

টাকা?

সরোজিনী।

পাসার চালটা হাতেই রয়ে গেল।

বড়ো চোখের মায়া?

উঁহু, মাটির যাদু! হাজারো পুরুষের কামনা-ছোঁয়া, এমনিই কি আর দেবীপুজোয় লাগে? ওখানেই তো পেন্নামটি করেছিল!

একগ্লাস শরবৎ দিয়ে মাণিক শেঠজী হাঁড়ির খবর বার করে নিল। নামধাম গাইগোত্র কি করি কেন এসেছি। এখনো শাদি করিনি শুনে

ভাবিত। নওজোয়ানের নিজস্ব নারী চাই। বেশিদিন ছররা হয়ে থাকলে কোন বিমারি এসে ধরবে তার ঠিক নেই। অবশ্যি কমজোরি হলে আলাদা কথা। তবে তার খুব ভালো ইলাজ এ শহরে আছে। শেঠজীর বন্ধু মশহুর হেকিম, পুরুষানুক্রমে রাজা নবাব রইসদের যৌনশক্তি বজায় রেখে আসছে। খাস দাওয়াই জানে, ছ' মাসে এমন তাকৎ হবে যে অওরৎ ত্রাহি ত্রাহি করবে। বিদেশে একা বলে ফিকর করার কারণ নেই, শেঠজীর নজর হামেশা থাকবে আমার ওপর। নয়া জায়গা, ইয়ার দোস্ত পসন্দ করার আগে জিগ্যেস করে নিলে ভালো হবে। এখানকার অস্থান-কুস্থান হারামী ইনসান সব ওর নখদর্পণে। রসকথায় শোনালো অমৃতসরের মেথরাণী-মাহাত্ম্য। ওদের সহবাসে নাকি প্রাচীন কোমরের বাতও সেরে যায়। হতে পারে, অনেকেই সুদেহী সুশ্রী, শুচিবাই নেই।

কর্মক্ষেত্রে নিরাশা। বিলিতি ডিগ্রীওয়ালা প্রার্থী আছে। তদুপরি একজন স্থানীয় কবি। মাতৃভাষায় এমন পদ্য লেখেন যে পড়লে ক্যা বাত ক্যা বাত করতে হয়। সেক্রেটারি সরদার গুরবক্স সিংহ দুঃখ করে বললো এতদূর থেকে এসেছো, কিন্তু ওদের সংগে মোকাবেলা করতে পারবে না!

অতএব শহর দেখা যাক, যাতায়াত খরচ অরা দিচ্ছে, এই অনেক।

বোলো জী সৎ শ্রীআকাল
যো বোলে সো নেহাল—
ওয়াহে গুরু ওয়াহে খালসা!

গুরদোয়ারা থেকে ফিরে এসে চিঠি পেলাম, যা হবার নয় হয়ে গেছে। শেঠজীর উল্লাস—এবারে তুমি এখানকার আদমি হয়ে যাবে। আমার হোটেলকে নিজের বাড়ি মনে করে থাকো। পারমামিণ্ট হলে সস্তা করে দেবো!

সন্ধ্যায় নিজের বাড়ি নিয়ে গেল। পরিবারের সংগে পরিচয় সত্যনারায়ণের কথা শুনতেই হবে।

রাজার ভাণ্ডারে যত ধনাদি আছিল।
নিশিমধ্যে সাধুর নৌকায় পূর্ণ হৈল।
চরমুখে শুনি রাজা ধরিয়া লইল।
জামাতা শ্বশুরে লয়ে কারায় পূরিল।

গৃহিণী শ্রোতাই বেশি। ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেবার জন্যে পেশাওয়ারী পুরুত সরল ব্যাখ্যা করলো—দোনো বাঙ্গোৎকো পকড়কে জেল মে ডাল দিয়া!

রাত্রে বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম এগারো নম্বরের কথা।

বছরখানেক আগে একটি রইস সন্তান গ্রাম থেকে মেয়ে নিয়ে এসে রাত্রি-বাস করেছিল ঐ ঘরে। বলেছিল বিয়ের কথা কিন্তু সকালে পয়সা ধরিয়ে সরে পড়ে। মেয়েটি গলায় সালোয়ার বেঁধে ফ্যান-এ লটকে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে ও ঘরে মাঝরাতে জামার খসখস দীর্ঘ নিশ্বাস অনেকেই শুনেছে।

দেশেগাঁয়ে নয়া ঘর তৈরি হলে তিনরাত গরু বেঁধে রাখা হতো ভূত পরখ করার জন্যে। হোটেলের দোতলায় গোমাতা সম্ভব নয়, তার বদলে বামুন রাখলে কাজ হতে পারে। শেঠজীর অবচেতন মনে বোধ করি এ খেয়াল ছিল।

মাথা পেট পকেটের অবস্থা কাহিল। দিনরাত রেলগাড়ির গোলমাল যাত্রীর আসা-যাওয়া। সবাই অ-তিথি, স্থায়িত্বের আশা আশংকা আমারই। গিয়ারহ নম্বরটা সুরানারী নিয়ে রঙনকের জন্যেই ব্যবহার হয়। ঘটনাটা শুনেছি বলেই হয়তো ঐ ঘরে হাসি কথাবার্তা চুড়ির রিনঝিন আমার কানে বেশি আসে।

সকাল সুন্দর। ভোর না হতে একটি অন্ধ এক পা কাটা, ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে হোটেলের সুমুখে দাঁড়িয়ে সুরেলা গলায় গায়,—রামাহো রাম! পংগু প্রাণীর গান, তিক্ততা মিষ্টি হয়ে ওঠে ওর সুরে। রাগ নেই দুঃখ নেই অভিমানের রেশ।

রোজ এক আনা।

বড়ি মেহেরবানি!

কল ফের আওগে না?

জরুর বাবুজী, দূর নহি চল সকতা হুঁ, রামজী মেরি দো রোটি ইহাই দেলোয়া দেতে হেঁ!

রামাহো রাম! গাইতে গাইতে চলে যায়। দেবতার দূরত্ব নেই, এ নামে ভরসা বেশি। নিজের জীবনে শ্রীরামচন্দ্র কতটুকু সুখ শান্তি পেয়েছিলেন? দেব-মহিমার আড়ালে তিনিও যে দুঃখী মানুষ।

একটু নিরালায় কোথাও যদি একটা ঘর পাওয়া যায়।

সর্বত্রই এক প্রশ্ন—বউ আছে? একা মানুষকে জায়গা দেবো না!

জায়গা পেয়েও পেলাম না। ঠিকানাটা বলতেই শেঠজী তর্জনী তুললো।

শাস্ত্রোক্ত বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা এবং সর্বনাশে সমুৎপন্নে সোমত্ত ছেলে। আলাদা করে দিয়েছে, তাহলেও বুড়ো ঘুমুলে পাড়া জুড়ুলে ছোঁড়া হানা দেয়

এখন নজর রাখবে কিন্তু নজরে পড়বে না এমনি একটি লম্বকর্ণ ভাড়াটে চাই। নজদিগ মৎ যানা। সমঝে ভাইয়া ?

দাবার চালে পাশার হিসেব অচল।

দরজায় শব্দ, আসতে পারি ?

মুখচেনা ছেলে। খানিকক্ষণ একথা সেকথা। শেষে বলেই ফেললো :

বাঙালিরা তন্ত্রমন্ত্র অনেক কিছু জানে। আমায় একটা অষুধ বাতলে দাও। শরীরে কুলোচ্ছে না, দেখা হওয়া মানেই চরণ উপরে চরণ পসারি— শুনেছি শিলাজতু খেলে তাকাৎ বাড়ে, সত্যি ? ব্যাপারটা জটিল—সৎ-মা। হারাম খোর বুড়টা কিনেছে। সবাই বারণ করেছিলাম, শুনলো না। শাদিটা হওয়া উচিত ছিল আমার সংগে পাড়ার মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে জানি।

যা উচিত তা তো হচ্ছেই !

মজাক নয়, এখানে কাউকে বলা চলে না, তুমি বিদেশী, মদত করো !

এ শহরে তো মশহুর—

অসম্ভব, বুড়টা সবার কাছে হেরে এসেছে।

প্রাচীন পঞ্জিকা ঘেঁটে অতিরতির অব্যর্থ একটা নির্ঘাৎ মোদকের নাম ঠিকানা লিখে দিলাম। পুরস্কার চায়ের নেমন্তন্ন। বুড্ঢা গাঁয়ে গেছে। মেয়েটির চেহারা কথাবার্তা ভারি মিষ্টি।

যে ঘরটা নিতে পারতাম সেটাও দেখে এলাম।

পঠনপাঠন চুলোয় গেছে। ভাবছি—অধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু। নানা কারণে এখানে আর কাজ করা—

সৎ শ্রী আকাল !

কৃপান হস্তে করতার সিংহ।

সৎ শ্রী আকাল মহারাজ, স্থনাও হালচাল।

বড়ি মুসিবৎ !

লোকটি হাসিখুশি, গল্পগাছা করতে ভালো লাগে। পারস্য ভাষার ওস্তাদ, কুড়িটি নিরুৎসাহ ছাত্রের নিরুদ্বিগ্ন অধ্যাপক। পাঠ্য প্রশ্ন পরীক্ষা সবই ওর হাতে। একটি ছোট বাড়িতে স্থখে ছিল এতোকাল। অধুনা অতিকায় জানোয়ার সওদা করে পড়েছে ফ্যাসাদে। একুশ সের দুধওয়ালী মহালক্ষ্মী মোব দরজা দিয়ে ঢোকে না।

দৈববাণী : উসকো ম্যয় বাহর নহি রখ সকতা হুঁ, মকান ছোড়ে দেংগে, তুম লে লেও !

ওদের অনেক নমস্কার জানিয়ে গৃহপ্রবেশ—বহু বাঞ্ছিত প্রাসাদ, এ কটি ঘরবারান্দা আঙিনা। বরাত খুললে যা হয়।

নওকর চাহিয়ে বাবুজী?

ইতস্তত করলাম—কানা খোঁড়া ভেংগুর।

হারামজাদার লেংগুর।

পাটিয়ালা রাজবাড়িতে কাজ করেছে শুনে পরাস্ত। একচক্ষু নন্দুরামের রান্না চমৎকার, কিছুদিন খেয়েই লালবাতির আলো দেখতে পেলাম। বুড়ি মেথরানী বিদায় করে তার মেয়ে লাজবন্তীকে বহাল করেছিল। কদিন বাদে সেও বললো—বহুৎ আচ্ছা পকাতা হ্যয়!

আচমকা পটপরিবর্তন।

কখন হয়েছে, মাঝরাতে না ভোরে? দরজা খোলার শব্দ পাওনি? যাকে তাকে রেখে নিলে! পাটিয়ালা না হাতী। দুচোখওয়ালা লোক কিছু কম আছে যে মহারাজা এক ব্যাটা কানার রান্না খাবেন?

পাড়ার প্রবীণ হরকিরাত সিংহ বললো, বিদেশী হচ্ছে মেহমান, তার সংগে এমনি ব্যবহার? কমবখ্‌তের অণ্ডকোষ কেটে শূয়রকে খেতে দেওয়া উচিত!

এরপর এলো সজ্জন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ প্রৌঢ় পরমানন্দ। স্বল্প রান্নার প্রচুর অবসরে টিকিতে লালফুল বেঁধে রোজ রামায়ণ পড়ে। মস্ত বই, একদিকে সংস্কৃত অন্যদিকে হিন্দি। মেয়ে বিয়ে দিয়ে ফতুর, ধার শোধের ব্যবস্থা হলেই দেশে চলে যাবে। ঘরের চাকরি ওর পেশা নয়।

এক বিকালে খেলার মাঠে খবর—

বাবুজী, মেহমান আয়া!

কঁহাসে?

পতা নেই, মালুম হোতা হ্যয় বংগালি।

ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালো। সিল্কের পাঞ্জাবি কয়েকটা সোনার আংটি, চেহারা কথা সপ্রতিভ।

নমস্কার দাদা, মাপ করবেন বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকেছি, ইনি আমার স্ত্রী!

মেয়েটি অবগুণ্ঠিতা, একটু হাত তুললো, মুখ দেখতে পেলাম না।

বিপদে পড়ে এসেছি, মার বড্ড অসুখ, আজই এলাহাবাদ যেতে হবে। ফিরে রাওলপিণ্ডি যাবো, সেখানেই ব্যবসা। কদিনের জন্য এঁকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই।

সে হয় না, আমি একা।

তাতে কি? ভদ্রলোক, স্বজাতি, আমার কোন বাধা নেই।

আমার আছে, গুপ্ত মশায়ের কাছে যান, বড়ো পরিবার নিশ্চিন্তে রেখে যেতে পারবেন।

আপনার কাছেই ভালো হতো!

ওখানে যান, পরমানন্দ দেখিয়ে দেবে, কাছেই।

লোকটি বেরুলো, অসন্তুষ্ট। পেছনে বউ, শরীর দেখে ষোল সতেরো। কিন্তু প্রবাসে এতো পরদানশীন?

পরদিন সকালে খবর গুপ্ত মশায়ের হাজার খানেক মেরে দিয়ে লোকটি সন্ধ্যার পরেই গায়েব। গিয়ে দেখি বসবার ঘরে এককোণে মেয়েটি কাঁদছে। কালকেরই শাড়ি কালকেরই ঘোমটা।

বাড়ির গিন্নির সান্ত্বনা—একটু যাও বিশ্রাম করো, কাল থেকে পেটে পড়ে নি কিছু। তোমার বাবাকে তার করা হয়েছে, আজ কালের মধ্যেই এসে নিয়ে যাবেন। গর্ভটর্ভ না হয়ে থাকলেই রক্ষে!

প্রবাসী বাঙালির মেয়ে স্বামী সম্বন্ধে জানে না কিছু। হপ্তাখানেক আগে বিয়ে হয়েছে। বাপ বরোদায় সামান্য কাজ করে, পাত্রের চেহারা কথায় বিশ্বাস করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেয়েছে। পরে জানা গেল পথেঘাটে বিয়ে করা বাবুটির পেশা। কয়েকটি প্রদেশেই তার এমনি বউ আছে।

পরমানন্দকে ঘটনাটা বললাম।

ম্যয় না হুঁ তো কিসিকো অন্দরে মৎ আনে দেনা। তরহ্ তরহ্ কি মরদ্ অওরৎ।

অওরৎ কঁহা বাবুজী? বেচারি ছোটি সি লড়কি!

সকল দেখা থা ক্যা?

তভি তো কহ্ রহা হুঁ, দুবলি পতলি চেহরামে থকায়ট, দুরসে আয়ী হোগী।

ঘোমটা সরিয়ে তেষ্টার জল খেতে ক্লান্ত মুখটি দেখেছে পরমানন্দ্।

অব ক্যা হোগা?

রব্ জানে, সোচনে কি বাত।

মেরি ভি লড়কি হ্যায়, দুনিয়ামে ক্যা কুছ হোতা হয়, কহাঁ ইনসানিয়াৎ?

ওর কথার জবাবে যেটা মনে এলো সেটা গল্প নয়।

জাহাজে দাঁড়িয়ে দেখছি পদ্মা, দিনে রাতে শীতে বর্ষায় কতোবার দেখা তবু অরুচি নেই।

এই যে কি খবর ?

আরে এসো, বউয়ের সংগে দেখা করো, শুনছো, এরই কথা বলছিলাম !

ঘোমটা সরিয়ে অপরিচিতার সলজ্জ নমস্কার।

বিছানার পাশে বাক্সের ওপর টোপর।

নমস্কার, কেমন আছেন, খাবার নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই—চলি, স্টেশন এসে যাচ্ছে, গোছগাছ করে নি !

বাড়ির উঠোনে পা দিতেই রাধাপিসি।

বা রে ছেলে একটা পোস্টকার্ড—

জাহাজে সুধীরের সংগে দেখা হলো !

বউ কেমন লাগলো বল।

অপরাজিতা মারা গেছে ?

বালাই ষাট, সোনার মেয়ে মরতে যাবে কেন, চিঠি পাসনি ?

কিসের চিঠি ?

ও হরি ! কিছুই জানিস না, খুঁজে আনি।

চারজন প্রৌঢ়ের সংগে আমি নীরব। নৌকোতে দু'ঘণ্টার পথ, দুপুরে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা। সুধীর বলেছে ভালো করে দেখো কিন্তু, ময়লা মোটা বেঁটে চলবে না। বুড়োদের বিশ্বাস নেই, আজে বাজে চেহারার মধ্যেও লক্ষ্মীশ্রী খুঁজে পাবে !

নিজে দাঁড়কাক। আবকারি কাজ, উপরি আছে। মেয়ের বাপ কাতরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আসল কথা মজুমদার গুষ্টিতে সবাই মিশকালো, এই পারিবারিক অন্ধকারে আলো আনবে ছেলের বউ। অনেক খানাতাল্লাসের পর অপরাজিতাকে পাওয়া গেছে।

একটু হাটো তো মা !

গোড়ালির ওপর শাড়ি তুলে নিশ্চয় হলো লোমশ নয়।

চুলের রংটা একটু হালকা, তা হলেও সুকেশী।

দুটো কাজ এক রকম, চোখ ট্যারা নয়।

লেখাপড়া ?

মিডল স্কুল।

যথেষ্ট, নামঠিকানা ধোপার হিসেব মেয়েদের এর বেশি কি চাই। গানবাজনা ?

সুযোগ হয় নি।

তা শিখে নেবে দুটো শ্যামাসংগীত, বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ীর ভালো লাগবে।

আমি দেখছিলাম অপরাজিতার মুখ। ফরসা গালদুটো মাঝে মাঝে লাল হয়ে যাচ্ছে, এক আধবার ঠোঁট কামড়ে নিচ্ছে।

কেমন দেখলি ?

চমৎকার, পিসি, বুক আর পাছাটাই বাকি রয়ে গেল।

লক্ষ্মীছাড়া অসভ্য !

অসহ্য বলো।

বিয়ের পর থেকে বউয়ের কাশি, সারে না কোনমতে। বছর ঘুরে এলো. ছেলেপুলে হবারও নাম নেই। ডাক্তার ফেল, বদ্যি বললো জরায়ু সংক্রান্ত ক্ষয় কাশি, সুদীর্ঘকাল চিকিৎসা করাতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া অবধি সহবাস বারণ।

তুমি কিছুদিন মা বাপের কাছে থেকে এসো বউমা।

সংগে সংগে বেয়াইকে চিঠি—আপনার মেয়ের যক্ষ্মারোগ আছে. গোপন করে বিয়ে দিয়েছেন। ওকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম আর এখানে আসবার দরকার নেই। শ্রীমান সুধীরের বিয়ে অন্যত্র স্থির হয়েছে—ইতি।

জানিস, কিছুদিন পরেই কাশি সেরে গেল। অনেকেই বলেছিল শ্বশুরবাড়ি আবার পাঠাতে কিন্তু মেয়ে মানলো না। দেবনাথ বাবুর ছেলে অজিত যেচে নিয়েছে। চমৎকার ছেলেটা, এবারে সত্যি মানিয়েছে। চেহারাটা তোর মনে আছে না ? বরের জন্যে খোড়ি বসে থাকতে হবে ওকে ! সবাইকে নেমন্তন্ন চিঠি দিয়েছিল, মজুমদার মশাই, সুধীরকেও। আবার—বিয়েতে শ্বশুর-বরকে নেমন্তন্ন করা, বাব্বা ঃ তুই থাকলে খুশি হতিস।

উচিত, নিশ্চয়ই।

মনের পাপটা বল তো ?

মেয়ের নাম অপরাজিতা।

ভাবতেও ভালো লাগে, না রে ?

রাধাপিসি অল্পবয়সী, সম্বন্ধটা গা-ছোঁয়া রসকষের।

মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—তোমার এমনি হলে !

উঠোনের কোণে নেবুগাছ। একটা কচি পাতা ছিঁড়ে মুখে দিল। সায়া ব্লাউজ পরে নি, হালকা শাড়ির আবরণে নিটোল দেহ ; পোড়াকপালের ক্ষতচিহ্ন কোথাও নেই। শীতললক্ষ্যার সন্ধ্যাবাতাসে একটা ষোড়শী স্তন পিসি সরিয়ে

রাধাকে এগিয়ে দিল। আগেও এমনি হয়েছে, সামলে নিয়েছে। আজ তার পরোয়া নেই।

আমার? নষ্ট জীবন আবার থেকে গড়তে পারে কখনো ভেবে দেখি নি। যাই, তোর চা নিয়ে আসি।

স্বামী পরিত্যক্তার অনাদৃত যৌবনস্বপ্ন অপরাজিতার কাহিনীতে ফিরে এলো একটুক্ষণ।

সীয়ারাম!

লম্বা নিশ্বাস ফেলে পরমানন্দ রামায়নের পাতা ওল্টাল—

কং নু সা দেশামাপন্না ক্লেশনাশিনী বিদেহী!

(২)

শীতের রদ্দুর। বেশ খানিকটা হেঁটে ভাবছি এগুবো, না ফিরবো।

টঙা এসে দাঁড়ালো। বুড়ো ইংরেজ নামতে ইতস্তত করছে। কাছে যেতে ছড়িটা আমায় দিয়ে দুহাতে টঙা ধরে সন্তর্পণে পা ফেললো।

অনেক ধন্যবাদ। এই হাঁটুটা বড্ড জ্বালায় শীতের সময়, ওঠা নামা মুশকিল। একটু চললেই ঠিক হয়ে যাবে।

হাত বাড়িয়ে পরিচয়।

কোথায় থাকো?

কাছেই, মিষ্টার উইলিয়াম্‌স।

আমি ক্যানটুনমেণ্ট-এ, এসো এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও।

বড়ো বাগানের মাঝখানটায় ছোট বাংলো, রাস্তাটা এ-কারের মতো বারান্দার সুমুখে না এলে বাড়ি চোখে পড়ে না।

বসো, চায়ের জল চাপিয়ে আসি। বেয়ারাটা আবার কার বিয়েতে গেছে, এই নিয়ে পাঁচবার হলো। গেল বছর ছিল দফনের পালা, মাসে একটা না একটা কেউ ওর মরবেই। মহা বজ্জাত।

তাড়িয়ে দাও না কেন?

সে হয় না। ওর বাপ আমার সইস ছিল বিশ বছর!

টেবিলের কোণে একগাদা খুনে-উপন্যাস, লাল সুতো দিয়ে বাঁধা পুরনো চিঠি, এডওয়ার্ড-যুগের পোষাকে বরকনের ছবি। ছুঁচ সুতো বোতামের বাক্স, কলম পেনসিল দুটো চেরী পাইপ তামাকের ডিবে এ্যাশট্রে, রোজকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নেই।

বাপের বয়সী। চা খেতে খেতে কথাবার্তাটা একতরফাই হল।

কদ্দিন আছো এখানে, তুবছর? এ মাইনেতে কাজ করে কিছু হবে না। ছেলেছোকরা মানুষ যুদ্ধে যাও না কেন? মিলিটারিতে আপত্তি—

মোটেই না, মিষ্টার উইলিয়াম্‌স, চেষ্টা করেছিলাম, হয় নি কিছু।

আই সী, টেল মি এ্যাবাউট ইট।

খাতায় নাম লেখা হয়েছে।

ভরতি হো যাওয়ে রংবুট
এথে মিলনগে ফট্টা কাপ্‌ড়া
ওথে মিলনগে ফুলবুট
ভরতি হো যাওয়ে রংবুট।

ষ্টোর-এ পোষাক আহরণ।

শার্ট প্যাণ্ট-এ আরো তুজন ঢুকতে পারি। সোলা-টুপীটা মাথার ওপর ছাত। সার্জেণ্ট বললো তুটো খবরের কাগজ ঠুসে নিও। বুট-এর বেলায়ও তাই, তুজোড়া মোজা আর কিছু তুলো।

নেভার সীন বেটার ইন অল মি' লাইফ, ইফ এভরি আইটেম ফিট্‌স, ইউ উড নট বি নরম্যাল।

সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে এক ঘণ্টার বিরাম।

সাইজ আপ-টলেষ্ট অন রাইট শর্টেষ্ট অন লেফট্‌—কুইক মার্চ লেফট্‌ রাইট, চিন আপ চেষ্ট ফরোয়ার্ড, লেফট্‌ রাইট, রীচ ব্যাক কম্পেনিইই—হল্ট!

হুইচ বাষ্টার্ড হ্যাজ টু লেফট্‌ ফীট?

সন্ধ্যার পর সার্জেণ্ট স্মিথ এসে তার গলগ্রহদের খবর নিয়ে যায়।

তোমরা কতোটা শিখবে জানি না, কিন্তু তোমাদের শেখাতে গিয়ে আমার মরণ নিশ্চয়। সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলে একটাই ভিক্ষে চাইব। ঐ দেয়ালের মতো বড়ো আয়না। মার্চ-এর সময় নিজেদের একবার দেখলে জানবে কি ভয়ানক জানোয়ার চরাচ্ছি আমি। ক্রাইষ্ট অলমাইটি! জানি তোমরা আমায় সন অব এ বিচ্‌ বলো।

ট্রেনিং শেষ হলে পুনর্মূষিক। গেলবারেও একটা দরখাস্ত দিয়েছিলাম।

সামথিং হ্যাজ টু বি ডান।

থ্যাংক্‌স, মিষ্টার উইলিয়ামস্‌।

নো নো, নট ইয়েট।

বেড়াবার পথে প্রায়ই আসে। এক পেয়ালা চা, তুটো বই নাড়াচাড়া, গল্প।

সিরিয়াস সাহিত্য আমার আর ভালো লাগে না। মার্ডার মিষ্টেরি নিয়ে বেশ সময় কাটে। কখনো সকালে ট্রেনের টিকেট কেটে সারাদিন ঘুরে আসি। ভেণ্ডার কুলী টঙাওয়ালা, যেখানে যাই পরিচিত মানুষ, দুটো কথা বলে খোঁজ খবর নিয়ে আসি। চল্লিশ বছর, শুধু মানুষ কেন, এখানকার গাছপালাও যে আমার মুখচেনা।

এর ওর তার কথা বলতে বলতে ভুলে যায় আমি এ শহরটাকেই ভালো করে চিনি না। কোন রাস্তায় কি ফল-ফুলের গাছ, কোন নদীতে কি মাছ, কোথায় কার আতিথ্য নিয়েছিল—আমায় সংগে নিয়ে যেন বেড়াতে বেরোয়। চুপ করে শুনি। চলে গেলে একলা বসে আমিও কখনো খুঁজি আমার গাঁয়ে নষ্ট চাঁদের রাত—

আবছা আলো মুচকি
হাসে। বেড়িয়ে পড়ো, মুখুজ্যে বাড়ি
ঘুমিয়েছে, টুলীকুকুর ফিরে এলে
আর হবে না বাগান লুটপাট।
জিগেস করো কানে মুখ রেখে—
ঘোষেদের ফরসা মেয়ে বলে দেবে
কার বাগানের কি, কোথায় বেড়া ভাঙা,
কুমড়ো লাউ আতা পেয়ারা সব জানে,
আরো জানে—ও দেখতে ভালো।
পুকুর ঘাটে সিঁড়ির পাশে বকুল
ফুল ছায়া, আয়না-আঁধার জলে
মুখ ভাসিয়ে হাসে, বেণী খোলার ছলে।

এক সকালে নিয়ে গেল কর্ণেল-কমাণ্ডাণ্ট-এর দফতরে।
আগে দুমিনিট কথা কয়ে আসি, ছেলেবেলার পরিচয়।
আমার ইণ্টারভিউতে একটি প্রশ্ন—
হাউ ডু ইউ নো মিষ্টার উইলিয়ামস?
পথের পরিচয়, কাছাকাছি থাকি।
হি ইজ ভেরি ফণ্ড অব ইউ। আই উইল স্পীক টু হেডকোয়ার্টার্স।
ফর্ম নিয়ে বসেছি, মিষ্টার উইলিয়াম জিগগেস করলো বাড়ি কোথায়?
জবাব শুনে মাথা নাড়লো, ঢাকা-চাটগাঁ আলষ্টারের চেয়েও খারাপ।
সত্যি বলো তো টেররিষ্ট সংশ্রব কখনো ছিল?

সামান্ত। দূতের কাজ করেছি। থানায় গেছি, হাজত অবধি পৌঁছই নি।

নাঃ ওতে কাজ হবে না। লেখো—কেয়ার অব মিষ্টার জে. বি. উইলিয়াম্‌স এম. এ (ক্যান্টাব)—এখন থেকে এই তোমার ঠিকানা। মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যেও।

কিছু না হওয়াতে অভ্যস্ত হলে আশাভংগের বালাই থাকে না। এখন আমার সরল রেখা আবার কুটিল। চিঠির প্রতীক্ষায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে।

ছুটির দিন। সকালে বসে কোটের বোতাম সেলাই করছে।

বসো, চিঠি এসেছে, পড়ো।

রিপোর্ট টু দি ট্রেনিং স্কুল। কনফার্ম।

ছুঁচসুতো রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল—

আই অ্যাম সো গ্ল্যাড, সো হ্যাপি !

মেয়ের বিয়ে ছেলের চাকরি, একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা ওর কাঁধ থেকে নেমে গেছে।

সুতোটা বেরিয়ে গেছে, পরিয়ে দাও তো !

ধন্যবাদের ভাষা খুঁজছি।

ডোণ্ট বি সিলি, আমার ছেলে থাকলে তার জন্যে করতাম না ? ইট ইজ যাষ্ট লাইক ছাট !

চা আনতে গেল।

ঘরটাকে আবার দেখলাম। সেই পুরনো বই চিঠিপত্তর ছবি, নতুন কিছু নেই। সবেতেই বার্ধক্যের ছোঁয়া স্পষ্টতর। ছবি লাগচে চিঠিগুলো হলদে হয়ে এসেছে। হতে পারে আগেও অমনি ছিল লক্ষ্য করিনি।

কাজে অকাজে দিনগুলো কেটে গেল।

বিকালের আকাশ ধূলোয় ছেয়ে গেছে, আঁধি এলো বলে। তাড়াতাড়ি হাঁটছি। টঙা এসে পাশে দাঁড়ালো।

নামবো না। তোমার তো রাত্তিরে গাড়ি। সাবধানে, থেকো। বাই দি ওয়ে আমার একটা কথা রাখবে ? চিঠি লিখো না, আই এ্যাম এ্যান অ-ফুল করেসপনডেণ্ট !

তোমার হাতের এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবো।

আঁধি আসছে, তোমারো অনেক কাজ আছে নিশ্চয়ই—

আই এ্যাম কামিং উইথ ইউ !

ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো খালি টেবিল, বই চিঠি ছবি নেই। যেন কেউ থাকে না এখানে। অন্যদিন গল্প হতো, আজ দুচারটে কথা।

চা শেষ হলে বলল—ষ্টেশনে যাবো না, হাঁটুটা ভালো নেই। লেট মি সে গুড বাই। লুক আফটার ইয়োর সেল্‌ফ।

* * *

গাড়ি তখনো ছাড়ে নি। সমবয়সী ভদ্রলোক হন্তদন্ত—

কোথায় ?

মহু।

আমিও।

পান খেয়ে আসি, নজর রেখো—

প্ল্যাটফরমে বাসের দিকে একটা আঙুল।

গেল তো গেলই।

গ্রীন সিগন্যাল গার্ডের হুইস্‌ল। ছুটতে ছুটতে এসে জানালার ভেতরে বাক্স ঠেলে দিয়ে চেঁচাল—খুব সাবধানে নামিও।

গাড়ি চলছে।

এবারে আমায় একটু ধরো।

বাক্স এক মণ ভদ্রলোক পোনে দু'মন। আমি একমণ দশ সের। কপালে ঘাম, হাত ছড়ে গেছে।

দুমিনিট ওদিকে হলেই তো এই কুস্তি করতে হতো না !

বুদ্ধি করে বাক্স বিছানাটা তুলিয়ে রাখলেও তো পারতে, দেখলে আমার দেরি হচ্ছে। এক জায়গায়ই যাচ্ছি, আশ্চয্যি !

যাত্রা শুভ।

অপর সহযাত্রী বাক্সের ওপর পা রেখেছে—

হা রে রে রে ওর ওপর নয়, ডেলিকেট জিনিষ আছে !

চুপচাপ। ষ্টেশনগুলো আমার দিকে আসছে।

প্লীজ ভাইয়া, ছটা সোডা আনিয়ে নাও !

উইলিয়াম্‌স-এর বাংলো থেকে বেরিয়ে অবধি মনে কুয়াশা—এই চঞ্চল লোকটার খামখেয়ালিতে খানিকটা কেটে গেল। বাক্সে একগাদা বোতল। তিনটে গ্লাসে সযত্নে হুইস্কি পরিবেশন করে আরামের নিশ্বাস ফেলে বলল।

পরিচয় হয় নি, সরি, রহমান। চীয়ার্স ! লখনউয়ি পানের খোঁজে

গিয়ে দেরি হয়ে গেল। অসভ্য দেশ, শওকিন কিছু চাইলেই নেই হায়গা জী!

দ্বিতীয় গ্লাসের সংগে ঠুমরি

আজ রাত যানে দে সজ্‌নী

মেহেদিওয়ালী হাথ জোড়ি।

গলাটি চমৎকার।

হঠাৎ ভাবনায় পড়ে গেল।

যাচ্ছি তো, ট্রেনিং টা কি রকম?

নিজের প্রথম-পাঠ থেকে কিছু শোনালাম।

তবে কথা হচ্ছে ওটা ছিল রংরুটের চিকিৎসা, এটা অফিসার ক্যাডেট-এর তালিম।

আরাম এ্যয়েসের সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না!

ব্যারাকে পৌঁছুতেই এক মাগ চায়ের সঙ্গে হুকুম হেয়ারকাটিং প্যারেড। মিলিটারি নাপিত এক ঘণ্টায় বিশ জনের শিরসি মণ্ডনং।

রহমান আমার রুম মেট। আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল।

বারণ করেছিলাম। তিনপট্টির ওপর সিংহ ওটা কি হয়?

সার্জেণ্ট মেজর।

তাই হবে। বললো কীপ কোয়াএট, উই ডোণ্ট ওয়ন্ট ফিল্‌ম এ্যাকটর্স হিয়ার!

মাস দুয়েক কেটে গেছে।

দাড়ি কামাতে কামাতে গজল গাইছে।

দেরি হয়ে যাবে, জলদি করো!

তুমি চলো, আমিও এলাম বলে।

লাঞ্চ ব্রেক। রহমানের পাত্তা নেই। ঘরে ঢুকে বিষন্ন দৃশ্য। বিছানায় বসে আছে, গালে হাত।

মাঠে কোথাও দেখলাম না? বিকেলে মেশিনে গান প্রাকটিস।

বাথরুমের দিকে দেখালো

সাতবার হয়ে এসেছি।

ডায়ারিয়া?

না, ক্যাপটেন গোমস।

তাই বলো। ওখানে মরতে গিয়েছিলে কি জন্যে ?

দেরি হয়ে গিয়েছিল। মাঝপথে রেজিমেণ্টাল সার্জেণ্ট মেজর হোয়াট দি ব্লাডি হেল! জিমন্যাসিয়ামে ঢুকে পড়লাম। ঝাড়ুদার বলল এখুনি গিয়ে সিক্-রিপোর্ট করো, তা না হলে বিপদ আছে।

দশগজ দূরে অন্ধকার করিডোরে দাঁড়িয়েছিলাম। গোম্‌স ব্যাটা আমায় দেখতেই পায় নি। লিষ্ট দেখে

ও-সি থি -সেভেন ?

ইয়েস্ সার !

হাঁটুতে ব্যথা জরজর ভাব কোষ্ঠবদ্ধ ?

ইয়েস সার !

স্যাণ্ড-ফ্লাই ফীভার, রিপোর্ট টু ট্রিটমেণ্ট রুম !

মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট গলায় ঢেলে দিল এক বোতল দুর্গন্ধ তেল। জীবনে এই প্রথম, তোবা তোবা !

সপ্তাহে একটা ফ্যাসাদ ওর টাইম টেবলে লেখা আছে। তবু গজল গেয়ে খুশমেজাজ

তকদীর মে যো লিখে হুয়ে হ্যায়

তদবীর সে ক্যা করে—

মাঝরাত্তিরে পাহাড়ী নদী পার হতে হবে। ক্রসিং-এর পর ভিজে কাপড়ে গাছতলায় বসে সিগারেট ধরিয়েছি, সেকশন-লীডার রহমান ধপাস করে এসে পাশে বসল।

সব ঠিক ?

প্রায়। মাথা গুনতিতে এক ব্যাটাকে পাচ্ছি না। যাবে আর কোথায় ? মজা ইনত্তাজার মে—

ভেরে পিস্তলের লাল সবুজ আলো।

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে চলো !

বৃষ্টিতে পাহাড়ী নদী পাগলা ঘোড়া। একটি ছেলেকে পাথরে আছড়ে কোথায় নিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে জানবার উপায় নেই। একসারসাইজ সার্চ করেও কিছু হলো না. সকালে পাওয়া গেল মৃত দেহ।

রহমানের শাবক ফিরেছে।

এখানে সবাই অদৃষ্টবাদী।

ভয় পেয়ো না, প্রত্যেকটা বুলেটে নাম লেখা থাকে, খামোকা এসে বি ধবে

না যায় তার বুকে। দূরে দাঁড়ালেও গুলি রিকোশোর করে আসে। পাঁচ ডিগ্রী সেফ্‌টি এ্যাংগ্‌ল', ব্যস!

ক্যাপটেন রবার্টস হাসে—মনে রেখো সবচেয়ে লজ্জার কথা হল পাছায় গুলি!

মেজর হেনরি এ্যান্টি-ট্যাংক রাইফেলের গুনগান করে।

ট্যাংক দেখলেই ঘাবড়ে যেও না, ঐ লৌহ দানবের জবাব এই ছোট জিনিষটিতে আছে। নাটুকে স্টাইলে অস্ত্রটি টেবিলে রাখে।

বাজে কথা!

ক্যাডেট জন উঠে দাঁড়ালো—মিড্‌ল ইস্ট-এ রমেলের ট্যাংক দেখলে সব ভুলে যাবে। দি ওনলি থিং টু ডু ইজ টু থ্রো এ্যাওয়ে দ্যাট স্টুপিড ওয়েপন এ্যাণ্ড জাম্প ইনটু দি নিয়ারেষ্ট ডিচ্‌!

নবাগত একশো ইংরেজ ছেলে ওখান থেকে এসেছে।

মেজরের মুখ লাল—ক্লাসের পর এ নিয়ে তোমার সংগে আলোচনা করব, ডু ইউ মাইণ্ড?

ঠ্যাং ভেঙে রহমান হাসপাতালে। আফশোষ জানাতে গিয়ে দেখলাম খুশিভরা চেহারা।

ঐ তেলের চেয়ে অনেক ভালো। কোনো তকলিফ নেই। আমার বাক্স থেকে এক বোতল শেরি এনে দেবে? এমিলিকে বলে রেখেছি।

এমিলি?

সিস্টার, খুব ভালো মেয়ে, কি যত্নটাই করে!

ট্রেনিং-এর কি হবে?

এমিলি ওর বাবাকে বলে ব্যবস্থা করে দেবে।

ওর বাবা?

ক্যাপটেন গোমস!

রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

আমার ঘরে এলো ক্যাডেট হ্যারিস। কুড়ি পুরো হয় নি। ল্যাংকাশেয়ারের ছেলে। নিজেই বলে—

ল্যাংকাশেয়ার বর্ণ্‌
ল্যাংকাশেয়ার ব্রেড,
ষ্ট্রং ইন দি আর্ম
উইক ইন দি হেড!

রাত্রে স্বপ্ন দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

কি হলো হ্যারিস? উঠে বসো, জল খাও!

সরি, আই ওয়জ ড্রীমিং অব হোম। মাম্‌স লষ্ট টু সান্‌স সরি, তোমার ঘুম নষ্ট করলাম।

বড্ড ছেলেমানুষ।

অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

সবার ঘরে আলো নিবে গেছে। গাবগাছে গিরগিটি ভুতুম ডাকবে এখুনি। রান্নাঘরের পেছনে গোসাপ খুঁজেছে মাছের কাঁটা। রাধাপিসির ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। বুকের তলায় বালিশ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে রহস্যলহরীর কতো নম্বর? কাছে থাকলে, পা টা টিপে দে না! উরুতে হাত পৌঁছুলে ফিরিয়ে দেয় গোড়ালিতে।

হ্যারিস, হ্যারিস, পাশ ফিরে শোও। নাথিং টু বি সরি এ্যাবাউট, হ্যাপেন্‌স টু অল অব আস্!

সো এমব্যারাসিং—পুরুষের অভিমান চোখের জল চাপতে পারে না, মুখ ফিরিয়ে নেয় দেয়ালের দিকে।

ট্রেনিং শেষ। ষ্টেশন পথ ব্যারাক, ষ্টেশন পথ ক্যানটুনমেণ্ট।

বাড়িটা বদলে গেছে ভেতরে বাইরে। বসবার ঘরে সোফাসেট পিয়ানো ওয়াইন ক্যাবিনেট। মহিলা ঢুকতে অপ্রস্তুত—মিষ্টার উইলিয়ামস?

সবে এসেছি, জানি না, অফিসে জিগগেস কর।

ব্যারাক দফতরে কেরাণী বলল ও তো অনেকদিন চলে গেছে। কোথায় তা জানি না। উড়ো খবর শুনেছি পেশাওয়ার সীমান্তে মারা গেছে।

দুটো যুগ কেটে গেছে। আজ-কালের শত সমস্যায় অতীত কথা কইবার সময় পায় না। খুঁটিনাটির বিড়ম্বনায় হালকা দিনও ভারী। ছোট ছেলে স্কুল পালিয়ে এসে ঘুড়ি মেরামতে ব্যস্ত। আমার জামার একটা বোতাম এখন-তখন। বাইরে অনেক আলো, চোখে কম, ডাকি—

ছুঁচে সুতোটা পরিয়ে দাও তো!

চমকে উঠি নিজের কণ্ঠস্বরে—

ওয়ান সেকেণ্ড, মিষ্টার উইলিয়াম্‌স!

কৃষ্ণ ধর

মস্কো থেকে দেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

সোভিয়েটের দক্ষিণের দেশ আজারবাইজান।

তার গায়ে লেগে আছে আর্মেনিয়া আর জর্জিয়া, সোভিয়েটের দুই প্রজাতন্ত্র।

সীমান্তের ওপারে ইরান, তুরস্ক। কাস্পিয়ান সাগরের ওপারে তাজিকিস্তান।

এদের নিয়ে ট্রান্সককেশিয়ান ফেডারেশন। অনেক কালের পুরনো দেশ। অতীতের পৃষ্ঠা হাতড়ালে এর নাম পাওয়া যাবে। তখন এদেশকে বলা হত অ্যাট্রোপাটেনা—দ্য ল্যাণ্ড অব দি কীপারস্ অব ফায়ার।

এ হল এ দেশের তৈলসম্পদেরই প্রতীকী ব্যাখ্যা। এখন আজারবাইজানকে বলা হয় 'অয়েল রিপাবলিক'। তার রাজধানী বাকু, কাস্পিয়ানের জলে-ধোয়া এই অপরূপ শহর 'অয়েল সিটি' নামে খ্যাত। কাস্পিয়ানের তলা থেকে তুলে আনছে পেট্রোলিয়াম। দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তৈল সম্পদের অধিকারী আজারবাইজান।

ওয়াহিদের কাছে সব শুনছিলুম। কবি সে সব অর্থেই। ইংরেজি সে জানেনা। কিন্তু কালুগিন সব সময় ওর কথাগুলো তর্জমা করে দিচ্ছিল। তার নিজের দেশের ইতিহাস সংস্কৃতি, লোকজীবনের সব তথ্য একজন অনুভবী শিল্পীর মন দিয়ে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিল আমাদের।

এই বাকু শহরেই ট্রান্সককেশিয়া অঞ্চলে লেনিনের ডাকে প্রথম সোভিয়েট শক্তির আত্মপ্রকাশ। ১৯১৮ সালের ২৫ এপ্রিল বাকু কমিউন গড়ে ওঠে। তা ছিল স্বল্পায়ু। বৃটিশ ও অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের লোভ এবং স্বার্থ ছিল আজারবাইজানের তেলের ওপর; প্রতিবিপ্লবীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দেয় বাকুর বিপ্লবীদের। ৩০ সেপ্টেম্বর ২৬ জন পিপলস্ কমিশারকে ওরা হত্যা করে। তাতেও বিপ্লব ধ্বংস হয় নি। আজারবাইজান সোভিয়েট জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান সদস্য। কিছুই ছিলনা ওদের জারের

আমলে। শতকরা চারজনও জানত না লেখা পড়া। ইসলামের নামে মেয়েদের বোরখার আড়ালে রেখে দেওয়া হত।

আজ এখানে শতকরা একশোজনই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। আজারবাইজানী মেয়েরা তাদের রুশী বোনদের মতোই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সম্মানিত সহযোগিনী।

আরও অনেক তথ্য জানায় আমাদের ওয়াহিদ। ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে অনেক মিল ছিল বলেই এই এশীয় প্রজাতন্ত্রের অসাধারণ অগ্রগতি আমাদের বিস্মিত করে।

একটিও গবেষণাগার ছিল না আজারবাইজানে পঞ্চাশ বছর আগে। এখন ১২২টি বিজ্ঞান গবেষণাগার। আজারবাইজানের তরুণ ও প্রবীণ বিজ্ঞানীদের শ্রমে ও প্রতিভায় সর্বত্র সম্মানিত।

জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতির কথা গর্বের সঙ্গে জানায় ওয়াহিদ। বিপ্লবের আগে এখানকার দরিদ্র মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল ২৭ বছর; এখন তা ৭২। শতায়ুলোক কত রয়েছে। প্রতি মিলিয়নে ৮৪০ জন শতজীবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বাকু কথার অর্থ হাওয়ার শহর। কাস্পিয়ান সাগরের হাওয়া অবিরল এই সুন্দর শহরকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে রাখে। এশিয়ার শহর হলেও বাকু অবিশ্বাস্যরকম পরিচ্ছন্ন। এত গাছপালা শহরে দেখলে চোখ জুড়োয়।

সমুদ্রের ধারটাকে ওরা নন্দনকাননের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে।

শর্মা বললে, বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভের কথা মনে পড়ে।

বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভের সমুদ্র তো মৃত ব্যাকওয়াটার। এখানে নীল টলটলে।

রৌদ্র আর নীলে মিলে ওর আশ্চর্য নিসর্গচিত্র। কবিতার দেশ আজারবাইজান। গোর্কি বিপ্লবের আগেকার বাকুর বর্ণনা দিয়েছেন: 'লোকবসতির কাছে আমি আর কখনো এত কাদা আর জঞ্জাল দেখিনি। জানলার পাশে একটি ফুল, একটু ঘাসে-ঢাকা জমি, একটি গাছ বা লতাগুল্ম চোখে পড়েনি আমার।'

আজকের বাকু ফুলের জলসা বসিয়ে রেখেছে।

সমুদ্রের ধারে ছায়া-ঘেরা ছোট ছোট কাফে। সমুদ্রের জল দিয়ে সুন্দর ক্যানাল করে রেখেছে আশেপাশে। এরা বলে 'ভেনিস অব বাকু'। আমরাও গিয়ে বসি। ছোট ছোট টেবিল। দুটো টেবিল জুড়ে আমরা গোল হয়ে

বসি কাস্পিয়নের দিকে মুখ করে। গাছের ছায়া, অদূরে রৌদ্রালোকিত সমুদ্র, মৃদুমধুর সঙ্গীত, সব মিলিয়ে গল্প-করা ও আড্ডা দেবার এমন চমৎকার জায়গা রাশিয়ায় আর কোথাও পাইনি।

এখানকার মানুষগুলোও খোলামেলা। মনে হয় অনেক সময় আছে তাদের হাতে।

আমাদের মতোই চা খেতে ভালোবাসে। যখন তখন চা। যেখানে খুশি গল্প।

এরা মুসলমান। নাম শুনলে যা বোঝা যায়। তাছাড়া চেনবার কোনো উপায় নেই। মসজিদ আছে, কিন্তু মোল্লাদের দিন শেষ। ধর্মাচরণে বাধা দেয় না কেউ। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি চলে না।

অপূর্ব সুন্দরী আইজারবাইজানের মেয়েরা। চোখা নাক, বড় বড় চোখ, কালো চুল। ভারতীয় বলে ভুল হয়। তবে পোশাক সব ইয়োরোপীয় ধরণের, স্কার্ট ও ব্লাউজ। ছেলেদের সার্ট, পাৎলুন, কোট। ঠাণ্ডা কম। তাই মস্কোর মতো সব সময় পোশাকে দমবন্ধ হয় না। হালকা পোষাকই জুৎসই। এখানে এসে টেরিকটের পোষাক আমাদের কাজে লাগল।

সাশাকে তো দেখলুম সকালে ইন্‌ট্যুরিস্ট হোটেলের ঘরে খালি গায়ে বসে আছে। বেচারা মস্কোভাইট। বাকুর হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আরাম করছে।

সকাল দশটায় আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আইজারবাইজানের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে। এখানে এসে দেখছি গাড়ি চড়ে বেড়ানোর চেয়ে হাঁটতে ভাল লাগে। খোলামেলা রাস্তা, গাছের ছায়া আর কবোষ্ণ রোদ : চলতে চলতে সহরের স্থাপত্যশিল্প দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে হয় ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

বললুম, চলো একটু আগে বেরোই। হেঁটে যাব গভর্ণমেন্ট হাউসে। সমুদ্রের দিকে মুখ বিশাল একটি বাড়ি। পুলিশ সিপাই সান্ত্রী কোনো কিছুই চোখে পড়ল না। খোলা দরজা যে কেউ ঢুকতে পারে।

সোজা মন্ত্রীর ঘরে। দরজা খুলে দিলেন একজন সহকারী। চাপরাশি, আর্দালি নেই। মন্ত্রীর ঘরটিতে একটি বড় টেবিল যেখানে তিনি বসেন। পিছনে আলমারিতে বই। টেবিলে কোনো কাগজপত্র বা ফাইল চোখে পড়ল না। দুটো টেলিফোন এই মাত্র।

আমরা যেতেই তিনি উঠে সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। মুখোমুখি বসে আলাপ।

'আপনাদের স্কুলে রুশভাষা পড়া কি আবশ্যিক?'

'না। আজারবাইজানী ভাষায় স্কুলে এবং কলেজে পড়ানো হয়। রুশ ভাষা শেখা তার ইচ্ছাধীন।'

'তাতে অসুবিধা হয় না।'

'দেখুন রুশভাষা একটি উন্নত ভাষা। উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করতে গেলে রুশভাষা শিখতেই হবে। আমাদের ছাত্ররা তাই স্বেচ্ছায় এই ভাষা শেখে। সবাই রুশ জানে। য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে গেলে রুশ জানতে হয়। কারণ উচ্চতর বিজ্ঞানের বই এখনো আজারবাইজানী ভাষায় তেমন লেখা হয়নি।' 'শিক্ষার সময় কী রকম?'

'দশ বছরের স্কুল, পাঁচ বছরের য়ুনিভার্সিটি। স্কুলের পড়াশোনার কৃতিত্বের ওপর নির্ভর করে ছাত্রটিকে য়ুনিভার্সিটিতে পাঠানো হবে কিনা। সাধারণ ছেলেরা স্কুলের পড়া শেষ করেই কাজে ঢুকে যায়। ভালো ছেলেরাই য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে।'

'বেকার নেই আপনাদের? শিক্ষিত বেকার সমস্যা নিয়ে তো আমরা খুবই ব্যতিব্যস্ত।' প্রসঙ্গটা ইচ্ছা করেই তুলি।

শিক্ষা মন্ত্রী একটু হাসলেন। বললেন, না, এখানে পূর্ণ কর্মসংস্থান করে দিয়েছে সোভিয়েট সরকার। গ্রাজুয়েটরা য়ুনিভার্সিটি থেকে বের হবার তিন চার মাস আগেই জেনে যায় ক'র কোথায় কাজ। আমাদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। বেকার থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মুর্তি প্রশ্ন করে, আপনাদের ডাক্তাররা পাশ করে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে চায়, না শহরেই থাকতে চায়?

এবারেও হাসলেন শিক্ষামন্ত্রী মুস্তাফাজিয়েভ। বললেন, পাশ করে কোনো ডাক্তার যদি গ্রামে যেতে না চায় তো আমরা বুঝবো আমাদের শিক্ষানীতিতেই কোনো গলদ আছে। প্রত্যেকটি ছাত্রকে সমাজ বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র যাকে শিক্ষার সমস্ত সুযোগ এনে দিল, তার কাছ থেকে কি সমাজ উপযুক্ত প্রতিদান চাইতে পারেনা?

'তা নিশ্চয়ই পারে। তবে শহর জীবনের আকর্ষণ ছেড়ে গ্রামে থাকতে না চাওয়া তো স্বাভাবিকও হতে পারে।'

'না তা স্বাভাবিক নয়। আমরা গ্রামের মানুষের জন্য সব রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছি। যারা ফসল ফলায় বা দুরান্তরে কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করে তারা তো গোটা সমাজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই

ওখানে পড়ে আছে। তারা অবহেলিত নয়। স্কুল, হাসপাতাল, থিয়েটার সব রকম ব্যবস্থাই আছে গ্রামের মানুষের জন্য।'

শিক্ষামন্ত্রী মুখে মুখে অনেক তথ্য পরিবেষণ করলেন। একবারও সেক্রেটারিকে ডাকতে হল না। কোথায় কী হচ্ছে সব তাঁর নখদর্পণে।

'বিজ্ঞান শিক্ষার দিকেই বোধ হয় আপনারা বেশি নজর দেন?'

'তা দিই। কারণ বিজ্ঞানই সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি। কিন্তু মানবিকী বিদ্যার প্রতিও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিই।'

'আজারবাইজানী ছাত্ররা কি বিজ্ঞানই বেশি পড়ে?'

হেসে বললেন তিনি, আমাদের ছেলেরা হিউম্যানিটিজ চর্চাই বেশি করে। আমি বললুম, আপনাদের দেশের জলবায়ু প্রকৃতিই আজারবাইজানীদের সুকুমার বিদ্যায় আকৃষ্ট করেছে।

মন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা হাসলেন। বললেন হয়তো তাই।

মন্ত্রী নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। উঁচুদরের ডিগ্রী আছে তাঁর।

সাধারণ স্কুল কলেজ ছাড়াও ওখানে রয়েছে নানা রকম পেশাভিত্তিক বিদ্যালয়।

যারা স্কুল শেষ করেই জীবিকায় চলে গেছে তারাও যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য য়ুনিভার্সিটিতে সান্ধ্য ক্লাশের ব্যবস্থা। সবার জন্য খোলা য়ুনিভার্সিটির লাইব্রেরি। জানলুম, বাকু য়ুনিভার্সিটির অয়েল ইনষ্টিট্যুটে দুজন ভারতীয় ছাত্র পড়ছে। হবেই তো। গুজরাটে প্রাকৃতিক গ্যাস আর তেল খননের কাজে আমরা সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েছি। এ বিষয়ে তারা এখন নাম্বার ওয়ান। ওদের কাছ থেকে শেখবার আছে অনেক।

'শরবত খাবেন?' পরিষ্কার শুনলুম শরবত কথাটা। আজারবাইজানীদের অতি প্রিয় পানীয়। রাস্তায় শরবতের দোকান। সবাই পাঁচ কোপেক দিয়ে চমৎকার সুবাসিত পানীয় নিচ্ছে। অনেক মিল আছে আমাদের সঙ্গে। ওরাও দেখছি খুব আগ্রহী ভারত বিষয়ে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, সবাই দেখছে আমাদের। বুঝতে পেরেছে আমরা প্রাচ্যদেশের। অনেকেই যেচে কথা বলতে এসেছে, ইন্দিস্কি?

'হাঁ আমরা ইন্দিস্কি।'

আলাপ জমে যায়। আশ্চর্য জনপ্রিয় ওখানে ভারতীয় ছবি। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে শুধাই, কী জানো ভারত সম্পর্কে?

রুশীতে জবাব দেয়, ভারতের ছবি অপূর্ব। রাজকাপুর, বলরাজ সাহনী

চমৎকার অভিনেতা। একবার তোমাদের নেহরুজী, শ্রেষ্ঠ লিডার, এসেছিলে আমাদের বাকু শহরে। এসেছিলেন ইন্দিরাজী। উফ্ সে কি উৎসাহ আমাদের বাকু শহরে সে এক স্মরণীয় দিন গেছে।

আশ্চর্য সরল সাদামাটা মানুষ এরা। সহজ কথাবার্তা পছন্দ করে লুকোনো-ছাপানো নেই, অতিরিক্ত কূটনৈতিক সৌজন্যের ধার ধারেনা তোমাদের ভালো লেগেছে, ভাইয়ের মতো থাকো ঘুরে বেড়াও।

ওরা, তো জাতে রুশ নয়। কিন্তু সোভিয়েটের মানুষ। জাতে জাতে ঝগড়া বিবাদ কবে মিটে গেছে। বহু শত জাতি, অধিজাতে মিলে সোভিয়েট মহাজাতি। এদের ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, কিন্তু কই আজ পর্যন্ত তো শোনা যায়নি ওদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে কিংবা প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে হয়েছে বিরোধ ; সমালোচকরা বলেন, স্তালিন গায়ের জোরে এদের বাঁধে রেখেছিল। নইলে কবে ইউক্রাইন, বাইলোরুশিয়া কিংবা উজবেক, তাজিকরা বেরিয়ে আসত ?

এরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট আক্রান্ত হয়েছিল। প্রথম দিকে নাৎসীরা অব্যাহত গতিতে ঢুকে পড়েছিল একেবারে রাশিয়ার ভিতরে। তখন তো ইচ্ছা করলেই সোভিয়েটের এই রাজ্যগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করে বেরিয়ে যেতে পারত। মস্কো থেকে কি তখন বাকু কিংবা তাসকেণ্টে এসে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হত ? এত বড় যুদ্ধ গেল, গোটা রাশিয়ায় একজনও কুইসলিং পাওয়া গেলনা কেন ?

এই প্রশ্নগুলোর সহজ, বুদ্ধিগম্য উত্তর সমালোচক 'সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ'রা দিতে পারে নি।

বাকুতেও মেট্রো আছে। ভাবা যায় না পঞ্চাশ বছর আগে এই শহর কি ছিল। কাদামাটির তাল থেকে এমন সুন্দর প্রতিমা গড়েছে মানুষের শ্রম আর ঐকান্তিকতা। এদের চেয়েও কারা সমৃদ্ধ জগতে সে চিন্তা আমার আসেনি। থাকুক তারা। আমি দেখছি, আমাদের মতোই হতচ্ছাড়া ছিল যারা জারের আমলে, তারা আজ সোভিয়েট নাগরিক হিসেবে আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় দেশের মতো উন্নত! অথচ ও নিয়ে এরা বড়াই করে বেড়ায় না।

'তোমরা নিজের চোখে দেখো। কোনটা তোমাদের পছন্দ নয় বলো, কোনটা ভালো লেগেছে তাও বলো।'

আজারবাইজান লেখক সংঘের আপিস। বাড়িটা হাল ফ্যাশনের নয় একটু বনেদিভাব তার উঁচু সিলিং, বিশাল ঘর আর প্রশস্ত সিঁড়িতে

কার্পেট পাতা সোপান। বাড়ির দরজায় দুদিকে ছুটো গাছ শ্যামলতা এনে দিয়েছে। এখন ফুল ফোটার সময় নয় হয়তো। কিন্তু ফুল রয়েছে ঘরে চমৎকার সাজানো; শুভ্র পুষ্পস্তবকের পবিত্রতা ছড়ানো।

'ওটা কার ছবি?'

'ইনি মুহম্মদ ফিজুলি। ষোড়শ শতাব্দীর আইজারবাইজানী লেখক ও দার্শনিক। আজারবাইজান সাহিত্যের প্রাণ-পুরুষ। ইরাণী ঐতিহ্যের ধারা থেকেই আজারবাইজানি সাহিত্যের উদ্ভব। ফিজুলি ছিলেন এই সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্তক।

এই কবির নামে রয়েছে রাজপথ। তার প্রতিমূর্তি তৈরি করেছে আজারবাইজানের মানুষ বাকু শহরের কেন্দ্রস্থলে।

আমরা আসছি শুনে লেখক সংঘের সদস্যরা উপস্থিত আসরে। খ্যাতিমান সব সাহিত্যিক। কথাসাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও কবিতায় এক একজন নামী পুরুষ। মীর্জা ইব্রাহিমোভ লেখক সংঘের সভাপতি। বয়স ষাটের কাছাকাছি, সুপুরুষ। উপন্যাস লেখক হিসেবে আজারবাইজানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

আমাদের বাসুদেবম নায়ার ঔপন্যাসিক। সাহিত্য বিষয়ে তার প্রশ্ন ছিল। আমারও ছিল। এল আঙুর আপেল, মিনারেল ওয়াটার।

বললুম, চাও খাব।

আজারবাইজানি চা চমৎকার। রূপোর কারুকার্যখচিত আধারে কাঁচের পান পাত্র, তাতে সুঘ্রাণ চা। সুগার-কিউব থাকে আলাদা পাত্রে সাজানো। এক চুমুক চা নিয়ে চিনির চৌকো বড়ি মুখে ফেলে দিতে হয়। এই এখানে চা খাবার রীতি। এত চিনি আমি খেতে পারছিলুম না। ওরা দিব্যি মজা করে চা খায়।

সাহিত্যের আলোচনায় সবাই যোগ দেন। আমাদের তরুণ কবিবন্ধু ওয়াহিদ আজিজও এসেছিল আমাদের সঙ্গে।

'নতুন লেখকদের চিন্তার সঙ্গে কি আপনাদের মতো প্রবীণদের বিরোধ ঘটছে?'

'বিরোধ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? স্টাইলের না কনটেন্টের? সাহিত্যকে আমরা জীবনের অস্তিবাদী দর্পণ বলেই মনে করি। যা জীবনকে সুন্দর করে সার্থক করে একজন সৎ লেখক তো তাই লিখবেন।

'এতো বাইরের জীবনের কথা বলছেন। আজকের মানুষের অস্তিত্বের জটিলতা কি আপনাদের সাহিত্যে ধরা পড়ে না?' প্রশ্নটা ছিল নায়ারের।

ইব্রাহিম বললেন, এ সব অসুস্থ, অসুখী সমাজের চিন্তা। আমরা তাকে প্রশ্রয় দিইনা।

আমাদের সমাজে মানসিকতা এবং বাস্তবতার সঙ্গেও এর কোনো মিল নেই।

যার অস্তিত্ব নেই লেখক তা নিয়ে লিখতে যাবেন কেন?'

'নতুন লেখকদের কি আপনারা সুযোগ দেন? লেখক সংঘের সভ্য যদি কেউ না হতে চায়?'

'লেখক সংঘের সভ্য হওয়া আবশ্যিক নয়। নতুন লেখকদের সব সময়েই সুযোগ দেওয়া হয়। তবে তাঁর লেখা পছন্দ হওয়া না হওয়ার ভার সম্পাদকের। লেখক সংঘ তাতে মাথা গলায় না। ধরা-পড়া করে তো সাহিত্যিক হওয়া যায় না। এ হল শিল্পীর কাজ, সূক্ষ্ম কাজ।'

'লেখকরা কি রকম পান?

'খুব ভাল। ত্রিশ পারসেণ্ট তো বটেই। লেখা ছাপাবার দায়িত্ব সরকারী প্রকাশনের।

ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্ন নেই। একজন ভালো লেখক অনেক রুবল পান তাঁর বইয়ে। বলতে পারেন, লেখকরা প্রিভিলেজড মানুষ। সমাজকে তাঁরা মানসিক উৎকর্ষের উপকরণ দিচ্ছেন। সমাজ তাদের শিল্পকর্ম নিশ্চিন্তে করবার সমস্ত রকম সুযোগ দিচ্ছে।'

'লেখার সমালোচনা হয়?'

'নিশ্চয়ই। আমাদের পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কোনো বই বের হলে তা নিয়ে আলোচনা করেন সমালোচক। তার দোষ ত্রুটি, গুন সবই বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়।'

'পাঠকদের বক্তব্য ছাপা হয় কি?'

'পাঠকদের বক্তব্যই সবার আগে ছাপা হয়। তারাই তো সাহিত্যের আসল বিচারক।'

রুশরা পাঠক হিসেবে খুবই মরমী। ইউনেস্কোর তথ্যে জানা যায় সবচেয়ে বেশি বই ছাপা হয় রাশিয়ায়। রুশরা লক্ষ করেছি, মনোযোগী পাঠকও। শুধু নিজেদের লেখাই নয়, পৃথিবীর সব সেরা লেখকদের বই-ই তাদের কাছে প্রিয়!

অনুবাদ কর্মে রাশিয়ার পরিশ্রম ও শিক্ষা তুলনাবিহীন। সেক্সপীয়ার, গ্যয়েটে থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ, রঁলা, আঁরি বারবুস, টমাস মান কিংবা

হেমিংওয়ে, আপটন সিনক্লেয়ার সবারই বই রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এবং পঠিত।

আজারবাইজান লেখকরাও বললেন সে কথা। রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রিয় লেখক। নতুনদের মধ্যে কৃষণ চন্দর, মুলুকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, সজ্জাদ জহীরের লেখার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত। গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন বাস্তববাদী লেখকের গল্প, কবিতা, উপন্যাসের সমাদর তাঁদের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার তুলনা হয় না। তাঁর অনেক বই রুশ ও অন্যান্য ভাষায় অনুদিত। তাদের প্রকাশ সংখ্যা ৫০ লক্ষ কপি ছাড়িয়ে গেছে। থিয়েটারে, সিনেমায়, ব্যালে নৃত্যে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর রূপায়ণ করেছেন তাঁরা।

সোভিয়েট সাংবাদিক ই, বোরোভিকের একটি রচনা দেখান আমাকে ওয়াহিদ। 'উত্তর সুমেরু অঞ্চলের একটি গ্রাম ক্রাসনোইয়ে। যৌথখামারের ক্লাব গ্রন্থাগারে বলগা-হরিণ প্রজনন তত্ত্বাবধায়ক দলের নেতা নেনেতসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। হরিণের পাল নিয়ে তুন্দ্রা অঞ্চলে দীর্ঘ সময় কাটাতে যাবার আগে কিছু বই ধার নিতে এসেছিলেন গ্রন্থাগারে, অনেকগুলি বই নিলেন তিনি। তার মধ্যে সবুজ রঙের মলাটে বাঁধানো একটি বই ছিল— রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। আলাপ পরিচয় করার সময় তাঁকে জিগেস করলুম, রবীন্দ্রনাথের লেখা এর আগে তিনি পড়েছেন কিনা।

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। ওঁর লেখা আমার খুব ভালো লাগে।'

'কেন?'

'কারণ উনি মানবপ্রেমিক লেখক।'

আরও অনেক তথ্য পাই তাঁর লেখায়।

'সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র মোলদাভিয়ার রাজধানী কিশিনেভে তরুণ দর্শকদের থিয়েটর নামে এক আশ্চর্য রঙ্গমঞ্চ আছে। এই রঙ্গমঞ্চের শিল্প পরিচালক ইয়োন উন্‌গুরিয়ানুর সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে আলোচনার সময় তিনি জানালেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক মঞ্চস্থ করা।

আমি প্রশ্ন করলুম, রবীন্দ্রনাথের নাটক কোন দিক দিয়ে আকর্ষনীয় মনে করেন? তিনি বললেন, প্রত্যেকের কাছেই কিছু-না-কিছু বলার আছে রবীন্দ্রনাথের। আশ্চর্য বহুমুখী প্রতিভা তাঁর। তিনি একাধারে গীতিকবি, বাস্তববাদী গল্পলেখক, আবার ওঁর নাটকে মেলে রোমান্সের আমেজ। আমাদের মোলদাভিয়ার মানুষের রোমান্স ভারি পছন্দ। রবীন্দ্রসাহিত্য সুন্দর, অর্থাৎ

মানুষের সেরা চরিত্র বৈশিষ্ট্য, অন্যায়কে পর্যুদস্ত করে। আর এই কারণেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে এত পছন্দ করি।

য়ুক্রাইনের কবি আঁদ্রেই মালিশকো একদল ভারতীয় লেখককে নিজের হাতে ধরা মাছের নিজ-হাতে রান্না করা ঝোল খাওয়াতে খাওয়াতে সাহিত্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ছিপে মাছ ধরতে ভালোবাসতেন।

অতিথিরা অবাক। মাছের ঝোল চাখতে চাখতে বলেন, কী করে জানলেন! কী করে আবার? কবির 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি মনে করে দেখুন। গল্পটিতে লেখক মাছমারা আর ছেলেদের কথা কত দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, মনে পড়ে?' প্রাচ্যবিদ্যাবিদ আলেকজান্দর গনাতিয়ুক-দানিলচুককে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক ইনস্টিট্যুটে অতগুলি ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলাভাষা বেছে নিয়েছিলেন কেন?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, এর কারণ একটিই। রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয় লেখক, আমি মূল ভাষায় রবীন্দ্র-রচনাবলী পড়ার জন্যে খুবই ব্যাকুল হয়েছিলুম।'

বাকু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য নাট্য চিত্রাঙ্গদা। ওয়াহিদ জানালে, আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছি কবির ওই আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি।

আমার দুঃখ হল, এমন একটি প্রযোজনা দেখবার সুযোগ হল না আমাদের। অনেকদিক থেকেই বাকুর শিল্পীদের মনের ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের এই অপরূপ নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করার।

'চিত্রা' নামে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন আজারবাইজানের শিল্পীরা। মূল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে নৃত্যনাট্যে সুর সংযোজনা করেন সোভিয়েট শিল্পী তাগি-জাদে নিয়াজি। বাকুর বিখ্যাত আখন্দুনভ অপেরা ও ব্যালে থিয়েটারে নৃত্য-নাট্য পরিবেশিত হয় পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে।

তাগি-জাদে নিয়াজি বলেছিলেন, ছোটবেলা থেকেই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতীয় বিষয় নিয়ে সঙ্গীত রচনার। ভারতীয় সঙ্গীত তার সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও গভীরতায় শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কয়েক বছর আগে থেকে আমি 'চিত্রা'র কাজ শুরু করেছি। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত সুরের ভিত্তিতে সঙ্গীত রচনা। এই নৃত্যনাট্যের সঙ্গীতের জন্য তা ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় সুর ও নৃত্যের তাল ও ছন্দ আমি ব্যবহার করেছি।'

চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা নিয়েছিলেন তামিলা শিরালিয়েভা ; অর্জুন হয়েছিলেন ভ্লাদিমির প্রেৎনেভ।

যা দেখছি মন ভরে যাচ্ছে। ভারতের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তাবোধে এখানকার মানুষ উদ্দীপ্ত। হিন্দুস্থানের সঙ্গে প্রাচীন আজারবাইজানের যোগ বহুদিনের। ইতিহাসে তা লেখা আছে। উত্তর ভারতের বণিকরা আসতেন ক্যারাভেনে হিন্দুকুশ পার হয়ে, পামিরের ওপর দিয়ে। ওয়াহিদ আমাদের দেখাতে নিয়ে গেল তার নিদর্শন। বাকু শহরের উপান্তে সযত্নে রক্ষিত একটি হিন্দু মন্দির। এরা বলে আতসগাহ্ (আতসগৃহ) অগ্নিমন্দির। অগ্নিউপাসক এরা কাদের বলেন জানি না। মনে হল মন্দিরের যজ্ঞকুণ্ড দেখে এটা ছিল হিন্দু যাত্রীদের উপাসনাগার।

আমাদের খুব উৎসাহ নিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল একটি সুন্দরী তরুণী।

হঠাৎ দেখলে পার্শী মেয়ে বলে ভুল হতে পারে।

'কী নাম তোমার ?'

'আমার নাম বেলা।' সলজ্জ ভঙ্গিতে বললে মেয়েটি।

'বেলা, এ তো পরিষ্কার ভারতীয় নাম। তুমি কি আজারবাইজানী ?'

'না, আমি আর্মেনিয়ান। কলেজে পড়ি। ইংরেজি জানি বলে ট্যুরিস্টদের জন্যও কাজ করি অবসর সময়ে।'

মন্দিরের প্রবেশ-তোরণে সংস্কৃতে তার প্রতিষ্ঠাতার নাম উৎকীর্ণ।

'ওঁ শ্রীগণেশায় নম স্বস্তি শ্রীনরপতি বিক্রমাদিত্য রাজাশকে কৃত সম্বৎসরে মাস পক্ষে রাত্রিদিন শ্রীজ্বালাজি নির্মিত মন্দির' ইত্যাদি। মন্দির শীর্ষে মহাকালের ত্রিশূল।

গ্যাসে আগুন জ্বালিয়ে দেখাল কী ভাবে এখানে হত আগুনের উপাসনা।

পূজারীরা নেই। পুজোর আসবাব-উপচার সযত্নে রেখে দেওয়া আছে। কাঁসর, ঘণ্টা সবই আছে।

হিন্দুরা কীভাবে পুজো করত শ্রীমতী বেলা ঘণ্টা বাজিয়ে তা আমাদের দেখাল।

আমরা ভারত থেকে এসেছি শুনে বেলার আগ্রহের অন্ত নাই।

কোথায় তারা উপাসনা করত, কোথায় তপস্যা করত সব ঘুরে ঘুরে দেখাল সে।

শহরে রয়েছে একটি মুলতানী সরাইখানার স্মৃতিচিহ্ন। নামেই বোঝা যায়

মুলতান থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আসত। এটা ছিল তাদের বাণিজ্য-পথ। এখান থেকে ওরা যেত ইরাণে, তুরস্কে, রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায়।

এদিক থেকেও পর্যকরা আকৃষ্ট হয়ে গেছেন ভারতে। আঠারো শতকে এসেছিলেন আফানিসি নিকিতিন। তাঁর ভারতভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে রুশ ভাষায়। এসেছিলেন আমাদের কলকাতায় গেরাসিম লেবেদেফ। বাংলা নাট্যশালার জন্মদাতারূপে যিনি স্মরণীয়।

পুরনোদিনের বাকুর চিহ্ন রয়েছে শিরবান শাহ্‌ব আমলের শহরের এলাকায়। নতুন বাকুর পাশেই তা রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা দেখছিলুম। মনে হচ্ছিল মোগল আমলের কোনো শহরে যেন আমরা চলেছি। পুরনো প্রাসাদ, মসজিদ, ছোট ছোট গলিপথ, সরাইখানা সব পাথরে বাঁধানো। সবই চমৎকার করে রাখা হয়েছে। লোকবসতিও আছে সেখানে। এই শহরের এই অংশটিকেও ঢেলে সাজানো হবে। তার ব্লু-প্রিণ্ট দেখলুম। হয়তো আর দশ বছর পরে এলে পুরনো বাকুর ওই অংশটিকে আর চেনাই যাবে না। কাস্পিয়ানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে শিরবান শাহ্‌দের আমলে তৈরি এক সুউচ্চ টাওয়ার। এর নাম কুমারীর টাওয়ার, দি মেডেনস্‌ টাওয়ার।

দুর্গের ভিতরে টাওয়ারের মতো দেখতে। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শিরবান বংশের শাসকরা ছিলেন আজারবাইজানের প্রভু। তাদেরই এক শাসক এই সুউচ্চ টাওয়ারটি তৈরি করিয়েছিলেন তার কন্যার অনুরোধে। লোককাহিনী আছে, শাসক পিতার নাকি অস্বাভাবিক কামনা ছিল কন্যার প্রতি। কন্যা নিজেকে এই কামনা থেকে বাঁচাবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করেন একটি টাওয়ার তৈরি করে দিতে যার সুউচ্চ কক্ষ থেকে নয়নাভিরাম কাস্পিয়ান সমুদ্রের তরঙ্গলীলা সে দেখতে পারবে।

কন্যার মনে আশা ছিল যতদিনে এই টাওয়ার নির্মাণ শেষ হবে তার পিতার মনের অস্বাভাবিক কামনা ততদিনে হয়তো ধুয়ে মুছে যাবে। তা হয় নি।

কুমারী কন্যার আর কোনো পথ ছিল না। ওই টাওয়ার থেকে তিনি ঝাঁপ দেন সমুদ্রে।

এমনি অনেক কাহিনী ছড়িয়ে আছে শিরবান বাদশাদের নিয়ে। শিরবান শাহর প্রাসাদ এখন জাতীয় মিউজিয়ম। তার শিল্পস্থাপত্য, চিত্রকলা সব কিছুর সঙ্গেই মুঘলের আশ্চর্য মিল।

মুঘল বাবর তো ফরগণা থেকেই গিয়েছিলেন দিল্লিতে। তাসকেণ্ট থেকে সেখানে যেতে হয়।

আমরা এসেছি শুনে বাকুর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহলে প্রচুর উৎসাহ। সবাই দেখা করতে চায়, কথা বলতে চায়। রাস্তায় অপরিচিত মানুষ ডেকে দু'দণ্ড কথা বলে। ইন্দিস্কি কিনা তাই।

ইনটুরিস্ট হোটেলে বসে গল্প করছিলুম। আমার সহযাত্রী সবাই খুশি, সত্যিই বাকু আসা সার্থক। আজারবাইজানের সৌন্দর্য তার প্রকৃতি আর অসীম নীল বারিধিতেই নয় তার মানুষের হৃদয়েও।

সাশা তো আমাদের বসতে দেয় না। দেখবার জন্যে সব সময়েই সে তৈরি। বললে তোমাদের জন্যে একজন সাংবাদিক নিচে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে। সাংবাদিক বটেই তবে রূপসী এক তরুণী।

'আমি আসছি 'ইভনিং বাকু' কাগজের তরফ থেকে। আমার নাম মারিয়া তোরবা।' মেয়েটি সুন্দর নম্র ভাষায় নিজের পরিচয় দিল।

আমরা গোল হয়ে বসি।

মারিয়া ব্যাগ থেকে কাগজ পেন্সিল বার করে তৈরি।

আমরাই হোমরা-চোমরা বড় মানুষদের কাছে গিয়ে নোট বুক কলম বার করি ইনটারভ্যুর জন্য। এখন দেখছি আমরাও ভি. আই. পি.।

'কেমন লাগল আমাদের দেশ বলো।' খুব সহজভাবে প্রশ্ন করে মারিয়া।

'খুব ভাল। তোমাদের দেশের মেয়েরা আরও ভাল। খুব সুন্দরী।'

যেন বা আরক্তিম হয়ে উঠল মারিয়ার সুন্দর মুখখানি। হবেই তো? আসলে ওতো মেয়ে। যতই সাংবাদিক স্মার্টনেস দেখাক না কেন?

শর্মাজী বলেন, তোমাদের সমুদ্রতীরে রৌদ্র আর ছায়াবীথিতে তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকাদের গুঞ্জন আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমরাও যেন ফিরে পেয়েছি তারুণ্য।'

সাশা হল কমিউনিস্ট। খুব গম্ভীর মুখে প্রতিটি কথার অনুবাদ করে ওকে শোনায়। মারিয়া চোখ তুলে তাকাল না। নোট বুকে ও কথা লেখবারই কী আছে।

আমি বললুম তোমাদের দেশের মানুষকেই সবচেয়ে ভালো লেগেছে। সোভিয়েটের নতুন মানুষ। এরাই তোমাদের সম্পদ, তা আমরা আবিষ্কার করে কত না খুশি কী বলবো তোমায়? পথ চলা মানেই পথের মানুষকে পাওয়া। একটা কবিতা শুনবে?

'পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে
পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া।'

'কার লেখা ?'

'কার আবার ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।'

মারিয়া উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, আশ্চর্য মরমী কবি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

'তিনি এ রকম তিন হাজার গান লিখে গেছেন।'

'আমাকে বেঙ্গলিজ্ শিখতে হবে।' মারিয়া বলে হেসে।

'তুমি এসো আমাদের দেশে শেখাব।'

বড় বড় হরফে আমাদের সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট ছাপা হল 'ইভনিং বাকুতে। সাশা আমাদের কপি এনে দেখাল।

ইউক্রাইনের মেয়ে মারিয়া তোরবা আমাদের সেই সকালটি আশ্চর্য মাধুর্যে ভরিয়ে দিয়েছিল।

আজারবাইজানী খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে খানদানী হল সাশলিক। মোগলাই ধরনের মাংস আর কি। তবে মশলাপাতি তেল কম। চমৎকার খেতে। টুকরো মাংস অল্প ভাজা ভাজা, সুগন্ধী ও স্বাদু। সঙ্গে সালাড হিসেবে দেয় এক রকমের কচি পাতাওয়ালা, পুদিনা কি ধনে পাতার মতো ডাল। কাচা চিবিয়ে খেতে হয়। ইনট্যুরিস্ট হোটেলের রেস্তোরাঁয় জায়গা ধরে না। বাকু কনসার্ট সুর তুলেছে। সুপুরুষ এক যুবক ভারি গলায় গাইছে গান। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। খুব দরদী গলা।

'কার গান গাইছে ?' আমি জিগ্যেস করি।

'এটি হল এসেনিনের লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা 'মায়ের কাছে চিঠি।'

এসেনিন আমার প্রিয় কবি। মায়াকভস্কির সমসাময়িকই হবেন। তার অশান্ত মনের ছবি পাই এই গানটিতে।

এসেনিন বলছেন, মা আমি জানি তুমি ওই দুরন্ত ছেলের জন্য অপেক্ষা করে আছো। আমার জন্যে উতলা হয়োনা তুমি। বার বার ওই পোষাকে তুমি বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িও না। লোকে ভাববে ছেলেটার জন্যে মায়ের কী দশা। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার অবাধ্য ছেলে। আমি ভালো হয়ে গেছি। মস্কোতে আমি ভালভাবে থাকি। খুব শান্ত হয়ে গেছি মা। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি আসবো তোমার কাছে। তুমি আর অমন করে ঘর-বার করো না লক্ষ্মীটি।'

সাশা আস্তে আস্তে নিচু গলায় তর্জমা করে শোনায় আমাকে। আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল। বাকু শহরে ওই সুদৃশ্য রেস্তোরাঁয় বসে আছি আমি। সামনে সুখাদ্য, কানে শুনছি এক আকুল হৃদয়ের দহন-

আলার গান। আমার মাও অপেক্ষা করে আছেন তাঁর রোগ শয্যায় কবে আমি ফিরব।

আমার চোখে যেন জল এল। কোনো রকমে তা লুকোই।

আশ্চর্য সুরুচি এদের। গানে, নাচে, শিল্পকর্মে সাধারণ মানুষকে তারা দেয় নতুন মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয়। পপ্ গানের অসঙ্গতি এখানে নেই। রুশ চিরায়ত শিল্পের মাধুর্যের সঙ্গে এরা শিল্পীর অনুভবী হৃদয়ের সংযোগ ঘটিয়েছে। সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রাকে করেছে সমুন্নত, রুচিশীল।

'কবিতাপাঠের আসর বসানো যাক আজ।' সাশার প্রস্তাব, 'ওয়াহিদ ও তুমি কবিতা শোনাবে।'

নায়ার বললে, আমি তো গল্প-উপন্যাস লিখি। পড়ে শোনাতে পারব না?

শর্মা বললেন আমি স্রেফ সাংবাদিক। আমি শুনে যাব।

মূর্তি বললে, আমিও।

আমার সঙ্গে দুটি ছোট বই ছিল। তা থেকেই তিনটি কবিতা পড়লুম ইংরেজিতে তর্জমা করে।

ওয়াহিদ বললে, তোমার কবিতা পড়ে নাজিম হিকমতের কথা মনে পড়ল। একবার বাংলায় পড়ে শোনাও।

শুনে বললে, তোমাদের ভাষা সঙ্গীতের মতো ধ্বনিময়।

আমি বললুম, তা চিত্ররূপময়ও।

ওয়াহিদ বিপ্লবী রোমান্টিক কবি। আধুনিক জীবন থেকে আহরণ করে সে কবিতার চিত্রকল্প। ছোট কবিতায় আশ্চর্য সংবেদনশীলতা ফুটে উঠেছে তার হাতে।

'কাকে ভাল লাগে তোমার?'

'বিদেশীদের মধ্যে লরকা, পাবলো নেরুদা নাজিম হিকমত। আমাদের দেশের পুশকিন।'

'মায়াকোভস্কি কেমন লাগে?' আমি জিগ্যেস করি।

'মায়াকোভস্কি আমার প্রিয় কবি। পুশকিন আমার হৃদয়ের।' বলে সে। আমাকে জিগ্যেস করলে, নতুন কী লিখছ?

'ভিয়েতনাম।'

'আমিও লিখেছি। শিগগিরই বেরুবে।'

কবিতা নিয়ে নানান আলোচনা হয়।

আমি ওকে প্রশ্ন করি, সমাজতান্ত্রিক দেশে তো সমাজের মধ্যে কোনো অন্তর্বিরোধ বা কনট্রাডিকশন নেই। তুমি তাহলে লেখার বিষয় পাও কি করে ?

'অতি সুন্দর প্রশ্ন।' ওয়াহিদ বলে, স্তাখো বাইরের কনট্রাডিকশন না থাকলেও কবির মন তার সৃজনীক্রিয়ায় তা খুঁজে পায় অন্যত্র। কবিতা তৈরি হয় তিনটি উপাদানে—হৃদয় মস্তিষ্ক আর চোখের জল; আমাদের সমাজ শ্রেণীহীন, বাইরের সংঘাত লুপ্ত, কিন্তু কবির মনে তো বৈপরীত্যের খেলা চলছেই। যেমন বৈপরীত্য আছে প্রকৃতিতে ঋতুতে। বর্ষার পর আসে বসন্ত, শীতের পর গ্রীষ্ম। গত শীতে পাতা ঝরেছে, এবারের বসন্ত ফুল ফোটাবার জন্যে। কবি তো শুধু নিজের দেশেই বাস করেনা। পৃথিবীর যেখানেই দুঃখ, যেখানেই সংঘাত সেখানেই কবির উপস্থিতি। তাদের কথা ভেবে আমি লিখি। তাদের দুঃখ আমাকে কাঁদায়, তাদের জয় আমাকে জাগায়।'

বলতে বলতে ওর শান্ত চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বললে, জানো কবির কাজ হল টেলিফোন যন্ত্রের মতো। একজন বাকুতে একজন কলকাতায়। যেখানে বসেই কবিতা পড়ুক না কেন, দুজন পাঠককে একজায়গায় মিলিয়ে দেওয়াই হল কবিতার কাজ। সে জন্যেই তো আজারবাইজানে বসে ইউজিন ওনিগিন যেমন আমাকে ভাবায়, চিত্রাঙ্গদার বেদনাও আমাকে তেমনি কাঁদায়। হৃদয়কে জাগিয়ে দেয় বলেই কবিতা সর্বকালের সবদেশের।

আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে আলোচনা হয়।

ওয়াহিদ বলল, আমার মতে কবিতার ভাষা হবে সহজ। যে সব মার্ক্সবাদী কবি দুরূহ ভাষায় লেখেন তারা মার্ক্সবাদ বোঝেন না। সমাজবাদী বাস্তবতা আমার হৃদয়ে, তাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে আমি লিখি। রবীন্দ্রনাথ, নাজিম হিকমত, লরকা আমাকে সে কারণেই আকর্ষণ করে।

ওয়াহিদকে নিয়ে ঠাট্টা করি, সাতাশ বছর বয়স হল, এখনো বিয়ের ফুল ফুটলনা তোমার্।

চোখ টিপে হাসে। বলে শাড়ি পরা কোনো বধুর জন্যে অপেক্ষা করছি।

'বেশ তো, আমরা ঘটকালি করতে পারি।

'ভারতবর্ষ আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। আমাদের এক কবি তৌফিক

বৈরাম ভারত সম্পর্কে তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন, হিন্দুস্থান হল একগুচ্ছ গোলাপ, আমাদের গ্রহে সূর্যের উপহার। মনে পড়ল লেখক সংঘের আপিস থেকে বেরিয়ে আসবার পথে তোফিক বৈরামের সঙ্গে দেখা পথে। আমাদের তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়েই শুনিয়েছিলেন তাঁর কবিতা। তার নাম 'বাকুতে জওহরলাল':

"আন্তরিক ভালবাসায় আমাদের দুটি দেশকে তিনি এক করে দেখিয়েছেন অন্তরে বুঝি, জওহরলালজী চিরকালের অতিথি আমার দেশের মানুষের হৃদয়ে অঙ্গনে।"

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য

কুসুমশর

গৌতম সরকারের ড্রয়িং রুমে একটা রেক্সিন মোড়া চেয়ারে বসেছিলাম। সামনে ইজিচেয়ারে বসেছিল গৌতম। অর্ধশায়িত ভঙ্গীতে। মুখে অর্ধদগ্ধ সিগারেট। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ে উড়ে ঘোরালো করে তুলছিল ওর চোখমুখ।

গৌতমের চেহারাটায় যেন আগের চেয়ে জৌলুষ কমে গেছে। কয়েক মাসের জল ঝড় আর অত্যাচারে। দুর্ঘটনায় অনেকটা পঙ্গু করে ফেলেছে ওকে। লহমায় যেন ভিতরটা ধরা পড়ে যায়। চোথ দেখলে বোঝা যায় চিন্তাকুল। মুখেও বিষাদের ছায়া যেন দাগ কেটে বসেছে।

ইজিচেয়ার ছেড়ে এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল গৌতম। প্রশংসা ভরা চোখে তাকিয়ে দেখছিল ওর বলিষ্ঠ সুপুরুষ চেহারা। ড্রয়িং রুমের এক কোণ থেকে আরেক কোণে ওর পাইথনের চামড়ার চটিটা ঘোরা ফেরা করছে। অবিশ্রান্ত পায়চারীর ক্লান্তিকর একঘেয়েমী ও বোধ হয় টের পাচ্ছে না।

গৌতমের কাছে এসেছিলাম তার স্ত্রীবিয়োগে সান্ত্বনা জানাতে। কাহিনীটা ছোট্ট। মাস খানেক আগে রাঁচীর হুণ্ড্রু ফল্‌সে বেড়াতে গিয়েছিল ওরা দুজনে। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনায় হঠাৎ উঁচু পাহাড় থেকে অনেক নীচে পাথর আর জলের আবর্তের মধ্যে পড়ে যায় বন্দনা। বন্দনার দেহ যখন জল থেকে তোলা হয় তখন অবশ্য তাতে প্রাণ ছিল না।

পাথরের মত নাকি সেদিন নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল গৌতম। একটা প্রচণ্ড রূঢ় আঘাতে অবশ হয়ে গিয়েছিল যেন।

বন্ধুবৎসল গৌতমের স্ত্রীবিয়োগে বিমূঢ় হয়েছিল সকলেই। বাড়ীতে আত্মীয়-বন্ধুর ভীড় কম হয় নি। সান্ত্বনা জানাতে সবাই এসেছিল এগিয়ে। কতই বা বয়স হয়েছে গৌতমের—কতই বা বয়স ছিল বন্দনার। অথচ গৌতমের মত এমন গভীরভাবে স্ত্রীকে ভালবাসতে পেরেছিল কজন।

এই আকস্মিক আঘাত অল্প কদিনেই বিকল করে ফেলেছে গৌতমকে। গৌতমের মত শক্ত মনের বলিষ্ঠ পুরুষকেও কতটা কাতর করে ফেলেছে স্পষ্ট বোঝা যায়। ওর মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে যন্ত্রণার ছাপ।

বোম্বাই থেকে সেদিন ফিরে এসে খবরটা পেয়ে আমিও কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। মনে হয়েছে ভয়ানক রকমের অপ্রত্যাশিত! কপালের রেখা বোধ হয় কেউ মুছে ফেলতে পারে না।

ভেবেছিলাম গৌতমকে সহজ করে তুলবার চেষ্টা করব। কিন্তু কাজটা মনে হল বেশ সুকঠিন।

বল্লাম, এই দুঃখ তো জীবনের প্রাপ্য। মনটাকে একটু হাল্কা করার চেষ্টা কর গৌতম। অত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

গৌতম বল্ল, কখনো ভারী লোহা চোখে দেখেছিস ভাস্কর? মনে হচ্ছে সব সময় তার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও নিষ্কৃতি নেই।

বল্লাম, তবু মনকে শক্ত করে তোলাটাই আজ তোর দরকার। দুঃখকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের আর কি উপায় আছে বল্?

গৌতম একটু ম্লান হাসি হাসবার চেষ্টা করল।

বল্লাম, নিজেকে সহজ করে না তুললে ধীরে ধীরে এই মানসিক গ্লানি তোর দেহের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। কথাটা ভুলে যাস্ না।

গৌতম এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। মুখ দেখে বোঝা গেল চিন্তায় কালো। ওর অস্থির পায়ের শব্দ ঘুরে ফিরতে লাগল ড্রয়িং রুমের এক কোণ থেকে আরেক কোণ।

চেয়ারে বসে বসে আমি একমনে ভাববার চেষ্টা করলাম গৌতম আর বন্দনার কথা। বেশীদিনের নয়। মাত্র কয়েকটা বছরের কাহিনী।

গৌতম আর বন্দনাকে যারাই পাশাপাশি দেখেছে তারাই অবাক না হয়ে পারে নি। একজোড়া হুইস্লিং টিল হাঁসের মত মনে হত ওদের দুজনকে। একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনের কথা কল্পনাও করা যেত না বোধ হয়। অদ্ভুত ছিল ওদের দুজনের মিল।

হাসিতে মুক্তো ছিটিয়ে যখন তাকাত বন্দনা কিম্বা তরল চটুলতায় ভরে উঠত তখন খুশী খুশী দেখাত গৌতমের মুখ। যখন তীক্ষ্ণ রসিকতায় মুখর হয়ে উঠত গৌতম তখন বন্দনা উপায়ান্তর না দেখে বাজেয়াপ্ত করে রাখত গৌতমের সিগারেট কেস্। মান অভিমানের পালা চলত কখনো কখনো।

অদ্ভুত সুখী দম্পতি ছিল ওরা। বহুলোকের মনে ঈর্ষা জাগত ওদের দেখে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী দুরন্ত পাখির মত উড়ে বেরিয়েছে ওরা। ওদের ট্যুরিষ্ট ব্যাগ ভরে উঠেছে রকমারী কিউরিওর সরঞ্জামে। সমস্ত ড্রয়িংরুমটায় ছড়ানো রয়েছে তার নিদর্শন।

ব্যাপারটা গৌতমই খুলে বলেছিল একদিন। বলেছিল, ব্যাপারটা একটু আকস্মিক। নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। সেবারে পুজোর ছুটীতে দার্জিলিং যাব না সিমলা যাব টস্ করে ঠিক করেছিলাম।

শেষকালে জয়ী হয়েছিল দার্জিলিং। কোন হোটেলে উঠব তাও ঠিক ছিল না। অবশেষে কপাল ঠুকে ঢুকে পড়েছিলাম ভদ্র চেহারার একটা হোটেলের দরজা ঠেলে।

আমার হিসেবে ভুল হয় নি। হোটেলটা ছিল বেশ সুন্দর। ভিতরে এবং বাইরে দুদিকেই কেতাদুরস্ত। আয়তনেও ছিল বেশ বড়। বোর্ডারদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না।

এই হোটেলেই হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল রঞ্জিৎ বাবুর সঙ্গে। বেশ দিল্‌খোসা মজ্‌লিশী লোক। অল্প কদিন হল সপরিবারে এই হোটেলে এসে উঠেছেন। সেই সঙ্গে আলাপ জমে উঠল তাঁর তিনজন অবিবাহিতা তরুণী মেয়ের সঙ্গে। বন্দনা, চৈতালী আর সোনালী।

বিকেলের দিকে আমরা প্রায়ই একত্রে বেড়াতে যেতাম। দল বেশ ভারী হয়ে উঠত। বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম আমরা। গল্পে গল্পে পাহাড়ী হাঁটা পথে কেটে যেত বেশ বিকেলটা।

বড় মেয়ে বন্দনাকেই আমার সব চাইতে মিশুক বলে মনে হয়েছিল। হরিণের মত চটুল ছিল ওর চাউনি। বৃষ্টির তোড়ের মত অনর্গল কথা বলতে পারত বন্দনা।

আর ওর চাউনিটাও কেমন যেন লোভী লোভী মনে হত। চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রলোভন ঢেলে আমার দিকে তাকাত মেয়েটি।

সমস্ত খেলাটায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল বন্দনা। আমি ছিলাম নিষ্ক্রিয় দর্শক।

একদিন হোটেলের সরু গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকছিলাম। বন্দনা একই সঙ্গে আসছিল আমার সঙ্গে। গায়ে ঘেঁষা ঘেঁষি হবার ভয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম আমি। পথ করে দিলাম বন্দনার।

বন্দনা কিন্তু খুশী হল না। চোখে বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠল ওর। বল্ল, আমি জল-বিছুটি নয়! আমায় ছুঁলে জ্বালা ধরত না আপনার শরীরে।

বল্লাম, মেয়েদের সঙ্গে গা ঘেঁষা ঘেঁষি করে চলাটা আমার অভ্যেস নয়।

বন্দনা বল্ল, আপনার দেখছি মর‍্যালিটির জ্ঞান খুব টন্‌টনে। একটা বই লিখে ফেলুন না।

আরেকদিন বিকেল বেলা দলছাড়া হয়ে আমি আর বন্দনা পিছিয়ে পড়েছিলাম। মাথা ধরার অজুহাতে সোনালী বিদায় নিয়েছিল। চৈতালী উধাও হয়েছিল সামনের দিকে পাইন বনের আকর্ষণে।

জায়গাটা খুব সুন্দর লেগেছিল সেদিন। একদিকে নীচু ঢালু উপত্যকা। অন্যদিকে হিমালয়ের উঁচু উঁচু নীলাভ চূড়া চোখে পড়েছিল। আরও দূরে চোখে পড়েছিল বরফে ঢাকা কতগুলি পাহাড়ের মাথা।

অতবড় ফাঁকা প্রকৃতির বুকে আমরা দুটি প্রাণী ছাড়া সেদিন অন্য আর কেউ ছিল না।

ফেরার পথে পাহাড়ী রাস্তায় দেখলাম বন্দনার মুখ অমাবস্যার মত কালো হয়ে আছে।

বল্লাম, এত গম্ভীর কেন?

বন্দনা বল্ল, আজ আপনি কি করলেন বলুন তো?

আমি বল্লাম, কি আবার করলাম?

বন্দনা বল্ল, মারাত্মক ভুল। এমন সুন্দর সুযোগ ছিল আজকে। জনপ্রাণীও ছিল না। শুধু ছিল প্রকৃতি। কোন পুরুষ এ রকম সুযোগ হাতে পেয়েও হারাতে পারে আমি কখনো কল্পনাও করি নি।

আমি বল্লাম, সমস্ত জিনিসটা একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াত না?

বন্দনা বল্ল, একজনের কাছে যেটা প্রহসন আরেকজনের কাছে সেটা অতি গুরুতর জিনিষও হতে পারে। জীবনের একটা জটিল সমস্যা।

বল্লাম, বড় বেশী সীরিয়াস্ হয়ে যাচ্ছ।

বন্দনা বল্ল, এ রকম ব্যাপারে কোন মেয়ে লঘু হয়ে উঠতে পারে না।

এ রকম কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা আরও ঘটেছিল।

শহরেও শ্রুতিসুখকর গল্পে পরিণত হয়েছিল আমাদের দুজনের কাহিনী। ব্যাপারটা গড়িয়ে গিয়েছিল বেশীদূর।

শেষকালে একদিন সন্ধ্যাবেলা হোটেলে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিল বন্দনা। বাইরে তখন ঝির্ ঝিরে বৃষ্টি ঝরছে। কাচের সার্সির ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের মাথায় বৃষ্টি দেখছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম ওকে দেখে।

দরজার সামনে বন্দনা দাঁড়িয়ে। ওর মুখে দৃঢ়প্রত্যয়—চোয়ালে কঠিন প্রতিজ্ঞা।

বন্দনা বলেছিল, আর এইভাবে চলতে দেওয়া অসম্ভব। আর দেরী করা চলে না।

রাত্রির আলোয় ওর চোখ জলছিল। সেই চোখ দেখে আমিও ভয় পেয়েছিলাম।

তারপরের ঘটনাটা তোমাদের জানা। লাল খামে মোড়া বিয়ের চিঠি আজও বোধ হয় মনে আছে।......

গৌতমের কাছে যেদিন এই গল্প শুনেছিলাম সেদিন রোমাঞ্চ জেগে উঠেছিল আমার শরীরে।

আজ ড্রয়িং রুমের চেয়ারে বসে বসে সেকথা ভাবতে ভাবতে মনটা কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিল ; চিন্তার মেঘ জমে উঠছিল মনের মধ্যে।

চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেদিনকার কথা। এই তো সেদিন দেখেছি গৌতম আর বন্দনাকে। ষ্টিয়ারিঙ্ হাতে নিয়ে বসে আছে বলিষ্ঠদেহী গৌতম। পাশের সীটে উচ্ছল ঝর্ণার মত বন্দনা। ডায়মণ্ডহারবার্ রোডের কালো রাস্তায় গাড়ীর স্পিড্ উঠছে দ্রুতবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে মীটারের কাঁটা। আর হঠাৎ মনে পড়ল নৈহাটীর বাগানবাড়ীতে পিক্‌নিকের কথা। রান্নার ভার নিয়েছিল সেদিন বন্দনা। গৌতম সেদিন গীটার বাজিয়েছিল মনে আছে।

পায়চারী করতে করতে সামনে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল গৌতম। আমারও তন্দ্রা ভেঙে গেল যেন। মনে হল এক যুগ পরে ঘুম থেকে উঠলাম। কিন্তু অস্বাভাবিক গম্ভীর মনে হল গৌতমের মুখ।

গৌতম আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল, কি ভাবছিস্? হুণ্ডরু জংগলে ঘেরা বিরাট পাহাড়ের উপর সরু পাথরের কোণায় বন্দনা কি ভাবে দাঁড়িয়েছিল? ঠিক মৃত্যুর আগের মুহূর্তে! তাই কি?

আমি বোবা হয়ে তাকিয়ে রইলাম। অঙ্গারের মত হঠাৎ চোখ জলতে লাগল গৌতমের।

আমার জার্মান ক্যামেরায় ওকে ধরে রাখবার জন্ত পাথরের কোণটায় আমিই ওকে দাঁড়াতে বলেছিলাম। বন্দনা স্মার্ট মেয়ে। ভয় পায় নি।

কিন্তু আমি পেয়েছিলাম। একটু দম নিল গৌতম।

এতদিনকার সেই অবাঞ্ছিত কাঁটাটা—যেটা এতদিন ধরে অনবরত খচ্ খচ্ করে আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে—আমাকে প্রচণ্ড অসুখী করে তুলেছে—তাকে শেষবারের মত খসিয়ে দেবার আগে আমিও ভয় পেয়েছিলাম।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল গৌতমের। আমি আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখের দিকে।

বন্দনা জানত না। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও জানত না বন্দনা যে খবরটা আমি জানতাম। সরু পাথরটা আলগা ছিল।

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

রাধামোহন সেন-কৃত সঙ্গীত তরঙ্গ

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বরোৎপত্তির স্থান

স্বরের উত্থান-উদাহরণ ।
পরিমান-স্থান করি রচন ॥১
পণ্ডিতগনের সু-অনুভব ।
কতগুলি পশু-পক্ষীর রব ॥২
খরজ-পরিমান খর-রব ।
মতান্তরে শিখি-রবে উদ্ভব ॥৩
রিখভ গাবী-রব-পরিমাণে ।
মতান্তরে ভেক-চাতক-মানে ॥৪
গান্ধার ছাগরব-পরিমান ।
মতান্তরে গাবী-রব-প্রমাণ ॥৫
মধ্যম বক-রবে অনুভব ।
অন্যমতে বলে কোকিল-রব ॥৬
পঞ্চম কোকিল-ধ্বনি মধুর ।
তুরঙ্গম-রবে ধৈবত সুর ॥৭
নিখাদ সম্ভবে মাতঙ্গ-স্বরে ।
সুরের ধ্যান পাইবেন পরে ॥৮
যেমন আকৃতি-রূপাধিকার ।
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেবা যার ॥৯
অহর্নিশি অষ্ট প্রহর বার ।
সমান ভাগে ভাগ সবাকার ॥১০
যে যে রাগে, যে যে ঋতুতে গায় ।
বিবরণ করি লিখিব তায় ॥১১
এক যন্ত্রেতে দ্বিসপ্ততি ধাম ।
যাহাতে বিশেষ বিশেষ নাম ॥১২
ছয় সুর ছয় রাগের পিতা ।
শেষেত রাগের মাতা মিলিতা ॥১৩

এক স্বর, তার হীন তনয়।
অপুত্রক বলি তাহারে কয় ॥১৪
কহে সেনদাস পুরাণ-সূত্র।
ছয়-রাগ ছয় স্বরের পুত্র ॥১৫

স্বরের নামাদি-নির্ণয়

স্বর—	খরজ	ঋখভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিখাদ
আকৃতি—	ব্রহ্মা	নারদ	অগ্নি	বিষ্ণু	ইন্দ্র	শিব	গণেশ
রূপ—	রক্তবর্ণ	পাটলবর্ণ	পিঙ্গলবর্ণ	নীলবর্ণ	কৃষ্ণবর্ণ	শুভ্রবর্ণ	রক্তবর্ণ
সন্তান—	ভৈরব	মালকোশ	হিন্দোল	দীপক	মেঘ	শ্রীরাগ	নিঃসন্তান
অধিকার—	জম্বুদ্বীপ	প্লক্ষদ্বীপ	শাল্মলীদ্বীপ	কুশদ্বীপ	ক্রৌঞ্চদ্বীপ	শাকদ্বীপ	পুষ্করদ্বীপ
অধিষ্ঠাত্রী—	ব্রহ্মা	ব্রহ্মা	সরস্বতী	বিষ্ণু	শিব	শক্তি	সূর্য্য
দিবা/রাত্রি—		৮।০-৩৬	৮।০-৩৪	৮।০-৩৪	৮।০-৩৪	৮...	৮।০-৩৪
বার—	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
ঋতু—	হিম	শিশির	বসন্ত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	×

স্বর-সপ্তকের উদ্ভব-রহস্য সম্পর্কে সঙ্গীত প্রেমীদের মনে কৌতূহল থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু সুদূর অতীতে, পশু-পক্ষীর কণ্ঠস্বরকে ভিত্তি করেই স্বর-সপ্তকের উদ্ভব হয়েছিল কিনা, আজকের দিনের সঙ্গীত-বিজ্ঞানীদের নিকট সেটা প্রশ্ন হিসাবে বা সমস্তারূপে তেমন গ্রাহ্য হয় না। বস্তুতঃ অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যেই বিষয়বস্তুটা উল্লিখিত হয়েছে এবং গ্রন্থাকার রাধামোহনও আলোচ্যক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের পন্থাই অবলম্বন করেছেন মাত্র। বলাবাহুল্য, হস্তীর বৃংহতি শুনে যদিও বা কারুর মনে নিখাদ স্বরটির কথা উদিত হয়, গান্ধার প্রভৃতি স্বরের সঙ্গে কোন কোন পশু-পক্ষীর স্বরের সামঞ্জস্য সম্বন্ধিক সে সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রন্থকারও "মতান্তরের" উল্লেখ কার পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ১—৮

স্বরের নামাদি নির্ণয় প্রসঙ্গেও উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রেও, বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয় মতান্তরের আধিক্যটাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্যের ব্যাপারটা থেকে যায় উহ্য। উদাহরণস্বরূপ এখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে

বিরচিত অহোবল-কৃত সঙ্গীত পারিজাতের (৮৮-৯৬ সূত্র) স্বর প্রকরণম্-এর সঙ্গে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রকাশিত সঙ্গীত তরঙ্গের "রূপ-বর্ণ"-র পার্থক্যটা উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা :

	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
পারিজাত—	কমলাবর্ণ	পিঙ্গলবর্ণ	স্বর্ণবর্ণ	কুন্দবর্ণ	শ্যামবর্ণ	পীতবর্ণ	চিত্রবর্ণ
তরঙ্গ —	রক্তবর্ণ	পাটলবর্ণ	পিঙ্গলবর্ণ	নীলবর্ণ	কৃষ্ণবর্ণ	শুভ্রবর্ণ	রক্তবর্ণ

স্বরের সময়-নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ দণ্ড পল প্রভৃতির উল্লেখ করে গেছেন। গ্রন্থকার রাধামোহন সম্ভবতঃ ব্যাপারটাকে সরল করবার উদ্দেশ্যেই ৮।০০৩৬ প্রভৃতি করেছেন। বলাবাহুল্য, আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাঙ্গীতিক সার্থকতা সম্পর্কে আমাদের কিছুমাত্রও ধ্যান ধারণা নেই। ৯-১৫

শোরতের গান

শরীরের মধ্যে অধ-উর্দ্ধ—দীর্ঘস্থলী।
বাম হৈতে দক্ষিণ অবধি প্রস্থ বলি॥ ১
এই দীর্ঘ প্রস্থে সপ্ত স্বর বিস্তারিয়া
বসতি করেন সদা সস্ত্রীক হইয়া॥ ২
প্রস্থ-ভাগে দ্বাবিংশতি নাড়ীর গাঁথনি।
সেই সব নাড়ী সপ্ত স্বরের রমণী॥ ৩
স্বরের রমণীগণ সে যে নাম ধরে।
প্রকাশ করিয়া তাহা লিখিতেছি পরে॥ ৪
সকলের সংজ্ঞা নাম বিখ্যাত শোরত।
বিশেষিয়া কহিব বিশেষ নাম যত॥ ৫
সপ্ত স্বর দেখায়্যাছি ত্রিসপ্তক যন্ত্রে।
দ্বাবিংশতি শোরত দেখাইব ভিন্ন তন্ত্রে॥ ৬
খরজ স্বরের হৈল এ চারি যুবতী।
তবরয়া কমোদতী মন্দী ছন্দোবতী॥ ৭
রিখবের তিন ভার্য্যা কনক-লতিকা।
দয়াবতী আদি করি রঞ্জনী রতিকা॥ ৮
গান্ধারের তুই নারী বলি বিবরিয়া।
প্রথমেতে রুদ্রা আর ক্রোধা সে দ্বিতীয়া॥ ৯
মধ্যম স্বরের হয় এ চারি রমণী।

বীজরেখা প্রসারিণী পার্ব্বতী মার্জ্জনী ॥ ১০
পঞ্চম সে স্বর, তরে এ চারি রমণী।
যতী রক্তা সন্দীপনী আর আলাপনী
ধৈবতের তিন জায়া জানাই লিখিয়া।
মদন্তী রোহিণী তার রমেয়া তৃতীয়া ॥ ১২
নিখাদ স্বরের দেখ এ দুই রমণী।
উগ্রা আর স্থাভনী অর্থাৎ সে ক্ষোভনী ॥ ১৩
স্বরের যে কর্ম্ম, শোরতের সেই কর্ম্ম।
স্পষ্ট অস্পষ্ট রূপেতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥ ১৪
প্রকাশ স্বরের রূপ অতিস্পষ্ট রূপ।
অস্পষ্ট রূপেতে আছে শোরতের রূপ ॥ ১৫
প্রকাশ্যাপ্রকাশ্য দুই ভাবের প্রকাশ।
বিরচিত শ্রীরাধামোহন সেনদাস ॥ ১৬

পয়ারের ছন্দ বজায় রাখবার জন্য গ্রন্থকার এখানে এমন কয়েকটি বাক্য ব্যবহার করেছেন যা আপাতদৃষ্টিতে বিকৃত মনে হবে। যেমন শোয়ত অর্থে তিনি শ্রুতিকে বুঝিয়েছেন। শ্রুতির নামগুলির মধ্যেও তবররা, প্রভৃতি কয়েকটি বিকৃত উচ্চারণের বাক্য আছে। আমরা এখানে শাস্ত্রী উচ্চারণসহ স্বর-শ্রুতির বিভাগটিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি। যথা :—

১। সা — ৪ শ্রুতি = ১। তীব্রা ২। কুমুদ্বতী ৩। মন্দা ও ৪। ছন্দোবতী।
২। রে — ৩ শ্রুতি = ১। দয়াবতী ২। রঞ্জনী ও ৩। রতিকা।
৩। গা — ২ শ্রুতি = ১। রৌদ্রী ও ২। ক্রোধা।
৪। মা — ৪ শ্রুতি = ১। বজ্রিকা ২। প্রসারিণী ৩। প্রীতি ও ৪। মার্জ্জনী।
৫। পা — ৪ শ্রুতি = ১। ক্ষিতি ২। রক্তা ৩। সন্দীপনী ও ৪। আলাপিনী।
৬। ধা — ৩ শ্রুতি = ১। মদন্তী ২। রোহিনী ও ৩। রম্যা।
৭। নি — ২ শ্রুতি = ১। উগ্রা ও ২। ক্ষোভিনী।
৮। সা — ৪ শ্রুতি = ১। তীব্রা………………প্রভৃতি।

অর্থাৎ, গ্রন্থকার উল্লিখিত—
শোরত কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—শ্রুতি।
তবররা কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—তীব্রা (সা-১)
কমোদভী কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—কুমুদ্বতী (সা-২)

রুদ্রা কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—রৌদ্রী (গা-১)
বীজরেখা কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—বজ্রিকা (মা-১)
পার্বতী কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—প্রীতি (মা-৩)
যতী কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—ক্ষিতি (পা-১)
রমেয়া কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—রম্যা (ধা-৩)
ক্ষোভনী কথাটির শাস্ত্রীয় উচ্চারণ হবে—ক্ষোভিনী (নি-২) ১-১৬

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ২২ শ্রুতির নামগুলিকে চক্র হিসাবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, স্বরের অন্তর্ভুক্ত শ্রুতি-সংখ্যাটাকে সঠিক রেখে শ্রুতির নামগুলিকে ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। যেমন, হারমোনিয়াম যন্ত্রের সি সার্প স্বরটিকে যিনি সা হিসাবে ব্যবহার করবেন তাঁর সা স্বরের প্রথম শ্রুতির নাম হবে তীব্রা এবং পরের পর শ্রুতি-নাম-গুলির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নি স্বরের ক্ষোভিনীতে এসে শেষ হবে। কিন্তু যিনি সি সার্পের পা স্বরটিকে অর্থাৎ জি সার্পটিকে সা হিসাবে ব্যবহার করবেন তাঁর সা স্বরের প্রথম শ্রুতির নাম অবশ্যই ক্ষিতি হবে না; পরন্তু তীব্রা হিসাবে গ্রাহ্য করে শ্রুতি-নামের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে ব্যাপারটা সুবোধ্য হবে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে সি সার্পটি সা স্বর হিসাবে গ্রাহ্য না হয়ে মা স্বর হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে; অতএব এই মা স্বরটির প্রথম শ্রুতির নাম হওয়া উচিত বজ্রিকা। আমাদের মনে রাখতে হবে, নারী-পুরুষ-ভেদে কারুর কণ্ঠস্বরই কোন বিশেষ স্বর-সপ্তকের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই দেখা যায়, পুরুষ গায়কমাত্রেই সি সার্পকে সা করে গান করেন না বা মহিলা কণ্ঠশিল্পীমাত্রেই জি সার্পকে সা হিসাবে গ্রহন করে গান করেন না। অপর পক্ষে আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রাচীনযুগে আমাদের দেশে বেণু বা বাঁশী ছিল স্বর-শ্রুতি নির্দ্দিষ্টকরণের একমাত্র যন্ত্র। বাঁশীর নির্দ্দিষ্ট স্বরকে ভিত্তি করেই বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের তন্ত্রী বাঁধা হতো। কিন্তু, বাঁশীই হোক আর বীণাই হোক বাদ্যযন্ত্রমাত্রেই ছিল কণ্ঠ-সঙ্গীত-শিল্পীর সহযোগী সঙ্গতকার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁবেদার। অর্থাৎ, গায়ক যন্ত্রের তাঁবেদারী করে তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে অস্বাভাবিক চীৎকার বা অস্পষ্ট করে বদনাম কিনতেন না।—এ সম্বন্ধে, আরও কিছু আলোচনা আছে। বিকৃত-স্বর, মূর্চ্ছনা ও গ্রাম প্রসঙ্গে।

স্বর ও শ্রুতির তাৎপর্য্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করবার পক্ষে এখানে সঙ্গীত পারিজাতের ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক সূত্রদুটির ব্যাখ্যা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। যথা:

শ্রুতি ও স্বর অভিন্ন কারণ উভয়ই কর্ণেন্দ্রিয়গম্য। অবশ্য শাস্ত্র বলেছেন, শ্রুতি ও স্বরের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু পার্থক্যটা আসলে প্রয়োগ সম্ভূত স্বর-বৈচিত্র্যের ভেদে। যেমন, সাপের লম্বমান ও কুণ্ডলীকৃত শরীর আপাত-দৃষ্টিতে বিভিন্ন মনে হলেও, আসলে অভিন্ন, তেমনি স্বর ও শ্রুতির ব্যাপারটাও অভিন্ন।—৩৮

রাগের যথার্থরূপ পরিবেশন করবার জন্য যখন যে ক'টি শ্রুতিকে প্রকট করে তুলতে হয়, তখন সেই ক'টি শ্রুতি স্বররূপে চিহ্নিত হয়; এবং বাকি সে ক'টি শ্রুতি রাগরূপে ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয় না, সেইগুলি স্বরের পরিবর্তে শ্রুতি হিসাবেই গণ্য হয়।—৩৯

পরবর্তী প্রকরণের আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে মনে রাখা দরকার, বর্ত্তমানে সে স্বর-সপ্তকটি উত্তর ভারতের তথা হিন্দুস্থানের শুদ্ধ স্বর-সপ্তকরূপে প্রচলিত; তার সঙ্গে গ্রন্থকার বিবৃত শুদ্ধ-স্বর-সপ্তকের পার্থক্য আছে। গ্রন্থকার এখানে প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে উল্লিখিত শুদ্ধ-স্বর-সপ্তকের কথা বলেছেন যার গা ও নি স্বরদুটি ছিল বর্ত্তমানের কোমল গা-নি স্বর দুটির অনুরূপ। প্রশ্ন উঠতে পারে, গ্রন্থকার কি তাহলে তাঁর সমসাময়িককালের সঙ্গীত-বিজ্ঞান রচনা না করে কেবলমাত্র প্রাচীনেরই অনুসরণ করেছিলেন? এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, প্রাচীনকালে প্রচলিত কোমল গা-নিযুক্ত শুদ্ধ স্বর-সপ্তকটি ঠিক কবে থেকে বর্ত্তমানে প্রচলিত তীব্র গা-নিযুক্ত শুদ্ধ স্বর-সপ্তকে রূপান্তরিত হয়েছিল সেটা সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না; কেবল জানা যাচ্ছে জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ (১৭৭৯-১৮০৪ খৃঃ) তদানীন্তন ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ ও শাস্ত্রকারদের নিজের দরবারে সমবেত করে, তাঁদেরই সাহায্যে "রাধাগোবিন্দ সঙ্গীত-সার" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু রচনা, সম্পাদনা ও সংকলন করতে বেশ কয়েক বৎসর লেগেছিল এবং প্রকাশিত হয়েছিল সওয়াই মহারাজা প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর ঠিক চার বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। এই রাধাগোবিন্দ সঙ্গীত-সার গ্রন্থটির মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম তীব্র গা-নি যুক্ত শুদ্ধ স্বর-সপ্তকের ইঙ্গিত ও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, আমরা ভারতবাসীরা স্বভাবতই সংস্কার মুগ্ধ প্রাচীন পন্থী। সুতরাং, সুপ্রাচীন কোমল গা-নি যুক্ত শুদ্ধ-স্বর-সপ্তকের পরিবর্ত্তে তীব্র গা-নিযুক্ত শুদ্ধ-স্বর-সপ্তককে অচিরাৎ গ্রহণ করতে পেরেছিলাম সন্দেহ আছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর ১০১০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজা "নগমত-এ-আশফি" নামক একটি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশ করেন ফার্সি ভাষায়। এই গ্রন্থটির

মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত বা উল্লেখ নেই যার দ্বারা বোঝা যায়, মহম্মদ রেজা তীব্র গা-নিযুক্ত শুদ্ধ স্বর-সপ্তককে গ্রহণ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দু' বৎসর পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাধামোহন প্রকাশ করেন সঙ্গীত তরঙ্গ—কোমল গা-নিযুক্ত শুদ্ধ স্বর-সপ্তককে গ্রহণ করেই। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত capt, Willara এর Treatises of Hindusthanse music গ্রন্থে শুদ্ধ-স্বর-সপ্তক প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পায়নি। শেষে, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ করম ইমান প্রকাশিত "মাদনুল মৌসিকী" নামক গ্রন্থটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে হিন্দুস্থানের শুদ্ধ স্বর-সপ্তক তীব্র গা-নিযুক্ত।

প্রাচীন ও বর্তমান শুদ্ধ স্বর-সপ্তকের শ্রুতি-ভেদ্ জনিত স্বর-পরিবর্তনটা এখানে দেখানো যাচ্ছে :—

প্রাচীন—(নি)	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	(র্সা)	
(৪)	৩	২	৪	৪	৩	২	৪		=২২
বর্তমান—(২)	৫	৩	২	৪	৪	৩	২		=২২

অর্থাৎ—

প্রাচীন মতে রে-গা ও ধা-নি দুই শ্রুতিযুক্ত হওয়ার কারণে "কোমল" গানন
বর্তমান মতে রে-গা ও ধা-নি তিন শ্রুতিযুক্ত হওয়ার কারণে "তীব্র" গা-নি

শ্রুতি-রূপক-বর্ণন

পুরুষের এ স্বভাব গোপনীয় নয়।
স্ত্রীলোকের এই রীত ব্যবধানে রয় ॥১
অতএব লোকাচার-মত ব্যবহার।
স্বর আর শোরতের প্রতি প্রতিকার ॥২
স্বরেরা পুরুষ, গতাগতি দূরাদূরে।
শোরত রমনীগন থাকে অন্তঃপুরে ॥৩
বাহিরেতে যাতায়াত নহে এই জন্য।
কি জানি কখনো যদি দেখে কেহ অন্য ॥ ৪
তেকারণে শোরতেরা আপনা সম্বরি।
অন্তরে থাকেন সদা বাহ্য পরিহরি ॥ ৫
অর্থাৎ স্বরের রূপ প্রকাশকে পায়।
শোরতের রূপ সূক্ষ্ম রূপে দেখা যায় ॥ ৬
শোরতের সকল স্বরের কাছে কাছে।
যথার্থ শ্রেণীপূর্ব্বকে অধোভাগে আছে ॥ ৭

নিরীক্ষণ কর যন্ত্র পশ্চাৎ-লিখিত।
স্বর আর শোরতেরা একত্রে স্থাপিত ॥ ৮

গ্রন্থকার রচিত শ্রুতি-যন্ত্রটি পত্রিকায় মুদ্রণের অসুবিধার জন্য আপাততঃ বর্জ্জিত হলো।

মতান্তরে খরজাদি ধৈবত এ হয়।
প্রত্যেকের তিন ভার্য্যা করিলা নির্ণয় ॥৯
ছয় সুরে অষ্টাদশ শোরত মিলন।
নিখাদের চারি ভার্য্যা কৈলা নিরূপণ ॥১০
কোন মতে এই মত করিলেন ধার্য্য।
শোরতের অধঃসুর, উর্দ্ধ মতে কার্য্য ॥১১
এই তিন মতে সুর শোরত বিরাজে।
পূর্বে লিখিয়াছি ইড়া আদি নাড়ী সমাজে ॥১২
শোরত গলার স্বরে নামে রে নির্গত।
জন্ম মাত্র লয় হয় জল-বিম্ব যত ॥১৩
কিন্তু শোরত হইতে সুর প্রকাশিত।
শ্রীরাধামোহন সেনদাস বিরচিত ॥

গ্রন্থকার এখানে আর এক রকম স্বর-সপ্তকের পরিচয় দিয়েছেন যার নি স্বরটির শ্রুতি সংখ্যা চার এবং বাকি ছয়টি স্বরের প্রত্যেকটির শ্রুতি সংখ্যা ছিল তিনটি করে। বস্তুতঃ গ্রন্থকার এখানে বিলুপ্ত গান্ধার গ্রামের অন্তর্গত স্বর-সপ্তকের শ্রুতি-বিভাগটির কথা বলতে চেয়েছেন; কিন্তু কোন গ্রাম-নামের উল্লেখ করেন নি। কৌতুহলী পাঠক লক্ষ্য করবেন সমগ্র সঙ্গীত তরঙ্গ গ্রন্থটির মধ্যে কোথাও গ্রাম প্রসঙ্গে কোনরূপ আলোচনা স্থান পায়নি। ইতিপূর্বে আমরা স্বর-সপ্তক ও তার শ্রুতি-বিভাগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম সেটি যে ষড়জ গ্রামের অন্তর্গত স্বর-সপ্তক ও তার শ্রুতি-বিভাগ, গ্রন্থকার ইঙ্গিতেও সে সম্বন্ধে কিছু বলে যান নি। কিন্তু গ্রন্থকার যে ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞানের গ্রাম-এর সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মূল গ্রন্থের ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠায়। আলোচনা নেই; কিন্তু একটি গ্রাম-চক্র মুদ্রিত আছে।

যাঁরা গান-বাজনার চর্চা করেন তাঁরা অবশ্যই" সপ্তকত্রয়—তিন গ্রাম—একইশ মূর্চ্ছনা—বাইশ শ্রুতি" প্রকৃতি কথাগুলির সঙ্গে পরিচিত। অর্থাৎ, উদারা (মন্দ্র) মুদারা (মধ্য) ও তারা (তার) নামক তিনটি স্বর-সপ্তক; ষড়জ,

মধ্যম ও গান্ধার নামক তিনটি গ্রাম ; তিন-সপ্তকের সাতটি স্বরের ভিত্তিতে (৭×৩) একুশটি মূর্চ্ছনা ; এবং বাইশটি শ্রুতির ওপর নির্ভরশীল প্রতিটি স্বর-সপ্তক। এর মধ্যে ষড়জ গ্রামের স্বর-সপ্তক ও তার বাইশটি শ্রুতি সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। অতঃপর বাকি দুটি গ্রাম ও তার শ্রুতি, মূর্চ্ছনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি।

ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞান-এ ষড়জ (সা) মধ্যম (মা) ও গান্ধার (গা) নামক তিনটি গ্রামের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এই তিনটি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বকালের সর্ব্বাধিক প্রচলিত গ্রাম হচ্ছে ষড়জ্ গ্রাম। গান্ধার গ্রামটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে অন্ততপক্ষে হাজার বছর পূর্ব্বে। এবার মধ্যম গ্রামটি একেবারে অপ্রচলিত হয়ে না গেলেও, কথঞ্চিৎ পরিমাণে অস্তিত্ব বজায় রেরেছে ষড়জ গ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করে। অনুমান করি, আলোচ্য ক্ষেত্রে, মতান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকার মধ্যম গ্রামের শ্রুতি বিভাগটির উল্লেখ্ করেন নি এই কারণেই।

মূর্চ্ছনার আধারস্বরূপ যে স্বর-মণ্ডল তাকেই গ্রাম বলা হয়। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থাদিতে তিনটি গ্রামের স্বর-শ্রুতি বিভাগ দেখানো হয়েছে এইভাবে :—

	(নি)	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	(র্সা)
সা-গ্রাম :	(৪)	৩	২	৪	৪	৩	২	৪	= ২২
মা-গ্রাম :	(৪)	৩	২	৪	৩	৩	৩	৪	= ২২
গা-গ্রাম :	(৪)	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৪	= ২২

মতান্তরে—

সা-গ্রাম :	(৩)	৩	২	৪	৪	৩	৩	৩	= ২২
মা-গ্রাম :	(৪)	৩	২	৪	৩	৪	২	৪	= ২২
গা-গ্রাম :	(৪)	২	৪	৩	৩	৩	৩	৪	= ২২

ষড়জ-গ্রামের অন্তর্গত ২২টি শ্রুতিকে যেমন তীব্রা, কুমুদ্বতী প্রভৃতি নামকরণের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে তেমনি মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের শ্রুতিগুলিকেও বিভিন্ন নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাহুল্যভয়ে, এখানে নামগুলির উল্লেখ ও উদাহরণ পরিত্যক্ত হলো। [ক্রমশঃ]

শ্রীসীতাকান্ত মহাপাত্র

অপু

কবি শ্রীসীতাকান্ত মহাপাত্র কটক জেলার পাটফুড়ায় ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'মহলের' কবি বর্তমানে ওড়িশার প্রশাসন বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। 'দীপ্তি ও দ্যুতি'; 'অষ্টপদী' তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ।

অপু,
শ্রাবণ মেঘের উদাস ভাসা চোখ
মেঘে ঢাকা নোয়ানো আকাশ
কাশ ফুলের লহর
দূর ট্রেনের হুইসিল ও ধোঁয়া
সব মিলে মিশে এক আলেখ্য
তোর চোখ জুড়ে অম্লান
অজর অমর হয়ে থাকুক।

ভাঁড়ার হাতড়ে মরা হাতে চাল কি
খুদ, কিছু না মিলুক
তুই গৌরীর সঙ্গে নেচে নেচে
টেলিগ্রাফ তারের গান শুনে চল্‌
ডাক পিয়নের পথ চেয়ে চেয়ে
চিঠির জন্য
মনপ্রাণ যতোই শুকিয়ে উঠুক
তুই চিঠি চিঠি ডাক তুলে
চিঠিখানা হাতে না দিয়ে
ঘর থেকে উঠোন
উঠোন থেকে ঘর
কোন কথা কানে না নিয়ে
লাফিয়ে বেড়া॥

হে আমার ক্ষুদে ক্ষুদে অলজ্জ অকুণ্ঠ
সামান্য কটি বাল্যদিন
উপনিষদের শ্লোকের মত
সরল অবোধ্য শুভ্র মন
জেটি, কলের বাঁশী, ট্রাম বাস কোলাহলে
হে আমার গায়ত্রী ছন্দ
অ-সীমান্ত বন্ধ্যা ধূসরের বৃত্ত মধ্যে
সবুজ ক'বিঘে ফসল ক্ষেত
তুই মৃত্যুঞ্জয়ী হ;

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের পৃথিবী
ও তার ওপারের অসীমতার ছবি
অনাহাত অনাহতের পূরবী
ধুয়ে দিক তোর দু'চোখের জল।
আমাদের মূর্খতা আর ছলনা
ভয় ও বেদনা
সব ডুবিয়ে দিক তোর খিল খিল হাসি
আনন্দের সত্ত্ব সহ এ জীবন
চিরদিনের জন্য
হয়ে উঠুক
যৌথভাবে সকলের॥

আশিস সান্যাল

হে কবি দাম্ভিক হও

আমারও আকাশে জেনো হবে সূর্যোদয়।
এখন আঁধার যত হোক বেগবান,
থাকুক কুয়াসা ঘিরে আনন্দ-সুরভি
কুটিল আঘাতে সব হোক ম্রিয়মান—

তবু জেনো একদিন অন্ধকার ছিঁড়ে,
সপ্তাশ্ব বাহিত রথে আসবে সজল ;
ঘুচে যাবে দুর্ভাগ্যের সব ব্যবধান—
এবং আনন্দে ফের সূর্যকরোজ্জ্বল

ছড়াবে নির্ভয় আরো পুষ্পিত প্রান্তরে।
ভেঙে যাবে যন্ত্রণার কঠিন সাম্পান ;
একদিন এ আকাশে হবে সূর্যোদয়
এখন আঁধার যত হোক বেগবান।

তাহলে রেখোনা ভয় এ আঁধারে আর—
আশা রাখো দ্বিধাহীন সর্ব অসম্ভবে ;
হে কবি দাম্ভিক হও। জেনো হে তোমার
আবার আকাশে সেই সূর্যোদয় হবে।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

তোমার জন্য

তোমার জন্য কিছু আনিনি
আমার কালো গোলাপের মত চোখ দু'টি
তোমায় দিলাম
তুমি দেখ ধুলো উড়ছে
আভাসা জল থেকে তুলে আনা আমার হৃদপিণ্ড
তোমায় দিলাম
দুই করে নীলরক্ত
তোমায় দিলাম স্রোত শিরা উপশিরা
ঘন ছায়াময় জগত আমায় দাও
আমি স্তব্ধ ঈযান ॥

॥ তের ॥

ইছামতীর জীবন স্রোত

ইংরেজের দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পর্কে ভারতের, বিশেষ ক'রে কংগ্রেসের তো বটেই, আদর্শগত বিরোধ ছিল। তবু যখন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছিল, সমাজতন্ত্রী দল প্রস্তাবের দোষত্রুটি বিশ্লেষণ ক'রে প্রস্তাব বাতিলের সমর্থনেই রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। বস্তুতঃ শর্তসাপেক্ষ হলেও এই প্রস্তাবকে স্বাধীনতার প্রাগুষা ধরে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনকে নেহরু সমর্থন করেছিলেন। এবং ১৯৪৬ সালের জুলাইতে সাংবাদিক বৈঠকে আলোচনা প্রসঙ্গে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রস্তাবের যে সকল অংশ এদেশের কল্যাণের পরিপন্থী মনে হবে সেগুলো পাল্টে নেওয়া যাবে। তাঁর এই উক্তি জিন্না সাহেবের পছন্দ হয় নি। অতএব ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট মুসলীম লীগ দেশে এমনই অশান্তি আর হিংসাত্মক বিক্ষোভের আগুন জ্বালালেন যে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। বিশেষ ক'রে পাঞ্জাব আর বাংলার মানুষ বিপন্ন হ'ল। কলকাতায় ১৯৪৬ সালের অগস্টে লীগের ডিরেক্ট অ্যাকশনে তিন দিনে ১০০০০ মানুষ মরেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কলকাতায় যে ব্ল্যাক আউটের রাত্রির অবসান হয়েছিল তা যেন নূতন ক'রে নেমে এল, না, শুধু রাতই নয় দিনের বেলাতেও অন্ধকারের আইন প্রয়োগ হতে থাকল। কারফিউ জারি ক'রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার লীগের অপপ্রচেষ্টাজাত খুনোখুনী ঠেকাতে থাকলেন। গান্ধীজী অস্থির হয়ে সাম্প্রদায়িতার বিরুদ্ধে নির্ভীক অহিংস অভিযানে ভারত চষে বেড়াতে লাগলেন। সরকারী হিসেবে এক বছরে মৃত্যুর সংখ্যা যা পাওয়া যায় তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।

শহর কলকাতার মানুষ এর মধ্যেও সাহিত্য সংস্কৃতির পথ আঁকড়ে ছিল। বাংলার প্রাণস্পন্দন তা সে যতই বিঘ্নিত হোক, সাহিত্য সেখানে থাকবেই। তার প্রত্যক্ষ নজীর বোধহয় 'অভ্যুদয়' পত্রিকা। গুপ্তপ্রেসের আড্ডাতে 'পূরবী পাব্লিশার্সে'র কর্ণধার খবরটা দিলেন এবং অনুরোধ করলেন, ওই

পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য প্রথম শ্রেণীর একটি উপন্যাস জোগাড় ক'রে দিতে। তাঁর ধারণা আমি ইচ্ছে করলেই যেন এ কাজটা সহজে পারি। চিন্তায় পড়লাম। তারাশঙ্কর তখন একাধিক উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত, অতএব সে আশা ছাড়তে হ'ল। আমার মাথায় একটা মতলব এসে পড়ল। বড়দা'র ওপর জুলুমটা চাপিয়ে দিলে কেমন হয়। গিরীনকে বললাম— কলকাতায় বসে ওসব হয় না। যদি একটু নড়াচড়া করতে পারেন তাহলে এক জনের কাছ থেকে আদায় করা যায়—

কোঁচার খুঁটটা বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে দাঁতে কামড়ে গিরীন স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বললেন, কি ব্যাপার, কোথায় যেতে হবে বলুন না মশাই!

বড়দা অনেকদিন ধরে ইছামতীর দুই তীরের জীবনপ্রবাহকে নিয়ে একটি 'এপিক' লিখবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। এই সুযোগে তাঁকে নামাতে পারলে বইটা লেখা শুরু করানো যায়।

গিরীন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বিভূতিবাবুর উপন্যাস! বলেন কি মশাই, সে হলে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু আমরা খুব বেশী টাকা দিতে পারব না যে! তার কি?

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমার জানা আছে, টাকার জন্যে বড়দার কাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসার কোনোই শঙ্কা নেই। তবু জিজ্ঞেস করে রাখা ভাল, গিরীনবাবুদের আঁচটা জেনে রাখলে কথাবার্তা চালানোর সুবিধে হবে। গিরীন বললেন, হাজার।

সঙ্গে সঙ্গে টাইমটেব্‌ল দেখে স্থির হল, ভোরের ট্রেনে রওনা হয়ে বড়দার সঙ্গে কথাবার্তা করে আবার সেদিনই কলকাতায় ফেরা হবে। গিরীন বললেন, ওঁকে তাহলে একখানা চিঠি লিখে দিন।

ও-সবের মধ্যে গেলেই ফ্যাসাদ। চিঠি পেলে উনি ভাবতে বসবেন, আর ভাবা মানেই আপাততঃ ইছামতী লেখার ব্যাপারটা আবার প্ল্যানের কোটরে ঢুকে পড়বে। আজ-কাল ক'রে ত অনেক বছরই পাশ কাটিয়ে এসেছেন। যেমন 'কাজল' অর্থাৎ পথের পাঁচালীর তৃতীয় খণ্ড, তেমনি ইছামতী—।

চাকুরিয়ায় যখন আমার এক এবং অদ্বিতীয় চৌকীর অংশীদার হয়ে বড়দা পরমানন্দে এক আধটা রাত কাটাতেন, তন্নু পুকুরে স্নান এবং আহার কখনো গজেনদা বা মন্মথদা'দের বাড়িতে সমাধা হ'ত, তখনকার কথা। ভোরবেলা উঠে লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে বলতেন 'ইছামতী'র কথা। মনে হ'ত

খুব শীগ্‌গিরই ওই উপন্যাস লেখা শুরু করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল, এটা-ওটা লিখেই চলেছেন অথচ সেই মহাউপন্যাস শিল্পীর উদাসীনতার আড়ালে যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

কি জানি কেন, দৃঢ় ধারনা হয়েছিল তাঁকে তাগাদা দিয়ে ওই কাজের মধ্যে নামানোর নৈতিক দায়িত্ব আমারই থাকা উচিত।

আমি আর একা নই। পুরনো বাড়ি ছেড়ে সংসার পাতা হয়েছে নতুন বাড়িতে। বড়দা এখনও আসেন। হঠাৎই শিমুল গাছের তলা দিয়ে বনবাদাড় ভেঙে-সরু সিঁথির মতো পায়ে চলার পথে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়—'তাহলে ওই কথাই রইল—'। বস্তুতঃ এই 'কোড ওয়ার্ড' দিয়ে আগমন ও বিদায় দুটিই জানান্ দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে ততদিনে। ভূপেনদা' (আমার সহপাঠী) আর আমি একই বাড়ির বাসিন্দে হয়েছি। সে 'ভেপার' এবং আমি 'ফোতো' আখ্যা পেয়েছি বড়দার স্নেহের সুরে। পরিবর্তন অনেকই হয়েছে, শুধু 'ইছামতী'র কিছু হয় নি। সে কথা তুললেই দাব্‌ড়ি দিয়ে বলেন বড়দা—'ওসব কি হুড়োহুড়ি ক'রে হয়? একি তোমাদের আধুনিক উপন্যাস! স্কেচ্‌ করতে হবে' বা 'হবে হবে—' কিম্বা 'দেখতেই ত পাচ্চ আমি ঘুমোচ্চি নে, ঠিক সময়ই লিখবো।'

মাঝে মাঝে এমনও সন্দেহ হয়েছে, মানসিক প্রস্তুতির পরিবেশটাই হয়ত হারিয়ে যাবে এই ভাবে।

দু-একবার ক্ষেপে গিয়ে আঘাত ক'রে সে আভাসও দিয়েছি! উনিও স্বভাবঔদার্যে হজম ক'রে হেসে বলেছেন—'তোমায় ত বলেছি স্কেচ্‌ করা দরকার। খাতাপত্তর কই যে স্কেচ্‌ হবে!'

তথাস্তু, খাতা কিনে দেওয়া হল। তারপর থেকে শুনেই আসছি, স্কেচ করা হচ্ছে ইছামতীর।

অতএব এই অতর্কিত আক্রমণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। গিরীনকে নিয়ে একদিন ভোরের ট্রেন ধরে রানাঘাট হ'য়ে যথারীতি গোপালনগর স্কুলে হাজির। না, বনগাঁ আগে যাইনি কেন না গোপালনগর স্কুলেই তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা—না পেলে তখন বারাকপুরে বাড়িতে যাবো। এমন আশাতীত হাজিরায় খুব খুশী হলেন উনি। ক্লাস নিচ্ছিলেন, বেরিয়ে এলেন। পিছু পিছু এল ছেলের দল। তাদের দিকে তকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন- এঁরা কলকাতার খবরের কাগজের লোক রে! হাঁ নমস্কার কর।

ছেলেরা বড় বড় চোখে তাকাল। এবং কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে ক্লাসের

বেঞ্চে ছাত্রদের পাশে বসে এ-গল্প, সে-গল্প করে তিনি বললেন, তা হলে তোমাদের চান-খাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে হয়—

আসল কথাটা যতবার বলতে যাই উনি বাধা দিয়ে থামিয়ে রাখেন,—ওসব পরে হবে। বেলা হয়ে যাচ্ছে, আগে খাওয়া-দাওয়া কর। সেই কখন কলকাতা থেকে বেরিয়েছ।

ওঁর ধরণই এই রকম, কাজের কথায় কান দেবেন না। হেডমাষ্টার ছাড়লেন না, তাঁর বাড়িতেই নিমন্ত্রণ। আতিথ্যের আতিশয্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গিরীন খুব খুশী। বললেন, হ্যাঁ, গেরস্থ বটে! 'ইছামতী'র কথা উঠতেই বড়দা মাথা নেড়ে উড়িয়ে দিলেন,—তুমি ক্ষেপেছ। এখন! এরই মধ্যে হয় নাকি!

গিরীনের দিকে তাকিয়ে বড়দা'র সংকল্প টলাবার জন্য বেশ চাপ দিয়ে বললাম,—এঁদের পত্রিকা মার খেয়ে যাবে, সেটাই কি আপনি চান?

—তা চাইব কেন? তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইছামতী শুরু করা উচিত হবে না। এ ত আর সাধারণ উপন্যাস নয়!…কিছু বুঝি না, বুঝলে চলে না। তাই বেপরোয়াভাবে বললাম, আরম্ভ এই রকম ভাবে না করলে আর হবেই না। কতদিন ধরে তো কেবল স্কেচই করছেন—আমার ত মনে হয় সে খাতাটায় কালীর আঁচড় পড়ে নি।

আধঘণ্টা ধরে এই নিয়ে বাকযুদ্ধ। বাকযুদ্ধ মানে, উনি রাজী হচ্ছেন না, আমি আর গিরীন ঘ্যানঘ্যান করছি, 'আপনি প্রথম এক কিস্তি লেখা পাঠিয়ে দিয়ে তারপর চালিয়ে যান না। পত্রিকার কিস্তী ত মাসে একবারের বেশি নয়!

অবশেষে উনি বললেন, আচ্ছা এত করে যখন বলছ, তখন ভেবে দেখতে হচ্ছে।

তখন বয়স ছিল কম এবং সাহিত্যের গূঢ় গভীর সাধনা সম্পর্কে ধারণা খুবই কাঁচা ছিল। নইলে অমন 'নেই আঁকড়া'র মতো জুলুম জবরদস্তি সম্ভব হ'ত না। 'ভেবে দেখি' কবুল করা মানেই কাজ হাসিলের পথ ধরেছে। এখানে ওই মানুষটির কথাবার্তার কিছু হদিস দেওয়া যাক। সভাসমিতির উমেদাররা মিত্র-ঘোষের দোকানে এসে যখন ধরত তখন—প্রথমে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন, অসুবিধের তালিকা দিতেন। নাছোড়বান্দাদের এড়াবার জন্যে কথার ওপর অকারণ জোর পড়ত—'আচ্ছা, আচ্ছা বিশেষ চেষ্টা করব—' এবং তারা চলে যাবার পর বলতেন—'ইন ফ্যাক্ট খাওয়া হচ্ছে

না।' আর যদি বলতেন—'দেখি, চেষ্টা করব।' সেক্ষেত্রে কথাটা নিছক মুখের হ'ত না। এই চেষ্টাকে আমরা বলতাম 'বাৎসরিক চেষ্টা।'

আর ভাবতে সময় দেওয়া চলবে না। পাকাপাকি এখানে আজই নিশ্পত্তি করতে হবে। কোনো রকমে কিছু টাকা ওষুধ গেলানোর মত বড়দার হাতে গুঁজে দেওয়া দরকার। তাহলেই আমাদের কাজ হাসিল। উনি নিজেও ত পত্রপত্রিকা প্রকাশের সমস্যা সম্পর্কে খানিকটা জানেন। অতএব টাকা নিয়ে কিছুতেই চেপে বসে থাকতে পারবেন না। যারা কাগজ বার করবে তাদের বিপদের আশঙ্কা তাঁকে ভাবিয়ে এবং লিখিয়ে ছাড়বে। সে-সব হিসেব ক'রেই আগাম বাবদ একশ টাকা গিরীন সঙ্গে নিয়েছেন। কিন্তু টাকা নিতে বড়দার খুব আপত্তি। তাঁর এখন ভাবনা আমাদের কলকাতায় ফেরার কি বন্দোবস্ত করা যায় তাই নিয়ে। প্রথমে বলেছিলেন, 'তোমার বৌদি খুব দুঃখু পাবে আজ থেকে যাও।' কিন্তু গিরীন রাজী নন্। আমরা না ফিরলে দুশ্চিন্তায় ভুগে মরবে সবাই। চারদিকে যা খুনের হিড়িক তাতে স্বভাবতই খারাপটা মনে আসে। ওদিকে গোপালনগর থেকে যে ট্রেন রানাঘাট যায় তা ধরলে সন্ধ্যের আগে কলকাতায় পৌঁছনো যাবে না। রাত হ'লে, কারফিউ অর্থাৎ শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মে আটক থাকতে হবে। এদিকে আকাশে বর্ষণের হুমকী। দু-এক পশলা হয়েও গেছে। এখান থেকে বনগাঁ পাঁচ মাইল, হাঁটলে ঠিক সময়ে ট্রেন ধরা যাবে কি না সন্দেহ আছে। স্কুল থেকে আমাদের নিয়ে উনি বেরোলেন—'নেহাতই যখন থাকবে না তখন চলো দেখি একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

বাজারে পৌঁছেও একবার বললেন—এখনো ভেবে ছাখো রাতে জমিয়ে গল্প গুজব ক'রে কাল সকালে কলকাতা রওনা হবে কি না!

গিরীন বললেন—লোভ হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই।

চালের এক কারবারীর গোলাতে হাজির হয়ে বড়দা তাঁকে বললেন, 'ভাই, তোমার লরি যাবে বনগাঁ!' সে বললে, মাল বোঝাই হচ্ছে। এখুনি ছাড়বে।

আবার সেই ব্রহ্মাস্ত্র, এঁরা কলকাতার খবরের কাগজের লোক। তোমার লরিতে বনগাঁ পেঁ ছে দিতে পারবে?

এখানে একটা কথা না বলে পারছিনা। শহর কলকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সঙ্গে এই পল্লীর কোন পরিচয় নেই। ব্যাপারী ভদ্রলোক মুসলমান. হাসি মুখেই আমাদের দায়িত্ব নিলেন। বললেন—একটু বসুন আপনারা!

যে কাজে আসা সেটা কিন্তু এখনো চোকে নি। ভালো মানুষকে নিয়ে মুস্কিল অনেক!

গম্ভীরভাবে গিরীনকে বললাম,—টাকা দিন। পথে ঘাটে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা ঠিক নয়। যখন আনা হয়েছে বড়দার নাম করে তখন দিয়ে যাওয়াই সব দিক দিয়ে ভাল।

আর বড়দার হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়ে বললাম,—একটা রসিদ দিয়ে ভদ্র-লোকের মগজ থেকে দুশ্চিন্তাটা দূর করুন।

ওই দোকানে বসেই বালির কাগজের ওপর 'ইছামতী' লেখার স্বীকৃতিপত্র রচিত হয়ে গেল। বড়দা বিদায় দিয়ে চলে গেলেন।

মোটামুটি এটুকু বললেই চলত। কেননা সেদিনের বাকি ঘটনার সঙ্গে 'ইছামতী' উপন্যাসের কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু এমন স্মরণীয় দিন জীবনে বড় বেশী আসে না, তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও বাকীটুকু বলার ইচ্ছে সম্বরণ করা দুঃসাধ্য।

লরি ছাড়ল আরও ঘণ্টাখানেক পরে। মাল উঠতে উঠতে তেতলার সমান উঁচু হয়ে গেল লরির মাথা। পরিশেষে জানা গেল, ড্রাইভারেরও দুজন সঙ্গী রয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে তারা তো বাইরে বসে ভিজতে পারে না। অতএব আমাদেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতেই হল, আমরা লরীর মাথায় বস্তার ওপর বসব।

যাত্রার শুরুটা খুব খারাপ ছিল না। কিন্তু একটন ওজন বইবার গাড়িতে অন্ততঃ একশোমণ বোঝা উঠেছে। পিছল পথে গাড়ি চলছে—গরুর গাড়ির গতিতে। তার ওপর বৃষ্টি এল মুষলধারে। চোখে বিঁধছে তীরের ফলার মত তির্যক বৃষ্টিধারা, পথের দুপাশে শিরীষগাছের ডালগুলো ডানা মেলে রয়েছে, শপাং-শপাং চাবুকের মত আচমকা ঝাপটা মারছে। অগত্যা কোলের মধ্যে মাথা লুকিয়ে গাছের ডালের চোটগুলো পিঠ পেতে সামলাচ্ছি। আমার গায়ে ওয়াটারপ্রুফ, কাজেই খুব আঘাত লাগছে না। গিরীণের মাথায় রাণী চক্রবর্তীর একটি খর্বাকৃতি লেডিজছাতা। তবে, ভগবানের আশীর্বাদে তাঁর বিপুল বপুতে কয়েকপ্রস্থ চর্বির 'পলেস্তারা' রয়েছে। তবু তিন তলার সামনে উঁচুতে চড়ে চলার একটা থ্রিলই আলাদা। মন্দ লাগছিল না। তাও এক সময়ে লরি বিগড়ে গেল। দোষ নাকি তেলের। তখন কালোবাজারে চড়াদামে পেট্রল বিক্রী হত। ড্রাইভারের ধারণা, ওই পেট্রলেও যথেষ্ট জল মেশানো হয়। তাই গাড়ি চলতে চলতে অচল হয়ে যায়। এক টনের স্থলে একশো মণ

বোঝা চাপানোর দরুণ যে কল বেগড়াতে পারে সে কথা মোটেই তার কাছে বিশ্বাস্য নয়।

ধান ভাণতে শিবের গান বেমানান। তবু একটু বলি,—বনগাঁ যখন পৌঁছই তখন ট্রেন বসে নেই। গিরীন ভরসা দিলেন, পার্টি অফিসে তাঁর এক বন্ধু থাকেন, রাতটা সেই ভদ্রলোকের আশ্রয়েই কাটানো যাবে।

তাই হোক।

কিন্তু হল না, কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি আঁকড়ে ধরে ধরে পার্টি অফিসে হাজির হয়ে সেই ভদ্রলোকের নাম করতে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর বলল,—হ্যাঁ, ওই নামে এর আগে একজন ছিলেন বটে। তবে তিনি তো বর্ত্তমানে পাগল হয়ে গেছেন।

গিরীনের পার্টি অফিসের মুস্কিলআশানের বাত্তিটি দম্‌কায় নিভে যেতে গিরীন স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল গুঁজে বললেন—তাহলে—!

আঁধার সবদিক দিয়েই নেমেছে। বড়দার অনুরোধ উপেক্ষা করা ভুল হয়েছে। শোধরাবার পথও খোলা নেই। মনে পড়ল, বছর কয়েক আগে এ শহরের বাসিন্দাদের তরফ থেকে বড়দাকে তাঁর জন্মদিনে সম্বর্ধনা দেওয়ার উৎসবে সাহিত্যিকের আদর-অভ্যর্থনায় যে মহিলাটি মুগ্ধ করেছিলেন সেই অন্নপূর্ণা গোস্বামীর কথা। সভা হয়েছিল সেই পুরনো বনগ্রাম হাইস্কুলে, একদা পরপর তিনদিন যার বাইরে ঘোরাঘুরি ক'রেও ভেতরে ঢুকতে সাহস হয়নি বালক বিভূতির। সেই স্কুলই যেন বাইরের পাঁচজন গণ্যমান্যের সামনে নিজের সন্তানকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহ উপচে দিয়েছিল। সভার পরে কয়েকজনকে গাঁয়ের বাড়িতে জোর করেই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'বল্লেন—কল্যানী পায়েস রান্না ক'রে বসে আছে যে তোমাদের জন্যে।' নগর আর পল্লীর দুই তরফের শরীকের মিলনের সেই স্মৃতিটুকু এখানে হাজির করছি।

গ্রামের মধ্যে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

একদিকে দেখলাম বিভূতিভূষণের আনন্দ,—আগ্রহে ঝলমেলে চেহারা। —ভাখো এই আমার পূর্বপুরুষদের ভিটো। এই হচ্ছে তেঁতুলতলীর আমতলা, যার কথা তৃণাঙ্কুরে আছে। ······আর, এই হচ্ছে গিয়ে সেই বকুলগাছ, যার তলাতে অপু আর দুর্গা খেলা করত। আর, দেখবে কুঠীর মাঠ? ইছামতীর ধারে যাবে?···

আর দেখলাম নাগরিক মনের হিসাবরক্ষী একটু আগে যিনি পল্লীর গুণগানে সভামঞ্চ ঝঙ্কৃত করেছিলেন সেই সভাপতিকে। তিনি বললেন—যাই বলো তাই আমার মন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। চারদিক কেবল গাছপালায় ঢাকা। আর কোন বৈচিত্র্য নেই? মানুষ এখানে কি সুখে থাকে। আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই খুব আনন্দ পাও এই ঝিমিয়ে পড়া নিস্তেজ পরিবেশের মধ্যে? না না, রাগ ক'র না। আমি একথা বলছি, তার কারণ আমি এই ধরণের জীবনযাত্রা কল্পনাই করতে ভয় পাচ্ছি। ইন ফ্যাকট আমায় যদি কেউ বলে যে, 'তুমি এখানে থাকো, তোমায় আর কিচ্ছু করতে হবে না, তোমায় মাসে পাঁচশ টাকা দেওয়া হবে'—তাহলেও আমি থাকতে পারব না।

বিভূতিভূষণ একটু হাসলেন, বললেন—তা পারবে কি করে? আমিই কি কলকাতাতে গিয়ে খুব আরামে থাকি? মাঝে মাঝে যাই শুধু তোমাদের টানে। কিন্তু কিছুক্ষণ ওই বদ্ধ বাতাসে থাকলেই পালাই পালাই ইচ্ছে করে। এও তোমার তেমনি হ'ল। আমার আবার গাছের পাতা না দেখ্‌তে পেলে, ইছামতীর জলে গা ভাসিয়ে স্নান না করতে পারলে, মনে হয় না যে, বেঁচে আছি, বুঝলে প্রবোধ।

সেই জন্মদিনের উৎসবে পরিচয়ের সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টায় একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে হুকুম দিলাম—'ডাক্তার গোস্বামীর কোয়ার্টারে চলো।' এবং কোচম্যান যখন দ্বিরুক্তি না ক'রে গাড়ি চালালো তখন বুঝলাম গোস্বামীরা বদ্‌লি হন্ নি।

সে রাতখানা গোঁসাই পরিবারের আতিথ্য আদরযত্ন গিন্নীনের উদরবিভাগে প্রচণ্ড গোলমাল বাধিয়েছিল। একে সাহিত্যিক তায় একখানা হবু মাসিকপত্রের সম্পাদক; সাহিত্যযশপ্রার্থিনীর ক্ষেত্রে আতিশয্য উদ্রেক খুবই স্বাভাবিক। যাক সে সব কথা।

অভ্যুদয় পত্রিকা প্রকাশ শুরু হ'ল; 'ইছামতী' এবং রমেশচন্দ্র সেনের 'কাজল' দুখানি উপন্যাসই ধারাবাহিক ভাবে বেরুতে থাকল। দেখা গেল বড়দা নিয়মিতভাবেই লেখার কিস্তি জুগিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে ঠেলে কাজে নামিয়ে না দিলে, অতি সাম্প্রতিক 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গল্প থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে যে উপাদান সংগ্রহ করে চলেছিলেন তা, শেষ পর্যন্ত গ্রথিত হয়ে জীবনের অতি পুরাতন যত্নলালিত পরিকল্পনাকে বাস্তব উপন্যাস আকারে পরিবেশন কোনো দিন সম্ভব করত কি না তা বলা শক্ত। কেন না ভ্রমণের নেশার পাশাপাশি খ্যাতির

বিড়ম্বনাস্বরূপ সভাসমিতির তাগিদ সামলানো, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অনুরোধে গল্প লেখা—এসব ত ছিলই, তার উপর এমন একজন নূতন মানুষ ১৯৪৭ সালের আশ্বিনে এই পৃথিবীতে হাজির হ'ল যাকে নিয়ে বিভূতিভূষণ বড় ব্যস্ত। বাবলু—পুত্রসন্তান। এর আগে কয়েকটি সম্ভাবনা ভ্রষ্ট হয়ে এই প্রথম সন্তান সংসার জীবনে নূতন দিগন্ত রচনা করল। বাবলু বড় রোগা হয়েছে, ঝিনুকের দুধ ঢোক গিলে খেতে পারে না। এইসব কথা তাঁর চিঠিপত্রেরও বেশির ভাগ দখল করতো। এসব বলছি কেন? মাসে মাসে পত্রিকার কিস্তি জুগিয়ে 'ইছামতী' লেখা যেভাবে এগোচ্ছিল পত্রিকার হাউই পরমায়ুটি ফুরিয়ে যাওয়ার পরই দেখলাম সাহিত্যের উপর সংসার অগ্রাধিকার কায়েম করল। গ্রীষ্মের ইছামতী নদীর মতোই উপন্যাসের স্রোতও শুকোলো। বাব্‌লু—বাব্‌লু স্থ—ই যেন জীবনের রস কেন্দ্র, রসের উৎস এবং উৎসব।

এদিকে আমি বড়দার নতুন উপন্যাস প্রকাশের উৎসাহে পত্রিকার যতটা কপি হাতের কাছে পেয়েছি প্রেসে দিয়েছি। অল্প দিনেই তা ছাপা শেষ। নতুন কপি চাই। কখনো বনগাঁ কখনো ঘাটশিলায় চিঠি দিই, শীগগির কপি পাঠান! ছাপাখানাতে কাগজ মজুত রয়েছে। অথচ—। মহা সমস্যা। চিঠির জবাব আসে না।

অবশেষে যদি বা চিঠি এল তা পড়ে' গায়ের রক্ত হিম হবার দাখিল। একদা ছিল যে 'আলো সাহিত্য চক্র' যার স্থায়ী সভাপতি তিনি (৪১ মির্জাপুর স্ট্রীটে তখন থাকতেন) তারই লেটার হেডে লেখা চিঠিখানি আজও সযত্নে রেখেছি আমার কাছে।

ঘাটশিলা
২৭শে আশ্বিন ১৩৫৬

গৌরীশঙ্কর, ৺বিজয়ার আশীর্বাদ নিও। বালক-বালিকাদের ও বউমাকে দিও। ইছামতী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য অবিলম্বে জানিও :—

১। তোমার হাতে ও ছাপানো নিয়ে মোট কত ফর্মা আছে?

২। ছাপানো বাকি ফাইল আমার পাওয়া দরকার।

৩। কি কি অধ্যায়ে কি কি ঘটনা ঘটচে (ছাপানো ফাইল যা আমাকে পাঠিয়েছিলে তা বাদে) তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

এগুলো না হলে (বিশেষতঃ ৩নং) আমার লেখা অগ্রসর হতে পারে না, তা নিশ্চয় বুঝতে পারচো।

আমার হাতে ২০।২২ পাতার Matter রয়েছে। উপরোক্ত Information গুলি Supply করলে বাকি লেখা অগ্রসর হবে, তৎপূর্বে যে সম্ভব নয়, তা তুমি নিজে একজন ঔপন্যাসিক হয়ে নিশ্চয় বুঝতে পারচো ?...

বড়দা

অতএব আমাকে 'ইছামতী'র সমস্ত ঘটনা, কাহিনীর অগ্রগতির স্তর, প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাদের বয়স, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদির বিশ্লেষণ এবং কাহিনীর চুম্বক তৈরী করতে হল। সেটি ওঁর কাছে পাঠাবার আগে অনেক সঙ্কোচ ছিল মনে। জানি না, কোথায় কি ত্রুটি রয়ে গেল! অবশেষে দিলাম পাঠিয়ে। শুনেছি সেই খসড়াটি আজও কল্যাণী বউদির কাছে রয়েছে।

এরপর বড়দা আবার 'ইছামতী' লিখতে শুরু করেন। উপন্যাসখানি ছাপাকালীন আরও একখানি চিঠি রয়েছে :

গৌরীশঙ্কর,

পাঠালুম Copy, লেখা slowly এগুচ্ছে। পূর্বেকার ছাপা file গুলি চাই। নতুবা আগে কি লিখেছি, না পড়লে, পরে লেখা যায় না। এর হাতে file গুলো পাঠাবে।... গজেনবাবুকে আমার কথা বলো। ইছামতী নিয়ে এখন ব্যস্ত আছি। তবে অত তাড়াতাড়ি Copy যোগান দিতে পারব না। পুনশ্চ...ইহার হাতে ২।৪টি gem clip পাঠাবে। অতি অবশ্যই।

ইতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমে উনি বলেছিলেন, বইখানা বড়জোর দুশো সওয়াদুশো পৃষ্ঠায় শেষ হবে। কিন্তু দেখা গেল সওয়াচারশো পৃষ্ঠা পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। এ তো গেল প্রথম পর্বের কথা।

বই বেরুনোর আগে এবং পরে বহুবার তিনি বলেছেন, ইছামতীই হবে ওঁর সবচেয়ে বড় উপন্যাস। কথা ছিল, আর কিছুদিন পরেই 'ইছামতী'র দ্বিতীয় পর্ব লেখা শুরু করবেন। তারপর তৃতীয় পর্ব। এমনি করে উপন্যাসের গতি এসে পৌঁছবে বর্তমান যুগধারায়। বর্তমান 'ইছামতী' হ'ল সেই মহাকাব্যধর্মী সুবৃহৎ উপন্যাসের উন্মেষপর্ব। যে পর্বে আমরা দেখি দোর্দণ্ড-প্রতাপ কুঠিয়াল সাহেবদের রবরবা থেকে ভাঙনের মুখে আর নালুপালের মতো সাধারণ মানুষকে ব্যাপারবেপাতের অধ্যবসায় ও মেহনতের দৌলতে ধনসম্পদে

উন্নতির পথে এগোতে, আর দেখি ভবানী বাঁড়ুয্যের মত কুলীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সাধারণ সংসার যাত্রার মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনপথে আত্মনিয়োগ করতে —পরবর্তী খণ্ডগুলিতে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে পরিপূর্ণ সামাজিক ইতিহাস পাঠকের সামনে হাজির করারই প্রতিশ্রুতি একে বলা যেতে পারে।

কুঠিয়াল শিপ্‌টন, দেওয়ান রাজারাম রায়, প্রসন্ন আমীন, হলা পেকে, অঘোর মুচি, রামকানাই কবিরাজ, নালু পাল, তিলু বিলু নিলু এবং সর্বোপরি গয়ামেম প্রতিটি চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে পাঠককে শতাব্দীকাল অনায়াসে পিছিয়ে নিয়েগিয়ে সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করেছে সার্থক ভাবে। ভবানী বাঁড়ুয্যে আর চৈতন্যভারতীর মধ্যে আমরা যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে স্বয়ং লেখককেই দেখতে পাই। বেদান্তের তত্ত্ব ব্যাখ্যা আর উপলব্ধির বিন্যাসে বিভূতিভূষণের ঈশ্বর-ধারণা এই দুই চরিত্রকে ঘিরে সুন্দর ফুটে উঠেছে।

"—ভগবান তোমাদের মত কড়া নয়। অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না যে সংসারে থাকলে ভক্তি লাভ হয় না। সংসার তবে ভগবান সৃষ্টি করলেন কেন? তিনি প্রতারণা করবেন তাঁর অবোধ সন্তানদের?...

"—তমোগুণের শক্তিই আবরণ। বস্তু যথার্থভাবে প্রতিভাত না হয়ে অন্য প্রকারে প্রতিভাত হয়। এই জন্যই তমোগুণের নাম বৃতি! ভগবানকে দোষ দিও না। এভাবে ভগবানকে ভাবচো কেন? বেদান্ত পড়লে বুঝতে পারবে। ..." বেদান্ত ও গীতার প্রসঙ্গে আলোচনা আমরা বড়দার মুখে অনেক বারই শুনেছি। ঢাকুরিয়ার গভীর রাত্রে বা ঘাটশিলায় জ্যোৎস্নাস্নাত ফুলডুংরী পাহাড়ের পাথরের ওপর বসে! এর জন্য পরিবেশ বিশেষের প্রয়োজন হ'ত না—যেকোনো অবস্থাতেই তত্ত্বকথা ফেঁদে বসতেন তিনি।

তিনি একই আন্তরিকতায় বাব্‌লু সুর আধফোটা বুলিগুলি ইছামতীর চালাচিত্রে এঁকে গেছেন যেমন এঁকে ছিলেন কোল্‌সওয়ার্দি গ্রাণ্ট Indian yogi-র ছবি। বর্ণনার ভাষাও যেন ওই পরিবেশকে আশ্চর্য সজীব ক'রে তোলে। 'ঘেঁটু ফুলের মত শাদা জ্যোৎস্না' কিম্বা প্রসন্ন আমীনকে গয়ামেম যখন বৃষ্টিতে না ভিজে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রে একটু হাসল তখন—'বিলের শামুক আবার কতটুকু সুধা আশা করে চাঁদের কাছে? ও-ই যথেষ্ট।' অতুলনীয় নয় কি?

রামকানাই কবিরাজ চরিত্রটির সঙ্গে বিভূতিভূষণের পিতামহ তারিণীচরণ যিনি বারাকপুর গ্রামে প্রথম আসেন কবিরাজী করতে তাঁর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য

থাকা সম্ভব। তবে প্রত্যক্ষ করা নিজের পল্লীর একজন কবিরাজের ছায়া পড়েছে, বিশেষতঃ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের দিক থেকে। উর্ম্মিমুখরের দিনলিপি তার সাক্ষ্য।...'গঙ্গাচারণের দোকানে কবিরাজ মশাইএর সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বললুম—কি রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই ?—কণ্টীকারির ফলভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটি বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় সত্তর হবে কিন্তু সদানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়া গাঁয়ে। তবুও আছেন, বলেন—'এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরী করেচে, সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।...' আর একদিন...'কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করচে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করেচে।...' আরও একদিন দেখি—'কবিরাজ মশাই পাঠশালায় ছেলে পড়াচ্চেন, তাঁর কাছে বসে একটু গল্প ক'রে...'

বস্তুতঃ 'ইছামতী' উপন্যাস লেখার পরিকল্পনাও তাঁর প্রথম প্রবাস জীবনেরই বাসনা ভ্রূণে মনের মাঝে লালিত হয়ে এসেছে সেই ১৯২৮ সাল থেকে। স্মৃতির রেখায় তার দলিল মিলবে। কমলাকুণ্ডুতে ঘোড়া ছুটিয়ে নায়েবের সঙ্গে যাত্রা। ক্ষেতে ক্ষেতে পাকা যবের সোনা-রং আর মিষ্ট সুবাস।...'ফুলকিয়ার সীমানা ছাড়িয়েই জঙ্গল থেকে একটা বুনো মহিষ বার হ'ল। সেটার মূর্ত্তি দেখেই আমি বললাম, এটা মারতে পারে। ঘোড়া ঘোরান মশাই। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেটা শিং নেড়ে লাল চোখে আমাদের দিকে চাইতে লাগল।...খুব রোদ চড়েছে, কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবলাম—ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এইরকম ধুধু বালিয়াড়ি। পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দুপাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙ শালিকের বাসা। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট। আকন্দ ফুল। গত পাঁচ শত বৎসর ধরে কত ফুল ঝরে' পড়েছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে।...কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে' কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম নাইতে এল মায়ের সঙ্গে...। কত ছেলে, কত তরুণ তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধার ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা ; বনঝোপ, ছাতিম বন।...

'এদের গল্প লিখব, নাম হবে ইছামতী।' (১. ৩. ১৯২৮)

শ্রীমান চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি বড়দা কল্যাণীর সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই ইছামতীর বীজাকার একটি খসড়া করে রেখেছিলেন এবং সেই খসড়ার টুকরো কাগজটি দেশালাইএর খাপের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন সযত্নে। আর দেশালাইএর খাপটি সর্বদা সঙ্গে থাকত তাঁর। 'ইছামতী' গ্রন্থ পরিচয় নিবন্ধে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ সম্পর্কে যে বিস্তৃত ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন (বিভূতি রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮—৪০৬) তা কৌতূহলী পাঠকের কাছে মূল্যবান তাতে কোনো সংশয় নেই। এবং এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা না দিয়েও যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্যই বিভূতিভূষণ বছরের পর বছর ধীরভাবে একটু একটু ক'রে মালমশলা সঞ্চয় করে গিয়েছেন! তিলুর মতো মেয়ে যেন হটী বিদ্যালঙ্কারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সমাজে নারী অবরোধের বাঁধন কিঞ্চিৎ শিথিল এবং সনাতন নারী শিক্ষার পুনরাগমনের আভাসও এতে মেলে। মেলে তিতুমিরের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের জনমনে প্রতিক্রিয়ার সংবাদ। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতেও নিজের দৃঢ় ধারণাকে নির্দ্বিধায় উপস্থাপিত করতে দেখি। রাজা-রাজড়া বা তার কাছাকাছি ধনমর্যাদার চরিত্রকে আমরা পাই না. কুঠিয়াল সাহেবের কবর খানায় প্রসন্ন আমীন আর গয়া মেমকে দেখতে পাই। যে গয়া নীচু জাতের ঘরের মেয়ে, কুঠিয়াল সাহেবের প্রসাদে ধন্যা হয়েও সমাজে পতিতা আর প্রসন্ন আমীন সেও গোলামীর জন্য অনেক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে উন্নতির স্বপ্নে। প্রসন্নর গয়ার ওপর লোভ ছিল—দেহের ক্ষুধা! তা কখনো চরিতার্থ হয় নি। না হোক, গয়াকে প্রসন্ন ভালোবাসে। পক্ষান্তরে গয়া এসব বুঝেও নিজেকে বাঁচিয়ে চললেও, ওই লোকটার প্রতি মমতা মন থেকে মুছে ফ্যালে নি। এই দুটি বি-সম বয়সী নারী ও পুরুষের বোঝাপড়ার মধুর রেশই প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিচিত্র প্রত্যয়বাদের।

পরিশেষে···ওদের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চল বেগে বয়ে চলেচে বড় লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে!.. এই যাত্রা মহামানবের জাগরণের দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে।

উপন্যাসের পটভূমি আর চরিত্রাবলী যদিও যশোর জেলার মোল্লাহাটী বারাকপুর, তবু বড়দার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে লিখেছেন বেশির ভাগই ঘাটশিলাতে বসে! যেমন পুরীর সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি গাঁয়ের আইনদ্দী বুড়ো বা

গুটকের কথা ভাবতে পাঠাতেন মনকে। মন যেন ইচ্ছাব্যবহারের প্রতীকারত এক নিষেধরথ।

'ইছামতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে। এটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস এবং ওই বছরের শেষের দিকে সেনেট হলে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশাইএর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভায়ইছামতীকে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারছি না। বড়দা বেঁচে থাকতে তাঁর কোনও কাহিনী নাটক বা চিত্রেও রূপায়িত হয় নি বা কোনও পুরস্কার তিনি পান নি—এর একটি বড় কারণ বোধহয় আমাদের দীর্ঘ শতাব্দীর পরাধীনতায় বিক্রীত ও বিকৃত বা বিভ্রান্ত বিচারবুদ্ধি। বুদ্ধিজীবীরূপে চিহ্নিত কিঞ্চিৎ সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তির ধারনায় 'পপুলার' এই অপরাধে অভিযুক্ত বিভূতি ভূষণের প্রত্যয়নিষ্ঠার এও এক প্রমাণ যে তিনি সমকালের পাইকারদের পাল্লার ওজনের দিকে নজর না রেখে নিজের কাজই ক'রে গেছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

বুদ্ধদেব বসু আর নেই

বুদ্ধদেব বসু আর নেই। বেতারে সংবাদটা শোনার পরও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুদিন আগেও যখন তাঁকে দেখেছিলাম, তখন তাঁর বর্তমান শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, আরো অনেকদিন তিনি বাংলা সাহিত্যের অকৃপণ সেবা করে যেতে পারবেন। কিন্তু মানুষের অনেক হিসেবই শেষ পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়। আমার ওই হিসেবও ভুল হয়ে গেল। তিনি কিন্তু হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। না, সত্যিই কি তিনি হিসেব চুকিয়ে দিতে পেরেছেন? তিনি কি জানতেন, অগোচরে মৃত্যুর থাবা এগিয়ে আসছে? বোধহয় তাঁর হিসেবেও ভুল হয়ে গেছে কিছুটা।

দুপুরে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। তখন তিনি অন্তিমশয়ানে শায়িত। না জানলে বিশ্বাস করতেই পারতাম না, এমন শান্ত, সৌম্য দেহের ভেতরে শুধু প্রাণটি নেই। মনে হচ্ছিল, যেন গভীর প্রশান্তিতে তিনি ঘুমোচ্ছেন। দাঁড়াতে পারলাম না বেশিক্ষণ। বেরিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। বিকেলে যাবো ভেবেছিলাম শেষ যাত্রায়। কিন্তু কিছুতেই মন সায় দিল না।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার যে প্রায়শ দেখা হত, এমন নয়। মাঝে তো একবার ভীষণ চটে গিয়েছিলেন আমার উপর। আমি তো ভেবেছিলাম, বোধহয় কোনওদিন তিনি আমাকে সেভাবে গ্রহণ করবেন না। তবু একদিন মনের অযুত দ্বিধা নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। বাইরের ঘরে বসে বসে ভাবছিলাম, বোধহয় একটা কিছু ঘটবে। কিন্তু তিনি ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছিল। আমাকে দেখেই বললেন, 'ওঃ, তুমি!

ছোট্ট একটি কথা। কিন্তু এই ছোট্ট কথাটির মধ্যেই কি একটা অপূর্ব আস্বাদ আমি পেয়েছিলাম, তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। তিনি যে আমার উপর রুষ্ট হয়েছিলেন এমন কোনও আভাসই পেলাম না তাঁর চোখে মুখে। বরং মনে হচ্ছিল, যেন কতকালের স্নেহের বন্ধনে আমি তাঁর সঙ্গে আবদ্ধ। জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন কোনো বই নিয়ে এসেছো বুঝি?"

লজ্জা পেলাম তাঁর কথায়। একটু মিথ্যে করেই বললাম, 'আজ্ঞে না। বই এখনও বাইণ্ডারের কাছ থেকে পাইনি। যে ক'টা পেয়েছিলাম, ফুরিয়ে গেছে। আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে যাবো।'

দিন দু'য়েকের মধ্যেই দিয়ে এসেছিলাম তাঁকে আমার সম্প্রতি প্রকাশিত বই দু'টি। যাই হোক সেদিন প্রয়োজনীয় দু' একটা কথা সেরে বেরিয়ে এসেছিলাম। ফেরার পথে বার বার তার কথাই ভাবছিলাম। কী অপরিসীম উদারতায় তিনি আমাকে মার্জনা করেছেন।

আসলে শিল্প সাহিত্য বিষয়ক কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি তিনি মেনে নিতে পারতেন না। বেশ মনে আছে, তখন আমরা কলেজের ছাত্র। মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন বিষয়ক একটি আবেদন পত্রে তাঁর সাক্ষর নিতে গিয়েছিলাম। আবেদন পত্রটিতে এর আগে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। বিশেষ কারণে, তাঁদের নাম এখন আর করতে চাইনা। বুদ্ধদেব বাবু আবেদন পত্রটি পড়ে বললেন, "এতে আমি সই করবো না।"

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, "মাতৃভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আবেদন পত্র রচিত হয়েছে, তার ভাষাই যদি শুদ্ধ না হয়, তাতে আমি সই করবো না।"

"কিন্তু এটি তো লিখেছেন অমুক।" "যিনিই লিখুন" উত্তরে বললেন বুদ্ধদেব বসু, "ভাষা সঠিক না হলে তার নিচে আমার সই পাবেনা।" আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম সেদিন। তাঁর নামের ইংরেজি বানানের শেষে 'a' না থাকার জন্য তিনি যে আমার উপর কি পরিমাণ চটে গিয়েছিলেন, তা হয়ত অনেকেরই জানা আছে।

আসলে, আমার ধারণা, কোনও ব্যাপারেই শৈথিল্যকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর সাহিত্যেও কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এমন নিটোল গদ্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে আর কেউ লিখতে পেরেছেন কিনা, জানা নেই! কবিতার ছন্দ ব্যবহারে এবং শব্দ চয়নেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করি। যেমন—

বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনি হাওয়ার কনকনে চাবুকে
গায়ের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো করে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপরে আনে আকাশ, হিংস্রক
হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম, শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীর মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।"

একালের তরুণ কবিদের কবিতার শব্দ চয়নে ও ছন্দ ব্যবহারে যখন চরম শৈথিল্য চলছে, তখন বুদ্ধদেব বসুর এই কাব্য বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য বলে মনে করি।

তাঁর চরিত্রের আর একটা দিকও আমাকে মুগ্ধ করেছে। এমন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক আমি আর দেখিনি! সাহিত্য ছাড়া আর কিছু তিনি ভাবতেন না। সাহিত্য ছাড়া আর কিছু করতেন না। সাহিত্য ছিল তাঁর সকল কাজের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি ব্যয় করেছেন সাহিত্যের জন্য। বাংলা সাহিত্যের এই নিরলস সাধককে কোনদিন বাংলা সাহিত্য ভুলতে পারবে না। বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে বিরাজ করবেন।

তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ঢাকায় জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৪-২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে ৮ দিন ব্যাপী জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতবড় সাহিত্য সম্মেলন এর আগে বাংলাদেশে আরঅনুষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্ট লেখকরা আমন্ত্রিত হয়ে এই সম্মেলনে যোগ দেন। ভারত থেকেও একটি বিরাট সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী মনোজ বসু, মন্মথ রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ রমা চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ জীবেন্দ্রসিংহ রায়, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, বাণী রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শ্রীমতী লীলা রায়, আশিস সান্যাল, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, প্রদীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব মোহনকুমার মুখার্জী, শ্রী এম, এস, দেশপাণ্ডে, কলকাতার বাংলা সাহিত্য আকাদমির সম্পাদক বিনয় সরকার, তুষার মহাপাত্র, বিশ্বনাথ সেন প্রমুখ। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছলে দলটিকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ১৪ তারিখ বিকেল তিনটায় বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তিনি তাঁর ভাষণে সাহিত্যিকদের জাতীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলবার সাধনায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনদিনই

সাহিত্যের অগ্রগতি হতে পারে না। গণ জীবনের দুঃখ বেদনার বাস্তব রূপায়নই সাহিত্যের কাজ।" বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে লেখক-শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি আরো বলেন, "দেশ গঠনের কাজে এবার আপনাদের রচনা সহায়তা করুক।"

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি জসীমউদ্দীন। তাঁর ভাষণের সুর ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের। বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকগুলি তিনি তুলে ধরেন। লোক সংস্কৃতির যথার্থ মর্যাদা দেবার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "মুক্তিলাভের পর দেশে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানীরা দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছে। প্রতিটি দেশবাসীকেই এগিয়ে আসতে হবে এর থেকে মুক্তির জন্য। আর লেখকদের রচনা অতীতের মত বর্তমানেও যেন হয় তাঁদের পাথেয়।"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডঃ মযহারুল ইসলাম সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই সম্মেলন দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করবে বলে আশা করি।" তাঁর ভাষণের পর বিভিন্ন দেশ থেকেও আগত বিদেশী প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। ভারতীয় দলের নেতা শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, "আজ আমাদের কয়েকজনকে যে সম্মান ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা বাংলা একাডেমী একটি অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। এর কার্যকলাপের সঙ্গে আমরা বহুদিন থেকে পরিচিত। মহাপরিচালক অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম। আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে এবং এর মহাপরিচালকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।" তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন, 'আমাদের অধিকাংশের জন্মভূমি এই দেশ। আমার জন্মভূমি নয় কর্মভূমি। ভালোবেসেছি এই দেশকে। ভালোবাসা পেয়েছি। এ দেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ির টান তো থাকবেই! শুধু দেশের সঙ্গে নয়, দেশের মানুষের সঙ্গেও। যেখানেই থাকি না কেন, তাঁদের চিন্তা আমাদের মন ভরে থাকে। ভবিষ্যতেও থাকবে।"

এরপর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেন বিনয় সরকার।

আলোচনা সভা : ৮ দিন ব্যাপী এই সাহিত্য সম্মেলনে আয়োজিত সাহিত্যসভায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আগত বিদেশী প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। সব কটি আলোচনা সভাই খুব আকর্ষক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের কবিতা বিষয়ক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান। তিনি বলেন, 'কবিতাকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাদের দুঃখ দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কবিতায় রূপায়িত করতে হবে। কেননা, কবিতায় যে শব্দের শাসক আমরা, তা জনগণের কাছ থেকে নেওয়া। তাই কবিতায় শব্দের রূপচর্চাও প্রেরণা হওয়া উচিত।

কবি জাফর-ওবায়দুল্লাহ্ তরুণদের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, সমাজের সাধারণ মানুষের জন্যে ক্ষোভের কবিতা লিখতে হবে। কবি আবুল হোসেন তাঁর বক্তব্যে কবিতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতি জোর দেন।

ডঃ মোহম্মদ মনিরুজ্জমান তার সুদীর্ঘ লিখিত ভাষণে বাংলাদেশের কবিতার উপর সার্থক মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের কবিতার অবয়বে সমাজচেতনা চিরকালই উপস্থিত। কবিরা কোন সময়েই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। এই কারণেই তাঁদের রচনা পড়লে মনে হয়, যেন তাঁরা কখনও প্রতিবাদ মুখর, আবার কখনও বিক্ষুব্ধ। এছাড়া এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে হতাশা ও নৈরাজ্যও প্রভাব বিস্তার করেছে। তা ছাড়াও আর একটি অনুধাবনযোগ্য বলে মনে করি। কবিরা সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে এসেছেন। মধ্যবিত্ত সুলভ অনুভূতি তাই বাংলাদেশের কবিতার একটা প্রধান দিক।" সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার মৌল আবেদন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান ইঙ্গিতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আশিস সান্যাল বাংলাদেশের কবিতায় তিনটি ধারার কথা উল্লেখ করেন এবং পশ্চিমবাংলার কবিতার সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা করেন। হরপ্রসাদ মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী, জনাব আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, জবাব আতাউর রহমান, শ্রীসন্তোষ গুপ্ত, জনাব আবু বকর সিদ্দিকী, জনাব আরসান আমিন প্রমুখও ভাষণ দেন। হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি মি. লেসলী ক্যারী বলেন যে, হাঙ্গেরীর সঙ্গে বাংলাদেশের হাজার হাজার মাইল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উভয় দেশের কবিতার একতায় একটা সমধর্মিতা আছে। আসলে পৃথিবীর সমস্ত কবি লেখকই অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে একই ভাষায় কথা বলেন।

নাটকের আলোচনা সভায় সভানেত্রী ছিলেন ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের নাটকের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা বিদ্যমান। কিন্তু এজন্যই থেমে গেলে চলবে না। রেডিও টেলিভিশন আমাদের প্রলুব্ধ করেছে। রুচিকে করেছে বিকৃত। এখনও বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠেনি। এসব সমস্যা নাট্য মঞ্চায়নের বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এখন নতুন পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।" এই আলোচনা সভার মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব জিয়া হায়দার, শ্রীরামেন্দু মজুমদার ও জনাব মমতাজউদ্দীন আহ্‌মদ। জনাব জিয়া হায়দার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিলনায়তন প্রতিষ্ঠা ও পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী গড়ার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেন। শ্রীরামেন্দু মজুমদার নাট্য মঞ্চায়ন থেকে প্রমোদকর তুলে নেওয়া এবং নাট্য সাহিত্যের বিকাশের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। জনাব আহমেদ জামান চৌধুরী, জনাব আলী জাকের, জনাব আনীস চৌধুরীও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবু জাফর শামসউদ্দীন। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব হাসান আজিজুল হক ও জনাব আক্রাম হোসেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব শওকত আলী, যতীন সরকার, সেকান্দার হায়াত, মিসেস বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ প্রমুখ। ছোটগল্পের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মিরত আলী। মূল প্রবন্ধ পড়েন জনাব বশীর আল হেলাল। তিনি বাংলাদেশের ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাণী রায়, আবদুল হাই, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবু জাফর, খোন্দকার সিরাজুল হক, রাহাত খান, বিপ্রদাস বড়ুয়া প্রমুখ। বিকেলের অধিবেশনে মনোজ বসু ও জনাব শওকত ওসমান নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অন্যান্য আলোচনা সভাগুলিও বিশেষ উল্লেখ্য হয়।

২১-ফেব্রুয়ারী: ২১ ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখ্য অনুষ্ঠান ছিল এই দিনটি। অমর শহীদদের স্মৃতি তর্পণের জন্য যেন রাত বারোটা থেকেই সমস্ত ঢাকা জেগে উঠছিল এক নতুন শিহরণ নিয়ে। হাজার হাজার মানুষের অবিশ্রান্ত ঢেউ কেন্দ্রীয় শহীদ

মিনারের পাদদেশে যেন আছড়ে পড়েছিল। অসংখ্য মিছিল বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে জড় হচ্ছিল শহীদ মিনারে।

হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে লেখকরাও এগিয়ে চলছিলেন শহীদ মিনারের দিকে নগ্নপদে। সবচেয়ে প্রথমে ছিলেন ভারতীয় লেখকরা। এগিয়ে এলেন ধীর পায়ে। ভিড় ঠেলে তাঁরা উপরে উঠে গিয়ে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করলেন। দু'মিনিটের জন্য কেমন যেন ছল ছল করে উঠলো তাঁদের চোখ।

কবি সম্মেলন: সকাল ৬টা থেকে শুরু হলো কবিতা পাঠের আসর। অন্ততঃ দশ হাজার লোক শুনছেন শহীদদের প্রতি নিবেদিত কবিতা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেগম সুফিয়া কামাল। কবিতা পাঠ করেন পশ্চিমবাংলার হরপ্রসাদ মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী, বাণী রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল প্রমুখ। বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে কবিতা পড়েন আব্দুল গণি হাজারি, আশরাফ সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম, আবদুস সাত্তার, ফজল শাহাবুদ্দিন, আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, আহসান হাবীব, মোহম্মদ মনিরুজ্জমান, জিয়া হায়দার, শহীদ কাদরী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা, জিনাত আরা, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ কবিরা।

বিভিন্ন সম্বর্ধনায়: এই সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকায় সমবেত বিদেশী লেখকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারী সকালে প্রেসক্লাবে জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃক সম্বর্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীনির্মল সেন। সম্বর্ধনার উত্তরে ভারতীয় দলের নেতা শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, "বাংলাদেশের সাংবাদিকরা দারুণ সাহসিকতার সঙ্গে কথ্য ভাষাকে স্বচ্ছন্দে খবরের পাতায় ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশের খবরের কাগজের ভাষা অনেক বলিষ্ঠ।" শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় "পদ্মা-মেঘনা উপকূলের তরুণদের কল্লোলমুখর স্রোতধারা অবশ্যই তার মোহনায় পৌঁছবে।" মনোজ বসু তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের গৌরোবজ্জ্বল ইতিহাসের উল্লেখ করেন। এ ছাড়াও হাঙ্গেরীয় প্রতিনিধি দলের নেতা লেসলী ক্যারী, পূর্ব জার্মান প্রতিনিধিদলের হান্সো গার্বনার, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ রমা চৌধুরী, মন্মথ রায় প্রমুখও ভাষণ দেন।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে পূর্বাণী হোটেলে এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় লেখকদের সম্বর্ধিত করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী জনাব ইউসুফ আলী এক আবেগময়ী ভাষণে বলেন, "রক্তের রাখিতে বাঁধা বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীতে ফাটল ধরাবার ক্ষমতা কারো নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশের মাটি শুধু এ দেশের মানুষের রক্তেই লাল হয়নি। সেই সাথে মিশে গেছে অনেক ভারতীয় জোয়ানের রক্ত। দুই দেশের মধ্যে রয়েছে আদর্শগত মিল। এই আদর্শ ই এনে দিয়েছে আমাদের কাছাকাছি।" মৈত্রী সমিতির সভানেত্রী বেগম বদরুন্নেসা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় উভয় দেশের মৈত্রীকে আরও সুদৃঢ় করবার গুরুত্বের উপর জোর দেন। ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীসুবিমল দত্ত-ও উভয় দেশের মৈত্রীকে আরো গভীরতর করার কথা বলেন।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীসুবিমল দত্তের আমন্ত্রণে ভারতীয় লেখকরা ১৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ভারতীয় দূতাবাসে এক চা-চক্রে মিলিত হন। শ্রী দত্ত সেখানে বিস্তৃতভাবে বাংলাদেশের জন্য ভারত সরকার কি কি করেছেন এবং করছেন, তা ব্যাখ্যা করেন। দূতাবাসের দুই জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনাব জালালউদ্দিন ও শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে আপ্যায়িত করেন। তাঁদের অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে।

আওয়ামী লীগ আয়োজিত সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, "বাংলাদেশের জনগণ শুভ ও সত্যযুগের উদ্বোধন করেছেন।" মন্মথ রায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানান, এই সময়ে শতাব্দীর তিনটি শ্রেষ্ঠ নাটক অভিনীত হয়েছে। প্রথমটি রচনা করেছেন বাংলার ভাষা শহিদ বরকত, সালাম প্রমুখ। দ্বিতীয়টি রচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের কর্মীরা। তৃতীয় নাটকটি রচিত হচ্ছে এবং তার বিষয় সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ সৃষ্টি। এই নাটক দেখবার জন্য সমগ্র পৃথিবী আগ্রহে অপেক্ষা করছে।" মনোজ বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ জীবেন সিংহরায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখও ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এ. এইচ. এম. কামারুজ্জমান।

এ ছাড়াও ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ডাকসু, রামকৃষ্ণমিশন, মুক্তধারা প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকেও ভারতীয় ও বিদেশী লেখক প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানান হয়। এমন আন্তরিক সম্বর্ধনা কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়।

সমাপ্তি অধিবেশন : সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি জনাব মহম্মদ উল্লাহ্। তিনি বলেন, "বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কবি-সাহিত্যিকরা মুক্তি সংগ্রাম থেকে উপাদান নিয়ে তাঁদের সৃজনশীল সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ দেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীরত্ব ও উদ্দীপনা দেখিয়েছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর থেকে দেশের কবি লেখকরা প্রেরণা পাবেন।" তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। তবে ভারত ও বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতাও অভিনন্দনযোগ্য।" অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিন। রাষ্ট্রপতি একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের পুরস্কার বিতরণ করেন। ডঃ মযহারুল ইসলাম, আতাউর রহমান প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শেষে একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং দু'মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এ ছাড়াও ১৫ দফার একটি প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়: "আমরা সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সকল রকম সাম্প্রদায়িকতা, পশ্চাৎমুখিনতা, অবক্ষয় মুখিনতা, ভাব-বিলাসিতা, পলায়নপরতা ও জীবন বিমুখতার বিরোধী।"

•

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে : ২২ তারিখ সকাল দশটায় ভারতীয় লেখকরা গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গণভবনে দেখা করতে। ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রায় আধঘণ্টাকাল কবি-লেখকদের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক আলাপ আলোচনায় কাটান। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর কাছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্বন্ধে জানতে চাইলে, তিনি তা বলেন। আশিস সান্যাল প্রশ্ন করেন: "পাকিস্থানী জেলে যখন আপনার জন্য কবর খোঁড়া হচ্ছিল, তখন তা দেখে আপনার কেমন লাগছিল?" বঙ্গবন্ধু হেসে বলেন, "আমি কিন্তু অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলাম।" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীত্ব আমার আর ভাল লাগছে না। কিন্তু ওঁরা আমাকে কিছুতেই ছাড়ছেন না।" এরপর সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য আলোচনায় ডঃ রমা চৌধুরী, বাণী রায়, লীলা রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যোগ দেন। শাদা পা-জামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত প্রধানমন্ত্রীকে তখন খুবই প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। অত্যন্ত আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল তাঁর কথা-বার্তায়।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে: ২১ তারিখ সন্ধ্যায় ভারতীয় লেখকরা গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে। সকলের সঙ্গেই রাষ্ট্রপতি করমর্দন করেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দেন। রাষ্ট্রপতির অনুরোধে প্রদীপ ঘোষ 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। সবিতাব্রত দত্তের নাম তো সকলের মুখে মুখে। মুকুন্দদাসের 'সাবধান' গানটি যে-ভাবে তিনি পরিবেশন করেছেন তার তুলনা হয়না। আবৃত্তিতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তিও সকলকে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনায় সুমিত্রা সেন ও মায়া সেন সকলকে অভিভূত করেছেন। 'থিয়েটার ওয়ার্কস শপ' এর "চাক ভাঙা মধু' ও 'রাজরক্ত' দেখে অন্ততঃ দু'দিনে ২০ হাজার দর্শক এই অসাধারণ নাট্য প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়ায় উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা বাংলা একাডেমী বিদেশ থেকে আগত সমস্ত বিদেশী প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার এবং আতিথেয়তার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা সত্যই প্রশংশনীয়। একাডেমীর প্রতিটি কর্মী যেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্মেলনটিকে সার্থক করবার জন্য কাজ করে গেছেন, তার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ পাওয়া যায়। তবে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সকলে এর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পেরেছেন বলে মনে হয়না। আশা করি, ভবিষ্যতে এ ধরনের সম্মেলনে যোগদানের আগে আর একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন যোগদানকারীরা। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

কবিতা মেলা: গত ১৬ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৫টায় ঢাকায় টি. এস. সি-র সামনের আয়ল্যাণ্ডে 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার উদ্যোগে এক কবিতা পাঠের আসর বসে। মুক্ত আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত এই কবিতা আসরে প্রায় ৪০জন তরুণ কবি কবিতা পাঠ করেন। এ'দের মধ্যে ছিলেন আসাদ চৌধুরী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মহম্মদ রফিক, আবুল হাসান, জিনাত আর রফিক, মুহম্মদ নূরুল হুদা, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দাউদ হায়দার, সানাউল হক খান প্রমুখ।

শরৎ সমিতি: শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২২ মার্চ দক্ষিণ কলকাতায় এক কবিতা পাঠের আসর বসে। এতে পৌরোহিত্য

করেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীসতীকান্ত গুহ বলেন, "কবিতা বস্তু জগৎ-এর রস আহরণ করলেও বস্তুর অতীত একটা অনুভূতিতে পাঠককে নিয়ে যায়। যে কবিতায় তা আছে, তাই কাব্য।" কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীকান্ত গুহ, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাণী রায়, শান্তিকুমার ঘোষ, সবিতা সেনগুপ্ত, আশিস সান্যাল, শুভ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভু রক্ষিত, সুপ্তি সেন প্রমুখ আরো অনেকে।

মুজতবা আলী স্মৃতি সভা: গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে সৈয়দ মুজতবা আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়, মনোজ বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, রশিদকবীর, জনাব জয়েনউদ্দিন, শওকত ওসমান প্রমুখ আলী সাহেবের সাহিত্য ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

একটি পত্রিকা: আফ্রো-এশীয় লেখক সংস্থার মুখপত্র 'লোটস'-এর ১৫নং সংখ্যাটি বর্তমানে আমাদের হাতে এসেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিশিষ্ট লেখকদের রচনার অনুবাদ এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তা ছাড়াও এতে এই দুই মহাদেশের সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনের বিভিন্ন খবর। ইংরেজি, ফরাসী, আরবী ও জর্মন ভাষায় কায়রো থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় আছে মিশরের লেখক ইলসুক এল সেবাই, সিরিয়ার খালদন এল শামা প্রমুখের প্রবন্ধ; রাশিয়া, বাংলাদেশ, ইরাক ও উগাণ্ডার বিশিষ্ট লেখকদের কবিতা ও গল্প। এ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার লোটাস পুরস্কার বিজয়ী লেখক আলেক্স লা-গুমা, ভারতের আশিস সান্যাল, সুদানের টাগ এল সের এল হাসানের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা। পত্রিকাটি আফ্রো-এশীয় রচনা সম্পর্কে আগ্রহীদের কাছে খুবই মূল্যবান মনে হবে।